রবীন্দ্র-সাগর সংগমে

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়
সম্পাদিত

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে স্ট্রীট :: কলিকাতা ১২.

প্রকাশক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে স্ট্রীট :: কলিকাতা ১২

RABINDRA-SAGARSANGAME
Edited by Bisu Mukhopadhyay
Price : Rs. 10·00

মূল্য : দশ টাকা

প্রচ্ছদ-শিল্পী : শ্রীকমল চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর : শ্রীবিজলী ভূষণ ভাদুড়ী
প্রিণ্টেক্স
৬, নবীন সরকার লেন :: কলিকাতা ৩

রবীন্দ্র
সাগর
সংগমে

"চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনং।
চলাচলমিদং সর্বং কীর্তির্যস্য স জীবতি ॥"

কবির আবির্ভাব ও তিরোভাব কাল

আবির্ভাব : ২৫ বৈশাখ (সোমবার, রাত্রি ২টা) ১২৬৮ সাল

তিরোভাব : ২২ শ্রাবণ (বৃহস্পতিবার, দিবা ১২-১৩ মিঃ) ১৩৪৮ সাল

।।। গ্রন্থাভাষ ।।।

রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্য-সাহিত্যের উপর শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্র-বোদ্ধা বহু সাহিত্যিক, সমালোচক ও প্রাজ্ঞজন নানা দিক হইতে তাঁহাদিগের বিশ্লেষণী-শক্তি ও সাহিত্য-বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে। বিভিন্ন ধরনের সংকলন-গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে কয়েকখানি এবং সেইগুলি ইদানীন্তনকালের লেখক-গণের রচনায় সমৃদ্ধ। বস্তুতঃ, উক্ত সংকলনগুলির মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে আলোচকদিগের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী ও মননশীলতা।

'রবীন্দ্র-সাগরসংগমে' প্রধানতঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যের উপর রচিত পূর্বাচার্যদিগের সমালোচনা, টীকা-টিপ্পনী ও মন্তব্যের সংকলন। অনুরূপ গ্রন্থ এযাবৎ সম্ভবতঃ আর প্রকাশিত হয় নাই। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল্যায়নের দিক হইতে ইহা একখানি মূল্যবান প্রাচীন দলিল-বিশেষ। এই দলিলের লেখকগণ আজ সকলেই লোকান্তরিত। রবীন্দ্রনাথের রচনারম্ভের প্রাথমিক যুগ হইতে তাঁহার সম্পর্কে এবং তাঁহার কাব্য-সাহিত্য সম্পর্কে এই মনীষীরা কি ধারণা পোষণ করিতেন, এই সংকলন-গ্রন্থের সাহায্যে তাহারই সামগ্রিক রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। কেবল-মাত্র ব্যক্তিবিশেষের রচনাই নহে, তৎকালীন বঙ্গভাষায় রচিত সাময়িক পত্রিকা-গুলিতেও সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে, রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-রচনা সম্পর্কে কি ধরনের বাদানুবাদ ও মন্তব্য প্রকাশিত হইত, তাহারও আংশিক নিদর্শন এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এই রচনাগুলির অধিকাংশই বিভিন্ন প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পত্রিকাসমূহ হইতে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অধুনা অপ্রাপ্য ও দুরূহ-লভ্য গ্রন্থাদি হইতে সংগৃহীত। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত ও বিস্মৃতপ্রায় বহু রচনার সন্ধানও পাঠকগণ এই সংকলনের সাহায্যে লাভ করিবেন। রবীন্দ্রনাথের সপক্ষে ও বিপক্ষে রচিত এই রচনাগুলির কতকাংশ যেইরূপ কৌতূহলোদ্দীপক, অপরাংশ সেইরূপ ভাষা, যুক্তি ও বিশ্লেষণের দিক হইতেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং তদানীন্তনকালের সাহিত্য-প্রচেষ্টার নিদর্শন-পুষ্ট। সমালোচনা-সাহিত্যের দিক হইতে এই আলোচনা-গুলির একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সাহিত্য-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত রবীন্দ্র-সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের একটি ধারাও

পরিলক্ষিত হইবে রচনাগুলির পারস্পরিক তাৎপর্য লক্ষ্য করিলে। যে 'কবি কাহিনী'র মাধ্যমে গ্রন্থকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের জয়যাত্রা সূচিত হইয়াছিল, সেই গ্রন্থ হইতে প্রকাশের পর্যায়ক্রম অনুসারে কাব্য, নাটক ও উপন্যাসসহ ত্রিশখানি রবীন্দ্র-গ্রন্থের আলোচনায়-সমৃদ্ধ এই সংকলন। যদিও নিরপেক্ষ সাহিত্য-বিচার অপেক্ষা কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আক্রোশ, অসূয়া এবং কবির সমাজ-চেতনা, ধর্মবিশ্বাস ও সাজাত্যবোধের সহিত মতান্তরের ফলেই আলোচনা-গুলি উদ্ভূত হইয়াছে, এবং যদিও স্তুতি-স্তাবকতার নিদর্শনও স্বল্প নয়, তথাপি বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রসার-প্রতিপত্তির কথাই বিশেষ ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে ইহাদিগের সাহায্যে। এই সম্পর্কে দার্শনিক-সমালোচক ক্রোচে একদা যে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন, পৃথিবীর কোন দেশে, কোন কালে, কোন কবি সমালোচকগণের নিকট প্রথমেই কবি বলিয়া স্বীকৃত হননি; যখন জনসাধারণ তাঁহাদিগকে যথার্থ কবি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তখনই সমালোচকগণ তাঁহাদিগের সম্পর্কে মুখর হইয়া উঠিয়াছেন। এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে ইতালীর মহাকবি দান্তে ও ইংলণ্ডের সেক্সপীয়রের নামোল্লেখ সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও বঙ্গদেশে অনুরূপ ঘটনাই ঘটিয়াছিল সমালোচনার ক্ষেত্রে। বহু বিরুদ্ধমতাবলম্বী ব্যক্তিও শেষ পর্যন্ত সর্বসাধারণের স্বীকৃতির অনুকূলে রবীন্দ্র-নাথের অনন্যসাধারণ সৃজনী-প্রতিভাকে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বর্তমানে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করিতে বসিলে সর্বপ্রথম ইহাই অনুমিত হয় যে, রবীন্দ্র-প্রতিভা দিগন্তবিস্তারি বিশাল ও সুগভীর সমুদ্রের সহিতই উপমেয়। সে রসসমুদ্রে সন্তরণ ও অবগাহন করা সম্ভব, কিন্তু তাহার পরিধি ও গভীরতার পরিমাণ নিরূপণ দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আলোচ্য সংকলন-গ্রন্থ 'রবীন্দ্র-সাগরসংগমে' বহু তীর্থযাত্রীর শুভাগমন হইয়াছে—কেহ কেহ শান্ত চিত্তে প্রশস্তি গাহিয়া এই তীর্থসলিলে অবগাহন করিয়া নিজেদের স্নিগ্ধ করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ বা ইহার বিশালতায় দিশাহারা হইয়া অশান্ত ও ক্ষুব্ধচিত্তে ইহাকে নিন্দিত করিয়াছেন, কিন্তু তন্নিবন্ধনে সাগরের বারিরাশি কণামাত্রও অপরিচ্ছন্ন হয় নাই, কোথাও তাহাতে মালিন্য স্পর্শ করে নাই।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা ও তাহার বিভিন্ন পর্যায় সংক্ষেপে আলোচনা করিলে ইহাই প্রত্যক্ষীভূত হয় যে, প্রথম পর্যায়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের আবেদন ক্ল্যাসিকাল মনে বৈপরীত্যই সৃষ্টি করিয়াছিল। আর্যসংস্কৃতি-নিষ্ঠ

সনাতন ভারতবর্ষ রবীন্দ্র-প্রতিভাকে পূর্ণাঙ্গরূপে গ্রহণ করিতে যথেষ্ট ইতস্ততঃ করিয়াছিল ; কারণ রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত আচারসর্বস্ব সংস্কারের রুদ্ধ-প্রাচীর ধূলিসাৎ করিয়া প্রত্যক্ষানুভূতির উপর আবেদনের নূতন ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ফলতঃ, প্রাচীন পদ্ধতিসম্মত কোন সূত্রই রবীন্দ্র-সাহিত্যের পূর্ণমূল্যায়নের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্য-পর্যায়ে আমরা লক্ষ্য করি, ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য-সাহিত্যের প্রভাব বহুলাংশে বিস্তৃত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, উক্ত সময় শেলি, কীটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং বিশেষভাবে ব্রাউনিং ও সুইনবার্ণের কাব্যোপলব্ধির সহিত ভারতীয় মার্জিত মনমানসে রোমান্টিক ধারার অনুপ্রবেশ আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কাব্য ভারতীয় অনুভূতিতে সাড়া জাগায়—নিত্য-নূতন আবিষ্কারের মত রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার পূর্ণবিকাশ কাব্যে-সাহিত্যে-আলোচনায় পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করে। রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন, কাব্য-বিভূতি ও ধর্মানুভূতি মনুষ্যত্বকে এমনই এক নূতনতর পথের সন্ধান দান করে যে, সর্বশেষে তাহারই সার্থক উপলব্ধির নিদর্শন হিসাবে, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে আমরা জগৎব্যাপী রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপনে ব্রতী হই।

আলোচ্য সংকলনে ব্যবহৃত রচনাগুলির পূর্বাপর পরিচয়-সাধনের জন্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বৈশদ্য-সাধনের জন্য, প্রত্যেকটি রচনার পাদদেশে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্তাকারে 'দ্রষ্টব্য'-সকল সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। এই দ্রষ্টব্যগুলির মাধ্যমে রচনাগুলির প্রকাশকাল, এবং কোন্ পত্রিকায় বা পুস্তকে ওগুলি প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে, প্রভৃতি আনুষঙ্গিক বিষয়ে যথাসম্ভব পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করা হইয়াছে। দ্রষ্টব্যগুলির বক্তব্যের মধ্যে সমসাময়িক কালের বহু প্রখ্যাত সমালোচক ও সাহিত্যসেবীর মতামতও উদ্‌ধৃত হইয়াছে প্রয়োজনসপক্ষে। লোকান্তরিত জ্ঞানী গুণী সমালোচক-জনের উক্তি ও মন্তব্যের সহিত বর্তমান কালের জীবিত ব্যক্তিদের উক্তির সামঞ্জস্য প্রদর্শনই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। এই প্রচেষ্টায় সম্পাদক কি পরিমাণ সার্থক হইয়াছেন তাহার বিচারক বিদগ্ধ পাঠকবর্গ। এতদ্‌ব্যতীত নিরপেক্ষ বিচার ও বৈরাচরণপ্রসূত বিচার যে একই বস্তু নহে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রয়াসেই, নিদর্শন হিসাবে, রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে বিদ্বেষপূর্ণ ও বিরুদ্ধ-ভাবসম্পন্ন রচনা ও টীকা-টিপ্পনীগুলি যে গৃহীত হইয়াছে আশা করি তাহা সকলেই কৌতূহলের সহিত উপলব্ধি করিবেন।

রবীন্দ্রনাথের রচিত গ্রন্থগুলির পরম্পরানুসারে এবং প্রকাশের ক্রমানুসারে আলোচনাগুলিকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে সংকলনের মূল অংশে। পরবর্তী বিভাগ 'পরিশিষ্ট'র প্রথমাংশে (ক) রবীন্দ্র-সাহিত্যের নানা দিক লইয়া বিশিষ্ট ও বিভিন্ন রচনাগুলি, এবং দ্বিতীয়াংশে (খ) বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার উক্তি ও অবশিষ্ট অংশগুলি স্থানগ্রহণ করিয়াছে। অধিকাংশ অধনা-দুষ্প্রাপ্য এই রচনাগুলি ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আরও একাধিক মূল্যবান রচনা প্রাচীন পত্রিকাগুলির মধ্যে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই সংকলনের পরবর্তী সংস্করণে, অবশ্য পরবর্তী সংস্করণের সম্ভাবনা যদি ফলপ্রসূ হয়, উক্ত রচনাগুলি গ্রথিত করিবার অভিলাষ রহিল। তথাপি সংকোচের সহিত ইহা স্বীকার করা চলে যে, এই প্রয়াস বর্তমান কালেও যেইরূপ রবীন্দ্রালোচনার ক্ষেত্রে আলোকপাত করিবে, তদনুরূপ পরবর্তীকালের রবীন্দ্র-গবেষকদিগের নিকট ইহা বহু বিস্মৃত তথ্যের সন্ধান দানেও সক্ষম হইবে।

দীর্ঘ আলোচনা না করিয়া কেবলমাত্র গ্রন্থের পরিচয় সম্পর্কে যাহা কিছু সংক্ষেপে ব্যক্ত করা প্রয়োজন এ ক্ষেত্রে তাহাই ব্যক্ত করিলাম। কাব্য-সাহিত্য ব্যতীত কবিবরের চিত্রাঙ্কন প্রতিভার বিশিষ্ট বিষয় এস্থলে আলোচিত হয় নাই। উহা শিল্পের এমনই একটি বিষয় যে, সে সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এই সংকলন-গ্রন্থে যাঁহাদিগের রচনা সংগৃহীত হইয়াছে, তাঁহাদিগের স্বর্গত আত্মার প্রতি আমি আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। ভারতের এই মহান্ মনীষীর কাব্য-সাহিত্যসৃষ্টির পরিচয়-সাধনের দ্বারা তাঁহারা নিজেদের যেইরূপ মর্যাদা দান করিয়াছেন, সেইরূপ রবীন্দ্রনাথকে কবিগুরুর সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতেও প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। এই রচনাগুলির যাঁহারা স্বত্বাধিকারী তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকজনের সহিত যোগাযোগ রক্ষার অসুবিধার জন্য অনুমতি গ্রহণ সম্ভব হয় নাই, সে জন্য আমি দুঃখিত। আশা করি ঋষি-কবির প্রতি এই শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে, তাঁহারা আমার প্রতিও অনুকম্পা প্রদর্শন করিবেন।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কার্য মন্ত্রণালয়ের বদান্যতার কথা। আংশিকভাবে তাঁহাদিগের অর্থানুকূল্য ব্যতীত এই বিরাট ব্যয়সাপেক্ষ গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে প্রকাশকরণ কখনই সম্ভব হইত না। আর ঘনিষ্ঠভাবে এই কার্যে আমি যাঁহাদিগের সহায়তা লাভ করিয়াছি, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রথমেই বন্ধুবর অবিনাশচন্দ্র ঘোষালের নাম উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য বহুবিধ বিষয়ে আমাকে

সাহায্য ও উৎসাহিত করিয়াছেন—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মনোরঞ্জন বসু, অমিয় কুমার মজুমদার, সুনীল রায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় গজেন্দ্রকুমার মিত্র, কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ। তাঁহাদিগের সহকারিতার কথাও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি। নলিনীকুমার ভদ্র ও সনৎকুমার গুপ্ত 'নির্ঘণ্ট' প্রণয়ন ও প্রুফ্-সংশোধন কার্যে সহায়তা করিয়া আমাকে বিশেষভাবে উপকৃত করিয়াছেন। পরিশেষে এই গ্রন্থের প্রকাশ সম্পর্কে মুদ্রাকর বিজলী ভূষণ ভাদুড়ী ও বিশিষ্ট পুস্তক প্রকাশক মেসার্স এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে সুধীরচন্দ্র সরকার ও সুপ্রিয় সরকারকে তাঁহাদিগের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

কলিকাতা

বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

॥ সূচীপত্র ॥

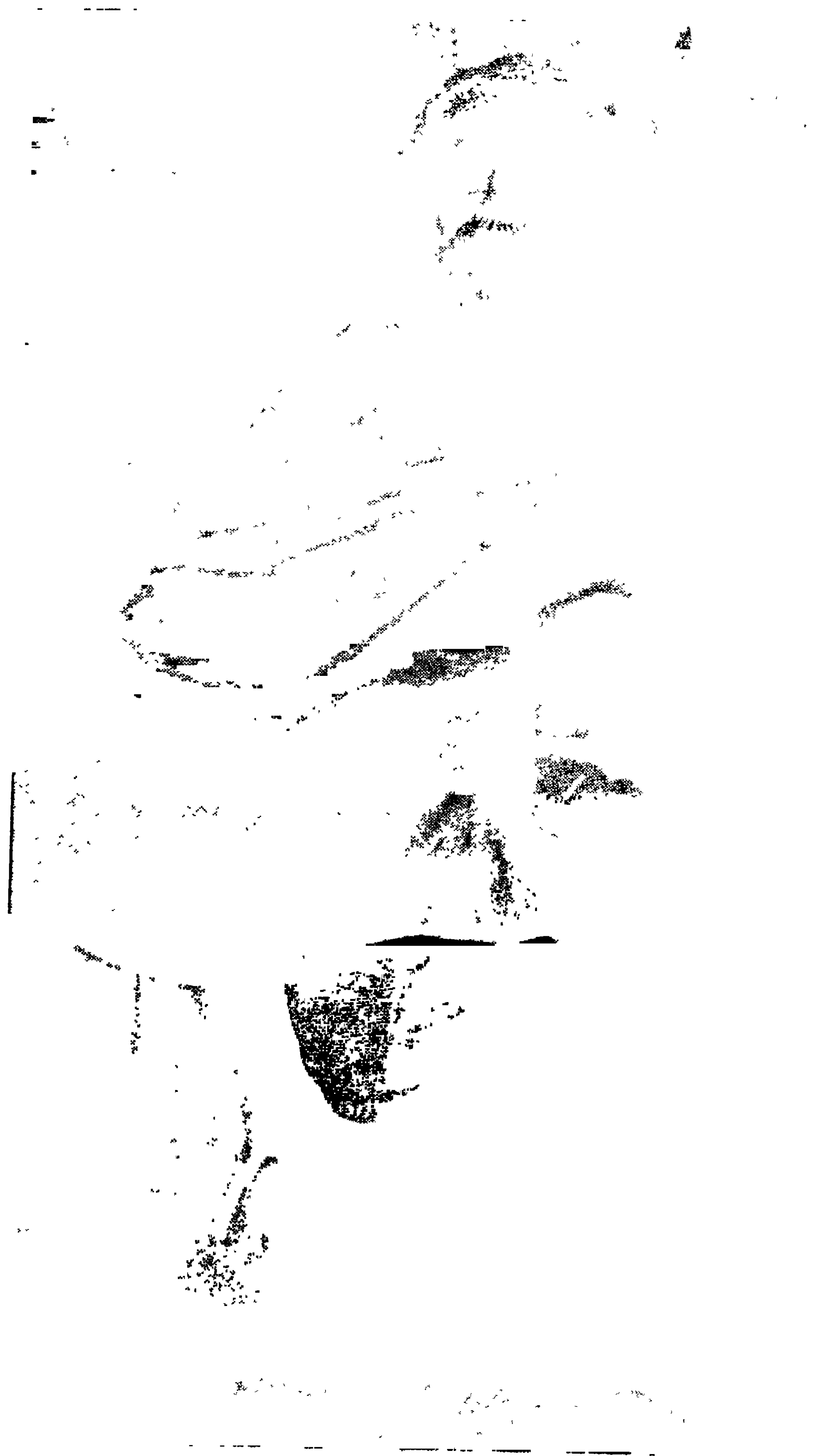
	বিষয় রচনাকার		পৃষ্ঠা
১।	কবি-কাহিনী—কালীপ্রসন্ন ঘোষ	...	১
২।	বাল্মীকি-প্রতিভা—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৭
৩।	রুদ্রচণ্ড—কালীপ্রসন্ন ঘোষ	...	১১
৪।	প্রভাত-সংগীত—ভূদেব মুখোপাধ্যায়	...	১৪
৫।	প্রকৃতির প্রতিশোধ—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৯
৬।	কড়ি ও কোমল—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ	...	২৪
৭।	কড়ি ও কোমল—দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী	...	৪১
৮।	রাজা ও রাণী—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	...	৪৮
৯।	রাজা ও রাণী—নিত্যকৃষ্ণ বসু	...	৫৬
১০।	মন্ত্রি-অভিষেক—ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	...	৫৯
১১।	মানসী—প্রিয়নাথ সেন	...	৭১
১২।	চিত্রাঙ্গদা—প্রমথ চৌধুরী	...	৯১
১৩।	চিত্রাঙ্গদা—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	...	১১৪
১৪।	সোনার তরী—যদুনাথ সরকার	...	১১৮
১৫।	নদী—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	...	১২২
১৬।	চিত্রা—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	...	১২৪
১৭।	চৈতালি—রমণীমোহন ঘোষ	...	১৪০
১৮।	কথা—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়	...	১৫৬
১৯।	ক্ষণিকা—চন্দ্রনাথ বসু	...	১৬৬
২০।	ক্ষণিকা—সতীশচন্দ্র রায়	...	১৬৮
২১।	নৈবেদ্য—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়	...	১৮০
২২।	চোখের বালি—সুখরঞ্জন রায়	...	১৮৪
২৩।	চোখের বালি—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	...	১৯৬
২৪।	নৌকাডুবি—নিশিকান্ত সেন	...	২০০
২৫।	গোরা—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	...	২০৯
২৬।	গীতাঞ্জলি—ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২১৬
২৭।	গীতাঞ্জলি—বিপিনবিহারী গুপ্ত	...	২২৭
২৮।	ডাকঘর—অজিতকুমার চক্রবর্তী	...	২৩৮
২৯।	অচলায়তন—ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২৫২
৩০।	ফাল্গুনী—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...	২৫৮
৩১।	ঘরে-বাইরে—যতীন্দ্রমোহন সিংহ	...	২৬৩

	বিষয় রচনাকার		পৃষ্ঠা
৩২।	বলাকা—সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	...	২৭৬
৩৩।	চতুরঙ্গ—সরসীলাল সরকার	...	৩০১
৩৪।	যোগাযোগ—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৩১৯
৩৫।	শেষের কবিতা—রমাপ্রসাদ চন্দ	...	৩৩৫
৩৬।	শেষের কবিতা—মোহিতলাল মজুমদার	...	৩৪২
৩৭।	চার অধ্যায়—রাজশেখর বসু	...	৩৫২
	পরিশিষ্ট (ক)	...	৩৫৫
১।	আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায় —বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	৩৫৭
২।	"ভাই হাততালি"—অক্ষয়চন্দ্র সরকার	...	৩৬২
৩।	কাব্যে-নীতি—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	...	৩৬৩
৪।	"পসারিণী"—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	...	৩৬৭
৫।	বাঙ্গালা ভাষা—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৩৬৯
৬।	রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা—বিপিনচন্দ্র পাল	...	৩৭০
৭।	রবি-কীর্তি—নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য	...	৩৭২
৮।	"সাহিত্য-ধর্মের সীমানা"-বিচার—দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী		৩৭৫
৯।	সাহিত্যে স্বেচ্ছাচার—গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়	...	৩৮১
১০।	ভেল্কীবাজি—অকিঞ্চন দাস	...	৩৮২
১১।	কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা—মোহিতচন্দ্র সেন	...	৩৮৫
১২।	রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রহস্য—রমাপ্রসাদ চন্দ	...	৩৯৪
১৩।	বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান অবস্থা—শশাঙ্কমোহন সেন	...	৩৯৯
১৪।	কবিবরের শাক্তভাব—বিনয়কুমার সরকার	...	৪০২
১৫।	অচলায়তন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৪০৮
১৬।	কবিতার ছন্দ ও মিল—বিহারীলাল গোস্বামী	...	৪১৩
১৭।	"সাহিত্যের মাত্রা"—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	৪২২
১৮।	সাহিত্যের রীতি ও নীতি—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	৪২৬
১৯।	রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিক প্রবন্ধ : "সদুপায়"—অমরেন্দ্রনাথ রায়		৪২৯
২০।	উর্বশী—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	...	৪৩৮
২১।	"জন্মকথা"—চিত্তরঞ্জন দাশ	...	৪৪৫
২২।	বাঙ্গালা ভাষার মামলা—বিজয়চন্দ্র মজুমদার	...	৪৫০
২৩।	রবীন্দ্রনাথ ও সমালোচনা-সাহিত্য—যতীন্দ্রমোহন বাগচী		৪৫৮
২৪।	রবীন্দ্র-বঙ্কিম বিতর্ক—সরলা দেবী	...	৪৬১
২৫।	বৈষ্ণব সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ—খগেন্দ্রনাথ মিত্র	...	৪৬৪
২৬।	পাঁচ হাজারী ও ছ'হাজারী—গোপালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়		৪৭৬

	বিষয় রচনাকার		পৃষ্ঠা
২৭।	রবীন্দ্রনাথ—দীনেশচন্দ্র সেন	...	৪৭৭
২৮।	রবীন্দ্রনাথ—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	...	৪৮৪
২৯।	সংগীতে রবীন্দ্রনাথ—ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী	...	৪৮৭
৩০।	রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য—অতুলচন্দ্র গুপ্ত	...	৪৯৪
৩১।	নটরাজ—অরসিক রায়	...	৫০১
পরিশিষ্ট (খ)			
১।	সাহিত্য (১—৪০)	...	৫১৩
২।	মানসী (৪১—৪৬)	...	৫৩৪
৩।	মানসী ও মর্মবাণী (৪৭—৫১)	...	৫৩৮
৪।	মালঞ্চ (৫২)	...	৫৪১
৫।	অর্চনা (৫৩—৫৪)	...	৫৪১
৬।	কল্লোল (৫৫—৫৬)	...	৫৪৩
৭।	কালি-কলম (৫৭—৬১)	...	৫৪৪
৮।	শনিবারের চিঠি (৬২—৬৭)	...	৫৪৬
৯।	পত্রিকাগুলির পরিচয়	...	৫৫১
১০।	ব্যক্তিবিশেষের খণ্ড মন্তব্য	...	৫৫২
১১।	লেখক-পরিচিতি	...	৫৫৭
১২।	নির্ঘণ্ট	...	৫৬৯

চিত্রাবলী ক্রমানুসারে—

(১) কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (২) ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নিত্যকৃষ্ণ বসু, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (৩) প্রিয়নাথ সেন, প্রমথ চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, যদুনাথ সরকার (৪) চন্দ্রনাথ বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (৫) ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (৬) সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সতীশচন্দ্র রায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সরসীলাল সরকার (৭) রাজশেখর বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, মোহিতলাল মজুমদার, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (৮) বিপিনচন্দ্র পাল, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ বাগচী, বিহারীলাল গোস্বামী (৯) নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১০) দীনেশচন্দ্র সেন, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, সরলা দেবী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত।



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি-কাহিনী

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

শব্দে কবিতার শরীর গঠন, ছন্দে উহার ভঙ্গি কিংবা গতির ঠাম, কিন্তু ভাবগত রসই উহার প্রাণ। নিম্নলিখিত পদাবলীতে কবিতার শব্দ আছে, ছন্দ আছে, কিন্তু প্রকৃত কবিতা নাই। যথা—

"আয়লো আলি, সবায় মিলি
কুসুম তুলি, মনের সুখে।"

অথবা—

"বকুল বনে, আকুল মনে
দুকুল উড়ায় গোকুল চোরে।
বাজলো বাঁশী, গলায় ফাঁসি,
ঘরে আসি কেমন কোরে॥"

এইরূপ ললিত পদাবলীতে শ্রুতিরঞ্জন হয়, কিন্তু মানবহৃদয়ের অন্তস্তল কখনও স্পৃষ্ট কিংবা আলোড়িত হয় না। বাঙালী, দুর্ভাগ্যবশতঃ তরলমতি বালিকাদিগের মত, এইরূপ পদাবলীরই ভক্ত এবং এই নিমিত্তই এদেশে ঈশ্বর গুপ্ত ও হরিশ [চন্দ্র] মিত্র প্রভৃতি ললিতপদ-ব্যবসায়ীদিগের এত আদর ছিল। আর এক শ্রেণীর পাঠক ললিতপদ অপেক্ষা পদ-বিন্যাসের মুন্সিয়ানা লইয়া ব্যতিব্যস্ত। তাঁহারা "আয়লো আলি কুসুম তুলি" শুনিবার জন্য অধীর হন না, এবং বকুল বনেও দুকুল উড়াইতে ভালবাসেন না। তাঁহাদের রুচি 'নিপট কপট শঠ লম্পট ঝম্পটে।' দাশুরায় তাঁহাদিগের কালিদাস; গোবিন্দ অধিকারী জয়দেব এবং বর্তমানকালের যাত্রাওয়ালাবর্গ তাঁহাদিগের কবি সম্প্রদায়। এই তিন শ্রেণীর পাঠক রবীন্দ্রনাথের কবি-কাহিনীতে অণুমাত্র সুখানুভব করিবেন না।

দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামাঙ্কিত যে গ্রন্থটি পুস্তকাকারে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়, তাহার নাম 'কবি-কাহিনী'। এই রচনা প্রথম বর্ষের "ভারতী" মাসিক পত্রিকায় ১২৮৪ সালের পৌষ হইতে চৈত্র, এই চারটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই সময় কবির বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লেখ করেছেন—

"এই কবি-কাহিনী কাব্যই আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ-আকারে বাহির হয়। আমি যখন মেজদাদার নিকট আমেদাবাদে ছিলাম তখন আমার কোনো উৎসাহী বন্ধু [প্রবোধচন্দ্র ঘোষ] এই বইখানা ছাপাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে বিস্মিত করিয়া দেন।"

কিন্তু যাঁহারা শব্দ ও ছন্দ অপেক্ষা কাব্যগত ভাবেরই সমধিক আদর করেন, তাঁহারা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে বাংলা ভাষার নূতন একখানি আভরণ বলিয়া গ্রহণ করিবেন। ইহাতে যথার্থই কবিতা আছে। যে কবিতা ঘনান্ধ নভো-মণ্ডলে দামিনীর মত রূপের ছটায় নয়নে ধাঁধা দেয়, রবীন্দ্রনাথের লেখায় সে কবিতা দৃষ্ট হইবে না। যে কবিতা প্রগল্‌ভা রসিকার মত আপনার ভারে আপনি ঢুলিয়া পড়ে, ইহাতে তাহার কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হইবে না। কিন্তু যে কবিতা, শিশিরসিক্ত কমল-কলির মত কথা না কহিয়াও মনুষ্যহৃদয়ের সহিত নীরবে কথোপকথন করে,—যে কবিতা ফোটে ফোটে হইয়াও ফোটে না, অথচ অপরিস্ফুট সৌন্দর্যে মনঃপ্রাণ কাড়িয়া লয়, এই কবি-কাহিনীর সর্বত্রেই সেইরূপ প্রীতিময়ী পবিত্র কবিতা সুরুচিসম্পন্ন পাঠকের চিত্তবিনোদন করিবে। এদেশের কত সহস্র কবিই ভালবাসা প্রসঙ্গে কত সহস্র কথা লিখিয়াছেন: কিন্তু কবি-কাহিনীতে অতি অল্প কএকটি পংক্তিতে ভালবাসা কিরূপ বর্ণিত ও সুচারুরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, পাঠক তাহার বিচার করুন।

"একি দেবি কলপনা, এত সুখ প্রণয়ে যে
আগে তাহা জানিতাম না ত!
কি এক অমৃতধারা, ঢেলেছে প্রাণের পরে
হে প্রণয় কহিব কেমনে ?
অন্য এক হৃদয়েরে হৃদয় করা গো দান,
সে কি এক স্বর্গীয় আমোদ।
এক গান গায় যদি, দুইটি হৃদয়ে মিলি
দেখে যদি একই স্বপন,
এক চিন্তা এক আশা, এক ইচ্ছা দুজনার
একভাবে দুজনে পাগল,

বেঙ্গল লাইব্রেরী-সংকলিত মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা মতে ইহার প্রকাশকাল ৫ই নভেম্বর, ১৮৭৮ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৩, আকার ডিমাই। এই পুস্তকটি ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত 'বান্ধব' পত্রিকায় (১২৮৫, মাঘ, পৃঃ ৪৬৪-৭) সমালোচিত হয়। কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ই এই প্রবন্ধটির রচয়িতা এইরূপ অনুমান বোধকরি অসংগত নয়। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিরূপ মতামত এদেশে গড়িয়া উঠিতেছিল, এই নিবন্ধটির মাধ্যমে পাঠক তারই নিদর্শন পাবেন। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র অচলিত সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে 'কবি-কাহিনী' মুদ্রিত হয়েছে।

হৃদয়ে হৃদয়ে হয়, সে কি গো সুখের মিল,
এ জনমে ভাঙ্গিবে না তাহা।
আমাদের দুজনের হৃদয়ে হৃদয়ে দেবি,
তেমনি মিশিয়া যায় যদি—
এক সাথে এক স্বপ্ন দেখি যদি দুই জনে
তা হইলে কি হয় সুন্দর!
নরকে বা স্বর্গে থাকি, অরণ্যে বা কারাগারে
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধা হোয়ে—
কিছু ভয় করিনাকো—বিহ্বল প্রণয় ঘোরে
থাকি সদা মরমে মজিয়া!
তাই হোক্—হোক্ দেবি আমাদের দুই জনে
সেই প্রেম এক কোরে দিক্।
মজি স্বপনের ঘোরে, হৃদয়ের খেলা খেলি
যেন যায় জীবন কাটিয়া।"

পুনশ্চ,

"নিশীথে একেলা হোলে, এইরূপ কত গান
বিরলে গাইত কবি বসিয়া বসিয়া।
সুখ বা দুখের কথা, বুকের ভিতরে যাহা
দিন রাত্রি করিতেছে আলোড়িত প্রায়,
প্রকাশ না হোলে তাহা, মরমের গুরুভারে,
জীবন হইয়া পড়ে দারুণ ব্যথিত।
কবি তার মরমের প্রণয় উচ্ছ্বাস কথা
কি করি যে প্রকাশিবে পেত না ভাবিয়া
পৃথিবীতে যেন ভাষা নাইক, মনের কথা।
পারে যাহা পূর্ণভাবে করিতে প্রকাশ।
ভাব যত গাঢ় হয়, প্রকাশ করিতে গিয়া,
কথা তত নাহি পায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া,
বিষাদ যতই হয়, দারুণ অন্তরভেদী
অশ্রুজল তত যায় শুকায়ে যেমন!"

বাবু রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির শোভা বর্ণনেও প্রশংসনীয়। গ্রন্থারম্ভে মহা প্রকৃতির যে একটি স্তোত্র রহিয়াছে, তাহা উচ্চ শ্রেণীর কবিযোগ্য না হইলেও মনোহর; কিন্তু আমরা সেটি উদ্ধৃত না করিয়া, হিমাচল বর্ণনার আরম্ভ ভাগ নিম্নে তুলিয়া দিলাম। যাহাদিগের হৃদয় আছে, এবং হৃদয়ে প্রকৃতির প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতি আছে, তাঁহারা এই বর্ণনা পাঠ করিয়া মোহিত হইবেন।

"কি সুন্দর সাজিয়াছে ওগো হিমালয়,
তোমার বিশালতম শিখরের শিরে
একটি সন্ধ্যার তারা! সুনীল গগন
ভেদিয়া, তুষারশুভ্র মস্তক তোমার!
সরল পাদপরাজি আঁধার করিয়া
উঠেছে তাহার পরে; সে ঘোর অরণ্য
ঘেরিয়া হুহুহু করি তীব্র শীতবায়ু
দিবানিশি ফেলিতেছে বিষণ্ন নিশ্বাস!
শিখরে শিখরে ক্রমে নিভিয়া আসিল
অস্তমান তপনের আরক্ত কিরণে
প্রদীপ্ত জলদ-চূর্ণ। শিখরে শিখরে
মলিন হইয়া এল উজ্জ্বল তুষার,
শিখরে শিখরে ক্রমে নামিয়া আসিল
আঁধারের যবনিকা ধীরে ধীরে ধীরে!
পর্বতের বনে বনে গাঢ়তর হোলো
ঘুমময় অন্ধকার। গভীর নীরব!
সাড়াশব্দ নাই মুখে অতি ধীরে ধীরে
অতি ভয়ে ভয়ে যেন চলেছে তটিনী
সুগম্ভীর পর্বতের পদতল দিয়া!
কি মহান্! কি প্রশান্ত! কী গম্ভীর ভাব!
ধরার সকল হোতে উপরে উঠিয়া
স্বর্গের সীমায় রাখি ধবল জটায়
জড়িত মস্তক তব, ওগো হিমালয়,
নীরব ভাষায় তুমি কি যেন একটি

গম্ভীর আদেশ ধীরে করিছ প্রচার !
সমস্ত পৃথিবী তাই নীরব হইয়া
শুনিছে অনন্ত মনে সভয়ে বিস্ময়ে।
আমিও একাকী হেথা রয়েছি পড়িয়া,
আঁধার মহা-সমুদ্রে গিয়াছি মিশায়ে,
ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র নর আমি, শৈলরাজ !
অকূল সমুদ্রে ক্ষুদ্র তৃণটির মত
হারাইয়া দিগ্বিদিক, হারাইয়া পথ,
সভয়ে বিস্ময়ে হোয়ে হতজ্ঞান প্রায়
তোমার চরণ তলে রয়েছি পড়িয়া।
উর্দ্ধমুখে চেয়ে দেখি ভেদিয়া আঁধার
শূন্যে শূন্যে শত শত উজ্জ্বল তারকা,
অনিমিষ নেত্রগুলি মেলিয়া যেন রে
আমারি মুখের পানে রয়েছে চাহিয়া।
ওগো হিমালয়, তুমি কি গম্ভীর ভাবে
দাঁড়ায়ে রয়েছ হেথা অচল অটল,
দেখিছ কালের লীলা, করিছ গণনা,
কালচক্র কতবার আইল ফিরিয়া !
সিন্ধুর বেলার বক্ষে গড়ায় যেমন
অযুত তরঙ্গ, কিছু লক্ষ্য না করিয়া,
কত কাল আইল রে, গেল কতকাল
হিমাদ্রি, তোমার ওই চক্ষের উপরি।
মাথার উপর দিয়া কত দিবাকর
উলটি কালের পৃষ্ঠা গিয়াছে চলিয়া।
গম্ভীর আঁধারে ঢাকি তোমার ও দেহ
কত রাত্রি আসিয়াছে গিয়াছে পোহায়ে।
কিন্তু বল দেখি ওগো হিমালয় গিরি,
মানুষ-সৃষ্টির অতি আরম্ভ হইতে
কি দেখিছ এইখানে দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে ?

যা' দেখিছ যা' দেখেছ, তাতে কি এখনো
সর্বাঙ্গ তোমার গিরি, উঠে নি শিহরি ?"

বাংলা কবিতার পঙ্কিল জলে এইরূপ নির্মল পুষ্প কি প্রীতিপ্রদ ! ইহাতে সৌন্দর্য আছে, অথচ সে সৌন্দর্যে কোন অংশেও রুচির বিকার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে সৌরভ আছে, অথচ সে সৌরভে কোন অংশেও মানসিক স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কা নাই। ভাষা ইহার কোথাও শোভাবর্ধনের জন্য কৃত্রিম কারুকার্যে বিভূষিতা হয় নাই। এবং ভাব-লহরী ক্ষীণসলিলা পয়স্বিনীর ক্ষীণ-লহরীর মত, যারপরনাই মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইলেও, কোন স্থানে প্রাণ-শূন্য হইয়া পড়ে নাই। এইরূপ নির্মল কবিতায় অনুরাগ জন্মিলে বঙ্গীয় কাব্যশাস্ত্রের অধোগতি না হইয়া উপকার হইবে, এবং যাঁহারা কবিতায় ইদানীং বীতস্পৃহ, তাঁহাদিগের শুষ্ক মনেও কাব্যে পুনরায় প্রীতির সঞ্চার হইতে থাকিবে।

কবি-কাহিনী রচয়িতা অমিত্রাক্ষর পদ্য রচনায় মাইকেলের ন্যায় সর্বত্র মিলটনের অনুসরণ এবং হেমবাবুর ন্যায় সংস্কৃত কবিদিগের ছন্দানুবর্তন না রিয়া, কোন কোন স্থানে কিয়ৎপরিমাণে এক নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছেন। যদি তাঁহার কবিতা সুন্দর না হইত, তাহা হইলে এইরূপ পদ্য কাহারও নিকট ভাল লাগিত না। কিন্তু তাঁহার পদ্য যেমনই কেন না হউক উহা কবিতার গুণে উদ্ধার পাইয়া গিয়াছে।

বাল্মীকি-প্রতিভা

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুখই স্বর্গ, আর যেখানে সুখ, সেই স্বর্গ। যেখানে বিদ্বৎমণ্ডলী, যেখানে একপ্রাণ বহুজনের সমাগম' [বিদ্বজ্জনসমাগম],১ সেখানে যাহার সুখ না হয়, সে পামর, সে হতভাগ্য,—তাহার অদৃষ্টে কুত্রাপি সুখ নাই, তাহার স্বর্গলাভ কখনই ঘটিবে না, তা বাঁচিয়া থাকিতেই কি, আর মরিয়া গেলেই কি?

যিনি কমলার কৃপাসত্ত্বেও ভারতীর২ চিহ্নিত সেবক, যিনি দুর্লভ মানব জন্মে দ্বিজেন্দ্র বলিয়া বরেণ্য তাঁহার আতিথ্যে স্বর্গসুখ লাভ করা যায়। ইহা বিচিত্র নহে। তাহার উপর, যেখানে বাল্মীকির কাব্য প্রভা,৩ যেখানে মূর্তিমতী প্রতিভা,৪ যেখানে সঙ্গীতের নিসর্গ-শোভা—, সে যদি স্বর্গ না হয়, তবে স্বর্গের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ করিতে হয়।

পঞ্চানন্দ স্বর্গবাসী হইলেও এখন নরলোকে বিরাজ করিতেছেন, সুতরাং মানব-স্বর্গেও তিনি ইন্দ্রত্ব করিতে গিয়াছিলেন। বিদ্বজ্জনসমাগমে তিনি মর্ত্যের পরম সুখ লাভ করিয়াছেন। ধরাধামে কি কি উপাদানে স্বর্গ সংগঠিত হয়, তাহার পরিচয় পঞ্চানন্দ পাইয়াছেন; অজ্ঞান-তিমিরান্ধের জ্ঞানাঞ্জন শলাকা স্বরূপ এই লৌহ লেখনী দ্বারা তদ্‌বৃত্তান্ত বিচরিত হওয়া আবশ্যক।

দ্রষ্টব্য: প্রথম দিকে বিহারীলাল চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ প্রেরণালাভ করেন বিহারীলালের নিকট হইতে এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুরসংযোজনা করে উক্ত নাটিকার রূপদানে তাঁকে সাহায্য করেন। এই গীতি-নাট্যে কাহিনীর চেয়ে সংগীতাংশই অধিক।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পরও তাঁহার গৃহে হিন্দু আচার অনুযায়ী গৃহদেবতার দৈনন্দিন পূজার্চনা ও সেবা কিছুদিন অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার গৃহে বৎসরের মধ্যে নানা পূজা-পার্বণে উৎসবাদিও হইত। পরে মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী গৃহদেবতা এবং নিজ পুত্র ও কন্যাগণকে লইয়া পৃথগন্ন হইলে মহর্ষি-ভবনে হিন্দু আচার অনুযায়ী প্রচলিত পূজা-পার্বণ ও উৎসব বন্ধ হইয়া যায়। তৎপরিবর্তে ১১ই মাঘে প্রতি বৎসর ব্রাহ্মোৎসব উপলক্ষে বিপুল জনসমাগম ও প্রীতি সম্মেলন, আরম্ভ হয়। কিন্তু এরূপ উৎসব মহর্ষি ভবনে অধিককাল সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয় নাই। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আদি ব্রাহ্ম সমাজ

যেখানে সমাগম, সেইখানে সভা ; যেখানে সভা সেইখানে সভাপতি। কালের জ্যেষ্ঠ পুত্র[৫] বঙ্গের গণপতি এই জনসমাজে সমাগত হইয়াছিলেন। ইহা বলাই বাহুল্য ! মণিমুক্তা বিভূষণে স্বয়ং সঙ্গীত স্বীয় রাজ্যশ্রী[৬] প্রদর্শনে, সমাগত বিদ্বজ্জনের মনোমোহন করিয়াছিলেন, ইহাও বলা নিষ্প্রয়োজন। বিধানের বল বিজ্ঞান; সুতরাং রসায়ন[৭] রূপ ধারণ করিয়া বিজ্ঞানের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। দেবভাষা, নাগর বেশে আশু উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া লম্ব-শাটপটাবরণে সভায় শোভা বর্ধন করিয়াছিলেন। শীতল[৮] ভাবে মেধা স্বীয় পুরুষকার দেখাইতেছিলেন। পাছে এত শোভা সমষ্টি সন্দর্শন করিয়া মানব নয়ন ঝলসিয়া যায়, সেইজন্য নেত্ররোগ ধন্বন্তরিও[৯] নিজ বিপুল কলেবর সঞ্চালনে ত্রুটি করেন নাই।

এতদ্ভিন্ন বিভাকরাদি[১০] নানা গ্রহ, জাতীয়ত্ব প্রভৃতি বিবিধ উপগ্রহ, কুলাচার্য ডার্বিনের পরমপূজ্য স্বকৃত ভঙ্গ কুলতিলক সম্প্রদায় তথায় উপদ্রব করিতে উপেক্ষা করেন। আর যেখানে এত উপসর্গ, সেখানে সাধারণীয় অক্ষয়চ্ছায়া[১১] মূল স্বর্গের অপ্সরা স্থানীয় হইয়া সকলকে বিমুগ্ধ করিতেছিলেন, ইহাতে কাহার না আনন্দ হইবার কথা ? এমত অবস্থায় সুকণ্ঠ সঙ্গীত

ত্যাগ ও পরে তাঁহার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ হইতে পৃথক হইয়া নববিধান সমাজ প্রবর্তনের ফলে, মহর্ষি ভবনের মাঘোৎসব তেমন জমিয়া উঠে নাই। এই সময়ে দেশের বিদ্বৎমণ্ডলীকে লইয়া মহর্ষির পুত্র ও আত্মীয়গণ 'বিদ্বজ্জনসমাগম'-এর প্রবর্তনা করেন।

> "উদ্দেশ্য—সাহিত্য সেবীদের মধ্যে যাহাতে পরস্পর আলাপ পরিচয় ও তাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব বর্ধিত হয়।···লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণকে নিমন্ত্রণ করা হইত।···গীতবাদ্যের আয়োজন থাকিত, নাট্যাভিনয় প্রদর্শিত হইত এবং সর্বশেষে সকলের একত্র প্রীতি-ভোজনে এই সাহিত্য-মহোৎসবের পরিসমাপ্তি হইত।"—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি।

এ সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

> "এই সম্মিলনী উপলক্ষ্যেই বাল্মীকি-প্রতিভা রচিত হয়। আমি বাল্মীকি সাজিয়াছিলাম এবং আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা সরস্বতী সাজিয়াছিল।"—জীবনস্মৃতি

১৬ই ফাল্গুন ১২৮৭ শনিবার সন্ধ্যায় মহর্ষি-ভবনে বিদ্বজ্জনসমাগম উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ রচিত 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রথম অভিনয় হয়। বিশ্বভারতী প্রকাশিত তথ্যপঞ্জী সংবলিত রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র ১৩৬০ জ্যৈষ্ঠ সংস্করণে এ সম্বন্ধে বহু সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে 'বিদ্বজ্জনসমাগমে'এর—বিশেষভাবে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অভিনয়ের একটি কৌতূহল-জনক বিবরণ মুদ্রিত হইল। স্বনামখ্যাত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত

এবং আকণ্ঠ সন্দেশে পঞ্চানন্দ যে নিরানন্দের বিনাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আইস ভাই, প্রবন্ধ শেষে জয়ধ্বনি করিয়া ছাপাখানায় কপি পাঠাইয়া দেওয়া যাউক।

এই পাদটীকাগুলি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত

১। বিদ্বজ্জন-সমাগম—এই নামে কলিকাতা জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারে একটি সাহিত্যিক সম্মিলন খুব সমারোহের সহিত হইয়াছিল।

২। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩। ঐ দিন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনীত হইয়াছিল। অভিনেতা ও অভিনেত্রী সকলেই ঠাকুর পরিবারের লোক।

৪। প্রতিভাসুন্দরী দেবী।

৫। তাৎকালিক খুব বৃদ্ধ Reverend K. M, Banerjee.

৬। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

৭। তাৎকালিক রসায়নাচার্য কানাইলাল দে বাহাদুর।

৮। লাহোরের 'Tribune' পত্রের শীতলবাবু।

৯। সেকালের সুপ্রসিদ্ধ চক্ষু চিকিৎসক লালমাধব মুখোপাধ্যায়। ইনি বিপুল-কলেবরই ছিলেন।

ছিলেন। তিনি তাঁহার নিজস্ব রচনাভঙ্গী অনুযায়ী বিদ্বজ্জনসমাগম তথা 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অভিনয়ের সমালোচনা করেন। এই রচনাটি 'বঙ্গবাসী'-প্রকাশিত ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী হইতে গৃহীত হইয়াছে।

এই অনুষ্ঠানে আরও যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম উল্লেখযোগ্য। গুরুদাসবাবু এই অভিনয়-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া একটি সংগীত রচনা করেন। পাঠকদিগের অবগতির জন্য এস্থলে উক্ত সংগীতের দুইটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা হইল —

"উঠেছে নবীন রবি নব জগতের ছবি
নব 'বাল্মীকি-প্রতিভা' দেখাইতে পুনর্বার।"...

বঙ্কিমচন্দ্রও এই নাটিকা সম্বন্ধে 'বঙ্গদর্শন'-এ লিখিয়াছিলেন, "যাঁহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বাল্মীকি-প্রতিভা" পড়িয়াছেন বা তাঁহার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা কবিতার জন্ম-বৃত্তান্ত কখনও ভুলিতে পারিবেন না।"

১০। 'নববিভাকর' পত্রের সম্পাদক প্রভৃতি।

১১। 'সাধারণী'র অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

এই নাটিকাটি সম্বন্ধে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনকথা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "বাল্মীকি-প্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নয়; সংগীতের একটা নূতন পরীক্ষা—অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনলে এর কোন স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর নয়। আসলে এটি সুরে তালে বাঁধা নাটিকা; স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য এর অতি অল্পস্থলেই আছে। কয়েকটি গান বিলাতী সুরে ঢালা; এও একটা বড় রকমের পরীক্ষা।"

'বাল্মীকি প্রতিভা' প্রথম প্রকাশিত হয় বিদ্বজ্জনসমাগম উপলক্ষে অভিনীত গীতি-নাট্যের প্রোগ্রাম হিসাবে। 'ভারতী' পত্রিকার সেকালের প্রচ্ছদপটটি এই পুস্তকের মলাট হইয়াছিল। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৩। পরবর্তী ১২৯২ সালের ফাল্গুন মাসে পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত হইয়া 'বাল্মীকি-প্রতিভার' ২য় সংস্করণ বাহির হয় এবং 'কাল-মৃগয়া'র কিয়দংশ ইহার সহিত যুক্ত হয়। কলিকাতা ৫৫ চিৎপুর রোড হইতে আদি ব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্রে কালিদাস চক্রবর্তীর দ্বারা ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। মূল্য ছিল চারি আনা। এই নাটিকার পরবর্তী সংস্করণ মূল 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

রুদ্রচণ্ড

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

বাবু রবীন্দ্রনাথ এদেশের একজন উদীয়মান কবি। বোধ হয় তাঁহার জ্যোতির নূতন আভা অচিরেই সমস্ত বঙ্গে ছড়াইয়া পড়িবে। তাঁহার সমগ্র কবিতাতেই একটুকু অপূর্ব ও অনন্যসাধারণ নূতনত্ব আছে। রুদ্রচণ্ডের রচনাতেও সেই নূতনত্ব স্পষ্টতঃ পরিলক্ষিত হইতেছে। কবিতাগুলি যেন আধ আধ ভাঙ্গা গলায় নিরবচ্ছিন্ন মধু ঢালিতেছে। কিন্তু নাটকাংশে ইহা অসম্পূর্ণ। আমরা নিম্নে এই কাব্যের কতিপয় পংক্তি তুলিয়া দিলাম। আমাদিগের বোধ হয় বাংলায় কেহই এমন জ্যোৎস্নাশীল, সরস, কোমল ও মধুর কবিতা রচনা করিতে পারে না।

অমিয়া।— তাই যদি হ'ত পিতা, বড় ভাল হ'ত !
কে জানে মনের মধ্যে কি হয়েছে মোর,
বরষার মেঘ যদি হইতাম আমি
বর্ষিয়া সহস্রধারে অশ্রুজল রাশি,
বজ্রনাদে করিতাম আকুল বিলাপ !
আগে ত লাগিত ভাল জ্যোছনার আলো,
ফুটন্ত ফলের গুচ্ছ বকুল তলাটি
ভ্রূকুটির ভয়ে তব ডরিয়া ডরিয়া
তাহাদেরো পরে মোর জন্মেছে বিরাগ ;

দ্রষ্টব্য * 'রুদ্রচণ্ড' নাটিকা, প্রকাশকাল ইংরেজী ১৮০৩ শক, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৫৩। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে ইহা রবীন্দ্রনাথের পঞ্চম পুস্তক। এই নাটিকাটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। পৃথীরাজের পরাজয়ের কাহিনী এই নাটিকার বিষয়বস্তু। কবি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্দেশে এই নাটিকাটি উৎসর্গ করেন। এই সময়েই 'ভগ্নহৃদয়' নামক আর একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থও সর্বত্র সমাদর লাভ করে। ত্রিপুরার তৎকালীন মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর কবিকে অভিনন্দন প্রেরণ করেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক (গীতি-নাট্য নহে) 'রুদ্রচণ্ড'। ইহা ১৮০৩ সালে (২৫ জুন, ১৮৮১) প্রকাশিত হয়। ইহা বর্তমানে 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র অচলিত প্রথম খণ্ডে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে।

শুধু একজন আছে যার মুখ চেয়ে
বড়ই হরষে পিতা সব যাই ভুলে,
দূর হ'তে দেখি তারে আকুল হৃদয়
দেহ ছাড়ি তাড়াতাড়ি বাহিরিতে চায়!
সে আইলে তার কাছে যেতে দি'ও মোরে!
সে যে পিতা অমিয়ার আপনার ভাই!

রুদ্রচণ্ড।— বটে বটে, সে তোমার আপনার ভাই!
শত তীক্ষ্ণ বজ্র তার পড়ুক মস্তকে
চিরজীবী হউক্ সে অগ্নি-কুণ্ড মাঝে!
মুখ ঢাকিস্ নে তুই, শোন তোরে বলি,
পুনরায় যদি তোর আপনার ভাই—
চাঁদ কবি এ কাননে করে পদার্পণ
এই যে ছুরিকা আছে কলঙ্ক ইহার
তাহার উত্তপ্ত রক্ত করিব ক্ষালন!

অমিয়া।— ও কথা বোল' না পিতা—

রুদ্রচণ্ড।— চুপ্ শোন্ বলি;
জীবন্তে ছুরিকা দিয়া বিঁধিয়া বিঁধিয়া
শত খণ্ড করি তার ফেলিব শরীর,
পাণ্ডুবর্ণ আঁখি-মুদা ছিন্ন মুণ্ড তার
ওই বৃক্ষ শাখা পরে দিব টাঙ্গাইয়া;
ভিজিবে বর্ষার জলে পুড়িবে তপনে
যত দিনে বাহিরিয়া না পড়ে কঙ্কাল!
শুনিয়া কাঁপিতেছিস্, দেখিবি যখন
মস্তকের কেশ তোর উঠিবে শিহরি!
আপনার ভাই তোর! কে সে চাঁদ কবি!

সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যগ্রন্থাবলী'র কৈশোরক অংশে রুদ্রচণ্ডের দুইটি গীত স্থান পাইয়াছিল। 'বান্ধব' সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁহার পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের এই নাটকটির সমালোচনা করেন। 'বান্ধব' পত্রিকার আষাঢ় ১২৮৮ সালের তৃতীয় সংখ্যায় এই সমালোচনাটি মুদ্রিত হয়।

হতভাগ্য পৃথ্বীরাজ, তারি সভাসদ !
সে পৃথ্বীরাজের হীন জীবন মরণ
এই ছুরিকার পরে রয়েছে ঝুলান' ।···

অমিয়া ।— বড় সাধ যায় এই নক্ষত্র মালিনী
স্তব্ধ যামিনীর সাথে মিশে যাই যদি !
মৃদুল সমীর এই, চাঁদের জ্যোছনা,
নিশার ঘুমন্ত শান্তি, এর সাথে যদি
অমিয়ার এ জীবন যায় মিলাইয়া !
আঁধার ভ্রূকুটিময় এই এ কানন,
সঙ্কীর্ণ-হৃদয় অতি ক্ষুদ্র এ কুটীর ।···

প্রভাত-সংগীত

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রবাবু যে একজন প্রকৃত আর্য কবি তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। 'আর্য-কবি' বলিলাম এইজন্য যে, তাঁহার হৃদয় প্রকৃতি-শোভার প্রতি অবিকল সেই ভাব ধারণ করে, যাহা প্রাচীন আর্য কবিদিগেরই করিত। আর্যকবির ভাব—'আমি প্রকৃতির'। ইউরোপীয় কবির ভাব, আজিকালি যদিও একটু পরিবর্তিত হইতেছে কিন্তু আদৌ 'প্রকৃতি আমার'। আর্য এবং ইউরোপীয় কবির এই মৌলিক প্রভেদের একটি সুন্দর প্রমাণ এই পুস্তক হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফরাসী কবি ভিক্টর হিউগো হইতে রবীন্দ্রবাবুর অনুবাদিত 'কবি' শীর্ষক কবিতাটি পাঠ করিয়া দেখ।

কবি

ওই যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া,
কভু বা অবাক কভু ভকতি বিহ্বল হিয়া,
নিজের প্রাণের মাঝে
একটি যে বীণা বাজে,
যে বীণা শুনিতেছেন হৃদয় মাঝারে গিয়া
বনে যতগুলি ফুল আলো করি ছিল শাখা,
কারো কচি তনুখানি নীল বসনেতে ঢাকা
কারো বা সোনার মুখ
কেহ রাঙ্গা টুক্ টুক্,
কারো বা শতেক রঙ যেন ময়ূরের পাখা,
কবিরে আসিতে দেখি হরষেতে হেলি দুলি

দ্রষ্টব্য: প্রভাত সংগীত-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১২৯০ সালে। সমালোচিত হয় 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ'তে ২ আষাঢ়, ১২৯০ সালে। তখন ইহার সম্পাদক ছিলেন মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ইহা স্বতন্ত্র পুস্তকরূপে বহুবার প্রচারিত হইলেও বর্তমানে মাত্র 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডে স্থান পাইয়াছে। এই পুস্তকের 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' কবিতাটি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচনা। রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে স্থানপ্রাপ্ত 'প্রভাত-সংগীত' গ্রন্থটি অবশ্য সংশোধিত আকারে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে।

হাব ভাব করে কত রূপসী সে মেয়েগুলি,
বলাবলি করে, আর ফিরিয়া ফিরিয়া চায়
প্রণয়ী মোদের ওই দেখলো চলিয়া যায়।
সে অরণ্যে বনস্পতি মহান্ বিশাল কায়া,
হেথায় জাগিছে আলো, হোথায় ঘুমায় ছায়া
কোথাও বা বৃদ্ধ বট
মাথায় নিবিড় জট ;
ত্রিবলী অঙ্কিত দেহ প্রকাণ্ড তমাল শাল ;
কোথা বা ঋষির মত
অশথের গাছ যত
দাঁড়ায়ে রয়েছে মৌন ছড়ায়ে আঁধার ডাল।
মহর্ষি গুরুরে হেরে অমনি ভকতি ভরে
সসম্ভ্রমে শিষ্যগণ যেমন প্রণাম করে,
তেমনি কবিরে দেখি গাছেরা দাঁড়াল নুয়ে,
লতা শ্মশ্রুময় মাথা ঝুলিয়া পড়িল ভুঁয়ে
একদৃষ্টে চেয়ে দেখি প্রশান্ত সে মুখচ্ছবি,
চুপিচুপি কহে তারা "ওই সেই ! ওই কবি ?"

অতএব ইউরোপীয় কবি বলিলেন যে, 'কবি' ফুল বধূর বল্লভ, বনস্পতিদিগের গুরু, কিন্তু আমাদের কবি কি বলেন ?—

"ওই দেখ ফুটে ওঠে ফুল !
আমি কে গো জননি গো,আমারে হেরিয়া কেন
এরা এত হাসিয়া আকুল !
ছোট ছোট ফুলগুলি ওদের হেরিয়ে হাসি
প্রাণমন পুরিল উল্লাসে !
প্রভাতের শিশুগুলি কেমনে চিনিল মোরে ?
মোরে কেন এত ভালবাসে ?
মরি মরি কচি হাসি স্নেহের বাছনি তোরা
মোরে যদি এত লাগে ভাল,

প্রতিদিন ভোর হলে আসিব তোদের কাছে,
না ফুটিতে প্রভাতের আলো !
বায়ুভরে ঢলি ঢলি করিবি রে গলাগলি,
হেরিব তোদের হাসিমুখ,
তোদের শোনাব গান, তোদের দেখাব প্রাণ
উদ্ঘাটিয়া পরাণের সুখ !”

আমাদের কবি ফুলকুমারীর হাসি দেখিলেন, প্রেম বুঝিলেন, অমনি আত্মসমর্পণ করিলেন !

আর্য কবিতে এবং ইউরোপীয় কবিতে এই যে মৌলিক প্রভেদ, তাহা অনেক স্থলে আরও এক প্রকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। আর্য কবি যেমন জগতের একটি রমনীয় বস্তু দেখেন, অমনি তাঁহার মন সমুদায় জগৎ শোভার প্রতি প্রধাবিত হয় এবং তাহাতে বিলীন হইয়া যায়। ইউরোপীয় কবিদিগের প্রায়ই এ ভাব হয় না। তাঁহারা আপনাদের 'অহং' বিন্দুকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রীভূত দেখিতে পারেন এবং ইহাতে যাহা কিছু রমণীয় তাহা সেই কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করেন। রবীন্দ্রবাবু ভিক্টর হিউগো হইতে অনুবাদ করিলেন—

“রজনী দেখিনু অতি পবিত্র বিমল,
ও মুখ দেখিনু অতি সুন্দর উজ্জ্বল,
সোনার তারকাদের ডেকে ধীরে ধীরে,
কহিনু 'সমস্ত স্বর্গ ঢাল এর শিরে।'
বলিনু আঁখিরে তব 'ওগো আঁখি-তারা,
ঢাল গো আমার 'পরে প্রণয়ের ধারা।”

রবীন্দ্রবাবু নিজে লিখিলেন—

“আমার নাহি সুখ দুখ পরের পানে চাই,
যাহার পানে চেয়ে দেখি তাহাই হয়ে যাই।”

আর লিখিলেন—

“সবার সাথে আছি আমি আমার সাথে নাই,
জগত স্রোতে দিবানিশি ভাসিয়া চলে যাই।”

ইউরোপীয় এবং আর্যে এই মজ্জাগত, এই অস্থিগত প্রভেদ। ইউরোপীয় নাহংকে অহং করিতে চায়; আর্য, অহংকে নাহং মনে করেন। একজনের

ধর্ম আত্মসাৎ করা, অপরের ধর্ম আত্মবিসর্জন করা। ফলে, দুই এক। কারণ এক হওয়া দুয়েরই উদ্দেশ্য। কিন্তু পথ পরস্পর বিপরীত। পথের মধ্যে দুয়ের সাক্ষাৎকার হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই—যদিও কোথাও হইতেছে দেখা যায়, তবে দুয়ের একজন অবশ্যই পথ ভুলিয়াছে বলিতে হইবে। অনেক নব্য-বাংলা কবিদিগের ন্যায় রবীন্দ্রবাবু তাঁহার প্রকৃত পথ ভুলেন নাই।

রবীন্দ্রবাবুর কবিতাগুলির সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু স্থানাভাববশতঃ পারিলাম না। তবে একথাটি বলিব যে, 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী'র ভাবটি প্রধানতম আর্য কবির ভাব নহে। রবীন্দ্রবাবু যে বলিয়াছেন—

অবোধ ওরে, কেন মিছে করিস আমি আমি।
উজানে যেতে কেন চাবি সাগর-পথ-গামী।

ইহাই প্রকৃত আর্য কবির ভাব।

আর একটি কথা বলিব—কিন্তু একথাটি কিছু ভয়ে ভয়ে বলিব। রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—

সৃজনের আরম্ভসময়ে
আছিল অনাদি অন্ধকার,
সৃজনের ধ্বংস-যুগান্তরে
রহিল অসীম হুতাশন।
অনন্ত আকাশ-গ্রাসী অনল সমুদ্রমাঝে
মহাদেব মুদি ত্রিনয়ান
করিতে লাগিলা মহাধ্যান।

আমরা বলি শাস্ত্র এবং যুক্তি উভয়ের মতে—

সৃজনের আরম্ভসময়ে
আছিল অসীম অন্ধকার,
সৃজনের ধ্বংসী কালানল
পুনরায় গিলিলা আপনা।
অনন্ত অনলগ্রাসী
আঁধার সমুদ্র মাঝে
মহাদেব মুদিয়া নয়ন
করিতে লাগিলা মহাধ্যান।

জাগতিক সুতরাং অতি জাগতিক যাবতীয় কার্যেরই পথ বৃত্তাকার, অতএব যাহার অন্ধকারেই আরম্ভ, অন্ধকারেই তাহার শেষ। বহ্নির 'তাপরশ্মি'-গুলি তাহার 'আলোকরশ্মি' হইতে পৃথক্‌ভূত এবং অধিকতর বলীয়ান্। সুতরাং যখন 'সর্বং জুহোমি বসুধাদি শিবাবসানাং' তখন 'আলোকরশ্মি'গুলিকেও অতিপ্রকট 'তাপরশ্মি'তে হোম করিয়া ফেলিব। আরও একটি কথা না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। ততদিনের পর বৈদান্তিক মায়াবাদের প্রকৃত অর্থ এই রবীন্দ্রবাবুর কবিতাতে দেখিতে পাইয়া যার পর নাই সুখী হইলাম। তিনি 'মহাস্বপ্ন' শীর্ষক কবিতায় লিখিয়াছেন—

কভু কি আসিবে দেব সেই মহাস্বপ্নভাঙ্গা দিন
সত্যের সমুদ্রমাঝে 'আধ' সত্য হয়ে লীন ?

যাহাকে এই 'আধ'সত্য বলা হইল, ইহারই বৈদান্তিক নাম 'মায়া'। এই মায়া লইয়া কতই তর্কবিতর্ক, কতই গোলমাল, কতই রূপক রচনার ছড়াছড়ি হইয়া গিয়া এক্ষণে ইউরোপীয় দার্শনিক বার্কলি হইতে উহার টিপ্পনী বাহির হইতেছে। কিন্তু একজন প্রকৃত কবি একটি মাত্র কথায় সমুদায় অন্ধকার ভেদ করিয়া, সমুদায় তর্কের মীমাংসা করিয়া প্রকৃত বিষয়টি বুঝাইয়া দিলেন, আর ইংরাজী নবিসের কাছে বার্কলির গ্রন্থ হইতে 'মায়াবাদ' শিখিবার প্রয়োজন রহিল না। মায়ার অর্থ—খণ্ডজ্ঞান বা 'আধসত্য'।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই কাব্যনাট্যের নামের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে,—প্রকৃতিকর্তৃক বা প্রকৃতিকৃত প্রতিশোধ, দ্বিতীয়, প্রকৃতিসম্বন্ধী বা প্রকৃতির বিষয় সম্বন্ধে প্রতিশোধ। কাব্যনাট্যের প্রথম দৃশ্যে সন্ন্যাসীর আত্মকথার কবিতায় কবিবরের বর্ণনানুসারে দ্বিতীয় অর্থ, অর্থাৎ স্নেহমায়াদি প্রকৃতির বিষয়মাত্রে সন্ন্যাসার সাধিত প্রতিশোধ, সমর্থিত হইয়াছে।

"কী কষ্ট না দিয়াছিস রাক্ষসী প্রকৃতি
অসহায় ছিনু যবে তোর মায়া ফাঁদে।
আমার হৃদয় রাজ্যে করিয়া প্রবেশ
আমারি হৃদয় তুই করিলি বিদ্রোহী।...
প্রতিজ্ঞা করিনু শেষে যন্ত্রণায় জ্বলি
একদিন—একদিন নেব প্রতিশোধ।...
এই দেখ্ তোর রাজ্য মরুভূমি আজি।
তোর যারা দাস ছিল স্নেহ প্রেম দয়া
শ্মশানে পড়িয়া আছে তাদের কঙ্কাল,
প্রলয়ের রাজধানী বসেছে হোথায়।"

দ্রষ্টব্য: 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাট্যকাব্য। প্রকাশকাল ১২৯১। (২৯ এপ্রিল, ১৮৮৪-পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮১)। এই গ্রন্থের বিশ্বভারতী সংস্করণে (ভাদ্র, ১৩৩৫) প্রথম সংস্করণের চতুর্দশ দৃশ্যটি পরিত্যক্ত হয় এবং স্থানে স্থানে গ্রন্থকার অংশবিশেষ পরিবর্জন ও পরিমার্জন করেন। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র যৎসামান্য আলোচনা করিয়াছেন। তৎপূর্বে তাঁহার 'আলোচনা' নামক প্রবন্ধ পুস্তকে 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র অন্তর্নিহিত ভাবটির ব্যাখা করিয়াছেন। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি যা বলিয়াছেন—

> "আমি বালক বয়সে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লিখিয়াছিলাম। তাহাতে এই কথা ছিল যে, এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া, এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া, এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি। যে জাহাজে অনন্তকোটি লোক যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া সাঁতারের জোরে সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা সফল হইবার নহে।"

এই কাব্যনাট্যের বিশ্লেষণে কবি লিখিয়াছেন : "এ বইটি কাব্যে ও নাট্যে মিলিত। সন্ন্যাসীর যা অন্তরের কথা, তা প্রকাশ হয়েছে কবিতায়। সে তার একলার কথা। এই আত্মকেন্দ্রিত বৈরাগীকে ঘিরে প্রাত্যহিক সংসার নানারূপে নানা কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এই কলরবের বিশেষত্বই হচ্ছে তার অকিঞ্চিৎকরতা। এই বৈপরীত্যকে নাট্যিক বলা যেতে পারে।"—অর্থাৎ ইহা নাটকীয় বস্তু। কবির এইরূপ কাব্যনাট্যের বস্তুবিভাগে ব্যষ্টিভাবে অর্থাৎ পৃথক গণনায় "প্রকৃতির প্রতিশোধ" কাব্য ও নাট্য, সমষ্টিভাবে বা সমাহারে কাব্যনাট্য।

কবির মন্তব্য—"প্রকৃতির প্রতিশোধের মধ্যে একদিকে যত সব পথের পথিক, গ্রামের যত সব নরনারী—তাহারা আপনাদের ঘর-গড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতন ভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে ; আর একদিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘর-গড়া এক অসীমের মধ্যে কোনমতে আপনাকে ও সমস্ত কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।"

ইহা এই কাব্যনাট্যের মূলসূত্র। এই সূত্রে গ্রথিত ইহার ক্রমিক দৃশ্যমালায় কবি স্বীয় মন্তব্যের দুই দিকেরই নানা ক্রিয়াকলাপের রঙ-বিরঙের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন, এই দুইএর একটি অন্যটিকে ছাড়িয়া সত্যতত্ত্বের সন্ধান দিতে পারে না, বস্তুতঃ উভয়ই উভয়কে লইয়াই পরিপূর্ণ ও সার্থক, অর্থাৎ সংসারের সমস্ত কিছু বা পরিদৃশ্যমান জগৎ ছাড়িয়া অনন্তের উপলব্ধির চেষ্টা যেমন অঙ্গহীন ব্যর্থ, অনন্তকে ছাড়িয়া অচেতন সাংসারিকের দৈনন্দিন ক্রিয়া-কলাপও সেইরূপই হীনাঙ্গ নিরর্থক। শকট ও চক্র—এই উভয়ের সহযোগে চক্রবান্ শকট কার্যসাধক সার্থক ; শকটের অভাবে চক্র, চক্রের অভাবে শকট,—দুইই অকর্মণ্য ব্যর্থ, অর্থাৎ দুইই দুইকে লইয়াই সম্পূর্ণ সাঙ্গ কর্মেকর। শান্ত ও অনন্ত—সংসার ও বিশ্বরূপ এইরূপই সতত অবিচ্ছেদ্য সংযোগে সম্মিলিত। সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত উভয়ের সম্মেলন সাধনায় সিদ্ধির সম্পূর্ণতাও ধ্রুব।

শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর শিক্ষক এবং 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' প্রণেতা ও রবীন্দ্র-ভক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'কবির কথা' (১৩৬১) গ্রন্থে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' সম্বন্ধে যে মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাই এস্থলে গৃহীত হইয়াছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রবীন্দ্র-রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডে স্থানলাভ করিয়াছে। উদ্ধৃতিগুলি আধুনিক পাঠানুযায়ী মুদ্রিত হইয়াছে।

এই কাব্যনাট্যের নায়ক সন্ন্যাসী। সে সংসারের সব-কিছুতেই বিরাগী, অর্থাৎ প্রকৃতির বিষয়মাত্রে বিতৃষ্ণ হইয়া স্নেহবন্ধন মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া প্রকৃতিজয়ী হইয়া আপনার ঘর-পড়া অনন্তের সাধনায় আপনাকে মন্ত্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী ভাবিয়া, মনে করিয়াছিল, সিদ্ধিতে কত না আনন্দ উপভোগ করিয়াছিল। কিন্তু সে বুঝিতে পারে নাই যে, তাহার সে সিদ্ধি অসিদ্ধ, অঙ্গহীন অসম্পূর্ণ। ইহাই সপ্রমাণ করিবার অভিসন্ধিতেই কবিবর সিদ্ধ সন্ন্যাসীকে তাহার গুহাবাস হইতে বাহির করিয়াছেন এবং সংসারের খেলা দেখাইবার উদ্দেশ্য সর্বপ্রকার সংসারী নরনারীর সমাগমস্থান, সাংসারিকের নানা কর্মকাণ্ডের দৃশ্যপট-ভূমিকা রাজধানীর রাজপথে আনিয়া বসাইয়াছেন; পরে কাব্যনাট্যের ক্রমিক দৃশ্যসমূহে নাগরিক ও গ্রাম্য নরনারীদিগের গৃহস্থতার দৈনিক ক্রিয়াকাণ্ডের যে বিবিধ চিত্র-পরম্পরা অঙ্কিত করিয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার একমাত্র অভিপ্রায়—সন্ন্যাসীর মন্ত্রসিদ্ধির পরীক্ষা। তৃতীয় ও চতুর্থ দৃশ্যের অনাথা বালিকা এই পরীক্ষার অমোঘ নিকষ পাষাণ—বালিকার 'পিতা' সম্বোধনে স্নেহাসক্ত সন্ন্যাসীর সিদ্ধির আসন বিচলিত হইল, বালিকার স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া সন্ন্যাসী সংসারে ফিরিয়া আসিল,—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। যে স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির অধীনতা মুক্ত হইয়া সন্ন্যাসী মন্ত্রসিদ্ধ হইয়াছিল, বালিকার প্রতি সেই স্নেহেই বিমুগ্ধ করিয়া কল্পনাকুশল কবি তাহাকেই আবার সংসারীর সাজ পরাইলেন!—তীব্র বিষ অমৃতমধুর হইল! অহো, কবিকর্ম বিলক্ষণ!

চতুর্থ দৃশ্যের পরবর্তী পঞ্চম দৃশ্য হইতে পঞ্চদশ দৃশ্য পর্যন্ত বিষয় এই স্নেহের পরিণতির ক্রমবর্ধমান বর্ণনার চলচ্ছবি।

ষোড়শ দৃশ্যে কাব্যনাট্যের পর্যবসান। বালিকার প্রতি সন্ন্যাসীর স্নেহের পরাকাষ্ঠা হেতু তীব্র শোকের বর্ণনাটি এই দৃশ্যের শেষ কবিতা। গুহামুখে ধুলায় পতিতা বালিকা, 'স্নেহের প্রতিমা'—সন্ন্যাসীর নিদারুণ শোকোদ্দীপক দৃশ্য। সন্ন্যাসী মৃত বালিকাকে দেখিয়াই ভাবিয়াছিল, অভিমানে পাষাণে সে শুইয়া আছে। কিন্তু যখন বুঝিতে পারিল, তাহার 'হৃদয়ের ধন' প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার স্নেহকোমল হৃদয় প্রবল শোকাবেগে ব্যাকুল হইয়া উঠিল; শোকবিহ্বল সন্ন্যাসীর বিষাদোক্তির কবিতায় বাষ্পকলুষ কণ্ঠের সেই শোকের নিদারুণ আঘাত অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে।—

"নয়ন-আনন্দ মোর, হৃদয়ের ধন,
স্নেহের প্রতিমা, ওগো মা, আমি এসেছি—
ধূলায় পড়িয়া কেন—ওঠ মা, ওঠ মা—
পাষাণেতে মুখখানি রেখেছিস্ কেন ?
আয় রে বুকের মাঝে—এও তো পাষাণ।
ও মা, এত অভিমান করেছিস্ কেন।
মুখখানি তুলে দেখ্—দুটো কথা ক !—
এ কী, এ যে হিম দহ।—না পড়ে নিশ্বাস—
হৃদয় কেন রে স্তব্ধ, বিবর্ণ মুখানি !
হায় হায়, এ কী নিদারুণ প্রতিশোধ।"

আলোচনা ॥ ১। "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়"—কবির এই কবিতা পঙ্‌ক্তির ভাবের প্রত্যক্ষ চিত্র—"প্রকৃতির প্রতিশোধ" বিরাগী হইয়া সন্ন্যাসী অনন্তের উপলব্ধির চেষ্টা করিয়াছিল বৃথাই,—কবির উদ্ভাবিত পরীক্ষাই ইহার প্রমাণ। সন্ন্যাসী জানিত না যে, "শূন্যতার মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থ, বিশেষের মধ্যে সেই অসীম প্রতিক্ষণ রয়েছে রূপ নিয়ে সার্থক, সেইখানে যে তাকে পায়, সেই যথার্থ পায়।"—অর্থাৎ সেই অসীমের বিশ্বরূপ বিশ্ব সংসারের সীমায় বিশেষ বিশেষ শান্তরূপে সতত বিরাজমান। সেই বিশেষের সাধনায়ই সাধক নির্বিশেষকে পায়, —সেই পাওয়াই সার্থক। এই বিশেষ ছাড়িয়া নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থই। এই দুই-এর মিলনহেতুই প্রেম, প্রেমে সাধ্যসাধকের একাত্মতা; একাত্মতা মুক্তি—ভগবৎপ্রাপ্তি। তাই কবির বাণী—"ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি।" ইহা "সীমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধনের পালা।"

২। প্রথম দৃশ্যের বর্ণনা—সন্ন্যাসী বৈরাগ্য সাধনে মুক্তিলাভের আশায় স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতিজয়ী অর্থাৎ প্রকৃতিসম্বন্ধী স্নেহাদি বিষয়মাত্রে মুক্ত হইয়া প্রকৃতির প্রতি প্রতিশোধ লইয়াছিল। শেষ দৃশ্যে সেই বিরাগী সেই স্নেহাবর্তের ঘূর্ণিপাকে ঘুরিতে ঘুরিতে সংসারে ফিরিয়া আবার সংসারী সাজিল। ইহা সন্ন্যাসীর প্রতি প্রকৃতি কর্তৃক বা প্রকৃতি কৃত প্রতিশোধ বা প্রতিক্রিয়া। কাব্যনাট্যের দৃশ্য সমূহে এই দুই প্রকার অর্থেই কবি তাঁহার অভিমত পরিস্ফুটরূপে বর্ণনা করিয়া, "প্রকৃতির প্রতিশোধ" দ্ব্যর্থক অর্থাৎ দুই অর্থে অন্বর্থ করিয়াছেন।

৩। সন্ন্যাসীকে সংসারে ফিরাইয়া আনার পরেই বালিকার প্রাণাত্যয়, আপাততঃ বিসদৃশ এই কবির কল্পনার যুক্তিযুক্ততা কি ?—এই প্রশ্ন সহজেই মনে আসে। এ বিষয়ে কবি নীরব, কিন্তু' এই নীরবতা তাঁহার অব্যক্ত প্রশ্নোত্তর সুব্যক্তই করিয়াছে। বালিকার মৃত্যুতে তাহার প্রতি সন্ন্যাসীর আন্তরিক স্নেহের একান্ত প্রভাব নিদারুণ শোকের বেদনা বিলাপোক্তিতে যেরূপ সুপ্রকট হইয়া উঠিয়াছে, বালিকার জীবিতকালে সেই প্রভাব প্রকাশের তাদৃশ উপযুক্ত কারণ মিলিত না।

৪। কাব্যনাট্যের দ্বিতীয় দৃশ্যে রাখাল বালকগণের গান,—"হেদে গো নন্দরাণী, আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও" ইত্যাদি। প্রভাত হইয়াছে, সূর্য উঠিয়াছে বনে বনে ফুল ফুটিয়াছে ; শ্যামকে লইয়া রাখালেরা গোষ্ঠে যাইবে, কুসুমিত বনে পর্বতে গোচারণের মাঠে বনমালায় শ্যামকে সাজাইয়া বাঁশী বাজাইয়া নূপুরের রুনুঝুনু তালে নাচিয়া নাচিয়া নাচের খেলা খেলিবে, তাই শ্যামকে ছাড়িয়া দেওয়ায় নন্দরাণীর কাছে আবদার তাহারা করিতেছে।—ইহা বাহ্যভাবে রাখালগণের গোষ্ঠ-সংগীত মাত্র ; কিন্তু ইহাতে কবির ইঙ্গিত,—"সেই মাঠে বিহার তাহারা (রাখালেরা) শূন্য করিতে চায় না। সেই মাঠে তাহারা তাহাদের অসীমের সঙ্গে মিলিত হইতে চাহিতেছে। সেইখানেই অসীমের সাজ-পরা রূপটি তাহারা দেখিতে চায়। সেইখানেই মাঠে মাঠে বনে পর্বতে অসীমের সঙ্গে আনন্দের খেলায় যোগ দিবে বলিয়াই তাহারা বাহির হইয়া আসিয়াছে।"

ইহাও কবির সেই একাত্মতার বাণী,—"সীমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধনের পালা।" তাই কবি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন,—"এই একটি মাত্র ভাব অলক্ষ্যভাবে নানারূপে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে।"

কড়ি ও কোমল

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

ভূমিকা ॥ নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে কার্য করাই যাঁহাদের স্বভাব, তাঁহারা এ পর্যন্ত গ্রন্থের পূর্বেই ভূমিকা লিখিয়া আসিতেছেন। গ্রন্থ-সমাপ্তির পরে ভূমিকা লেখার প্রথা আমিই প্রবর্তিত করিব ভাবিয়াছিলাম—কিন্তু লোকে যতদুর ভাবে, কার্যে ততদুর ঘটিয়া উঠে না বলিয়া ভূমিকা পূর্বেই বসিল।

হোমার, বাল্মীকি, বর্জিল, ব্যাস, সেক্সপীয়র, কালিদাস, গেতে, দান্তে, ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ, বাইরন, শেলি, জয়দেব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহা মহা কবিগণ রচনা দূরের কথা—কল্পনাতেও যাহা আনিতে পারেন নাই, এই গ্রন্থে তাহাই লিপিবদ্ধ করা আমার অভিপ্রেত ছিল। বলিলে অনেকে বিশ্বাস না করিতে পারেন, কিন্তু সত্য করিয়া বলিতে পারি যে, ফলে এই কাব্য যতই মন্দ হউক না কেন, মনে মনে জগতের কোন কবি অপেক্ষা নিকৃষ্ট রচনা না করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাব্য লিখিতে পারি আর না পারি, অন্ততঃ লিখিবার ইচ্ছাটাও করিয়াছি, এ বড় সামান্য যোগ্যতার কর্ম নহে।

মোট কথা—যদিও ইহাতে 'কড়ি ও কোমলের' ন্যায় "স্তন" নং ১, "স্তন" নং ২, "চুম্বন", "বিবসনা" প্রভৃতি সুরুচি-সঙ্গত কবিতা লিখি নাই, তথাপি তদ্রূপ ঈশ্বর-প্রেমাত্মক এক-আধটি কবিতার অভাব হইবে না। মন্দ লোকের মন্দভাব—আমার মনে পাপের লেশমাত্র নাই।

সুজন পাঠক,—তুমি যতই দুর্জন হও না কেন, যখন আমার কাব্যপাঠ করিতেছ, তখন নিশ্চয়ই তুমি সুজন—অতএব গ্রন্থকারদিগের কৌলিক প্রথা-নুসারে পুনশ্চ বলিতেছি—হে সুজন পাঠক, তুমি তোমার পত্নীর সমক্ষে অবলীলা-ক্রমে এই "মিঠে কড়া" নামক মহাকাব্য পাঠ করিতে লজ্জা বোধ করিবে না।

দ্রষ্টব্য: 'কড়ি ও কোমল' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম কবিতা গ্রন্থ। ইহার প্রথম প্রকাশকাল ১২৯৩ সাল (১৪ নবেম্বর, ১৮৮৬) পৃষ্ঠা সংখ্যা ১+২৬৩। ইহা আশুতোষ চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত হয়। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হইলে 'হিতবাদী'র সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ইহার একটি বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করিয়া একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে গ্রন্থকারের নামের স্থলে "রাহু" রচিত এই নামে মুদ্রিত হয়। পুস্তিকাটির আসল নাম "ইহা কড়িও নহে, কোমলও নহে, পুরো সুরে মিঠে কড়া।"

এবং হংহো পাঠিকে, তুমিও তোমার স্বামীর নিকট আদি ব্রাহ্মমতে এই পুস্তক পড়িতে পারিবে। পড়িলেই বুঝিবে রবি আমার কবলে কিনা।—রাহু

॥ গ্রন্থ-সূচনা ॥

বলিতে ললিত কথা,
গাইতে ললিত গান,
লিখিতে ললিত গাথা,
তুলিতে "তরল তান"।

হাসিতে মধুর হাসি,
নাচিতে পুলক ভরে,
কেমনে পারিব আমি,
সুকবি না হ'লে পরে ?

ফোটাব ভাবের ফুল,
জোটাব কথার ঢেউ ;
সাগর গড়িব কুম্ভে,
ডুবে কি মরিবে কেউ ?

হয়েছে সুকবি হতে
খুঁজে খুঁজে সোজা কথা।
যা ইচ্ছা তা লিখে যাব।
মাথা নাই মাথা ব্যথা ॥

কালীপ্রসন্ন তৎপূর্বে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে আক্রমণ করিয়া 'অবতার' (১৮৮১) নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কালীপ্রসন্ন এই কুৎসা রটনায় নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের কয়েক জনের কুৎসা রটনা করিয়া 'রুচিবিকার' নামে একটি পুস্তিকা (১৮৯৭) প্রকাশ করিলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ আইনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহাতে কালীপ্রসন্নের কারাদণ্ডের আদেশ হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে যে সকল বিরোধী ব্যক্তির অভ্যুদয় হইয়াছে, কালীপ্রসন্ন তাঁহাদেরই অন্যতম।

না হয় না হবে মানে,
রস চাই—কবিতায়।
মিষ্টি হ'লে বেঁচে যাই
ভাবনা থাকেনা আর॥

গ্রাম্য কথা, শুদ্ধ কথা,
একত্র মিলায়ে ধরে',
শকটচড়া, গাড্যারোহণ,
গড়িব সমাস করে'।

মাঝেতে ইংরাজী কথা
(জানা আছে যতদুর)
ঢুকায়ে করিব সুখে
বঙ্গ-ভাষা দর্পচুর।

গড়িব নূতন শব্দ
ব্যাকরণ go to hell
অই শুন ইংরেজী
ভারতী বা হয় fail.

"চাঁদিনী" চাঁদের রাণী
মানে তার বোঝা ভার!
"চাঁদিমা"টি অপভ্রংশ,
চন্দ্রমা কি চন্দ্রিকার?

করুক এ সব তর্ক
বিদ্যাসাগরাদি বুড়ো।
আমি ত ভাষার মুখে
জ্বালিব খড়ের নুড়ো॥

সোজা কথা! কোথা আছ?
এস হেথা জুটে যাও।

কড়ি ও কোমল

আমি যে সুকবি হব,
কথা রাখ মাথা খাও।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ
বঙ্গের আদর্শ কবি।
শিখেছি তাঁহারি দেখে ;
তোরা কেউ কবি হবি ?

"কড়ি ও কোমল" পড়
"পূরো সুর" চাস্ যদি।
পড়ে যা আমার টোলে
দেখে যা কবিত্ব-নদী।

সে যে রবি—আমি রাহু,
তুল্য মূল্য সবাকার।
ধনী সে—দরিদ্র আমি,
সে আলো—এ অন্ধকার।

॥ মথুরায় ॥

মিশ্রকাফি—একতালা

(৩৪-৩৬ পৃষ্ঠা পড়িয়া)

দারুণ দৈবের দোষে
পড়িলাম "মথুরায়"।
সুমধুর কথাগুলি
সুললিত পদাবলী
কড়ি কি কোমল বলি ?
—ঠিক করা হ'লো দায়।

দারুণ দৈবের দোষে
পড়িলাম "মথুরায়"

একে রবি তায় কবি,
তায় মথুরার ছবি
তায় প্রাণ খায় খাবি
বাঁশরী বাজেনা তায়।

বাজ তোর পায়ে পড়ি
বাজরে কোমল কড়ি
কচুবনে গড়াগড়ি
নহিলে যাইবি হায়।
দারুণ দৈবের দোষে
পড়িলাম "মথুরায়"।

"একবার রাধে রাধে
ডাক্ বাঁশী মনোসাধে"—
শুনে ব্যাকরণ কাঁদে
হেন সন্ধি শুনি নাই!

ব্যাকরণ হারায়েছে
শুধু এক বাঁশী আছে,
ভয় হয় কবি পাছে
হারাইয়া ফেলে তাই।

এ শিঙা হারালে পর
কি করিবে কবিবর
কি বাজাবে অতঃপর
ভেবে দুঃখে হাসি পায়

দারুণ দৈবের দোষে
পড়িলাম "মথুরায়"॥

॥ পুলক নাচিছে গাছে গাছে ॥

(১৪ পৃষ্ঠা পড়িয়া)

মানুষের মনে মনে
এতদিন ছিলে ভাল ।
কেনরে পুলক আজ
তোমার এ দশা হলো ?
কবির লেখনী অগ্রে
কি জানি কি শক্তি এ যে !
গাছে গাছে নেচে নেচে
ভ্রমিতেছ যার তেজে !!

(২)

নাচিতেছ কোন্ গাছে,
কোথায় সে গাছ আছে ?
না জানি কেমন গাছ—হায়রে কপাল !
শেওড়া কি সহকার
ঠিক করে সাধ্য কার ?
তাল নারিকেল কিম্বা খর্জুর কাঁটাল ;

কিম্বা নাচ ধীরে ধীরে
ক্ষুদ্রতর-তরু-শিরে
আকন্দ, এরণ্ড, ঘেঁটু—এর কোনটিতে ?

বিচুটি কি আলকুশী
কোথা তুমি থাক খুসী ;
ছোট গাছ বলে বুঝি চাহনা বলিতে ;

ওল, কচু, কাঁটানটে,
এরাও তো গাছ বটে,
পুলক নাচিছ শিরে এর মধ্যে কার ?

তেশিরে কি মনসায় ?
শুধু নাম করা তার
—উদ্দেশে প্রণাম করি—বলনা এবার।
ধুতুরায় নাচ কিরে,
কচি কচি বংশ শিরে ?
নয় রাঙচিত্র গাছে—কিম্বা বাবলায় ?
ওই যা হয়েছে ভুল !
জাতি আদি যত ফুল
তার মধ্যে নাচ তুমি কাহার মাথায় ?
যেমন আমার মন
ভাবি নাই, এতক্ষণ
গোলাপ, টগর, যুঁই, মল্লিকা, মালতী।
জানিনা পুলক নাচে
এর মধ্যে কোন্, গাছে
সুধালে পুলক হায় কহেনা ভারতী।

(৩)

জানিতে চাহিনা আমি সুধাবনা আর
নাচ তুমি, যথা ইচ্ছা কবি-কল্পনার
না জলে, না মৃত্তিকায়, নাচ তুমি গাছে,
এই শুনে প্রাণ মোর পরিতুষ্ট আছে ॥

॥ নবরত্ন ॥

(প্রথম রত্ন—১৩৩ পৃষ্ঠা
"মাগো আমার লক্ষ্মী
মনিষ্যি না পক্ষী
এই ছিলেম তরীতে
কোথায় এনু ত্বরিতে

কাল ছিলেম খুলনায়
তাতে ত আর ভুল নাই
কলকেতায় এসেছি সগু
বসে বসে লিখছি পগু ।।" –রবি

ভেলা মোর বাপ আচ্ছা মন্দ !!
"মন্দ বড় বাছের বাছ,
ঠেস দিয়ে আমরুলের গাছ,
দেখেছেন পাঁকাটি,
লেগে গেছে দাঁত কপাটি ।"

আয় তোরা কে দেখতে যাবি,
ঠাকুর বাড়ী মস্ত কবি !!
হায়রে কপাল হায়রে অর্থ !
যার নাই তার সকল ব্যর্থ !!—রাহু

(দ্বিতীয় রত্ন—১০৬ পৃষ্ঠা)

"তোদের ফেলে সারাটা দিন
আছি অমনি এক রকম ।
খোপে বসে পায়রা যেমন
কচ্ছে কেবল বক্ বকম্ ।

আজকে নাকি মেঘ করেছে
ঠেকছে কেমন ফাঁকা ফাঁকা ।
তাই খানিকটে ফোঁস ফোঁসিয়ে
বিদায় হলো রবি কাকা ।"—রবি

উড়িস্‌নে রে পায়রা কবি
খোপের ভিতর থাক্ ঢাকা ।
তোর বক্ বকম্ আর ফোঁস ফোঁসানি
তাও কবিত্বের ভাব মাখা !

তাও ছাপালি, গ্রন্থ হ'ল
নগদ মূল্য এক টাকা !!!—রাহু

(তৃতীয় রত্ন—১০৮ পৃষ্ঠা)

"চোখের আড়াল, প্রাণের আড়াল
কেমনতর ঢং এগো ।
তোমার প্রাণ যে পাষাণ সম
জানি সেটা long ago."—রবি

কেমন ভাষা, বিদ্যা খাসা
দেখ কেমন সং এ গো
রোগা হাড় তাই বেঁচে গেল
প্রমাদ অণ্ড বণ্ড পণ্ডে গো ।

(চতুর্থ রত্ন—১০৯ পৃষ্ঠা)

"বৃষ্টি পড়ে চিঠি না পাই
মনটা নিয়ে ততই হাঁপাই
শূন্য চেয়ে ততই ভাবি
সকলি ভোজ বাজি এ ।
ফিলজপি মনের মধ্যে
ততই উঠে গাঁজিয়ে ।"—রবি

ষেঠের বাছা ষষ্ঠীর দাস
সুখে থাক বারো মাস
সইতে না হয় তোমায় যেন
"ফিলজফির গাঁজানি ।"

কার হাঁড়িতে কেন খেয়েছ,
গাঁজা গোঁজা সব সয়েছ,
বড় বিদ্যা ছরকুটেছ
গন্ধে বেরোয় পরাণি ।—রাহু

কড়ি ও কোমল

(পঞ্চম রত্ন—১২২ পৃষ্ঠা)

"জলে বাসা বেঁধেছিলাম
ডেঙ্গায় বড় কিচি মিচি
সবাই গলা জাহির করে
চেঁচায় কেবল মিছি মিছি।
জান তো ভাই আমি হচ্ছি
জলচরের জাত।
আপন মনে সাঁতরে বেড়াই
ভাসি দিন রাত॥"—রবি

মাছ সেজেছ বেশ করেছ
"জলচরের জাত।"
আর ভেসো না আর ভেসো না
হবে কুপো কাত॥
কতই সাধ যাচ্ছে কবির
আহা মরে যাই।
পায়রা ছিল, মাছ হয়েছে,
যাচ্ছে উড়ো যাই!

কবি তুমি মানুষ বটে
হ'লে পায়রা মাছ।
গেলে, স্থলে, শূন্যে, জলে,
বাকি কেন গাছ?—রাহু

(ষষ্ঠ রত্ন—১৩৯ পৃষ্ঠা)

"ধার করা নাম নেবো আমি
হবে না ত সিটী
জানই আমার সকল কাজে
Originality."—রবি।

মৌলিকতা পথের ধারে
গড়াগড়ি যায়।
ও তার অনুবাদের বিষম ঠেলায়
ব্রহ্মা লজ্জা পায়॥

চুনোগলি হার মেনেছে
মৌলিকতা দেখে।
যত মুদিমালা বাংলা পড়ে
রবি ঠাকুর লেখে॥—রাহু

(সপ্তম রত্ন)

পোঁতা—১১১ পৃষ্ঠা, কুঁড়ে (অলস অর্থে) ১০৬ পৃষ্ঠা

ওঁরে বাঁবা "কুঁড়ে" কিঁরে ?
"পোঁতা" বঁলে কাঁরে।
ঠাকুর ঘরের কবির কথায়
শূর্পণখা হারে॥—রাহু

(অষ্টম রত্ন)

"আকাশ ঘিরে জাল ফেলে
তারা ধরাই ব্যবসা।
থাক্‌গে তোমার পাটের হাটে
মথুর কুণ্ডু শিবু সা।"—রবি

ও জেলে ভাই জাল টেনে নাও
পদ্য লেখা কি সোজা।
ভাবের চোটে পাহাড় ফাটে
যা পদ্য যা মিলে যা॥—রাহু

কড়ি ও কোমল

(নবম রত্ন)

''রবীন্দ্রনাথ ধরা পড়েছে''—১৩০ পৃষ্ঠা

অনেক মেয়ে সতী আছেন ধরা পড়েছে রাধা।
অনেক জন্তু বোঝা বয় ধরা পড়েছে গাধা ॥
অনেক কবি কাব্য লেখে স্বভাব কবি তুমি।
অনেক মিঞা গণ্ডমূর্খ ধরা পড়েছি আমি ॥—রাহু

॥ গান ॥

তোরা শুনে যা
আমি গান গে'তেছি।
আমার গলা ফেটে যায়
তোরা, বসে করিস কি ?

আমার নয়কো যে সে গান
এতে নাচিয়ে দে যায় প্রাণ
গানের কথায় কথায় ভাব পোরা,
গানের নূতন ধরন শোন্ তোরা ॥

তোরা, দেখে যা দেখে যা, শুনে যা শিখে যা
কেমন গানের তানের ঢেউ।
আহা, ফুলের রাশিতে, চাঁদের হাসিতে
অরুচি ধরাতে পারেনি কেউ।
ওরে, এতদিন ধরে পারেনি কেউ ॥

যদি সব পুরাতন, এও ত নূতন
এতেও অরুচি ধরায়েছি
তবে দেখ্‌ রে বিচারি কত বাহাদুরি,
বেঁচে থাকি আমি যাই বলিহারি ॥

(২)

গানে, কি খ হ'তো।
ফুলের রাশি, চাঁদের হাসি যদি দেশে না থাকিত ॥

নিথর কি ক্ষুদ্র কথা যদি না থাকিত হেথা,
নিঝুম রেতে মুখানি থুয়ে জোছনা নাহি ঘুমা'ত ॥

যমুনা যেত শুকায়ে, চাঁদনী যেত লুকায়ে,
চাঁদের বংশের হ'তো ধ্বংস আমিয়া ধূলায় গড়া'ত ॥
মলয় যদি প্রণয় আশে, না ভ্রমিত আকুল শ্বাসে,
জন্ম ভ'রে পিউ পিউ ক'রে পাপিয়ার গলা ভাঙ্গিত ॥

নিরালা গোলাপবালা, যদি বন না কত্তো আলা
না যদি ভ্রমরা-সাথে নলিনী সখী নাচিত।

পথ হারা বাঁশীর তান যদি না কাঁদাত প্রাণ,
গান বাঁধার বাজার, হ'তো আঁধার 'এধার ওধার'
মারা যেতো ॥

॥ "ঙ" বন্দনা ॥

মাথায় পাগড়ী সার
Brief-less Barrister *
ক বর্গে পঞ্চম বর্ণ
"ঙ"রে আমার।

সাহিত্যের আদালতে
দেখি নাই কোন মতে
অন্যের আশ্রয় বিনা
স্বাতন্ত্র্য তোমার।

* খুড়ি। ব্যারিষ্টারের পাগড়ী থাকে না। পেটিফগিং প্লীডার বলিলে সামলা থাকায় কথাঞ্চ চলিত।

চিরদিন তব রোগ
অন্তের সহিত যোগ
একা দেখা নাহি দিতে
সম্মুখে সবার।

কোথায় পাথর চাপা
সঙগোপনে ছিলে বাপা
এতদিন ছিল তব
বিরল প্রচার।

উন্নত সাহসী কবি
বঙ্গের উজ্জ্বল রবি
এতদিনে করিলেন
তোমার উদ্ধার।

"সংস্কৃত" কথা ছিল
এবে সঙস্কৃত হ'ল
এই বারে মারা যাবে
আজ অনুস্বার॥

রাঙা ভাঙা সঙগে রঙগে
নব শোভা সর্ব অঙগে
বাঙলা ভাষার॥

মৌলিকতা Originality দেখে যাও।
যাহা কোন কবি ভাবে নাই, সরস্বতী স্বপ্নে দেখে নাই
বিশুদ্ধ রুচিসঙ্গত।

॥ ঈশ্বরের প্রেম ॥

ইহা রথযাত্রা কি জলযাত্রা হইতে ফিরিয়া লেখা হয় নাই
মুদির দোকানে এক সের, আধ সের, এক পোয়া

আধ পোয়া, প্রভৃতি যথাক্রমে উপরি উপরি
সাজান দেখিয়া লিখিত হইল।

এক সের হতে ছটাকের সিকি
সারি সারি রাখা তবকে তবকে
যেন যুবতীর কুচ একতর
প্রলয় ঘটায় পলকে পলকে।

মুদি যেন এক যুবতীর স্তন
চারু বাটখারা রূপে,
যুবকের মন করিতে ওজন
রাখিয়াছে চুপে চুপে।

শ্রীফল দাড়িম্ব বিফল সে সব
কুচের প্রকৃত তুলনা এই।
মুদির দোকানে এরূপ সাজান
দেখেছে যে জন বুঝিবে সেই॥

রমণীর স্তন সুন্দর কেমন
গঠনে কৌশল কত।
দুগ্ধের বিটপী রসের ভাণ্ডার
বিধাতার মনোমত।

কি আশ্চর্য প্রেম পিতার অন্তরে
কেমন মহিমা তাঁর!
হেন স্তন তিনি রচিলা হেলায়
কিবা শিল্প চমৎকার!

দেখি বাটখারা ভাবিলাম স্তন
স্তন ভেবে স্মরি পরম পিতায়।

ভাবের সংসর্গ* বিচিত্র কেমন
কবির কল্পনা কি বিচিত্র হায় ॥

॥ স্বপ্ন দর্শন ॥

গভীর নিশীথে হেন
স্বপন দেখিনু কেন
মরমের মাঝে যেন
কে গেল কি কহিয়া।

আতঙ্কে আকুল প্রাণ
মন করে আন্‌চান্‌
কিসে পাব পরিত্রাণ
নাহি পাই ভাবিয়া ॥

কে যেন জগৎময়
কি যেন দেখালে ভয়
থরথরি সমুদয়
অঙ্গ উঠে কাঁপিয়া।

কে যেন আকাশ থেকে
আমার অদৃষ্ট দেখে
ভবিষ্যৎ খুলে রেখে
গেল এই বলিয়া :

"শুন ওরে মূর্খ কবি
বগলে পুরেছ রবি
মিঠেকড়া নব ছবি
গিয়াছ রে আঁকিয়া।

* Association of ideas.

নাশিতে তোমার জাড্য
রচনার পরিপাট্য
নূতন হেঁয়ালি নাট্য
রহিয়াছে হইয়া।

সেই সে মুষল যবে
বালকে বাহির হবে
কি করিবে তুমি তবে
মোটা বুদ্ধি লইয়া?

ঠাট্টা হবে গাড়ী গাড়ী
হাসিবে ঠাকুর বাড়ী
ক্ষিতিতলে গড়াগড়ি
যাবে তারা হাসিয়া।

হুওয়ো' দিবে ভূমণ্ডল
স্বর্গ আর রসাতল
গাইবে কিন্নরীদল
দুঃখ তব দেখিয়া।

এই বেলা সাবধান
দাও টেনে পিটটান।
হরে ল'বে তব প্রাণ
দেব দেবী রুষিয়া॥

কড়ি ও কোমল

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী

পুস্তক অনেকেই লেখে, এবং যে যা লেখে, তাই তাঁহার নিকট ভাল লাগে। ভাল না লাগিলে তাহা প্রকাশ কেন? কিন্তু অতি অল্প পুস্তকই জগতে আদর পায়, সাহিত্যে স্থায়ী হয়। বাংলার সাহিত্য-জগতে এখনও লেখকের সংখ্যা অল্প। যাঁহারা সাধারণের নিকট আদর পাইতেছেন, তাহাদের সংখ্যা আরো অল্প। জলবিম্বের ন্যায় কত পুস্তক নিমেষের মধ্যে ক্ষণদেখা দিয়াই যেন কোথায় লুকাইয়া যায়, আর খুঁজিয়াও পাওয়া যায় না। তবু কিন্তু অনেক লেখক অহংকার করিতে ছাড়েন না। কেহ বা দুই একখানি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া, কেহ বা দুই একখানি সঙ্কলিত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া অহংকারে আর কিছুই দেখেন না। এই অহংকারে আর কাহারও কিছু অনিষ্ট হউক বা না হউক, সমালোচকগণের হাড় জ্বালাতন! পুস্তক দিয়া সমালোচনা না পাইলে কিছুতেই তাঁহারা ছাড়েন না। সমালোচনা মন্দ হইলেও যে দশা, না হইলেও সেই দশা, গ্রন্থকারদিগের অহংকারে তাঁহাদিগকে নিন্দুকের পদে বরণ করে। সমালোচকগণের কিছুতেই নিস্তার নাই। যেমন পুস্তকই হউক না কেন, একবার পড়িতেই হইবে, দু'কথা লিখিতেই হইবে। এ দুর্ভোগ যেন কাহাকেও ভুগিতে না হয়।

দ্রষ্টব্য : ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমলে'র একটি বিদ্বেষপূর্ণ সমালোচনায় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের পরিচয় পাঠকবর্গ পাইয়াছেন। প্রধানতঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যের উত্তরোত্তর ঔজ্জ্বল্য ও প্রতিষ্ঠা দেখিয়া যেমন একদল লোক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের উপর শ্রদ্ধাশীল হইয়াছিলেন, সেই সঙ্গে একদল সাহিত্যিক নামধেয় ব্যক্তিরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিদ্বেষীও হইয়াছিলেন তৎসমসাময়িককালে। উক্ত সময় 'নব্যভারত' মাসিক পত্রের সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী 'কড়ি ও কোমলে'র একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা স্বীয় পত্রিকার অগ্রহায়ণ (১২৯৪) সংখ্যায় প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ দেবীপ্রসন্নর এই সমালোচনাটি প্রকাশিত হইলে বিরোধীপক্ষের কোলাহল সাময়িকভাবে কথঞ্চিৎ স্তব্ধ হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'তে 'শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী' ও 'কড়ি ও কোমল' প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা আছে। 'সঞ্চয়িতা'র (পৌষ, ১৩৩৮) ভূমিকায় 'কড়ি ও কোমল' সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন—

এই দুর্ভোগের অবস্থায় কিন্তু একটা সুখের আশা আছে। হঠাৎ যদি কোন ভাল পুস্তক হাতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে আনন্দ আর হৃদয়ে ধরে না। যে পুস্তক একবার ছাড়িয়া দশবার পড়িতে ইচ্ছা হয়, এমন পুস্তক হাতে পাইলে আর আনন্দের সীমা কোথায়? এই এক আশাতেই সমালোচক পদ লোকে গ্রহণ করে। আর যে আশা আছে, তাহা বলিয়া কাজ কি?

অনেক ছাই পাঁশ ঘাঁটিয়া আমরা একখানি প্রকৃত কবির প্রকৃত হৃদয়ের ছবি পাইয়াছি। আমরা যে আনন্দিত হইয়াছি, তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। 'কড়ি ও কোমল' যে জীবনের ছবি—তাহাতে প্রতিভা আছে, সহৃদয়তা আছে, প্রেম আছে, জ্ঞান আছে। আর তার সঙ্গে একটু বাল-চঞ্চলতাও আছে।

রবীন্দ্রবাবু যে একজন প্রথম শ্রেণীর কবি, সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ নাই। শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার বড়াল ও শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাস, ইঁহারাও আমাদের বিবেচনায় এক শ্রেণীর কবি, কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর নীচে। ভাষার কমনীয়তায়, ভাবের উচ্ছ্বাসে, চিন্তার গভীরতায় ইনি সকলের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু গিরীন্দ্রমোহিনী এবং গোবিন্দচন্দ্রের বিশেষত্ব এই, ইঁহারা উভয়েই ইংরাজি কবিদিগের গ্রন্থের সহিত অপরিচিত, সুতরাং ইঁহাদের কবিতায় অনুকরণ ভাগ কিছু অল্প। ইঁহারা উভয়েই স্বদেশের কবি, স্বদেশের ভাবক। রবীন্দ্রবাবু এবং অক্ষয়বাবু যেন কিছু কিছু বিদেশের হইয়া গিয়াছেন। স্বভাবের

"কড়ি ও কোমলে অনেক ত্যাজ্য জিনিস আছে, কিন্তু সেই সেই পর্বে আমার কাব্য-ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে।"

এই 'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থ সম্বন্ধে কবি অন্যত্র আরও মন্তব্য করিয়াছেন—

"কড়ি ও কোমলের কবিতা মনের অন্তঃস্তরের উৎসের থেকে উছলে উঠেছিল। তার সঙ্গে বাহিরের কোনো মিশ্রণ যদি ঘটে থাকে তো সে গৌণভাবে।"

* * *

"কড়ি ও কোমলে যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে আর একটি প্রবল প্রবর্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব। যাঁরা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ। কড়ি ও কোমলেই তার প্রথম উদ্ভব।"

'কড়ি ও কোমল' সংশোধিত আকারে 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্ণনায় গোবিন্দচন্দ্র, বোধ করি, ইঁহাদের সকলের উপরে আসন পাইবার যোগ্য। কিন্তু সে কথার বিচারের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।

রবীন্দ্রবাবু এ পর্যন্ত গীতিকবিতাই লিখিতেছেন। অন্যদিকে তাঁহার শক্তি খেলিবে কিনা, জানি না। সুতরাং আমাদের দেশের খ্যাতনামা কবিদিগের সহিত ইঁহার তুলনা চলে না। কিন্তু একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, রবীন্দ্রবাবু বাংলা সাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়া এ যুগের অধিনায়ক হইয়া বসিয়াছেন। এখনও তাঁহার অল্প বয়স, এখনও অনেক বাকী আছে। কিন্তু এখনই তিনি কবিত্ব জগতে যে আসন পাইয়াছেন, তাহা যার-তার ভাগ্যে ঘটে না। ইঁহার আবির্ভাবের পর, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রের খণ্ড কবিতার প্রতি যে লোকের আদর কমিয়াছে, এ কথায় আর সন্দেহ নাই। এই উভয় কবিই খণ্ড কবিতা সম্বন্ধে অন্ততঃ, রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল প্রতিভার নিকট নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছেন।

'কড়ি ও কোমল'—অতি উচ্চদরের পুস্তক। কয়েকটি পদ্য ভিন্ন যেটি পড়া যায় সেইটিই চমৎকার,—কি ভাবের জমাট, কি চিন্তার ছটা, কি বর্ণনার গরিমা, সকলই আশ্চর্য। বাস্তবিকই আমরা 'কড়ি ও কোমল' পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। ইচ্ছা হয়, দুই একটি কবিতা তুলিয়া দেখাই, কিন্তু আবার মনে হয়, কোন্‌টি রাখিয়া কোন্‌টি তুলি? অধিকাংশই যখন ভাল, তখন পাঠক পুস্তক না পড়িলে কেমনে যে এ পুস্তকের সৌন্দর্য বুঝিবেন, জানি না। এই জন্য একান্ত অনুরোধ, সকলেই এ পুস্তকখানি একবার পড়েন।

আমরা নমুনাস্বরূপ দুই চারিটি কবিতা মাত্র উদ্ধৃত করিলাম।

১। পূর্ণ মিলন

নিশিদিন কাঁদি, সখী, মিলনের তরে
যে মিলন ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন।
লও লও বেঁধে লও কেড়ে লও মোরে—
লও লজ্জা, লও বস্ত্র, লও আবরণ।
এ তরুণ তনুখানি লহ চুরি করে—
আঁখি হতে লও ঘুম, ঘুমের স্বপন।
জাগ্রত বিপুল বিশ্ব লও তুমি হরে
অনন্তকালের মোর জীবন-মরণ।

বিজন বিশ্বের মাঝে, মিলনশ্মশানে,
নির্বাপিতসূর্যালোক লুপ্ত চরাচর,
লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্ন প্রাণে,
তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর।
এ কী দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্‌খানে ॥

২। স্তন

পবিত্র সুমেরু বটে এই সে হেথায়,
দেবতা-বিহারভূমি কনক-অচল।
উন্নত সতীর স্তন স্বরগ-প্রভায়
মানবের মর্ত্যভূমি করেছে উজ্জ্বল।
শিশু রবি হোথা হতে ওঠে সুপ্রভাতে,
শ্রান্ত রবি সন্ধ্যাবেলা হোথা অস্ত যায়।
দেবতার আঁখিতারা জেগে থাকে রাতে,
বিমল পবিত্র দুটি বিজন শিখরে।
চিরস্নেহ-উৎসধারে অমৃত-নির্ঝরে
সিক্ত করি তুলিতেছে বিশ্বের অধর।
জাগে সদা সুখসুপ্ত ধরণীর 'পরে,
অসহায় জগতের অসীম নির্ভর।
ধরণীর মাঝে থাকি স্বর্গ আছে চুমি
দেবশিশু মানবের ওই মাতৃভূমি ॥

চিন্তা কত গভীর, ভাব কত মহান্। কিন্তু ইহাপেক্ষা মধুর কবিতা আরো আছে। তারও দুই-একটি নমুনা দি।

১। মথুরায়

বাঁশরি বাজাতে চাহি
বাঁশরি বাজিল কই?



বিহরিছে সমীরণ,
কুহরিছে পিকগণ,

মথুরার উপবন
কুসুমে সাজিল ওই।
বাঁশরি বাজাতে চাহি
বাঁশরি বাজিল কই?

২। নদী এল বান

দিনের আলো নিবে এল
সুয্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে
চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে,
রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁশর ঘণ্টা
বাজল ঠং ঠং!

৩। অস্তমান রবি

থাম ওই সমুদ্রের প্রান্তরেখা 'পরে,
মুখে মোর রাখ তব একমাত্র আঁখি।
দিবসের শেষ পলে নিমেষের তরে
তুমি চেয়ে থাকো আর আমি চেয়ে থাকি।
দুজনের আঁখি-'পরে সায়াহ্ন-আঁধার
আঁখির পাতার মতো আসুক মুদিয়া,
গভীর তিমিরস্নিগ্ধ শান্তির পাথার
নিবায়ে ফেলুক আজি দুটি দীপ্ত হিয়া।
শেষ গান সাঙ্গ করে থেমে গেছে পাখী,
আমার এ গানখানি ছিল শুধু বাকী॥

প্রতিভা ও চিন্তার পরিচয় দিয়াছি, ভাবের পরিচয় দিয়াছি, সৌন্দর্যের পরিচয় দিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের পরিচয় এখনো বাকী! তাঁহার হৃদয়ের পরিচয়, বঙ্গভূমির প্রতি, এবং বঙ্গবাসীর প্রতি আহ্বান-গীতির প্রতি ছত্রে অমৃত অক্ষরে লেখা আছে। দুঃখিনী মাতৃভূমির ঋণ এইরূপে যদি পরিশোধ করিয়া যাইতে পারেন, তবেই রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের অক্ষয় স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

কবি বলেন—

"হাসি মুখে নিও ফুল, তার পরে হায়
ফেলে দিও ফুল, যদি সে ফুল শুকায়।"

এ ফুলও যদি শুকায়, তবে এ দেশে স্থায়ী হইবে কি, জানি না।

'কড়ি ও কোমলে' আমরা রবীন্দ্রনাথের কিছু চঞ্চলতা, কিছু বালকত্বও দেখিয়াছি। কবির লেখা কবির নিকট আদরের হইতে পারে, কিন্তু দামু বসু ও চামু বসুর পত্র আমাদের নিকট আদরের হয় নাই, এবং ক্ষোভের কারণ হইয়াছে। স্থায়ী সাহিত্যে এইরূপ ব্যঙ্গোক্তি বা অহংকারে পূর্ণ ছড়া কাটাকাটি স্থান না পাই-লেই ভাল হয়। হিংসা বিদ্বেষে যে দেশ ছারখারে চলিল, সে দেশে আবার এরূপ লেখাকেও কি স্থায়ী করিতে আছে, আমরা বড়ই দুঃখিত হইয়াছি।

এ পুস্তকে আরো কিছু সামান্য দোষ আছে। স্থানে স্থানে লেখকের মনের বিকার-কালিমার কিছু কিছু অস্ফুট ছায়া ফুটিয়াছে! সেগুলি এ পুস্তকে না থাকিলেই ভাল হইত।

শ্রীমতী ইন্দিরার নিকট কবি যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, তাহার অনেক স্থানেই বেশ কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু স্থানে স্থানে অসার কথায় পূর্ণ—এসকল পত্রগুলি অন্য পুস্তকে ছাপাইলেই ভাল হইত।

"মাগো আমার লক্ষ্মী,
মনিষ্যি না পক্ষী!
এই ছিলেম তরীতে,
কোথায় এনু ত্বরীতে!

কাল ছিলেম খুলনায়,
তাতে ত আর ভুল নাই,

কল্‌কাতায় এসিছি সদ্য
বসে বসে লিখছি পদ্য।"

এইগুলি কি না ছাপাইলেই চলিত না? এইগুলি সন্নিবেশিত করা সম্পাদকের নিতান্তই ভুল হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আর রবীন্দ্রবাবু যদি ছাপাইতে বলিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে কি এতই অহংকারী মনে করিব যে, তাঁহার সব লেখাই তিনি ছাপানোর উপযুক্ত মনে করেন? মোট কথা, আমাদের বিবেচনায় কাজটা ভাল হয় নাই।

রবীন্দ্রবাবুর দোষ-গুণের কথা অনেক বলিয়াছি, আর সংক্ষেপে বলা সম্ভবপর নয়। আমাদের আশা আছে, রবীন্দ্রবাবুর কবিতা এ দেশে অক্ষয়কীর্তিস্তম্ভস্বরূপ চিরকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

রাজা ও রাণী

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

রবীন্দ্রবাবুর 'রাজা ও রাণী' একখানি জীবন্ত কাব্য; ক্ষুদ্রে বৃহৎ মুকুর। ইহাতে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছে; এই সমস্ত চরিত্র-গুলির কেন্দ্রস্থানীয় রাজা বিক্রমদেব; ইঁহার হৃদয়বৃন্তের পারিজাত সুমিত্রা। সুমিত্রার সৌরভে সমস্ত কাব্যকানন আমোদিত; পুস্তক খুলিতেই সর্বাগ্রে সন্ধ্যা-তারাবৎ ইহার উজ্জ্বল মূর্তি পাঠকের চক্ষু আকৃষ্ট করিবে। ইঁহার কথা পরে বলিব, যাহাকে ফুটাইবার জন্য বসন্ত সমীর নিয়ত চুম্বন দান করিয়াছে,...যে প্রস্ফুটিত, যাহার লোহিত কান্তিচ্ছটায় দিক আলোকিত, সে ত চোখে পড়িবেই, —কিন্তু যাহাকে শ্যামল প্রাণের মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে তৃণগুচ্ছেরও প্রাণের সাধ, সে কেমন করিয়া কোথা হইতে ঐ ক্ষুদ্র কোমল মুখখানি বাহির করিল, যাহা আধেক দেখিয়া পাঠকের প্রাণ স্নিগ্ধ, অথচ অপরিতৃপ্ত,...এ কোমল বালিকা 'ইলা'। কবি মহিমময়ী জ্যোতির্ময়ী রাজ্ঞী 'সুমিত্রা'কে উজ্জ্বল বর্ণে আঁকিতে দু-একটি মাত্র সামান্য রেখাপাতে 'ইলা'কে আঁকিয়া গিয়াছেন। 'ইলা' বসন্ত ব্রততীর মত হৃদয়-ভারে নম্র, হইলেও, সে হৃদয়ে মেঘান্তরালে বিদ্যুতের মত তেজের অভাব নাই।

কুমারের সাহায্যে বিক্রমদেবকে উদাসীন দেখিয়া—

"তুমি নাকি পৃথিবীর রাজা!
বিপন্নের কেহ নহ তুমি!

দ্রষ্টব্য: 'রাজা ও রাণী' নাটক ১২৯৬ (আগষ্ট, ১৮৯৬) সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের পুস্তকের সহিত বর্তমান সংস্করণের (বিশ্বভারতী, ১৩৩৬) কতকগুলি প্রভেদ আছে। 'রাজা ও রাণী'র কাহিনী লইয়া কবি পরবর্তীকালে গদ্য-নাট্য 'তপতী' (১৩৩৬) রচনা করেন। তপতীর ভূমিকায় তিনি 'রাজা ও রাণী' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"রাজা ও রাণী আমার অল্প বয়সের রচনা, সেই আমার প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা'।

"সুমিত্রা ও বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে—সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে-প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হোলো, সেইটেই রাজা ও রাণীর মূলকথা।"

এত সৈন্য, এত যশ, এত বল
নিয়ে দূরে বসে রবে ? রাখিবে না তারে ?
তবে পথ বলে দাও, অবলা রমণী
আমি, তাঁর তরে জীবন সঁপিব একা।"

কুমারের দৃষ্টি যেমন সূক্ষ্ম, প্রেমের বলও তেমনি অসাধারণ, তাহা বীর-হৃদয়েও যেমন, নারী-হৃদয়েও তেমনি। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, ইলা বালিকা, তাহার এই বালিকাভাব একস্থানের একটিমাত্র কথায় যেমন ফুটিয়াছে, তেমন সমস্ত পুস্তকের মধ্যে আর কোথাও নয়। যখন সুমিত্রা কুমারসেনের মস্তক লইয়া সভায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, যখন সকলে ইন্দ্রজালদর্শকের ন্যায় স্তব্ধ, যখন প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও মনে হইতেছে,—ইহা হইতে পারে না, সেই সময়ে ইলা দ্রুতবেগে আসিয়া বিক্রমদেবের প্রতি বলিল, "মহারাজ, কুমার আমার ?" তাঁহার ত বিশ্বাস হইতেছে না। বিক্রমদেব যে কুমারের সহিত তাহার বিবাহ দিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন! তাহা কখনও অন্যথা হইতে পারে না। আজ যে বিবাহের রাত্রি! এমন কেমন করিয়া হইবে ? সে কণ্ঠে যে আজ মালা পরাইবে! তাই সে ছিন্ন কণ্ঠ দেখিয়াও আর কিছু বলিতে পারিল না, আর কোন কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না; কেবল চীৎকার করিয়া বিস্মিতের ন্যায় বলিয়া উঠিল,—"মহারাজ, কুমার আমার ?" বালিকার যে দাবী রহিয়াছে, সে কেমন করিয়া অন্য কথা বলিবে। এত আশায় এত নৈরাশ্য, সহসা এই কঠোর বজ্রসম আঘাতে (মূর্ছার স্থানে) বালিকার কোমল হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক, আমাদের বোধ হয়, তাহা হইলে অসংগত হইত না।

সুমিত্রা ও ইলা, রেবতী ও নারায়ণী, বিক্রমদেব ও দেবদত্ত, কুমারসেন ও চন্দ্রসেন, ইঁহারা সকলেই আপন আপন বর্ণে এরূপ উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়াছেন যে, আপন আপন বিভাগে বা রঙ্গস্থলে কেহই ন্যূনাতিরিক্ত নহে। সমুদায়

'রাজা ও রাণী'র উপর্যুক্ত সমালোচনাটি কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী কর্তৃক রচিত। গিরীন্দ্র-মোহিনী প্রধানতঃ বাংলা সাহিত্যে গীতি-কবিতার রচয়িত্রী হিসাবে পরিচিতা ছিলেন। তাঁহার এই সমালোচনাটি 'মানসী এবং রাজা ও রাণী' নামে প্রকাশিত হয় 'সাহিত্য' পত্রিকার ১২৯৮ সালের বৈশাখ সংখ্যায়। উক্ত সমালোচনাটি হইতে এস্থলে কেবলমাত্র 'রাজা ও রাণী'র অংশটিই গৃহীত হইয়াছে। 'রাজা ও রাণী' 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

কাব্যখানি জীবন্ত, এমন কি বৃদ্ধ ভৃত্য শংকরেরও উচ্চতা, তেজস্বিতা রাজসিংহাসন পর্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে। সমস্ত কাব্যের মধ্যে ইলার পিতা অমরুরাজ স্বতন্ত্র ছাঁচে ঢালা, তিনিই কেবল মিশ খান নাই, তাঁহাতে যেন কিসের অভাব রহিয়া গিয়াছে, আর একটু ফুটিলে ভাল হইত। তাঁহার বিকাশের ক্ষেত্রও নিতান্ত সংকীর্ণ। এইখান হইতেই কবি যেন কিছু তাড়াতাড়ি পুস্তক শেষ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। অমরুরাজ্যের ন্যায় রেবতীরও অন্তঃকরণ ক্ষুদ্র, ত্রিবেদীও এই শ্রেণীভুক্ত। কবি ইচ্ছা করিয়াই ইহাদের ক্ষুদ্র করিয়াছেন, নহিলে কাব্যের সৌন্দর্য থাকে না। তথাপি অমরু নিষ্প্রভ, রেবতী উজ্জ্বল। রেবতী ক্ষুদ্রাশয় হইলেও প্রচ্ছন্নতা জানে না। বিষকুম্ভপয়োমুখ নহে, সে গোপনে কীটের মত দংশন করে না, সে উদ্ধত ফণিনীর মত। দেবদত্ত ও নারায়ণীর কথোপকথন বেশ সরল; এই দ্বিজদম্পতি না থাকিলে, কাব্যে একটি রসের অভাব থাকিয়া যাইত। কেবল উজ্জ্বলে গম্ভীর হইত। ইঁহারা মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়া পাঠককে খুব হাসাইয়াছেন। এখন রাজা রাণীকে দেখা যাউক। সুমিত্রা রাণী হইলেও ইহার আসন রাজার অপেক্ষা উচ্চে। ইনি রাজার গৌরবে নহে, স্বীয় মহান্ হৃদয়ের গৌরবে গৌরবিণী। আপন আলোকেই বিভাসিতা। কুমারসেনের উপযুক্তা ভগিনী; অন্যদিকে বিক্রমদেবেরও উপযুক্তা পত্নী। কেহ কেহ বলেন যে, বিক্রমদেব কুমারসেনের মত, এবং কুমারসেন বিক্রমদেবের মত যদি হইত, তাহা হইলেই উপযুক্ত মিলন হইত। এ উল্টা হইয়াছে। উল্টা বটে, কিন্তু আমরা বলি ইহাই ঠিক। বিক্রমদেব যদি কুমারসেনের মত হইতেন, তাহা হইলে আদৌ এ নাটকের সৃষ্টি হইত না। তাহা হইলে আমরা এই প্রেমপূর্ণ নবনীতহৃদয় কঠোর কর্তব্যপরায়ণা প্রকৃতি বিচিত্রা সুমিত্রার উচ্চহৃদয়ের বিকাশ কি দেখিতে পাইতাম? এ উক্তি কি শুনিতে পাইতাম—

> "যে প্রেম করিছে ভিক্ষা সমস্ত বসুধা
> একা আমি সে প্রেমের যোগ্য নই কভু।"
> "এখন সময় নয় আসিও না কাছে
> এই মুছিয়াছি অশ্রু যাও রাজ কাজে।"

ইহা প্রিয়মুখাপেক্ষিণী প্রেম-বিহ্বলা নারীর উক্তি নহে, স্নেহসর্বস্বহৃদয়া জননীর কথা, রাজ্ঞীর কথা। বিক্রমদেব রাজা হইলেও তাঁহার প্রকৃতি

অনেকটা দুর্দমনীয় বালক প্রকৃতির মত। ইনি প্রেমিক, কিন্তু ইঁহার প্রেম স্বাধীন নহে, তাহা জগৎবিচরণক্ষম নহে, প্রশান্ত নহে, কেবল মহাসমুদ্রের মত আপন হৃদয়ে ভীষণ তরঙ্গায়িত। ইহার উচ্ছ্বাস অশমিত, যখন যে দিকে চলে, তখন কোনও বাধা বিঘ্ন না মানিয়া কেবলই ছুটিতে থাকে, তাহাতে শমতা নাই, স্থৈর্য নাই, ক্লান্তি নাই, ঝটিকার মত উচ্ছৃঙ্খল। তাঁহার সর্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা রাহুর মত রাণীর হৃদয়-রাকার দিকে ধাবিত। তাহা সর্বগ্রাস করিয়া জগৎ অন্ধকার করিবার জন্য লালায়িত। তাহার একটি মাত্র রশ্মিরেখা আর কোথাও পতিত হয়, তাহা তিনি সহিতে পারেন না। তাঁহার প্রজা উৎপীড়িত, দেশে দুর্ভিক্ষ, রাজ্য শত্রুহস্তগত, তথাপি তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। রাণী তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে যাইতে বলিলে—

রাজা,—"ভীম্ যুদ্ধে যাব আমি, কিন্তু তার আগে
তুমি মান অধীনতা, তুমি দাও ধরা ;
ধর্মাধর্ম, আত্মপর, সংসারের কাজ,
সব ছেড়ে হও তুমি আমারি কেবল
তবেই ফুরাবে কাজ, তৃপ্তমন হয়ে
বাহিরিব বিশ্বরাজ্য জয় করিবারে !
অতৃপ্ত রাখিবে মোরে যতদিন তুমি
তোমার অদৃষ্ট সম রব তব সাথে !"

কি ভয়ানক ! কিন্তু রাণী ত বুঝিতে পারেন না যে, কেমন করিয়া আবার তিনি তাঁহার হইবেন। রাজ্ঞী যে অনন্ত নীলাকাশের পূর্ণচন্দ্র ! সমুদ্রহৃদয়ে পড়িয়া তিনি নিয়তই চঞ্চল !

সুমিত্রা। "আজ্ঞা কর মহারাজ মহিষী হইয়া
আপনি প্রজারে আমি করিব রক্ষণ !"

বিক্রম "এমনি করেই মোরে করেছ বিকল !
আছ তুমি আপনার মহত্ত্ব শিখরে
বসি একাকিনী আমি পাইনে তোমারে
দিবানিশি চাহি তাই ! তুমি যাও কাজে,
আমি ফিরি তোমারে চাহিয়া ! হায় হায়,
তোমায় আমায় কভু হবে কি মিলন ?"

ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। রাজারাজড়াদের মধ্যে এরূপ স্বভাব নিতান্ত বিরলও নহে। যাহার হৃদয়ে সাহারার তৃষ্ণা, সে সমুদ্র শোষণের জন্য ব্যস্ত না হইবে কেন? ইহা অবশ্য রাজার চিত্র নহে। যাঁহার হস্তে সহস্রের ভার অর্পিত, তাঁহার আত্মশাসন কই, মহান্ আত্মত্যাগ কই?…রাজাতে লোকে অবশ্য ইহাই দেখিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এখানে কবির উদ্দেশ্য কি, দেখা আবশ্যক। বিক্রমদেবের মধ্যে কবি একটি বেগবান হৃদয়ের গতি কিরূপ, তাহাই আঁকিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; বলা বাহুল্য, তাহাতে সফলও হইয়াছেন। তিনি বিক্রমদেবকে আমাদের নিকটে আদর্শ রাজা বলিয়া উপস্থিত করেন নাই। রাজার প্রকৃতির মধ্যে একটি অন্ধতা দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। রাজাকে প্রেমিক ও সহৃদয় বলিয়া আমাদের বিলক্ষণ বিশ্বাস। অবস্থা বিশেষে, মনের আবেগে, হৃদয়বান্ ব্যক্তি কোনও কঠিন কর্ম অনায়াসেই করিয়া ফেলিতে পারেন, কিন্তু তজ্জন্য অনুতপ্ত হওয়াও সে প্রকৃতির লক্ষণ। কোনও কার্য করিয়াই প্রায় তাঁহাকে আমরা তেমন অনুতাপ করিতে দেখি না। প্রেমপ্রবণ হৃদয়ের স্বভাবই ক্ষমা। প্রেমবৃত্তির নিকটে অন্যান্য সকল বৃত্তিই দুর্বল। রাজা নিজেই তাহা একস্থানে বলিয়াছেন—

"প্রেম এই হৃদয়ের স্বাধীন কর্তব্য
সকল কর্তব্য চেয়ে প্রেম গুরুতর!"

গৃহত্যাগের পর যুদ্ধ জয় করিয়া রাণী আসিয়াছেন শুনিয়া রাজা বলিতেছেন—

"কে এসেছে! কারে বন্দী লয়ে?
এসেছে কি আমারে করিতে বন্দী?"

রাজা মুখে যাহাই বলুন, তাঁহার অন্তর যে ধূমায়িত, তাহা বেশ বোঝা যায়। রাণী রাজার সাক্ষাৎ প্রার্থিনী হইলে তিনি বলিয়া উঠিলেন—

"সাক্ষাৎ? কাহার সাথে? রমণীর সনে
সাক্ষাতের এ নহে সময়!
বন্ধ কর দ্বার—এ শিবিরে শিবিকার
প্রবেশ নিষেধ!"

এ নিষ্ঠুরতা তখন কতকটা অভিমান, কতকটা রোষ, বাকীটা পুরুষহৃদয়ের গর্বময় ঔদ্ধত্য সঞ্জাত, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু তাহার পর এ নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানের পর, প্রেমিকের পশ্চাত্তাপ কই? প্রেমিক-শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র

কঠোর কর্তব্যের অনুরোধে প্রাণপ্রতিমা সীতাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহাতে প্রেমিকোচিত পশ্চাত্তাপের অভাব ছিল না। সীতার স্বর্ণময়ী প্রতিকৃতি পার্শ্বে রাখিয়া তিনি যজ্ঞ সমধা করিয়াছিলেন। যদিও আমরা ইহাতে দেখিতে পাই, রাজা যুদ্ধ ব্যপদেশে রাণীকে ভুলিতে প্রয়াস পাইতেছেন এবং তাহাতে কৃতকার্যও হইতে পারিতেছেন না, তথাপি তেমন প্রেমের এমন পরিণতি দেখিয়া তৃপ্তি হয় না।

ত্রিচূড় প্রমোদবন দেখিয়া স্বপ্নের মত তাঁহার পূর্বস্মৃতি একবার জগিয়া উঠিয়াছিল—

"এমনি নিভৃত সুখ ছিল আমাদের
গেল কার অপরাধে! আমার কি তার!
যারি হোক, এ জনমে আর কি পাব না
খুঁজে, মাঝখানে সহসা হারায়ে গেল
সুখের প্রবাহ কিছুতে পাব না তারে!"

কিন্তু পাইবার চেষ্টা কই?

"চিরজন্ম কেবলি শুনিব, দূর হতে
শুধু তার অবিশ্রাম কল্লোল ক্রন্দন!
যাও তবে একবারে চলে যাও দূরে!
দেখা যাক, যদি এইখানে—সংসারের
নির্জন নেপথ্য দেশে পাই নবপ্রেম,
তেমনি অতলস্পর্শ তেমনি মধুর!"

পরে ইলাকে দেখিয়া—ইহার মধ্যে স্বীয় নিষ্ঠুরতার জন্য অনুতাপ নাই।

"একি অপরূপ মূর্তি! চরিতার্থ আমি!
উঠ উঠ হে সুন্দরি! তব পদস্পর্শ-
যোগ্য নহে এ ধরণী।
তুমি কেন ধুলায় পতিত? চরাচরে
কিবা আছে অদেয় তোমায়?"

ইহা পুরুষ-হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাব হইতে পারে, কিন্তু প্রেমিক-হৃদয়ের নহে। প্রণয়পাত্র কখন এত তুচ্ছ হইতে পারে না। ইহাতেই আমরা

বিক্রমদেবের অপরাপর গুণ থাকা সত্ত্বেও, তাঁহাকে আত্মবিস্মৃত বালক প্রকৃতি বলিতে বাধ্য হইয়াছি।

যাহা হউক, ইলার সমক্ষেই রাজার হৃদয়ের গুপ্তপ্রেম জাগিয়া উঠে এবং সেইখানেই সেই প্রেমের আদেশে তিনি আত্মত্যাগে দীক্ষিত হন। এইখানেই রাজার মহান্ হৃদয়, মেঘমুক্ত গিরিচূড়ার ন্যায় পাঠকের চক্ষে প্রতিভাত হয়। এইখান হইতেই তাঁহার চঞ্চলতা শমিত, উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়মিত, বুদ্ধি স্থিরীকৃত হয়। কুমারসেনের প্রতি ইলার অটল প্রেম দেখিয়া বিক্রমদেব বলিতেছেন—

"কি প্রবল প্রেম! ভালবাস, ভালবাস,
এমনি সবেগে চিরদিন। যে তোমার
হৃদয়ের রাজা, শুধু তারে ভালবাস!
প্রেমস্বর্গচ্যুত আমি! তোমাদের দেখে
ধন্য হই! দেবী চাহিনে তোমার প্রেম;
শুষ্ক শাখে ঝরে যায় ফুল, অন্য তরু
হতে ফুল ছিঁড়ে কেমনে সাজাব তারে?
আমারে বিশ্বাস কর—আমি বন্ধু তব;
চল মোর সাথে, আমি তারে এনে দেব,
সিংহাসনে বসায়ে কুমারে তার হাতে
সঁপি দিব তোমারে কুমারি!"

ইহাই ত প্রেমিকের কথা! ইহাই রাজার যোগ্য উক্তি! এইখানেই বিক্রম-দেবের বিকাশ! সহসা এ পরিবর্তন অবশ্য ইলার বিনীত, নম্র, প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের গুণেই বলিতে হইবে।

কেহ বলেন, সুমিত্রার অশ্বারোহণে বহির্গমন এবং ছিন্ন মুণ্ড লইয়া যাওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অসামাজিক কার্য। উত্তরে আমরা ইহাই বলিতে পারি, যে সময়ের এবং যে জাতির কথা লইয়া কবি এ নাটকখানি লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের আধুনিক হিন্দুসমাজ নহে এবং রাণী সুমিত্রাও শাঁখা-সাড়ী-পরিহিতা বাঙ্গালিনী নহেন। তিনি রাজপুত মহিলা। অশ্বারোহণ, অস্ত্রধারণ প্রভৃতি কার্য তদানীন্তন মহিলাগণের শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। স্নেহময় ভ্রাতার ছিন্ন মুণ্ড বহিয়া লইয়া যাওয়া, কোমল-হৃদয়া রমণীর পক্ষে অতি কঠিন কার্য, স্বীকার করি। কিন্তু জগতে অসম্ভবও কিছু নাই! উদয়সিংহের ধাত্রী পান্না

রাজবংশ-রক্ষার্থে, উদয়সিংহের পরিবর্তে, জননী হইয়া স্বহস্তে স্বীয় সন্তানকে মৃত্যুর করাল ক্রোড়ে শায়িত করিয়াছিল।...অবস্থা বিশেষে অসংগতও সংগত হয়, অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে। এইবার আমরা কুমারসেনের সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইব। বিক্রমদেবের তুলনায় কুমারসেনকে আমাদের উচ্চ বলিয়া মনে হয়। ইঁহার স্থির, ধীর, প্রশান্ত হৃদয়ের এক দিকে কর্তব্যপরায়ণতা, অপর দিকে স্নেহপ্রবণতা। ইনি পুরুষের মত রোষকম্পিত হইয়াও রমণীর মত ক্ষমা করিতে পারেন। ইনি স্বাধীন, ইঁহার নিজের লাগাম সর্বদাই নিজের হাতে। ইঁহার প্রেম বিশ্বাসশীল! জ্যোৎস্না রজনীর মত প্রশান্ত, স্নিগ্ধ, নির্মল, স্বর্গীয়! ইঁহাদের উভয় ভ্রাতা ভগিনীর চরিত্র, পুরুষ ও নারী উভয়গুণের বিচিত্র সংমিশ্রণ!

বস্তুতঃ, 'রাজা ও রাণী' ভাবের গাম্ভীর্যে, শব্দমাধুর্যে ও পূর্ণপ্রাণতায় সাহিত্য-সংসারে একখানি উচ্চদরের গ্রন্থ। আমরা রবীন্দ্রবাবুর নিকটে এক্ষণে গীতি-কবিতা অপেক্ষা এইরূপ গ্রন্থের অধিক আশা করিয়া থাকি।

রাজা ও রাণী

নিত্যকৃষ্ণ বসু

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নাটকের আলোচনা আমরা প্রায়ই করিয়া থাকি। আজও উহার পাতা উণ্টাইয়া এখানে-সেখানে দেখিতেছিলাম। সমগ্র পুস্তকের মধ্যে চারিটি কি পাঁচটির বেশী ভাল এবং spirited passage নাই। আমি সেই চারি-পাঁচটির স্থল সর্বদাই পাঠ করিয়া থাকি। কিন্তু আজ সে কথা লেখা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি আজ তাঁহার অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে আপত্তি করিতে চাই। রবীন্দ্রনাথ একদিন স্বীকার করিয়াছিলেন বটে যে, তিনি অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে যে নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা সমীচীন নহে। তথাপি মনের ভিতর আজ যে কথাটা জাগিতেছে তাহা লিখিয়া রাখায় কোন দোষ নাই। রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর অধিকাংশ স্থলেই চতুর্দশাক্ষর-পরিমিত মাপ-কাঠির সাহায্যে কাটিয়া লওয়া সাধারণ গদ্য মতে। বাক্যের আরম্ভ এবং শেষ সম্বন্ধে তিনি প্রায়ই দৃষ্টিহীন। মাঝখানটাকেও সব সময়ে বাদ দেওয়া যায় না। স্বীকার করি, গল্পের গদ্যময় সামান্য অংশগুলাকে কাব্যের ভাষায় আবৃত করা অনেক সময়েই অসম্ভব। আর অসম্ভব না হইলেও তাহা সর্বস্থলে বাঞ্ছনীয় নহে। উহাতে ভাষা যেন কতকটা কৃত্রিম (affected) হইয়া

দ্রষ্টব্য: নিত্যকৃষ্ণ বসু (১৮৬৫-১৯০০) নিতান্ত অল্প বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি তাঁহার ডায়েরী বা দিনলিপির মধ্যে যে সমসাময়িক সাহিত্য-চিন্তার উপকরণ রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর বন্ধু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী' নামে 'সাহিত্য' পত্রিকায়, ১৩১০-১১ ও ১৩১০-১৫ সালে প্রকাশ করেন। এই ডায়েরীর অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কীয় আলোচনার অংশ হইতে 'রাজা ও রাণী' অধ্যায়টি এস্থলে গৃহীত হইয়াছে।

এই ডায়েরীতে নিত্যকৃষ্ণ বসু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কতকগুলি মন্তব্য করেন। প্রসঙ্গতঃ এস্থলে দুইটি উদ্ধৃত করা হইল—

"···ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের উদয় হইয়াছিল, কিন্তু আমি তাহার কোনও খবর পাই নাই। ক্রমশঃ তাঁহার সহিত পরিচিত হইলাম। প্রথম প্রথম সর্বস্থলে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতাম না। তথাপি সেই উদীয়মান রবির অপূর্ব আলোকে আমার হৃদয়বাষ্পের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র সম্প্রদায় কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।"

পড়ে। কিন্তু তথাপি, আমার বিশ্বাস যে, কবি সাবধান হইলে উভয় দিক বজায় রাখিয়া চলিতে পারেন।

'রাজা ও রাণী'র অধিকাংশ চরিত্রই কতকটা রহস্যময়। যেন আগাগোড়া সঙ্গতি নাই! প্রথমে বিক্রমদেবের চরিত্র ধরা যাক। বিক্রমদেব বিলাস-পরায়ণ বটে। প্রেমের গাম্ভীর্যের অপেক্ষা উদ্দামতাই তাঁহাতে বেশী বর্তমান। প্রকৃত প্রেম যে কর্মাত্মক ও বুদ্ধিবৃত্তিমূলক, ইহা তিনি বুঝিতে পারেন না। তিনি উহাকে কেবল ক্রিয়াহীন ভোগের বলিয়াই জ্ঞান করেন। এরূপ চরিত্রের বিপরিবর্তন দেখাইতে হইলে উহাকে কর্মক্ষেত্রে আনিয়া ফেলিতে হয়। কবিও তাহা করিয়াছেন। আবার মাঝে মাঝে তাঁহার হৃদয়ে সে পুরাতনের স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে, কবি তাহাও দেখাইয়াছেন। ইহা স্বভাবিক। কিন্তু কবিকে অবশেষে একটু ভ্রান্ত দেখিতে পাই। কবি বিক্রমকে আবার 'নব প্রেমে'র জন্য ক্ষেপাইয়া তুলিলেন কেন? ইলার প্রতি বিক্রমের প্রেমটা নিতান্ত ইতর জনোচিত হইয়াছে। বিক্রমকে ইতর করা বোধ হয় কবির উদ্দেশ্য নহে। আবার যখন বিক্রম শুনিলেন যে ইলা অন্যের প্রতি আসক্তা, অমনি তিনি ঘুরিয়া পড়িয়া পুনর্বার সেই পুরাতনের পশ্চাতে ছুটিলেন। বিক্রম চরিত্রে এরূপ চাঞ্চল্যের কিছুতেই সামঞ্জস্য হয় না। যে ছিল কেবল স্বপ্নময় আর চিন্তাময়, কবি তাহার

"...পুরাতনের জীর্ণ কুটীর হইতে হঠাৎ নূতনের বিস্তীর্ণ সৌন্দর্য-গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ [illegible]ই বাঙলার বর্তমান কবিকুলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু সে মোহ বেশীদিন স্থায়ী হইল না। আমার প্রথম-প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থে রবীন্দ্রের পদ্ধতি অনেকটা লক্ষিত হইবে।"—সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ—১৩১১।

'রাজা ও রাণী' সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কান্তকবি রজনীকান্ত সেন মুমূর্ষু অবস্থায় মেডিকেল কলেজের কটেজে থাকাকালীন, একদিন কবিবর রবীন্দ্রনাথ কান্তকবির আহ্বানে মৃত্যুশয্যাশায়ী কবির নিকট উপস্থিত হইলে, 'রাজা ও রাণী' প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অংশটি সেন কবি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—

"এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে নাকি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়?"

পরিণাম শক্তিময় আর কমময় করিতে পারেন। ইহাতেই বিক্রমের জয়। অথবা, তাহাকে কেবল ঘটনাস্রোতে ভাসাইয়া দিয়া, কবি তাহার পরাজয়ও দেখাইতে পারিতেন। কিন্তু আমরা বিক্রমকে অব্যবস্থিতচিত্ত দেখিবার আশা করি নাই। কুমারসেনের চিত্রও এইরূপ অসঙ্গত। বাহুবল ও প্রেমবলের আধার বীর কুমারসেনের মুণ্ডটা যে আমরা অবশেষে একটা থালের উপর আমজামের 'তত্ত্বের' ন্যায় দেখিব, এমন আশা করি নাই। আর সুমিত্রা যে শেষে ভ্রাতৃহত্যারূপ একটা মহাপাপ করিবে, ইহাও নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অনাবশ্যক। নাটক লিখিতে হইলে সম্পূর্ণ আত্মবিলুপ্তির প্রয়োজন; রবীন্দ্রবাবু আপনাকে ভুলিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার চরিত্রগুলিতে তাঁহাকেই ছদ্মবেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ পরে এক পত্রে ঐ প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করিয়া কান্তকবিকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন—

"সুখদুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারের প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোট এই মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না? শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই।"...

মন্ত্রি-অভিষেক

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

শক্তিশালী সহোদরদ্বয়—দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যের শান্ত ছায়ায় বিচরণ করেন, ক্রীড়া ও কার্য করেন; সম্প্রতি রাজনীতির রঙ্গাকাশে সমুদিত; দৃশ্য সুন্দর, বঙ্গভূমি আশা করে উহা কার্যকরও হইবে। প্রখর বুদ্ধি পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর বৃটীশ-বঙ্গের প্রথম রাজনৈতিক দলের প্রধান ব্যক্তি। ঠাকুর বংশ আমাদের মধ্যে পাশ্চাত্য আলোক বিস্তারের 'পায়োনিয়ার'। দ্বারকানাথের বংশধরগণ বংশের মুখ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিতেছেন।

সাহিত্যে, সংসারে থাকিয়া, সংসারকোলাহল হইতে দূরে থাকে। সাহিত্যের কামনা—শান্তি। স্বভাবতই সে কামনা। সুতরাং সাহিত্য-সেবকগণ রাজনীতির কোলাহলময় কোন্দলে কদাচিৎ যোগ দিয়া থাকেন। কিন্তু সংসারের লোক তাঁহাদের রাজনৈতিক মতামত শুনিতে এবং জানিতে সর্বদাই কৌতূহলাক্রান্ত। তাহার কারণ সুস্পষ্ট।

সাহিত্য-সেবক ও সাহিত্যকারের চিন্তা, অন্যান্য অনেক শ্রেণীর লোকের চিন্তা অপেক্ষা স্বভাবতই সুদূর-ব্যাপিনী। সে চিন্তাধারা রাজনৈতিক প্রশ্ন-

---

দ্রষ্টব্য: 'মন্ত্রি-অভিষেক' পুস্তিকাটি এমারেল্ড নাট্যশালায় লর্ড ক্রসের বিলের প্রতিবাদে আহূত বিরাট জনসভায় রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পঠিত হয় (ইং ১৫ই মে, ১৮৯০)। পুস্তিকার প্রকাশকাল ২ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭ সাল। প্রথমে ইহা 'ভারতী ও বালক' মাসিক পত্রিকার ১২৯৭ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতার ব্যাপারে ইহা একটি প্রাথমিক ঘটনা। এ সম্বন্ধে কবির মূল বক্তব্য ছিল, গভর্ণমেণ্টের দ্বারা মন্ত্রিনিয়োগ অপেক্ষা সাধারণ লোকের দ্বারা মন্ত্রি-অভিষেক অনেক কারণে আমাদের নিকট প্রার্থনীয় মনে হয়। এই পুস্তিকাটি 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র অচলিত দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পাইয়াছে। কবি এ সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন—

> "...যখন 'মন্ত্রি-অভিষেক' প্রবন্ধটি লিখেছিলুম তার পরে এখন কালের প্রকৃতি বদলে গেছে, তাই এ লেখাটি এখনকার মনের মাপে মিলবে না। দুই কালের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে তখন রাজদ্বারে আমাদের ভিক্ষার দাবি ছিল অত্যন্ত সঙ্কুচিত। আমরা ছিলুম দাঁড়ের কাকাতুয়া, পাখা ঝাপটিয়ে চেঁচাতুম পায়ের শিকল আরো ইঞ্চি কয়েক লম্বা করে দেবার জন্যে। আজ বলচি দাঁড়ও নয় শিকলও নয় পাখা মেলব অবাধ স্বরাজ্যে।

বিশেষ বা ঘটনা-বিশেষ কিরূপ ভাবে গৃহীত ও চিন্তিত হয়, তাহা জানিতে কাহার না বাসনা থাকে? পুনশ্চ,—সাহিত্যকার সদা সর্বক্ষণ সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত; অথচ তাহাদের বৈষয়িক ব্যাপারে,—তাহাদের সাময়িক কোন্দল কোলাহলে একরূপ নির্লিপ্ত। কাজেই কৌতুহল আরও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

রাজনীতির দৈনিক সংগ্রামে, সাহিত্যের উপাসক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনেক সময়েই প্রবেশ করেন না। প্রায়ই তাহা হইতে তাঁহারা 'প্রচ্ছন্ন' থাকেন; কিন্তু রাজনীতির, কেবল রাজনীতির কেন, সকল নীতিরই মূল বীজ বপন করেন তাঁহারা। তাঁহারা অনভিব্যক্ত অধিনায়ক,—অদৃশ্য অভিনেতা।

চেলসির রুদ্ধদ্বার কুটীর-কক্ষে কারলাইল ধ্যান-নিমগ্ন, কিন্তু কে বলিবে, মানবীয় কার্যক্ষেত্রে তাহাদের নৈতিক রাজ্যে কারলাইল কর্তৃত্ব করেন নাই? ভারতীয় আর্যঋষি নিবিড় অরণ্য-নিবাসে লুক্কায়িত থাকিয়া সাম্রাজ্য শাসনের সর্বময় প্রভুত্ব করিতেন। সাহিত্যের স্বভাব-জাত সন্ততি রুশো ও ভিক্তর হুগো; তাঁহারা, সাহিত্য মাত্র উপজীবী, কিন্তু রাজনৈতিক জগতে কি মহা আলোড়নই না উত্থিত করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন।

সাহিত্যাচার্যগণ রাজনীতির উনকোটি, খুঁটি-নুটি লইয়া নাড়াচড়া করেন না; কিন্তু যাহা রাজনীতির বা প্রজ্ঞানীতির মৌলিক পদার্থ, তাহা সাহিত্য হইতে অলক্ষ্যে উদ্ভূত ও বিপতিত হইয়া জনসাধারণের মধ্যে অলক্ষ্যে বিস্তার-লাভ করে।

> তখন সেই ইঞ্চি-দুয়েকের মাপের দাবি নিয়েও রাজপুরুষের মাথা গরম হয়ে উঠত। আমি সেই চোখ রাঙানির জবাব দিয়েছিলুম গরম ভাষায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে এ ছিল আমার ওকালতি সেকালের পরিমিত ভিক্ষার প্রার্থীদের হয়ে। 'আবেদন আর নিবেদনের থালাকে' তখনো আমি অশুচি বলে মেনেছি, এবং তৎকালীন কন্‌-গ্রেসের বিনয় দীনতা আমার হাতে ভর্ৎসনা পেয়েছে। এই কথা প্রমাণের জন্য তখনকার সাংবাদিক দলিল থেকে দিন ক্ষণ তারিখের উদ্ধারের ভার রইল তাঁদের 'পরে যাঁরা কাটা ফসলের পুরানো ক্ষেতে উঞ্ছবৃত্ত সংগ্রহে সুদক্ষ।"—'শনিবারের চিঠি', মাঘ, ১৩৪৬।

মন্ত্রি-অভিষেকের এই সমালোচনাটি বিগত শতাব্দীর অন্যতম সমালোচক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় 'নব্যভারত' পত্রিকার পৌষ, ১২৯৭ সালে প্রকাশ করেন।

পৃথিবীতে যাঁহারা প্রভুশক্তিসম্পন্ন, তাঁহারাই প্রয়োগকর্তা। প্রয়োগকর্তা রাজা, সাম্রাজ্য-শাসন-সচীব এবং সমাজের অধিনেতৃগণ। সাহিত্য বিজ্ঞানে উদ্ভাবন করে, শিল্পে সংগঠন করে;—শাসয়িতাগণ করেন প্রয়োগ। সংসারের প্রয়োগকর্তাদিগের পদবী সর্বোচ্চ। শিল্প-বিজ্ঞানের আবিষ্কার, সাহিত্যের সত্য, সংসারে প্রযুক্ত ও প্রচারিত না হইলে তাহা প্রায় কিছু-নয়ের মধ্যে,—অতএব তাহা,—সমাজের হিতার্থে বা সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি অর্থে,—কার্যে প্রযুক্ত ও কার্যে প্রযুক্ত হইয়া জনসাধারণে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। শিল্প ও বিজ্ঞানের কীর্তি ও সাহিত্যের মুক্তি, প্রচার করেন, কার্যে পরিণত ও প্রয়োগ করেন,—শাসয়িতা, সচীব ও সামাজিকগণ। ইঁহারা কর্মী। কর্মীর হস্তে সভ্যতার অনুষ্ঠান, কবির মস্তিষ্কে তাহার উপাদান। কবি অর্থে বৈজ্ঞানিক, শিল্পী ও সাহিত্যকার কোম্পানীকে বুঝিবে।

কবিবর বায়রণ, কবি অপেক্ষা কর্মীর পক্ষপাতী ছিলেন, বায়রণ এবং শেলি উভয়ই ঘোর প্রজাতান্ত্রিক ছিলেন। মহাকবি মিল্টন প্রজানৈতিক রাজ্যের সেবক নহেন, সম্পাদকত্ব করিয়াছিলেন। মিল্টন কবি এবং কর্মী। বায়রণ এবং শেলীর নাম কর্ম জগতে প্রকাশ্যে প্রচারিত তত নহে। না হউক। বায়রণ শেলীর নাম য়ুরোপীয় সাধারণতন্ত্রের সূক্ষ্ম-দেহে গভীর অঙ্কিত। বায়রণ এবং শেলি নীরবে রাজনৈতিক সংস্কারের মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সাম্য স্বাধীনতার যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অঙ্কুরিত হইয়া ফুল-ফলবান বৃক্ষে পরিণত হইতে এখনও বহুযুগ বাকী আছে।

অসাধারণ লোক অপেক্ষাকৃত অতি অল্পই জন্মেন। কিন্তু সংসারে অসাধারণকেও সাধারণ কার্য করিতে হয়, করা উচিত, না করা প্রত্যবায়। সেক্ষপীয়র অসাধারণ কবি। কিন্তু সাধারণ কার্য, সাধারণের অতি সামান্য কার্যও সেক্ষপীয়র করিয়া গিয়াছেন, করিয়া গিয়াছেন বলিয়া কি সেক্ষপীয়র অসাধারণ নহেন? কবি হইলেই যে তাঁহাকে ঘর-গৃহস্থলীর কিছুমাত্র কর্ম করিতে নাই, ক্রমাগত 'কুঞ্জ-কাননে' বসিয়া কোকিলের ডাক শুনিতে হয়, এমনতর কোন কথা নাই। কবিরও কর্মী হওয়া উচিত।

সেক্ষপীয়র, মিল্টন মহা-কর্মী। আমাদের ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্র কবিকঙ্কণও কোন্ কর্মী নহেন? তিনি রাজনৈতিকও কোন্ নহেন—প্রজানৈতিকও কোন্ নহেন? কবিকঙ্কণ বাঙালীর কবি, ঐতিহাসিক, পুরোহিত, প্রতিনিধি—সব।

যেমন পুরী তেমনি পুরোহিত, যেমন প্রকৃতির লোক; তেমনি প্রতিনিধি; তাহার অন্যথা হয় নাই বলিয়া যাহারা নাসিকা কুঞ্চিত করে, তাহারা নির্বোধ। মুকুন্দরাম যদি মন্দ হয়েন, সে দোষ মুকুন্দরামের নহে, সে দোষ তৎকালিক বাঙালী জগতের মনুষ্যের।

বৃহতের সহিত ক্ষুদ্রের তুলনা করিলে বলা যায়, বায়রণ শেলির ন্যায় আমাদের হেম-নবীনও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অলক্ষ্যে কিঞ্চিৎ কার্য করিয়াছেন। আনন্দমঠের কবিও কিঞ্চিৎ করিয়াছেন। স্বীকার করুন বা না করুন, বাঙালীর অদ্যকার এই কংগ্রেস উপরোক্ত কবি-কার্য পরম্পরার নিকট কিয়ৎ-পরিমাণে ঋণী।

ঠাকুর ভ্রাতৃ-যুগল সৎ-প্রকৃতির সুসন্তান, সদ্বিদ্যায় শিক্ষিত;—তাঁহারা সম্পদের সুললিত ক্রোড়ে বর্ধিত ও পালিত। অতএব স্বভাবতঃ এবং শিক্ষাবশতঃ তাঁহারা সুখ-সরলতার সুস্বাদু দুগ্ধময়। তাঁহারা সংসার ক্লেশের ন্যায় বিষয়ীর বৈষয়িক চতুরালীতেও অনভ্যস্ত। শুনিয়াছি তাঁহাদিগের 'সঙ্গ' সংসারের সাধারণ 'সঙ্গ' হইতে বিলক্ষণ স্বতন্ত্র,—সাধারণতঃ দৈনিক পৃথিবীর তুলনায় তাঁহাদের অধিবাসিত পৃথিবীটুকু যেন অভিনব।

জীবন-যাত্রার জ্যোৎস্নাময় পথের পথিক, তাঁহারা নৈসর্গিক শোক-সন্তাপ অবশ্যই সহ্য করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু কঠোর সংসারে সন্তরণ-কারী জীবের যাহা অবশ্যম্ভাবী অদৃষ্ট, সেই অনিবার্য নিত্য অভাবের দারুণ দংশন কখনও সহ্য করেন নাই,—স্বতঃ করেন নাই,—পরতঃ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া হয়ত অনুভবও করেন নাই; সেই জন্যই বোধ হয় কবি রবীন্দ্রনাথ কবি মুকুন্দরামের কাব্যে কবিতা উপভোগ করিতে সম্যক সক্ষম হয়েন না। কল্পনার কবি, কার্যের কবিকে বুঝেন না, ইহা এক আক্ষেপ। কিন্তু সে আলোচনার অবকাশ এখানে নাই।

স্বাভাবিক বুদ্ধিশক্তি সর্বত্রই সমান কার্য করে। বিচক্ষণতা ধর্মমঞ্চের ন্যায় বৈষয়িক বেঞ্চেও বিচক্ষণতা। সাহিত্য-সেবক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিগত কতিপয় বৎসর হইতে ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য। সম্প্রতি তিনি 'জমিদার পঞ্চায়তে'র সম্পাদক। 'জমিদার পঞ্চায়ৎ' এক বৈষয়িকী সভা। ব্রাহ্মসমাজস্থ বেদীতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষ বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, বৈষয়িকী সভার সম্পাদক রূপেও তিনি অল্প বিচক্ষণতার আভাস দেন নাই। 'বিষয়কার্যে'

অতীব তীক্ষ্ণবুদ্ধি বলিয়া যাঁহারা বিশিষ্ট এবং অনবরত বিষয়-ব্যাপারে নিরত, তাঁহাদের কাহারও কাহারও অপেক্ষা বিষয় ব্যাপারে নূতন ব্রতী জমিদার পঞ্চায়তের সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পঞ্চায়তের কার্যপ্রণালী পরিচালনা করে অধিকতর পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন।

বিষয়ীরূপে দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রথম দৃষ্ট পাঞ্চায়ৎ গৃহে। পরন্তু তিনি 'মরকত-গৃহে' প্রজানৈতিক রাক্ষসী সভার সভাপতি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজনৈতিক বক্তৃতার আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। অতএব এস্থলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই পাঠকের সম্মুখে রীতিমত উপস্থিত করি। কারণ তিনিই এ প্রবন্ধের প্রধান নায়ক।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য 'মনোনয়ন' পদ্ধতির খণ্ডন ও 'নির্বাচন' প্রস্তাবের অনুমোদন জন্য উপর্যুক্ত প্রজা-সভা। সভার সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ;—সভায় সম্রাজ্ঞীর কলিকাতা-নিবাসী অগণিত সংখ্যক প্রজা সমুপস্থিত ;— সভার বহুতর বক্তাদিগের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জনৈক বক্তা। বক্তাদিগের অনেকেই ইংরাজীতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন ; স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রনাথও ইংরাজীর দৌরাত্ম্য পরিহার করিতে পারেন নাই ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা বাংলায়। ইহা বাঙালীর ও বাংলা ভাষার অহংকার এবং রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট গৌরব।

রবীন্দ্রবাবুর এই রাজনৈতিক বক্তৃতা 'মন্ত্রি-অভিষেক' নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা বোধ করি ইহাই প্রকৃত প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথের প্রথম রাজনৈতিক সন্দর্ভ। কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি আধ-সাহিত্যিক, আধ-রাজনৈতিক ও সামাজিক রকমের বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার নাম—(স্মৃতি-শক্তি যদি আমাদিগকে প্রবঞ্চিত না করিয়া থাকে) 'হাতে-কলমে'। হাতে-কলমে বিদ্রূপে ও রহস্য-রসিকতায় 'রগরগে'। সুকোমল কবিতার উৎস রবীন্দ্রনাথ বিদ্রূপ করিতেও বিশিষ্ট-হস্ত। তাঁহার 'হাতে-কলমে' ছোটখাট গোছের একখানা ব্যঙ্গকাব্য। 'হাতে-কলমে'র লেখক রাজনৈতিক গলাবাজির প্রতি এবং তথাকথিত constitutional agitation-এর প্রতি এমনতর এক কটাক্ষ করিয়াছিলেন যে, সে কটাক্ষ,—সে কোমল-কুটিল কটাক্ষ অনেকের আমরণ মনে থাকিবার কথা। কিন্তু 'হাতে-কলমে'র লেখক এবং 'মন্ত্রি-অভিষেকে'র বক্তায়, এই কতিপয় বৎসরমাত্র সময়ে যেন কিঞ্চিৎ ভিন্নতা ঘটাইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইল। এই 'ভিন্নতা'—সাময়িক স্রোত ধরিয়া হিসাব করিলে উন্নতির দিকে বলিতে হয়।

'হাতে-কলমে'র কর্তা রবীন্দ্রনাথ যাহার দোষ ঘোষণা করিয়াছেন, মন্ত্রি-অভিষেকের বক্তা রবীন্দ্রনাথ তাহারই অতি সুন্দর সমর্থন করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

বাঙ্গালী বড় 'বাক্যবাগীশ' হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া অনেকে ব্যঙ্গ করে, সাহেবেরা তো করেনই,—স্বদেশীয় বিজ্ঞেরাও করেন; 'হাতে-কলমে'র কবিও খুব কঠিনরূপে করিয়াছিলেন,—করার যে কারণ নাই, তাহা বলিতেছি না; তবে মন্ত্রি-অভিষেকের বক্তা সেবিষয়ে কি বক্তৃতা করিয়াছেন শুনুন।

'ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী ষড়যন্ত্রকারী বাবু সম্প্রদায়', 'মুখ-সর্বস্ব বাক্যবীর' ইত্যাদি বিশেষণের মধ্যে আপন গাত্রজ্বালা নিহত করিয়া চতুর্দিক হইতে সশব্দে আমাদের প্রতি (বাক্যবাণ?) নিক্ষেপ করিতেছেন। আমরা হাসিয়া বলিতেছি, কথা তোমরাও কিছু কম বল না। তোমরা যদি আরম্ভ কর ত আমরা কি তোমাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারি। তোমাদের কাছেই আমাদের শিক্ষা। কথার বায়ব শক্তিতেই ত তোমাদের এতবড় রাজ-নৈতিক যন্ত্রটা চলিতেছে। কথা-ভরা রাশি রাশি পুঁথি জাহাজে করিয়া প্রতি-নিয়ত আমাদের নিকট প্রেরণ করিতেছ। এতদিন মুখস্থ করিয়াও যদি দুটো কথা কহিতে না শিখিলাম, তবে আর কি শিখিলাম। তোমাদের নিকট হইতে শিখিয়াছি, কথাই তোমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রহ্মাস্ত্র। কামান বন্দুক ক্রমশঃ নীরব হইয়া আসিতেছে।'

ইহার মধ্যে একটু মিষ্ট ব্যঙ্গ আছে, তা থাকুক। কথা ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রহ্মাস্ত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেকালেও কথার 'কেরামত' কম ছিল না। কথার জোরে বিষ নামিত, কথার তোড়ে ভূত ছাড়িত;—তোমার 'মন্তর-তন্তর' সেও বাক-যন্ত্রের বায়বীয় শক্তি হইতে উদ্ভূত।

'মন্ত্রি-অভিষেক' নামটি বেশ। এবং অর্থ টা একটু 'আগ বাড়াইয়া' ধরিলে নামটি—বক্তব্য বিষয়টির কতক কাছাকাছিও বটে।

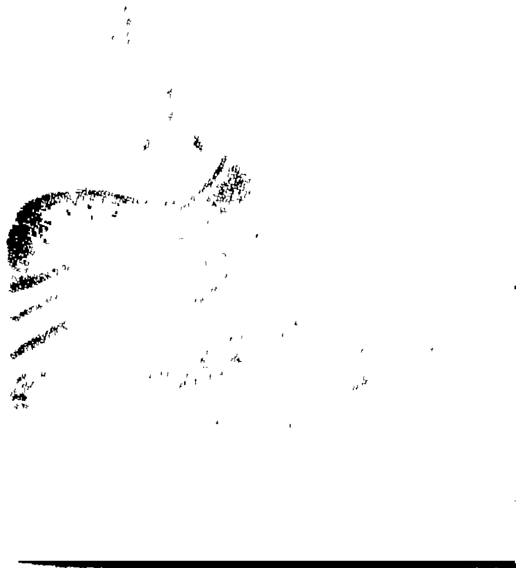
রাজকার্য চলে আইন-কানুনে। আমাদের এখানকার আইন-কানুন তৈয়ারী হয় লাটসাহেবদের সভায়। সভায় অবশ্য সভ্য থাকে, সভ্য নহিলে আর সভা কি? এখন ধর, লাটসাহেবরা হলেন রাজা। আইন তৈয়ারী করার সভার সভ্যেরা কাজেই লাটসাহেবরূপ রাজার মন্ত্রী। এই মন্ত্রী মহাশয়েরা রাজকার্য বা অকার্যের উপর বড় একটা মন্ত্রণা দিতে অধিকারী নহেন; কোন



কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ



ভূদেব মুখোপাধ্যায়



কালীপ্রসন্ন ঘোষ



হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়



ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



নিত্যকৃষ্ণ বসু



গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

একটা আইন তৈয়ার হওয়ার সময় সে বিষয়ে আপন আপন মতামত জানাইতে সক্ষম। তা সে যা হউক, ইঁহারা এক রকমের মন্ত্রী বৈকি ?

এই রকমের মন্ত্রী মহাশয়দিগকে প্রচলিত প্রথা অনুসারে নিযুক্ত করিয়া থাকেন, লাটসাহেব অর্থাৎ রাজা ; এখন সেই মন্ত্রীদের কতক কতককে নিযুক্ত করিতে চাই আমরা, প্রজা। ইহা লইয়া গণ্ডগোল, কথাবার্তা, কংগ্রেস এবং আমাদের আলোচ্য রবীন্দ্রবাবুর বক্তৃতা। পরন্তু ইহা লইয়াই লর্ড ক্রস এবং ব্রাডলার 'বিল'। ক্রসের 'বিল' বলে, মন্ত্রি-অভিষেক করিবেন রাজা, ব্রাডলার বিল বলে, তাহা করিবে প্রজা।

কিন্তু আমাদের পাঠকবর্গ ত আর মূর্খ নহেন যে, ঐ সর্ব শিক্ষিত-জন-বিদিত এবং আলোচিত বিষয় অত অধিকতর খোলসা করিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে ?

ক্রসের বিলে নির্বাচন প্রচলনের অভাব বলিয়াই তাহার প্রতিবাদ। নতুবা তাহাতে ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার সম্বন্ধে অনেক উন্নতির কথা আছে। আক্ষেপের বিষয়, সেই সকল উন্নতির কথাগুলির উল্লেখ আদপেই কেহ করিতেছেন না। রবীন্দ্রবাবুও করেন নাই।

রবীন্দ্রবাবু তাহার উল্লেখ করেন নাই ; মিস্টার ব্রাডলার 'বিল' সম্বন্ধেও বিশেষ কোন কথা কহেন নাই। সংক্ষিপ্ত কথায় তাঁহার বক্তৃতার মর্ম এই যে, যখন আমরা ভারতীয় প্রজা নির্বাচন প্রণালী একান্ত ব্যগ্রতার সহিত আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, তাহা প্রদান করা ইংরাজ রাজের সর্বতোভাবে উচিত। কারণ তদ্বারা প্রকৃতিপুঞ্জের সন্তোষ উৎপাদিত হইবে। শাসনকার্যে সন্তোষ পদার্থটি উপেক্ষার যোগ্য নহে।

ইংরাজ কর্তৃক ভারত শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতবর্ষেরই উন্নতি ; রবীন্দ্রবাবু এই কয়েকটি কথাকে 'জ্যামিতিক' স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বীকার্য বলিয়া ধৃত করিয়া তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছেন এবং সেই স্বতঃসিদ্ধ বা স্বীকার্যের উপর তাঁহার সব কয়টা যুক্তি, তর্ক স্থাপিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রবাবুর যুক্তি এইরূপ—

"ভারত শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের উন্নতি। সেই উন্নতির জন্য ভারতবর্ষীয় কতকগুলি মন্ত্রীর সাহায্য প্রার্থনীয় হইয়াছে। অতএব ইহা সহজেই মনে হয় যে, আমরা ভারতীয় মন্ত্রীদিগকে আপনারা নিজে নিবাচন করিয়া দিলে কাজটাও ভাল হইবে, আমাদের মনেরও সন্তোষ হইবে।"

ইহা কবি-হৃদয়ের উপযুক্ত সরল যুক্তি, তাহাতে অবশ্য কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রবাবু তাঁহার শ্রোতাবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"...ভরসা করিয়া বলিতে পারি, এমন অবিশ্বাসী এ সভায় কেহই নাই, যিনি বলিবেন, ভারতের উন্নতিই ভারত শাসনের মুখ্য লক্ষ্য নহে।"

পুনশ্চ তিনি বলিতেছেন—

"...আমরা যদি স্থির চিত্তে, প্রণিধান করিয়া দেখি, তবে ইহা নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আমরা এত বহুল সুফল লাভ করিয়াছি যে, তাহার নিঃস্বার্থ উপকারিতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে কৃতঘ্নতা মাত্র।"

ভারতের উন্নতিকল্পে ভারত শাসিত হইতেছে এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টে ভারতবর্ষ বহুল সুফল লাভ করিয়াছে, ইহা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় আমরাও স্বীকার করি; আমাদের ন্যায় অনেকেই করেন। তবে রবীন্দ্রনাথবাবুর স্বীকার্যে এবং আমাদের স্বীকার্যে কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য আছে। কারণ 'অবিশ্বাসী' ও 'কৃতঘ্ন' হইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার আশঙ্কা সত্ত্বেও আমরা সরলভাবে আমাদের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিতে সঙ্কুচিত নাহ যে, ভারতের উন্নতি ভারত শাসনের উদ্দেশ্য হইলেও তাহা 'মুখ্য উদ্দেশ্য' নহে!—গৌণ উদ্দেশ্য। পরন্তু ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অনুষ্ঠিত ভারত-উপকার 'নিঃস্বার্থ' বা 'নিষ্কাম' নহে,—তাহা স্বার্থমূলক ও সকাম। কারণ তাহাই স্বাভাবিক এবং তজ্জন্য আমাদের গবর্ণমেণ্ট বিন্দুমাত্রও নিন্দনীয় নহেন। যদি এ সময়ে, বা যে কোন সময়েই হউক, এ দেশে হিন্দু রাজার হিন্দু গবর্ণমেণ্ট থাকিত, তাহা হইলে তাহার অনুষ্ঠিত ভারত উন্নতিও গৌণ উদ্দেশ্যমূলক এবং তৎকৃত উপকারও স্বার্থ-সঙ্কুল হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রবাবুর 'রাজনীতির মূল কথাতেই আমাদের যখন কিঞ্চিৎ মত ও বিশ্বাস পার্থক্য হইতেছে, তখন তিনি সেই মূল হইতেই যে সকল শাখা-প্রশাখা উত্থিত করিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ ঐক্যমত হইবারও সম্ভাবনা নাই। সে বিষয়ে বাক্যব্যয় করাও বিফল বিবেচনা করি।

উপস্থিত বিষয় প্রসঙ্গে আমাদের যদি কোনও বক্তব্য থাকে, তাহা এই যে, যদি ক্রসের বিল বিষয়োপযোগী না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রাডলার বিলও বিষয়োপযোগী হয় নাই। আমাদের বিবেচনায়, উহারা উভয়ই 'এক ভস্ম

আর ছার' ইত্যাদি। ব্রাডলার বিলে প্রতিনৈধিক নির্বাচন আছে বটে, কিন্তু সে থাকা না থাকা। তদ্দ্বারা আসল কার্য এক পদও অগ্রসর হইবে না। একটা হৈ-চৈ হইবে বটে।

ব্রাডলার বিলে 'নির্বাচন' আছে যেন নির্বাচনেরই জন্য, শাসন-কার্যের সংস্কারের জন্য নহে। ব্রাডলার বিল ও কংগ্রেসের কথা একই। কংগ্রেসও এ সম্বন্ধে চাহিতেছেন কেবল 'নির্বাচন', সুশাসন নহে। কারণ প্রজা-নির্বাচিত শত সংখ্যক সদস্যের মত যদি একমাত্র সভাপতির ইঙ্গিতে 'রদ' হইয়া যায়, তবে আমাদের সেই নির্বাচিত সদস্যদিগের সফলতা কোথায়? তাঁহারা কার্যতঃ যে 'সাক্ষী-গোপাল' সেই সাক্ষী-গোপালই ত রহিয়া গেলেন। সাক্ষী-গোপালের সাধ কি আজও আমাদের মিটে নাই !!!

রবীন্দ্রবাবু বলিতেছেন—

"এমন দুরাশাও আমরা করিতেছি না যে, আমাদের প্রতিনিধিদের হস্তে রাজ-ক্ষমতা থাকিবে। তাঁহারা কেবল নিবেদন করিবেন মাত্র, বিচারের ভার, কার্যের ভার তোমাদের।"

হায়! এই অধিকার-মাত্র-বিহীন প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়া ভারতভূমি নিজের কি উপকার সাধন করিবেন, আমরা জানি না! আর ইহার জন্য,—এই নাম মাত্র নির্বাচনের জন্য কেন বৃথা 'জলধি বন্ধন' হইতেছে,—তাহাও বুঝিতে পারি না !! এ সম্বন্ধে বরং প্রতিবাদিত বিলের কোন কোনও ধারা মন্দের ভাল।

কংগ্রেস যে প্রকৃতির 'নির্বাচন' চাহিতেছেন ও দেশকে চাহাইতেছেন, তাহা ত গেল এই। পরন্তু নির্বাচনের নিজের বস্তুগত আলোক ও অন্ধকার আছে। আলোক অপেক্ষা অন্ধকারের পরিমাণ অল্প নহে। রবীন্দ্রবাবু আলোকের কথা কহিতে গিয়াছিলেন, আলোকের কথাই কহিয়াছেন। অন্ধকার তাঁহার বক্তৃতায় অকথিত আছে। না থাকিলে চলিত না। আলোক অন্ধকার দুয়ের বিচার করিয়া কথা কহিতে হইলে নির্জনে বসিয়াই তাঁহাকে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াই পাঠাইতে হইত। মরকত-গৃহে তিনি বক্তা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেন না।

আমরা লর্ড ক্রসের বিলের অনুমোদন করি না, মিস্টার ব্রাডলার বিল পাস হইলে আমরা কৃতার্থ হইব, এমন কথাও সজ্ঞানে বলিতে পারি না। তবে লর্ড ক্রসের বিল পাস হইলে যে দেশ অচিরাৎ উৎসন্ন যাইবে বলিয়া মহা 'হুলস্থুল'

পড়িয়া গিয়াছে, ইহা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য হই। মরকত-গৃহের সভায় রবীন্দ্রবাবু যে 'রেজুলিউসনটি' 'চালনা' করিয়াছিলেন, তাহা এই উৎসন্ন বিষয়ক—

"That this meeting views with apprehension and alarm the introduction of Lord Cross's India Councils' Bill into the British Parliament and desires to record its firm conviction that if this measure be passed into law in its present shape, it will create deep and widesprade discontent and injure the vital interest of the Indian Nation." ইত্যাদি।

সপক্ষ সমর্থনের জন্য সর্বথা অত্যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাহা আমরা জানি, কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর ন্যায় রাজনীতির বে-পেশাদার চিন্তাশীল ব্যক্তি কিরূপে দ্বিধাশূন্য হইয়া উপর্যুক্ত 'রেজুলিউসন' প্রচার করিলেন, ভাবিলে একটু বিস্মিত ও লজ্জিত হইতে হয়। ব্যবস্থাপক সভার বর্তমান অবস্থা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে,—সে অবস্থা আমাদের অনুমোদনীয়, আশানুরূপ ও সন্তোষকর না হইলেও তদ্দ্বারা দেশ একেবারে অবশ্য উৎসন্ন যায় নাই, পক্ষান্তরে তাহা আমাদিগকে শিক্ষিত ও দীক্ষিত করিয়া প্রতিনিধি প্রণালীর শাসন সম্বন্ধে অন্ততঃ আকাঙ্ক্ষা করিতেও উপযুক্ত করিয়াছে। লর্ড ক্রসের কাউন্সিল বিলের যাহা উদ্দেশ্য তদ্দ্বারা ব্যবস্থাপক সভার বর্তমান অবস্থা উন্নত বই অবনত হইবে না! অতএব লর্ড ক্রসের কাউন্সিল বিল আইনে পরিণত হইলে দেশ কেন কথিতরূপ রসাতলে যাইবে, বুঝিয়া উঠা যায় না। লর্ড ক্রসের বিলের প্রতিবাদে ও প্রতিনিধি প্রণালীর প্রার্থনায় আমরা নিজেও যোগ দিতেছি,—কিন্তু যাহা সত্য তাহা সত্যের অনুরোধেও বলা উচিত। অত্যুক্তিতে অসারতাই প্রকাশ পায়। আসল কার্যও নষ্ট হয়।

লর্ড ক্রসের বিলের লিখিত সংস্কার কেহ চাহেন না, সে সংস্কারে শিক্ষিত সম্প্রদায় কহিতেছেন সর্বনাশ হইবে, সম্ভবতঃ সে বিল 'সেরেস্তা জাত' হইবে। সে বিল 'সেরেস্তা জাত' হইবে—ব্রাডলার বিল পাস হওয়া দূরের কথা, পার্লামেণ্টে পেশও হইবে না। প্রতিনিধি নির্বাচন প্রথা প্রচলন হইল না, ব্যবস্থাপক সভার গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাবিত সংস্কারও আমরা করিতে দিলাম না। অবস্থা যাহা ছিল, তাহাই রহিল, অথচ আমরা দাপাদাপি করিয়া মরিলাম। কত অর্থ সামর্থ্য অনর্থক ব্যয় করিলাম।

বলিবে, লর্ড ক্রসের বিল আমাদেরই আন্দোলনের ফল। আমরা সে বিল গ্রাহ্য ও গ্রহণ করিলাম না। আমাদেরই আন্দোলনে পুনরায় অধিকতর অধিকার সংযুক্ত বিল প্রস্তাবিত হইবে; ভাল, তোমাদের এই যুক্তি ভ্রমসঙ্কুল নয় কে বলিল ? লর্ড ক্রসের বিল আমাদের আন্দোলন উৎপাদিত বলিয়া যদি যথার্থ-ই তোমাদের ধারণা হইয়া থাকে, তাহা একটা মহা ভ্রম। সে ভ্রমের উপর আর অধিক নির্ভর করা উচিত হইতেছে না।

রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন আবশ্যক, তাহা সর্বতোভাবে স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের যেরূপ অবস্থা তাহাতে উৎকট আন্দোলনটা কিছু বড় বেশি কাজ হইবে না। আমাদের কংগ্রেসিক আমলে আন্দোলনটা কিছু উৎকট রকম হইতেছে, ইহা অনেকেরই বিবেচনায় বিড়ম্বনা। লর্ড ক্রসের বিলের প্রতিবাদ প্রসঙ্গে আমরা তুমুল আন্দোলন উত্থিত করিয়া কিছু করিতে পারিলাম না;—কাজেই সে আন্দোলন জীবিত রাখিতে চাহিতেছি। অঙ্গে-বঙ্গে-কলিঙ্গে, কংগ্রেসের আন্দোলন চলিবে, বিলাতেও আমরা আন্দোলন করিব। যতদিনে আমরা উচ্চতর রাজনৈতিক অধিকার না পাই, আন্দোলনেরও ছাড়িব না। কিন্তু এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে যে আন্দোলনেরও আন্দোলনত্ব থাকিবে না। সংসারে সকল দ্রব্যের ন্যায় আন্দোলনের এ কার্যে মহা আকর্ষণ, তাহার নূতনত্ব অধিকাংশের মধ্যে সারত্ব অপেক্ষা অভিনবত্ব অধিক কার্যকরী হয়। পরন্তু একটা ধারাবাহিক ও অবিশ্রান্ত আন্দোলন উত্থিত করিয়া রাখা রাজা ও প্রজা উভয়েরই পক্ষে অমঙ্গল, ইহাও আমাদের বিবেচনা করা উচিত। আন্দোলনে উভয়েরই অশান্তি সে বিষয়ে সন্দেহ কি ?

প্রজার ন্যায় রাজা ও রাজপুরুষগণও রক্ত মাংসে গঠিত মানুষ। তাহাদেরও মেজাজ আছে, খেয়াল আছে—আসক্তি ও বিরক্তি আছে। রবীন্দ্রনাথ-বাবুর কথায় তাহারাও "নিমন্ত্রণে যান, বিনীত সম্ভাষণে আপ্যায়িত হন, লন টেনিস খেলেন। মহিলাদের সহিত মধুরালাপ করেন।" এতএব তাঁহারা আমাদের অনন্ত আন্দোলনে একান্ত আপ্যায়িত হইবেন, তাহাও নয় ? বলিবে, "তাঁহারা আপ্যায়িত না হউন, আশঙ্কিতও হইবেন।" আচ্ছা ? আশঙ্কিত হইয়া আমাদের অধিকার দানের পরিবর্তে আঘাত করিতেও ত পারেন! রবীন্দ্র-বাবু যাহাই বলুন, মনুষ্য প্রকৃতির অতীত বলিয়া কেহই বিবেচনা করে না। রাজ-ভক্ত প্রজাদের পক্ষে ক্রমাগত রাজভক্ত বিচলিত করা কর্তব্যও নহে।

বিলাতি আন্দোলনের উপর আজকাল আমরা কিছু অতিরিক্ত বিশ্বাস করিতেছি। এ বিশ্বাসেরও বিশিষ্ট কারণ দেখি না। বিলাতি প্রজার পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার আছে এবং তাহাদের কোন কোন সম্প্রদায়ের কতক কতক লোক আমাদের প্রেরিত বক্তাদিগকে আদর আপ্যায়িত করিয়া থাকেন ইহা সত্য। কিন্তু তাহাতে আমাদের কোন কার্যসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা কোথায়? মিস্টার দাদাভাই নৌরজী ও মিস্টার লালমোহন ঘোষ বহু বৎসর তাহাদের আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া বিলাত প্রবাস করিলেন, কত বক্তৃতা দিলেন ও করতালি প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু কই কার্য ত কিছুই হইল না। বিলাতি নির্বাচকগণ সর্বত্রই আত্মস্বার্থের বশীভূত। অধিকাংশ স্থলে আত্মস্বার্থ ও উৎকোচের বশীভূত। আমরা উৎকোচের আয়োজন করিলেও যে তাহাদের মন পাইব তাহারই বা স্থিরতা কি? আমরা অনেক সময়ে 'লিবারাল' ও 'রেডিকাল' সম্প্রদায়ের নিকট হইতে আশা প্রাপ্ত হইয়া থাকি; কিন্তু সে আশা পাই, যখন তাঁহারা শাসন শক্তি হইতে বিচ্যুত, যে মুহূর্তে তাঁহারা রাজ্যের কার্যভার গ্রহণ করেন, সে মুহূর্তে পূর্ব-কথা বিস্মৃত হইয়া মতান্তর প্রাপ্ত হয়েন। যখন উদার প্রকৃতি বড় বড় মেম্বর ও মন্ত্রিগণ সম্বন্ধেই এই কথা, তখন সাধারণ নির্বাচকদিগের প্রদত্ত আশ্বাস সম্বন্ধে আর অধিক কথা কি? ফলতঃ, ইংলণ্ডে আমরা করতালি পাইলেও পাইতে পারি, কিন্তু কার্য কদাচিৎ পাইবার সম্ভাবনা। অভিজ্ঞতাতে যতটা ইঙ্গিত করে তাহাতে ইহাই বুঝাইতেছে। তবে 'আশা বৈতরণী নদী' ইংলণ্ডে আমমোক্তার রাখার উপযোগিতা আমরা একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না।

উপসংহারের বক্তব্য, আমাদের আলোচিত রবীন্দ্রবাবুর এই বক্তৃতা বাজারের সাধারণ রাজনৈতিক প্রবন্ধ হইতে অনেক উচ্চ শ্রেণীর; ইহাতে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ আছে। কাজেই ইহা চিত্তাকর্ষক।

রাজনৈতিক কার্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রবাবুকে দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। আমরা আশা করি, তিনি সে ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

মানসী

প্রিয়নাথ সেন

সৌন্দর্য উপভোগে আমরা যে আনন্দ লাভ করি, তাহা এক দিকে যেমন বিশুদ্ধ, অপর দিকে তেমনি প্রখর। প্রখরতানিবন্ধন সে আনন্দ আমরা নিজের ভিতর বদ্ধ রাখিতে না পারিয়া জগৎসংসারকে তাহার ভাগ লইতে আহ্বান করি; এবং বিশুদ্ধ বলিয়া পরের সহিত উপভোগে সে আনন্দ কমিয়া না গিয়া বরং বাড়িতেই থাকে। ইংরেজ কবি শেলি লিখিয়াছেন, প্রেমের বিভাগ অর্থে এমন বুঝায় না যে, কাহারও প্রাপ্ত অংশ হইতে তাহাকে কিঞ্চিন্মাত্র বঞ্চিত করা। এ কথায় অনেকেরই আপত্তি থাকিতে পারে—কিন্তু সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া সকলে মিলিয়া আনন্দ ভাগ করিয়া লইলে, আনন্দ যে বাড়ে বই কমে না, তাহা আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি। সৌন্দর্য-উপভোগ-প্রবৃত্তির মূলে যে পরার্থপরতা আছে, ইহা তাহার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং তাহা হইলেই আমরা বলিতে পারি যে, এই বৃত্তি মঙ্গলময়ী এবং ইহার পরিচালনা শুভোদ্দিষ্টা।

আমাদের সৌন্দর্যস্পৃহা নানা উপায়ে চরিতার্থ হয়। কিন্তু বোধ হয় সুন্দর কাব্য হইতে আমরা যে আনন্দ পাই তাহা সর্বতোভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ। চিত্র-বিদ্যা, সঙ্গীত-বিদ্যা প্রভৃতি অপরাপর কলা-বিদ্যারও উদ্দেশ্য সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি, কিন্তু কাব্যে যেমন বাহ্য এবং অন্তর্জগতের সৌন্দর্য স্থায়ী, এবং সর্বাঙ্গীণ বিকাশপ্রাপ্ত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না।

কাব্যামোদী পাঠক, তাই কোনও সুন্দর কাব্যের সন্ধান পাইলে সুখে অধীর হইয়া অপরকে তাহার রসাস্বাদনে সুখী করিতে উৎসুক হন। সম্ভবতঃ, সমালোচনার জন্ম ইহা হইতেই।

দ্রষ্টব্য : 'মানসী' ১২৯৭ সালে (ইং ১৮৯০) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের মতে 'মানসী' তাঁহার সর্বপ্রথম কাব্যপদবাচ্য রচনা। 'সঞ্চয়িতা'র ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন—

> "মানসী থেকে আরম্ভ করে বাকি বইগুলির কবিতায় মন্দ মাঝারির ভেদ আছে। কিন্তু আমার আদর্শ অনুসারে ওরা প্রবেশিকা অতিক্রম করে কবিতার শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।"

'মানসী' প্রকাশিত হইলে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর অন্যতম সাহিত্য-শিষ্য এবং রবীন্দ্রবান্ধব

আমরা 'মানসী' পাঠে যে তীব্র এবং নিরবচ্ছিন্ন আমোদ পাইয়াছি, সচরাচর কোন কবিতা-পুস্তক পাঠে তাহা ঘটিয়া উঠে না। সেই আনন্দ-উদ্বেগে প্রণোদিত হইয়া মানসী-প্রকাশের কিছুদিন পরেই আমরা উহার একটি বিস্তৃত সমালোচনা লিখি—কিন্তু কতিপয় কারণবশতঃ উহা সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি মানসীর দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে—আমরাও তদুপলক্ষে আমাদের পূর্বরচিত প্রবন্ধ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

আমাদের বিবেচনায় মানসী একখানি অতি উৎকৃষ্ট, অতি অপূর্ব গ্রন্থ। এত চরম সৌন্দর্যের, এত বিচিত্র কবিতার একত্র সমাবেশ বাংলা ভাষাতে আজ এই প্রথম দেখিলাম। অপর কোনও ভাষাতেও এরূপ একখানি গ্রন্থের ভিতর এত উচ্চদরের অথচ বিভিন্ন প্রকৃতির এতগুলি কবিতা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। কুড়ি বৎসরের ভিতর ইংরাজী বা ফরাসী ভাষায় এমন কোনও কবিতা-পুস্তক দেখিয়াছি কি? সুইনবার্ণ এবং ভিক্টর হুগোর দুই একখানি গ্রন্থ স্মরণ হইতেছে—কিন্তু মানসী পড়িয়া বিষয় এবং ভাবের বৈচিত্র্যগুণে এবং কাব্য-সৌন্দর্যের উৎকর্ষনিবন্ধন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা পুস্তকই বার বার আমার মনে আসিয়াছে। সে পুস্তক আর কাহারও নয়, ভিক্টর হুগোর—এবং সেখানি তাঁহার অপর কোন পুস্তক নয়, তাঁহার লে কোঁতাঁপ্লাসিওঁ (Les Contemplations)। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, সমালোচক বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিলেন। আমরা কিন্তু আমাদের মনের কথাই বলিতেছি। আমাদের স্থির বিশ্বাস মানসীর রসাস্বাদনে অধিকারী পাঠক যদি ভিক্টর হুগোর কোঁতাঁপ্লাসিওঁ পড়িয়া থাকেন, তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে, এই দুই পুস্তকের একত্র নামকরণ অনিবার্য না হইলেও, নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে।

মানসীর ভাষা এবং ভাব—যেন একই ছাঁচে একেবারে প্রকৃতির হাত

প্রিয়নাথ সেন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকার পৌষ, ১৩০০ সালে এই কাব্যের একটি অত্যুৎকৃষ্ট সমালোচনা প্রকাশ করেন। কেহ কেহ এই সমালোচনাটি সর্বতোভাবে গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। এইরূপ মনোভাবের নিদর্শন হিসাবে তৎকালের উদীয়মান সাহিত্যিক এবং সমালোচক নিত্যকৃষ্ণ বসুর বক্তব্যটি নিম্নে বিবৃত হইল—

> "পৌষ মাসের 'সাহিত্য' মুদ্রিত হইতেছে। রবীন্দ্রবাবুর 'মানসী' নামক কবিতা পুস্তকের সমালোচনা দেখিলাম। এমন··সমালোচনা কখনও পাঠ করিয়াছি কিনা বলিতে পারি না। ইহা প্রকৃত সমালোচকের স্বাধীন মতের অভিব্যক্তি নহে, অন্ধ ভক্তের

হইতে বাহির হইয়াছে। বাস্তবিক ইহার কোথাও কৃত্রিমতার নাম গন্ধ নাই। এই সকল কবিতার অসাধারণ উৎকর্ষের মূলীভূত কারণ,—তাহাদের মর্ম্মগত সত্য। মানসী বড়ই সুন্দর, কেন না মানসী বড়ই সত্য। তাহাতে একটিও মিথ্যা কথা নাই। কবি মানব-হৃদয়ের অকৃত্রিম ভাব সমূহের অতলস্পর্শ গভীরতা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছেন বলিয়াই, সেই চির সত্যের ভিতর কবিত্বের অমর সৌন্দর্যের সন্ধান পাইয়াছেন। সেই জন্য তাহার অন্বেষণে তাঁহাকে মিথ্যার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইতে হয় নাই। প্রকৃতির চিরসৌন্দর্য্যের প্রাণ পর্যন্ত দেখিবার চক্ষু তাঁহার আছে বলিয়াই, তাঁহাকে বসিয়া বসিয়া চিরদিন রং ঘুঁটিতে হয় নাই। তিনি বাহ্য এবং অন্তর্জগতের এতদূর পর্যন্ত দেখিতে জানেন বলিয়াই, এত সৌন্দর্য দেখিতে পাইয়াছেন, এবং এমন সুন্দর করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন। এই গেল মানসীর ভাব ও প্রাণের কথা। ইহার বাহ্য বিকাশ অর্থাৎ ভাষা এবং ছন্দ সম্বন্ধে ঠিক সেই কথাই খাটে। পূর্বেই বলিয়াছি, এই কবির ভাব ও ভাষা একাধারে একেবারে তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছিল। অর্থাৎ সৃষ্টির হৃদয় হইতে তাঁহার হৃদয় মধ্যে যে সৌন্দর্যের বার্তা আসিয়াছে, তাহা একেবারে কবিত্বের আকার ধরিয়াই আসিয়াছে। সেইজন্য তাঁহাকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কবিদিগের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া শব্দ আহরণ করিতে হয় নাই—ভাব প্রকাশের জন্য ইতস্ততঃ করিতে হয় নাই। এদিকে আবার জোর করিয়া একটা মস্ত কথা বলিবার কোথাও প্রয়াস বা চেষ্টা দেখিলাম না। পূর্ণ প্রাণ হইতে সুন্দর এবং পরিণত ভাষা ও ছন্দে, উচ্ছ্বাসোন্মুখ কবিতার মুক্তস্রোত হিল্লোলময়ী ধারায় নিঃসৃত হইয়াছে। সংক্ষেপে এই কবির বলিবার কথা আছে—কথা বলিবার আড়ম্বর নাই। তাই তাঁহার ভাষা সারগর্ভ, সুন্দর, পরিষ্কার, পরিস্ফুট এবং ভাবের পর্দার সঙ্গে সুমিলিত।

স্তুতিমাত্র। লেখক মহাশয় সমালোচনায় হাত না দিয়া মানসী-মঙ্গল কাব্য লিখিলে তাঁহার উদ্দেশ্য বোধ হয় অধিকতর সুসিদ্ধ হইত। বড়ই আক্ষেপের বিষয়, বাঙ্গালা দেশে এখনও প্রকৃত স্বাধীন সমালোচনার সাক্ষাৎ পাইলাম না।··আমার বোধ হয়, তাঁহার আদর্শ দেবতা মনে মনে হাসি সংবরণ করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রবাবু যে নিজের দৌড় বুঝেন না, এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাঁহার প্রতিভা আছে। প্রতিভার গতি সর্বত্র। পরকেও যেমন বুঝে, আপনাকেও তেমনি।

যে দীপ লইয়া জগতের—বিশ্বের অতুল রহস্যপ্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি, তাহা

শুধু তাহাই নহে। এ প্রশংসায়, ভাষার এ গুণপণায়, উৎকৃষ্ট গদ্য বা পদ্য উভয়েরই দাবী আছে, এবং উভয়েরই থাকা চাই। কিন্তু পদ্যের হিসাবে এই সকল কবিতার অপূর্ব সুন্দর ভাষাকে আরও সুন্দর এবং মুগ্ধকর করিয়া তুলিয়াছে শব্দবিন্যাসে তাঁহার অসাধারণ বিস্ময়কর ক্ষমতা। আমি কেবল শব্দের লালিত্য বা মাধুর্যের কথা বলিতেছি না—কাব্যাংশে তাহাদের সার্থকতার কথা বলিতেছি। এ ক্ষমতা যে কেবল রবীন্দ্রবাবুর মানসীতেই প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা নহে; তাঁহার শৈশব কবিতার ভিতরও ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁহার নির্বাচিত শব্দগুলির ভিতর যেন স্বভাবের চিরসৌন্দর্য জাগিয়া রহিয়াছে—প্রকৃতির পূর্ণ-মোহ তাহাদের ভিতর বিদ্যমান। নিকৃষ্ট কবিদিগের বর্ণনার ন্যায় তাহারা নিসর্গের কেবলমাত্র প্রাণহীন ফোটোগ্রাফ বা অন্ধ ছবি নহে। স্বভাবের সমস্ত জীবন তাহাদের অভ্যন্তরে প্রদীপ্ত। পাঠকালে এই শব্দমন্ত্রে আহূত হইয়া পাঠকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, কখনও বা স্বভাবের উদার, কখনও বা রুক্ষ, কখনও বা বিস্ময়কর দিব্য-মূর্তি; এবং কেবল তাহাই নহে। প্রকৃতির সৌন্দর্যরাশি দেখিলে হৃদয় যে অব্যক্ত অধীরভাবে চঞ্চল হইয়া উঠে, তাহাদের ভিতর সেই অব্যক্ত অধীরতাটুকুও ব্যক্ত হইয়াছে। তাহারা কেবল বাহ্যজগতে সৌন্দর্যরাশি আনিয়া পাঠককে উপহার দিয়া ক্ষান্ত হয় না—কবির অন্তর্জগতের আরও মুগ্ধকর বার্তা আনিয়া দেয়—আনন্দউন্মুখ পাঠকের প্রাণে কবির উপভোগ-গলিত তপ্তপ্রাণ ঢালিয়া দেয়। এক কথায়, তাহাদের ভিতর যেমন নিসর্গের চিরপ্রফুল্ল সৌন্দর্যরাশি বর্তমান, তেমনই তাহারই সঙ্গে সঙ্গে কবি-হৃদয়ের মুগ্ধ উপভোগও বর্তমান।

এই পরিষ্কার ভাষা ও এই হোমমন্ত্রময় শব্দবিন্যাসের উপর আবার আসিয়া পড়িয়াছে, উদ্বেলিত প্রাণের সমুচ্ছ্বাসপূর্ণ, জন্মান্তরীণ স্মৃতির ন্যায় মুগ্ধকর,

---

কি নিজের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া একেবারে নির্বাপিত হইয়া যায়? আমার বিশ্বাস এই, যে কবি পরের ন্যায় নিজের আত্মাটিকেও বিশ্লেষণ করিতে পারেন না, তাঁহার প্রতিভা অসম্পূর্ণ। ভক্ত ও গোঁড়া মহাশয়দিগের অযথা ও অসংযত স্তুতিবাদে কাব্য-রাজ্য উচ্ছিন্ন হইতে বসিয়াছে। কে আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিবে।"

'মানসী' রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

বহুকাল পরে প্রিয়নাথ সেন বিরচিত এই প্রবন্ধটি প্রমোদনাথ সেন কর্তৃক সম্পাদিত 'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৩৪০) মুদ্রিত হইয়াছে।

এক অতি আশ্চর্য—অতি অপূর্ব ছন্দের আকুল তরঙ্গ। বাস্তবিক দ্বিজেন্দ্রবাবুকে ছাড়িয়া দিলে শব্দ-বিন্যাস এবং ছন্দরচনায় রবিবাবু বঙ্গ কবিদিগের শীর্ষস্থানীয়, এবং ভবিষ্যতের চির আদর্শ। এক ছন্দ লইয়াই কবি-প্রতিভার পূর্ণ পরিমাণ লওয়া যাইতে পারে। নিকৃষ্ট সমালোচকেরা ছন্দকে কবিতার বাহ্য-গঠন বা পরিচ্ছদ-জ্ঞানে তাহাকে নিতান্ত গৌণ বা অপ্রধান স্থান দিয়া থাকে। নিকৃষ্ট কবিদের নিকট ছন্দ ভাব-প্রকাশের নিগড় বা ব্যাঘাত হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে। কিন্তু প্রকৃত কবিদের হাতে ছন্দ ভাষা অপেক্ষা রসবিকাশের শ্রেষ্ঠতর—যোগ্যতর অবলম্বন। ভাষা যাহা করিতে পারে না, ছন্দ তাহা অনায়াসে করিয়া থাকে। ভাষা যেখানে যাইতে পারে না, ছন্দের স্বর্গীয় রাগিণী সেখানে ভাব-প্রকাশের পথ অতি সুগম করিয়া দেয়। পদ্য যদি ছন্দোময়ী রচনা হয়, এবং গীতিকাব্য যদি প্রাণের উচ্ছ্বাস হয়, তবে সে উচ্ছ্বাস আর কিছুতেই তেমন প্রকাশ পায় না, যেমন ছন্দের আকুল হিল্লোলে। প্রথম শ্রেণীর কবি মাত্রেরই ছন্দের উপর আশ্চর্য ক্ষমতা। ছন্দের উপর ক্ষমতা অর্থে আমি বুঝিতেছি না—মাত্রা, মিল বা যতি সংস্থাপন সম্বন্ধে শাস্ত্রের শাসন মানিয়া চলা। এমন অনেক পদ্য আছে, যেখানে সকল নিয়মই সুন্দর রক্ষিত হইয়াছে—পড়িতে-শুনিতেও যাহা বেশ সুমধুর, অথচ ছন্দের যে সৌন্দর্যের কথা আমি বলিতেছি, তাহাতে তাহার কিছুই নাই। সে সৌন্দর্য নিয়মের অধীন নয়, শিক্ষারও আয়ত্ত নয়। গায়কের কণ্ঠের ন্যায় তাহা নিতান্ত স্বভাবের সামগ্রী। বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসকে লইয়া যে পুরাতন বিবাদ আছে, এখানে তাহার মীমাংসা হইতে পারে। বিদ্যাপতির ছন্দের উপর এই আশ্চর্য ক্ষমতা আছে—বিদ্যাপতির গলা আছে। চণ্ডীদাসের নাই। চণ্ডীদাসের ছন্দ বেশ সুন্দর এবং মধুর, বেশ তাললয়বিশিষ্ট কিন্তু তাহাতে বিদ্যাপতির অপূর্ব মোহ নাই। মলয় সমীরণের ন্যায় তাহা হঠাৎ হৃদয়কে উৎফুল্ল করে না, প্রাণকে ভাসাইয়া দেয় না। বিদ্যাপতির বংশীর রবে প্রাণ শিহরিয়া উঠে, চিত্ত চমকিত হয়, বর্তমান ভুলিয়া গিয়া কোথায় কোন্ দিকে ভাসিয়া যাই।

"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

চণ্ডীদাসের এই কয়টি কথায় বিদ্যাপতির সুন্দর কণ্ঠধ্বনি অতি সুন্দররূপেই বর্ণিত হইয়াছে, এবং ইহাতে বিদ্যাপতির ছন্দের ঘোরও একটু আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পূর্ণমাত্রায় নহে। ইহাতেও কেমন একটু আকুলতা আছে, কিন্তু দেখ, সে

অকুলতা এই কয়েক কাতর পদের দীর্ণ বিদীর্ণ মর্মোচ্ছ্বাসে ভাসিয়া ধুইয়া মগ্ন হইয়া গেল।

"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।"

বিদ্যাপতি সুরে মুগ্ধ করেন, চণ্ডীদাস কথায় মুগ্ধ করেন। কিন্তু সুর লইয়াই ছন্দ লইয়াই কবির কার্য। তাই বলিয়া এমন বুঝিও না, চণ্ডীদাসের সুর নাই বা বিদ্যাপতির কথা নাই।

ছন্দের উপর রবিবাবুর ক্ষমতা বিদ্যাপতি প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর কবিদিগের ন্যায়। তাঁহারও ছন্দের সুরে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, সুদূর নিকট হয়, নিকট সুদূর হয়। দুই চারিটি পদ্যে চক্ষে জল আসিয়া পড়ে এবং ছন্দের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে মর্ম কাঁপিতে থাকে। এই মানসীতে তাঁহার ছন্দরচনা ক্ষমতার চরম উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি নূতন মিল, নূতন মাত্রা, নূতন পদবিভাগ, যতি-সংস্থাপন আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি নূতন ছন্দ প্রণয়ন করিয়াছেন। বাংলা ভাষার সুপ্ত অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে উদ্বোধিত করিয়াছেন, এবং আরও বিস্ময়কর ব্যাপার— পুরাতনকে নূতন করিয়া গড়িয়াছেন। যুক্তাক্ষর সম্বন্ধে তাঁহার অভিনব ব্যবস্থা সকল স্থানে না খাটিলেও, আমাদের পুরাতন 'আটপৌরে' পয়ার ছন্দের জরাজীর্ণতার ভিতর অনেকটা জীবনী সঞ্চারিত করিয়াছেন। তাহার সেই অলস নিদ্রাতুর 'একঘেয়ে' ভাব বিদূরিত করিয়া, তাহার স্থানে জাগ্রত জীবনের সচল ভাব আনিয়া দিয়াছেন। অথচ এই অভিনব বিধানের ভিতর উৎকট কিছুই নাই— ইহা বাংলা ভাষা ও ছন্দের আভ্যন্তরিক ধাতুগত স্বাভাবিক গতির সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়া মিশিয়া গিয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত এই কয়টি চরণের যতি-বিভাগে এবং বিভিন্ন স্বরের উত্থানপতনে—অথবা জানি না কোন নিগূঢ় কারণে,— হৃদয়ের কি ঘোর ব্যাকুলতাই প্রকাশ পাইয়াছে, যেন আবেগ-ভরা প্রাণের গভীর 'দুরু দুরু' এই ছন্দের তালে তালে স্পন্দিত হইতেছে।

"তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শত রূপে শতবার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার!
চিরকাল ধরে' মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছি গীতিহার,

কত রূপ ধরে' পরেছ গলায়
নিয়েছ সে উপহার,
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার!
যত শুনি সেই অতীত কাহিনী,
প্রাচীন প্রেমের ব্যথা,
অতি পুরাতন বিরহ-মিলন-কথা,
অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে
দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমির-রজনী ভেদিয়া
তোমারি মুরতি এসে,
চির স্মৃতিময়ী ধ্রুব-তারকার বেশে।"

হাজার কথা দিয়া কোন কালে কেহ যাহা বলিতে পারিত না, কোন কালে কেহ যাহা বলিতে পারিবে না, তাহা এই কতিপয় অলঙ্কারশূন্য সাদাসিধা, অতি সরল, অতি সহজ অতি সামান্য পদে কি চমৎকার, কি প্রাণভরা উক্তি পাইয়াছে। জানি না শেষ চরণপাঠে চক্ষের উপর কত জন্ম কত যুগ ঘুরিয়া যায়। কত সুদূর বৎসরের বিশাল মেঘরাশি ঠেলিয়া প্রাণ কোথায় ভাসিতে থাকে। অতীতের অনন্ত বিস্তৃতি চক্ষের সম্মুখে খুলিয়া যায়। কত অন্ধকার কত আলো আসিয়া প্রাণে পড়ে। ইহা অপেক্ষাও আরও মুগ্ধ সুন্দর সুরবিশিষ্ট পদ ও চরণ মানসীতে অনেক আছে। এ স্থলে তাহাদের উল্লেখ করিতে গেলে প্রবন্ধের শেষ হইবে না। সে যাহা হউক, আমি বলিতে চাহি যে, কবির এই মোহমন্ত্রময় শব্দবিন্যাস এবং অপূর্ব ছন্দ-সৌন্দর্য রসবিকাশে এবং ভাবপ্রকাশে তাঁহাকে অতুল ক্ষমতা দিয়াছে। ইহার দ্বারা সকল ভাব, সকল রসই বেশ পূর্ণ পরিণত অভিব্যক্তি পাইয়াছে। বিশাল সমুচ্চ বা সুগভীর ভাব—মনের ভাষা যেখানে পৌঁছিতে পারে না—অতি সূক্ষ্ম কোমল মৃদুভাব—কথায় যাহাকে ধরিতে পারা যায় না, হৃদয়ান্তঃপুরচারিণী কল্পনার সেই লাজময়ী কুসুমসুকুমার মূর্তি—ভাষার রূঢ় স্পর্শে যাহা মলিন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, এই সকলই কি চমৎকার, কি অনির্বচনীয় সুরন্দররূপেই ব্যক্ত হইয়াছে। কখন কখন তাঁহার একটি সমগ্র কবিতা এইরূপ একটি ভাবেই পরিপূর্ণ। অথচ তিনি উচ্চ প্রতিভাবলে তাহাদিগকে এমনি কবিত্বময় অথচ পরিচিত ভাষায় প্রকাশ

করিয়াছেন যে, একদিকে যেমন ভাবের নৈসর্গিক গৌরব এবং সুষমা রক্ষিত হইয়াছে, অপর দিকে পাঠকের হৃদয়ে তাহারা শৈশব-সুহৃদের ন্যায় অতি সহজে প্রবেশ লাভ করে। তাহাতে অপ্রাঞ্জল কিছুই নাই—জটিলতার নাম গন্ধ নাই। মানসীতে এমন অনেক কবিতা আছে। উদাহরণস্বরূপ প্রথম এবং শেষ কবিতা দুইটির উল্লেখ করিলাম। 'উপহারে' যদিও ছন্দের মোহ বা অপূর্বতা কিছুই নাই, তবু কি সুন্দর সরল ভাব ও ভাষায় কবির সমস্ত জীবন-কাহিনী ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে। সে চিত্র যেমন সুন্দর, তেমনি সত্য। কবির প্রাণের সেই দুর্দমনীয় সৌন্দর্য-পিপাসা, সৌন্দর্যকে ধরিবার নিমিত্ত সেই জন্মান্তরীণ আকুলতা, কি অনির্বচনীয় মধুর ভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে। সৌন্দর্যকে কে কবে আয়ত্ত করিয়াছে, আয়ত্ত করিয়াই বা কে তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। মনে করি এই বুঝি পাইলাম, পলক না ফেলিতে কই কোথায় আবার উড়িয়া গেল—'আঁখি পালটিতে নাহি পরতীতে যেন দরিদ্রের হেম'—এক যায়, আবার শত শত আসিয়া জীবনকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলে—প্রাণের ভিতর চির-চঞ্চলতা, সুচির অশান্তি আনিয়া দেয়। দুইটি কথায় ইহার কি সুন্দর ছবিই অঙ্কিত হইয়াছে—'রচি শুধু অসীমের সীমা' এই কয়টি কথায় কবি-জীবনের সমস্ত উন্মত্ত আশা, প্রাণ-ভরা স্বপ্ন, হৃদয়-ভরা আবেগ এবং পৃথিবী-ভরা ব্যথা কি উক্ত হয় নাই ?

গ্রন্থের শেষ কবিতাটিতে প্রেমিকের জীবনরহস্য তেমনি সুস্পষ্ট এবং সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। প্রেমের সর্বস্ব ধর্ম ইহার ভিতর উক্ত হইয়াছে। প্রেমিকের সকল কার্য এবং সকল চিন্তার, সকল আশা এবং কল্পনার ভিতর যে প্রিয়জনের মধুর মূর্তি বিরাজ করিতেছে, তাহার অনন্ত বিশাল হৃদয়াকাশ যে প্রিয়জনের সেই ক্ষুদ্র সুন্দর মুখচন্দ্রমার অসীম জ্যোৎস্নায় চির আলোকিত, তিনি তাহার কি সুন্দর বর্ণনাই করিয়াছেন—

> "নাহি সীমা আগে পাছে, যত চাও তত আছে,
> যতই আসিবে কাছে তত পাবে মোরে।
>
> আমারেও দিয়ে তুমি এ বিপুল বিশ্ব ভূমি
> এ আকাশ এ বাতাস দিতে পার ভরে'।"

নিম্নলিখিত কয়টি ছত্রে পুরুষের কল্পনাময় Idealising প্রেমের অনির্বচনীয় মধুর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে—

"আমি যা পেয়েছি, তাই সাথে নিয়ে ভেসে যাই,
কোনখানে সীমা নাই ও মধু মুখের।
শুধু স্বপ্ন শুধু স্মৃতি তাই নিয়ে থাকি নিতি
আর আশা নাহি রাখি সুখের দুখের।"

এই সকলের উপর আবার কি মধুর সুমিষ্ট ছন্দ। সাদাসিধা সহজ কথা, সরল অথচ মধুময় গাঢ় প্রাণভাসান সুর। কোনও কল্ কৌশল নাই, ভাষা বা ছন্দের কোনও কৃত্রিমতা বা জটিলতা নাই, আমাদের ঘরের বাংলা, অথচ কি স্বর্গীয় রাগিণী। যেন শারদ জ্যোৎস্নার শুভ্র সরল আকুল হৃদয়ে শেফালিকা তাহার শুভ্র সরল আকুল প্রাণখানি নীরবে খুলিয়া দিয়াছে।

কিন্তু বিষয় ও ভাবের অভিনব ও প্রগাঢ় মাধুর্যে, এবং ছন্দেরও অভিনব অপার্থিব সুষমায়, 'বর্ষার দিনে' নামক কবিতাটি রবিবাবুর অসাধারণ শক্তির অপূর্ব দৃষ্টান্ত। তাঁহার অপর সকল কবিতা হইতে, এবং তাহা হইলেই বঙ্গ-সাহিত্যের অপর সকল কবিতা হইতে ইহা পৃথক, এবং বিশেষ আসন পাইবার উপযুক্ত। ইহার মত দ্বিতীয় কবিতা তিনি বা অপর কোন্ বঙ্গ কবি লিখিয়াছেন? বাংলা ভাষায় বা ছন্দে যে এমন মোহিনী আছে বা থাকিতে পারে, তাহা আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই, তিনি কেবল তাঁহার সুন্দর প্রতিভাবলে আমাদের এই 'একঘেয়ে' ভাষায় অভিনব শক্তি দিয়াছেন, বা তাহার প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য উদ্ভাবন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, এই কবিতাটি সহস্রবার পাঠে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, অপর কোনও ভাষায় এরূপ সুন্দর ছন্দ রচিত হইতে পারে না, অপর কোনও ভাষায় ইহার উপযুক্ত উপাদান নাই। আমাদের এই বাংলা ভাষাতেই কেবল ইহা সম্ভবপর। জানি না, অপর কোন্ ভাষাতে এমন কোন্ কবিতা আছে, যাহাতে সমগ্র বর্ষার ঘনঘোর জীবনের সমস্ত বুকভরা ব্যথা এমন অনির্বচনীয় মনোহর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বর্ষার মেঘরুদ্ধ হৃদয় যেন এই কবিতার কাতর ছন্দে বিদীর্ণ হইয়াও হইতেছে না। ইহার প্রত্যেক কথার অন্তরালে প্রাবৃটের চির সন্ধ্যা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, এবং মানবজীবনের অনিবার্য বিষাদ সেই সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে জড়িত রহিয়াছে। এদিকে কি সুন্দর অথচ সহজ ভাব ইহার প্রাণের ভিতর নিহিত রহিয়াছে। যে সকল কবি বা কল্পনাব্যবসায়ী মানব-জীবনের উন্মুক্ত সাধারণ রাজপথ ছাড়িয়া দিয়া তাহার প্রচ্ছন্ন প্রান্তভাগ বা অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট প্রদেশের অপ-

রূপ শোভাবর্ণনে পটু—Poe, Baudelair বা Hawthorne তাঁহাদেরও কবিতা বা রচনার ভিতর এমন কোন অপার রহস্যময় গোধূলির ছায়া দেখি নাই, এমন পবিত্র অপার্থিব বিষাদ দেখি নাই। ইহার সুন্দর ছন্দের কাতর মন্থরগতিতে সন্ধ্যার হৃদয়-ধ্বনি অনুভূত হয়, এবং তাহার আলুলায়িত কেশের শিথিল অন্ধকার উহার প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতার ভিতর ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

মানসীর উত্তরার্ধে মিত্রাক্ষর পয়ারে যে সকল কবিতা আছে (মেঘদূত, অহল্যা-বিদায়) তাহাদেরও ঠিক এইরূপেই প্রশংসা করা যাইতে পারে। বাস্তবিক এই সকল কবিতায় রবীন্দ্রবাবু বাংলা পয়ারকে নূতন করিয়া গড়িয়াছেন, তিনি তাহাকে অভিনব জীবন প্রদান করিয়াছেন। ইহা নিতান্ত তাঁহার নিজের সামগ্রী। তাঁহার পূর্বে কোন বঙ্গীয় কবি এইরূপে পয়ার রচনা করেন নাই। তাঁহার হস্তে ইহা এক অপূর্ব জীবন্ত দর্পিত গতি লাভ করিয়াছে। কবিতার তীব্র স্রোতে একটি চরণ কেমন আর একটির উপর তরঙ্গায়িত হইয়া উছলিয়া পড়িয়াছে! চরণের উপর চরণের এইরূপ উচ্ছ্বাসকে ফরাসী ভাষায় আঁজাবমাঁ (Enjambement) বলে। বাংলায় যেমন এই চতুর্দশ-মাত্রাত্মক পয়ার, ইংরাজীতে সেইরূপ আয়াম্বিক পেণ্টামিটার (Iambic Pentameter) এবং ফরাসী ভাষায় আলেকজাঁন্ড্রিন্ (Alexandrine)। এই তিন ভাষাতেই এই তিন ছন্দের প্রতি চরণের অন্তে যতি স্থাপিত হইয়া থাকে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। অধুনিক কালে ভিক্টর হুগো আলেকজাঁন্ড্রিন্-এর এই নিয়মের নিগড় খুলিয়া দিয়া সাহিত্যসমাজে মহা বিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, ফরাসী ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ না থাকিলেও এই শৃঙ্খলমুক্ত আলেকজাঁন্ড্রিন্ সর্বতোভাবে ইংরাজী অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্বাধীনতা, সৌন্দর্য এবং বাক্‌পটুতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, ভিক্টর হুগোর বহু পূর্বে এই আঁজাবমাঁ কখন কখন ব্যবহৃত হইত। রবীন্দ্রবাবুই কিন্তু এই প্রথমে বাংলা মিত্র পয়ারের পায়ের বেড়ী খুলিয়া দিলেন, এবং তাহাতে যে বাংলা সাহিত্যের বল এবং সৌন্দর্য কতদূর বর্ধিত হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহাকেই বলে প্রতিভার বিক্রম। ইঁহার এই মিত্রাক্ষর পয়ার পড়িয়া ইংরাজী পেণ্টামিটার-এর শীর্ষস্থানীয় শেলির এপিসাইকিডিয়ন (Epipsychidion) মনে পড়ে। ইংরাজী সাহিত্যেও উচ্চ শ্রেণীর কবি ভিন্ন মধ্য বা নিকৃষ্ট কবিদিগের লেখায় এরূপ পয়ার দেখিতে পাইবে না। পোপ (Pope) বা ড্রাইডেন (Dryden)-এ ইহা নাই, কিন্তু শেলি এবং কীটস্-এ ইহা

বহুল পরিমাণে দেখিবে। বাংলা যদি ফ্রান্স হইত, তাহা হইলে আজ রবীন্দ্রবাবু সাহিত্য-জগতে ভিক্টর হুগোর ন্যায় পূজা পাইতেন—তাহা হইলে তাঁহার এই অভিনব দৃপ্ত সুন্দর আবিষ্ক্রিয়ার জন্য দেশে হুলুস্থুল পড়িয়া যাইত, তাহা হইলে কচিৎ আমাদের ন্যায় দুই একজন পাঠকের মৃদু-কোমল প্রশংসার পরিবর্তে সহস্র রসজ্ঞ এবং কৃতজ্ঞ কণ্ঠের উচ্চ জয় রোলে বাংলা ব্যস্ত হইয়া উঠিত।

আমি দেখিতেছি ভারি বিপদে পড়িলাম, এত দিক্ হইতে মানসীর কবিতা সমূহের এত প্রশংসা করা যাইতে পারে যে, এক দিকের কথা বলিতে গেলে অপর সহস্র দিক পড়িয়া থাকে। এই এক ছন্দের কথা বলিতে গিয়া, আমি অন্যান্য নানা কথা ভুলিয়া যাইতেছি। উপর্যুক্ত অহল্যা নামক কবিতা এমন বিশাল ভাবে পরিপূর্ণ—ইহার ভিতর জড়জগতের সহিত এমন একটি অসাম ধাতুগত সহানুভূতি রাহিয়াছে যে, বোধ হয় যেন, Walt Whitman-এর সৃষ্টি বিশাল প্রাণ Shelley-র অমর বীণা লইয়া ঝঙ্কার করিতেছে। যে সকল অন্ধ এবং বধির পাঠক রবিবাবুকে তাঁহার সেই অপোগণ্ড কালের কবিতা সমূহের মধ্যে চিনিয়া রাখিয়াছেন, তাহাদিগকে এই অহল্যার প্রকাণ্ড কল্পনার পরিচয় লইতে বলি। তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে অহল্যার সেই 'নেত্রহীন মূঢ় রূঢ় অর্ধ জাগরণের' বিশাল চিত্র কি স্থান পাইবে? তাঁহার কি উদার মহত্ত্ব এবং মাধুর্যপূর্ণ ভাষা! কি স্নেহ-প্রীতিময়ী কল্পনা—উষার ন্যায় সরল শুভ্র আলোকময়ী দৃষ্টি। তাঁহার কবিহৃদয়ের বিশ্ব-ব্যাপিনী করুণা—এ সকলের আদর না দেখিলে মর্মে মরিয়া যাইতে হয়।

মানসীর 'বিদায়' নামক কবিতার পূর্বার্ধে বিদায়মান দিবসের বিষণ্ণ আলোক জড়িত রহিয়াছে, অপরার্ধে সন্ধ্যার শিথিল হৃদয়ের আকুলতা এলাইয়া পড়িয়াছে। শেষ কয়েকটি চরণে আকাশ, সাগর এবং সাগর-তীরের উল্লেখে বোধ হয়, যেন কোন্ সুদূর অপরিচিত দেশে কোন্ সীমাহীন শূন্য প্রান্তরের ভিতর সন্ধ্যার বিশাল বিজনতার মধ্যে আত্মহারা হইয়া ভাসিতেছি,—মাথার উপর সন্ধ্যাতারা কেবল তাহার শুভ্র বিমল দীপ্তি বর্ষণ করিতেছে। জীবনের একটি ক্ষণিক বিদায়ের বিরহ-বিষাদে থাকিয়া, কবি প্রিয়তম বা প্রিয়তমাকে মহাবিদায়ের সম্ভাষণ করিতেছেন। এ বিরহ প্রেমিকের বিরহ এবং কবির বিরহ। ইহারই অধীনে প্রেমিক কবি দেখিয়াছিলেন, 'ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে'। তাই সুদূর প্রবাসে থাকিয়া কবি বলিতেছেন—

"আকূল সাগর মাঝে চলেছে ভাসিয়া
জীবন তরণী। ধীরে লাগিছে আসিয়া
তোমার বাতাস, বহি' আনি' কোন্
দূর পরিচিত তরি হ'তে কত সুমধুর
পুষ্পগন্ধ, কত সুখস্মৃতি, কত ব্যথা,
আশাহীন কত সাধ, ভাষাহীন কথা।
সম্মুখেতে তোমারি নয়ন জেগে আছে
আসন্ন আঁধার মাঝে অস্তাচল কাছে
স্থির ধ্রুবতারাসম ; সেই অনিমেষ
আকর্ষণে চলেছি কোথায়, কোন্ দেশ
কোন্ নিরুদ্দেশ মাঝে !"

এবং বিশ্বচরাচরের সুন্দর উদার বিষন্ন পদার্থের সহিত আপনার স্মৃতি বিজড়িত রাখিয়া প্রেমাস্পদের নিকট ভবিষ্যৎ চিরবিদায় গ্রহণের কথা উত্থাপন করিতেছেন। প্রকৃতির হৃদয়ের সহিত এক সূত্রে গ্রথিত এমন কবিতা খুবই বিরল। ইহাতে যেন জড়-জগতের অব্যক্ত মায়া পড়িয়া রহিয়াছে। পড়িলে বোধ হয়, যেন প্রকৃতির কোন মহান্ বিশাল রাজ্যের ভিতর দিয়া চলিতেছি, যেন উদার বিস্তৃত সাগর বক্ষে ক্ষুদ্র দৈনিক জীবনের অবসাদ বিদূরিত করিতেছি,—যেন সংসারচক্রে ঘূর্ণ্যমান ক্লান্ত ম্লান হৃদয় প্রসারিত নিরবচ্ছিন্ন বিজনতার মধ্যে কি এক পবিত্র অথচ বিষাদপূর্ণ শান্তি উপভোগ করিতেছে, যেন হৃদয়ের সম্মুখে অনন্তের মহারাজ্য খুলিয়া গিয়া, কোথা হইতে এক মহান্ অথচ নিরুদ্দেশ উদ্দেশ্য আসিয়া প্রাণীকে ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে।

এইবার দেখিতেছি আমার কাজ ভারি কঠিন হইয়া উঠিল, এইবার আমি মানসীর প্রেম-কবিতাগুলির উল্লেখ করিব। কিন্তু আমার দরিদ্র ভাষায় তাহাদের উপযুক্ত প্রশংসা অসম্ভব। আমি নিজেই বুঝিতেছি, আমার সেরূপ বাক্যবিভব নাই, যাহাতে তাহাদের সহস্র গুণের এক অংশও প্রকাশ করিতে পারি। তাহাদের ভাব যেমন গভীর, অকপট ও মধুর, তাহাদের ভাষা ও ছন্দ সেইরূপ সরল, মধুর এবং গভীর রাগিণীতে বাঁধা। মানব-প্রেমের অসীমতা এবং অনন্ত গভীরতা মানসীর কবি যেমন অনুভব করিয়াছেন, এবং ভাষা ও ছন্দে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন, পৃথিবীর খুব অল্প কবিই তাহা পারিয়াছেন।

সকল দেশেরই সাহিত্যে প্রেম-কবিতার দৌরাত্ম্য একটু বাড়াবাড়ি। আমাদের দেশে ত কথাই নাই। এখানে বাগ্দেবীর বন্দনা শেষ না হইতেই, পঞ্চবাণের ষোড়শোপচারে পূজা। কিন্তু সুস্থ সুন্দর সরল কৃত্রিমতাহীন অথচ প্রেমের মধুর উন্মাদনায় পরিপূর্ণ, এমন কয়টি কবিতা আছে? বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে প্রকৃত প্রেমের আকুলতা ও গভীরতা পূর্ণমাত্রায় থাকিলেও, তাঁহাদের ভিতর অসীম বিস্তৃতির ভাব নাই। তাঁহাদের গান প্রায় একই কথায় পরিপূর্ণ, কিন্তু এক কথা হইলেও তাহা হৃদয়ের কথা এবং প্রগাঢ় অনুভবশক্তির পরিচায়ক। তাহা ছাড়া তাঁহাদের ভিতর অপ্রাকৃত কিছুই নাই, সেই জন্য একঘেয়ে হইলেও তাহারা চিরজীবনে জীবিত। কিন্তু মানসীর প্রেম-কবিতাগুলি কতই বিচিত্রভাবে পরিপূর্ণ, কত দিক হইতে কত বিভিন্ন অবস্থায় কবি প্রেমকে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহারা না কেবলমাত্র শরীরের মরুময় নিকৃষ্ট লালসায় জর্জরিত বা পীড়িত, না অপ্রেমিকের মিথ্যা আধ্যাত্মিকতার আড়ম্বরময় অহংভাবে স্ফীত বা বর্ধিতদেহ। তাহাদের ভিতর 'ছিব্‌লেমি' চটুলতা কিছুই নাই, কিন্তু অতল মানব-হৃদয়ের মর্মোচ্ছ্বাস আছে। মানবজীবনের পূর্ণ প্রদীপ্ত আকাঙ্ক্ষায় তাহারা জীবিত উন্মত্ত আকুল। বাস্তবিক মানুষের সমুদয় হৃদয়বৃত্তির মধ্যে প্রেমের যেমন শ্রেষ্ঠতা, তেমনিই সকল কবিতা বা গানের মধ্যে প্রেম-কবিতার শ্রেষ্ঠতা, সর্বতোভাবে সুন্দর প্রেম-গীতি বড়ই বিরল। আমাদের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব কবিরাই, ইহার চরম সৌন্দর্য দেখাইয়াছেন, এবং তাঁহাদের পরিসর ক্ষুদ্র হইলেও, তাঁহারা তাহারই মধ্যে কবিত্বের যথেষ্ট উৎকর্ষ প্রদর্শিত করিয়াছেন। ইংরেজ কবিদিগের মধ্যে বর্তমান শতাব্দীর পূর্বে একা Shakespeare-ই যেমন অপরাপর সকল বিষয়ে, সেইরূপ এ বিষয়েও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তারপর এই বর্তমান শতাব্দীতেই আমরা যাহা কিছু উচ্চদরের প্রেম-কবিতা দেখিতে পাই। রবীন্দ্রবাবুর কিন্তু শৈশব হইতেই প্রেম-কবিতায় অদ্ভুত অসাধারণ ক্ষমতা। তাঁহার রচিত প্রায় সকল প্রেম-কবিতাগুলিই সর্বতোভাবে সুন্দর, সেই ছেলেবেলার 'বালি ও আমার গোলাপবালা' হইতে আজিকার এই মানসীর 'আমার সুখ' পর্যন্ত, তাহাদের কোথাও ভাব, ভাষা বা ছন্দে একটুও খুঁত নাই। রবিবাবুর কবিতা সমূহের ভিতর তাহারা বসন্ত-প্রস্ফুটিত পুষ্পস্তবকের ন্যায় বা বিমল নৈশ আকাশে প্রস্ফুট-শ্রী তারকাপুঞ্জের ন্যায় 'উজ্জ্বল মধুর' শোভা বিকীর্ণ করিতেছে। অবার তাহাদের মধ্যে দু-একটির তুলনা নাই। একটির উল্লেখ করি,—'আজ

সখী মুছ'।* বাংলা, ইংরেজী বা ফরাসী সাহিত্যে মিলন এবং উপভোগের এমন স্বর্গীয় সঙ্গীত কেহ কখন শুনে নাই। ইহার উপযুক্ত প্রশংসা আমার ক্ষমতার বাহিরে। ইহাতে সমস্ত বসন্তের কুসুম-সুষমা, শারদ-জ্যোৎস্নার সমস্ত মোহ, এবং মলয় সমীরণের সমস্ত উন্মাদনা বর্তমান। ইহা পাঠে ইংরেজী সাহিত্যের ভিতর একটি অতি সুন্দর প্রেম-কবিতা মনে পড়ে। Maud-এর ভিতর বিরহ-বিধুর প্রেমের সেই মধুর অপেক্ষা ও আকাঙ্ক্ষাময় আহ্বান-সঙ্গীত; এই মিলন সঙ্গীতের যথার্থ দোসর।

মানসীর গোড়ার দিকের প্রেম-কবিতাগুলির ভিতর নবীন প্রেমের প্রথম বিরাগ ও বিরহের সুন্দর মোহ এবং জ্বালা—উপভোগ এবং অধীরতা—হর্ষ এবং বিষাদ, কি সুন্দর ছন্দেই বর্ণিত হইয়াছে। ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায় সুমধুর,—বাংলা ভাষায় তাহাদের তুলনা কোথায়? 'বিরহানন্দ', 'ক্ষণিক মিলন' প্রভৃতির ছন্দ, কবি দ্বিজেন্দ্রবাবুর নিকট ধার করিয়াছেন বটে—কিন্তু প্রথম দুইটি কবিতার অমৃত-মধুর ছন্দ তাঁহার নিজের রচিত। তাহাদের কি সুমিষ্ট ঝঙ্কার—কি সুন্দর গুঞ্জন—প্রতি শ্লোকের শেষ-ভাগে, মাত্রা এবং মিলনের কি অপূর্ব ছটা। কিন্তু এ সকল কবিতারও মধ্যে মিথ্যা কিছুই নাই, চটুল ছিব্‌লেমি বা ন্যাকামি নাই—প্রেমহীন বিরহের হাহুতাশ নাই, 'আন্ ছুরি', 'খাই বিষ' নাই। এখানে কোকিল অভিসম্পাত বা নির্বাসনের ভয় না রাখিয়া তাহার আনন্দবিকশিত কণ্ঠস্বরে ডাকিতেছে, এবং জ্যোৎস্নাও দাহিকাশক্তি অর্জন করিতে শিখে নাই। এখানেও কবির নিজ হৃদয় সত্য এবং স্বভাবের চিরসুস্থতার ভিতর আছে বলিয়াই আর সকলই প্রকৃতিস্থ। আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Byron-দিগের বোধ হয় ইহা ভাল লাগিবে না।

গ্রন্থের শেষের দিকে কবিতাসমূহে যে প্রেম ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা পূর্ণ, উন্নত এবং গভীর। সে প্রেম পরিণত মানব-জীবনের প্রেম। ইহাতে মানুষকে পরিপূর্ণ এবং পবিত্র করে। জীবনের সম্যক স্ফূর্তি এবং বিকাশ আনিয়া দেয়। এ প্রেম জীবনের একটি ক্ষুদ্র অংশ বা পরিচ্ছেদ নয়—সমস্ত মানব-জীবনই এই প্রেমের। যেখানে এ প্রেম নাই, সেখানে মানব-জীবনের পূর্ণতাও নাই। সূর্যালোকে যেমন দিবসের শূন্য হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া রাখে, এ প্রেমও সেইরূপ মানবহৃদয়কে পরিপূর্ণ করে। ইহাতে সঙ্কীর্ণ

* ভানুসিংহের কবিতা দেখ।

হৃদয় বিস্তীর্ণ হয়, ক্ষুদ্র হৃদয় উন্নত হয়, অলস হৃদয় উদ্যমে জাগ্রত হয়। এক কথায় ইহা প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদ উভয়েরই মুক্তিসাধন করে।,

গ্রন্থের দুই দিকের প্রেম-কবিতাগুলির ভিতর যেমন ভাগবত বৈষম্য লক্ষিত হয়, তেমনই আবার তাহাদের ছন্দ ও গঠনের বিভিন্নতা আছে। পূর্বদিকের কবিতাগুলির ছন্দের বেশ চটক আছে। তাহাদের মাধুর্য মদিরতামিশ্রিত, তাই পাঠককে ক্রমশঃ ক্লান্ত করিয়া আনে। অপরার্ধের কবিতাগুলির মধুরতার ভিতর নিসর্গের মহৎ বস্তুর উদারতা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহাদের সৌন্দর্য উপ-ভোগে প্রাণ উত্তরোত্তর বিকশিত হয়। প্রথমার্ধ বসন্তের উৎফুল্ল কোলাহলে ব্যস্ত, অপরার্ধ সাগরোর্মির মধুর, উদার নির্ঘোষে ধ্বনিত হইতেছে।

এই সকল কবিতা আবার কলা-কৌশলে ইউরোপীয় প্রধান কবিদিগের রচনা অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে, কিন্তু ভাবের ঔদার্যে এবং রসের গভীরতায় তাহাদিগের অপেক্ষা অনেকগুণে উচ্চ। শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় হৃদয়েও প্রেমের এতদূর মৌলিকতা এবং গভীরতা নাই, সুতরাং ইউরোপে এরূপ কবিতা এখনও জন্মে নাই। কই আমি ত ইংরেজী বা ফরাসী কবিদিগের গ্রন্থাবলীর ভিতর 'পূর্বকালে' বা 'অনন্ত প্রেম' প্রভৃতির ন্যায় কবিতা দেখি নাই।

এই দুইটি কবিতারই মর্মকথা—যাহাকে ভাল বাসিয়াছি, তাহাকে কি সবে এই মাত্র এই জন্মে ভাল বাসিলাম? আমার হৃদয়ে এই যে প্রেমের প্রগাঢ়, দুরন্ত, নিবিড় অনুভব, ইহা কি আজিকার? এই বিশ্ববিলোপী প্রেমের স্রোত কি একদিনে জন্মিয়াছে, না অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে? আমরা যে আজ উভয়ের প্রেমে আত্মহারা, ইহার কি পূর্বাপর নাই? সুদূর অতীতে আমাদের মত যাহারা ভাল বাসিয়াছিল, তাহাদের সেই মহান্ অনুভবের ভিতর কি আমরা ছিলাম না? এবং ভবিষ্যতে কি এই মহান্ অনুভব নিবিয়া যাইবে? সকল প্রেমিকের মাঝে আমরা ছিলাম, আছি, এবং থাকিব। বর্তমানে নিখিল জগতের সমস্ত প্রেম আমাদের দুইজনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। Walt Whitman-এ এই ধরনের কথা মাঝে মাঝে দেখা যায় বটে, কিন্তু Walt Whitman মার্কিন দেশীয়, এবং অনেকটা প্রাচ্যভাবে দীক্ষিত।

'ধ্যান' নামক কবিতাটির সুন্দর ভাব কেবলমাত্র আমাদেরই দেশের ভিতর বদ্ধ না থাকিলেও, অনুভবের গভীরতায় Hugo বা Shelley-র শ্রেষ্ঠতম রচনার সমান।

"তোমার পাইনে কূল,
আপনা মাঝারে আপনার প্রেম
তাহারো পাইনে তুল।
উদয় শিখরে সূর্যের মত
সমস্ত প্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষ-নিহত
একটি নয়ন সম ;
অগাধ অপার উদাস দৃষ্টি
নাহিক তাহার সীমা।
তুমি যেন ওই আকাশ উদার ;
আমি যেন এই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দ পূর্ণিমা !
তুমি প্রশান্ত চির নিশিদিন,
আমি অশান্ত বিরাম বিহীন
চঞ্চল অনিবার,
যতদূর হেরি দিগদিগন্তে
তুমি আমি একাকার !"

কৈ Hugo বা Shelley-র ভিতর এমন সুন্দর পরিপূর্ণ কবিত্বের আকুল উচ্ছ্বাস দেখি নাই।

মানসীতে এখনও নানা বিষয়ক কত কবিতা আছে যাহাদের এ পর্যন্ত নাম উল্লেখ করিতে পারি নাই। তাহাদের ভিতর অনেকগুলিই উপরে সমালোচিত কবিতা সমূহের ন্যায় সুন্দর। যে কবিতার ভিতর এমন অতুলনীয় শ্লোক আছে, তাহার সম্যক প্রশংসা করিতে গেলে 'ভাষা' 'মৌন' হইয়া পড়ে।

"আঁখি দিয়ে যাহা বল সহসা আসিয়া কাছে
সেই ভাল, থাক তাই, তার বেশী কাজ নাই,
কথা দিয়ে বল যদি মোহ ভেঙে যায় পাছে !

এত মৃদু এত আধো, অশ্রুজলে বাধো বাধো
সরমে সভয়ে ম্লান এমন কি ভাষা আছে ?
কথায় বলোনা তাহা আঁখি যাহা বলিয়াছে !”

যে সকল পাঠক মানসীর অপর কোন অংশ বুঝিতে বা তাহার সৌন্দর্য অনু-ভব করিতে পারেন নাই, তাঁহারাও ‘নব বঙ্গ-দম্পতির প্রেমালাপের’ রহস্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। ‘নিষ্ফল উপহারের’ বাঁধাবাঁধি ছন্দ, নিয়ন্ত্রিত রচনা, এবং ভাবের শাসন, বঙ্গ সাহিত্যে অদ্বিতীয়। দুরন্ত কশাঘাতে বাঙালী ভিন্ন অপর সকল জাতির মনে লজ্জা ও ঘৃণার উদ্রেক হইতে পারে। তাহাতে যে বেদুইনের বর্ণনা আছে তাহা কোন্ শ্রেষ্ঠ কবির না উপযুক্ত ? ‘শূন্য ব্যোম অপরিমাণ মদ্য সম করিতে পান’—ওমর খায়্যমের যোগ্য—সহসা শুনিলে তাঁহারই কথা বলিয়া ভ্রম হয়। ইহার পরের দুইটি কবিতা যদি আমাদিগের বঙ্গবীরেরা প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করেন, তাহা হইলে বুঝি একদিন ভারত উদ্ধারের পথ হইতে পারে। ‘সুরদাসের প্রার্থনায়’ সৌন্দর্য-বিধুর প্রেমবিহ্বল কবিহৃদয়ের কি সুন্দর কাতর চিত্রই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একটি মাত্র কবিতা রচনার দ্বারা অনেকেই প্রভূত কবি-যশ অর্জন করিতে পারে। কিন্তু রবিবাবুর অক্ষয় ভাণ্ডারে ইহা একটি সামান্য ক্ষুদ্র রত্ন। ইহাতে তিনি হৃদয়-উচ্ছ্বাসের সঙ্গে এমন হৃদয় বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে, যেন Browning ও Shelley একত্র মিলিত হইয়াছে। ইহার উপান্ত Stanza-র সুন্দর কবিত্বময় বর্ণনা একবার মাত্র পাঠে মনে চিরকাল রহিয়া যায়। কেমন অল্প কথায়, উজ্জ্বল উপমার গুণে, ‘ভীষণ মধুরের’ প্রদীপ্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে—

“উজ্জ্বল যেন দেব রোষানল,
উদ্যত যেন বাজ !”

দুইটি বন্ধুকে লিখিত দু’খানি পত্রের ভিতর বন্ধুহৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহশীলতা কবিতার স্রোতের সঙ্গে কেমন সুন্দর মিলিয়া-মিশিয়া গিয়াছে। ইহাদেরও ভিতর স্বভাববর্ণনে কবির স্বাভাবিক মোহমন্ত্র পরিস্ফুট—

“যেনরে সরম টুটে’ কুমুদ আর না ফুটে
কেতকী শিহরি উঠে করে না আকুল !”

এই কয়টি কথায় যেন ভরা শ্রাবণের মেঘ-স্নিগ্ধ হৃদয়ের আলোক ও ছায়া, সৌরভ এবং শ্যামকান্তি প্রাণে আসিয়া পড়ে।

'নারীর উক্তি' এবং 'পুরুষের উক্তি' ভাল হইলেও আদর্শের উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে নাই। প্রথমটির আরম্ভ অবিকল Browning-এর মত হইলেও, পরে তাঁহার অসাধারণ বিশ্লেষণ শক্তির কিছুই দেখিলাম না। Browning-এর কথার ধারই ইহাতে নাই, এবং ইহার ভিতর মানব-জীবনের কোন রহস্য উদ্ভাবিত হয় নাই। 'পুরুষের উক্তি'তে কিন্তু একটি বেশ গভীর সত্য প্রকটিত হইয়াছে—

"কেন তুমি মূর্তি হয়ে এলে,
রহিলে না ধ্যান-ধারণার।
সেই মায়া-উপবন, কোথা হল অদর্শন
কেন হায় ঝাঁপ দিতে শুকাল পাথার!"

তাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অসীম সুন্দর গদ্য-কাব্যের নায়িকা নায়কের সহিত কেবলমাত্র এক রাত্রি প্রেম-সম্ভোগের পর চিরকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া বলিয়াছেন;—"তোমার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আমার নিকট আসিবার জন্য নিয়তই তাহার পক্ষ সঞ্চালন করিবে। আমি তোমার চির-বাঞ্ছিত হইয়া রহিব। তোমার লুব্ধ কল্পনা আমাকে পাইবার জন্য অনুদিন উৎসুক থাকিবে।" —(Mademoiselle de Maupin)। 'শূন্য গৃহে' এবং 'জীবন মধ্যাহ্নে' দুইটিই আমাকে বড় ভাল লাগিয়াছে। তাহাদের ভাষা ও ছন্দের পরিপাট্য এবং ভাবের গাম্ভীর্য বড়ই হৃদয়গ্রাহী। নিম্নলিখিত শ্লোকের রস কি সরল সুন্দর ভাষাতেই ব্যক্ত হইয়াছে ("কাল ছিল প্রাণ জুড়ে…হেন বজ্রাঘাত" ৭৬ পৃঃ) "তারায় তারায় তার ব্যথা গিয়ে লাগে"—সৌন্দর্যে ইহা Tennyson-এর "Star to star vibrates light"-এর অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। 'জীবন মধ্যাহ্নের' ন্যায় দ্বিতীয় কবিতা বাঙলা ভাষায় দেখি নাই। ইহা সুন্দর ধর্মভাবে পরিপূর্ণ, এবং পূর্ণ প্রাণের উক্তি। ইহাতে কোনরূপ ভান বা আড়ম্বর, কোনরূপ ভঙ্গী বা ভেঙান নাই। হৃদয়ের যথার্থ ভাবই যথাযথ চিত্রিত হইয়াছে। ইহার এক একটি উপমা অতি মনোহর—

"লজ্জা বস্ত্র জীর্ণ শত ঠাঁই।"

"—শস্যশীর্ষরাশি
ধরার অঞ্চলতল ভরি,—"

আর দুইটি কবিতার উল্লেখ করিয়াই এই দীর্ঘ প্রবন্ধের শেষ করিব।

'নির্মল কামনা' একটি নিতান্ত অভিনব পদার্থ। আমাদের ধারণা ছিল যে, বাংলা ভাষায় অমিত্র ছন্দে এমন কবিতা রচিত হইতে পারে না। মিলের অভাবে তাহা নিতান্ত শোভাহীন ও শুনিতে নিতান্ত শ্রুতিকঠোর বোধ হইবে। কিন্তু রবিবাবু দেখাইলেন যে, এইরূপ মাত্রাবিভাগে বেশ সুন্দর অমিত্র ছন্দ রচিত হইতে পারে।

'উচ্ছৃঙ্খল' নামক কবিতাটির ভিতর কি চমৎকার, কি সুন্দর, কি কারুণ্য-পূর্ণ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। উচ্ছৃঙ্খলের কি নূতন, কি পরিপূর্ণ চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার ভাবে কি গভীরতা! ছন্দে কি আকুলতা! ভাষায় কি তরঙ্গ! এমন সুন্দর কবিতা কখন পড়ি নাই। ইহার ভাষা ও ছন্দ সর্ব-শ্রেষ্ঠ গীতিকবিদিগের ভাষা ও ছন্দের ন্যায় উন্মুক্ত এবং উদার। Shelley বা Swinburne-এর ইংরেজী, Hugo বা Leconte de Lish-এর ফরাসী, ভবভূতি বা জয়দেবের সংস্কৃত ইহা অপেক্ষা কোন অংশে বেশী গৌরবান্বিত নহে। কেহ যদি ইহাকে নিতান্ত অন্যায় প্রশংসা বিবেচনা করেন, তাঁহার নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, তিনি যেন উপর্যুক্ত কবিদিগের গ্রন্থাবলী হইতে শ্রেষ্ঠতর রচনা আমাকে দেখাইয়া দেন।

উপসংহারে কি বলিতে হইবে যে, মনিসীর কবিতাগুলি ভাবপ্রধান না বস্তুপ্রধান? তাহারা কোন্ বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, ত্রবং তাহাদের ভিতর কবি কি গুপ্ততত্ত্ব নিহিত করিয়াছেন? অতি আহ্লাদের সহিত বলিতেছি, আমরা এ সকল বিষয়ে কিছুই জানি না, এবং জানিতেও চাহি না। কেবল এই মাত্র জানি যে, সৌন্দর্য-অনুভবে তাহাদের জন্ম, এবং সুন্দর অভিব্যক্তিতে তাহাদের বিকাশ। যেখানে এই দুইটি আছে, সেখানে অপর সকলই আছে বা আর কিছুরই প্রয়োজন নাই। কাব্য সম্বন্ধে—আর কেবলই কাব্য সম্বন্ধে কেন?—সমস্ত কলাবিদ্যা সম্বন্ধে প্রথম এবং শেষ কথা এই যে, সমালোচনা বিষয়টি সৌন্দর্যব্যঞ্জক কিনা? যদি তাহাতে সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ থাকে, তবে অপর হাজার কেন অভাব তাহার থাকুক না, তাহাতে কিছুমাত্র আসিয়া যায় না—তাহাতে তাহার নিজ উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে; কিন্তু হাজার অপর গুণের আধার হইয়াও যদি তাহাতে সৌন্দর্যের স্ফূর্তি বা বিকাশ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা একেবারে অপদার্থ। তাহার নিজের উদ্দেশ্য তাহাতে সাধিত হয় নাই। পৃথিবীতে তাহার স্থান বা প্রয়োজন নাই। আমার

যতটুকু রসাস্বাদনশক্তি আছে, তাহাতে আমি নিঃসংশয়ে নির্দেশ করিতে পারি যে, মানসীতে সৌন্দর্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হইয়াছে। সুতরাং ইহার জাতি বা সম্প্রদায় নির্বাচনের প্রয়োজন দেখি না। ইহা প্রথম শ্রেণীর কাব্য। প্রথম শ্রেণীর কাব্যের এই এক অসাধারণ গুণ যে, তাহার সহিত কাহার কোন বিবাদ বিসম্বাদ থাকিতে পারে না, সকল শ্রেণীর লোক তথায় স্থান পাইতে পারে। তাহাতে কোন সাম্প্রদায়িকতা নাই বলিয়া, সকল সম্প্রদায় তাহার উদার সৌন্দর্যের অসীমতার ভিতর মিলিত হইতে পারে। সে কবিতা বিষয় অনুসারে বস্তুগত বা ভাবগত। তাহার সৌন্দর্য যেমন অনুভবে, তেমনি অভিব্যক্তিতে,—যেমন কল্পনায়, তেমনি রচনায়—যেমন অন্তর্দৃষ্টিতে, তেমনি বহির্দৃষ্টিতে। তাহা যেমন জপিবার, তেমনি মাতিবার এবং মাতাইবার। মানসীর ভিতর এমন অনেক কথা আছে, যাহা পাঠে হৃদয় তাহার অন্ধ রুদ্ধ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিশ্বচরাচরে ছড়াইয়া পড়ে—সমস্ত সৃষ্টির ভিতর ব্যাপ্ত হইয়া যায়—ব্যাকুল প্রাণ জগতের মাঝখানে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে, আপনাতে আপনি থাকিতে না পারিয়া জগৎসংসারের মাঝে সংসার রচনা করে, এবং সমস্ত মানবহৃদয়ের সহিত মিলিত হয়। আবার এমনও কথা আছে যে, হৃদয় নিজের প্রচ্ছন্নতর অন্তঃপুরমধ্যে সেই একই কথার ধ্যানে নিমগ্ন হয়। বিশ্ব তখন বিলুপ্ত—জগৎ—শূন্য। প্রাণ—প্রাণেরই ভিতর প্রবিষ্ট ও আপনাতে আপনিই বিভোর। এইরূপে মানসীতে পূর্ণতম সৌন্দর্য, উচ্চতম কবিত্ব, এবং শ্রেষ্ঠতম আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে। সত্যই ইহা "শ্রেষ্ঠতম প্রাণের বিকাশ" বাঙলা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন এবং কাব্যামোদী ব্যক্তিমাত্রেরই আদরের বস্তু।

চিত্রাঙ্গদা

প্রমথ চৌধুরী

রবীন্দ্র-পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীমান্ সোমনাথ মৈত্র আমাকে আপনাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সমন্ধে দু'চার কথা বলবার জন্য বহুবার অনুরোধ করেছেন। তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতে আমি সদাই প্রস্তুত, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি বরাবরই ইতস্ততঃ করেছি। কারণ রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সমালোচনা করতে আমি ভয় পাই।

এ বিষয়ে যখনই কিছু বলবার প্রবৃত্তি মনে জেগে ওঠে, তখনই এ প্রশ্নও আমার মনে উদয় হয় যে, কাব্য-সমালোচনা করবার সার্থকতা কি? আমি জানি যে, সমালোচনা জিনিসটে সাহিত্য-জগতের অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। বরং আমাদের স্কুল-কলেজে কবির চাইতে সমালোচকেরই প্রাধান্য বেশী। প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক তেইন্-এর ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস আমরা অনেকেই পড়েছি। কেননা ইংরেজী সাহিত্যের এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য সে বই আমরা অধ্যয়ন করতে ও যথাসাধ্য কণ্ঠস্থ করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু উক্ত বিপুল সাহিত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় অমোদের ক'জনের আছে? এ ক্ষেত্রে সমালোচনা কাব্যের রসাস্বাদ করবার পক্ষে একটি অন্তরায় মাত্র। কোনো বিশেষ ভাষার সমগ্র কাব্যের ইতিহাসের কথা ছেড়ে দিলেও একটি বিশেষ কবির কাব্যের রসাস্বাদ করবার পক্ষেও তার উক্তরূপ সমালোচনা তেমন অনুকূল নয়। গেরফিনুস Gervinus অথবা Dowden ডাউডেনের সমালোচনা পড়ে ক'জন পাঠক-শেক্স্পীয়ারের কাব্যের রসগ্রাহী হয়েছেন। আমরা যখন তেইন্ পড়ি অথবা গেরফিনুস পড়ি, তখন আসলে সমাজ ও সংসার সম্বন্ধে তাঁদের

দ্রষ্টব্য: 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্য ১২৯৯ সালের ভাদ্র মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের আলোচনায় দুইটি বিরুদ্ধ মতবাদ সূচিত হয়। বিরুদ্ধ-মতবাদী কবি দ্বিজেন্দ্রলালের বক্তব্যটি পরবর্তী নিবন্ধে মুদ্রিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম আত্মীয় এবং রবীন্দ্র-সাহিত্য ব্যাখ্যাতা প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের 'বীরবল' ইহার একটি আলোচনা করেন। এই আলোচনাটি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র-

ফিলসফিই পড়ি। এ জাতীয় ঐতিহাসিক দার্শনিক সমালোচনার গলদ এই যে, কাব্যের আত্মা দেশকালের মধ্যে আবদ্ধ নয়, আর কাব্যরসিক মাত্রই জানে যে, কাব্য হচ্ছে ফিলসফির বহির্ভূত, কারণ মানবাত্মার যে মূর্তির সাক্ষাৎ কাব্যে পাওয়া যায়, তার সাক্ষাৎ দর্শনে মেলে না।

আমার কথা ভুল বুঝবেন না। আমি একথা বলতে চাই নে যে, কবি ফিলসফার হতে পারে না, আর ফিলসফার কবি হতে পারে না। পৃথিবীতে এমন কবিও আছেন যাঁকে লোকে মহাদার্শনিক মনে করে, অপর-পক্ষে এমন দার্শনিক আছেন যাঁকে লোকে মহাকবি মনে করে। প্লেটোর দর্শন তো কাব্য বলে ইউরোপে বহুকাল থেকে গণ্য হয়েছে। এমন কি স্পিনোজার এথিক্স্ জিয়োমেট্রির পদ্ধতিতে লেখা হলেও, তা অনেকের কাছে একখানি মহাকাব্য। অপরপক্ষে শেলি শেক্স্পীয়ারের ফিলসফি নিয়ে ইংলণ্ডে কত-না আলোচনা হয়েছে। এমন কি ফিলসফি অব রবীন্দ্র-নাথ নামক একখানি গ্রন্থ আছে। অপরপক্ষে উপনিষদ, কাব্য কি দর্শন, তা আজও মনীষিবৃন্দ ঠিক করতে পারেন নি। কবির সঙ্গে দার্শনিকের প্রভেদ কোথায়, intuition-এর সঙ্গে concept-এর প্রভেদ কি সে তর্ক আজ তুলতে চাইনে, কেন না সে আলোচনা হবে আগাগোড়া দার্শনিক, অতএব অপ্রাসঙ্গিক। উপরন্তু আমার পক্ষে সে চর্চা নিতান্তই অনধিকারচর্চা।

আমি শুধু এই সত্যটি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কাব্য-সমালোচক মাত্রেই কতক অংশে ফিলসফার হতে বাধ্য। আমাদের দেশের অলংকারশাস্ত্র দর্শনশাস্ত্রের একটি শাখা বিশেষ। গ্রীসে অ্যারিষ্টটল যে শ্রেণীর লোক ছিলেন, এদেশের অভিনব গুপ্তও সেই শ্রেণীর লোক। উভয়েই নৈয়ায়িক।

আগে একটা দার্শনিক মত খাড়া ক'রে তারপর সেই মতানুসারে কাব্যের হীনতা বা শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করবার চেষ্টা যে বৃথা, সে জ্ঞান আজকের লোকের

পরিষদে প্রথম পঠিত হয় ১৩৩৪ সালে। ইহা পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধ-সংগ্রহে' (প্রথম খণ্ড—১৩৫৯) মুদ্রিত হইয়াছে।

'চিত্রাঙ্গদা'র কাহিনীটি লইয়া পরবর্তীকালে কবি 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা' (১৩৪৩) রচনা করিয়া-ছিলেন। অতঃপর 'চিত্রাঙ্গদা' নানা ধরনের সংস্করণে মুদ্রিত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত পরবর্তী নিবন্ধের 'দ্রষ্টব্য' দেখুন।

হয়েছে। তাতেই ফরাসী দেশের নবযুগের সমালোচকেরা নিজেদের ইমপ্রেশনিষ্ট বলে পরিচয় দেন, অর্থাৎ তাঁদের মতে কাব্যবস্তু হচ্ছে সহৃদয়হৃদয়সংবাদী। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা এ আশাও করেন যে, তাঁদের মতামতের universal validity আছে। কোনো সমালোচকের পক্ষে এ আশা ত্যাগ করা অসম্ভব। কারণ আমি যখনই কোন মতকে সত্য বলে মনে করি, তখনই মনে করি যে, তা সকলের পক্ষে সত্য। তেমনই, যখনই বলি এ বস্তু সুন্দর তখনই এ কথাটা উহ্য রয়ে যায় যে, তা সকলের কাছেই সুন্দর। ইউনিভার্সাল ভ্যালিডিটি অবশ্য দর্শনের বিষয়। সুতরাং আমি রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে যতই অদার্শনিক কথা বলি-না কেন, একটা-না-একটা ফিলসফি তার মধ্যে থেকে উঁকি মারবে। আর সে ফিলসফি যে কত কাঁচা অথবা পচা, তা ধরা পড়বে আপনাদের দার্শনিকচূড়ামণি প্রেসিডেন্টের কাছে। অথচ কি করা যায়? কাব্য ম্যাজিক হতে পারে, কিন্তু সমালোচনা লজিক হতে বাধ্য।

আর-এক জাতীয় সমালোচনা আছে, যার রিজ্ন্-এর সঙ্গে কোনোই সম্পর্ক নেই, যা ষোলআনা আনরিজ্ন্-এর ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এ জাতীয় সমালোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো কাব্যবিশেষের নিন্দা কিংবা প্রশংসা করা। প্রায়ই দেখা যায়, এ নিন্দা-প্রশংসার মূল হচ্ছে রাগ-দ্বেষ। কোনো কারণে কবি নামক মানুষটির উপর বিরক্ত হলে সমালোচক তাঁর কাব্যের নিন্দা করেন এবং অনুরক্ত হলে প্রশংসা করেন। এ অনুরাগ-বিরাগ কাব্য-জগতের কথা নয়; আমাদের এই চিরদিনের সমাজ-সংসারের কথা। এ রকম সমালোচনার জন্মস্থান হচ্ছে হৃদয়। আলংকারিকরা যে হৃদয়ের কথা বলেন এ সে হৃদয় নয়, রক্তমাংসে-গড়া সেই হৃদয়, যা প্রাণী মাত্রেরই বুকের ভিতর দিবারাত্র ধড়ফড় করছে। সুখের বিষয়, এই মাংসপিণ্ড হতে আমি কোনোরূপ মতামত উদ্ধার করতে পারিনে। তা যে পারিনে তার প্রমাণ, সাহিত্যিক হিসাবে কেউ কেউ আমার সুখ্যাতি করেন, কেউ কেউ বা অখ্যাতি। কিন্তু এ বিষয়ে সবাই একমত যে, আমার অন্তরে হৃদয় বলে পদার্থটি নেই। আপচ্ছান্তি।

এতদ্ব্যতীত আর-এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন যাঁরা কাব্যের বিচারক। এইসব কাব্যজগতের ধর্মাধিকরণের দল, কোন্ কবি কাব্যের কোন্ বিধি পালন করেছেন ও কোন্ নিষেধ অমান্য করেছেন, সেই অনুসারেই কাব্যের সপক্ষে বা বিপক্ষে রায় দেন। আমি কাব্যের এরূপ বিচারক হতে পারিনে,

কারণ কাব্য-জগতের অলঙ্ঘ্য নিয়মাবলীর অস্তিত্ব আমি মানি নে। কাব্যেরও অবশ্য law আছে, কিন্তু প্রতি যথার্থ কবিই হচ্ছেন তাঁর rules-এর স্রষ্টা। যে নিয়মের সাক্ষাৎ কালিদাসের নাটকে দেখতে পাই সে নিয়মাবলীর সাহায্যে শেক্স্‌পীয়ারের নাটক বিচার করা যায় না। বের্গসঁ যাকে বলেন creative evolution, কাব্যজগতে সৃষ্টির মূল পদ্ধতি যে তাই সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া আপনারা আমাকে রবীন্দ্র-সাহিত্যের উপর জজিয়তি করবার জন্য আহ্বান করেন নি, কারণ সে কাজের ভার তো মাসিক সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রেরাই অযাচিত ভাবেই নিয়েছে।

রবীন্দ্র-পরিষদের প্রস্তাবে সম্মত হবার পূর্বে আমার ইতস্ততের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, আমাকে বক্তৃতা করতে হবে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে। আমাকে এ ক্ষেত্রে প্রমাণ করতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ একজন কবি ? জগদ্‌বিখ্যাত ইতা-লীয় দার্শনিক ক্রোচে কাব্যসমালোচকদের বিদ্রূপ করে বলেছেন, পৃথিবীতে, কোনো দেশে কোনো কালে মানবজাতি কি তোমাদের সার্টিফিকেটের উপর আস্থা রেখে কাউকে কবি বলে স্বীকার করেছে, না, লোকমতে যাঁরা কবি বলে গণ্য ও মান্য হয়েছেন, তাঁদের সম্বন্ধেই তোমরা মুখর হয়ে উঠেছ ? ইতালিতে দান্তে ও বিলাতে শেক্স্‌পীয়ার লোকমতে বড় কবি বলে গণ্য হবার পরেই না তোমরা তাঁদের বিষয়ে বক্তৃতা করতে আরম্ভ করেছে ? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হচ্ছে, হাঁ, তাই। একথা যে সত্য তার প্রমাণের জন্য সাগর-লঙ্ঘন করবার প্রয়োজন নেই। রামায়ণ ও মহাভারত যে মহাকাব্য সে বিষয়ে লোকমত সমালোচকের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

এ থেকে এই প্রমাণ হয় যে, কবি-বিশেষ যে কবি, এই কথাটা মেনে নিয়েই তাঁর কাব্যের আমরা সমালোচনা করতে পারি। কারণ কবিত্বশক্তি বস্তু যে কি, তা লজিকের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না। তা যে যায় না তা মানুষ বহুকাল পূর্বে বুঝতে পেরেছে। আমাদের দেশের প্রাচীন আলংকারিক বামনাচার্য বলেছেন যে, 'কবিত্ববীজং প্রতিভানম্‌' এবং উক্ত সূত্রের তিনি বক্ষ্যমাণরূপ ব্যাখ্যা করেছেন—

'কবিত্বস্য বীজং কবিত্ববীজং, জন্মান্তরাগতসংস্কারবিশেষঃ।'

এ ব্যাখ্যা কি খুব পরিষ্কার ? 'জন্মান্তরাগতসংস্কারবিশেষঃ' বলায় শুধু বলা

হয় যে, কবিত্বশক্তি আলৌকিক শক্তি অর্থাৎ মিষ্টিরিয়স্। আমরা অপরের প্রতিভা থাকলে তা চিনতে পারি, কিন্তু তা যে কি তা স্পষ্ট করে বলতে পারিনে। এর কারণ প্রতিভা স্বপ্রকাশ। কিন্তু তা প্রকাশ করে বলবার প্রয়াস বৃথা। এই চেষ্টা যে ব্যর্থ তার প্রমাণ অ্যারিষ্টটল থেকে হেগেল পর্যন্ত সকল দার্শনিকই দিয়েছেন। প্রতিভার সন্ধান যে সাইকোলজি নামক বিজ্ঞানের মধ্যে পাওয়া যায় না তার প্রমাণ, ও-বস্তুর মূল কারণ একালের বৈজ্ঞানিকেরা ফিসিঅলজির অন্তরে খুঁজেছেন। প্রতিভা যে একরকম insanity এ মতও ইউরোপে প্রাদুর্ভূত হয়েছে। সে মত সত্য কি মিথ্যা তা আমি বলতে পারি নে। আমার বক্তব্য এই যে, প্রতিভা যদি একরকম ইন্স্যানিটি হয়, তাহলে এজাতীয় ইন্স্যানিটি অনেকেই বরণ করে নেবেন, অন্ততঃ আমি তো নেবই। এই প্রতিভার স্পষ্ট কার্য হচ্ছে আমাদের মনকে উদ্দীপ্ত ও আলোকিত করা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের স্পর্শে যাদের মন আলোকিত হয়ে ওঠে, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা নিজেই realise করেছেন, আর সে আলোক যাঁদের অন্তরে প্রবেশ করেনি লজিকের সাহায্যে তাঁদের অন্তরের রুদ্ধ বাতায়ন উন্মুক্ত করে দিতে আমি পারব না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ এক-জন কবি ও মহাকবি এই কথাটি মেনে নিয়েই তার একটি বিশেষ কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করব।

কোনো কবিকে বড় কবি বলে স্বীকার করতে বাধ্য হলেও তাঁর কাব্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার জিজ্ঞাসা আমাদের মনে উদয় হয়। এ ক্ষেত্রে মূল প্রশ্ন হচ্ছে, কাব্যের প্রয়োজন কি? প্রশ্ন বহু পুরাতন। আমাদের দেশের প্রাচীন আলংকারিকরা এ প্রশ্নের যা হোক একটা-না-একটা উত্তর দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমি তাঁদের মতের দু'একটা উল্লেখ করব। এ স্থলে বলে রাখা আবশ্যক যে, আমি ফাঁক পেলেই যে সংস্কৃত আলংকারিক-দের মতামত পাঁচজনকে ফুর্তি করে শোনাই, তার কারণ এ নয় যে, আমি তাঁদের কথা এ বিষয়ে চূড়ান্ত বলে বিশ্বাস করি কিংবা তাঁদের মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করি। আলংকারিক হিসাবে অ্যারিষ্টটল বড় কিংবা দণ্ডী বড়, হেগেল বড় কিংবা বিশ্বনাথ বড়, সে বিচার করবার শক্তিও আমার নেই, প্রবৃত্তিও আমার নেই। আমি যে সংস্কৃত আলংকারিকদের দোহাই দিই তার একমাত্র কারণ আমি বাংলা ভাষায় কথা কই, আর সংস্কৃত কথা

বাংলা ভাষার মধ্যে যত সহজে বেমালুম খাপ খায়, গ্রীক ও জর্মান কথা ততই সহজে সমালুম বেখাপ্পা হয়।

এখন প্রস্তুত বিষয়ে ফিরে আসা যাক। বামনাচার্য বলেছেন—

'কাব্যং সদৃষ্টাদৃষ্টার্থম্ প্রীতিকীর্তিহেতুত্বাৎ।'

বামন নিজেই উক্ত সূত্রের বক্ষ্যমাণ ব্যাখ্যা করেছেন—

'কাব্যং সচ্চারু দৃষ্টপ্রয়োজনম্ প্রীতিহেতুত্বাৎ।
অদৃষ্টপ্রয়োজনম্ কীর্তিহেতুত্বাৎ॥'

সংস্কৃত শাস্ত্রকারেরা এত সাঁটে কথা কন যে, আমাদের পক্ষে তাঁদের রচিত সূত্র যেমন সহজবোধ্য তার ব্যাখ্যাও প্রায় তদ্রূপ। আমি অনুমান করছি যে, বামনাচার্যের কাব্যের দৃষ্টপ্রয়োজন হচ্ছে কাব্যভোক্তার প্রীতি, আর তার অদৃষ্টপ্রয়োজন হচ্ছে কাব্যকর্তার কীর্তি। এখন এই অদৃষ্টপ্রয়োজনের কথা মুলতবি রেখে দৃষ্টপ্রয়োজনের কথাটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করা যাক, কারণ আজকের সভায় যারা একত্র হয়েছি তাদের কেউই কাব্যের কর্তা নন, সবাই ভোক্তা। কর্তা যে আমরা নই তার প্রমাণ, কবিকীর্তি আমরা কেউই লাভ করিনি, যদিচ আমরা কেউ কেউ পদ্য লিখেছি।

কাব্যরস আস্বাদ করে যে আমরা প্রীতিলাভ করি এ তো প্রত্যক্ষ সত্য, সুতরাং এ সম্বন্ধে আর তর্ক নেই। কেননা, যা দৃষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষ তা স্বতঃসিদ্ধ। তবে মনে রাখবেন, যে বিষয়ে তর্ক নেই সেই বিষয়েই মানুষের তর্কের শেষ নেই। তাই এই প্রীতিকথা নিয়ে দেদার তর্ক করা যেতে পারে, কেননা যুগ-যুগ ধরে করা হয়েছে। প্রীতি অর্থ যদি হয় pleasure, তাহলেই বামনাচার্যের মতকে hedonism-এর কোঠায় ফেলে দেওয়া যায়। কাব্য সম্বন্ধে ও-মত অগ্রাহ্য, কেননা ও-মতানুসারে কাব্য বিলাসের একটি উপকরণ হয়ে পড়ে, অর্থাৎ মাল্যচন্দনবনিতার দলে পড়ে যায়। এ তর্ক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা দেদার করেছেন। বোধ হয় তাদের সমধর্মী পণ্ডিতের দল এ দেশে সেকালেও ছিলেন। সে কারণ নব্য আলংকারিকরা প্রীতির বদলে 'আনন্দ' শব্দের উপরেই ঝোঁক দিয়েছেন। এমন কি নব্য আলংকারিকদের আদিগুরুর নাম আনন্দবর্ধনাচার্য। এ আনন্দ যে কোনো লৌকিক আনন্দ নয় সে কথা নব্য আলংকারিকরা স্পষ্টাক্ষরে লিখে গেছেন। আনন্দের ইংরেজী pleasure নয়, joy। A thing of beauty is a joy for ever

কবি কীট্‌সের এ বাণী তাঁরা বিনাবাক্যে শিরোধার্য করে নিতেন, কারণ নিরানন্দ হওয়াটাই সংসারের দাসত্বের ফল, আর আনন্দই মুক্তি। প্রীতি দৃষ্টপ্রয়োজন একথা বলার অর্থ কাব্যামৃত-রসাস্বাদ করার আনন্দ ব্যতীত কাব্যের অপর কোনো দৃষ্টপ্রয়োজন নেই। মানবমনের প্রীতিসাধনই কাব্যের একমাত্র utility ।

এ কথা প্রসন্নমনে মেনে নেওয়া অনেকের পক্ষে পুরাকালেও কঠিন ছিল, আর একালে একরকম অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কারণ একালে মানুষের রক্ত-মাংসের যা প্রয়োজন তাই মানবজীবনের একমাত্র প্রয়োজন বলে গণ্য হয়েছে এবং সেই প্রয়োজনের কায়মনোবাক্যে সাধনা করাই জীবনের প্রধান কর্তব্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং কাব্যের সার্থকতা আমরা মানুষের সাংসারিক প্রয়োজনের মাপকাঠিতে যাচাই করতে সদাই প্রস্তুত।

কাব্যামৃতরসের আস্বাদ যে মুক্তির আস্বাদ এ মতে সায় দেওয়া আমাদের পূর্বপুরুষদের পক্ষে অতি সহজ ছিল, কেননা তাঁদের মতে জীবনটা হচ্ছে নিছক ভবযন্ত্রণা। জীবনের ধর্ম হচ্ছে আত্মাকে তার দাস করা, আর মনের এই দাসত্ব হতে মুক্তির প্রসাদেই মানবাত্মা আনন্দ লাভ করে। আমি পূর্বেই বলেছি যে, সকল দেশেই সকল যুগেই অলংকারশাস্ত্র হচ্ছে দর্শন-শাস্ত্রের একটা শাখা মাত্র। সুতরাং আমাদের দেশের দর্শনশাস্ত্রের মুক্তির সঙ্গে কাব্যচর্চার মুক্তির জ্ঞাতিত্ব আছে ও উভয়েই স্বজাতীয়।

একালে জীবনের প্রতি আমাদের দার্শনিক অবজ্ঞা নেই, আছে অন্ধভক্তি। কারণ, জীবন আমাদের পক্ষে এখন আর নিরর্থক নয়। আমরা এখন জানি যে, জীবন হচ্ছে ক্রমবর্ধনশীল, এবং তার চরম সার্থকতার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে ভবিষ্যতে। মর্ত্যকে স্বর্গে পরিণত করবার শক্তি মানুষের হাতেই আছে, সুতরাং আমাদের কাম্য পদার্থ মোক্ষ নয়, ভূস্বর্গ। জীবন আজও দুঃখময়, কিন্তু আমাদের পক্ষে পরমপুরুষার্থ হচ্ছে এই দুঃখময় জীবন থেকে পলায়ন করা নয়, তাকে জয় করা। কামনাকে বশ করা জীবনীশক্তির হ্রাস করা, কারণ সে শক্তির যথার্থ কার্য হচ্ছে কাম্য বস্তুকে বশীভূত ও আয়ত্ত করা। এখন আমরা Evolution নামক নূতন বিশ্বকর্মার সন্ধান পেয়েছি তাই আমরা progress নামক তার চাকা ঘোরানোকে পরমপুরুষার্থ মনে করি। কাল আগে ছিলেন প্রলয়কর্তা, ইভলিউশনের দৌলতে তিনি হয়ে উঠেছেন সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং মানুষের যত

প্রকার সাংসারিক প্রয়োজন আছে তার সাধনা করাই এ যুগে যথার্থ মানব-ধর্ম। ফলে অর্থ কাম আমাদের আরাধ্য বস্তু হয়ে উঠেছে। তাই এ যুগে আমরা সবাই হয় economical, নয় political, নয় social সমস্যার হাতে-কলমে মীমাংসা করবার জন্য ব্যগ্র। ফলে কাব্য আমাদের এইসব প্রচেষ্টার কতদূর সহায় কি অন্তরায়, সেই হিসেব থেকে কাব্যের মূল্য নির্ধারণ করবার প্রবৃত্তি আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, এসব দিক থেকে কাব্যের সমালোচনা করায় শুধু অল্পবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয়। কারণ এ জাতীয় সমালোচকের মনের কথা হচ্ছে, কাব্য থেকে কি শিক্ষালাভ করলুম কি আনন্দ লাভ করলুম, তা নয়। এ জাতীয় সমালোচক সেকালেও ছিল এবং তাদের লক্ষ্য করে দশরূপকার ধনঞ্জয় বলেছেন—

আনন্দনিস্যন্দিষু রূপকেষু
ব্যুৎপত্তিমাত্রং ফলমল্পবুদ্ধিঃ
যোঽপীতিহাসাদিবদাহ সাধুঃ
তস্মৈ নমঃ স্বাদুপরাঙ্মুখায়।

এ সংস্কৃত মত আমি শিরোধার্য করি, কেননা এই হচ্ছে অতি-আধুনিক মত। যে মত অতিপুরাতন এবং সেই সঙ্গে অতিনূতন সে মত যদি ভুল হয় তো তা নাছোড় ভুল, অর্থাৎ সত্য।

রবীন্দ্রনাথ আজকের দিনে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় কবি, সুতরাং তাঁর কাব্যে আমরা সুশিক্ষা অশিক্ষা কি কুশিক্ষা কোন্ জাতীয় শিক্ষা লাভ করি এ প্রশ্ন অনেক সমালোচক করেছেন এবং সেসব প্রশ্নের উত্তর নিজেরাই দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ তাঁর একখানি কাব্যের উল্লেখ করব, যার উপর অল্পবুদ্ধি সাধু লোকেরা বহু বাণ বর্ষণ করেছেন; যদিচ তাঁদের মধ্যে অনেকে সেখানি যে যথার্থ কাব্য তা অস্বীকার করতে পারেন নি। সে কাব্যের নাম চিত্রাঙ্গদা। এই চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধে প্রতিকূল সমালোচনার সার সংগ্রহ করেছেন টম্‌সন নামক জনৈক ইংরেজ মিশনারি। তাঁর প্রথম বক্তব্য হচ্ছে—

It is his loveliest drama ; a lyrical feast, though its form is blank-verse......it is almost perfect in unity and conception, magical in expression.

যাঁরা কাব্যের রস উপভোগ করেন তাঁরা এর বেশি কোনো কাব্য সম্বন্ধে

আর কি জানতে চান ? কিন্তু সাধু ব্যক্তিদের আরও একটি বলবার কথা আছে। এ কাব্য সাধু কি অসাধু তার বিচার তাঁরা না করে থাকতে পারেন না। তাই টম্‌সন বলেছেন—

The play was attacked as immoral, and to this day offends many readers, not all of whom are either fools or milksops.

......the purpose of the play has been represented as being the glorification of sexual abandonment.

......the play, in these earlier passages, repeatedly trembles on the edge of the bog of lubricity.

তার পর এর চাইতেও এ কাব্যের একটি বড় দোষ আছে। টম্‌সন বলেন—

The most serious charge that can be brought against Chitrangada is against its attitude.

টম্‌সন সাহেবের কৃত চিত্রাঙ্গদা কাব্যের দোষগুণ-বিচারের বিচার করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমি কবির উপর জজিয়তি করতে ভয় পাই, কিন্তু সমালোচকের সঙ্গে ঝগড়া আমি সানন্দে করতে পারি।

চিত্রাঙ্গদা একটি স্বপ্নমাত্র, মানবমনের একটি অনিন্দ্যসুন্দর জাগ্রত স্বপ্ন। এ চিত্রাঙ্গদা সেকালের মণিপুরের রাজকন্যা নন, সর্বকালের মানুষের মনপুরীর রাজরানী, হৃদয়নাটকের রত্নপাত্রী। আমরা যাকে আর্ট বলি তা হচ্ছে মানবমনের জাগ্রত স্বপ্নকে হয় রেখায় ও বর্ণে, নয় সুরে ও ছন্দে, নয় ভাষায় ও ভাবে আবদ্ধ করবার কৌশল বা শক্তি।

অনঙ্গ-আশ্রম হচ্ছে একটি কল্পলোক, যেমন মেঘদূতের অলকা ও কুমারসম্ভবের শৈল-আশ্রম একটি কল্পলোক মাত্র। জিয়োগ্রাফিতে এসব লোকের সন্ধান মেলে না, কারণ মাটির পৃথিবীতে তাদের স্থান নেই, তাদের সৃষ্টি স্থিতি শুধু মানুষের মনে।

মানুষের মন অবশ্য এই পৃথিবী হতে মনোমত উপাদান সংগ্রহ ক'রে এই কল্পলোক রচনা করে ; যেমন মানুষে গুটিকতক পার্থিব উপাদান দিয়েই স্বর্গলোক অর্থাৎ সর্বলোককাম্য একটি অপার্থিব কল্পলোকের সৃষ্টি করেছে।

এই কল্পলোক বাস্তব জগৎ থেকে বিভিন্ন হলেও বিচ্ছিন্ন নয়। ভালো কথা,

আমরা যাকে বস্তুজগৎ বলি সে বস্তুই বা কি? সে জগৎও তো মানুষের মন রচনা করেছে। কবিতার কল্পলোক ও বুদ্ধির প্রকৃত লোক দুইই মানবমনের সৃষ্টি। এ দুয়ের ভিতর যথার্থ প্রভেদ এই যে, এ দুটি মানবমনের দুটি বিভিন্ন শক্তির রচনা। কথাটা শুনে চমকে উঠবেন না। আপাতদৃষ্টিতে যা বাহ্যবস্তু বলে মনে হয় তাকে যাচিয়ে দেখতে গেলে দেখতে পাওয়া যায় তার অন্তরে রয়েছে logical mind। আমরা যাকে object বলি তা যে subject-এরই বিকার তা স্বয়ং লজিকই মানতে বাধ্য।

এই বস্তুজগৎ ওরফে মানুষের কর্মভূমির যথার্থ স্রষ্টা হচ্ছে মানুষের কর্মপ্রবৃত্তি। কর্মজগৎ ও কল্পজগৎ এ দুই জগৎই সমান সত্য, কেননা আমাদের মনে যেমন কর্মের প্রতি আসক্তি আছে তেমনি কর্মজগৎ থেকে মুক্তি পাবারও আকাঙ্ক্ষা আছে। এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় আমাদের স্বকপোলকল্পিত ধর্মে ও আর্টে। সুতরাং চিত্রাঙ্গদা যে-জাতীয় স্বপ্ন সে স্বপ্নেরও আমাদের আন্তরিক প্রয়োজন আছে। এ প্রয়োজনের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন শুধু সেই জাতীয় বুদ্ধিমান লোকেরা যাঁদের অন্তর একান্ত বিষয়বাসনার গণ্ডীবদ্ধ, সে বিষয়বাসনা ব্যক্তিগতই হোক আর জাতিগতই হোক। এঁদের মনে কর্মজিজ্ঞাসার অতিরিক্ত জিজ্ঞাসা নেই। এই একচক্ষু হরিণের দল ভুলে যান যে, মানুষমাত্রই বাস করে কতকটা কর্মজগতে আর কতকটা স্বপ্নলোকে।

এই স্বপ্নকে যাঁরা সম্পূর্ণ সাকার করে তুলতে পারেন, অর্থাৎ সমগ্র ও পরিচ্ছিন্ন রূপ দিতে পারেন, তাঁরাই হচ্ছেন পূর্ণ আর্টিস্ট। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কাব্য মানুষের যৌবনস্বপ্নের একটি অপূর্ব এবং সর্বাঙ্গসুন্দর চিত্র।

ছবি গান ও কবিতার বিষয় আলোচনা করতে হলেই আমরা 'সুন্দর' শব্দটি বারবার ব্যবহার করতে বাধ্য হই—যেমন দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনা করতে বসলে আমরা বারবার 'সত্য' শব্দটি ব্যবহার করতে বাধ্য হই। অথচ beauty ও truth-এর বাচ্য পদার্থের মত অনির্দেশ্য বস্তু আর ভূভারতে নেই। তাই আমরা 'সৌন্দর্য' শব্দের বদলে সৌন্দর্যের নানারকম উপকরণের উল্লেখ করি, যথা মাধুর্য ঔদার্য কান্তি দীপ্তি সুষমা সৌকুমার্য লালিত্য লাবণ্য চমৎকারিত্ব মনোহারিত্ব ইত্যাদি। এ সব নামই সৌন্দর্যের বেনামি হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। ফলে এসবের প্রাসাদে সৌন্দর্যের অর্থ স্পষ্টতর হয় না, কিন্তু সৌন্দর্য নামক গুণটির অনুভূতি লোকসামান্য। সুতরাং সেই অস্পষ্ট অনুভূতির উপরই আমার এ

আলোচনা প্রতিষ্ঠিত করব। আর তা করায় ক্ষতি নেই। কারণ যেসকল দার্শনিক beauty, truth প্রভৃতি শব্দের চুলচেরা বিচার করেন, তাঁরা অনেকেই সোনা ফেলে আঁচলে গিঁট দেন। অর্থাৎ নামের সন্ধান করতে রূপের সন্ধান হারিয়ে ফেলেন।

কোনো কাব্যের আত্মার পরিচয় দেওয়ার চাইতে তার দেহের পরিচয় দেওয়াটা ঢের সহজ, কেননা দেহ জিনিসটে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও পরিচ্ছিন্ন। আর, সকলেই জানেন যে ভাষা হচ্ছে ভাবের দেহ। নীরব কবি বলে পৃথিবীতে কোনো প্রকার জীব নেই, কেননা এ পৃথিবীতে ভাষাহীন ভাব নেই। সুতরাং আমি যদি চিত্রাঙ্গদার ভাষার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি তাহলে আশা করি তার আত্মার সাক্ষাৎকার আপনারা আপনা হতেই পাবেন। আমাদের দেশে লোকে ভগবানকে কায়াহীন সত্তা হিসাবে ধারণা করতে পারতেন না, তাই তাঁকে ধর্ম-কায় ও বৈষ্ণবেরা মন-কায় বলে উপলব্ধি করতেন। সুতরাং কাব্যকে ভাষা-কায় বলায় আমরা কাব্যের আত্মা সম্বন্ধে নাস্তিক অথবা দেহাত্মবাদী বলে অন্ততঃ এ দেশে গণ্য হব না।

কবিকঙ্কণ বলেছেন যে, চণ্ডীকাব্য তিনি লেখেন নি কিন্তু চণ্ডী তাঁর হাত ধরে লিখিয়েছেন। ভারতচন্দ্রও ঐ একই কথা বলেছেন। তিনিও অন্নপূর্ণার আদেশে ও প্রসাদে অন্নদামঙ্গল রচনা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এ চণ্ডী এ অন্নপূর্ণা সরস্বতী ব্যতীত অন্য কোনো দেবতা নন। কবিকঙ্কণ সরস্বতীর গুণ-বর্ণনা করতে একটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করেছেন যে তাঁর—

বীণাগুণে তরল অঙ্গুলি।

কবিকঙ্কণের অঙ্গুলি কিন্তু তরল নয়, স্থূল। আর ভারতচন্দ্রের অঙ্গুলি লঘু হলেও সে অঙ্গুলি কখনো বীণাগুণ স্পর্শ করে নি, কারণ তাঁর অঙ্গুলি ছিল মেজরাপ-মণ্ডিত। চিত্রাঙ্গদার কবির অঙ্গুলি যে বীণাগুণে পূর্ণমাত্রায় তরল তা যাঁর ভাষার সুরের কান আছে তিনি চিত্রাঙ্গদার দু-লাইন পড়লেই বুঝতে পারবেন। চিত্রাঙ্গদা একটি সম্পূর্ণ রাগিণী। এর কোথাও একটি বেসুরো কথা নেই, আর এ ভাষার গতি যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনি সলীল। ও-কাব্যের অন্তরে যেমন একটিও বেসুরো কথা নেই তেমনি একটিও উচ্ছৃঙ্খল ছত্র নেই। এ কাব্যের ধ্বনি এক মুহূর্তের বাণীকে ছাপিয়ে কিংবা ছাড়িয়ে ওঠে নি। ভাষার সমতা ও ধ্বনির সগুণতা গুণে চিত্রাঙ্গদা মেঘদূত ও কুমারসম্ভবের স্বজাতীয় ও সমকক্ষ। এ ভাষা

যেমন প্রসন্ন তেমনি সপ্রাণ, যেমন উজ্জ্বল তেমনি স্নিগ্ধ। এ ভাষা পরিপূর্ণ প্রাণের আবেগে মুক্তছন্দে অবলীলাক্রমে বয়ে যাচ্ছে। এ প্রবাহিণীর সুর ললিত, তাল মধ্যমান। এ কাব্য সরস্বতী নিজ হাতে লিখেছেন বললে আমরা সে কথায় অবিশ্বাস করতুম না।

ভারতচন্দ্র স্থানান্তরে বলেছেন যে, অন্নদা তাঁকে ভরসা দিয়েছিলেন যে—

যে কবে সে হবে গীত, আনন্দে লিখিবে।

চিত্রাঙ্গদার কবি, যার মুখ দিয়ে যা বলেছেন তা সবই গীত হয়েছে। এ ভাষা কবির মুখে স্বয়ং বসন্ত দিয়েছিলেন। চিত্রাঙ্গদা বসন্তের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন যে—

বড় ইচ্ছা হয়েছিল সে যৌবনোচ্ছ্বাসে
সমস্ত শরীর যদি দেখিতে দেখিতে
অপূর্বপুলকভরে উঠে প্রস্ফুটিয়া
লক্ষ্মীর চরণশায়ী পদ্মের মতন!
হে বসন্ত, হে বসন্তসখে, সে বাসনা
পুরাও আমার শুধু দিনেকের তরে।

বসন্তসমীরণের স্পর্শে চিত্রাঙ্গদার দেহের অনুরূপ চিত্রাঙ্গদা কাব্যেরও দেহ অপূর্বপুলকভরে ফুটে উঠেছে। এ ভাষা নবীন প্রাণের স্পর্শে আগাগোড়া মুকুলিত ও পুলকিত।

আমাদের নিত্যকর্মের ভাষার সঙ্গে কবির ভাষার যে একটি স্পষ্ট প্রভেদ আছে, তা সকলেই জানেন। দৈনিক সংবাদপত্রের ইংরেজি ভাষা ও শেক্সপীয়ারের ভাষা যে এক নয়, তা যে-কোনো সংবাদপত্রের এক পৃষ্ঠা পড়বার পর শেক্সপীয়ারের নাটকের এক পৃষ্ঠা পড়লেই সকলের কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। প্রভেদ যে ঠিক কোথায় তা বলা অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে উপায়ান্তরের অভাবে আমরা নানারূপ বিশেষণের আশ্রয় নিই। কিন্তু সেসব বিশেষণের সার্থকতাও অনুভূতিসাপেক্ষ। যে-কোনো বিষয়ের আমরা ব্যাখ্যা শুরু করি নে কেন, লজিকের সাহায্যে কতক দুর অগ্রসর হবার পর আমরা দেখতে পাই যে, লজিকের হাত ধরে আর বেশি দুর এগনো চলে না। কেননা তখন আমরা এমন-একটি সত্যের সাক্ষাৎলাভ করি যার নাম mystery। এর কারণ ভগবান্ কৃষ্ণ বলে দিয়েছেন—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।

এই ব্যক্তমধ্যেই লজিকের এলাকা। আমরা যদি বলি কবির ভাষায় প্রাণ আছে, তাহলে বলা হয় যে কবির ভাষা অনির্বচনীয়; কেননা প্রাণ পদার্থটিও একটি mystery, তবে উপমার সাহায্যে ব্যাপারটি একটু পরিষ্কার করা যায়। আমাদের কর্মের ভাষা static, অর্থাৎ পদার্থের নামকরণ করেই তার কর্মের অবসান হয়; কবির ভাষা dynamic, অর্থাৎ সে ভাষার অন্তরে গমক আছে, অকবির ভাষার অন্তরে তা নেই। আলংকারিকরা বলেছেন—

ইদমন্ধং তমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্
যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে।

কবির মুখনিঃসৃত এই শব্দাখ্য-জ্যোতি মনের নানাদেশে সঞ্চারিত হয় এবং নানা ভাবকে অঙ্কুরিত করে; ফলে আমাদের মনোজগতের প্রাণের ঐশ্বর্য বাড়িয়ে দেয়। কবির বাণী তার অন্তর্গূঢ় শক্তির বলে কি বাহ্যজগৎ কি অন্তর্জগতের বিরাট অব্যক্ত অংশের রহস্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। চিত্রাঙ্গদার ভাষা সেই জাতীয় জাদুকরী ভাষা, যার সাক্ষাৎ আমরা ইংরেজ কবি কীট্সের কবিতায় পাই। এক কথায় এ হচ্ছে লৌকিক ভাষার অলৌকিক সংস্করণ। এ ভাষার মোহিনীশক্তির মূল হচ্ছে কবির আত্মায়। সে যাই হোক, ভাষার সঙ্গে কাব্যের এতটা আত্মীয়তা আছে যে, ইউরোপে অনেকে কবিকে a great voice বলে আখ্যা দিয়েছেন।

প্রাচীন আলংকারিকদের মতে কাব্যের সৌন্দর্য নগ্ন নয়, অলংকৃত। এমন কি তাঁদের মতে—

কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ।

যে অলংকারের গুণে কাব্য গ্রাহ্য সে গুণটি কি? বামনাচার্য বলেছেন যে—

সৌন্দর্যমলংকারঃ।

সৌন্দর্য অর্থ অলংকার, আর অলংকার অর্থ সৌন্দর্য; এরকম ব্যাখ্যা শুনে এ বিষয়ে আমরা যে তিমিরে আছি সেই তিমিরে থেকে যাই। আমি বালককালে একটি বঙ্গদেশীয় মুসলমানের মুখে একটি 'হররা' ঘোড়ার কথা শুনি। 'হররা' অর্থ কি, জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করলেন 'বোরা'। তারপর 'বোরা' কাকে বলে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন 'মুসকি'। এইরূপ ব্যাখ্যা শুনে আমি অবশ্য তাঁর আরবি ও ফারসি ভাষায় পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট তারিফ করি, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার ধারণা হয় ভদ্রলোক কি বলতে চান তা নিজেও জানেন না, কেননা যদি

জানতেন তো ও-রঙের বাংলা নামটাই বলে দিতেন। সুতরাং বামনাচার্য যখন অলংকার শব্দ কি connote করে তা বলতে না পেরে কি denote করে তাই বললেন, তখন তাঁর বক্তব্য বোঝা গেল। যখন শুনলুম—

পুনরলংকার শব্দোঽয়মুপমাদিষু বর্ততে

তখন নিশ্চিন্ত হলুম।

আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত 'কাব্যজিজ্ঞাসা' নামক একটি অতি সুন্দর ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ বাংলায় লিখেছেন। সে প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন যে, নব্য আলংকারিকদের মতে উপমাদি অলংকারের প্রাচুর্য সত্ত্বেও বাক্য কাব্য হয় না, অপরপক্ষে বহু অনলংকৃত বাক্য চমৎকার কাব্য। এর প্রমাণ সংস্কৃত সাহিত্যে দেদার আছে। কিন্তু অলংকার যে কাব্যকে শোভাহীন করে এমন কথা কোনো আলংকারিক বলতে পারেন না, তা তিনি যতই নব্য হোন-না কেন। কেননা, উপমাদি যদি কাব্যদেহের কলঙ্ক হত তাহলে কালিদাসের কাব্য পা থেকে মাথা পর্যন্ত কলঙ্কিত। অতএব কোন্ স্থলে কিরূপ উপমাদি প্রকৃতি-সুন্দর কাব্যের শোভা বৃদ্ধি করে, সে সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা আবশ্যক।

আমি এ স্থলে শুধু দুটি মূল অলংকারের কথা বলব। একটি অনুপ্রাস, অপরটি উপমা। সংস্কৃত মতে একটির নাম শব্দালংকার, অপরটির নাম অর্থালংকার। কিন্তু এ উভয়ই মূলতঃ সমধর্মী। দণ্ডী বলেছেন—

যয়া কয়াচিচ্ছ্রুত্যা যৎ সমানমনুভূয়তে।
তদ্রূপাহি পদাসত্তিঃ সানুপ্রাসা রসাবহা।

তারপর—

যথাকথাঞ্চিৎ সাদৃশ্যং যত্রোদ্ভূতং প্রতীয়তে
উপমা নাম সা তস্যাঃ প্রপঞ্চোঽয়ং নিদর্শ্যতে।

অর্থাৎ এক অলংকারের প্রসাদে কানের কাছে শব্দসমূহ সমান অনুভূত হয়, অপর অলংকারের প্রসাদে মনের কাছে বস্তুসদৃশ প্রতীয়মান হয়।

এ বিশ্বে আমাদের আপাতদৃষ্টিতে যা বিভিন্ন তার সমীকরণ করাই হচ্ছে কাব্যের ধর্ম, অর্থাৎ যা-কিছু পরস্পরবিচ্ছিন্ন তাদের নিরবচ্ছিন্ন রূপ দিতে আর প্রক্ষিপ্ত জগৎকে সংক্ষিপ্ত করতে পারে শুধু কবিপ্রতিভা। পরাবিদ্যা যেমন আমাদের লৌকিক ভেদবুদ্ধি নষ্ট করে, কাব্যও তেমনি আমাদের লৌকিক ভেদদৃষ্টি নষ্ট করে। এই বিশ্বে বহুর সমপ্রাণতা ও আত্মীয়তার অনুভূতিই হচ্ছে মুক্তির

রসাস্বাদ। কারণ যে মুহূর্তে ভেদবুদ্ধি অপসারিত হয় সেই মুহূর্তে অহং আত্মা হয়ে ওঠে।

আমার এ ধারণা যদি সত্য হয় তো বলা বাহুল্য যে, অনুপ্রাস ও উপমা দুইই কাব্যের বিশেষ অন্তরঙ্গ। কারণ দৃশ্যজগৎ ও শব্দজগতের নিগূঢ় সত্য ব্যক্ত করাই এদের ধর্ম। এ দুই যখন কাব্যের অন্তরঙ্গ না হয়ে বাহ্য অলংকার হয় তখনই তা অগ্রাহ্য। ভাষার ও ভাবের খেলো জমির উপর উপমা-অনুপ্রাসের চুমকি বসানো শুধু মন্দ কবির কারদানি। চিত্রাঙ্গদা কাব্যের অনুপ্রাস কিংবা উপমা উভয়ই ও-কাব্যের অন্তরঙ্গ। এ কাব্যে এমন একটিও অনুপ্রাস কিংবা উপমা নেই যা এ কাব্য-অঙ্গে প্রক্ষিপ্ত, এবং অন্তর থেকে উদ্ভূত নয়। সংগীতে যেমন সেই তানের চমৎকারিত্ব আছে যে তান রাগিণীর প্রাণ থেকে স্বতঃ-উৎসারিত, তেমনি চিত্রাঙ্গদা-রূপ রাগিণীর অন্তরে বহু অনুপ্রাস আছে যা উক্ত রাগিণীর অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে—

> সেই সুপ্ত সরসীর স্নিগ্ধ শষ্পতটে
> শয়ন করেন সুখে নিঃশঙ্ক বিশ্রামে…
> শেফালিবিকীর্ণতৃণ বনস্থলী দিয়ে…
> ধন্য সেই মুগ্ধ মূর্খ ক্ষীণতনুলতা
> পরাবলম্বিতা লজ্জাভয়ে-লীনাঙ্গিনী
> সামান্য ললনা…

এসব অনুপ্রাস যে চমৎকার তার সাক্ষী কান। কিন্তু এসব অনুপ্রাস অযত্ন-সুলভ। ধ্বনি আপনিই দানা বেঁধে উঠেছে সমগ্র সংগীতপ্রাণ কাব্যের অন্তর হতে। টম্‌সন সাহেব বলেছেন যে, এ কাব্য magical in expression, যদিচ অমিত্রাক্ষরে রচিত। এ কাব্যে যে অন্ত-অনুপ্রাস নেই তার কারণ সমগ্র কাব্যখানিই একটি একটানা অনুপ্রাস।

আসল কথা এই যে, অলংকার হচ্ছে কাব্যের একরূপ ভাষা। নব্য আলংকারিকরা অলংকারের জাতিভেদ স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে অতিশয়োক্তি হচ্ছে একমাত্র অলংকার। প্রাচীনেরাও এ অলংকারকে সর্বোত্তম অলংকার ব'লে গণ্য করেছেন। এ অলংকার যে কি, তা প্রাচীন আলংকারিকদের মুখেই শোনা যাক—

বিবক্ষা যা বিশেষস্য লোকসীমাতিবর্তিনী
অসাবতিশয়োক্তিঃ স্যাদলংকরোত্তমা যথা।

লোকসীমাতিবৃত্তস্য বস্তুধর্মস্য কীর্তনম্
ভবেদতিশয়ো নাম সম্ভবোঽসম্ভবো দ্বিধা।

চিত্রাঙ্গদা কাব্যের উপমা-রূপকাদি উক্ত অর্থে অতিশয়োক্তি, অর্থাৎ তাদের গুণে বর্ণিত বিষয় সব লোকসীমা অতিক্রম করে, ইংরেজিতে যাকে বলে, **transcend** করে। এই সর্বোত্তম অলংকারের স্পর্শে সমগ্র কাব্যশরীরের রূপ-লাবণ্যও লোকোত্তর হয়ে উঠেছে, অর্থাৎ যা natural তা supernatural বলে প্রতিভাত হয়। আমি নিম্নে চিত্রাঙ্গদা থেকে দু-চারিটি ঐ জাতীয় উক্তি উদ্‌ধৃত করে দিচ্ছি। তাদের নাম উপমাই হোক, রূপকই হোক আর উৎপ্রেক্ষাই হোক, তার প্রতিটি যে অপূর্ব অতিশয়োক্তি সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। চিত্রাঙ্গদা মদনের বরে ক্ষণিকের জন্য ফুলের মত ফুটে উঠে বলছেন—

যেন আমি ধরাতলে
এক দিনে উঠেছি ফুটিয়া, অরণ্যের
পিতৃমাতৃহীন ফুল ; শুধু এক বেলা
পরমায়ু—তারি মাঝে শুনে নিতে হবে
ভ্রমরগুঞ্জনগীতি, বনবনান্তের
আনন্দমর্মর, পরে নীলাম্বর হতে
ধীরে নামাইয়া আঁখি, নুমাইয়া গ্রীবা
টুটিয়া লুটিয়া যাব বায়ুস্পর্শভরে
ক্রন্দনবিহীন, মাঝখানে ফুরাইবে
কুসুমকাহিনীখানি আদি-অন্ত-হারা।

এমন সুন্দর এমন মর্মস্পর্শী পরিপূর্ণ যৌবনের কুসুমকাহিনী আর কোনো কবির মুখে কেউ কখনো শুনেছেন ?

পুষ্পরাজ্যেও আবিষ্কৃত আর-একটি উপমার পরিচয় দিই। চিত্রাঙ্গদা যেদিন তার সদ্যপ্রস্ফুটিত অলোকসামান্য রূপের প্রথম সাক্ষাৎ পান—

সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে।
শ্বেত শতদল যেন কোরকবয়স
যাপিল নয়ন মুদি ; যেদিন প্রভাতে

প্রথম লভিল পূর্ণ শোভা, সেইদিন
হেলাইয়া গ্রীবা, নীল সরোবরজলে
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন
রহিল চাহিয়া সবিস্ময়ে।

এই শব্দচিত্রের দিকে সহৃদয় ব্যক্তি চিরকাল 'রহিবে চাহিয়া সবিস্ময়ে'।

আলংকারিকদের মতে কবির যে জাদুমন্ত্রের বলে সাদৃশ্য সাযুজ্যে similarity identity-তে পরিণত হয় সেই উক্তিই অতিশয়োক্তি। তাঁরা উদাহরণস্বরূপ বক্ষ্যমাণ শ্লোকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—

মল্লিকামালভারিণ্যঃ সর্বাঙ্গীণার্দ্রচন্দনাঃ
ক্ষৌমবত্যো ন লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নায়ামভিসারিকাঃ।

অর্থাৎ অভিসারিকা জ্যোৎস্নার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে, কেননা তিনি মল্লিকার মালা ধারণ করেছেন, সর্বাঙ্গে চন্দন লেপন করেছেন, এবং ক্ষৌমবাস পরিধান করেছেন। এখন চিত্রাঙ্গদার বিষয়ে কবির একটি উক্তি শোনা যাক—

উষার কনকমেঘ দেখিতে দেখিতে
যেমন মিলায়ে যায় পূর্বপর্বতের
শুভ্র শিরে অকলঙ্ক নগ্ন শোভাখানি
করি বিকশিত, তেমনি বসন তার
মিলাতে চাহিতেছিল অঙ্গের লাবণ্যে
সুখাবেশে।

এ কবির সাক্ষাৎ পেলে প্রাচীন আলংকারিকদের যে দশা ধরত সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। এরূপ উক্তির চিত্রাঙ্গদায় আর অন্ত নেই। এ ক্ষেত্রে আমি আলংকারিকদের ভাষায় বলতে বাধ্য হচ্ছি 'স্বয়ং পশ্য বিচারয়'। এখানে আর দুটি মাত্র উপমার উল্লেখ করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি নে। চিত্রাঙ্গদা সুপ্ত অর্জুনের সম্বন্ধে বলেছেন—

শ্রান্ত হাস্য লেগে আছে ওষ্ঠপ্রান্তে তাঁর
প্রভাতের চন্দ্রকলাসম, রজনীর
আনন্দের শীর্ণ অবশেষ...

দ্বিতীয়টি অর্জুনের উক্তি—

তুমি ভাঙিয়াছ ব্রত মোর। চন্দ্র উঠি
যেমন নিমেষে ভেঙে দেয় নিশীথের
যোগনিদ্রা-অন্ধকার।

উক্ত কথা ক'টিতে কবির বাণী তার চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। সনৎ-কুমার নারদকে বলেছিলেন, 'অতিবাদী হও; আর লোকে যদি তোমাকে অতিবাদী বলে তো বোলো যে, হাঁ আমি অতিবাদী।' কবি মাত্রেই অতিবাদী। আর এই 'অতি' শব্দের মর্ম যিনি গ্রহণ করতে পারেন তিনিই মর্মে মর্মে অনুভব করবেন যে, চিত্রাঙ্গদার কবি চরম কবি।

আমি পূর্বে বলেছি, চিত্রাঙ্গদা একটি সম্পূর্ণ রাগিণী। টম্‌সন সাহেব এ কথা অস্বীকার করেন নি, কেননা তিনি বলেছেন It is a lyrical feast। কিন্তু উক্ত feast উপভোগ করে নাকি মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। কারণ উক্ত রাগিণীর আস্থায়ী erotic এবং অন্তরা immoral।

যদি ধরে নেওয়া যায় যে, কবিতা সংগীতের স্বজাতীয়, তাহলে জিজ্ঞাসা করি, কানাড়া moral এবং কেদারা immoral, ভূপালী শ্লীল ও ভৈরবী অশ্লীল —এরকম কথা বলায় ছন্নতা ও মূর্খতা ছাড়া আর কিসের পরিচয় দেওয়া হয়?

যদি এ মত কেবলমাত্র শ্রীযুক্ত টম্‌সনের মত হ'ত তাহলে এ বিষয়ে কোন কথা বলবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে আর্টের morality-র বিচার করতে অনেকে সদাই উৎসুক। আমাদের ব্যাবহারিক জীবনের পক্ষে মর‍্যালিটি অত্যাবশ্যক। এবং সেই কারণে জীবনের এই অত্যাবশ্যক বস্তুটি আমরা সর্বত্রই খুঁজতে চাই। চুরি করা যে অধর্ম, এ বিষয়ে আমরা সকলে একমত। যাঁর নিজে চুরি করতে আপত্তি নেই, তিনিও তাঁর জিনিস পরে চুরি করলে তাঁকে পুলিশে ধরিয়ে দেন।

মৃচ্ছকটিক নাটকে পরের ঘরে সিঁদ কেটে চুরির একটি চমৎকার বর্ণনা আছে এবং শর্বিলকের মুখে চুরিবিদ্যার একটি সরস গুণকীর্তন আছে। যা মানুষ মাত্রেরই মতে immoral, সেই বিষয় নিয়ে কবি তাঁর কল্পনা খাটিয়েছেন, অথচ অদ্যাবধি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি সংস্কৃত সাহিত্য হতে মৃচ্ছকটিকের ও-অংশ বহিষ্কৃত করবার প্রস্তাব করেন নি। এর কারণ কি? এর কারণ সমাজে যা অধর্ম, কাব্যে তা রসে পরিণত হয়েছে। ফলে মৃচ্ছকটিক পড়ে কারও মনে চুরি করবার প্রবৃত্তি জন্মায় নি। মর‍্যালিটি হচ্ছে মানুষের ব্যাবহারিক

আত্মার জিনিস, আর কাব্য তার অন্তরাত্মার। এই অন্তরাত্মার সঙ্গে ব্যাবহারিক আত্মার প্রভেদ কি তা জানতে চান তো দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করুন। কাব্যের যে জীবনের উপর কোন প্রভাব নেই, এ কথা অবশ্য আমি বলতে চাইনে; কাব্যের আবেদন মানুষের moral sense-এর কাছে নয়, spiritual sense-এর কাছে। যা spiritual হিসাবে অমৃত তা যে মর‍্যাল হিসেবে বিষ এ কথা শোভা পায় শুধু জড়বুদ্ধির মুখে। বরং মানুষে চিরকাল এই বিশ্বাস করে এসেছে যে, মনের স্পিরিচুয়াল খোরাক মানবাত্মার সর্বাঙ্গীণ পুষ্টি সাধন করে। এ বিশ্বাস ভ্রান্তি নয়।

চুলোয় যাক অন্তরাত্মা। ব্যাবহারিক আত্মার দিক থেকেই দেখা যাক। কবির স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ধারণা (attitude) কি হিসেবে জঘন্য? তা যে ঘৃণ্য সে কথা রোলো Rollo নামক অপর একটি অধ্যাপক স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন। তাঁর কথা হচ্ছে এই: one hates the view; এবং টম্‌সন একথা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। কবির মতে নাকি woman exists for man's sake। চিত্রাঙ্গদার শেষ কথাগুলিই নাকি কবির মনের কথা। তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক যে তাই।

চিত্রাঙ্গদার শেষ নিবেদন এই যে, তিনি অর্জুনের শুধু প্রণয়িনী নয়, তাঁর সহধর্মিণীও হতে চেয়েছিলেন। এই সহধর্মিণীর আদর্শ নাকি সেকালের অসভ্যদের আদর্শ, হিন্দুদের আদর্শ। কিন্তু একালের সভ্য মানবের, অর্থাৎ ইংরেজের, আদর্শ হচ্ছে স্ত্রীলোকের পুরুষের সহধর্মী হওয়া। পিতা যখন চিত্রাঙ্গদাকে পুত্র করেছিলেন তখন অর্জুনের কর্তব্য ছিল তাঁকে ভ্রাতা করা। তাহলেই টম্‌সন এবং রোলোর কাছে এ কাব্য জঘন্য না হয়ে বরেণ্য হত।

যখন এঁদের মুখে এসব বুলি শুনি, তখনই মনে হয় যে বর্তমান সভ্যতার বুলিগুলি যেমন সাধু তেমনি ভুয়ো। Equality of the sexes বহুলোকের মুখে একটি সম্পূর্ণ নিরর্থক কথা, কেননা এ ক্ষেত্রে সাম্যের সঙ্গে ঐক্য শব্দের অর্থের প্রভেদের প্রতি তাঁরা নজর দেন নি। Woman exists for woman's sake-এ কথাটি তেমনি হাস্যকর যেমন man exists for woman's sake কথাটা হাস্যকর। সত্য কথা এই যে, individual rights of women-এ চিত্রাঙ্গদার কবি বিশ্বাস করেন না। যদি তিনি না করেন তার কারণ, অপরের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত ইন্‌ডিভিজুয়াল বলেও কোন জীব নেই; অতএব তার কোন

রাইট্‌স্‌ও নেই। অধিকার কর্তব্য ইত্যাদি সামাজিক মানবের কথা, সুতরাং প্রতি অধিকারের সঙ্গেসঙ্গেই অসংখ্য কর্তব্যবন্ধন আছে। স্ত্রীজাতিকে তার মনের ও জীবনের নানারূপ বন্ধন থেকে মুক্ত করে আমরা woman-কে man করতে পারব না, পারব শুধু তাকে female করতে, কারণ instinct-এর বন্ধন থেকে কোন জীবকে মুক্ত করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য। টম্‌সন যে-সভ্যতার মুখপাত্র সে-সভ্যতার বোধ হয় এই বিশ্বাস যে, স্ত্রীলোককে কোন রকমে দ্বিতীয় পুরুষ করতে পারলেই বিশ্বমানব উত্তম পুরুষ হয়ে উঠবে।

স্ত্রীজাতি যে মানুষ হিসাবে পুরুষজাতির equal খৃস্টধর্মাবলম্বীরা এ সত্যের সন্ধান যুগযুগান্তরের পরে পেয়েছে। বাইবেলের মতে নারী আদিম মানুষের একখানি পাঁজরার হাড় হতে সৃষ্ট। যুগ যুগ ধরে তারা এ কথা বেদবাক্য জ্ঞানে মেনে এসেছে। অতঃপর তাদের যখন জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হ'ল তখন তারা সেই অস্থিজ জীবকে আবার মানুষ করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল এবং তাদের কাছে যথার্থ মানুষ হচ্ছে পুরুষমানুষ। তাই তারা কাজে না হোক কথায় বিধির নিয়ম উলটে দিতে চায়। হিন্দুর কল্পনা কিন্তু চিরকালই বিভিন্ন। কালিদাস বলেছেন—

স্ত্রীপুংসাবাত্মভাগৌ তে ভিন্নমূর্তেঃ সিসৃক্ষয়া
প্রসূতিভাজঃ সর্গস্য তাবেব পিতরৌ স্মৃতৌ ॥

এ শুধু কবিকল্পনা নয়, ধর্মশাস্ত্রের ঐ একই কথা। মনু বলেছেন—

দ্বিধাকৃত্বাত্মনো দেহমর্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎপ্রভুঃ ॥

মদন চিত্রাঙ্গদাকে বলেছিলেন—

আমিই চেতন ক'রে দিই
একদিন জীবনের শুভ পুণ্যক্ষণে
নারীরে হইতে নারী, পুরুষে পুরুষ।

এই কাব্য এই শুভ পুণ্যক্ষণের কল্পনা। এবং কবিপ্রতিভার বলে এ পুণ্যমুহূর্ত একটি অনন্ত মুহূর্ত হয়ে উঠেছে। যা জীবনে ক্ষণিকের, তাকেই মনোজগতে চিরদিনের করবার কৌশলের নামই আর্ট।

বসন্ত বলেছেন—

একটি প্রভাতে ফুটে অনন্ত জীবন···

আর মদন—

সংগীতে যেমন, ক্ষণিকের
তানে, গুঞ্জরি কাঁদিয়া উঠে অন্তহীন
কথা।

চিত্রাঙ্গদা কাব্যের মর্মকথা মদন ও বসন্তই অমরবাণীতে বলে দিয়েছেন।

যে দেব 'নারীরে হইতে নারী পুরুষে পুরুষ' চেতন ক'রে দেয় তাঁর গ্রীক নাম Eros, এবং এই কারণেই পূর্বোক্ত শ্রেণীর সমালোচকেরা এ কাব্যকে erotic বলেন।

এখন ইংরেজি ভাষায় এ শব্দটি হীন অর্থে ব্যবহৃত হয়। Erotic love-এর বাংলা আমি জানিনে, সম্ভবতঃ তাঁরা যাকে platonic বলেন, এ love তার উলটো। এবং এই জাতীয় সমালোচকদের কাছে উক্ত কারণে চিত্রাঙ্গদা অশ্লীল। এখন, এ কাব্য শ্লীল বা অশ্লীল সে বিচার করবার একটি বাধা আছে। চিত্রাঙ্গদা যে অশ্লীল নয় তা প্রমাণ করতে হলে আমার যুক্তি সব অশ্লীল হয়ে পড়বে, আর আমি যখন দর্শন-বিজ্ঞানের আলোচনা করছি নে, তখন শ্লীলতার সামাজিক বন্ধন লঙ্ঘন করবার আমার কোন অধিকার নেই। আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সৌন্দর্য, সত্য নয়; সুতরাং এ ক্ষেত্রে রুচির কথাটা বড় কথা।

Love বিষয়ে শ্লীলতা রক্ষা করে আলোচনা করা যে অসম্ভব তার সাক্ষী স্বয়ং প্লেটো। তাঁর যে পুস্তক থেকে প্লেটনিক লভ্-এর কিম্বদন্তী জন্মগ্রহণ করেছে সেই *Banquet* নামক অপূর্ব দার্শনিক বিচার বাংলায় কথায় কথায় অনুবাদ করা চলে না, কারণ অদার্শনিক পাঠকদের কাছে তা ঘোর অশ্লীল বলে গণ্য হবে। প্লেটনিক লভ্-এর বিচারই যদি এতাদৃশ ভয়াবহ হয়, ত অ-প্লেটনিক লভ্-এর বিচার যে বীভৎস হবে তা বলাই বাহুল্য।

প্লেটনিক লভ্ একটি আকাশকুসুম। সুতরাং একদলের লোকের কাছে তা যেমন বিদ্রূপের বিষয়, অপর আর-এক দল লোকের কাছে তা তেমনি শ্রদ্ধার বিষয়। এখন, উক্ত মতের ভক্তদের জিজ্ঞাসা করি, কুসুম মাত্রই কি আকাশকুসুম নয়? গাছের মূল থাকে মাটিতে, কিন্তু তার ফুল ফোটে আকাশে। ফুল দেখবামাত্র যে-লোকের তার মূলের কথাই বেশি করে মনে পড়ে সে ফুলের যথার্থ সাক্ষাৎ পায় না, পায় শুধু মাটির। সুন্দরের হিসেব থেকে ফুল আকাশ-

কুসুম মাত্র, এবং তাতেই তার সার্থকতা ; কিন্তু সত্যের হিসেব থেকে তা সমগ্র সৃষ্টিপ্রকরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে অনুস্যূত। আমরা যাকে প্রেম বলি, তাও মনোজগতের বস্তু হলেও দেহের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত নয়। যেমন পার্থিব ফুলের রূপ তার একমাত্র গুণ নয়, উপরন্তু তার প্রাণ আছে ; তেমনি মানবপ্রেম শুধু চিদাকাশের কুসুম নয়, দেহ ও মন উভয় জগৎ অধিকার করেই তা বিরাজ করে। তারপর দেহ-মনের বিভাগটা কি তেমন সুনির্দিষ্ট ? দেহের কোথায় শেষ ও মনের কোথায় আরম্ভ, তা কি আমাদের প্রত্যক্ষ ?

ভারতচন্দ্র বলেছেন—

ভূতময় দেহ নবদ্বার গেহ নর-নারী কলেবরে।
গুণাতীত হয়ে নানা গুণ লয়ে দোঁহে নানা খেলা করে॥
উত্তম অধম স্থাবর জঙ্গম সব জীবের অন্তরে
চেতনাচেতনে মিলি দুইজনে দেহিদেহ রূপ ধরে।
অভেদ হইয়া ভেদ প্রকাশিয়া একি করে চরাচরে॥

যদি কোন কবির কল্পনায় দেহ-দেহীর ভেদাভেদজ্ঞান মূর্ত হয়ে ওঠে তাহলে সে কবির কল্পনাকে কি শুধু দৈহিক বলা চলে ? যা কেবলমাত্র দৈহিক তার অন্তরে সত্য আছে কিন্তু সৌন্দর্য নেই। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করতেন যে, কামলোকের উপরে রূপলোক বলে আর-একটি লোক আছে। যে ব্যক্তি তাঁর বর্ণিত বিষয়কে কামলোক থেকে রূপলোকে তুলতে পারেন তিনিই যথার্থ কবি। চিত্রাঙ্গদা যে রূপলোকের বস্তু কামলোকের নয় তা যাঁর অন্তরে চোখ আছে তিনিই প্রত্যক্ষ করতে পারেন। যাঁদের তা নেই, অর্থাৎ যাঁরা অন্ধ, তাঁদের সঙ্গে তর্ক করাই বৃথা।

অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

কিছু
তার নাই কি বন্ধন পৃথিবীতে। এক
বিন্দু স্বর্গ শুধু, ভূমিতলে ভুলে প'ড়ে
গেছে ?

চিত্রাঙ্গদা

তাই বটে।

এ কাব্য সম্বন্ধে এই শেষ কথা। Erotic কাব্য বলে কোনো বস্তু নেই, কেননা যে মুহূর্তে কবির কল্পনা কাব্য-আকার ধারণ করে সেই মুহূর্তেই তা eroticism অতিক্রম করে। আমি পূর্বে বলেছি চিত্রাঙ্গদা, মেঘদূত ও কুমারসম্ভবের স্বজাতি এবং মেঘদূত ও কুমারের মতই তা কাব্যজগতে অমর। চিত্রাঙ্গদা একাধারে কাব্য, চিত্র ও সংগীত, অতএব তা চরম কাব্য। কেননা চিত্রাঙ্গদায় তার ত্রিধারার পূর্ণ মিলন হয়েছে। আর্ট হিসাবে চিত্রাঙ্গদার আর-একটি মহাগুণ তার পরিমিত ও পরিচ্ছিন্ন আয়তন, এর অস্থায়ী-অন্তরার পর যদি আভোগ-সঞ্চারী থাকত, অর্থাৎ এ স্বপ্ন যদি আরও বিস্তৃত হ'ত, তাহলে পাঠকের মন স্বপ্নলোক হতে সুষুপ্তিলোকে চলে যেত।

চিত্রাঙ্গদা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

রবীন্দ্রবাবুর 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যটি লউন। এটি রবীন্দ্রবাবুর ভক্তদের বড় প্রিয় কিনা ?—তাই চিত্রাঙ্গদাই লইলাম।

মহাভারতে বর্ণিত চিত্রাঙ্গদার গল্পটি সংক্ষেপে এই ;—

অর্জুন মণিপুর রাজ্যে ভ্রাম্যমাণা চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন, এবং চিত্রাঙ্গদার পিতার সম্মতি লইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন।

এই গল্পটি রবীন্দ্রবাবুর বড়ই গদ্যময় বোধ হইল। কন্যার পিতার সম্মতি লইয়া কন্যার সম্মতি লইয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করা—এ ত সকলেই করে। রবীন্দ্রবাবু যদি তাহা করেন, তাহা হইলে যে ব্যাসদেবের ধাপে তাঁহাকে নামিয়া যাইতে হইবে। রবীন্দ্রবাবু কোর্টশিপের অবতারণ করিলেন। হউক না অস্বাভাবিক, নূতন রকম ত হইল। 'ডুব্‌বে না হয় ডুব্‌বে—একটা নতুন হবে খুব।' কোর্টশিপ নহিলে কখনও প্রেম হয় !

রবীন্দ্রবাবুর 'কাব্যে'র গল্পাংশ এই—বনমধ্যে অর্জুনকে দেখিয়া উপযাচিকা হইয়া কুরূপা চিত্রাঙ্গদা তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করেন। অর্জুন অস্বীকৃত হন। তাহার পরে চিত্রাঙ্গদা মদন ও বসন্তের কাছে রূপ ধারণ করেন। অর্জুন তখন সম্মত হয়েন। অর্জুন সেই অনূঢ়া কন্যাকে বর্ষকাল ভোগ করেন। তাহার পরে তাঁহাদের (বোধ হয়) বিবাহ হয়।

অদ্ভুত কোর্টশিপ ! এ কোর্টশিপে একজন সামান্যা ইংরাজ নারী সম্মত হইত না। কিন্তু তাহা একজন হিন্দু রাজকন্যা যাচিয়া লইলেন ! চমৎকার !

রবীন্দ্রবাবু অর্জুনকে কিরূপ জঘন্য পশু করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, দেখুন !

দ্রষ্টব্য : 'চিত্রাঙ্গদা'র প্রথম সংস্করণ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক চিত্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়, ১২৯৯ সালের ২৮শে ভাদ্র। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশলাভ করে 'বিদায়-অভিশাপ'-সহ ১৬ই শ্রাবণ, ১৩০১ সালে। অতঃপর সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থাবলী-ভুক্ত সংস্করণ, মোহিতচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ-ভুক্ত সংস্করণ, হিতবাদী কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী-ভুক্ত সংস্করণ প্রভৃতি বহু ধরনের সংস্করণে বহুসংখ্যক বার 'চিত্রাঙ্গদা' প্রকাশিত হইয়াছে এবং এই কাব্য-নাট্যখানির পুনর্মুদ্রণও হইয়াছে বহুবার। বর্তমান রবীন্দ্র-

একজন যে কোনও ভদ্রসন্তান এরূপ করিলে তাহাকে আমরা একাসনে বসিতে দিতে চাহিতাম না। অর্জুন একজন কুমারীর ধর্ম নষ্ট করিলেন। একটু ইতস্ততঃ করিলেন না, মনে একটুমাত্র দ্বিধা হইল না। বর্ষকাল ধরিয়া একটি ভদ্রমহিলাকে সম্ভোগ করিলেন। আর তিনি যে-সে ব্যক্তি নহেন, তিনি অর্জুন—রাজপুত্র, পঞ্চ পাণ্ডবের একজন, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সারথ্য করিতেন, যিনি এত জিতেন্দ্রিয় যে, উর্বশীর প্রেমও প্রত্যাখান করিয়াছিলেন! যিনি বেশ্যাসক্তিও অনুচিত বিবেচনা করিতেন, তিনি রবীন্দ্রবাবুর হাতে পড়িয়া অনায়াসে একটি রাজকন্যার ধর্মনাশ করিলেন।

আর চিত্রাঙ্গদা! বেচারী, মা আমার! বঙ্গের কবিবরের হাতে পড়িয়া তোমার যে এ হেন দুর্গতি হইবে, তাহা বোধ হয় তুমি স্বপ্নেও ভাবো নাই। একজন যে-সে হিন্দু কুলবধূ যে অবস্থায় প্রাণ দিত, কিন্তু ধর্ম দিত না, সেই অবস্থা তুমি উপযাচিকা হইয়া গ্রহণ করিলে। আর বলিব কি—বর্ষকাল—দ্বিধা নাই, সংকোচ নাই, ধর্ম নাই—কেবল নিত্য ভোগ, ভোগ; আর নির্লজ্জ-ভাবে তাহার বর্ণনা, আর কেবল রূপটি নিজের নহে বলিয়া আত্মগ্লানি! দুঃখ তাহা নহে যে, 'কল্য রাত্রিকালে কি করিলাম।' দুঃখ এইমাত্র—'হায় আমি স্বয়ং যদি সুরূপা হইতাম, তাহা হইলে আরও উপভোগ করিতাম।' বর্ষকালের ভিতর, কি তাহার পরেও ব্যভিচারিণীর একদিনের জন্যও অনুতাপ হইল না।

রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন।

ইতিপূর্বে প্রমথ চৌধুরী-কৃত আলোচনাটির মধ্যে 'চিত্রাঙ্গদা'র নাটকীয় ঐশ্বর্য, মাধুর্য ও গুণপনার কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই কাব্য-নাট্যখানি প্রকাশের কয়েক বৎসরের মধ্যেই নানাদিকে এ সম্বন্ধে নানা বিরুদ্ধভাবের প্রকাশ হইতে থাকে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় উক্ত সময় 'সাহিত্য' (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬, ২০ বর্ষ, ২য় সংখ্যা) পত্রিকায় প্রকাশিত 'কাব্যে-নীতি' নামক একটি প্রবন্ধে 'চিত্রাঙ্গদা' সম্বন্ধে অত্যন্ত বিরূপ ও শ্লেষোক্তিপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করেন। উক্ত প্রবন্ধের অংশবিশেষ হইতে আমরা 'চিত্রাঙ্গদা'র আলোচনাটি এস্থলে মুদ্রিত করিলাম।

'সাহিত্য' পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় এই রচনাটি প্রকাশিত হইলে পর, উক্ত বৎসরেরই কার্তিক সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রিয়নাথ সেন দ্বিজেন্দ্রলালের বিরূপ মন্তব্য ও নিন্দাসূচক উক্তির উত্তর হিসাবে 'চিত্রাঙ্গদা' সম্পর্কে বলেন যে—

তাহাই বুঝি যে, এই কাব্য দুর্নীতিমূলক হউক, ইহা মনুষ্য-স্বভাবের একখানি ছবি। তাহাও নহে। এ চিত্র অস্বাভাবিক। লজ্জা, সংকোচ, সম্ভ্রম, সব দেশেই নারীজাতির সম্পত্তি; একজন কুলাঙ্গনাকে এরূপ নির্লজ্জা কুলটা করিতে হইলে একটা আয়োজন চাই! অর্থাৎ, কেন সে কুলটা হইল, তাহা দেখানো চাই! যদি একজন নাসিকাহীনা নারী আঁকে, তাহা হইলে কেন সে নাসিকাহীনা হইল, এ কথা অন্ততঃ ইঙ্গিতেও কাব্যে বোঝানো চাই। নহিলে এরূপ চিত্র কাব্যে অস্বাভাবিক। রবিবাবু এরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের কোনও আয়োজন দেখান নাই।

রবীন্দ্রবাবুর গ্রহ-উপগ্রহগণ ভারতচন্দ্রকে নিশ্চয়ই অত্যন্ত অশ্লীল কবি বলেন, আর রবিবাবুকে 'chaste' কবি বলেন। কিন্তু, ভারতচন্দ্র যাহাই করুন, তিনি বিদ্যার যে ভোগবর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দাম্পত্য প্রেমের সম্ভোগ—indecent, কিন্তু immoral নয়! রবীন্দ্রবাবুর চিত্রাঙ্গদার সম্ভোগ অভিসারিকার সম্ভোগ। হিন্দুসমাজে কেন, পৃথিবীর কোনও সভ্যসমাজে এ চিত্রাঙ্গদা মুখ দেখাইতে পারিত না।

'অশ্লীলতা' ঘৃণার্হ বটে। কিন্তু 'অধর্ম' ভয়ানক। ঘরে ঘরে 'বিদ্যা' হইলে সংসার আঁস্তাকুড় হয়; কিন্তু ঘরে ঘরে এই চিত্রাঙ্গদা হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্ন যায়। সুরুচি বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সুনীতি অপরিহার্য। আর রবীন্দ্রবাবু

"সম্প্রতি রবিবাবুর রচিত 'চিত্রাঙ্গদা' নামক কাব্য সম্বন্ধে আমাদের প্রথম ধারণার পুনরালোচনা করিতে হইয়াছে। প্রকাশ হইবার কালেই আমরা 'চিত্রাঙ্গদা' পাঠ করি। সেই প্রথম পাঠে এবং তাহার পরেও কয়েকবার পাঠকালে ইহা আমাদের একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর প্রথম শ্রেণীর খণ্ডকাব্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। রচনার উৎকর্ষে, ভাবাভঙ্গীর মৌলিকতায়, শব্দরচনার নৈপুণ্যে, ছন্দের লীলাময়ী গতিতে, মানব-প্রকৃতির অভিজ্ঞতায় নাট্যগুণে এবং সর্বশেষ নিছক কবিত্বরসে সাহিত্য-সংসারে ইহাকে অনন্য-সাধারণ সৌন্দর্যে মণ্ডিত একটি দুর্লভ রত্ন বলিয়াই জানিয়াছিলাম। কিন্তু গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের লিখিত 'কাব্যে-নীতি' নামক প্রবন্ধে 'চিত্রাঙ্গদা'র সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য পাঠ করিয়া আমাদের উক্ত ধারণার পুনর্বিচার আবশ্যক হইয়াছে। তাঁহার মতে এই কাব্য দুর্নীতি-মূলক এবং 'অস্বাভাবিক'। ইহা পাঠ করিয়া আমরা বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়াছি, আমাদের পূর্ব-ধারণা আকস্মিক তীব্র আঘাত পাইয়াছে, এবং আমাদিগকে চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছে,—

এই পাপকে যেমন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তেমন বঙ্গদেশে আর কোনও কবি অদ্যাবধি পারেন নাই। সেইজন্য এ কুনীতি আরও ভয়ানক।

আমি 'চিত্রাঙ্গদা'র সমালোচনা করিতে বসি নাই। ইহার সুন্দর ভাষা ও মধুর ছন্দোবন্ধ, ইহার উপমা-ছটা অতুলনীয়। মাইকেলের পর এত মধুর অমিত্রাক্ষর বোধ হয় আর কেহই লিখিতে পারেন নাই। তথাপি এ পুস্তকখানি দগ্ধ করা উচিত।

কোনও কোনও 'ভক্ত' বলিবেন (একজন সেদিন বলিয়াছিলেন) যে, এ দুর্নীতি হউক, কিন্তু এ চমৎকার কাব্য। তাঁহারা যেন রুস্কিনের বাণী মনে রাখেন যে, যাহার মূলে দুর্নীতি, তাহা কাব্য হয় না! আর, যে কাব্য পড়িয়া কোনও উচ্চ প্রবৃত্তির উত্তেজনা না হয়, যাহা পড়িয়া কেহ নিজেকে মহত্তর ও পবিত্রতর বিবেচনা না করে, তাহা উচ্চ কাব্য নয়। দুর্নীতি সত্ত্বেও কাব্য চমৎকার হয় না। সূর্য না হইলে দিবা হয় না।

যে 'দুর্নীতি' এবং 'অস্বাভাবিকতা' দ্বিজেন্দ্রবাবু এই কাব্যে এমন সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন, তাহা আমাদের চক্ষে পড়ে নাই কেন? সম্ভবতঃ প্রথম পাঠকালে আমাদের নীতি-জ্ঞান তত জাগ্রত ছিল না, এবং কবির রচনার মোহমন্ত্রে আমাদের বিচার-শক্তি অভিভূত বা একেবারে লুপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং 'সাহিত্যে'র পাঠকবর্গের সহিত আমরা 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য পুনর্বার পাঠ করিব, এবং তৎসম্বন্ধে আমাদের পূর্ব-ধারণার এবং দ্বিজেন্দ্রবাবুর মতের আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইব।"

দ্বিজেন্দ্রলালের যুক্তি খণ্ডন—

"আমাদের এমন আশা আছে যে, দ্বিজেন্দ্রবাবুর আপত্তি সত্ত্বেও এই নির্দোষ এবং মনোমুগ্ধকর 'কোর্টশিপ' শীঘ্র সমাজ হইতে বিচ্যুত হইবে না, এবং দ্বিজেন্দ্রবাবুর নিন্দা সত্ত্বেও রবিবাবুর এই গানগুলি যতদিন বাংলা ভাষা এবং বাঙালী জাতি থাকিবে, ততদিন তাহারা আদরের সহিত গীত হইবে।"—সাহিত্য, কার্তিক, ১৩১৬; পৃঃ ৩৭৬-৪০৮।

'সাহিত্য' পত্রিকার অগ্রহায়ণ (১৩১৬) সংখ্যায় ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'চিত্রাঙ্গদা'র আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—

"চিত্রাঙ্গদা কাব্যখানি সুনীতি কি দুর্নীতির প্রচার করিতেছে, নায়িকা অজাতোপযমা নবযৌবনা চিত্রাঙ্গদা সলজ্জা কি নির্লজ্জা, নায়ক মাতুলীকন্যাহারী কৃষ্ণসখা অর্জুন লম্পট কি জিতেন্দ্রিয়, এবং কাব্যপ্রণেতা রবীন্দ্রনাথের রুচি সু কি কু, এই সব কথা লইয়া কয়েকমাস ধরিয়া সাহিত্যের আসরে একটা ঘোঁট চলিতেছে। রবীন্দ্রনাথের যশঃ-সূর্যের কালমেঘরূপ দ্বিজেন্দ্রলাল 'সাহিত্য'-আকাশে উদিত।"

সোনার তরী

যদুনাথ সরকার

সারাজীবন শুধু খেটেছি এবং সাংসারিক কাজে ব্যস্ত হয়ে রয়েছি। শেষে দেখি যে আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। মৃত্যু প্রলয়-ঝড়ের মত আমাকে গ্রাস করবার উদ্যোগ করছে। আশপাশে পালাবার পথ নাই।

আমার যাহা জীবনের ব্রত, সে কাজে আমার সহচর নাই, সহায় নাই। (সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীরা একক; জীবনের মধ্য দিয়া তাঁহারা নিজ কাজ করিয়া যান, সাহায্য পান না, উৎসাহ পান না, সফলতা বড় দুরবর্তী বোধ হয়। তাই তাঁহাদের জীবন সঙ্গীহীন, বিষাদছায়া মাখা। পতিত জাতির কবি দান্তের, অথবা ঘোর কৃত্রিম ও বৈষয়িক ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগের প্রকৃতির কবি গ্রের জীবনে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়।)

মরণ-নদীর ওপার হতে পরলোকের একটু আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বড়ই অস্পষ্ট, কারণ 'সে অনাবিষ্কৃত দেশের প্রান্ত হতে এ পর্যন্ত কোন পথিক ফেরে নাই।'

এ নদীতে একমাত্র কাণ্ডারী কাল-তরঙ্গ-অপরাজয়ী, অপ্রতিহতশক্তি ঈশ্বর। তাঁহাকে হৃদয়-নিভৃতে অনুভব করা যায়, কিন্তু চাক্ষুষ দেখা যায় না। ['তাঁহাকে না পাইয়া বাক্য মনের সহিত ফিরিয়া আসে।' তিনি 'কল্পনা চিন্তা ধারণা ও সিদ্ধান্তের বাহির; যাহা পড়িয়াছি, শুনিয়াছি, বা লোকে বলিয়াছে তার চেয়ে বড়' (শেখ সাদী)। 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন পাই না।' তবে তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিয়া লইব কিরূপে?]

দ্রষ্টব্য: 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থ ১৩০০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হইলে ইহার অর্থ ব্যাখ্যা লইয়া নানা আলোচনা হয়। রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—

> "এক জাতের কবিতা আছে যা লেখা হয় বাইরের দরজা বন্ধ করে। সেগুলো হয়তো অতীতের স্মৃতি বা অনাগতের প্রত্যাশা, বাসনার অতৃপ্তি বা আকাঙ্ক্ষার আবেগ, কিংবা রূপরচনার আগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার এক জাতের কবিতা আছে যা মুক্তদ্বার অন্তরের সামগ্রী, বাইরের সমস্ত কিছুকে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে।"...

তাঁহারই আশ্রয় লওয়া যাক্। আমার জীবনের কাজগুলি তাঁহাতেই অর্পণ করি। শ্রম করিয়াছি আমি, কিন্তু তাহার ফল চাহি না। তিনি শুধু খুসী হয়ে সেগুলি গ্রহণ করুন ও জগতে বিলিয়ে দিন।

"বলেছি যে কথা করেছি যে কাজ
আমার সে নয়, সবার সে আজ,
ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসার মাঝ
বিবিধ সাজে।"

ভোগবাসনার লেশমাত্র না রাখিয়া সমস্ত কর্ম নিঃশেষ করিয়া তাঁহাকে সমর্পণ করিলাম। শ্রমজীবনের শেষে সংসারে আমাকে আর কিছুর প্রয়োজন নাই। কর্তব্য বাকী নাই। এখন শুধু ঈশ্বরসন্নিধি চাই।

কিন্তু তাহা পাইলাম না। তিনি শুধু আমার কর্ম গ্রহণ করিলেন; আমাকে মুক্তি দিলেন না। তাই এ প্রাচীন বয়সে একলা শুধু হাতে হতাশ হয়ে মৃত্যু অপেক্ষায় বসে আছি।

॥ উপসংহার ॥

কাব্য বুঝিতে হইলে পাঠকের মনের সহায়তা অত্যাবশ্যক। সেক্ষপীয়র পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন, 'সর্বোচ্চ নাটকও শুধু ছায়া মাত্র, যদি দর্শকের কল্পনা স্টেজের অভাবগুলি পূরণ করিয়া না লয়।' সমালোচনা আত্মপ্রকাশ; তাই একজন চতুর ফরাসী সমালোচক তাঁহার সেক্ষপীয়র সম্বন্ধে বক্তৃতাগুলির আরম্ভে বলিয়াছিলেন,—'Gentlemen, I am going to speak of myself in

---

এই গ্রন্থটির বিভিন্ন কবিতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন তাহা রবীন্দ্র-রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডের 'গ্রন্থ-পরিচয়ে' লিপিবদ্ধ আছে। কৌতূহলী পাঠক সেগুলি হইতে কাব্য-পাঠের যথাযথ রস গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন। 'সোনার তরী' উক্ত খণ্ডের রচনাবলীতে মুদ্রিত হইয়াছে।

এই সমালোচনাটি ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মহাশয় কর্তৃক 'প্রবাসী' মাসিক পত্রিকায় অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ সালে প্রকাশিত হয়।

এক্ষেত্রে 'সোনার তরীর' ব্যাখ্যান বিষয়ে কবি নিত্যকৃষ্ণ বসুর মতামতটি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বিবেচনায় নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

connection with Shakespeare'. যে পাঠক যতটা পুঁজি লইয়া আসেন, কাব্য পাঠ করিয়া সেই পরিমাণেই লাভ করেন।

রবীন্দ্রনাথের গত ষোল বৎসরের কবিতাগুলি সম্পূর্ণরূপে নূতন ভাব প্রচার করিতেছে। ('সোনার তরী'কে এ ভাবের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত বা আদর্শ মনে করা ভুল।) এই ভাবগুলি আমাদের পুরাতন-স্মৃতি অভ্যস্ত-ভাব হইতে ভিন্ন। অনেকের পক্ষেই নূতন। প্রথম পাঠেই যে এরূপ কবিতার প্রতি পংক্তি বোঝা যাইবে এরূপ আশা করা যায় না; এবং না বুঝিতে পারিয়া অমনি নব-বাণীর দূতের প্রতি অথবা রবি-ভক্তগণের মধুচক্রে ঢিল ছুঁড়িলে শুধু 'হাসির সমালোচনা' রচনা করা হয়।

কেবল একটি কবিতা বা অধ্যায়ে চক্ষু নিবিষ্ট রাখিলে লেখকের মনের ভাব ধরা কঠিন হইতে পারে। কিন্তু এমন কোন লেখক নাই যাঁহার অনেকগুলি এক সময়ের রচনা পড়িলে অর্থবোধ অসম্ভব বা কঠিন। শেলী, ব্রাউনিং, এমার্সনও আজকাল বেশী পড়িয়া পড়িয়া অতি পুরাতনের মত সহজ বোধ হয়। আমাদের দেশের সমালোচকেরা যদি ভাব-বিকাশ তাঁহাদের কর্তব্য বলিয়া চিনিতেন, তবে এতদিনে রবীন্দ্রনাথের নূতন ধরনের কবিতাগুলি পাঠক-সমাজে বড়ই পুরাতন হইয়া পড়িত। তাহা হয় নাই বলিয়া কি এগুলি অর্থহীন জটিলতা মাত্র, শুধু 'মিছে কথা গাঁথা'? তাহাদের মধ্যে কি এক

"রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের প্রথম কবিতা 'সোনার তরী'র আলোচনা করিতেছিলাম। ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ এ পর্যন্ত আমরা বুঝিতে পারি নাই। কেবল সু-চন্দ্র ও দ-বাবু, বাস্তবিক বুঝুন আর না বুঝুন, বুঝিবার ভান বিলক্ষণ করেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে উদ্দেশ্যে কবিতাটি লিখিয়াছেন, তাহা তিনি সেদিন এক বন্ধুর নিকট বলিয়াছেন। তিনি বলেন, 'আমি মাতৃভূমিকে আমার যথাসর্বস্ব সমর্পণ করিয়া তাঁহার নিকট অক্ষয় যশ প্রতিদান-স্বরূপ চাহিলাম। কিন্তু প্রতিদান পাইলাম না, অর্থাৎ আমি নিতান্ত দীন দরিদ্র, আমার যাহা কিছু ছিল, তাহাও অতি সামান্য, সুতরাং আমি বঙ্গীয় সমাজে স্মরণীয় হইতে পারিলাম না।' অর্থ মন্দ নহে; কিন্তু কবিতার ভাষায় এই অর্থ পরিস্ফুট হইয়াছে কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আমরা গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া, উদ্দেশ্য ও অর্থ মিলাইতে মিলাইতে শেষ শ্লোকের নিকট এক রকমে পৌঁছিলাম। তারপর—

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই—ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।'

মহান্ শিক্ষা নাই ? নির্দোষ আমোদ ভাল জিনিস। **Laugh and grow fat.** কিন্তু শুধু 'হাসির গান' জীবন-গীতা হইতে পারে না ; শুধু **broad grains**-এ কখনও জাতীয় উন্নতির ভিত্তি গাঁথা হয় নাই।

এইখানে আসিয়া একেবারে হাল ছাড়িয়া দিতে হইল। সুতরাং রবীন্দ্রবাবুর নিজকৃত ব্যাখ্যা সমগ্রভাবে গ্রহণ করিতে পারিলাম না।"

'সাহিত্য' (১৩২০, পৌষ ; ২৪শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা) পত্রিকায় রমাপ্রসাদ চন্দ্র তাঁহার 'রবীন্দ্র-নাথের কাব্য-রহস্য' নামক প্রবন্ধের মধ্যে 'সোনার তরী' সম্বন্ধে একটি সুন্দর ব্যাখ্যা করেন। এই ব্যাখ্যার মধ্যে তিনি মোহিতচন্দ্র সেনের নাম উল্লেখ করিয়া একস্থানে বলিয়াছেন, "আমার ভক্তিভাজন শিক্ষক মোহিতচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, 'সোনার তরী'র উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি কে ? 'হৃদয়-যমুনা'য় কাহাকে আহ্বান করা হইয়াছে ? এ সব প্রশ্ন আমরা বৃথা জিজ্ঞাসা করি।"

আসলে 'সোনার তরী' লইয়া ইতিপূর্বে মহারথগণের মধ্যে যে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, চন্দ্র মহাশয় তাহারই উত্তর দান করেন এই প্রবন্ধের মধ্যে, এবং তাহাতে রবীন্দ্রনাথের গুণপনাই প্রকাশ পায়।

নদী

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

অনেকে মনে করেন, মানব প্রকৃতিটা ভগবানের একটা মস্ত ভুল, বিশেষতঃ শিশু প্রকৃতি। বাস্তবিক স্বর্গে যদি একটা টেক্সট্ বুক কমিটি থাকিত এবং ভগবান যদি তাহার, কিংবা তথাকার গুরু-মহাশয়দের পরামর্শ লইয়া শিশু প্রকৃতি গড়িতেন, তাহা হইলে শিশুরা এত খেলা ভালবাসিত না, দুপর রোদে ঘরময় দাপা-দাপি করিত না, ঠাকুরমার কাছে বসিয়া সন্ধ্যার আধ-আলো আধ-আঁধারে উপকথা শুনিতে চাহিত না, এবং এতটা স্বপ্নপ্রিয় ও কল্পনার দাস হইত না। ভগবানকে কষ্ট পাইয়া বেত গাছের সৃষ্টি করিতে হইত না। কিন্তু যা হইবার নয়, তাহার জন্য দুঃখ করিয়া কি হইবে? শিশুগুলিকে ভগবান আমাদের কাছে পাঠাইয়াছেন। বহুকাল ধরিয়া দেখা গেল যে, ঠেঙ্গাইয়া শিশুদিগকে গোপালের মত সুশীল ও সুবোধ করা গেল না। তাহারা ক্রমাগত নামতা পড়িতে ত চায়ই না; এমন কি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কবিগণ যে এমন চৌদ্দ অক্ষরের মিলযুক্ত নীতিগর্ভ কবিতানিচয় প্রণয়ন করিয়াছেন, তৎসমুদয়ও অভিনিবেশপূর্বক অধ্যয়ন করিতে চায় না। টেক্সট্ বুক কমিটির চেয়ে ত ছেলেদের বুদ্ধি ও নীতিজ্ঞান অধিক নয়। তাঁহারা এ সকল কবিতাকে অতি উপকারী বলিয়াছেন। তবু শিশুরা সেগুলি আপনা হইতে পড়ে না। এখন উপায় কি? আমাদের বরাবরই একটা সন্দেহ আছে, ভয়ে বলিতে পারি নাই। সন্দেহটা এই যে, আমরা অবশ্য খুব বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান জীব; কিন্তু হয়ত ভগবান নিতান্ত কাঁচা কারিকর না হইতেও পারেন। শিশুদিগকে ঠেঙ্গাইয়া পিটিয়া আমাদের মনের মত করিয়া গড়িতে ত পারা গেল না। এখন ভগবানের উপর

দ্রষ্টব্য: 'নদী' প্রকাশিত হয় ১৩০২ বঙ্গাব্দে। 'দাসী' পত্রিকার মার্চ, ১৮৯৬ সংখ্যায় ইহা সমালোচিত হয়। উক্ত সময়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'দাসী'র সম্পাদক ছিলেন। তৎকালে প্রধানতঃ পত্রিকার সম্পাদকই নিজে সমালোচকের কার্য করিতেন। ইহা যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের রচনা তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

'নদী' গ্রন্থটি ঠাকুর-পরিবারের পরিকল্পিত 'বাল্য গ্রন্থাবলী' পর্যায়ের দ্বিতীয় পুস্তক। এই

হাতিয়ার না চালাইয়া শিশুদিগকে তাহাদের প্রকৃতির গতি অনুসারে বাড়িতে দিলে মন্দ হয় না। তাহাদের জ্ঞানার্জনের মধ্যেও ক্রীড়াশীলতা আসুক না; তাহাতে ক্ষতি কি? বিড়ালছানাগুলি লেজ নাড়িয়া লাফাইয়া লাফাইয়া খেলা করে, নীতি ও গাম্ভীর্য ভাল বলিয়া ভগবান তো তাহাদের লেজগুলি কাটিয়া সংসারে পাঠাইয়া দেন নাই? ক্রীড়াশীলতা বোধ হয় পাপ নয়। কল্পনাটাও বোধ হয় মন্দ জিনিস নয়। শিশুদের কল্পনা জাগাইয়া দেওয়া বরং ভাল বলিয়া বোধ হয়। তুমি আমি হয়ত জ্ঞানের শুষ্ক হাড় চিবাইতে পারি; কিন্তু শিশুরা একটু রস চায়; সকল জিনিসই সৌন্দর্যের পরিচ্ছদে সজ্জিত দেখিতে চায়। যিনি তাহাদের এই নির্দোষ ক্রীড়ার সঙ্গী হইতে পারেন, তাহাদের কল্পনা সজাগ করিয়া তুলিতে পারেন, বিজ্ঞানকে তাহার সহচর সৌন্দর্যের সহিত একত্র করিয়া তাহাদের খেলার সাথী করিতে পারেন, তিনি তাহাদের পরম বন্ধু। আমরা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে শিশুদের বন্ধুত্ব-লিপ্সু দেখিয়া অতিশয় প্রীত ও আশান্বিত হইলাম। তাঁহার 'নদী'র সঙ্গে অনেক শিশু কল্পনার রথে চড়িয়া নানাদেশ ভ্রমণ করিবে। শিশুরা পড়িয়া ইহার সুন্দর কাগজ ও ছাপা শ্রীহীন করিয়া দিলে আমরা সুখী হইব।

পর্যায়ভুক্ত প্রথম পুস্তকটি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'শকুন্তলা'। তৃতীয় এবং শেষ পুস্তক অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল' এই 'বাল্য গ্রন্থাবলী'ভুক্ত।

'নদী' গ্রন্থটি প্রথম সংস্করণের পর আর পৃথকভাবে প্রকাশিত হয় নাই। পরে ইহা 'শিশু' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। বর্তমানে 'শিশু' গ্রন্থটি ছাড়াও 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র নবম খণ্ডে 'শিশু' অংশে 'নদী' মুদ্রিত হইয়াছে।

চিত্রা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম হইতেই বলিয়া রাখি, আমার এ প্রবন্ধটি সমালোচনা নহে। এক-খানি নূতন উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ সম্প্রতি বাহির হইয়াছে, সেইখানি পড়িয়া যাহা মনে হইতেছে, তাহাই লিখিব। ছয় রিপুর উপর সপ্তম রিপু—অর্থাৎ উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন, তাহার উপর সম্পূর্ণ বশবর্তী হইয়া হয়ত 'চিত্রা'র এক-চতুর্থাংশ এইখানেই উঠাইয়া ফেলিব—কিছুমাত্র সংযমের চেষ্টা করিব না। তাহাতে পাঠকের লাভ আছে, বিনামূল্যে চিত্রার অনেকটা পড়িয়া লইবেন; আমার লাভ আছে, আমার এই কুলিশ-কঠোর গদ্য টুকরা টুকরা হইয়া থাকিবে, এবং পরতে পরতে কাব্যরসে ভিজিয়া নিতান্ত বৃদ্ধ ছাড়া আর সকলেরই দন্তে উত্তমরূপে চূর্ণ হইতে পারিবে। হয়ত এমন কথা বলিব, যাহা স্বয়ং কবিই কখনও ভাবেন নাই; এমন স্থানে সংশয় করিব যাহা নিতান্তই সরল, এমন স্থানে অভিভূত হইয়া পড়িব, যেখানে অন্যে ছন্দ ও মিল ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইবেন না, এবং এমন অনেক স্থান ছাড়িয়া দিয়া যাইব যাহার প্রশংসা করিবার জন্য ভাষার অনটন পড়িয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ এখন বঙ্গের একমাত্র জীবিত যুবক কবি। উকিল হেমচন্দ্র মাথায় শামলা বাঁধিয়া দিব্য ওকালতী করিতেছেন, কিন্তু কবি হেমচন্দ্রের বহুদিন যাবৎ ৺প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। কবি নবীনচন্দ্র কথঞ্চিৎ জীবিত থাকিলেও গীতা গীতা করিয়া আপনার বার্ধক্য ঘনাইয়া তুলিতেছেন। বর্তমান কালে ফুলের গন্ধ, মলয় বাতাস, প্রেমসঙ্গীত, প্রিয়ার চাহনি, উচ্চ-মিষ্ট-হাস্য কেবল রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই পাওয়া যায়। আরও দুই একখানা গ্রন্থে এবং মাসিক পত্রের দুই-এক

দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' প্রকাশিত হয় ১৩০২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে। অর্থাৎ ইং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় প্রখ্যাত গল্পকার ও ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় গদ্য-রচনায় উৎসাহিত হন। কারণ প্রথম দিকে প্রভাতকুমার বীণাপাণির বেদীতে অর্ঘ্যরূপে কবিতার ডালি লইয়া প্রবেশ করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় প্রভাতকুমার ইং ১৮৯৬ (বৈশাখ, ১৩০৩)-এর মে মাসের 'দাসী' পত্রিকাতে 'চিত্রা'র একটি সমালোচনা প্রকাশ করেন। ইহা 'বসুমতী

সংখ্যার একটু-আধটু পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা এমন খাঁটি নহে, এমন প্রাণভরাও নহে।

রবীন্দ্রনাথের ইদানীন্তন রচনার সঙ্গে পূর্বের রচনাগুলি তুলনা করিলে দেখা যায়, মূলতঃ এক থাকিলেও অন্তরংশে ও বহিরংশে দুইয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার পূর্বের কবিতা লঘু গোলাপের মত ছিল, এখন সুবিকশিত পদ্মটির মত হইয়াছে; কিশোরী বালিকার মত ছিল, এখন জিম্ন্যাস্টীকের পূর্ণাবয়ব যুবকের মত হইয়াছে।

যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের সংবাদ রাখেন, তাঁহাদের মধ্যে এখন দুইটি দল। একদল রবীন্দ্রনাথের সপক্ষে, একদল বিপক্ষে। প্রথম দলের অধিকাংশই সুশিক্ষিত মার্জিতরুচি নব্য যুবক;—ইঁহারা সকলেই প্রায় এক প্রকারের লোক। দ্বিতীয় দলে অনেক প্রকারের লোক—মনুষ্যের চিড়িয়াখানা। (ক) বৃদ্ধ—তাঁহাদের কানে দাশুরায়ের অনুপ্রাস, ভারতচন্দ্রের শব্দ পরিপাট্য এমনই লাগিয়া আছে, যে অপর কিছু একেবারে তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে কেহ কেহ মাইকেল অবধি নামেন, আর নহে। তাহা ছাড়া তাঁহাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ এক মহাদোষে দোষী—তিনি অল্পবয়স্ক। যাহাকে এখন উলঙ্গাবস্থায় পথে খেলা করিতে দেখিতেছি, আমি বৃদ্ধ হইলে এবং সে যুবক হইলে যদি কেহ আসিয়া আমাকে বলে—দেখুন অমুক এমন হইয়াছে; হয়ত আমি বলিব—কে অমুক? আরে না না; ওসব বাজে কথা। বৃদ্ধের কাছে যাহা পুরাতন তাহাই প্রাণপ্রিয় মনে হয়, নূতন (তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ভিন্ন) কিছুই ভাল লাগে না। সুতরাং নব্য কবির রচনা কেমন করিয়া ভাল লাগিবে? তাহা আশা করাই অন্যায়। মানুষের যৌবনের স্মৃতি সংগীতের মত মৃত্যুক্ষণ অবধি মনে জাগিয়া থাকিয়া তাহাকে মোহিত করিয়া রাখে। তখন সে দিনগুলি

সাহিত্য-মন্দির' প্রকাশিত 'প্রভাত গ্রন্থাবলী'র পঞ্চমভাগে পুনর্মুদ্রিত হয়। বর্তমানে ইহা 'প্রভাত গ্রন্থাবলী'র প্রথম খণ্ডে (প্রকাশকাল মাঘ, ১৩৬৫) স্থান পাইয়াছে।

'চিত্রা'র অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি কবিতা—'প্রেমের অভিষেক', 'পূর্ণিমা', 'উর্বশী', 'জীবন দেবতা', 'সিন্ধুপারে' প্রভৃতির ব্যাখ্যা করিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমারকে ৬ই চৈত্র, ১৩০২ তারিখে শিলাইদহ হইতে যে পত্র লেখেন, সেই মূল্যবান পত্রটি শ্রীকালিদাস নাগ মহাশয় ১৩৪৯ সালের 'প্রবাসী' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন।

যত না মিষ্ট, যত না সুন্দর ছিল, এখন দুর হইতে সেইগুলিই শতগুণ মিষ্ট ও সুন্দর মনে হয়। তখন যে দেশকে, যে দৃশ্যকে, যে রাগিণীকে, যে কবিকে সে বলিয়াছে 'আহা' সেই দেশ, সেই দৃশ্য, সেই রাগিণী, এবং সেই কবিই মৃত্যুদিন অবধি তাহার 'আহা' থাকিবে। এইটি মনুষ্যহৃদয় সম্বন্ধে একটি অব্যর্থ নিয়ম। (খ) প্রৌঢ়—এখনকার প্রৌঢ়েরা একদিন কাব্যে, সাহিত্যে ভারি মাতিয়াছিলেন—সেই বঙ্গদর্শনের সময়। ইঁহারা অনেকে হেমচন্দ্রের 'আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে' আবৃত্তি করিয়া বয়সকালে অনেক হা-হুতাশ করিয়াছিলেন, যদিও এখন তাহা কোন ক্রমেই স্বীকার করেন না। ইঁহারা এখন রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে ছেলেমানুষী বলিয়া উড়াইয়া দেন, তাহার কারণ হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ইঁহাদের হৃদয়বীণার যে তন্ত্রীগুলিতে আঘাত করিয়া টুং টাং শব্দ বাহির করিয়াছিলেন, সেই তন্ত্রীগুলিই এখন এমন ঢিলা হইয়া পড়িয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথের আঘাতে ছড়ছড় শব্দমাত্র করিয়া থামিয়া যায়। (গ) যুবকের মধ্যে যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে, তাঁহারা কেহ কেহ ব্যর্থকাম কবি। একটি ইংরাজী প্রবচন আছে, ব্যর্থকাম গ্রন্থকারেরা সমালোচক। (এখানে সমালোচক অর্থে নিন্দুক) হইয়া দাঁড়ায়। ইঁহারা যাহা হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা হইতে না পারিয়া, যে হইয়াছে তাহার প্রচুর নিন্দা করিয়া সান্ত্বনা ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। মানুষ যখন প্রতিযোগিতায় হারিয়া যায়, তখন যে জিতিয়াছে, তাহার প্রতি তাহার বিজাতীয় বিদ্বেষ, বিরক্তি, আক্রোশ ও ঘৃণা হইয়া থাকে—এটা নিতান্ত স্বাভাবিক। ইঁহারা অনেকে বিদ্বান, কৃতী সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর; ইঁহাদের আবার যাহারা ধামাধরা আছে তাহারা শুনিয়া শুনিয়া বলিয়া থাকে রবিঠাকুর আবার কবি! সত্য সত্য আমি এমন লোকের মুখে একথা শুনিয়াছি, যে কস্মিনকালে রবীন্দ্রনাথের একখানি গ্রন্থ এমন কি একটিও কবিতা পাঠ করে নাই। আমাদের কলেজের কতকগুলি যুবক অকালে নিতান্ত জ্যেঠা হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা রবীন্দ্রনাথের নিন্দা করে। এই সকল যুবককে চিনিবার কতকগুলি লক্ষণ এখানে নির্দেশ করিতেছি। (১) তাহারা অশ্লীল কথা কহিয়া মনে করে ভারি রসিকতা করিলাম। (২) পথে-ঘাটে ভদ্রলোকের মেয়েছেলে দেখিলে আপনা-আপনির মধ্যে কুৎসিত হাসিতামাশা করে। (৩) কোনও নূতন ভাল বিষয়ে কাহারও চেষ্টা দেখিলে তাহাকে বিদ্রূপ করে। (৪) কোনও বিষয় পুরাতন হইলে, যদি নিতান্ত মন্দও

হয়, তথাপি তাহার জন্য খুব লড়িয়া থাকে—ইত্যাদি। দুঃখের বিষয় প্রথম দল অপেক্ষা দ্বিতীয় দলের লোকসংখ্যা অধিক। কিন্তু পূর্বাপেক্ষা রবি-ভক্তের দল এখন অনেক বাড়িয়াছে—এ বৃদ্ধি 'রাজা ও রাণী' প্রকাশিত হইবার পর হইতে। তাঁহার চমৎকার ক্ষুদ্র গল্পগুলিতেও শত্রুপক্ষের অনেকে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

এটা আমি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, যাহারা রবীন্দ্রনাথের ভক্ত, তাহারা ভারি গোঁড়া। কেহ যদি রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে একটি কথা বলিল, অমনি রণং দেহি রণং দেহি বলিয়া তাহারা গর্জন করিয়া উঠে। বোধ হয় এই কারণেই, যাহারা বিপক্ষে তাহারাও ঘোরতর বিপক্ষে। অনেক ছাত্রাবাসে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়া শেষকালে শত্রুপক্ষে মিত্রপক্ষে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইয়াছে শুনিয়াছি। অনেকে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যুদ্ধ করিতে এতই প্রস্তুত, যে সহসা মনে হয় লোকটা ম্যানিয়াগ্রস্ত। ইহার কারণ কি? বঙ্গের আর কোনও লেখকের ত এরূপ দৃঢ়বিভক্ত শত্রুপক্ষ মিত্রপক্ষ নাই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সমুদ্রের মত বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে। যদি কাহারও হৃদয়বাঁধে একটু ছিদ্র থাকে, সেই পথ দিয়া অল্পে অল্পে জল প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে ছিদ্র আরও বড়, আরও বড়, আরও বড় হইয়া পড়ে, তখন হৃদয়টা জলপ্লাবিত হইয়া যায়। আর যাহার হৃদয়-বাঁধে ছিদ্রই নাই, তাহার কোনও ল্যাঠাই নাই; তাহার ভিতর এক ফোঁটা জলও প্রবেশ করিতে পায় না; এমন লোক তর্ক করিয়া সেই সমুদ্রের অস্তিত্ব লোপ করিবার চেষ্টা ত করিবেই।

এইবার গৌরচন্দ্রিকা ছাড়িয়া বহিখানাতে হাত দিই। 'চিত্রা' দেখিতে বেশ, কিন্তু প্রথম সংস্করণ 'সোনার তরী'র মতন হয় নাই। যাহারা রবীন্দ্রনাথের ভক্ত, তাহারা প্রায়ই বাছা বাছা; তাহারা অনায়াসেই দেড় টাকার স্থলে দুই টাকা দিয়া চিত্রা কিনিতে প্রস্তুত ছিল, যদি চিত্রা দেখিতে আরও ভাল হইত। কেহ কেহ বলেন, ভাল পুস্তকের খুব ভাল কাগজ, ভাল বাঁধাই, ভাল মলাট না-ই হইল। আমরা বলি—তা' ত বটেই, তবে কি জান? ইত্যাদি। অর্থাৎ বেশ সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারি না, তথাপি ইচ্ছা করি বইখানি দেখিতে খুবই সুন্দর হয়। চিত্রার কবিতাগুলি

একটি ছাড়া সবই 'সোনার তরী'র পরে লেখা। শেষ কবিতাটির তারিখ ২০শে ফাল্গুন, ১৩০২। কবিতাগুলির তারিখ দেখিয়া একটা তথ্য আবিষ্কার করিয়াছি—'সাধনা' থাকিতে রবীন্দ্রনাথ অতি অল্পই লিখিয়াছেন। চিত্রার সমস্ত কবিতাগুলি দুই বৎসরে লেখা, কিন্তু অর্ধাংশের কিছু কম 'সাধনা' বন্ধ হইবার এই তিন মাসে রচিত। রবীন্দ্রনাথের লেখনীর ক্ষিপ্রগতি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এই তিন মাসে রচিত অধিকাংশ কবিতাই তাঁহার উৎকৃষ্ট রচনাগুলির মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য। অতএব পাঠকগণ এখন 'চিত্রা' পাইয়া 'সাধনা'র মৃত্যুশোক বিস্মৃত হউন। এই প্রসঙ্গে এখানে একটা সংবাদ দিয়া সকলকে চমৎকৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। বঙ্গ-সাহিত্যে অদ্বিতীয় নাটক 'রাজা ও রাণী' রচনা করিতে, সংশোধন করিয়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে রবীন্দ্রনাথের একমাসের অধিক লাগে নাই। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তিনি যত ক্ষিপ্র রচনা করেন, লেখা ততই ভাল হয়। এটা সামান্য প্রহেলিকা নহে।

প্রথম কবিতা—'চিত্রা'। আরম্ভ হইয়াছে—

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।"

এই 'তুমি' টি যে কে, তাহা কবিতাটি পড়িয়া ধরিবার জো নাই। হয়ত অভিধানে সে নাম নাই। হয়ত তিনি 'সোনার তরী'র 'মানস সুন্দরী', কবির হৃদয়ে জাগ্রত দেবতা। কবি তাহাকে বলিতেছেন, তুমি—

"একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয় বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম হৃদয়-গগনে,'
চারিদিকে চির-যামিনী।"

তাহার পর 'সুখ'—রবীন্দ্রনাথের নূতন ধরনের পয়ারে লিখিত। ইহার পর হইতে দ্বাদশটি কবিতা সাধনায় ক্রমে ক্রমে বাহির হইয়াছিল; কিন্তু 'প্রেমের অভিষেক' নামক কবিতাটির বর্তমান অবস্থা দেখিয়া হয়ত অনেকে মর্মাহত হইবেন। 'সাধনা'র কবিতায় সমস্ত উক্তিটি একটি ক্ষুব্ধ লাঞ্ছিত দরিদ্র কেরানীর মুখে দেওয়া হইয়াছিল, 'চিত্রা'য় সে কেরানীটিকে পদচ্যুত করিয়া তাহার স্থানে একটি সাদাসিধে মানুষকে বসান হইয়াছে। বলা বাহুল্য সেই

সঙ্গে তাহার 'অপোগণ্ড সাহেব শাবক' মনিবটিকেও অন্তর্ধান হইতে হইয়াছে। কিন্তু এ পরিবর্তনের কারণ কি? কেহ কেহ 'সাধনা'র সেই কবিতা পাঠ করিয়া নাকি বলিয়াছিলেন—"অফিসের কেরানীর সহিত জড়িত না করিয়া সাধারণ ভাবে আত্মহৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিলে, প্রেমের মহিমা অধিক সরল, উদার, উজ্জ্বল এবং বিশুদ্ধভাবে দেখান হয়। সাহেবের দ্বারা অপমানিত, অভিমান-ক্ষুণ্ণ, নিরুপায় কেরানীর মুখে এ কথাগুলা যেন অধিক মাত্রায় আড়ম্বর ও আস্ফালনের মত শুনায়।"—আমি কিন্তু এ যুক্তির মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি না। আস্ফালন নহে ত, কি? আস্ফালনই বটে। যে অপমানিত, ক্ষুধিত, সর্ব-জনের উপেক্ষিত, সে যখন বলিবে—আমার কিছুই নাই, কেবল প্রেম তুমি আছ—তাহাতেই আমি রাজার অপেক্ষা অধিক সুখী; সেই প্রেমের যথার্থ মূল্যবান সার্টিফিকেট। আর যাহার কোনও কষ্ট নাই, চাকরি করিবার প্রয়োজন নাই, দিব্য আহার করিয়া নাদুস নুদুস চেহারাটি, তাহার মুখে "তুমি মোরে করেছ সম্রাট, তুমি মোরে পরায়েছ গৌরবমুকুট" তেমন শুনায় কি? প্রেমের মহিমায় মহীয়ান্ ছবিটির পাশের ছবিটি যত ম্লান হইবে, প্রথমটি সেই পরিমাণে উজ্জ্বল দেখাইবে। এই law of contrast-এর জন্য চিত্রার ছবিটির উজ্জ্বলতা অনেক হ্রাস পাইয়াছে।

পূর্ব-প্রকাশিত রচনাগুলি ছাঁটিয়া ছাড়িয়া রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি বড় উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণের 'কড়ি ও কোমলে' শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রগুলি নাই। কিন্তু সমগ্র বঙ্গসাহিত্যে এই পত্রগুলির তুলনা নাই। শ্রদ্ধাস্পদ 'নব্য-ভারত' সম্পাদক মহাশয় প্রথম সংস্করণ 'কড়ি ও কোমল' সমালোচনাকালে এই পত্রগুলি প্রকাশ করাতে দোষ দেখিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, এগুলি 'কড়ি ও কোমলে' না দিয়া এইরূপ কবিতার অন্য একখানি বহি করিলেই হইত। বোধ হয় এই সকল আলোচনাদি শ্রবণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ নূতন সংস্করণে পত্রগুলি বাদ দিয়াছেন। নব্যভারত-সম্পাদক মহাশয়ের মতে আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা থাকিলেও এটি আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই—অনেকেই পারেন নাই। যে পুস্তকে গম্ভীর বিষয়ের সমাবেশ থাকিবে, তাহাতে লঘু বিষয়, হাসির বিষয় থাকিতে পাইবে না, এ নিয়মটা বড় ভাল বোধ হয় না। এ কেমন, না কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিয়া

একদিন আগাগোড়া পোলাও খাওয়ান, অন্যদিন আগাগোড়া চাটনি খাইতে দেওয়া। দ্বিতীয় সংস্করণ 'রাজা ও রানী'তেও অনেক পরিবর্তন ও ব্যবকলন হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন—

"বলেছি যে কথা, করেছি যে কাজ,
আমার সে নয়, সবার সে আজ।"

সুতরাং প্রকাশিত কবিতাগুলিতে তাঁহার আর অধিকার নাই। তবে তিনি কি হিসাবে প্রকৃত অধিকারীর বিনা অনুমতিতে সেগুলিতে কাঁচি চালান? এ অপরাধটা আইনের ভিতর আনিতে পারিলে তাঁহার নামে নালিশ চলিত, কিন্তু তাহা যখন নয়, তখন আমরা (অগত্যা) বিনীতভাবে তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি, যেন তৃতীয় সংস্করণে 'কড়ি ও কোমল', 'রাজা ও রানী' অবিকল প্রথম সংস্করণের মত করিয়া মুদ্রিত হয়; দ্বিতীয় সংস্করণ 'চিত্রা'য় যেন 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটি 'সাধনা'য় প্রকাশিত কবিতার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে।

'অন্তর্যামী' কবিতাটি বড় কৌতূহলের বিষয়। যাত্রা শুনিতে শুনিতে একবার সাজঘরে উঁকি মারিবার জন্য বাল্যকালে বড় আগ্রহ হইত। এই যে রাম, এই যে রাবণ, হনুমান, বিভীষণ এত যুদ্ধ করিতেছে, বক্তৃতা করিতেছে, ইহারাই সাজঘরে ঢুকিয়া হাসে, গল্প করে, রাবণের হাত হইতে হুঁকাটি লইয়া রাম তামাক খায়, দেখিয়া বড়ই বিস্ময় ও আমোদ জন্মিত। 'অন্তর্যামী' কবিতাটির ভিতর দিয়া একবার কবির সাজঘরে উঁকি মারিয়া দেখিলাম। দেখিলাম রানীর মত সজ্জিত একটি মহিমময়ী নারীমূর্তি স্বর্ণের সিংহাসনে বসিয়া আছেন; তাঁহার সম্মুখে আমাদের কবিটি নতজানু হইয়া বলিতেছেন—"তুমি কে আমায় বলিয়া দাও, আর আমায় অন্ধকারে ঘুরাইয়া মারিও না। তুমি যে বাঁশী দিয়াছ, আমি কেবল তাহাতে ফুঁ দিই;—কি কল করিয়া রাখিয়াছ, তাহা হইতে অপূর্ব সঙ্গীত উৎপন্ন হয়। লোকে ভাবে আমি বাজাই, কখনো কখনো আমারই ভ্রম হয়, বুঝি আমিই বাজাই, কিন্তু আমি ফুৎকার দিই মাত্র। আমি যে কথা কখনও ভাবি নাই, সে কথা কেমন করিয়া বাঁশী দিয়া বাহির হয়? যে ব্যথা বুঝি না, সে ব্যথা কেমন করিয়া হৃদয়ে জাগিয়া উঠে? আমার ভিতরে কি জন্য তুমি অসীম বিরহ, অপার বাসনা গোপনে বসিয়া রচনা করিতেছ? তোমার লীলা যখন অবসান

হইবে, তখন কি আমাকে ফেলিয়া রাখিয়া, আমার বাঁশীটি ফিরিয়া লইয়া, তোমার রহস্যপুরীতে লুক্কায়িত হইবে? যে দিন আমার মৃত্যু হইবে, সেইদিন কি বুঝিতে পারিব এই সকলের উদ্দেশ্য কি, তাৎপর্য কি?” আমরা ত শুনিয়া অবাক। আমরা মনে করিতাম কবি গাহেন আমরা শুনি, কিন্তু ইহার ভিতর যে এত রহস্য আছে তাহা কে জানিত? এই কবিতাটি এমন চমৎকার প্রণালীতে রচিত এবং স্থানে স্থানে ভাষা এত মনোহর, যে পড়িলে মনে হয় ভাগ্যে আমরা বাঙ্গালা জানিতাম!

'সাধনা' কবিতাটি দেবী বীণাপাণির প্রতি কবির আত্মনিবেদন।

কবি বলিতেছেন—

“দেবি, আজি আসিয়াছে অনেক যন্ত্রী শুনাতে গান
অনেক যন্ত্র আনি।
আমি আনিয়াছি ছিন্নতন্ত্রী নীরব ম্লান
এই দীন বীণাখানি।”

জগতের সমগ্র যন্ত্রীর সঙ্গীতের মধ্যে এ গানগুলির কোথায় স্থান হইতে পারে বলিতে পারি না, কিন্তু বাঙ্গালার এ ক্ষুদ্র আসরে ত ইতিপূর্বে কখনও এমন শুনা যায় নাই। 'পুরাতন ভৃত্য'—হাস্যরসের সহিত করুণরসের অপূর্ব মিশ্রণ। এই কবিতাটি যাঁহাদের অপঠিত, তাঁহারা বোধ হয় সহজে ধারণা করিতে পারিবেন না, এই দুইটি বিপরীত প্রকৃতির রস কেমন করিয়া একত্র করা যাইতে পারে;—বাস্তবিক বঙ্গ-সাহিত্যে আর কোথাও এমন নাই। 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটিও এই ধরনের। ইহার গল্পাংশ নিতান্তই সাধারণ। ইহা যে কবিতায় রচিত হইতে পারে, এ সম্ভাবনাও অন্যের মস্তকে উদয় হওয়া কঠিন হইত। উপেনের দেশে ফিরিবার সময় জন্মভূমির যে স্তোত্রটি কবি তাহার মুখে বসাইয়াছেন তাহা বড় সুন্দর—

“নমোনমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি।
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগন-ললাট চুমে তব পদধূলি,
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।
পল্লব ঘন আম্রকানন, রাখালের খেলাগেহ।
স্তব্ধ অতল দীঘি-কালোজল নিশীথ-শীতল স্নেহ।”

আবার আমতলায় বসিয়া তাহার পূর্বস্মৃতি কেমন মধুর, স্বপ্নময় !—

"সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম,
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম ॥
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা-পলায়ন,—
ভাবিলাম হায় আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন ।"

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রাকৃটিক্যাল্-সম্প্রদায় সর্বদা কবিদিগকে আক্রমণ করিয় থাকে, কবি 'শীতে ও বসন্তে' কবিতায় প্রাকৃটিক্যাল্‌গণকে খুব একহাত লইয়াছেন। যাহার মনোদেশটা শীত-প্রধান, সে বলে ইতিহাসের কাঠ কাটি, বিজ্ঞানের পাথর ভাঙি, সমালোচনার কামান গড়ি। আবার যাহার মনোদেশে বসন্ত ঋতুটা প্রবল, সে বলে নাটকের ফুলগাছ তৈয়ারি করি, কবিতা-ফুলের মালা গাঁথি। সুবিধা পাইলেই পরস্পর পরস্পরকে গালি দেয়। 'নগর-সঙ্গীত' কবিতাখানা যেন একখণ্ড জলন্ত লৌহ, তাহার চারিদিক হইতে যুক্তাক্ষরের স্ফুলিঙ্গ ছিটিয়া বাহির হইয়াছে।

'পূর্ণিমা'—কবি একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন, সেখানি পণ্ডিতের লেখা।

"সমালোচনার তত্ত্ব ; পড়ে হয় শেখা
সৌন্দর্য কাহারে বলে—আছে কী কী বীজ
কবিত্ব-কলায় ।"*

পড়িতে পড়িতে কবির হৃদয় শুষ্ক হইয়া উঠিল ; মনে হইল, কবিত্ব, কল্পনা, সৌন্দর্য, সুরুচি, রস সব মিথ্যা—সমস্ত কেবল 'শব্দ মরীচিকা-জাল'। অনেক রাত্রে দিক্ হইয়া বই ফেলিয়া যাই, তিনি আলো নিবাইয়া দিলেন, অমনি

"উচ্ছ্বসিত স্রোতে,
মুক্ত দ্বারে, বাতায়নে, চতুর্দিক হতে
চকিতে পড়িল কক্ষে বক্ষে চক্ষে আসি
ত্রিভুবনবিপ্লাবিনী মৌন সুধাহাসি ।"

—অর্থাৎ অনন্ত আকাশভরা পূর্ণিমা তাঁহার কক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া নিঃশব্দে

* এক প্রকার কলা হয় তাহা বীজে ভরা। মানুষ তাহা খাইতে পারে না ; কিন্তু আশা করি বানরসম্প্রদায়ের কোনও প্রকার অসুবিধা হয় না। ইতি—লেখক

সকৌতুকে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। যে বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মী মূর্তিমতী হইয়া কবিকে আসিয়া বলিলেন—বাতি জ্বালাইয়া, বহির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কোথায় তুমি আমার অন্বেষণ করিতেছিলে! আমি যে তোমারি দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। বাস্তবিক, আকাশের চন্দ্র নক্ষত্রের নীলিমায়, ধরণীর পুষ্পে পল্লবে, পর্বতে সমুদ্রে এত সৌন্দর্য, তাহা আপনার চক্ষু দিয়া যে দেখিতে পায়, তাহার পক্ষে ড্রাইডেন রস্কিন সাহেবের গ্রন্থ হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া সৌন্দর্যতত্ত্ব উদ্ধার করিবার দুশ্চেষ্টা অতি হাস্যকর বটে। কিন্তু সকলের চক্ষের জ্যোতি ত সমান প্রবল নহে; যাহাদের দৃষ্টি নিস্তেজ তাহারা এইরূপ পুস্তকের ভিতর দিয়া অণুবীক্ষণ না করিয়া আর করে কি?

'উর্বশী'—পৌরাণিক উর্বশীর নাম অব ইকরিয়া কবি যাঁহাকে স্তব করিয়াছেন, তাঁহাকে অনেক কবি পূর্ব হইতেই স্তব করিয়া আসিতেছেন। গ্যেটে যাঁহাকে বলেন, The Eternal Woman—Ewige Weibliche, উর্বশীমূর্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কবি তাঁহাকেই পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন। আদর্শ রমণীকে দুইভাগ করিলে, একভাগে The Beautiful আর একভাগে The Good পড়ে। উর্বশী কবিতায় প্রথমোক্তার স্তবগান। ইহার পরের কবিতা 'স্বর্গ হইতে বিদায়', তাহার একস্থানে দ্বিতীয়বার একটি চমৎকার ফোটো আছে, তাহা ক্রমে উদ্ধৃত করিব। এক ব্যক্তি 'বর্ষ লক্ষশত' স্বর্গে বাস করিয়াছে; আজ তাহার পুণ্যবল শেষ হইল, তাহাকে স্বর্গ হইতে বিদায় লইতে হইবে। সে আশা করিয়াছিল যাইবার দিন স্বর্গের দেবতারা তাহার জন্য দুই ফোঁটা চোখের জল ফেলিবেনই। কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাহাতে কাহারও ভ্রূক্ষেপও নাই। যে ব্যক্তিটা তাহাদের মধ্যে লক্ষশত বর্ষ বাস করিল, সে চলিয়া যাইতেছে, তাহাতে কাহারও প্রাণে বিষাদের লেশমাত্র নাই! কেমন করিয়া থাকিবে? স্বর্গে ত শোক নাই, অশ্রু নাই; সুতরাং হৃদয় নামক একটা ব্যাপারের অস্তিত্বই নাই। তাই সে যাইবার দিন আক্ষেপ করিতেছে—

"অশ্বত্থশাখার
প্রান্ত হতে খসি গেলে জীর্ণতম পাতা
যতটুকু বাজে তার, ততটুকু ব্যথা
স্বর্গে নাহি লাগে, যবে মোরা শত শত
গৃহচ্যুত হতজ্যোতি নক্ষত্রের মতো

মুহূর্তে খসিয়া পড়ি দেবলোক হতে
ধরিত্রীর অন্তহীন জন্মমৃত্যুস্রোতে।”

অনাথিনী বিধবার বালক পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া, লেখাপড়া শিখিবার জন্য কোনও ধনী আত্মীয়ের প্রাসাদে অবস্থানকালীন, সেখানে যদি স্নেহ না পায়, তবে তাহার মনের ভাবটা ঠিক এইরূপ হয়। মার ঘরে সেই সব ছিল, এখানে লোকজন দাসদাসীপূর্ণ পরিবারের মধ্যে সে একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। এখানে সে উত্তম আহার পায়, উত্তম শয্যা পায়, হর্ম্যশিখরে বাস করে, গাড়ী চড়িয়া বেড়াইতে পায়, সকলই সুখ, সকলই সুবিধা, কেবল একটি জিনিসের অভাব। সেই একটি জিনিসের অভাবে লবণহীন ব্যঞ্জনের ন্যায় এত আয়োজন সব ব্যর্থ হইয়া রহিয়াছে। যাইবার দিন স্বর্গহারা নর তাই অভিমান করিয়া বলিতেছে—

“থাকো স্বর্গ হাস্যমুখে, করো সুধাপান
দেবগণ। স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান—
মোরা পরবাসী। মর্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি—তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি দু-দিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দু-দণ্ডের তরে।

যত ক্ষুদ্র যত ক্ষীণ যত অভাজন
যত পাপীতাপী, মেলি ব্যগ্র আলিঙ্গন
সবারে কোমল বক্ষে বাঁধিবারে চায়—
ধূলিমাখা তনুস্পর্শে হৃদয় জুড়ায়
জননীর। স্বর্গে তবে বহুক অমৃত,
মর্ত্যে থাক্ সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা—অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি

তাহার পর স্বর্গের অপ্সরীগণকে বলিতেছে—তোমরা সুখে থাক, আমি ত চলিলাম। কিন্তু যেখানে আমি যাইতেছি, সে দেশ এমন হৃদয়হীনতার রাজ্য নহে; সেখানে—

"দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার, নদীতীরে
কোনো-এক গ্রামপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটিরে
অশ্বত্থছায়ায়, সে বালিকা বক্ষে তার
রাখিবে সঞ্চয় করি সুধার ভাণ্ডার
আমার লাগিয়া সযতনে। শিশুকালে
নদীকূলে শিবমূর্তি গড়িয়া সকালে
আমারে মাগিয়া লবে বর। সন্ধ্যা হলে
জলন্ত প্রদীপখানি ভাসাইয়া জলে
শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি একমনা
করিবে সে আপনার সৌভাগ্য গণনা
একাকী দাঁড়ায়ে ঘাটে। একদা সুক্ষণে
আসিবে আমার ঘরে সন্নত নয়নে
চন্দনচর্চিত ভালে রক্তপট্টাম্বরে,
উৎসবের বাঁশরি-সঙ্গীতে। তারপরে
সুদিনে দুর্দিনে, কল্যাণকঙ্কণ করে,
সীমন্ত সীমায় মঙ্গলসিন্দূরবিন্দু
গৃহলক্ষ্মী দুঃখে সুখে, পূর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্র-শিয়রে।"

কি সুন্দর! এই বর্ণনার কেমন করিয়া প্রশংসা করিব। ইহার অপেক্ষা সুন্দর আর কিছু পড়িয়াছি কি?—রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়িয়া অনেক স্থানে এই কথাই বলিতে হইয়াছে। এ যেন আর্য-ঋষির প্রণীত দেবদেবীর স্তবের মত হইল। যখন যে দেবতার স্তব হইতেছে, তখন তাঁহাকেই বলা হইতেছে—তুমিই গতি, তুমিই মুক্তি, তুমিই সর্বসারভূত। আর একটা নীচু দরের উপমা দিই;—এক ব্যক্তি বলে, বর্ধমানের সীতাভোগ ভাল কি মিহিদানা ভাল, কখনও স্থির করিতে পারিলাম না। যখন সেটা খাই, তখন সেইটাই সেরা বলে মনে হয়।

'সান্ত্বনা'—রবীন্দ্রনাথের সকল বিশেষত্বই ইহাতে বর্তমান। এটি স্ত্রী-উক্তি—চমৎকার রচনা। 'বিজয়িনী' চিত্রার মধ্যে একটি অতি উৎকৃষ্ট

কবিতা; গল্পাংশ তিন কথার অধিক নয়। অচ্ছোদ সরোবরে রূপসী স্নান করিতেছেন; তীরে শ্বেত প্রস্তর গঠিত সোপানে তাঁহার ত্যক্ত বস্ত্রালঙ্কার পড়িয়া রহিয়াছে। মদন ধনুঃশর লইয়া এক বকুলগাছের আড়ালে মোতায়েন আছেন, যুবতী উঠিলেই তাঁহাকে বাণবিদ্ধ করিবেন। রমণী স্নানান্তে তীরে উঠিলেন, অমনি অনঙ্গদেব তাঁহার সম্মুখীন হইলেন, কিন্তু বাণ ত্যাগ করা হইল না—

"সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল তরে। পরক্ষণে ভূমি 'পরে
জানু পাতি বসি, নির্বাক্ বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদনপানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।"

এই কবিতাটি আগাগোড়া বর্ণনার বিচিত্র ফুলে খচিত। একটা অংশ এখানে তুলিয়া দিই। রমণীর স্নানের সময়—

"চৌদিকে উঠিতেছিল মধুর রাগিণী
জলে স্থলে নভস্তলে; সুন্দর কাহিনী
কে যেন রচিতেছিল ছায়ারৌদ্রকরে
অরণ্যের সুপ্তি আর পাতার মর্মরে
বসন্তদিনের কত স্পন্দনে কম্পনে
নিঃশ্বাসে উচ্ছ্বাসে ভাষে আভাসে গুঞ্জনে
চমকে ঝলকে। যেন আকাশ-বীণার
রবিরশ্মি-তন্ত্রীগুলি সুরবালিকার
চম্পক-অঙ্গুলিঘাতে সঙ্গীত ঝংকারে
কাঁদিয়া উঠিতেছিল—মৌন স্তব্ধতারে
বেদনায় পীড়িয়া মূর্ছিয়া।"

'গৃহশত্রু'—চারিটি শ্লোকের একটি কবিতা। একটু তুলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু

কোনখানটায় তুলিব স্থির করিতে না পারিয়া সে সংকল্প ত্যাগ করিলাম। 'উৎসব'—এটি তেমন হয় নাই; রবীন্দ্রনাথের অন্য কবিতার সঙ্গে তুলনা করিয়াই বলিতেছি, তেমন হয় নাই। নতুবা বঙ্গ-সাহিত্যের শত শত কবিতার মধ্যে ফেলিলে এটিরও মৃত হস্তীর ন্যায় লক্ষ টাকা মূল্য হইবে। 'বাল্য-গ্রন্থাবলী'র দ্বিতীয় পুস্তক 'নদী'র উৎসর্গপত্র পড়িলে জানা যায়, 'উৎসব' রচনার দিন কবির বাড়ীতে একটি বিবাহ ছিল। সেই উপলক্ষে রচিত বলিয়াই কি ইহা এমন প্রাণহীন হইয়াছে? অবশ্য কবিতায় গার্হস্থ্য ঘটনার উল্লেখমাত্র নাই, কিন্তু তবুও দুই স্থানে ফাঁক বহিতেছে—

"তুমি কি বসেছ আজি
নটবর বেশে সাজি?"

অপিচ—

"তোমারি কি পট্টবাস
উড়িছে সমীরে?"

'জীবনদেবতা'—কবির মনে যাহাই থাকুক, এটি সাধারণে স্ত্রী-উক্তির একটি কবিতা বলিয়াই গ্রহণ করিবে। 'রাত্রে ও প্রভাতে'—ইহাতে একটি বড় পুরাতন কথা লিখিত হইয়াছে। যে দিন জগতে প্রথম নরনারীর মধ্যে প্রণয় ঘটিয়াছিল, সেইদিন হইতেই পুরুষ একটা বিষয় লক্ষ্য করিতেছে—কিন্তু সে কথা, এই বোধ হয়, কবিতায় প্রথম ব্যক্ত হইল। টকটকে খোঁপার নূতন অলঙ্কারের রঙ, প্রভাতে দেখিবে একরকম, মধ্যাহ্নে অন্যরকম, সন্ধ্যাবেলায় আবার তৃতীয় প্রকারের। প্রেমিক প্রেয়সীর দুইটি মূর্তি দেখিতে পান। রাত্রে একরূপ, দিবসে অন্যরূপ। এই কবিতা হইতেই উদ্ধৃত করিয়া চিত্র দুইটি স্পষ্ট করি—

"কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্না-নিশীথে
কুঞ্জকাননে সুখে
ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা
ধরেছি তোমার মুখে।"

* * *

"আজি নির্মলবায় শান্ত উষায়
নির্জন নদীতীরে

স্নান-অবসানে শুভ্রবসনা
চলিয়াছ ধীরে ধীরে।”

*　　*

রাতে　প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি　এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে　কখন দেবীর বেশে
তুমি　সমুখে উদিলে হেসে।”

‘১৪০০ সাল’—শতবর্ষ পরের কল্পিত পাঠককে সম্বোধন করিয়া লিখিত। এক স্থলে আছে—

“আজি হতে শত বর্ষ পরে
এখন করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি
তোমাদের ঘরে ?
আজিকার বসন্তের আনন্দ-অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে।”

‘সিন্ধুপারে’—এইটি শেষ কবিতা। মৃত্যুসিন্ধুর পারে, প্রেমিকের সহিত তাহার প্রিয়ার নূতন করিয়া বিবাহ হইল। মৃত্যু রজনীতে অবগুণ্ঠিতমুখী অশ্বারোহিণী এক রমণী আসিয়া পুরুষকে ডাকিল। সঙ্গের দ্বিতীয় অশ্বে তাহাকে বসাইয়া সিন্ধুপারে লইয়া গেল। রমণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুরুষ একটি গিরিগুহায় প্রবেশ করিল। ভিতরে অপূর্ব ক্ষোদিত বহুকক্ষযুক্ত সুসজ্জিত প্রাসাদ। রমণী এক পালঙ্কে বসিয়া পুরুষকে পার্শ্বে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করিল। দশদিকে বীণা বেণু বাজিতে লাগিল—ক্রমে বিবাহ হইল। বিবাহের বর্ণনাটি বড় চমৎকার।—

“বাজিয়া উঠিল শতেক শঙ্খ হুলু-কলরব সাথে—
প্রবেশ করিল বৃদ্ধ বিপ্র ধান্যদূর্বা হাতে।
পশ্চাতে তার বাঁধি দুই সারি কিরাত নারীর দল
কেহ বহে মালা, কেহ বা চামর, কেহ বা তীর্থজল।
নীরবে সকলে দাঁড়ায়ে রহিল,—বৃদ্ধ আসনে বসি
নীরবে গণনা করিতে লাগিল গৃহতলে খড়ি কষি।
আঁকিতে লাগিল কত না চক্র, কত না রেখার জাল,
গণনার শেষে কহিল, ‘এখন হয়েছে লগ্ন-কাল।’

শয়ন ছাড়িয়া উঠিলা রমণী বদন করিয়া নত,
আমিও উঠিয়া দাঁড়াইনু পাশে মন্ত্রচালিত মতো।
নারীগণ সবে ঘেরিয়া দাঁড়াল একটি কথা না বলি,
দোঁহাকার মাথে ফুলদল-সাথে বরষি লাজাঞ্জলি।
পুরোহিত শুধু মন্ত্র পড়িল আশিস করিয়া দোঁহে,
কি ভাষা কি কথা কিছু না বুঝিনু, দাঁড়ায়ে রহিনু মোহে।
অজানিত বধূ নীরবে সঁপিল—শিহরিয়া কলেবর,
হিমের মতন মোর করে, তার তপ্ত কোমল কর।"

পুরুষ মন্ত্রচালিতের মত বিবাহ করিয়া গেল, কিন্তু তখনও জানে না, রমণী কে? পরে কাকুতি মিনতি করিয়া যখন মুখ দেখিতে পাইল, দেখিল সেই! তখন প্রেমিক প্রেয়সীর 'অমল কোমল চরণকমলে' চুম্বন করিল। ব্যাকুল অশ্রু বাধা না মানিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, এবং—

"অপরূপ তানে ব্যথা দিয়ে প্রাণে বাজিতে লাগিল বাঁশি।
বিজন বিপুল ভবনে রমণী হাসিতে লাগিল হাসি।"

চৈতালি

রমণীমোহন ঘোষ

ডিসেম্বর মাসের 'দাসী'তে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'রবীন্দ্রবাবুর চৈতালি' শীর্ষক যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমার যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে ; সংক্ষেপে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আরম্ভেই বলিয়া রাখা ভাল যে, রবীন্দ্রবাবুর সকল কবিতাগুলিই যে সম্পূর্ণরূপে দোষহীন এবং তাহা হইতে কোথাও কিছু উৎকৃষ্ট হইতে পারে না, এমন আমার এবং সম্ভবতঃ রবীন্দ্রবাবুর অন্যান্য ভক্তেরও বিশ্বাস নহে। কারণ মনুষ্যকৃত সমস্ত কার্যেই গুণের সঙ্গে ন্যূনাধিক পরিমাণে দোষও অবশ্যই মিশ্রিত থাকিবে। তবে রবীন্দ্রবাবুর কাব্যে যে দোষগুলি বর্তমান আছে তাহা পূজনীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাসবাবুর কথায় বলিতে গেলে, রবিমণ্ডলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণচিহ্নগুলির সহিতই উপমেয়। ঐ চিহ্নগুলি রবির অতুলনীয় তেজঃ ও প্রভার কোন ক্ষতি করে না এবং বিচক্ষণ জ্যোতির্বিদগণও বিশেষ কৌশলে নির্মিত যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতিরেকে তাহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না। রবিলাঞ্ছনগুলি আবিষ্কার করিবার জন্য অধিক আয়াস স্বীকার না করিয়া, যাহারা রবির নির্মলোজ্জ্বল আলোক দেখিতে পায় না, তাহাদের চক্ষুরুন্মীলনের জন্য চেষ্টা করা সমালোচকের কর্তব্য। একটা কাব্যের মধ্যে যেটুকু শিক্ষা ও সৌন্দর্য আছে, মানব-হৃদয়ের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, বেদনা ও ব্যাকুলতা পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহাই বিশেষরূপে পাঠকদের মনে মুদ্রিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেই, সমালোচকগণ দেশের ও সাহিত্যের যথেষ্ট উপকার সাধন করিতে পারেন।

দ্রষ্টব্য : 'চৈতালি' ১৩০৩ সালে সত্যপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

'চৈতালি' প্রকাশিত হইলে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'দাসী' পত্রিকায় ইহার একটি তীব্র সমালোচনা প্রকাশ করেন। ইহার উত্তরে কবি রমণীমোহন ঘোষ বর্তমান সমালোচনাটি 'প্রদীপ' (আষাঢ়, ১৩০৬) পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সে সময়ে 'দাসী'র প্রচার বন্ধ হইয়া যায়।

'চৈতালি' স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ২৩ মার্চ, ১৯১২ সনে। ইহা রবীন্দ্র-রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রবাবু কি মনে করিয়া 'সোনার তরী' লিখিয়াছেন, সেই প্রশ্নের আলোচনা লইয়া প্রবন্ধ আরম্ভ হইয়াছে। 'সাহিত্য'-সেবকগণ বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে 'সোনার তরী'র যে তিন প্রকার ব্যাখ্যা অনুমান করিয়াছিলেন, তাহার কোনও একটা স্বয়ং কবির অভিপ্রেত ছিল কিনা বলিতে পারি না। তাহা জানিতেও চাহি না। 'সোনার তরী' পাঠে আমার মনে যে ভাবের উদ্রেক হয়, তাহাই আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। কাব্যসমালোচনা-প্রণালী সম্বন্ধে রবীন্দ্রবাবু একবার যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিতেছি—

> "কাব্যসমালোচনা ব্যক্তিগত। চাঁদের আলো পদ্মার বালুচরের উপর পড়িয়া একরূপ আকার ধারণ করে, নদীর জলের উপর পড়িয়া আর একরূপ ভাব ধারণ করে, আবার ও পারের ঘন-সন্নিবিষ্ট বন-ভূমির মধ্যে পড়িয়া আর একরূপে প্রতিভাত হয়। চন্দ্রালোকের মধ্যে যে কাব্যরস আছে ইহাই তাহার তিন প্রকার সমালোচনা। কিন্তু ইহা পাত্রগত তাহার আর সন্দেহ নাই। তথাপি চন্দ্রালোকের কবিত্ব হিসাবে তিনই সত্য। চন্দ্রালোককে দেশকাল পাত্র হইতে উঠাইয়া লইয়া তাহার অতি বিশুদ্ধ নিরপেক্ষ সমালোচনা করিতে হইলে, তাহার কবিত্ব ছাঁটিয়া দিতে হয়।"১

রবীন্দ্রবাবু কি ভাবিয়া 'সোনার তরী' লিখিয়াছিলেন, 'পাঞ্চভৌতিক সভা'য় 'কাব্যের তাৎপর্য' সম্বন্ধীয় আলোচনায় তিনি স্বয়ংই তাহা বলিয়া দিয়াছেন—

> "এই পর্যন্ত বলিতে পারি, যখন কবিতাটা '(বিদায় অভিশাপ)' লিখিতে বসিয়াছিলাম তখন কোন অর্থই মাথায় ছিল না, তোমাদের কল্যাণে এখন দেখিতেছি লেখাটা বড় নিরর্থক হয় নাই—অর্থ অভি-ধানে কুলাইয়া উঠিতেছে না। কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির সৃজন শক্তি পাঠকের সৃজন শক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়; তখন স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য, কেহ বা নীতি, কেহ বা তত্ত্ব সৃজন করিতে থাকেন। এ যেন আতসবাজিতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া—কাব্য সেই অগ্নিশিখা, পাঠকদের মন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আতসবাজি। আগুন ধরিবামাত্র কেহ বা হাউইয়ের মত একেবারে

১। সাহিত্য—৩য় বর্ষ, ৪৩২ পৃঃ

আকাশে উড়িয়া যায়, কেহ বা তুবড়ির মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, কেহ বা বোমার মত আওয়াজ করিতে থাকে।···কাব্য হইতে কেহ বা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহ বা দর্শন উদ্‌ঘাটন করেন, কেহ বা নীতি, কেহ বা বিষয় জ্ঞান—আবার কেহ বা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারেন না—যিনি যাহা পাইলেন তাহাই লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে ঘরে ফিরিতে পারেন—কাহারও সহিত বিরোধের আবশ্যক দেখি না—বিরোধে ফলও নাই।"

'সোনার তরী' কবিতাটি যে পাঠকদিগের নিকট আশানুরূপ আদর না পাইয়া ভগ্নহৃদয় কবির বিষাদের গান, তাহা যদিও আমি আদৌ বিশ্বাস করি না, তথাপি সমালোচক মহাশয়ের প্রতিকূল মত সত্ত্বেও নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, রবীন্দ্রবাবুর ঐরূপ আক্ষেপ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এদেশে রবীন্দ্র-বাবুর প্রতিভার এখনও সমুচিত আদর হয় নাই। সভাস্থলে স্কুলের ছাত্রবৃন্দ অনেক সময় রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গীতের জন্য অসংযত ব্যগ্রতা প্রকাশ করে সত্য, কিন্তু তাহাতেই কি সাধারণ্যে তাঁহার কাব্যের যথেষ্ট আদর সূচিত হয়? নব্য বঙ্গে রবীন্দ্রবাবুর ভক্তের সংখ্যা নিতান্ত সামান্য না হইলেও তাঁহার প্রতিভার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। রবীন্দ্রবাবু যদি পাঠকদের নিকট ন্যায্য আদর পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার আদরের 'সাধনা'র অকালমৃত্যু আমাদিগকে দেখিতে হইত না। সম্ভবতঃ জনসাধারণ এখনও 'সাধনা'র সারবত্তা ও প্রয়োজনীয়তা সম্যক্ উপলব্ধি করেন নাই। কিন্তু অনেক শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তি 'সাধনা'র তিরোভাব জাতীয় ক্ষতি বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন।

কিন্তু যাঁহারা সাগ্রহে রবীন্দ্রবাবুর কবিতাদি পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারাও যে অনেক সময় আশ্চর্যরূপে উহার মর্মগ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করেন, তাহাই সর্বাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয়। কয়েক বৎসর পূর্বে 'সাহিত্যে'র একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক 'তর্কবৈচিত্র্যে' রবীন্দ্রবাবুর 'হিং টিং ছট্' নামক কবিতার যে-রূপ বিকৃত ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবতঃ সকলের মনে আছে। বর্তমান বর্ষের আশ্বিন মাসের 'সাহিত্যে'ও 'বীণাবাদিনী' পত্রিকার সমালোচনা উপলক্ষে রবীন্দ্রবাবুর একটি গানকে যেরূপ অন্যায় আক্রমণ করা হইয়াছে, অনেকে তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—"মম হৃদয় শয়ন-মাঝে শুন মধুর মুরলী বাজে, মম অন্তরে থাকি থাকি—কেবল

কষ্ট-কল্পিত চর্বিতচর্বণ নয়, নিতান্তই হাস্যরসের উদ্দীপক।" কিন্তু গানটি আদ্যো-পান্ত যিনি একটু প্রণিধানপূর্বক পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিবেন যে পংক্তি ক'টি এইরূপ হইবে—

"আজি আকুল ফুলসাজে,
জাগো মৃদু কম্পিত লাজে
মম হৃদয়-শয়ন-মাঝে ;
শুন মধুর মুরলী বাজে
মম অন্তরে থাকি থাকি।"

কেবল মুদ্রাকর-প্রমাদ বশতঃই একটা বিরামচিহ্ন অযথাস্থানে স্থাপিত হইয়াছে।—সাহিত্যসমাজপতি বলিয়া যাঁহারা পরিচিত হইতে অভিলাষী, তাঁহারাই যখন সহজে এরূপ একটা সরল কবিতার অর্থবিভ্রাট ঘটাইতে পারেন, তখন সাধারণ পাঠকদের হাতে রবীন্দ্রবাবুর অনেক কবিতারই যে দুর্গতি হয় তাহা স্পষ্টই অনুমান করা যাইতে পারে।

রবীন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে সমালোচক মহাশয়ের একটি অভিযোগ এই যে, 'সোনার তরী'র পর হইতে তিনি কবিতায় ভাষার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন, এবং "অতিরিক্ত আদরে ধনীর ঘরের সন্তানের মত তাঁহার ভাষাও কেমন বিগড়াইয়া যাইতেছিল।" সমালোচক 'চিত্রা'র কতকগুলি কবিতা লক্ষ্য করিয়াই এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ 'চিত্রা' হইতে কয়েকটি যুক্তাক্ষরবহুল সুন্দর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'চিত্রা'র অনেক কবিতায় যে রবীন্দ্রবাবু ভাষার উৎকর্ষের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে কবিতাগুলির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইয়াছে ভিন্ন কোন অংশে কমিয়া যায় নাই। রবীন্দ্রবাবু নিজেই একস্থানে বলিয়াছেন যে, কবিবর বিহারীলালের কাব্য পাঠ করিয়া তাঁহার "এই শিক্ষাটি স্থায়ীভাবে হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়াছে যে, সুন্দর ভাষা কাব্যসৌন্দর্যের একটি প্রধান অঙ্গ ; ছন্দে এবং ভাষায় সর্বপ্রকার শৈথিল্য কবিতার পক্ষে সাংঘাতিক।"[২] ঐ প্রবন্ধেই অন্যত্র বাঙ্গালা কবিতার ছন্দে যুক্তাক্ষরের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া বলিয়াছেন—

"বাংলা যে ছন্দে যুক্ত অক্ষরের স্থান হয় না, সে ছন্দ

২। সাধনা—৩য় বর্ষ, ২য় ভাগ, ১৫৪ পৃঃ

আদরণীয় নহে। কারণ, ছন্দের ঝঙ্কার এবং ধ্বনিবৈচিত্র্য, যুক্ত-অক্ষরের উপরেই অধিক নির্ভর করে। একে বাঙ্গালা ছন্দে স্বরের দীর্ঘ হ্রস্ব নাই। তার উপরে যদি যুক্ত অক্ষর বাদ পড়ে, তবে ছন্দ নিতান্তই সুললিত শব্দপিণ্ড হইয়া পড়ে। তাহা শীঘ্রই শ্রান্তি-জনক তন্দ্রাকর্ষক হইয়া উঠে, এবং হৃদয়কে আঘাতপূর্বক ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। সংস্কৃত ছন্দে যে বিচিত্র সঙ্গীত তরঙ্গিত হইতে থাকে, তাহার প্রধান কারণ স্বরের দীর্ঘ হ্রস্ব এবং যুক্ত অক্ষরের বাহুল্য। মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি অবগত ছিলেন। সেই জন্য তাঁহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ ধ্বনি এবং তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।”

‘চৈতালি’র কবিতায় ছন্দের বিচিত্র ঝঙ্কার ও সৌন্দর্য নাই। কবিতাগুলির ভাব যেমন সরল, ভাষাও তেমনই বাহুল্যবর্জিত ও সরল ;—তাহার কারণ, ‘চৈতালি’র অধিকাংশ কবিতাই চতুর্দশপদী। এক একটি ভাবে, এক একটি তরঙ্গে, এক একটি কবিতা সম্পূর্ণ। চতুর্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে ছন্দের সঙ্গীত ও সৌন্দর্য বিকশিত করা সম্ভবপর নহে, এবং সেরূপ চেষ্টা করিলে চতুর্দশপদীর উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হইয়া যায়। ‘চৈতালি’র ‘উৎসর্গ’ ‘গান’ ও ‘প্রার্থনা’র ছন্দে ‘চিত্রা’র বিচিত্র তরঙ্গিত সঙ্গীতঝঙ্কার ধ্বনিত হইয়া উঠে। সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন, “রবীন্দ্রবাবুর কবিতাসিন্ধু মন্থন করিলে অতি অল্প স্থানেই বিষাদভরা করুণস্বর ব্যতীত আর কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়।” এতৎ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, কেবল রবীন্দ্রবাবুর কবিতা কেন, বর্তমান যুগের ইংরাজী কবিতায়ও বিষাদের সুরের প্রভাব যে খুব বেশী তাহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু এ জন্য আক্ষেপ করিবার বিশেষ কোন কারণ দেখিতেছি না। রবীন্দ্রবাবু তাঁহার কাব্যগুরু বিহারীলালের প্রতিভা সমালোচনা উপলক্ষ্যে এই প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

“অসন্তোষ মানবপ্রকৃতির সহজাত।…কবিতায় অসন্তোষ-গানের বাহুল্য দেখা যায় বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করিয়া থাকেন। কিন্তু দোষ কাহাকে দিব ? অসন্তোষ মানুষকে কাজ করাইতেছে, আকাঙ্ক্ষা কবিকে গান গাওয়াইতেছে। সন্তোষ এবং পরিতৃপ্তি

যতই প্রার্থনীয় হউক, তাহাতে কার্য এবং কাব্য উভয়েরই ব্যাঘাত করিয়া থাকে। অ যেমন বর্ণমালার আরম্ভ এবং সমস্ত ব্যঞ্জন-বর্ণের সহিত যুক্ত, অসন্তোষ ও অতৃপ্তি সেইরূপ সৃজনের আরম্ভে বর্তমান এবং সমস্ত মানবপ্রকৃতির সহিত নিয়ত সংযুক্ত। এই জন্যই তাহা কবিতায় প্রাধান্যলাভ করিয়াছে, কবিদিগের মানসিক ক্ষিপ্ততা বা পরিপাকশক্তির বিকারবশতঃ নহে।”৩

যাদ ইহকালেই মানবজীবনের সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি হইত, তাহা হইলেই এই বিষাদের ভাব নিন্দনীয় হইত, এবং তাহা হইলে সম্ভবতঃ এরূপ অসন্তোষ ও অতৃপ্তি কবিহৃদয় চঞ্চল করিত না। কিন্তু বর্তমান জীবনের এই অতৃপ্তিই আমাদিগের হৃদয়ে ইহকালের পরপারবর্তী অনন্ত জীবনের আশা ও আভাস আনিয়া দেয়। সমালোচক মহাশয় ‘চৈতালি’র সমালোচনা করিতে যাইয়া তাঁহার প্রবন্ধে পুনঃ পুনঃ বিদেশীয় কবিতার সর্বাঙ্গীণ শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করিয়াছেন এবং কয়েকটি ইংরাজী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবিদিগের রচনার তুলনায় রবীন্দ্রবাবু প্রমুখ এ দেশীয় গীতিকবিদিগের কবিতার অপকর্ষ প্রদর্শন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে তিনি কত দূর সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহা বিচার করা অনাবশ্যক। কারণ অতি প্রাচীন ইংরাজী সাহিত্যের সহিত অপরিপুষ্ট নবীন বাঙ্গালী সাহিত্যের এখনও তুলনার সময় আসে নাই। এইরূপ অনুচিত তুলনা দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরবহানি করিবার চেষ্টা সম্বন্ধে রবীন্দ্রবাবু কোন প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

“বহুকাল হইতে বহুতর সামাজিক প্লাবনের সাহায্যে স্তর পড়িয়া ইংরাজী সাহিত্য উচ্চতা, কঠিনতা এবং একটা নির্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্প্রতি পলি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।...ইহার ইতিহাস নাই, আবহমান কাল প্রচলিত প্রবাহ নাই, বহুকাল সঞ্চিত রত্নভাণ্ডার নাই, ইহার বিক্ষিপ্ত অংশ-গুলিকে এখনও সমালোচনার নিয়মে বাঁধিবার সময় হয় নাই। সুতরাং ইংরাজী সমালোচন গ্রন্থ হইতে মুখগহ্বর পূর্ণ করিয়া লইয়া যখন

৩। সাধনা—৩য় বর্ষ ২য় ভাগ, ১৩১-৩২ পৃঃ

কোন প্রবল প্রতিপক্ষ ইহার প্রতি মুহুর্মুহু ফুৎকার প্রয়োগ করিতে থাকেন, তখন বঙ্গসাহিত্যের ক্ষীণ আশার আলোটুকু একান্ত কম্পিত ও নির্বাপিতপ্রায় হইয়া আসে। কিন্তু তথাপি বলা যাইতে পারে ফুৎকার যতই প্রবল হউক, শীর্ণ দীপশিখা তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ।

"বর্তমান বাঙ্গালা লেখকেরা বঙ্গসাহিত্যের প্রথম ভিত্তি নির্মাণে প্রবৃত্ত আছেন। সুতরাং যাঁহারা ইংরাজী গ্রন্থস্তূপশিখরের উপর চড়িয়া নিম্নে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারা ইহাদিগকে ছোট বলিয়া মনে করিতে পারেন।···যে শ্রেণীর সমালোচকের কথা বলিতেছি, তাঁহারা যখন বাঙ্গালা পড়েন, তখন মনে মনে বাঙ্গালাকে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া লন, সুতরাং সমালোচ্য গ্রন্থের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না।···মাতৃভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে সকল সাহিত্যই ম্লান নির্জীব ভাব ধারণ করে, তখন তাহার প্রতি সমালোচনা-রূপ শর প্রয়োগ করা কেবল 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' দেওয়া মাত্র।"[৪]

কিন্তু বঙ্গসাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যের সহিত তুলনার যোগ্য না হইলেও নব্য বঙ্গকবির রচনায় যে 'উদার চিন্তা ও মহানুভাব' স্থান পায় না, 'হতাশার কথা না থাকিলে যে এদেশের কবিতা জমাট বাঁধে না,' তাহা কেমন করিয়া স্বীকার করিব? উদাহরণস্বরূপ এখানে রবীন্দ্রবাবুর 'এবার ফিরাও মোরে' শীর্ষক কবিতাটির উল্লেখ করিতে পারি। ইহাতে যে উদার বিশ্বপ্রেমের গম্ভীর রাগিণী ধ্বনিত হইতেছে তাহা কোন বিদেশীয় কবিরই অযোগ্য নহে। অত্যাচারিত, ক্লিষ্ট ও নিরীহ স্বদেশবাসীদিগের দুঃখ দৈন্য দেখিয়া ব্যথিতহৃদয় কবি কহিতেছেন—

"···এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে;

৪। সাধনা—১ম বর্ষ, ১ম ভাগ, ৪৭১-৭৩ পৃঃ

দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার,
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হ.নতা আপনার
মনে মনে।"...
"কি গাহিবে, কি শুনাবে!—বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যে-জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।
মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি—তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে—জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি।"...
"শুধু জানি তাহারি মহান্
গম্ভীর মঙ্গল ধ্বনি শুনা যায় সমুদ্রে সমীরে,
তাহারি অঞ্চলপ্রান্ত লুটাইছে নীলাম্বর ঘিরে,
তারি বিশ্ববিজয়িনী পরিপূর্ণা প্রেমমূর্তিখানি
বিকাশে পরমক্ষণে প্রিয়জনমুখে। শুধু জানি
সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্কতিলক।"...
"হয়ত ঘুচিবে দুঃখনিশা,
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেমতৃষা।"

সমালোচকের মতে বিদেশীয় কবিদিগের কবিতায় সুখ, দুঃখ, আশা, ভয়, আনন্দ, বিষাদ, ঘৃণা ভালবাসা প্রভৃতি নানা ধ্বনি ধ্বনিত হইয়া থাকে; কিন্তু অস্মদ্দেশীয় কবিতায় সে সকল ভাব, সে সজীবতা ও সে বৈচিত্র্য নাই, তাহা নিতান্তই রুগ্ন ও অশ্রুজলপ্লাবিত। যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, 'ইস্তক বিলাতী পণ্ডিত, লাগায়েৎ বিলাতী কুকুর সকলেরই সেবা করেন, দেশী গ্রন্থ পড়া দূরে

থাকুক, দেশী ভিখারীকেও ভিক্ষা দেন না।' তাঁহাদের মুখে এরূপ উক্তি শুনিলে আশ্চর্য বোধ হয় না। হেমেন্দ্রবাবুর ন্যায় যাঁহাদের মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও ভক্তি আছে, তাঁহাদের নিকট হইতে এরূপ অভিযোগ শুনিলে বাস্তবিকই হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগে।

সমালোচক একস্থানে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "অনেক নবীন কবির কবিতায় রবীন্দ্রবাবুর মধুর মুরলীধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই; কিন্তু হেমচন্দ্রের গম্ভীর ভেরী নিনাদের প্রতিধ্বনি আর শুনিতে পাই না কেন?"—ইহার কারণ এই যে, ভেরীনিনাদ অপেক্ষা মুরলীধ্বনি অধিকতর মধুর এবং প্রাণস্পর্শী। বিশেষতঃ শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালী জাতি চিরদিনই মুরলীর সুধাবর্ষী সঙ্গীতে মুগ্ধ। ভেরীরব হৃদয়ে একটা সাময়িক উত্তেজনা জন্মাইয়া দেয় বটে, কিন্তু তাহা আমাদের প্রাণের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। যুদ্ধবিগ্রহাদির সময়ই ভেরীনিনাদ অত্যন্ত আবশ্যক এবং আদরণীয়; কিন্তু যতই আমরা জ্ঞান ও সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছি, ততই বাল্যোচিত যুদ্ধকলহপ্রিয়তা ত্যাগ করিয়া উদার প্রেম ও শান্তির মাধুর্য এবং মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতেছি। তাই এখন আর ভেরীরব পূর্বের ন্যায় আমাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট করিতে পারিতেছে না; মুরলীর মধুমাখা শান্তির রাগিণী আমাদিগের নিকট প্রিয়তর হইতেছে।

'বাঙ্গালা শব্দ ও ছন্দ' বিষয়ক আলোচনায় রবীন্দ্রবাবু একবার 'সাধনা'য় লিখিয়াছিলেন—

> "ইংরাজীতে অনেক সময় আটদশ লাইনের একটি ছোট কবিতা লঘুবাণের মত ক্ষিপ্রগতিতে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া মর্মের মধ্যে বিদ্ধ হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় ছোট কবিতা আমাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক জড়তায় আঘাত দিতে পারে না।"
>
> সমালোচক বলিতেছেন—
>
> "এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ইহা মনে করিবার কারণ ছিল যে, রবীন্দ্রবাবুর ক্ষুদ্র কবিতায় এই অভাব দূর হইবে। কিন্তু 'চৈতালি'র অনেক কবিতা পাঠ করিয়া তাহা বোধ হয় না।"

উল্লিখিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রবাবু দেখাইয়াছিলেন যে, 'বাঙ্গালা শব্দ উচ্চারণের মধ্যে কোথাও ঝোঁক নাই,' বাঙ্গালা শব্দে অক্ষরের গুরুলঘুও নিরূপিত নাই,

এবং 'বোধ করি কতকটা সেই কারণে আমাদের ভাষার এই খর্বতা আমরা অত্যুক্তি দ্বারা পূরণ করিয়া লইতে চেষ্টা করি।...সেই জন্য সংক্ষিপ্ত সংহত রচনা আমাদের দেশে প্রচলিত নাই বলিলেই হয়।' সুতরাং ইংরাজী কবিতার ন্যায় বাঙ্গালা ছোট কবিতা যে সহজে আমাদের মর্মে বিদ্ধ হইয়া থাকে না, তাহা বঙ্গীয় কবির অক্ষমতাজনিত নহে; পরন্তু বাঙ্গালা-ভাষার মজ্জাগত কয়েকটি ত্রুটির জন্য। সেই জন্য রবীন্দ্রবাবু যদিবা বঙ্গভাষায় ইংরাজী আদর্শের অনুরূপ ছোট কবিতার অভাব পূরণ করিতে না পারিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিভার অগৌরব কিছুই নাই। বঙ্গভাষায় ছোট কবিতার ইংরাজী আদর্শানুরূপ উৎকর্ষ যতদূর হইতে পারে, তাহা তিনি সাধন করিয়াছেন, এবং বোধ করি ক্ষুদ্র কবিতার রচনানৈপুণ্যে অন্য কোন বঙ্গীয় কবি তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।

কিন্তু যথার্থই কি 'চৈতালি'র অনেকগুলি ক্ষুদ্র কবিতা ঠিক আদর্শানুযায়ী হয় নাই? আমরা কিছুতেই ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। 'চৈতালি'র অনেকগুলি ছোট কবিতা বাস্তবিকই লঘুবাণের মত ক্ষিপ্রগতিতে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বিদ্ধ হইয়া থাকে প্রমাণস্বরূপ আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে উদ্ধৃত 'বঙ্গমাতা' 'দুই উপমা' 'তত্ত্বজ্ঞানহীন' ও 'বৈরাগ্য' প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করিতে পারি। 'বঙ্গমাতা'র শেষ দুইটিমাত্র ছত্র—

"সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ করনি!"

যদি বঙ্গীয় পাঠকের হৃদয়ের স্বাভাবিক জড়তায় আঘাত দিতে না পারে, তবে তাহা নিতান্তই অস্বাভাবিক কাঠিন্যপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং কোন আঘাতই যে তাহা বিচলিত করিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চিত।

'চৈতালি'র দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে যে গুচ্ছ গুচ্ছ ফল ধরিয়াছে, তাহার অনেক-গুলিই ইটালীদেশীয় আঙ্গুরের মত সুমিষ্ট, সুগন্ধ ও রসে উৎপূর্ণ। 'মানসী' ও 'সোনার তরী', এবং 'চৈতালি'র কবিতা একজাতীয় নহে। কিন্তু 'চৈতালি'র অনেকগুলি সরল চতুর্দশপদী কবিতা যেমন স্বজাতিপ্রেম-প্রণোদিত, তেমনি সময়োপযোগী। দুই একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। আমাদের যে সকল উচ্চশিক্ষাভিমানী স্বদেশবাসী বিজাতীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন, তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন—

"কে তুমি ফিরিছ পরি প্রভুদের সাজ।
ছদ্মবেশে বাড়ে নাকি চতুর্গুণ লাজ?
পরবস্ত্র অঙ্গে তব হয়ে অধিষ্ঠান
তোমারেই করিছে না নিত্য অপমান?
বলিছে না, 'ওরে দীন যত্নে মোরে ধর'
তোমার চর্মের চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠতর?'
চিত্তে যদি নাহি থাকে আপন সম্মান,
পৃষ্ঠে তবে কালো বস্ত্র কলঙ্ক-নিশান।
ওই তুচ্ছ টুপিখানা চড়ি তব শিরে
ধিক্কার দিতেছে নাকি তব স্বজাতিরে?
বলিতেছে, 'যে মস্তক আছে মোর পায়
হীনতা ঘুচেছে তার আমারি কৃপায়।
সর্বাঙ্গে লাঞ্ছনা বহি' এ কী অহঙ্কার।
ওর কাছে জীর্ণ চীর জেনো অলঙ্কার।"

রাজজাতির নিকট হইতে যখনই পদাঘাত, কর্ণপীড়ন ও অপমান আমাদের লাভ হয়—এবং আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে সেরূপ দুর্ঘটনা আজকাল বিরল নহে—তখনই আমাদের দেশীয় সংবাদপত্রে কেবল ইংরাজের পাশবিকতার বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ প্রকাশ করা হয়। এরূপ আচরণ দেখিয়া কবি ব্যথিতচিত্তে লিখিয়াছেন—

"যারা শুধু মরে কিন্তু নাহি দেয় প্রাণ,
কেহ কভু তাহাদের করেনি সম্মান।
যতই কাগজে কাঁদি যত দিই গালি,
কালামুখে পড়ে তত কলঙ্কের কালী।...
নিজের বিচার যদি নাই নিজ হাতে,
পদাঘাত খেয়ে যদি না পার ফিরাতে,—
তবে ঘরে নতশিরে চুপ করে থাক্,
সাপ্তাহিকে দিগ্বিদিকে বাজাস্‌নে ঢাক।
একদিকে অসি আর অবজ্ঞা অটল,
অন্য দিকে মসী আর শুধু অশ্রুজল।"

'বঙ্গমাতা' এবং 'দুই উপমা' নামক কবিতা দুইটিতে রবীন্দ্রবাবু স্বজাতির বর্তমান দুর্দশার কারণ এবং এই দুর্গতি মোচনের উপায়ের আভাস, কেমন সুন্দর ভাবে, সরল ভাষায়, অল্প কথায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা একবার মাত্র কবিতা দুইটি পাঠ করিলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন। মূল প্রবন্ধেই কবিতা দুইটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

'অনাবৃষ্টি' কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া সমালোচক বলিয়াছেন—

"জাতীয় কবি হইতে হইলে, জাতির সুখ দুঃখের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি নিতান্তই আবশ্যক।...যে দেশে একবার অনাবৃষ্টি বা অন্য কোন কারণে অজন্মা হইলে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, সে দেশের কবির পক্ষে অনাবৃষ্টির মত একটা গুরুতর বিপদ লইয়া এরূপ বিদ্রূপ করা কতদূর সঙ্গত বলিতে পারি না।... জাতির সুখ দুঃখ যদি আমাদিগের সুখ দুঃখ না হয়, তবে আমরা জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াও অন্তর্ভুক্ত নহি,—তবে জাতির প্রতি আমাদিগের কিছুমাত্র ভালবাসা নাই।"...

'অনাবৃষ্টি'তে যদিও কবি কৃষককন্যার দুঃখে সহানুভূতি দেখান নাই, তথাপি 'চৈতালি'র অনেক কবিতায়ই পল্লীবাসী দরিদ্র কৃষকসন্তানদের প্রতি কবির যেরূপ অকৃত্রিম স্নেহ, আন্তরিক সহানুভূতি ও সরল সহৃদয়তা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আর কোন বাঙ্গালা কবিতায় আছে কিনা সন্দেহ। 'চৈতালি'র একটি 'স্নেহদৃশ্য' এইরূপ ;—দরিদ্রের ঘরের বিংশতি বৎসর বয়স্ক একটি শীর্ণ যুবক—

"বহু বরষের রোগে অস্থিচর্মসার
শিশুসম কক্ষে বহি জননী তাহার
আশাহীন দৃঢ়ধৈর্য মৌন ম্লানমুখে
প্রতিদিন লয়ে আসে পথের সম্মুখে।
আসে যায় রেলগাড়ি, ধায় লোকজন,—
সে চাঞ্চল্যে মুমূর্ষুর অনাসক্ত মন
যদি কিছু ফিরে চায় জগতের পানে,
এইটুকু আশা ধরি মা তাহারে আনে।"

'দিদি' কবিতায় কবি পশ্চিমে মজুরের শিশু সন্তানের খেলাধূলা ও ভ্রাতৃ-

বাৎসল্যের একটি মধুর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তারপর যেখানে 'দিদি' 'কোমললোম' ছাগবৎস ও অবোধ উলঙ্গ শিশু ভ্রাতাটিকে একসঙ্গে কোলে লইয়া উভয়ের 'পরিচয়' সাধন করিয়া দিয়াছে, সেখানেও তাঁহার স্নেহদৃষ্টি পতিত হইয়াছে। মূঢ় বেদের মেয়ে ও তাহার প্রিয় সঙ্গী কুকুরের সানন্দ সোৎসাহ ক্রীড়ার দৃশ্যটিও তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। আবার, সরল-হৃদয় অশিক্ষিত কৃষকের পুঁটুরাণী নামক বৃহৎকায় মহিষটির প্রতি সরল স্নেহাদরও কবি সকৌতুকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়াছেন। 'পল্লীগ্রাম' ও 'মধ্যাহ্ন' প্রভৃতি কবিতায় পল্লীগ্রামের নির্জন নির্মল প্রকৃতির প্রতি কবির স্বাভাবিক ভালবাসা প্রকাশ পাইয়াছে। কৃষকজীবনের প্রতি কবির সস্নেহ সহানুভূতির প্রমাণস্বরূপ বোধ হয় আর অধিকসংখ্যক কবিতার উল্লেখ করা অনাবশ্যক। সমগ্র 'চৈতালি' গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া দেখিলেই পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন।

সমালোচক লিখিয়াছেন, "রবীন্দ্রবাবু প্রেমের কবি ; তাঁহার প্রেমের কবিতা অতি মধুর।" একথা যে অতি যথার্থ, তাহা আশা করি, কেহই অস্বীকার করিবেন না। প্রেমের কবিতা রচনায় রবীন্দ্রবাবু সিদ্ধহস্ত। 'চৈতালি'তেও প্রেমের কবিতার অভাব নাই। কিন্তু কয়েক মাস পূর্বে 'দাসী' পত্রিকাতে সমালোচিত 'মালঞ্চ' নামক কবিতা-গ্রন্থখানি যে প্রেমের কথায় পরিপূর্ণ, এ প্রেম তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। এ প্রেম অতি পবিত্র, অতি উদার, অতি মহান্। আলোচ্য প্রবন্ধে উদ্ধৃত 'পুণ্যের হিসাবে' কবি প্রেম ও পূজার একত্ব ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন—

"যারে বলে ভালবাসা, তারে বলে পূজা !"

'প্রিয়া'র প্রতি প্রেমই যে ক্রমে বিকশিত হইয়া উঠিয়া সমস্ত বিশ্বকে আপনার করিয়া তোলে, তাহা লক্ষ্য করিয়া কবি বলিতেছেন—

"তোমার মহিমাজ্যোতি তব মূর্তি হতে
আমার অন্তরে পড়ি ছড়ায় জগতে।
যখন তোমার 'পরে পড়েনি নয়ন
জগৎ-লক্ষ্মীর দেখা পাইনি তখন।
স্বর্গের অঞ্জন তুমি মাখাইলে চোখে,
তুমি মোরে রেখে গেছ অনন্ত এ লোকে।

এ নীল আকাশ এত লাগিত কি ভালো,
যদি না পড়িত মনে তব মুখ-আলো।'
অপরূপ মায়াবলে তব হাসি-গান
বিশ্বমাঝে লভিয়াছে শত শত প্রাণ।
তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে,
তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে।"

'চৈতালি'র 'ধ্যান' এইরূপ—

"যত ভালোবাসি, যত হেরি বড়ো করে,
তত প্রিয়তমে, আমি সত্য হেরি তোরে।
যত অল্প করি তোরে, তত অল্প জানি—
কখনো হারায়ে ফেলি, কভু মনে আনি।
আজি এ বসন্তদিনে বিকশিত মন
হেরিতেছি আমি এক অপূর্ব স্বপন ;
যেন এ জগৎ নাহি, কিছু নাহি আর,
যেন শুধু আছে এক মহাপারাবার।
নাহি দিন নাহি রাত্রি নাহি দণ্ডপল,
প্রলয়ের জলরাশি স্তব্ধ অচঞ্চল ;
যেন তারি মাঝখানে পূর্ণ বিকাশিয়া
একমাত্র পদ্ম তুমি রয়েছ ভাসিয়া ;
নিত্যকাল মহাপ্রেমে বসি বিশ্বভূপ
তোমা মাঝে হেরিছেন আত্ম প্রতিরূপ।"

'চৈতালি'র 'আশার সীমা' 'মানসী' 'প্রেয়সী' প্রভৃতি প্রেমের কবিতাগুলিও অতি সরল এবং সুন্দর।

'বৈরাগ্য' বিষয়ক কবিতায় রবীন্দ্রবাবু গার্হস্থ্যাশ্রমের শ্রেষ্ঠতা যেমন সুন্দর-ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, 'দেবতার বিদায়' নামক কবিতায়ও তেমনি সুস্পষ্ট ভাষায় দীন এবং অসহায়জনের প্রতি দয়াই মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। 'চৈতালি'র কোন কোন কবিতায় ভগবানের প্রতি কবির একান্ত অনুরক্তি ও তাঁহার অনন্ত কৃপায় সুদৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ পাইতেছে। পরম দয়াময় পরমেশ্বর যে আমাদের ভীতির কারণ নহেন, কিন্তু স্নেহময় পিতার ন্যায়

আমাদের একান্ত ভক্তি ও প্রীতির পাত্র, নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি ছত্রে কবি এই ভাবটি ব্যক্ত করিয়াছেন—

"বরঞ্চ ঈশ্বরে ভুলি স্বল্প তাহে ক্ষতি ;
ভয় ঘোর অবিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতি।
তিনি নিজে মৃত্যুকথা ভুলায়ে ভুলায়ে
রেখেছেন আমাদের সংসার-কুলায়ে।
তুমি কে কর্কশ কণ্ঠ তুলিছ ভয়ের ?
আনন্দই উপাসনা আনন্দময়ের।"

অন্যত্র ভগবানকে উদ্দেশ্য করিয়া কবি ভক্তিভরে বলিতেছেন—

"তুমি যদি বক্ষোমাঝে থাক নিরবধি
তোমার আনন্দমূর্তি নিত্য হেরে যদি
এ মুগ্ধ নয়ন মোর,—পরাণ-বল্লভ,
তোমার কোমলকান্ত চরণপল্লব
চিরস্পর্শ রেখে দেয় জীবনতরীতে
কোন ভয় নাহি করি বাঁচিতে মরিতে।"

মৃত্যুর বিশ্বব্যাপিনী মূর্তিতে কবি বিভীষিকা কিছুই দেখিতে পান না। প্রত্যুত, 'মাধুরী' নিরীক্ষণ করিয়াই তিনি মুগ্ধ ;—

"পরান কহিছে ধীরে—হে মৃত্যু মধুর,
এই নীলাম্বর, একি তব অন্তঃপুর ?
আজি মোর মনে হয় এ শ্যামলা ভূমি
বিস্তীর্ণ কোমল শয্যা পাতিয়াছ তুমি।
জলে স্থলে লীলা আজি এই বরষার,
এই শান্তি, এ লাবণ্য, সকলি তোমার।
মনে হয়, যেন তব মিলন বিহনে
অতিশয় ক্ষুদ্র আমি এ বিশ্বভুবনে।
প্রশান্ত করুণচক্ষে, প্রসন্ন অধরে
তুমি মোরে ডাকিতেছ সর্ব চরাচরে।
প্রথমমিলনভীতি ভেঙেছে বধূর
তোমার বিরাট মূর্তি নিরখি মধুর।

সর্বত্র বিবাহ-বাঁশি উঠিতেছে বাজি,
সর্বত্র তোমার ক্রোড় হেরিতেছি আজি।"

সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন, "অনুসন্ধান করিলে 'চৈতালি'তে দুই চারিটি সুন্দর মুক্তা মিলিবে।" কিন্তু সুখের বিষয় 'চৈতালি'তে মণিমুক্তার সংখ্যা তেমন বিরল নহে। ইহার অনেক স্থলেই বহুমূল্য উজ্জ্বল রত্নরাজি দীপ্তি পাইতেছে। সে সকল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার স্থান এখানে নাই। রবীন্দ্র-বাবু যদিও তাঁহার 'ভক্তের প্রতি' কবিতায় বলিয়াছেন—

"গেয়ে গেয়ে ফিরি পথে আমি শুধু কবি।
নহি আমি ধ্রুবতারা! নহি আমি রবি।"

তথাপি আমরা তাঁহাকে ভক্তির যে উন্নত লোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, 'চৈতালি' সেখানে তাঁহার 'অচল আসন' দৃঢ়তর করিয়াছে।

'চৈতালি'র রীতিমত সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য এবং ক্ষমতার বহির্ভূত। কেবল হেমেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ শ্রবণ এবং পাঠ করিয়া যে কয়েকটি কথা স্বতঃ মনে উদিত হইয়াছে, তাহাই প্রকাশ করিয়া বলিলাম। উপসংহারে সমা-লোচকের সহিত আমরাও সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি যে, "রবীন্দ্রবাবুর প্রতিভারবির ভাস্বর জ্যোতিতে আমাদিগের সাহিত্যাম্বর বহুদিন ধরিয়া উজ্জ্বল থাকুক;" এবং 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা' ও 'চৈতালি'র ন্যায় অমূল্য আভরণে বঙ্গভাষার শ্রী দিন দিন বিকশিত হউক।[৫]

৫। কোন প্রবন্ধ যে পত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার সমালোচনাও সেই পত্রে প্রকাশিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। বর্তমান সমালোচনাটি 'দাসী'তেই প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। 'দাসী' সম্পাদকের নিকট ইহা প্রেরিতও হইয়াছিল। কিন্তু লেখক লিখিয়াছেন, 'উক্ত পত্রিকাখানি উঠিয়া যাওয়ায় আমার 'প্রতিবাদ' তাহাতে প্রকাশিত হইতে পারে নাই।'

কথা

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

কবিবর রবীন্দ্রনাথ প্রণীত কতকগুলি অভিনব কবিতা 'কথা' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতাগুলি সম্প্রতি রচিত হইলেও, কবিতা-নিবদ্ধ বিষয়গুলি অতি পুরাতন ইতিহাসের সম্পত্তি। বৌদ্ধগ্রন্থে, রাজস্থানের কিম্বদন্তীতে, শিখ সমাজের শৌর্যগাথায়, মহারাষ্ট্ররাজ্যের বিক্রমকাহিনীতে ও ভক্তমালের পুণ্যকথায় এতদিন যাহা সঞ্চিত ছিল, তাহারই ছায়া লইয়া কবিতাগুলি গঠিত। যে সকল ঐতিহাসিক কীর্তিকাহিনী এখনও একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই, তাহা কিরূপে কাব্য-সৌন্দর্যের উপাদান হইতে পারে, কবি তাহার অনেক পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। পদলালিত্য-গৌরবে, রস-সমাবেশ-কৌশলে, চিত্তবিনোদনচাতুর্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত; তাঁহার প্রতিভা বিষয় নির্বাচনের জন্য যে স্বদেশের পুরাতন পুণ্য-কথা অবলম্বন করিতে অগ্রসর হইয়াছে, ইহা দেশের ও দেশীয় সাহিত্যের পক্ষে আনন্দের সংবাদ।

ভারতবর্ষ বহু পুরাতন সভ্যজনপদ বলিয়া সকল দেশেই সুপরিচিত। তাহার পুরাকাহিনীর লুপ্তোদ্ধার করিবার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-সেবকগণ অতুল অধ্যবসায়ে পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় বহু বিলুপ্তপ্রায় শিলালিপি বিশদীকৃত ও মরু-মরীচিকা নিহিত স্মৃতিচিহ্ন উদ্ঘাটিত হইতেছে। কিন্তু সে সকল প্রত্নতত্ত্ব সাধারণ্যে সুপরিচিত হইতে পারিতেছে না। তাহার সৌন্দর্যভোগ করিতে হইলে যেরূপ অধ্যবসায় ও অধ্যয়ন ক্লেশের প্রয়োজন, আমাদের দেশের পাঠক সাধারণের মধ্যে সেরূপ

দ্রষ্টব্য: 'কথা' ১৩০৬ সালের মাঘ মাসে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপনে প্রথম সংস্করণের পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—

> "এই গ্রন্থে যে সকল বৌদ্ধকথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সংকলিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধীয় ইংরাজি গ্রন্থ হইতে গৃহীত। রাজপুত কাহিনীগুলি টডের রাজস্থান ও শিখ বিবরণগুলি দুই একটি ইংরাজি শিখ ইতিহাস হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। ভক্তমাল হইতে বৈষ্ণব গল্পগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি।"…

পাঠানুরাগ এখনও বর্ধিত হইয়া উঠে নাই। সুতরাং দুই দশজন স্বদেশের বা বিদেশের পুরাতত্ত্ববিৎ জীবনপাত করিয়া যে সকল তথ্যাবিষ্কারে কৃতকার্য হইতেছেন, দেশের লোকের নিকট সহসা তাহার সমাদর হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহাদের সযত্ন-সংকলিত পুরাতত্ত্বের সারাংশ কবিতানিবদ্ধ হইলে, তৎ-প্রতি সহজে লোক-চক্ষু পতিত হইতে পারে। সেকালের ইতিহাসে যে সকল চরিত্রের আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে অনেকগুলি চিরকালই কাব্যসৌন্দর্যের উপাদানরূপে গণ্য হইতে পরিবে। কবি সেইরূপ আদর্শ লইয়া কয়েকটি 'কথা' রচনা করায়, বঙ্গ-সাহিত্যে কিয়ৎ পরিমাণে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হইল। এক সময়ে স্বদেশের এবং বিদেশের পুরাতন পুস্তকের ভাবানুবাদ করা বঙ্গ-সাহিত্যের সর্বপ্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর কল্পনার প্রাবল্যে সে লক্ষ্য ভাসিয়া গেল। কিছুদিন বঙ্গ-সাহিত্য বহু পথে ধাবিত হইয়া অবশেষে কোকিল-কূজন, ভ্রমর-গুঞ্জন ও মানভঞ্জনের তরল তরঙ্গের রঙ্গরসেই সমধিক মত্ত হইয়া উঠিতেছিল, তখন সৌন্দর্য সৃষ্টির অনুরোধে কল্পনার উচ্ছৃঙ্খল নখরাঘাতে বহু ঐতিহাসিক চরিত্র শতধা বিদীর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সুতরাং স্বদেশের ইতিহাস হইতে আদর্শ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে অক্ষত কলেবরে কবিতানিবদ্ধ করিলেও যে সৌন্দর্য সৃষ্টির বাধা হয় না, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যসেবকগণের সম্মুখে এক অভিনব চেষ্টার দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন।

ঐতিহাসিক চিত্রচয়নে কবিকল্পনা যে সর্বথা নিরঙ্কুশ হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে একবার কর্তব্যানুরোধে তীব্রভাষা লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ এই নূতন কবিতাপুস্তকের ভূমিকায় যেন তৎপ্রতি কটাক্ষ করিয়াই লিখিয়াছিলেন—"মূলের সহিত এই কবিতাগুলির কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে (১-৯) খণ্ডে মোহিতচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে কবির কাব্যরচনাগুলি নির্বাচিত করিয়া 'যেগুলি ছন্দ ও ভাবসৌন্দর্যে মনোহর ও মর্মস্পর্শী সেগুলিকে রক্ষা করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা' হয়। এই গ্রন্থাবলীর ৫ম ভাগে পূর্বপ্রকাশিত 'কথা' শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হয়।

'কথা'র এই সমালোচনাটি ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কর্তৃক 'প্রদীপ', ভাদ্র ১৩০৮—৪র্থ ভাগ, ৯ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

হইবে, আশা করি সেই পরিবর্তনের জন্য সাহিত্য-নীতিবিধানমতে দণ্ডনীয় গণ্য হইব না।" আমি কবিকুলকে ঐতিহাসিক হইবার জন্য তাড়না করি নাই; কিন্তু ঐতিহাসিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সকলকেই আগ্রহে অনুরোধ করিয়াছিলাম। যাহার যে চরিত্র তাহার মূল প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গল্পাংশ সরল সরস বা সহজে বোধগম্য করিবার জন্য অবান্তর বিষয়ের কিছু কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিলে ইতিহাসের ক্ষতি নাই—সাহিত্যের বিলক্ষণ লাভ। কবি বর্তমান পুস্তকে ঐতিহাসিক চরিত্রের মূল প্রকৃতির কিছুমাত্র পরিবর্তন করেন নাই; সুতরাং অবান্তর বিষয়ে যাহা কিছু ইতরবিশেষ করিয়াছেন, তজ্জন্য কেহ তাঁহাকে দণ্ডার্হ মনে করিতে পারিবেন না। ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার সময়ে বহু মৃত মহাত্মার চিতাভস্মের উপর দিয়া পদবিক্ষেপ করিতে হয়; তাহার প্রত্যেক ভস্মকণা পবিত্র ও সম্মানার্হ—সেখানে যাঁহারা সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে কাতর বা অক্ষম, তাঁহাদের সৌন্দর্য-বোধশক্তির মূলেই বিলক্ষণ দোষ প্রবেশ করিয়াছে; বচন-রচন-কৌশল-বলে তাঁহারা কবি বলিয়া সমাদর পাইতে পারেন না। সৌন্দর্য রুচির সহিত একসূত্রে গ্রথিত। যে শ্মশানে দাঁড়াইয়া চিতাধূমাচ্ছন্ন গগনমণ্ডলে নেত্রনিবদ্ধ করিয়া কুৎসিত সঙ্গীত গান করিতে পারে, সে প্রতিভাশালী পণ্ডিত হউক—কবি নহে।

বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে ভারতবর্ষে যে মহাশক্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা চিরপ্রচলিত প্রথা পদ্ধতির বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কেবল চরিত্র-গৌরবে অর্ধ ভূমণ্ডলে অধিকার বিস্তার করিতে সক্ষম হয়। ভগবান শাক্য-সিংহ ও বৌদ্ধাচার্য উপগুপ্ত তজ্জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। মগধাধিপতি বিম্বিসারের শাসন সময়ে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়—তিনি বৌদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অভাবে তাঁহার রাজপুরী হইতে বৌদ্ধধর্মের নাম পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল; লোকে প্রাণভয়ে পুরাতন ধর্ম পুনঃগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইতিহাস-বিখ্যাত প্রিয়দর্শন অশোক নরপতিও প্রথমে প্রচলিত হিন্দুধর্মেই আস্থাবান ছিলেন; অবশেষে মথুরা-প্রবাসী বৌদ্ধসন্ন্যাসী উপগুপ্তের মন্ত্রশিষ্য হইয়া অর্ধ ভূমণ্ডলে বৌদ্ধমত প্রচারিত করিয়া ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। বৌদ্ধগণের মধ্যে কত দীন দরিদ্র ব্যক্তিও জনহিতব্রত সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এ সকল এখন ইতিহাসের কথা, জীর্ণগ্রন্থে কীটাকুল হইয়া উঠিয়াছে! সুতরাং সেকালে কি কৌশলে পথের কাঙাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরকে পদানত

শিষ্যরূপে বশীভূত করিয়া দেবতার ন্যায় পূজা প্রাপ্ত হইতেন, তাহা আর জীবন্তভাবে দর্শন করিবার উপায় নাই। কবি তাহার কয়েকটি চিত্র সংকলিত করিয়া বৌদ্ধধর্মের ত্যাগ ও পরসেবা এবং উপগুপ্তের নির্লিপ্ত চরিত্র সুকৌশলে ভাষা-নিবদ্ধ করিয়াছেন। পাটলিপুত্রের নগরোপকণ্ঠে কুক্কুটারামে অবস্থিত হইবার পূর্বে উপগুপ্ত মথুরায় অবস্থান করিতেন, তখন তাঁহার তরুণ জীবন। কিন্তু তরুণ জীবনেই তিনি উচ্চলক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ব্রহ্মচর্য ও আত্মসংযম সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহার চরণতলে ভারতবর্ষের নরনারী ও তাহাদের অদ্বিতীয় সম্রাট প্রিয়দর্শন অশোক লুটাইয়া পড়িয়াছিলেন। মথুরায় অবস্থান করিবার সময় তিনি নগর-প্রাচীরতলে সুপ্ত থাকিতে একদা কোন অভিসারিকার চঞ্চল পদ তাঁহার গাত্রে পতিত হয়। তখন—

"নগরীর দীপ নিবেছে পবনে,
দুয়ার রুদ্ধ পৌরভবনে,
নিশীথের তারা শ্রাবণগগনে,
ঘন মেঘে অবলুপ্ত।"

সুতরাং কোথায়ও কেহ দেখিবার লোক ছিল না। রমণী এরূপ সময়ে এরূপ স্থানে সহসা নরদেহ স্পর্শে চমকিত হইয়া প্রদীপ ধরিয়া দেখিল—

"নবীন গৌর কান্তি!
সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান,
করুণা কিরণে বিকচ নয়ান
শুভ্র ললাটে ইন্দু সমান,
ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি।"

নয়নে 'লজ্জা জড়িত' হইলেও, রমণী রূপ দেখিয়া আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। মুখরার ন্যায় তাঁহাকে স্ব-ভবনে আহ্বান করিয়া ফেলিল। উপগুপ্ত বলিলেন—

"অয়ি লাবণ্যপুঞ্জে!
এখনো আমার সময় হয় নি,
যেথায় চলেছ, যাও তুমি ধনি!

সময় যেদিন আসিবে আপনি
যাইব তোমার কুঞ্জে।"

অল্পদিনের মধ্যেই সে সময় আসিল, উপগুপ্তও প্রতিশ্রুতি পালন করিলেন। কিন্তু হায়! সেদিন রমণী বসন্তরোগগ্রস্তা গলিতদেহা ;—

"রোগমসি ঢালা কালি তনু তার
লয়ে প্রজাগণে পুর পরিখার
বাহিরে ফেলেছে, করি পরিহার
বিষাক্ত তার সঙ্গ।"

উপগুপ্ত সেই দিনটিতে তাহার শিয়রে আসিয়া শ্মশানশয্যায় স্বহস্তে সর্বাঙ্গে ঔষধ লেপন করিতে বসিলেন। এই সন্ন্যাসীর চরিত্রবলেই উত্তরকালে ভারত-বর্ষের পুণ্য নাম দেশ-দেশান্তে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু ইতিপূর্বে বঙ্গ-সাহিত্যে কেহ তাঁহাকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বাহ্য প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে এই চরিত্র-সৌন্দর্য মিলাইয়া দেখ—ইহার নিকট কত চন্দ্র-করোজ্জ্বল নির্মল রজনী মলিন বলিয়া বোধ হইবে না কি ?

আর এক সময়ে আমাদের দেশে অন্যবিধ আর একটি মহাশক্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল ;—তাহার জন্মস্থান পঞ্চনদ, জন্মদাতা গুরু নানক ও শক্তি-বিধাতা গুরুগোবিন্দ, ইতিহাসে সুপরিচিত। যাহারা এই মহাশক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা শিখ্ নামে পরিচিত হইয়া বীরদর্পে অদ্যাপি সভ্যজগতে সম্মান লাভ করিতেছে। কিন্তু কবে কিরূপে এই শক্তি ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল, কেহ তাহার সন্ধান রাখিত না। যখন ফুটিয়া উঠিল, তখন সকলেই চাহিয়া দেখিল ;—

"পঞ্চনদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠেছে শিখ—
নির্মম নির্ভীক।"

তখন কান পাতিয়া সকলে শুনিল—

"অলখ নিরঞ্জন"—
মহারব উঠে বন্ধন টুটে

করে ভয় ভঞ্জন—
বক্ষের পাশে ঘন উল্লাসে
"অসি বাজে ঝনঝন !"

দিল্লীর বাদশাহের সহিত অল্পদিনের মধ্যেই এই নবাগত মহাশক্তির সংঘর্ষ সমুপস্থিত হইয়াছিল। সে সংঘর্ষে শিখ বহুবার পরাজিত হইলেও কদাচ বশীভূত হয় নাই। দিল্লীশ্বরের বাহুবল ছিল, তাহার নিকট লক্ষ লক্ষ শিখ মাথা পাতিয়া জীবন দান করিয়াছে, কিন্তু একটি প্রাণীও কৃতাঞ্জলিপুটে কাতরে জীবন ভিক্ষা করে নাই! গুরুদাসপুর গড়ে—

"মোগল শিখের রণে
মরণ আলিঙ্গনে
কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি
দুই জনা দুই জনে!"

ইহার একটি কথাও কবিকল্পিত নহে; কিন্তু এত করিয়াও এই যুদ্ধে শিখবীর বন্দা বন্দী হইয়াছিলেন। মোগলেরা তাঁহাকে ও তাঁহার পার্শ্বচরগণকে দিল্লীতে বাঁধিয়া আনিল। সেখানে যাহা হইল, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই!

"পড়ি গেল কাড়াকাড়ি
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারি লাগি তাড়াতাড়ি।
দিন গেলে প্রাতে ঘাতকের হাতে
বন্দীরা সারি সারি
'জয় গুরুজীর' কহি শত বীর
শত শির দেয় ডারি!"

জীবনরক্ষার জন্য পাড়াপাড়ি করাই জীবের প্রকৃতি। জীবন বিসর্জনের জন্য এমন কাড়াকাড়ি করিতে শিখ ভিন্ন আর কেহ শিখিয়াছিল কিনা সন্দেহ। দিল্লী বীর-শোণিতে প্লাবিত হইয়া গেল; অবশেষে—

"বন্দার কোলে কাজি দিল তুলে
বন্দার এক ছেলে;

কহিল, ইহারে বধিতে হইবে
নিজ হাতে অবহেলে।...
কিছু না কহিল বাণী,
বন্দা সুধীরে ছোট ছেলেটিরে
লইল বক্ষে টানি।...
তার পরে ধীরে কটিবাস হতে
ছুরিকা খসায়ে আনি—
বালকের মুখ চাহি
'গুরুজীর জয়' কানে কানে কয়
'রে পুত্র ভয় নাহি'।"

পিতাপুত্র উভয়কেই জীবন বিসর্জন করিতে হইল। ঘাতক বন্দার দেহ সাঁড়াশি দগ্ধ করিয়া ছিঁড়িল; কিন্তু—

"স্থির হয়ে বীর মরিল, না করি
একটি কাতর শব্দ!"

শিখ কিরূপ নির্মম নির্ভীক তাহা সংক্ষেপে বুঝাইতে গিয়া, সে কি জন্য নির্মম নির্ভীক তাহাও সুকৌশলে অভিব্যক্ত হইয়াছে। শিখের ইতিহাসে অকাতরে মুণ্ডদানের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তজ্জন্য গুরুগোবিন্দের মৃত্যু ও তরুসিংহের জীবন বিসর্জনের গাথাও প্রদত্ত হইয়াছে।

পঞ্জাবের শিখের ন্যায় দাক্ষিণাত্যের মারাঠারাও একদিন নববলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছিল। শিখ নির্মম নির্ভীক—মারাঠা কর্মনিষ্ঠ ও সুচতুর। শিখ ক্ষুদ্ররাজ্য গঠন করিয়াছিল; মারাঠা সমগ্র ভারতবর্ষে প্রাধান্যলাভের উপক্রম করিয়াছিল। কি জন্য মারাঠা দিল্লীশ্বরকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়া আবার কালক্রমে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে, কয়েকটি চিত্রে তাহা সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। মারাঠা শক্তির জীবন প্রভাতে—মারাঠা শক্তির জীবনদাতা ছত্রপতি শিবাজী গুরু রামদাসের গৈরিক বসনের পতাকা উড়াইয়া পরার্থে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন; যে যেখানে ছিল স্বদেশ ও স্বধর্মের উদ্ধার কামনায় পতাকা-তলে সমবেত হইয়াছিল। জীবন-মধ্যাহ্নে পেশোয়া বংশের ধনলিপ্সায় মারাঠাশক্তি স্বার্থ-চিন্তায় পরার্থ বিস্মৃত চিন্তায় হইয়াছিল; জীবনসন্ধ্যায় তাহারা দস্যু ও তস্কররূপে মানব-সমাজে উপদ্রব করিয়া তৃণ-জঙ্গলের ন্যায় একে একে ভস্ম হইয়া গেল!

রাজস্থানের রাজবংশধরগণ সামন্তসেনা সহায়ে ইতিহাসে যে সকল অদ্ভুত বীরকীর্তির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অন্য দেশে দুর্লভ। রাজা ন্যায়নিষ্ঠ বলিয়া সামন্তগণ তাঁহার আহ্বানে অকুতোভয়ে জীবন বিসর্জন করিতে আসিত; রাজশক্তি প্রজাসাধারণের বাহুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া রাজা বিচারকালে ন্যায়ের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব বিস্মৃত হইতেন। একটি দৃষ্টান্তে দেখি—

"বিপ্র কহে 'রমণী মোর
আছিল যেই ঘরে
নিশীথে সেথা পশিল চোর
ধর্মনাশ তরে।
বেঁধেছি তারে, এখন কহ
চোরে কি দিব সাজা?'
'মৃত্যু' শুধু কহিলা তারে
রতন রাও রাজা।
ছুটিয়া আসি কহিল দূত—
'চোর সে যুবরাজ।
বিপ্র তাঁরে ধরেছে রাতে
কাটিল প্রাতে আজ!
ব্রাহ্মণেরে এনেছি ধরে
কি তারে দিব সাজা?'
'মুক্তি দাও' কহিলা শুধু
রতন রাও রাজা।"

পড়িতে পড়িতে কবিকল্পিত কাহিনীর মত বোধ হয়, এমন ঘটনা কেবল রাজস্থানের ইতিহাসেই সম্ভবে! সে ইতিহাসে বীরের ন্যায় বীররমণীও আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্তে পৃথিবীকে চমকিত করিয়া গিয়াছেন। কবি তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিয়া ছবিখানি সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছেন! কোন এক বিশেষ যুদ্ধে রণোৎসাহে উন্মত্ত হইয়া অকাতরে আত্মবিসর্জন করা সহজ, কেন না তাহা স্বাভাবিক। ধর্মনাশ ভয়ে চিতায় প্রবেশ করা কঠিন হইলেও তেমন কঠিন নহে, কারণ দশের দৃষ্টান্তে উত্তেজনা আসিয়া দুর্বলতাকেও বলদান করিয়া থাকে।

কিন্তু প্রতি দিবসের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের ভিতরে স্বদেশের জন্য আত্ম-সুখ মুহূর্তে তুচ্ছ করিয়া জীবনদানের জন্য অগ্রসর হওয়া তেমন সহজ নহে। সহজ না হইলেও রাজস্থানের পল্লীতে পল্লীতে নরনারীকে এইরূপে জীবন-দান করিতে দেখিয়া ইতিহাস-লেখক তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতির উপর পুষ্পবর্ষণ করিয়া থাকেন। কবি এইরূপ একটি বিবাহসভার বর্ণনা করিয়াছেন। বর-কন্যা 'আঁচল বাঁধা আঁখি নত' মন্ত্র পড়িবার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান, এমন সময়ে মহারাণার দূত আসিয়া যুদ্ধের জন্য বরকে আহ্বান করিল; তখন প্রহর-খানেক রাত হয়েছে শুধু! শাঁখ বাজাইয়া মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ ব্যাপারটা শেষ করিয়া গেলেও না চলিত এমন নহে, কিন্তু রাজপুত সে শিক্ষালাভ করে নাই!

"বাঁধা আঁচল খুলে ফেলে বর
মুখের পানে চাহে পরস্পর
কহে প্রিয়ে নিলেম অবসর
এসেছে ঐ মৃত্যুসভার ডাক।"

সত্য সত্যই বরের আর বিবাহ করা হইল না। কন্যা চতুর্দোলায় চড়িয়া বরের বাটীতে উপনীত হইলেন। কিন্তু তখন—

"নিশীথ রাতে বর সজ্জা পরা
মেত্রিপতি চিতার পরে শুয়ে।"

কন্যা ক্রন্দন করিলেন না, কপালে করাঘাত করিলেন না, বসন ভূষণ খুলিয়া ফেলিলেন না; চিতায় বসিয়া পতিপদ ধারণ করিলেন। কবিও তাঁহার শোকে বসুধাকে দ্বিধা বিভক্ত হইবার জন্য অনুরোধ না করিয়া বলিয়া

"ধুধু করে জ্বলে উঠল চিতা—
কন্যা বসে আছেন যোগাসনে।
জয়ধ্বনি উঠে শ্মশান মাঝে
হুলুধ্বনি করে পুরাঙ্গনা।"

কিন্তু আপাদমস্তক এরূপ রুধিররঞ্জিত ঐতিহাসিক চিত্র বঙ্গ-সাহিত্যের বর্তমান পাঠক-পাঠিকার চিত্তরঞ্জন করিতে কতদূর সক্ষম হইবে তাহাতে কিছু সন্দেহ বোধ হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা অপেক্ষা গানই অধিকাংশ বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত, তাহা ক্রমশঃ নিম্নস্তরেও গড়াইয়া পড়িতেছে। সুতরাং কবি বনফুলের মালায় গান গাহিয়া মন ভুলাইয়া এখন রক্ততিলক-পরা কৃপাণ-করা ভৈরবীমূর্তির বর্ণনা করিতে রসিয়াছেন দেখিয়া, বাঙ্গালী ভয়ে চক্ষু মুদিয়া ঘনঘন শ্রীদুর্গা স্মরণ করিতেছে না, ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট।

স্কটলণ্ডের সমর-কবিতা, রাজস্থানের অমর কবি চন্দ ভট্টের বীর-গাথা, এ সকলই কিন্তু কথার আকারে ছড়ার সুরে সরলভাবে গ্রথিত। জন-সাধারণ শুনিয়া শুনিয়া কণ্ঠস্থ করিবে, বালক-বালিকা ক্রীড়া-কৌতুকের ন্যায় আবৃত্তি করিবে, শ্রমজীবী চিত্তবিনোদনের জন্য পরিশ্রমের সময়ে অন্যমনস্কের ন্যায় গুনগুন করিয়া গান করিবে, তাহাই এই শ্রেণীর কবিতার লক্ষ্য হইলে, ইহার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। কবি বোধ হয় সেই জন্যই ইহাকে কাব্য কবিতা বা তদ্রূপ কোন গুরুতর নামে পরিচিত না করিয়া বিনীতভাবে বলিয়াছেন—ইহার নাম 'কথা'। আমাদের ভাষায় যে 'কথা' নাই, তাহা ঠিক নহে। সুয়ারাণী দুয়ারাণীর কথা, ঘুমপাড়ানিয়া মাসী-পিসীর কথা, বেহুলা-লখিন্দরের কথা, দাশুরায়ের নলিনী-ভ্রমরের কথা এবং পৌরাণিক কীর্তিকাহিনী ও মেয়েলী ব্রতের কথায় বাঙ্গালা দেশ আচ্ছন্ন হইয়া আছে। তথাপি এ দেশে উচ্চ লক্ষ্যের খাতিরে তুচ্ছ কর্ম বিসর্জন করিয়া লক্ষ্য সাধন করিবার কথা নূতন করিয়া রচনা করিবার প্রয়োজন রহিয়া গিয়াছে। যিনি প্রথমে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন, তাঁহার উদ্যম হয়ত কিছুদিন লোকের নিকট তেমন ভাল লাগিতে না পারে, কিন্তু এই শ্রেণীর কথা একবার ভাষায় স্থানলাভ করিলে কালে যে তাহা বহুমূল্য অলঙ্কার বলিয়া স্বীকৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ হয় না।

ক্ষণিকা

চন্দ্রনাথ বসু

তোমার সহিত পথ চলিবার সামর্থ্য আমার নাই—তোমার গতি এতই দ্রুত, এতই বিদ্যুৎবৎ। তোমার প্রতিভার পরিমাপ নাই—উহার বৈচিত্র্যও যেমন, প্রভাও তেমনি। আমি তোমার প্রতিভার নিকট অভিভূত। 'কণিকা', 'কথা' 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা'—বলিতে গেলে চারিমাসের মধ্যে চারিখানা—পারিয়া উঠিব কেন? প্রকৃতপক্ষেই পারি নাই। 'কণিকা' ছাড়িতে না ছাড়িতে 'কথা' আসিল—'কথা' দিয়া তুমি আমার হইতে 'কণিকা' কাড়িয়া লইলে—কণিকার ভোগ ত আমাকে পূর্ণ করিতে দিলে না। এমনি করিয়া 'কল্পনা' দিয়া 'কথা' কাড়িয়া লইয়াছিলে, আমার ভোগে আবার বাধা দিয়াছিলে! এবার 'ক্ষণিকা'য় চমকিত করিয়াছ। আবার ভোগে বিবাদী হইয়াছ। আমি ক্ষুদ্র—সুতরাং আমার গতি বড় ধীর—আমি তোমার সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছি না। পিছাইয়া পড়িতেছি—কিন্তু তোমার গতি দেখিয়া চমৎকৃত হইতেছি—ও গতি যথার্থই বিদ্যুতের গতি,—যেমন দ্রুত, তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি সুন্দর। ও গতি এখানকার নয়, ঊর্ধ্বদেশের—মহাকাশের। রবীন্দ্রনাথ, তোমার পরিমাণ করিতে পারি, যথার্থই এমন শক্তি আমার নাই।

যে চারিখানির নাম করিলাম, সকলগুলিই মিষ্ট, হৃদয়স্পর্শী, সুগভীর, সুললিত, (অনেক স্থলে) সূক্ষ্ম, সুতীক্ষ্ণ। কিন্তু 'ক্ষণিকা'য় বঙ্গের পল্লী-জীবনের, পল্লী-প্রকৃতির যে অনির্বচনীয় সৌরভ পাইলাম তাহাতে আমি—পল্লীপ্রিয় পাড়া-গেঁয়ে—মুগ্ধ হইয়াছি। এ সৌরভ তোমার আর কোন কাব্যে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয় এ সৌরভ শিলাইদহ-জনিত। প্রকৃতির প্রাণের

দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্র-জীবনী প্রসঙ্গে বর্তমানের পাঠকশ্রেণী চন্দ্রনাথ বসুকে রবীন্দ্রনাথের একজন তীব্র সমালোচক ও রবীন্দ্র-বিদ্বেষী হিসাবে মনে করিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রনাথ বসু বঙ্কিম-গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ায়, সামাজিক মত ও ধর্মবিশ্বাসে রবীন্দ্রনাথের মতাবলম্বী ছিলেন না। তাই বলিয়া তাঁহাকে রবীন্দ্র-প্রতিপক্ষ বলিলে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইবে। রবীন্দ্রনাথের সহিত যে তাঁহার গভীর প্রীতিবন্ধন ও সহৃদয়তা ছিল, বর্তমান রচনাটি পাঠ করিলে পাঠকগণ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এই রচনাটি একটি পত্র বিশেষ। 'ক্ষণিকা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

সৌরভ পল্লীতেই পাওয়া যায়। কোন্‌টার কথা বলিব? অনেকগুলাতে এ সৌরভ পাইয়াছি। কিন্তু কি জানি কেন, 'বিরহের' সৌরভে বড়ই মজিয়াছি। তুমি যে উহা প্রত্যক্ষবৎ করিয়া দিয়াছ।

ক্ষণিকার একটা বড় গুণপনা দেখিলাম।—উহার আকৃতিও ক্ষণিকার ন্যায়। ক্ষণিকার প্রতি পৃষ্ঠায় দেখি ক্ষণিকা আঁকা রহিয়াছে। তাই বলি তোমার প্রতিভার পরিমাণ হয় না।১

ইলে, চন্দ্রনাথ বসু এই পত্রে (৩০শে শ্রাবণ, ১৩০৭) কবিকে নিজের হৃদয়াবেগ প্রকাশ করিয়া ংবর্ধিত করেন। ইহা 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংখ্যায় প্রকাশিত, 'কণিকা' সম্বন্ধে আর একটি পত্রে চন্দ্রনাথ বসু রবীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন—

"রবীন্দ্রনাথ,

'কণিকা' একখানি পাইয়া যেমন আনন্দিত হইলাম তেমনি উপকৃত হইলাম। অনেক গূঢ় গভীর কথা অতি সুখপাঠ্য, অনেকস্থলে কবিত্বপূর্ণ 'বচনে' বলিয়াছ। তোমার অনেক লেখায় wit-এর পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু 'কণিকা'য় wit-এর প্রাণ (soul) দেখিলাম। দেখিয়া, তোমার প্রতিভার ভিত্তি কোথায়, তাহাও যেন একটু বুঝিলাম। কণিকায় সবই ভাল হইয়াছে—কেবল উহার নামকরণ ঠিক হয় নাই। 'হীরক-কণিকা' বলিলে ঠিক নামকরণ হইত।"

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত চন্দ্রনাথের অনেকগুলি পত্র 'সবুজপত্র' (আশ্বিন, ১৩২৫) পত্রিকাতেও ্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল পত্র হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সাহিত্য সমাজ প্রভৃতি িষয়ে অনেক সময় মতবিরোধ ঘটিলেও উভয়ের মধ্যে আগাগোড়াই একটা প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন ছিল।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'-র ৮৩ সংখ্যক পুস্তিকার মধ্যেও হা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১। এই পত্রখানি পাইবার পর রবীন্দ্রনাথ বন্ধুবর প্রিয়নাথ সেনকে একখানি পত্র লেখেন। ক্ত পত্রখানি প্রিয়নাথ সেনের 'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি' (প্রমোদনাথ সেন সম্পাদিত—১৩৪০, প্রথম সং) ান্থ হইতে এক্ষেত্রে প্রকাশিত হইল—

"আজ চন্দ্রনাথবাবুর একখানি চিঠি পেয়ে বিশেষ উৎসাহ লাভ করলুম—সেইটে তোমাকে ্পি করে পাঠালে তুমিও বোধ হয় খুসি হবে।***এই চিঠিখানি পড়ে উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে থার্থই সঙ্কোচ ও লজ্জা অনুভব করছিলুম। প্রাপ্যর চেয়ে অধিক পেয়েছি সে বিষয়ে আমার িজের মনে সন্দেহের লেশমাত্র নাই।—'বিরহ' কবিতাটা আমার নিজের কিছু বিশেষ প্রিয়—সইটে উনি বিশেষরূপে নির্বাচন করাতে আমি একটু বিশেষ খুসি হয়েছি।"

ক্ষণিকা

সতীশচন্দ্র রায়

আজ অনেকদিন হইল রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' বাহির হইয়াছে। বাস্তবিক পড়িয়া পড়িয়া এতদিনে 'ক্ষণিকা' আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। এখন বোধ হয় এই কাব্য-সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বেশ জোর করিয়া, স্থির করিয়া বলিতে পারিব। প্রথম উদয়ের চক্ষু-ঝল্‌সানো এখন আর নাই, তাই আশা করি এতদিনে দ্বিধা না করিয়া 'ক্ষণিকা' সম্বন্ধে মন্তব্য বলিতে পারি।

ক্ষণিকার কথাপ্রসঙ্গে একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি একদিন আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসার মুখে একটু মৃদুহাস্যের নুড়ী নিক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"হাঁ সুন্দর বটে, কিন্তু সমস্ত কবিতাকে কবি গভীর অর্থযুক্ত করিতে পারেন নাই!" অনেকেরই হয়ত এইরূপ মত। আমাদেরও এ বিশ্বাস নয় যে, ক্ষণিকার যে-কোন-একটি কবিতা তুলিয়া লইয়া পড়িলেই যথেষ্ট গভীর কবিত্ব আস্বাদন করা যায়। যে-কোন-একটি তুলিলে ত হইবে না-ই—যে-কোন-একটি অতি উৎকৃষ্ট কবিতাও পৃথক্ করিয়া লইয়া পড়িলে তাহার সমস্তটা সৌন্দর্য জানা যাইবে কিনা সন্দেহ। কদম্বফুলের কেশরগুলি যেমন একটা শরীরে বাণবিদ্ধ থাকাতে, সৌন্দর্য-সৌগন্ধপূর্ণ একটি সম্পূর্ণ কদম্বফুল—একটিমাত্র কেশরে অসম্পূর্ণ, ক্ষণিকাও তেমনি সবগুলি কবিতা লইয়া একটি ভাবসুরভি কবিত্বমণ্ডল;—একত্র দেখিলেই ইহার সৌন্দর্য,—প্রকৃতি যেমন চিরকালের সহচর, কখনও যায় না, ইহাও তেমনি যাইবে না। কিন্তু যাঁহারা এই একত্বসূত্রটির ঠাহর না পাইবেন তাঁহারাই গভীর অর্থের অভাবে নৈরাশ্য প্রকাশ করিবেন। কিন্তু তাঁহারাও

দ্রষ্টব্য: 'ক্ষণিকা' ১৩০৭ সালের শ্রাবণ মাসে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত একটি পত্রে (৪ অক্টোবর, ১৯৩৩) 'ক্ষণিকা'র 'আবির্ভাব কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

> "কাব্যের একটা বিভাগ আছে যা গানের সজাতীয়। সেখানে ভাষা কোনো নির্দিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে না, একটা মায়া রচনা করে, যে-মায়া ফাল্গুন মাসের দক্ষিণ হাওয়ায়, যে-মায়া শরৎ ঋতুতে সূর্যাস্তকালের মেঘপুঞ্জে। মনকে বাড়িয়ে তোলে; এমন কোনো কথা বলে না যাকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

অবশ্য—যদি বাহ্যজগতের কোনো সৌন্দর্য-প্রেরণা ধরিবার শক্তি তাঁহাদের অবশিষ্ট থাকে—তাহা হইলে তাঁহারাও ক্ষণিকার ভাষা পড়িয়াই কাঁপিয়া উঠিবেন! এ কি চমৎকার! এ যে স্টাইল!—ঠিক মনের কথা ভাবের ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে ছন্দ বাঁধিয়া অক্লেশ উপমায়, অনায়াস সাজসজ্জায় ছুটিয়া বাহির হইতেছে!

আমরা যতদিন সংস্কৃত দিয়া লিখিব, ততদিন আমাদের স্টাইল হইবে না। আমরা লিখিবার সময়ে সংস্কৃতের স্থূল ঢাকনীতে আমাদের মনের গতিভঙ্গী আগাগোড়া ঢাকিয়া ফেলি, তাই আমাদের স্টাইল এত অল্প।

কবিতা মনের কথা, বিশেষতঃ লিরিক কবিতা। তাই তাহার ভাষা নিতান্ত সোজা হওয়া দরকার। 'ক্ষণিকা' লিরিকের চরম—উহার ভাষাও তাই একেবারে নিখুঁত সোজা। এই সোজার কত গুণ তাহা দেখা যাইবে।

যে সময়ে আর শিল্পীর কুঁদানো চক্ষে পড়ে না, গঠনটি ঠিক প্রকৃতির ছবির মত প্রাণ ছুঁইয়া দেয়, 'ক্ষণিকা' সেই সময়ের। ভাবে এবং ভাষায় অভেদ। ভাষা কানে প্রবেশ করিয়া তাহার নিরর্থ তৌর্যত্রিকে একমিনিটও দেরী করে না। ঠিক প্রাণে ভাব ও চিত্র নাচাইয়া দেয়—যতটুকু তৌর্যত্রিক ভাষাতে রহিয়াছে, ততটুকু ভাব-উদ্বোধনের জন্য আবশ্যক। ইহা হইতে ভাবও যেমন সম্যক্ উদ্বোধিত হয়, তেমনি প্রতি ভাবের সঙ্গে যে একটি মাত্র সুর আছে (যাহা কবিরাই আয়ত্ত করিতে পারেন), সেটিও ধরা পড়িয়া যায়।

"সূর্য গেল অস্তপারে
লাগ্‌ল গ্রামের ঘাটে
আমার জীর্ণ তরী—
শেষ বসন্তের সন্ধ্যা হাওয়া

"ক্ষণিকার 'আবির্ভাব' কবিতায় একটা কোনো অন্তর্গূঢ় মানে থাকতে পারে; কিন্তু সেটা গৌণ; সমগ্রভাবে কবিতাটার একটা স্বরূপ আছে; সেটা যদি মনোহর হয়ে থাকে তাহলে কিছু বলবার নেই।"

'ক্ষণিকা' রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

'ক্ষণিকা'র বর্তমান সমালোচনাটি বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায়ের লিখিত। ইহা 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী' (১৩১৯) নামক গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে।

শস্যশূন্য মাঠে
উঠ্‌ল হাহা করি—"

এই লাইন ক'টি পড়িবামাত্র বুক ছাঁত করিয়া উঠে। শব্দ বুঝিবার জন্য একটুও অপেক্ষা করিতে হয় না, ঠিক সেই উদার মাঠের উদাস হাওয়াটা আসিয়া, বুকের উপর হাহা করিয়া উঠিয়া, দূরে ঘুরিয়া চলিয়া যায়।

তারপরে সাজসজ্জা। প্রকৃতি রূপে এবং বর্ণে ভরা। তাহার সুরের সঙ্গে সঙ্গে রূপ অনন্ত। কবিরও যখন সম্পূর্ণতা লাভ হয় তখন তাহার সুরগুলি জমিয়া রূপের বৈচিত্র্য এবং বর্ণের হিল্লোল চারিদিকে ঘিরিয়া আসে। প্রকৃতি বর্ণনা করিতে গিয়া কবিগণ যে রূপ ও বর্ণ ফুটান, এখানে তাহার কথা হইতেছে না। এখানে রূপ ধরিয়া ভাব প্রকাশের কথা বলিতেছি। ইহাই কাব্যের অলঙ্কার। যেমন—

"জীবন অন্তে যায় চলি, তাই
রংটি থাকে লেগে
প্রিয়জনের মনের কোণে
শরৎ সন্ধ্যামেঘে"—

এই পঙ্‌ক্তি ক'টিতে দূরস্মৃতির ভাবটি শরৎসন্ধ্যামেঘে একটি নিবিড়-করুণ রূপ পাইয়াছে বলিতে পারি। এইরূপ অলঙ্কার কবিতার প্রতি পৃষ্ঠায়। এইরূপ অলঙ্কার যেমন ভাষাটিকে ঝুম্‌কা ফুলের ন্যায় বিচিত্র রঙে সাজাইয়া দিয়াছে, সেইরূপ ভাষাটিও কিন্তু আপনাকে নিতান্ত সোজা করিয়া ফেলিয়া অলঙ্কারগুলিকে সহজেই জীবন্ত হইয়া উঠিবার সুযোগ দিয়াছে। ছন্দ সম্বন্ধেও সেই কথা। ভাষা অত সহজ, এক একটি পদ অত অল্পাক্ষর বলিয়াই ছন্দগুলি এত বিচিত্র ভঙ্গীপূর্ণ, এমন সহজে ভাবানুসারিণী। অমরকোষ হইতে স্থূলস্থবির শব্দ বাছিয়া অত নানাভঙ্গীর ছন্দ কে রচিতে পারিত, আমি জানি না।

ছন্দ চাই, সহজ ভাষা চাই, অলঙ্কার চাই—এ সমস্তই লিরিকের বাহ্যিক উপাদান। কিন্তু এই যে কামিনী-ফুলদলের মত অলঙ্কারগুলি ঝরিয়া পড়িতেছে, ইহার নিগূঢ় কারণ একটি মুক্ত প্রাণের হাওয়া বই আর কিছুই নহে। ক্ষণিকার আদ্যোপান্ত সেই প্রাণটির সন্ধান লইয়া তৃপ্ত হইব।

কাব্যটির নাম 'ক্ষণিকা'। কিন্তু নাম দিয়াই কবি ক্ষান্ত হন নাই। মুখবন্ধস্বরূপ একটি কবিতায় আবার নামটির ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

"ক্ষণিকের গান গা'রে আজি প্রাণ—"

"ধরণীর 'পরে শিথিল-বাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস্ যাপন।"

এই ঝলমল প্রাণটিই যে ক্ষণিকার আগাগোড়া চলিয়া গিয়াছে—কিরূপে গুরু-ভারবর্জিত হইয়া প্রথমে যাত্রা করিয়াছে, কিরূপে ক্রমে মুক্তপ্রাণ নানা সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া গিয়া মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে সুখে বিচরণ করিয়াছে এবং অবশেষে কি একটি গম্ভীর পরম পরিণতি পাইয়াছে, তাহারই অনুধাবন করিয়া কৃতার্থ হইব।

ক্ষণিকা লিরিক। তাই যত কিছু ছবি, সমস্তের মধ্যেই কবির প্রাণটি বিশেষ করিয়া দেখিতে পাই। কালিদাসের কালে লোধ্র-কুরুবক, অশোক-দোহদ শৌরসেনী জল্পনা আপনা আপনি আমাদের কতকটা মোহিত করে বটে, কিন্তু কবির চিত্ত যে সহজেই সেই দুরকালের মধ্যে ঢুকিয়া, সেকালের সমস্ত সৌন্দর্য মালার মত গাঁথিয়া তুলিতেছে, এই চলৎকল্পনার লঘুগমনই আরও অধিক চিত্তহারী। ক্ষণিকার গ্রাম্য চিত্রগুলির যে স্বতন্ত্র আনন্দ, তাহা তো আছেই, তাহা ছাড়া সেগুলি যে একরকমে চিত্তভাবের বাস্তবায়িত ছায়া বই আর কিছুই নহে—ইহাই আমাদের প্রধানতঃ দেখিবার বিষয়। ক্ষণিকার সেই মুলধারা অর্থাৎ এই কাব্যের আদ্যন্তমধ্যে প্রবাহিত যে কবিজীবনটি, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিতে পারি, ক্ষণিকায় কবিজীবনের একটি সন্ধি ও পরিণতি দেখা যায়। একটি প্রাণ ভোগক্ষুব্ধ যৌবন ছাড়াইয়া ব্যাপ্ত শান্তির স্থির জলে নামিয়া আসিতেছে। ক্ষণিকার যে মোটামুটি দুটি ভাগ আছে, তাহার প্রথম ভাগে প্রাণ কেবল জল্পনা করিতেছে—'আর এ সব বড় কাজ, বড় কথা, সংসারের শূন্য গাম্ভীর্য ভালো লাগে না,—সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে মাতাল হইয়া উঠিব,—কাজ আর নহে, কেবল আনন্দ—দুর্দিন পড়িলে ঘরে খিল লাগাইয়া ছন্দগাঁথা কিন্তু আনন্দ পাইলে অগ্নিমুখে পতঙ্গের মত তাহাতে গিয়া ছুটিয়া পড়া। সুখ দুঃখ—যত বুকভাঙা বোঝা সব ঠেলিয়া ফেলিব।' মোটামুটি প্রথম ভাগে মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার ভাব—আর শেষভাগে প্রকৃতই সেই সৌন্দর্যের সঙ্গে মাতাল হইয়া উঠা—সেই

অনলস আনন্দের জীবন যাপন। সাপের খোলসের মত যেন প্রথম ভাগে, শেষ ভাগের আনন্দচঞ্চল চিত্তের নির্মোক দুলিতেছে। প্রথম ভাগে সংকল্প হইতেছে—'তখন খাতা পোড়াও ক্ষ্যাপা কবি' আর শেষ ভাগে 'চতুর রাঙা ঠোঁটে মধুর হাসি' দেখিয়া—

"কথাই নাহি জোটে
কণ্ঠ নাহি ফোটে।"

প্রথম ভাগে সংকল্প হইতেছে—কথার ওজন রাখিব না, আর শেষ ভাগে—

"প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে।"

প্রথম হইতে 'কবির বয়স' পর্যন্ত প্রথম ভাগ, 'বিদায়' হইতে দ্বিতীয় ভাগ। কবি বিদায় লইতেছেন। অনেকক্ষণ জল্পনা করিয়া মনটাকে বুঝাইয়াছেন। 'আঁধার আলোয় সাদা কালোয় দিনটা ভালই গেছে কাটি'—কবি বিশ্রামে যাইতেছেন, যুবাদলের আমোদপ্রমোদে আজ তাঁহার যৌবনান্তকালের বিমনস্কতা উপস্থিত। প্রাণটি আজ আর ভোগে বদ্ধ নাই, আজ তাহার কোন তীব্র লোভ নাই, কিন্তু সৌন্দর্যের কণামাত্র আভাসেই বিকল হইয়া উঠিতেছে—'পড়ল খসে খসে'। প্রাণ বিশ্বে ছড়াইয়া গিয়াছে—সে আজ উদাসীন। একদিন যৌবনের মত্ততায় অকূলে যাত্রা হইত, রশারশি ছিঁড়িয়া ছুটিয়া যাইতে হইত, কিন্তু এখন আর সে তীব্র আবেগ নাই; সে তীব্র যৌবন,—'জীবনের সেই পরম অধ্যায়' চম্পকবকুলচামেলীভারে নিজেকে মণ্ডিত করিয়া মুহুর্মুহুঃ উত্তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাসে আপনাকে মাধবীর গূঢ় সত্তার সঙ্গে অনন্ত-আবর্তন-মুখে বিদায় করিয়া দিয়া আসিয়াছে—

"অমর বেদনা মোর হে বসন্ত রহি গেল তব
মর্মর নিশ্বাসে
উত্তপ্ত যৌবন-মোহ রক্তরৌদ্রে রহিল রঞ্জিত
চৈত্র সন্ধ্যাকাশে।" (কল্পনা)

এবার আর যৌবনের সেই তীব্র বেদনা সহিবে না—

"এবার ঘুমো কূলের কোলে
বটের ছায়াতলে
ঘাটের পাশে রহি,

ঘটের ঘায়ে যেটুকু ঢেউ
উঠে তটের জলে
তারি আঘাত সহি।"

"যাস্‌রে খেয়া বেয়ে।
আন্‌বে বহি গ্রামের বোঝা
ক্ষুদ্র ভারে ভারে
পাড়ার ছেলে মেয়ে।"

কবি আসিয়া যেন নিতান্ত সরল সৌন্দর্যের মধ্যে গ্রামের প্রান্তে ঘর পাতিয়াছেন।

"আজ শান্ত তীরে তীরে
তোমায় বাইব ধীরে ধীরে।"

খঞ্জনা নদীর তীরে অঞ্জনা গ্রামখানি। সে গ্রামে শরৎ ও বর্ষা ঋতুতে কবির বাস। কবি সেখানে অকাজে যখন-তখন যেখানে-সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, লক্ষ্য কিছু নাই বলিয়াই প্রতি মুহূর্ত তাহার সৌন্দর্য-সম্পদ্‌ কবির প্রাণে অজস্র ঢালিয়া দিতেছে—

"দীঘির জলে ঝলক ঝলে
মানিক হীরা,
সর্ষে-ক্ষেতে উঠছে মেতে
মৌমাছিরা।
এ পথ গেছে কত গাঁয়ে,
কত গাছের ছায়ে ছায়ে,
কত মাঠের গায়ে গায়ে
কত বনে।
আমি শুধু হেথায় এলেম
অকারণে।"

কখনও মাঠে, কখনও ঘাটে—রাস্তা যেখানে গিয়াছে, কবি সেখানেই যাইতেছেন। কখনো কখনো মনটিকে একটু ঘুরাইয়া সেই দূর বৃন্দাবনের দিকে ফেলিয়া, হৃদয়ের জালে সেকালের সখাদের সমস্ত মধুর লীলা তুলিয়া আনিতেছেন,

প্রতি শব্দে পাঠককে বৃন্দাবনে লইয়া যাইতেছেন। কাল ও দেশের ব্যবধান কোন সৌন্দর্যকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না। হৃদয় এত লঘুভার যে, সে 'রিমিঝিমি বাদল বরিষণে' রাতে স্বপ্নের সঙ্গেও সত্যের মত করিয়া সম্ভাষণ করিতে চায়। কবির কাছে সত্য এত গুরুত্ববর্জিত হইয়াছে যে, স্বপ্ন হইতে যেন তাহার কিছু তফাত নাই। এমনি তরল প্রাণ বলিয়া তাহার প্রসারও অনেক—অনেক দূর—একটুখানি উত্তেজনা হইলেই সে বাণিজ্যে ছুটিয়া যায়—

"নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা,
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগর-বিহঙ্গেরা।

নারিকেলের শাখে শাখে
ঝোড়ো হাওয়া কেবল ডাকে।"

এইরূপ ভারশূন্য প্রাণে কবি আসিয়া গ্রামে বাসা করিয়াছেন। যেখানে-সেখানে অকারণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সন্ধ্যায় বধূর দ্বারে অতিথি হইয়া রিণিঠিনি শিকলটি নাড়িয়া দিতেছেন,—মাঠের মেঘত্রস্তা হরিণ-চোখ মেয়েটিকে কৃষ্ণকলি বলিয়া অভিহিত করিতেছেন,—জলার্থিনী দুটি বোনের গুঞ্জনধ্বনি দূর হইতে শুনিতেছেন,—'ভাঙনধরা কূলে' আপনারি অন্তরের সৌন্দর্যতৃপ্তিকে মূর্তিমতী দেখিতেছেন,—

"আজকে এমন বিজন প্রাতে
আর কারে কি চাই?
সে কহিল ভাই,
নাই নাই নাই গো আমার
কারেও কাজ নাই।"

কখনো 'সজলনীলজলদবরণবসনাবৃতা'র জন্য স্থান করিয়া দেওয়া হইতেছে। মোট কথা 'শরৎকালের বালুচরে নির্জন ঘর' হইতে, কখনো স্থলপথে, কখনো জলপথে বাহির হইয়া কবি বাংলা গ্রামের সমস্ত সৌন্দর্যের সম্মুখেই আপনাকে আনিয়া ফেলিতেছেন—এ কেবল স্বচ্ছ হৃদয়ে সৌন্দর্যের ছাপ ধরা। হৃদয়ে আলোড়ন থাকিলে এই কোমল সৌন্দর্যগুলি এমন যথাযথ বেশে উঠিয়া আসিতই না।

সৌন্দর্যের সঙ্গে কেবলমাত্র দেখা এবং স্পর্শ বিনাই তাহার আভাটি হৃদয়ে

পাওয়া। তাই যাত্রীকে কেবলমাত্র পার করিয়াই সুখ—কোন পীড়াপীড়ি. কোন নাছোড় জিজ্ঞাসাবাদ নাই—

"বলতে যদি না চাও, তবে,
শুনে আমার কি ফল হবে ?"

কোন ব্যস্ততা নাই। দু'জনে একটি গাঁয়ে থাকিয়াই সুখ। প্রাণ সৌন্দর্যের উপরে আপনাকে বিশ্বময় ছড়াইয়া প্রতি ক্ষুদ্র কণায় বৃহৎ সুখকে, দূরের সুখকে অধিকার করিতেছে—

"তাদের বনে ঝরে শ্রাবণধারা
মোদের বনে কুসুম ফুটে ওঠে।"

একটি যে দূরবিস্তারী 'গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে'—প্রকৃতির কবি আজ প্রাণে প্রকৃতির সেই মিলনাধার ঔদার্যটি লাভ করিয়াছেন। যেখানে 'বিরহ', সেখানেও আবেগ ব্যাপ্ততায় শান্ত হইয়া গিয়াছে। দুপুরে ঝাউয়ের অবিরাম শব্দে ক্ষণকালের জন্য সমস্ত আকাশ বিরহবাঁশীর সুরে কাতর—আবেগ আর হৃদয়ের সংকীর্ণ কোটরে জ্বলিয়া মানুষটিকে বিক্ষিপ্ত করিতেছে না, শুভ্র অলস মেঘজড়ানো আকাশ, নিস্তরঙ্গ নদী—সমস্ত প্রকৃতিকে জড়াইয়া পড়িয়া আছে।

মিলনের আহ্বান—সেও কি অতীব্র সুরে !—

"এস তোমার চরণ দুটি
তৃণের পরে ফেলে।"

আর মিলন তো নিতান্তই 'সোজাসুজি'। সোজাসুজি বলিয়াই ছোট নহে, পরন্তু অতি বৃহৎ, মনোরম উচ্ছ্বাস—

"দুটি চক্ষে বাজবে তোমার
নব রাগের বাঁশী,
কণ্ঠে তোমার উচ্ছ্বসিয়া
উঠবে হাসিরাশি।"

অতর্কিতে কোন দিন দুর্দিনে সুন্দরী ফুল নিতে আসিয়া পড়িলেও কোন শশব্যস্ততা নাই। মনে পড়ে বটে একদিন ছিল—

"বন আলো করি ফুটে ছিল যবে
রজনীগন্ধারাজি,—"

কিন্তু অচিরেই সে খেদ পরিহার করিয়া 'ছিন্ন কুসুম পঙ্কে মলিন ধুয়ে ধুয়ে' দেওয়া হয়। এক একদিন 'মনের কথা জাগানে' বাতাস বহিলে আগের কথা মনে পড়িয়া প্রাণের তল হইতে বেদনা মর্ম্মরিত হইয়া উঠিতে চায়, কিন্তু—'আজকে কিছুই গাব না'—কবি সহজেই আপনাকে সংবরণ করিয়া ফেলেন।

তাই দেখিতেছি শান্তি, ব্যাপ্তি—দেখিতেছি অসীমে প্রসার। প্রথম ভাগে কবি তীব্র ভোগাকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া আসিয়াছেন,—ক্রমে দেখিতে পাই মিলন, বিরহ, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি প্রাণটিকে আদৌ ধরিতে পারিতেছে না, তাহাদের মধ্য হইতে 'সূত্রং মৃণালাদিব' সৌন্দর্যটুকু লইয়া, আনন্দরসটুকু লইয়া প্রাণ কোথায় ছুটিয়া যাইতেছে। সুখ দুঃখ ত পাতার ভেলার খেলার মত, প্রেমও নিতান্ত সহজ—এসব ছাড়াইয়াও কবি কোথায় যাইতেছেন? তাঁহার উদার প্রাণ কাহাকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে সম্পূর্ণ ব্যয় করিয়া দিতে পারে? উত্তর—প্রকৃতিকে। পূর্বে যে সুর শুনিয়াছিলাম 'অকূল শান্তি সেথায় বিপুল বিরতি' এখন তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। মাধুর্যে কবি আজ ধনী, তিনি আজ কৃতার্থ, তিনি আজ দাতা, সকলকেই তাঁহার কিছু দিবার আছে—

"আছে আছে কিছু রয়েছে বাকী।"

প্রকৃতির বুকেই যেন তাঁহার স্থির শান্তির ঘর তৈয়ার হইয়া গিয়াছে। কবিও তাহা ছবিতে এবং সিধা কথায়ও বলিয়া দিতে বাকী রাখেন নাই। 'ভৎর্সনা' কবিতায় কবি বলিতেছেন—"আমাকে তিরস্কার করিও না। আমি বিনা স্পর্শে তোমার সৌন্দর্য লইয়াছি, আমি কাহারো জন্য অপেক্ষা করিয়া নাই—আমার গৃহ আছে—সেখানে,

"জ্বলে প্রদীপ ধ্রুবতারার মত।"

আবার সিধা কথাতেই বলিতেছেন—

"দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি"—

"তাই ত্রিভুবন ফিরিছে আমার পিছুতে।"

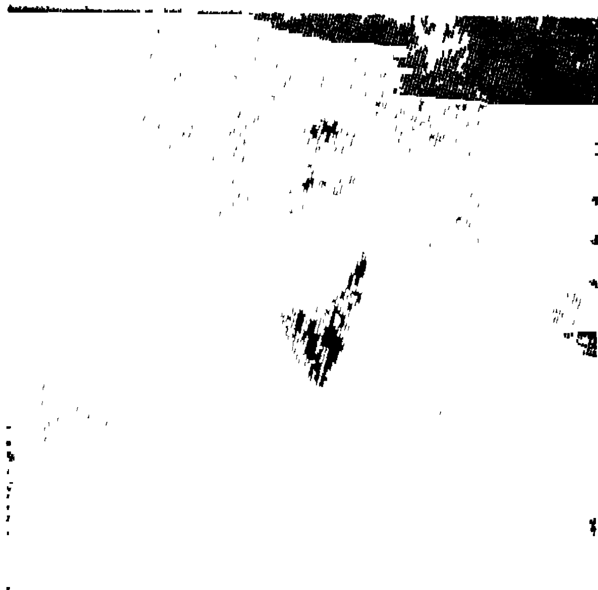
স্থির শান্তির ঘর রচিত হইয়া গিয়াছে। তাই যতই শেষের দিকে যাই, ততই প্রাণ মেঘমুক্ত, ততই প্রাণ আপনার ঔদার্যপরিমাণ বিহারভূমিতে আসিয়া পড়িতেছে,—শেষের দিকে যতই যাই, ততই সেই 'বিপুল বিরতি',



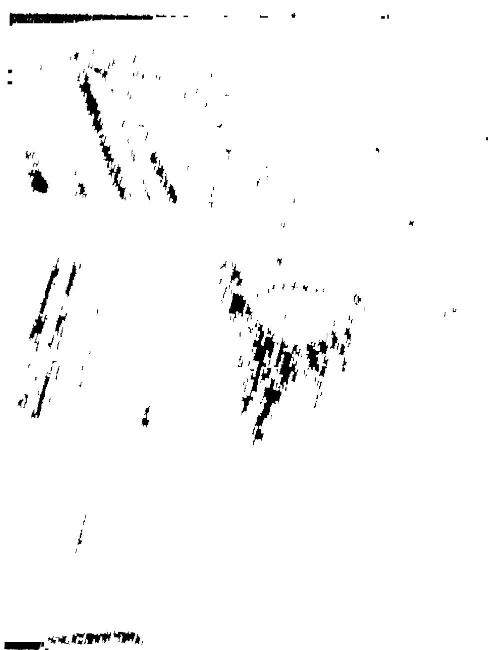
প্রিয়নাথ সেন

প্রমথ চৌধুরী





চন্দ্রনাথ বসু



রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়



প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়



অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

সেই 'অকূল শান্তির' সম্মুখে আসিয়া পড়িতেছি। প্রভাতে কবির প্রাণটি বর্ষাধৌত প্রকৃতির উপর পড়িয়া ঝিকিঝিকি করিয়া কাঁপিতেছে, সংসারের আচারকে অবহেলা করিয়া বর্ষার ঝর্ঝরের সঙ্গে মাতিয়া উঠিতেছে—নব বর্ষায় নানা রঙের অনুকারে নানা রঙীন ভাবের জাল প্রাণের চারিদিকে ময়ূরের পাখার মত খুলিয়া যাইতেছে, বিশ্বের সৌন্দর্য বুকের মধ্যে আসিতেছে, আবার প্রাণের ভাব বিশ্বে বাস্তবায়িত হইয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। যেমন—

"নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে।
নব তৃণদলে ঘন নব ছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে,
পুলকিত নীপনিকুঞ্জে আজ
বিকশিত প্রাণ জেগেছে।"...

প্রকৃতিও নদীকূলে, কেতকীতটে, মেঘপ্রাসাদে, বকুলশাখার অন্ধকারে অনতিস্ফুট বিভাসে নিজের মূর্তিখানি দেখাইয়া পালাইতেছে। একজন চিত্রকর যদি এই ছায়াভাসগুলিকে অম্বর ব্যঞ্জনের বর্ণে ফুটাইতে পারিতেন! এত তন্ময়তা, এত সৌন্দর্য, এত বিস্তার, এত সুসঙ্গত সঙ্গীত যদি সর্বোৎকৃষ্ট লিরিক সৃষ্টি না করিতে পারে তবে জগতে আর পূর্ণ লিরিক নাই।

এইরূপে সঙ্গীতের মাতালের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপ্তক্ষেত্রে আসিয়া আমরা বহির্ভুবনের উপর গলিয়া পড়িয়াছি, কিন্তু অবশেষে আরও একটি নিবিড়তর স্পর্শে আমরা অতলের অতলে ডুবিয়া গিয়াছি। প্রকৃতির মধ্যে এতকালের আরাধ্যা আবির্ভূতা হইলেন, প্রাণ আনন্দে ভাঙিয়া-চুরিয়া ভাসিয়া গেল, কোনদিকে আর তীরের সন্ধান পাইল না।

"আমার পরাণে যে গান বাজাবে
সে গান তোমার কর সায়
আজি জলভরা বরষায়।"

"যেথা চলিয়াছ সেথা পিছে পিছে
স্তবগান তব আপনি ধ্বনিছে।"

কবির বীণা নীরব হইয়া রহিল।

ক্ষণিকায় সৌন্দর্যের সাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছে। ক্ষণিকা একখানি সাধনার ইতিহাস, সৌন্দর্যসাধনা ও মাধুর্যসাধনার ইতিহাস অর্থাৎ পরম কবিতা, কবিদের আপনাদের জিনিস। কবি সংসার হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সৌন্দর্যের সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, সাধনা সফল হইয়াছে। তাই কবি সংসারের জন্য একটি আলয় নির্মাণ করিতেছেন—তাঁহার সৌন্দর্য ও মাধুর্যের আদর্শস্বরূপা এই কল্যাণী।—কবির 'সর্বশেষের গানটি' সিদ্ধকাম কবিকে আবার সংসারের সহিত মিলাইয়া দিতেছে।

ক্ষণিকায় আরও দুইটি কবিতা আছে। সুগম্ভীর দুইটি কবিতা। সেই দুইটি পড়িলেই আমরা বুঝিতে পারিব, তুমুল ছন্দে কাহার আবির্ভাব হইয়াছিল। এইখানেই আমরা অতলের অতলে ডুবিয়া যাই। চঞ্চল হইতে গভীর সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া বাংলার প্রকৃতির বনপথ দিয়া একটি কবির প্রাণ আসিয়া অবশেষে এক 'স্তব্ধ উদার আলয়ে নীরব নিভৃত ভবনে' উপস্থিত হইয়াছে। এখনো—

"চিহ্ন কি আছে শ্রান্ত নয়নে
অশ্রুজলের রেখা ?"

বাংলাও ধন্য, আমরাও ধন্য। যতই সংসারের ভার বাড়িবে, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অত্যাচারে আমাদের জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিবে, ততই এই পরিপূর্ণ কোমল মাধুর্যের বিবরণ সর্বদাই আমাদিগকে অসীম এবং সুন্দরের সহিত অন্ততঃ কণাতেও সংশ্লিষ্ট রাখিবে। যাহারা এইরূপ সুন্দর হইতে জানে এবং মানুষের জীবনের নিগূঢ় মধুর রস নিজের প্রাণে পাইয়াছে, তাহারাই যেন আপনার কথা গান করে, তাহারাই যেন লিরিক কবিতা লেখে। কারণ ঐ একটি হৃদয়ের জ্যোতিঃসম্পদে সমস্ত মনুষ্যজাতির গৌরব।

ক্ষণিকার আলোচনা করিলাম। আসল কাব্যপাঠের যে আনন্দ, তাহার শতাংশের একাংশও বলা হইল না। যাঁহারা ক্ষণিকা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই একথা বুঝিবেন। ক্ষণিকার আলোচনা করিলাম সত্য, কিন্তু প্রসঙ্গতঃ একটু এদিক্-ওদিক্ একটু আগেপিছে দৃষ্টি দেওয়া অনিবার্য। রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবন ধারাবাহিক। স্তরে স্তরে তাঁহার কাব্যের বিকাশ—কোনোখানে একটা উড়িয়া-আসা উদ্ভট কবিতা পাওয়া দুষ্কর। তাই একখানি কাব্যের সূত্রেই স্বভাবতঃ আমরা তাঁহার অন্যান্য কাব্যে গিয়া উপস্থিত হই। ক্ষণিকা হইতে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি—কি আলোড়ন, কি বেদনা, কি একটা অশান্ত অন্বেষণ।

সেই 'তলতল ছলছল' ইত্যাদি আহ্বানের গভীর আবেগ;—'সেই ভীষণ রঙ্গে ভবতরঙ্গে ভাসাই ভেলা রাত্রিবেলা' ইত্যাদি অতিমাধুর্যের অবসাদান্তে উন্মত্ত মিলন;—সেই ধরণীগগনের সৌন্দর্যকে ব্যথিত হৃদয়ের বেষ্টনে মানসী প্রেয়সীর রূপে আহরণ করিয়া লইবার চেষ্টা,—যেমন 'মানসসুন্দরীতে'; আবার সেই রমণীকে সমস্ত সম্বন্ধ, কর্তব্য-বন্ধন হইতে ছাড়াইয়া বিশ্বভুবনের অঙ্গে তাহাকে বিস্তারিত করিয়া দেওয়া—যেমন উর্বশীতে; সেই 'যেতে নাহি দিব' স্বরে বুক চিরিয়া পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ক্রন্দন; সেই চিত্রাঙ্গদায় পার্বতীয় অরণ্যচ্ছায়ে দীর্ঘায়িত প্রেমলীলা—আরও সেই কত ঢেউয়ের টলমলানি, কত স্রোতের টান যে, দেখিয়াছি তাহার মধ্যে কি একটা কৃচ্ছ্র আলোড়নই দেখিতে পাই! তাহার পরে ক্ষণিকায় আজ সৌন্দর্য সহজ হইয়া আসিয়াছে 'নাগাল পেয়েছি ছুঁতে'! চৈতালিতে যে একটা শান্তি আছে, সেটা গভীর শান্তি নহে, বিকাল-বেলার শান্তির মত—তখনো সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রাণ একেবারে নিবিড় মাখামাখি ভাবে মিশিয়া যায় নাই; কিন্তু ক্ষণিকায় একেবারে মিলন, 'অকূল শান্তি সেথায় বিপুল বিরতি'।—ক্ষণিকার যে শান্তি, তাহা নিতান্ত নিবিড় রহস্যময় মধ্যরজনীর শান্তি।

ক্ষণিকা হইতে এখন আবার আমরা কোথায় যাইব? রবীন্দ্রনাথ যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহার জন্য তো আমরা নিতান্ত কৃতজ্ঞ। কিন্তু আরো কি সম্মুখে চাহিতে পারি না? ওয়াল্‌ট্ হুইট্‌ম্যান Passage to India বা 'ভারতযাত্রা' নামক কবিতায় আত্মার সঙ্গে সমুদ্রে বাহির হইয়া ভারতের তীরে উপস্থিত হইয়া যেমন বলিতেছেন—

"Passage to more than India, O Soul."

"আরো দূর, ওরে প্রাণ ভারত ছাড়িয়া—"

তেমনি ক্ষণিকায় দাঁড়াইয়া আমরা কি 'আরো দূরের' সঙ্গীতের, আরো বৃহৎ গভীর গুহার প্রত্যাশা করিব না?

নৈবেদ্য

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

ঈশ্বরতত্ত্ব-বিষয়ক বা ধর্মমূলক গ্রন্থ না হলেও 'নৈবেদ্য' ঈশ্বরতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট আনন্দের খনিস্বরূপ। সমগ্র সংগ্রহ-গ্রন্থখানিতে একটিও ধর্মমূলক ভ্রান্তি নেই। এর ঈশ্বর-ধর্মিতা সর্বাস্তিক গভীর। সকল ধরনের উপাসনাক্ষেত্রে—সে খ্রীষ্টান, মুসলমান বা হিন্দু যে-কোন সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, এর একশত চতুর্দশপদী কবিতাসকল নিঃসংশয়ে বা নিঃসঙ্কোচে আবৃত্ত বা গীত হতে পারে। কবিতাগুলি মানব-হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি এবং সেই হেতু এদের স্থান প্রকৃতিতে ও বিশ্বচেতনায়।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে রীতি-সম্মত সমালোচনা করবার সময় সম্ভবতঃ এখনো আসেনি। এই কবিতাগুলির অন্তর্নিহিত মর্মকথা হচ্ছে—সীমার মধ্যে ও সীমার মাধ্যমে অসীমের অনুভূতি,—এই মহতী ধারণা বোধগম্য হওয়ার পক্ষে কতকগুলি কবিতার বিশ্লেষণাত্মক প্রত্যভিজ্ঞা সহায়ক হতে পারে বলে মনে হয়। অনেকের মতে লেখকের প্রচলিত পূর্বলেখা থেকে নৈবেদ্য হচ্ছে ব্যতিক্রম—এ যেন অনেকটা স্বতন্ত্র। একথা সত্য যে কবিতাগুলির মধ্যে কোন ধর্মভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে পরিষ্কার দেখা যাবে যে, কবির সমস্ত কাব্যধারায় সত্তার ব্যক্তিক বন্ধন ছিন্ন করে, সম্বন্ধের কারা-দুয়ার ভেঙে ফেলে সবার মধ্যে নিজেকে অন্তর্লীন করবার এক দ্বন্দ্ব বিদ্যমান।

অসীমের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ব্যক্তিক সম্বন্ধ হচ্ছে কবিতাগুলির মূল সুর।

দ্রষ্টব্য: বর্তমান ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্র-শতাব্দী পৃথিবীময় উদ্‌যাপিত হইতেছে। রবীন্দ্র-প্রতিভার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন সর্বপ্রথম ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। তিনিই আমাদের সর্বপ্রথ[ম] সজাগ করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের মহান্‌ সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁর সম্পাদিত 'সোফিয়া' পত্রিকা[য়] (সেপ্টেম্বর, ১৯০০) সম্পাদকীয় আলোচনায়। রবীন্দ্রনাথকে তিনি 'দি ওয়ার্লড পোয়েট অব্‌ বেঙ্গল' বলিয়া সংবর্ধিত করেন। পরে তাঁহার ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সম্পাদিত, ইংরেজী 'দি টুয়েনটিএ[থ] সেনচুরি'-পত্রিকাতে (জুলাই, ১৯০১) 'নৈবেদ্য' গ্রন্থের সমালোচনায় রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশ্লেষণ করি[য়া] দেশবাসীকে রবীন্দ্র-রচনার প্রতি আকৃষ্ট করেন।

এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা এইরূপ যুক্তি দেখান যে, অসীম সহজ-অধিগম্য নয়, সুতরাং অধ্যাত্ম দিক থেকে যাঁরা অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর তাঁদের পক্ষে সাময়িকভাবে সসীমকেই অসীম রূপে উপাসনা করা উচিত। কিন্তু অসীম কি বাস্তবিকই অনধিগম্য? যদি অনধিগম্য হ'ত তা হলে যুক্তি স্ব-বিরোধী হয়ে যেত। অসীমের প্রত্যক্ষের মধ্যেই ত যুক্তির উন্মেষ।

"যুক্তির আরম্ভ ও যুক্তির পরিণতি হ'ল সীমাহীন সার্বিক সত্তা। যৌক্তিকতাই ত হচ্ছে অসীমের ধারণা,—সত্য কি তা জানবার জন্য মানুষের বুদ্ধি ততক্ষণ উদ্দীপ্ত হতে পারে না, বা কল্যাণ কি তা সাধনের জন্য তার হৃদয় প্রদীপ্ত হয় না যতক্ষণ মানুষ ঈশ্বরের করুণার ব্যক্তিক সংস্পর্শে না আসে। মানুষ ও ভগবানের মধ্যে সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, সেখানে ব্যবধানের কোন অবকাশ নেই। এমন কোন কিছুই নেই যা আমি ও আমার স্রষ্টার মাঝখানে এসে দাঁড়াতে পারে। ভগবানের সহিত মানুষের সান্নিধ্য-লাভের এই গৌরবময় অধিকার কবি পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করেছেন। সকল অধিকারের মধ্যে কবির কাছে এইটিই সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার। নৈবেদ্যে কবি নিজেকে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রথম অর্ঘ্য দিয়েছেন।

কবির উৎসর্গ এখানেই ক্ষীণ হয় নি—তিনি আরো দূরে গিয়েছেন, আরো গভীরে প্রবেশ করেছেন। সমস্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব অবহেলা করে, মানুষের দুঃখ-দৈন্যের প্রতি উদাসীন হয়ে যদি স্বর্গের আনন্দলাভ করতে হয় তবে কবি সে আনন্দও চান না। আপনজনের দুঃখদৈন্যের অংশ-গ্রহণ দেবোচিত কর্ম, এইরূপ জীবন মর্ত্যে দেব-জীবনসদৃশ। নির্দোষের শাস্তিভোগ ভগবানের নির্যাতন বই আর কি—ইহাই মানবতার লাঞ্ছনা। ভগবান নিজের ভালবাসা, নিজের সমবেদনার জন্য নিজে দুঃখ ভোগ করেন। অপরের অপরাধের জন্য যারা দুর্গতি ভোগ করছে তাদের প্রতি সমবেদনাপ্রকাশ

'নৈবেদ্য' প্রকাশিত হয় আষাঢ়, ১৩০৮ সালে। ইহা রবীন্দ্র-রচনাবলীর অষ্টম খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে 'নৈবেদ্য' ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"এমন সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। আমার 'নৈবেদ্য'র কবিতাগুলি প্রকাশ হচ্ছিল তার কিছুকাল পূর্বে। এই

ও তাদের সাহায্য করা, বিধবা অনাথ অনাশ্রিত দুর্বল ও অত্যাচারিতদের বেদনার অংশভাগী হয়ে তাদের বোঝা লাঘব করা,—এ সকলই হচ্ছে মানবতার প্রতি কৃপাপরবশ হবার জন্যে বিধাতার কাছে আবেদন জানানো।

কৃচ্ছ্রতার অছিলায় সংসারবিরক্তির ধারণা, দুঃখকে পরিহার, সুখ ও আরামের প্রতি আকর্ষণ—কবির কাছে ছিল অত্যন্ত গর্হিত। দুঃখ-যন্ত্রণা বিপদ-আপদের মধ্য দিয়েই কবি যথার্থই মুক্তি চান। যদিও কালিক বৈচিত্র্যের মূলে আছে চিরন্তন ঐক্য, তথাপি অনৈক্য, অসংগতি, বিরোধ ও যুদ্ধ সেই পরম অদ্বিতীয়ের সন্তানদের স্বায় কবলিত করছে,—ফলে মৌলিক ঐক্য কখনও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে না যদি স্বার্থপর, আত্মম্ভরী মনুষ্যত্ব—আত্মত্যাগ নিষ্কলুষ দুঃখ, ও সহানুভূতিপূর্ণ প্রেম দ্বারা প্রতিহত না হয়। আমি বিশ্বাস করি যে, কবি যথাসময়ে তাঁর অপূর্ব মনোমুগ্ধকর সুরে এই মহিমময় বিষয়বস্তু নিয়ে আরো অনেক গান গাইবেন এবং সে গান শুনে তারা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে সচেতন হবে এবং পরস্পরের বোঝা বহন করবার শুভবুদ্ধি তাদের মধ্যে জাগ্রত হবে।

জাতিসমূহের ভাগ্য-বিধাতারূপে ভগবান সম্পর্কে উক্তি নৈবেদ্যর কতকগুলি কবিতায় দেখা যায় যা বাস্তবিকই বীরত্বব্যঞ্জক। এ একটি স্বয়ং-চিন্তনীয় বিশেষ ব্যাপক বিষয়। ভবিষ্যৎ ভারতের মহিমার ভিত্তি স্থাপনের জন্য কবি পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে তাকান নি। আধুনিক সভ্যতার বিভ্রান্তকারী জলুস কবির নিকট নিশার আলো, প্রত্যুষের স্বর্ণদ্যুতি নয়।

নৈবেদ্যে কবির আদর্শ হচ্ছে ক্লেদ-কলুষ-মুক্ত পবিত্র সনাতন হিন্দু সংস্কৃতির উপর ভারতবর্ষের জাতীয় সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত করা, যদিও এই প্রতিষ্ঠিত সৌধের উপর পাশ্চাত্য কারুকার্য থাকতে পারে।

নৈবেদ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবধারা হচ্ছে সোপাধিক ঈশ্বরের মধ্যে নিরুপাধিক

কবিতাগুলি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁর সম্পাদিত 'দি টুয়েনটিএথ্ সেনচুরি' পত্রিকায় এই রচনাগুলির যে প্রশংসা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন, সেকালে সেরকম উদার প্রশংসা আমি আর কোথাও পাইনি। বস্তুতঃ এর অনেককাল পরে এই সকল কবিতার কিছু অংশ এবং 'খেয়া' ও 'গীতাঞ্জলি' থেকে এই জাতীয় কবিতার ইংরেজি অনুবাদের যোগে যে সম্মান পেয়েছিলেম, তিনি আমাকে সেইরকম সম্মান দিয়েছিলেন সেই সময়েই।'

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ—পৌষ, ১৩৪

ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা, বন্ধনমুক্ত সেই নির্বিশেষ সার্বিক সত্তার উপলব্ধি, নিরালম্ব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবার সেই সনাতন বৈদান্তিক অভীপ্সা। (স্বয়ং-প্রকাশ ব্রহ্মজ্ঞান) নৈবেদ্যের মধ্যে কে দেখতে পায় না? মানুষ তাঁকে বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট এক মহান্ পুরুষ হিসাবে জানে, কিন্তু সে আনন্দ কেবলমাত্র জীবের সহিত সংস্পর্শের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—সে আনন্দ নিহিত আছে অনন্তপ্রসারিত অতলস্পর্শী গভীরতায়, যেখানে সকল বৈচিত্র্য এক অচিন্তনীয় ঐক্যে সমন্বিত হয়েছে। ভারতবর্ষ তার সেই সনাতন অভীপ্সা হারিয়ে ফেলেছে—তাই তার আজ অধঃপতন। কবি তাঁর নৈবেদ্যে নূতন সুরে উপনিষদের সেই চিরন্তন মন্ত্রই গেয়েছেন।

বি, অনিমানন্দ লিখিত 'The Blade' নামক গ্রন্থে 'নৈবেদ্য'র সমালোচনা সম্বন্ধে উল্লেখ আছে যে, "It pleased the poet immensely. No one had ever praised him so effusively, so entirely." (p. 100)

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একথাও লিখিয়াছিলেন—

"তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, অপরপক্ষে বৈদান্তিক,—তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রভাবশালী। অধ্যাত্মবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি আমাকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট করে।"

চোখের বালি

সুখরঞ্জন রায়

চোখের বালি যখন নব পর্যায় বঙ্গদর্শনের প্রথম বৎসরে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইতেছিল, বাংলার উপন্যাস সাহিত্যের রসজ্ঞ পাঠকবৃন্দ সেই সময়েই যে চোখের বালিতে একটা নূতন রসের আস্বাদ পাইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য।

বৌঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষি হইতে একটা বড় রকমের লাফ দিয়া চোখের বালিতে আসিয়াই আমরা দেখতে পাই যে, রবীন্দ্রনাথের অপরিপক্ক প্রতিভা অনেক বৎসরের গুপ্তবাস করিয়া অকুণ্ঠিত শক্তি ও সৌন্দর্যে 'পূর্ণ প্রস্ফুটিতা' হইয়া দেখা দিয়াছে। এই প্রতিভার দক্ষিণহস্তের সুধাভাণ্ডে সুধার প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও বামকরের বিষভাণ্ডও একেবারে শূন্য নয়। আশার পাতিব্রত্য, রাজলক্ষীর পুত্রস্নেহ, অন্নপূর্ণার সাত্বিকতা, বিহারীর উন্নত হৃদয়,—এই মাধুর্যের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে বিনোদিনীর বিলাসলীলা ও মহেন্দ্রের নগ্ন দুর্বলতায় একটু তিক্ত রসও গলাধঃকরণ করিতে হইয়াছে। তবে এই তিক্তরসের একটু বিশেষত্ব আছে,—রুক্মিণী-রোহিণীর বীভৎসতা ও প্রতাপ-রঘুপতির মধুবিরোধী ভাব ইহার উপাদান নহে; অতি-মাধুর্যের অসংযমই ইহার জন্মের কারণ। বৌঠাকুরাণীর হাটে মধুবিরোধের নিকট মধুরতার পরাজয়, আর রাজর্ষিতে বর্ণিত হইয়াছে এই মধুবিরোধের উপর মাধুর্যের জয়। রবীন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যে একমাত্র 'বৌঠাকুরাণীর হাট'ই নির্জলা ট্রাজেডি (tragedy), অন্যান্য সকল গ্রন্থেই মুখ্যতঃ রবীন্দ্রের স্বাভাবিক সুস্থচিত্ততা (sanity of mind) ও আশাফুল্লতা (optimism) বর্তমান। অতিভোগে 'চোখের বালি'র আরম্ভ, অবসাদ ও উচ্ছৃঙ্খলতা ইহার দ্বিতীয় অবস্থা, প্রকৃত

দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রনাথের অন্যতম উপন্যাস 'চোখের বালি' প্রথমে ধারাবাহিকভাবে 'বঙ্গদর্শন' নব পর্যায়ের প্রথম বর্ষে (১৩০৮) প্রকাশিত হয়। পরে 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' হইতে ১৩০৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস 'গৃহদাহ' ও 'চরিত্রহীনে'র ন্যায় রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসটি পাঠক-সমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে।

'প্রবাসী', 'সাহিত্য' প্রভৃতি সাময়িক পত্রের অন্যতম লেখক সুখরঞ্জন রায় ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'প্রতিভা' পত্রিকায় 'কথা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ' পর্যায়ে এক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ (১৩১৮,

রসমাধুর্যে ইহার শেষ, এইজন্ত রাজলক্ষ্মীর মৃত্যুসত্ত্বেও 'চোখের বালি' ট্র্যাজেডি নহে।

ট্র্যাজেডি নহে, তাই বলিয়া ইহাতে করুণ রসের কিছুমাত্র অল্পতা নাই। মহেন্দ্রের আশাকে ত্যাগ, রাজলক্ষ্মীর মৃত্যু, বিহারী ও বিনোদিনীর একক জীবন এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র ঘটনায় এই পুস্তকের করুণাধারা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উচ্ছলিত হইয়া বহিয়া চলিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এই পুস্তকে এক মুহূর্তে শৈশব হইতে 'যৌবনে গঠিতা' হইয়া দেখা দিয়াছে। ভাষা এখানে আর জলীয় নয়; 'চোখের বালি'র ভাষা রসপ্রাচুর্যে সঘন, উপমা-সম্ভারে মনোহর, বিচিত্র আভরণে বিভূষিত; কখনো হাস্যে উজ্জ্বল, কখনো ব্যঙ্গে তীব্র, কখনো বা করুণায় অশ্রুপ্লুত এবং সকল স্থানেই ভাব-প্রকাশ ক্ষমতায় ও কবিত্বসম্পদে অতুলনীয়। স্বভাবের নিয়মে পূর্বের বাহুল্য-অংশ বর্জন করিয়া ভাষা এখানে বিচিত্র সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষা ও ভাবমাহাত্ম্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শনস্বরূপ প্রয়াগের যমুনা-বর্ণনা ও তাহার আনুষঙ্গিক মহেন্দ্রের ভাবলীলার বর্ণনার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ইহার করুণ রস Sentimental নহে। বাংলার গৃহের তুচ্ছ ও বৃহৎ দৈনন্দিন জীবন-ব্যাপারে ও ঘটনার বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতে ইহা গভীরভাবে স্পর্শ করে।

ইহার গৃহচিত্র, এমন কি, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যেও অতুলনীয়। কবি ইহাতে আশ্চর্য সহানুভূতির সহিত বাংলার মায়ের, বাংলার আদর-পুষ্ট ছেলের, বাংলার লজ্জানমিতা বধুর মর্মকোষে প্রবেশ করিয়াছেন; এবং সেখানকার সমস্ত মাধুর্য-কোমলতা, স্নেহ-অভিমান লুঠিয়া আনিয়া বাংলার পাঠক সমাজের জন্য 'সোনার থালে' পরিবেশন করিয়া দিয়াছেন। মহেন্দ্রের প্রতি রাজলক্ষ্মীর স্নেহ ও ক্ষণে ক্ষণে অভিমান-তীব্রতা, মধ্যবর্তী অন্নপূর্ণাকে পাইয়া এই

অগ্রহায়ণ-পৌষ) করেন। এই আলোচনার অন্তর্গত 'চোখের বালি'র সমালোচনাটি এখানে অংশবিশেষ মুদ্রিত হইল। উক্ত সময় 'প্রতিভা'র সম্পাদক ছিলেন—ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। পরবর্তী প্রবন্ধের 'দ্রষ্টব্যে' এ সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। 'চোখের বালি' রবীন্দ্র-রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

স্নেহ-অভিমানের লীলা খেলা, মহেন্দ্র আশার বিরোধবিক্ষুব্ধ দাম্পত্য প্রেম, মহেন্দ্র-বিহারীর বন্ধুত্ব ও তাহাদের ক্রমবিপর্যয় ও পুনঃসংস্থাপন, এমন আশ্চর্য নৈপুণ্যের ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সহিত বর্ণিত হইয়াছে যে বাংলাভাষায় ইহার তুলনা মিলা ভার।

ইহার চরিত্রসৃষ্টিও অতুলনীয়। আমরা পৃথক ও বিস্তৃতভাবে এই পুস্তকের চরিত্রগুলির আলোচনা করিব।

মহেন্দ্র: কাঙ্গারু শাবকের মত মাতার অঞ্চলে অঞ্চলেই মহেন্দ্র অনেক দিন ফিরিয়াছে; এবং এমন কি, সেখান হইতে নির্বাসনের ভয়ে বিবাহের প্রস্তাবকেও বড় একটা আমল দেয় নাই। ইহাতে যে তাহার অনাস্বাদিত দাম্পত্য জীবনের একটা রক্তলোলুপ ক্ষুধা গোপনে শাণিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। এই প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়নায় এই সর্বগ্রাসী প্রেম-স্পৃহায় বিবাহের মুহূর্তপর হইতেই সে আশাকে সমস্ত গৃহকর্ম, সংসার, সমাজ ও মাতার সেবা হইতে ছিনাইয়া আনিয়া, শয়ন-ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শিক্ষা দিবার ছলে রাত্রিদিন অবসরহীন দাম্পত্যলীলা চালাইতে লাগিল।—কোথায় রহিল মাতা রাজলক্ষ্মী আর বন্ধু বিহারী, কোথায় রহিল কলিকাতার রাস্তার কর্মপ্রবাহ আর মেডিকেল কলেজের নিয়মিত লেক্‌চার শোনা। লজ্জায় কাকীমা দেশ ছাড়িলেন, অভিমানিনী মাতা পিত্রালয়ে গেলেন, সংসার উৎসন্ন গেল।

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন মিলনরস আর কতদিন সুখ দিয়া থাকে! অতি-সম্ভোগের অবশ্যম্ভাবী ফল, মথিত সুধাসাগরের হলাহল, অবসাদ আসিয়া মহেন্দ্রকে অন্তরে অন্তরে পীড়িত করিতে লাগিল; এমন সময় বিনোদিনী আসিয়া সোনার পাত্রে ভরিয়া যে ফেনোচ্ছল মদিরা তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে ধরিল, অবসাদগ্রস্ত মহেন্দ্র নূতন উত্তেজনার অন্বেষণে তাহা আনন্দে পান করিয়া বসিল এবং ধীরে ধীরে রীতিমত উন্মত্ত হইয়া উঠিল। পাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া, Classic ছাড়িয়া Romantic-এর প্রতি ধাওয়া, মহেন্দ্র-চরিত্রের একটা বিশেষত্ব। আশার প্রতি তাহার প্রেম ও ঘনায়মান এই নবীন উত্তেজনায় যে যুদ্ধ বাধিল, তাহাতে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থাটা এমন হৃদয়-বিদারক হইল যে, অতিবড় পাষাণেরও হৃদয় বেদনামন্থনে ক্লিষ্ট ও জমাট-অশ্রুভারে পিষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিল না। পতন তো অনেকেরই হয়, এবং পৃথিবীতে পতিতকে ঘৃণা

করিতে কুঞ্চিত-নাসা নীতি-ব্যবসায়ীরও যখন অভাব নাই, তখন আমরাই না হয় দুই এক জনে একটু উন্নত হৃদয়ের পরিচয়স্বরূপ, মহেন্দ্রের এই অন্তর্যুদ্ধের সম্মান রক্ষার জন্য তাহার প্রতি সামান্য এই একটু দয়া প্রকাশই করিলাম। অবশ্য জানি, মহেন্দ্রের পরবর্তী নগ্ন দুর্বলতা ও তাহার চরিত্রের বিসদৃশ লজ্জাজনকতা আমাদের এই দয়াটুকুরও দাবী তেমন ভাবে করিতে পারে না। কিন্তু মহেন্দ্র-চরিত্র গোবিন্দলালের মত একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। কবি অতি বড় মানসিক দুরবস্থার সময়েও তাহাকে বিনোদিনীর প্রতি কিছুমাত্র জোর প্রকাশ করিতে দেন নাই, এবং দূরে দূরে রাখিয়া বিনাশের হস্ত হইতে তাহার চরিত্রের মর্মগত সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। এই সম্মানের বলেই মহেন্দ্র তাহার আশার নিকট পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছিল এবং অপমানের কয়েকটা লজ্জা-মলিন দিবসের স্মৃতিকে বক্ষ হইতে মুছিয়া ফেলিয়া সেই বুকেই আবার তাহার হৃদয়ের লতাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিতে পারিয়াছিল।

আশা ঃ মহেন্দ্রের মেয়ে দেখা ব্যাপারে আশাকে যখন আমরা প্রথম দেখিতে পাই, তখনি সে তাহার লজ্জা সঙ্কোচ ও স্নিগ্ধতা, মুদিত পদ্মের মত তাহার কুমারী-হৃদয়ের মর্মকোষটির ভিতর অপর্যাপ্ত প্রেমসম্ভার ও ভবিষ্যৎ সতী-মাহাত্ম্য বহন করিয়া, আমাদের নয়নে ও মনে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর আশা ও মহেন্দ্রের বিবাহ হইল; আশা নির্বিচারে নির্বিরোধে হিন্দু-কুললক্ষ্মীর স্বভাবধর্মের অনুপ্রাণতায় স্বামীকে দেবতার মত ভক্তি ও মানবীয় স্বামীর মত ভালবাসা দিতে লাগিল; এবং নবীন দাম্পত্য জীবনে এই প্রেম-মুগ্ধ অবসর-লীলার দিনে সংসার-ধর্মকে বঞ্চিত করিয়া স্বামীর মনোরঞ্জন করিতে ত্রুটি করিল না।

আশার জীবনের প্রথম স্তরে তাহার নিরবচ্ছিন্ন সুখ, দ্বিতীয় স্তরে সুখ-দুঃখের মিশ্রণ, তৃতীয় স্তরে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ। কিন্তু আশা-চরিত্রের মধ্যে এই দুঃখের প্রয়োজন আছে। অতি সুকুমার স্নিগ্ধপেলবা আশা সোহাগের বাতাসে এবং প্রেমতাপের চুম্বন-মদিরায় ঢুলিয়া গলিয়া, যখন আর বৃন্তবন্ধন ধরিয়া থাকিতে পারিল না,—তখন দুঃখ তাহাকে আপন কোলে ঠাঁই দিল, এবং তাহার চরিত্রের ফলিবার দিন আসিল। শারীরিক বাবুয়ানার মত মানসিক দুঃখের একটা সংসার-বিমুক্ত বাবুয়ানা আছে; আশাকে তাহারও

অবসর দেওয়া হইল না। এক মুহূর্তে রাজলক্ষ্মীর পীড়ার ছল করিয়া উপবাস-ক্ষুধিত সংসার সেবা-কর্মের দাবী করিয়া তাহার চারিদিকে আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। একটা লজ্জাহীন অপমান অনুতাপে তাহার হৃদয় পিষ্ট হইতে লাগিল। হৃদয়ের একটি বৃত্তিকে বেশী মাত্রায় খাদ্য যোগাইতে গিয়া অন্য সকলকে সে যে দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর ঘরে আনিয়া ফেলিয়াছে, এক মুহূর্তে সেই নিষ্ঠুর সত্য তাহার চক্ষে ফুটিয়া উঠিল। কোথায় রহিল আর দুঃখ-চিন্তার অবসর! রাজলক্ষ্মীর সেবা এবং ঘরকন্নার বিরামহীন কাজ চলিতে লাগিল। একত্রবাসের মধ্যেও এতদিন যে একটা অপরিচয় রহিয়া গিয়াছিল, সম-দুঃখিতা মাতা এবং বধূর মধ্যে নিমেষে তাহা ঘুচিয়া গেল; মৌনা রাজলক্ষ্মীর পদতলে মৌন আশা তাহার আপন স্থানটি জুড়িয়া বসিল।

আশার কৃচ্ছ্রসাধনে এবং নীরব সতীত্ব-গৌরবে মহেন্দ্রকে একদিন ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল, এবং তাহাদের দুইজনের আবার মিলন হইয়াছিল। সেই সময় আশার কথায় এবং ব্যবহারে তাহার চরিত্রের যে দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা অতি সুন্দর এবং আনন্দ-জনক।

প্রথমে আশাকে দুর্বলা বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে তাহাকে আশ্চর্য নৈপুণ্যের সহিত দৃঢ়চিত্তা করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছেন। আশা-চরিত্রের এই যে ক্রম-বিকাশের সৌন্দর্য, ইহা সূর্যমুখী, ভ্রমরেও নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। মনে হয় আশা-চরিত্র এই জন্যই আমাদিগকে বেশীমাত্রায় আনন্দ ও শিক্ষা দান করে।

বিনোদিনী: এক হিসাবে এই আখ্যায়িকার শ্রেষ্ঠ চরিত্র বিনোদিনী। এমন কি সেই হিসাবে সমগ্র বাঙ্গালা কথা-সাহিত্যেও ইহাকে শ্রেষ্ঠ চরিত্র বলা যায়। বিনোদিনীর মত এমন বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্না, 'Intellectual' চরিত্র সৃষ্টি রবীন্দ্র আর করেন নাই। এই চরিতাঙ্কন এই গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল, নিপুণ ও আনন্দপ্রদ। বিনোদিনী পৃথিবীর বর্তমান জটিল যুগের একটি প্রতিনিধি জীব। বিলাস-চাঞ্চল্য ও ভোগবৈরাগ্য, হাবভাব ও প্রকৃত প্রেমিকতা, নিষ্ঠুরতা ও কোমলতা, উদ্দীপ্ত ভীষণতা ও পেলব নমনীয়তা, বিদেশীয় উচ্ছৃঙ্খল কক্ষচ্যুতি ও হিন্দু কুললক্ষ্মীর সংসার-স্থিতি, হালছাড়া ভাব ও বলিষ্ঠ দৃঢ়তা, এই বিরোধগুলি তাহার চরিত্রে একসঙ্গে গায় গায় লাগিয়া আছে। এত বিচিত্র ও বিরুদ্ধ উপকরণের মিশ্রণে এবং জীবনের সহিত এত স্বাভাবিক অথচ অনতিদূর

সংস্পর্শ রাখিয়া রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনী-চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন যে, ইহাতে তাঁহার আশ্চর্য এবং অতুলনীয় নৈপুণ্যের প্রকাশ পাইয়াছে ; এবং গ্রন্থশেষে ইহাকে একটা কল্যাণের সমন্বয় প্রদান করাতে তাঁহারই উপযুক্ত চরিত্র-চিত্ররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

জঙ্গলাকীর্ণ স্যাঁতসেঁতে অপরিষ্কার পল্লীভবনে উজ্জ্বলবর্ণা বিধবা বিনোদিনী—বঙ্কিম ও দীনবন্ধুর গ্রন্থরসিকা ও অক্লান্ত সেবাপরায়ণা। শহরের ছেলে বিহারীর সঙ্গে তাহার দেখা হইল ; অমনি তাহার সস্নেহ সেবাহস্ত বিহারীর দিকে অগ্রসর হইল, এবং তাহার চিত্ত এই সেবাপরায়ণতার সুযোগ পাইয়া যেন একটু উৎফুল্লই হইয়া উঠিল। যেই তাহার এই মূর্তি দেখিলাম, তার পর মুহূর্তেই আশার প্রতি মহেন্দ্রের প্রেমব্যঞ্জক এক লিপি হাতে পড়ায় রঙ্গ-ভূমিতে বিনোদিনীর আর এক মূর্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িল ;—তাহা একটু ঈর্ষাপরায়ণা। বিনোদিনী ভাবিল, আশার এত সুখ! সবই ত আমার জন্যই সঞ্চিত ছিল? মহেন্দ্রের সঙ্গে আমারই বিবাহ হইবার কথা ছিল।—সে মূর্তি একটু ভীষণাও বটে। কারণ তাহাতে একটু প্রলয়ের রুদ্রতা আছে। এই জায়গায়ই বিনোদিনী-চরিত্রে মহেন্দ্র ও আশার সর্বনাশের বীজের বপন হইয়া গেল।

বিনোদিনী কলিকাতায় মহেন্দ্রের বাড়ীতে আসিল। ধীরে ধীরে মহেন্দ্রের অন্তরঙ্গ হইয়া, সঙ্গ এবং সেবায় ও বিলাসব্যঞ্জক হাবভাবে 'সুন্দর পাপের' মত তাহাকে উজ্জ্বল রঙীন চ্যুতির পথে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু বিনোদিনীর স্বপক্ষে এই কথা বলিতে হইবে, তাহার হাবভাব ও লীলাচাঞ্চল্য প্রথমে একেবারে বিসদৃশ হইয়া প্রকাশ পায় নাই ; তাহার চরিত্রের একটা নিয়ত-সপ্রকাশ সংযম তাহাকে একান্ত বিসদৃশতার হাত হইতে বরাবর রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু তাহার এই বিকাশ এবং সংযম, এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, ইহা দ্বারাই মহেন্দ্র আরও বেশী মুগ্ধ হইয়া পড়িল ; এবং যে একেবারে ধরা দিয়াছে তাহাকে ছাড়িয়া, যে ধরা দেয় অথচ ছাড়িয়া যায়, তাহারি পশ্চাতে তাহার হৃদয় ঘোড়দৌড় করিয়া ফিরিতে লাগিল। বিনোদিনী মহেন্দ্রের ক্রমপতনে একটা আনন্দ অনুভব করিল, এবং সে মহেন্দ্রকে ভালবাসে ইঙ্গিতে তাহা বুঝাইল ; এমন কি, নিজেকেও এই বিশ্বাসে ভুলাইতে ছাড়িল না। কিন্তু প্রকৃত কথা, সে মহেন্দ্রকে কখনো ভালবাসে নাই ; এ আনন্দ তাহার প্রেমানুভূতির আনন্দ

নহে; তাহার সুখের অন্তরায় আশার সুখনীড়ে তাহার চির-উপবাসী ক্ষুধিত হৃদয় হইতে উদ্গীরিত অনল ধরাইয়া দিবারই এ আনন্দ। ইহাতে তীব্রতা আছে, মোহবিভ্রম আছে, কিন্তু প্রেম নাই।

আদরের নামে আর কুলাইয়া উঠে না বলিয়া বিনোদিনী ও আশা একদিন 'চোখের বালি' পাতিয়াছিল—ইহার গৌণ আদরের অর্থ চাপা পড়িয়া গিয়া, একদিন যে মুখ্যটাই প্রকাশিত হইয়া উঠিবে, অদৃষ্টের এই সহাস্য নিষ্ঠুর পরিহাস বুঝি বিনোদিনীও প্রথমটা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। বিনোদিনী এতদিন খেলার ছলে মাটি খুঁড়িয়াছে; কিন্তু আজ তাহাতে যখন রক্ত লেলিহান রসনা মেলিয়া একটা দুরন্ত সরীসৃপ মাথা জাগাইয়া বসিল, তখন সে সহসা স্তম্ভিত হইয়া গেল, এবং পরমুহূর্তেই খেলা সংবরণ করিয়া আত্ম-রক্ষার জন্য রঙ্গভূমি হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। তারপর মহেন্দ্র বহুদিন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়াছে। বিনোদিনী তাহার প্রবৃত্তিকে কিছুমাত্র প্রশ্রয় না দিয়া সর্বপ্রযত্নে তাহাকে এই পাপের পথ হইতে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছে। এইখানেই তাহার জীবনের 'দানবী পালার' অন্তর্ধান, এবং মানবী ও দেবী পালার অভ্যুদয়।

কিন্তু বিনোদিনী-চরিত্রের প্রথম অঙ্কই আমরা এক দিক দিয়াই মাত্র দেখিয়াছি—তাহা মহেন্দ্র-বিনোদিনীর সম্বন্ধ। এটা বিনোদিনীর নিকৃষ্ট দিক, মূল চরিত্রের ভিত্তির সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক নাই; ইহা তাহার চরিত্রের উপর দিয়া স্রোতের শৈবালের মত ভাসিয়া গিয়াছে। যাহা বরাবর ছিল এবং এখন আরো উজ্জ্বল বাধাবিমুক্ত হইয়া চিরস্থায়ীরূপে দেখা দিয়াছে; তাহা তাহার প্রকৃত প্রেমের দিক, তাহা বিহারী-বিনোদিনীর সম্বন্ধ।

প্রথম সাক্ষাতেই যে তাহাদের ভালবাসা জন্মিয়াছিল তাহা নহে; কিন্তু সেই সময়েই যে উভয়ের প্রতি উভয়ের একটা শ্রদ্ধা জন্মিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। বিনোদিনীর কলিকাতা-বাসে তাহাদের এই পরস্পর শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছিল। মহেন্দ্রের সহিত বিলাসখেলার সঙ্গে সঙ্গে বিহারীর মত শ্রেষ্ঠতর চরিত্রের প্রতি তাহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি বিনোদিনী-চরিত্রের একটা গোপন অথচ সত্য দিক প্রকাশ করে মাত্র। তাহার এই মহত্ত্বের উদ্বোধনে তাহার প্রতি বিহারীর শ্রদ্ধা কাজ করিয়াছিল খুব বেশী। বিহারীর নিকট হইতে সে যে 'পূজার অর্ঘ্য' পাইয়াছিল, তাহার প্রতিদান-স্বরূপ

বিনোদিনী বিহারীকে প্রকাশ্যভাবে তাহার হৃদয়ের 'স্বর্গসুধা' অর্পণ করিল, বিহারীর নিকট তাহার প্রেম নিবেদন করিল। তারপর আরম্ভ হইল বিনোদিনীর বেদনা ও তপশ্চর্যা, আহার-কৃচ্ছ্রতা ও সর্বপ্রকার বিলাস-বিভব হইতে তাহার আনন্দ-মুক্তি।

বিহারী এই উপন্যাসের কষ্টিপাথর। তাহারই হৃদয়ের মহত্ত্ব ও বিচার-শক্তির মাপকাঠি দিয়া এই গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্রের পরিমাপ করিতে হয়। কোন্ জায়গায় কোন্ চরিত্র সত্য পথ হইতে চ্যুত হইতেছে, এবং কোন্ জায়গায় তাহাতে সত্যের প্রকাশ ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা আমরা বিহারীর হৃদয়ের ভিতর দিয়া জানিতে পারি। তাহার চরিত্র-ভিত্তি সত্য ও মহত্ত্বের সুদৃঢ়তায় প্রতিষ্ঠিত; সে চ্যুতিকে আপনার সত্য ও ন্যায়ের বজ্রকণ্ঠে ভর্ৎসনা করিতে কুণ্ঠিত নহে।

আমরা এই বজ্রসুকঠিন বিধাতা বিহারীকে দেখিয়াছি। কিন্তু এই বজ্র-সুকঠিনতার ভিতরই তাহার সমস্ত নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই, তাহার এই কাঠিন্য বাঙ্গালী জীবনের বিচিত্র সম্বন্ধের কোমলতাকে তাহার হৃদয়ে চাপা দিতে পারে নাই। এই কাঠিন্য সংসারবিরোধী puritanic কাঠিন্য নহে; বরং সংসারকে স্বর্গের পথে লইয়া যাইবার একটা উপায়মাত্র। এই বিধাতা বিহারীর সঙ্গে সঙ্গে আমরা হাস্যরসিক বিহারীকে, পুস্তকের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বিচিত্র বিরোধ ও বন্ধুত্বের শোচনীয় পরিণামের ভিতর দিয়া মহেন্দ্রের বন্ধু বিহারীকে, মহেন্দ্রের মাতা রাজলক্ষ্মীর পুত্রস্থানীয় মাতৃহীন স্নেহ-অভিমান-পূর্ণ আব্দারী বিহারীকে, শিক্ষা-সংস্কারক লোকহিতকর-কার্যানুষ্ঠানরত রবীন্দ্র-নাথের অঙ্কুর বিহারীকে এবং সর্বোপরি প্রেমিক বিহারীকে, ও দেবী অন্নপূর্ণার নিকট স্নেহে এবং ভক্তিতে সন্নত সন্তান ও ভক্ত বিহারীকে দেখিয়াছি। এতগুলি বিচিত্র উপকরণ ও রসধাতুর সংমিশ্রণে বিহারী-চরিত্র সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই তাহা আমাদিগকে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

আর দুইটি চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিতে বাকী আছে—রাজলক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণা। একটি বাঙ্গালী পরিবারের সংসারাসক্তা গৃহিণী ও মাতা; আর একটি, সংসারবিমুক্তা ভগবৎ-পরায়ণা বিধবা রমণী; দুইটি দুই বিভিন্ন ছাঁচের প্রতিনিধি-চরিত্র।

রাজলক্ষ্মী : বাঙ্গালী মাতারই ন্যায় পুত্রের প্রতি স্নেহশীলা, অন্য কেহ তাঁহার পুত্রকে তাহা হইতে বেশী ভালবাসিবার দাবী করিবে, অথবা পুত্র মাতাকে

ডিঙাইয়া অন্য কাহাকেও ভক্তি ও ভালবাসা বিতরণ করিবে, অর্থাৎ কেহ আসিয়া তাঁহার ও তাঁহার পুত্রের পরস্পর স্নেহের মাঝে দাঁড়াইবে, ইহা তিনি মোটেই সহ্য করিতে পারেন না। এই সম্বন্ধে তিনি ভয়ানক খুঁতখুঁতে ও অভিমানিনী। অন্নপূর্ণার মধ্যস্থতায় প্রতিহত হইয়া তাঁহার পুত্রস্নেহ যে স্নেহা-ভিমানে পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা এক সময়েই অশ্রু এবং হাস্যরসে সিক্ত; অশ্রুসিক্ত রাজলক্ষ্মীর পক্ষে, এবং তাঁহার এই বেদনা নিতান্তই অমূলক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া—হাস্যসিক্ত পাঠকের পক্ষে। রাজলক্ষ্মী স্নেহশীলা; পরের ছেলে বিহারীকেও আপন ছেলের মতন ভালবাসিতে জানেন। তিনি দয়াবতী; বিধবা বিনোদিনীকেও আপন বাড়ীতে নিজের ঘরের লোকের মত করিয়া রাখিতে কিছুমাত্র পরাঙ্মুখ নহেন। তিনি অন্নপূর্ণাকে প্রথমে প্রতিদ্বন্দ্বীর মত দেখিতেন, এবং তাঁহার সঙ্গে শক্রর মত অত্যন্ত তীব্র-কঠোরভাবে আচরণ করিতেন; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব হইতেই দেখিতে পাই, তাঁহার এই চিরসহচরী 'জা'টির প্রতি তাঁহার বদ্ধমূল ভালবাসা কেমনে তাহাতে ফিরিয়া আসিয়াছে, এবং মৃত্যুর আগের সেই সর্বমিলনদৃশ্যে তিনি ভক্তি ও ভগবৎ-পরায়ণা অন্নপূর্ণার নিকট আপনাকে কেমন খাটো মনে করিতেছেন। সেই অশ্রু-সকরুণ দৃশ্যটিতে যখন ক্ষমা ও স্নেহমণ্ডিতা রাজলক্ষ্মী সকলের সঙ্গেই পৃথিবীর এপারে শেষ বারের জন্য মিলিত হইলেন, তখন তাঁহার পরিবারের শান্তিসুখ বিনাশের যে মূল কারণ সেই বিনোদিনীকেও উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

অন্নপূর্ণা: রাজলক্ষ্মীর মত একেবারে সংসারে সম্পূর্ণ ডুবিয়া না থাকিলেও, সাংসারিক সুখদুঃখ তাঁহার চিত্তকে যে এখনো একেবারেই স্পর্শ করে না তাহা নহে, তাঁহার অনন্ত সাগরযাত্রার পূর্বে আমরা দেখি, ঘাটের সহিত তাঁহার অনেকগুলি বাঁধন ছিঁড়িয়া গেলেও দুটি একটি এখনো বর্তমান;—মহেন্দ্র, বিহারী এবং সর্বোপরি, আশার সংসারস্থিতি দেখিয়া লইবার অভিলাষই তাঁহার ঘাটের সহিত শেষ বন্ধন। গ্রন্থের প্রথম হইতেই নানা বিরুদ্ধ বিচিত্র ঘটনাপরম্পরায় আমরা তাঁহার হৃদয়ের এই সংসারবন্ধন ও ঈশ্বরের প্রতি প্রবল আকর্ষণের একটা অন্তর্যুদ্ধ দেখিতে পাই। দেখিতে পাই, অন্নপূর্ণা কাশী গিয়াও কেমন মহেন্দ্র, বিহারী ও আশার চিন্তা হইতে বিরত থাকিতে পারেন নাই; দেখিতে পাই মহেন্দ্র, আশা ও বিহারী একে একে কাশী গিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের চিন্তায় ভাবিত করিয়া দিয়া তাঁহার একনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক

চিন্তাকে কেমনে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে ও কেমনে তিনি শেষ বন্ধন ছিঁড়িয়া তাহারই প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া রাজলক্ষ্মীর গৃহকেন্দ্রে পুনরায় আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। যে বন্ধন গ্রন্থের প্রথম হইতেই ছিঁড়িবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল গ্রন্থের শেষে তাহা ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

ইতিপূর্বে বিহারীকে এই উপন্যাসের কষ্টিপাথর বলিয়াছি; কিন্তু অন্নপূর্ণা সম্বন্ধে একথা খাটে আরো বেশী, বিহারীর বিচারশক্তি অনেকটা খণ্ডিত; তাহা বিচার্য চরিত্রের সাময়িক মানসিক বিশেষত্ব কার্যকলাপে নির্ভর করিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে, কাজেই তাহা পরিণত নহে। কিন্তু আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা পরিপুষ্ট অন্নপূর্ণার বিচারশক্তিকে পরিণত বলা চলে।

মানব-চরিত্রের বিচার-শক্তির সহিত অন্নপূর্ণাতে পরীক্ষার কাঠিন্যও আছে; তাহা কাশীতে এক রাত্রের এক নিমেষের একটি 'বিহারী' উচ্চারণে আমরা দেখিয়াছি, এই বিচার-শক্তি ও এই পরীক্ষার বজ্র-কাঠিন্য, বিহারী এবং অন্নপূর্ণা চরিত্র—উভয়েই এ দুটি বর্তমান; ইহাতেই এই দুই চরিত্রের সাদৃশ্য, আবার বৈসাদৃশ্যও এইখানেই! বিহারী মহৎ চরিত্র, অন্নপূর্ণা আধ্যাত্মিক চরিত্র। মহৎ চরিত্রে যাহা থাকে, আধ্যাত্মিকে তাহাই পরিণত আকারে থাকে; কারণ মহত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতায় কোনো মূলগত পার্থক্য নাই; আধ্যাত্মিকতা মহত্ত্বের পরিণত সংস্করণ।

'চোখের বালি'র বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ কোনো কোনো দিক হইতে শোনা যায় না এমন নহে, যাহারা বিলাতী কুরুচিপূর্ণ গ্রন্থাবলী বিনা প্রতিবাদে গলাধঃকরণ করিয়া বসেন তাঁহাদেরই নিকট হইতে এই অভিযোগ শুনিলে আরো আশ্চর্য হইতে হয়।

দেহ ও মন (আত্মা বলিলাম না) লইয়াই মানব; ভোগচাঞ্চল্য-মানসত্তা লইয়াই মানবীয় ব্যাপার। কাজেই মানবীয় ব্যাপারের বর্ণনায় ভোগচাঞ্চল্যের কথা থাকিবেই। তবে এই ভোগচাঞ্চল্য যখন অন্য সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া উদগ্রভাবে আপনি প্রকাশিত হইয়া উঠে, তখনই তাহা অশ্লীল হইয়া যায়, কিন্তু তাহার নিজের সীমার ভিতর তাহারও একটা ন্যায্য অধিকারের দাবী আছে। 'চোখের বালি'তে সামাজিক হিসাবে এই ভোগচাঞ্চল্য তাহার সীমা লঙ্ঘন করে নাই, তাহা বলি না; কিন্তু সাহিত্যনীতির হিসাবে করে নাই

তাহা নিশ্চয়। আমি বলিতে চাই, 'চোখের বালি'তে এই ভোগচাঞ্চল্য একান্ত হইয়া উঠে নাই। মহেন্দ্র-বিনোদিনীকে, বিহারী অন্নপূর্ণা পুস্তকের প্রথম হইতেই বিধৃত করিয়া রাখিয়াছেন এবং অন্নপূর্ণারই হৃদয়ের মঙ্গলময়তায় পুস্তকের পর্যবসান হইয়াছে। হৃদয়ের বিশেষ বিশেষ বৃত্তি মহেন্দ্র বিনোদিনীতে পরিস্ফুট হওয়া সত্ত্বেও বিহারী অন্নপূর্ণাতে সেই হৃদয়েরই শ্রেষ্ঠত্বের বৃত্তিগুলি পরিস্ফুট হইবার অবসর পাইয়াছে। 'চোখের বালি'র ভোগচাঞ্চল্যের বিসদৃশভাব না থাকিবার ইহাই একটি প্রধান কারণ। বিনোদিনীকে নিয়াই তো এই পুস্তকের বিলাস ব্যাপার। কিন্তু এই বিনোদিনী চরিত্রেই দ্বিতীয় কারণ বর্তমান। বিনোদিনীর মহত্ত্ব প্রথম হইতেই আমাদের নিকট প্রকাশ পাইয়াছে; কাজেই তাহার কোন সাময়িক ব্যবহারেই নিরুপায় ভাবে আমরা সেই দিকেই হেলিয়া পড়িতে পারি না; বিশেষতঃ তাহার সেই সাময়িক ব্যবহারও বরাবর সংযম দ্বারা বিধৃত।

বিনোদিনীর ব্যবহার জায়গায় জায়গায় বিলাস-ব্যঞ্জক হইলেও অশ্লীল নহে। একদিন যখন ভারে অবনতা বিনোদিনীর মস্তকের কেশগুচ্ছ মহেন্দ্রের ললাট স্পর্শ করিয়া ফেলিয়াছিল, তখন আমরা বিনোদিনীর দৌর্বল্য দেখিয়াছিলাম;—কিন্তু কবি মহেন্দ্রকে অমনি সতর্ক করিয়া দিয়া আমাদিগকে অশ্লীলতার হাত হইতে বাঁচাইয়াছেন, বিনোদিনী বিহারীর অসমাপ্ত চুম্বন দৃশ্যকেও অশ্লীল বলিতে পারি না; কারণ ইহাতে অশ্লীলতানিরাকরণকারী মস্ত একটা গুণ রহিয়াছে;—তাহা বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর আন্তরিক প্রেম।

আপাতদৃষ্টিতে 'চোখের বালি'র অশ্লীলতা যদি কোথায়ও থাকিয়া থাকে, তবে তাহা চরিত্রের নগ্ন বিশ্লেষণে। আপাতদৃষ্টিতে বলিলাম; কারণ, একটু তলাইয়া দেখিলেই আমরা দেখিতে পাই যে, মহেন্দ্রের ভোগব্যাপার তাহার নিজের পক্ষে শারীরিক হইলেও লেখক পাঠকের পক্ষে তাহা শারীরিকতাতেই পর্যবসিত হয় নাই, বরং সম্পূর্ণভাবে মানস। শারীরিকতা শুধু মানসতা-প্রতিপাদনেরই উপায়মাত্র।

মহেন্দ্র চরিত্র একটা কার্যকারণ-সম্বন্ধের সূত্রেই আমরা অনুসরণ করিয়া থাকি; তাহার চরিত্রের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা মনস্তত্ত্বই আলোচিত হইয়াছে দেখিতে পাই। দেখিতে পাই, বিবাহের অনিচ্ছা কেমন অতি-ভোগে ডুবিয়া গেল, অতিভোগ কেমন তার অবশ্যম্ভাবী ফল অবসাদে জড়িমাবদ্ধ

হইয়া আসিল এবং এই অবসাদ কেমন আবার জড়তার বেড়ী ভাঙিয়া অস্বাভাবিক উত্তেজনায় ফেনোচ্ছল হইয়া উঠিল। মহেন্দ্র-চরিত্রের এই পর্যায়-গুলি আকস্মিক নহে বরং মনস্তত্ত্বমূলক; কাজেই অবশ্যম্ভাবী। মহেন্দ্র-চরিত্রে যিনি এই psychological interest-এর আস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহার নিকট এই শারীরিক ব্যাপারটা নিতান্তই তুচ্ছ এবং খাটো। ইহা শেষ নয়, শুধু একটা উপায়মাত্র; কাজেই কোনো বিচক্ষণ পাঠকের নিকট তাহা একান্ত না হইয়া যবনিকা অন্তরালে সরিয়া যাইতে বাধ্য।

চোখের বালি

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

যে বঙ্গদর্শনের বক্ষে একদিন বঙ্কিমবাবুর বাঙ্গালা ভাষার সুবিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠতম নবেল 'বিষবৃক্ষ' ও 'চন্দ্রশেখর' প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেই আজ রবিবাবুর 'চোখের বালি' বাহির হইতেছে। কর্তব্যানুরোধে এ বালি ঘাঁটিবার কর্মভোগ যখন আমাদের করিতে হইয়াছে, তখন তাহার উপযুক্ত আলোচনা অবশ্যই হইবে। কিন্তু আজ নয়, কয়েকদিন পরে। আপাততঃ মোটের উপর এই বক্তব্য যে, রবিবাবু নির্ভীক স্বরে যে ভীরুতা, রুচিভ্রংশ, সত্যের অপলাপ ও সর্বপ্রকার সাহিত্যনীতির শৈথিল্য তাঁহার ও তদীয় বঙ্গদর্শনের পক্ষে 'অমার্জনীয়' প্রচার করিয়া তাহাদের সংস্পর্শ-বিরহিত হইতে প্রথমেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, সেই ভীরুতা, সেই রুচিভ্রংশ, সেই সত্যের অপলাপ এবং সেই সর্বপ্রকার সাহিত্য-নীতির শৈথিল্য ষড়যন্ত্রে একজোট হইয়া তাঁহার এই কুৎসিত আখ্যানের আরম্ভ হইতে উপস্থিত অধ্যায় পর্যন্ত পূর্ণগ্রাস করিয়াছে। ইহার প্লট এবং নায়িকার নাম ও চরিত্রটি অপরের লিখিত ও অব্যবহিত পূর্বে প্রকাশিত এবং রবিবাবুর বঙ্গদর্শনের এই প্রথম সংখ্যাতেই সমালোচিত একটি নবেলেরও নয়—'টেলের' প্লট ও নায়ক নায়িকা চরিত্রের অবিকল অনুকৃতি ;—সর্বত্রই একই আত্মায় উভয়ের একই রূপ গতি, এবং স্থানে স্থানে, এমন কি, একই শরীরের স্থিতি। সরল ভাবেই বলিতেছি, রবিবাবু অজ্ঞাতে এই গলিত পঙ্কময় প্রমাদে পড়িয়া থাকিবেন। নিশ্চয়ই অজ্ঞাতে তিনি ইহা করিয়া বসিয়াছেন, নহিলে জানিয়া শুনিয়া এমনতর কাজে কেহই প্রবৃত্ত হইতে পারে না। এ ব্যাপারট

দ্রষ্টব্য : সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত 'নব বঙ্গদর্শন' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে 'চোখের বালি' সম্পর্কিত এই আলোচনামূলক অংশটি উদ্ধৃত। 'নব বঙ্গদর্শন' নিবন্ধটির একটি ইতিহাস আছে। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের চারি বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ পত্রিকার সম্পাদনা-ভার মুক্ত হইলে তাঁহার অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক হন। সঞ্জীবচন্দ্রের পরে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও চন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদকতায় কিছুকাল প্রকাশিত হইবার পর 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হইয়া যায়। আঠারো বছর পরে ১৩০৮ সালে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদকত্বে নব পর্যায়ে 'নব বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়

কেবল বর্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের নয়, সমগ্র সাহিত্য সংসারের একটা অতি বিস্ময়কর ও রহস্যময় সুসদৃশ ঘটনা। চোখের বালি সম্বন্ধে আমরা যাহাকিছু বলিলাম, তাহা উহার আলোচনাকালে আমরা অক্ষরে অক্ষরেই দেখাইয়া দিব, এবং তৎকালে উক্ত বিস্ময়কর রহস্যের আমরা যে মীমাংসা করিয়াছি, তাহাও সবিস্তারে বলিব।[১] তখনই তিনি সম্ভবতঃ বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা তাঁহার সরল ও বেদনাহীন কঠিন সমালোচক হইলেও, তাঁহার শত্রু ও নিন্দুক নহি।

তা, যাহাই হউক, আমরা বলিতেছি ও আমাদের অত্যল্প আলোকানুসারে অবশ্যই বরাবর বলিব যে, রবিবাবু এতবড় লম্বা ও এমনতর কুৎসিত উপন্যাসে হাত দিয়া একেবারেই ভাল করেন নাই। ভগবান তাঁহাকে যে শক্তি দিয়াছেন, তাহা এরূপ কার্যের আদৌ উপযোগী নহে। শক্তির প্রকৃত পরিণাম ও প্রকৃতিটা ঠাওর না করিয়া ও তাহার পরিধিটাকে সর্বদিকস্পর্শী ভাবিয়া ইদানীং তিনি অনবরত তাহার অপব্যবহার ও অপচয় দ্বারা প্রায় প্রতিদিনই তাহাকে ধূল্যবলুণ্ঠিত করিতেছেন।

সে-যুগে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ সমালোচকদের অন্যতম ছিলেন 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। যদিও তিনি রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী ছিলেন, তথাপি তাঁহার প্রতিকূল সমালোচনাতেও তিনি ছিলেন অগ্রণী। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে দুর্নীতির বীজ ছড়াইতেছেন, ইহাই ছিল তাঁহার প্রধান অভিযোগ। তিনি নিজেই যে শুধু 'চোখের বালি' সম্বন্ধে প্রতিকূল মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার অনুরোধে যতীন্দ্রমোহন সিংহ 'সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা' নামক প্রবন্ধ লেখেন। ইহা ১৩২৭ সালের 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হওয়ার পূর্বেই সমাজপতি পরলোকগমন করেন। যতীন্দ্রমোহনের প্রবন্ধটিতে চোখের বালি, গোরা, ঘরে বাইরে নামক তিনটি উপন্যাস ও 'নষ্টনীড়' নামক একটি গল্প সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা আছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি শরৎচন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধার কথা সর্বজন সুবিদিত। তিনি তাঁহাকে অন্তরে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন যে, একমাত্র বেদব্যাস ব্যতীত এত বড় কবি আর আমাদের দেশে জন্মান নাই। ১৩৩৮ সালের পৌষ মাসে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিরূপে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে ভাষণ দেন, তাহাতে বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের রচনার সহিত কি করিয়া তাঁহার পরিচয় হয়, সেই প্রসঙ্গে 'চোখের বালি' সম্পর্কে তিনি বলেন—

…"বঙ্গদর্শনের নব পর্যায়ের যুগ। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' তখন

১। 'চোখের বালি' সম্বন্ধে সমাজপতির আর কোনো আলোচনা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং বইখানির 'রহস্য' সম্বন্ধে তাঁহার 'মীমাংসা' পাঠকদের অজ্ঞাতই থাকিয়া গিয়াছে।

'চোখের বালি' যে বইখানিরং অবিকল অনুকৃতিবৎ, তাহার নাতিহ্রস্ব ও কিঞ্চিদতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত সমালোচনা স্বয়ং মুখোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর নব-দর্শনের প্রথম সংখ্যাতেই করিয়াছেন। অপ্রিয় সত্যোৎঘাটন ও বিকৃতি-বিশ্লেষণে ন্যায়তঃ বাধ্য বিচারক ও সমালোচকের অনুপযুক্ত ও অতিরিক্ত সদয় দৃষ্টিতে দেখিয়াও দোষজ্ঞাপন অপেক্ষা গুণকীর্তনে অধিকতর অভিলাষী মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনতিক্রমণীয় কর্তব্যের অনুরোধে, যেন একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিতান্ত বাধ্য হইয়াই বলিতেছেন ;—"* * * ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডচিত্র অঙ্কিত করিতে পারা এক ; ক্ষুদ্র চিত্রগুলিকে অন্তর্গত করিয়া একটা বিশাল চিত্রপট আঁকা আর। পাঁচকড়িবাবু প্রথমোক্ত রকমে কৃতকার্য ; দ্বিতীয়োক্ত রকমে ব্যর্থপ্রয়াস ! * * * এই উপন্যাসের মুখ্য চিত্র উমাকেই দেখ। উমা একটি আস্ত জীবন্ত মানুষ হয় নাই—একটি রক্তমাংসের বেদান্তদর্শন হইয়াছে মাত্র। * * * পাঁচকড়ি-বাবু স্বর্গের চিত্রই আঁকিতে গিয়াছিলেন, আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, তাহা নরকের চিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে পাপচিত্র পাঁচকড়িবাবু আঁকিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য কি ? কেবল কি পাপচিত্র আঁকিবার জন্যই পাপচিত্র আঁকা ?"

নূতন লেখক পাঁচকড়িবাবুর সম্বন্ধেই যখন ইহা অতি সদয় ও মৃদু মন্তব্য,

ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়ল। সে দিনের সে গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোন দিন ভুলব না। কোন কিছু যে এমন ক'রে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্বে কখন স্বপ্নেও ভাবিনি এতদিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলুম। অনেক পড়লেই যে তবে অনেক পাওয়া যায়, এ কথা সত্য নয়। ওই তো খানকয়েক পাতা তার মধ্য দিয়ে যিনি এত বড় সম্পদ সেদিন আমাদের হাতে পৌঁছে দিলেন, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায় ?"

২। 'চোখের বালি' নব পর্যায় বঙ্গদর্শনে বাহির হইবার আগে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উমা' নামক একখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' প্রণেতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় নব বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যাতেই উপন্যাসখানির সমালোচনা করেন। ইহাতে বিধবার প্রেমের চিত্র আঁকা হইয়াছে। 'চোখের বালি'র নায়িকা বিনোদিনীও বিধবা। সম্ভবতঃ এইটুকু সাদৃশ্য দেখিয়াই সমাজপতি এই উক্তি করেন যে, 'চোখের বালি' উমার হুবহু অনুকরণ। যুক্তি অকাট্য—তাহাতে সন্দেহ নাই !

উচ্চতর স্তরের অভ্যস্ত ও পুরাতন লেখক রবীন্দ্রনাথবাবুর বই 'বালি' সম্বন্ধে মুখোপাধ্যায় মহাশয় কি বুঝিয়াছেন ও বলিতে চাহেন, জানিতে চাওয়া অন্যায় নহে।৩

রবিবাবুর এই বই অতঃপর 'বঙ্গদর্শনে' বাহির হওয়া বন্ধ হইলেই, বোধ হয়, ভাল হয়। কারণ তাঁহার এই 'চোখের বালি' বঙ্কিমবাবুর হউক, তাঁহার হউক বা আর যাহারই হউক, বঙ্গদর্শনের মুখে চুনকালী মাখিয়া দিতেছে। তাহা একবারের জন্য হইলেও হইত। মাসে মাসে পূর্বনামজাদা 'মান্যমান' লোকের মুখময় চুনকালী মাখানটা ভাল দেখায় কি?

রবিবাবু তাঁহার গদ্য ভাষা এমনতর ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া 'ভ্যাল্‌সা' করিয়া ফেলিতেছেন কেন? অবিশ্রান্ত রচনাতিসারই কি ইহার কারণ? তাঁর নিজেরই কথায় বাঙ্গালীর 'নাড়ী' স্বাভাবিক 'অবস্থার চেয়েও যেমন দাবিয়া গেছে', ('ইয়ার সঙ্গে এই 'গেছে'টা নিত্য সম্বন্ধে লেগেই আছে এবং বোধ করি খাঁটি 'বাংলা' ব্যাকরণের খাতিরেই হবে, ক্রমাগত কান ঝালাপালা 'করিয়া দেছে'।) তেমনই দাবা নাড়ীরই মত তাঁর ভাষার দেহখানার অস্থিমজ্জা দারিদ্র্য ও দুর্বলতায় দিন দিন 'যেন দাবিয়া যাচ্ছে'। রবিবাবু পদ্য গদ্য অনেকই লিখিয়াছেন; লিখিতেছেনও অনেক। দৈনিক সংবাদপত্রের দেশী সম্পাদকেও এত লেখা লেখে না ও এত ছাপে না। কিন্তু বোধ করি, তাঁর নিদারুণ দাবুনিতেই এখন সেটা নেহাৎ রগ-বসা 'হইয়া গেছে'।

৩। 'চোখের বালি' সম্বন্ধে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের কোনো আলোচনাও 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হয় নাই।

নৌকাডুবি

নিশিকান্ত সেন

বাঙ্গালাদেশের প্রেসের কৃপায় প্রতি বৎসর হতভাগ্য সাহিত্য-সেবীগণের সহিত অগণ্য বঙ্গীয় উপন্যাসের দর্শন লাভ ঘটে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সকল উপন্যাসের সহিত তাঁহারা যেন আর পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন না। উপন্যাসের নাম শুনিলেই যেন তাঁহারা একটু আতঙ্কিত হইয়া উঠেন; কিংবা ঘৃণার ভাব প্রকাশ করেন। আমি একথা শুধু প্রকৃত সাহিত্য-শিল্পিগণের সম্বন্ধেই বলিতেছি, অপরপক্ষ এ সম্বন্ধে যথেষ্ট উদার একথা এ স্থলে বলাই বাহুল্য মাত্র। বস্তুতঃ বাঙ্গালাদেশে উপন্যাসের এরূপ দুরবস্থা কেন, তাহার সমালোচনা এ স্থলে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বর্তমান প্রচলিত অধিকাংশ উপন্যাসেই বিয়োগান্ত মিলনান্ত দৃশ্যাবলীর অভাব নাই, ভাষা কৌশলেরও যে তাদৃশ দোষ আছে এরূপও মনে হয় না; তথাপি এই সকল উপন্যাস পড়িয়া তৃপ্তি হয় না, পড়িয়া মনে হয় সময় এবং অর্থের যথেষ্ট অপব্যবহার করিলাম; কিন্তু কিছুই লাভ হইল না, ইহার কারণ কি? আমার মনে হয়, উপন্যাস লিখিতে হইলে যে সকল সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি, মানব-চরিত্রের অভিজ্ঞতা এবং যথাযথ অঙ্কন-নিপুণতার প্রয়োজন, তাহা বাঙ্গালার অধিকাংশ ঔপন্যাসিকেরই নাই।

একটি বৃহৎ বৃক্ষ চিত্রিত করিতে হইলে, যেমন তাহার ক্ষুদ্র পত্রপল্লব ডালপালা এমন কি তাহার শিকড়টি পর্যন্ত আঁকিয়া দেখাইতে হয়, উপন্যাসের চরিত্র-চিত্রাঙ্কনেও ঠিক তদনুরূপ প্রত্যেক খুঁটিনাটির দিকে মনোযোগ দিবার

দ্রষ্টব্য: 'চোখের বালি'র পর রবীন্দ্রনাথের ঘটনাবহুল উপন্যাস 'নৌকাডুবি' ১৩১৩ সালে (ইং ১৯০৬) গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা সর্বপ্রথম 'নব পর্যায় বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (১৩১০ বৈশাখ হইতে ১৩১২ আষাঢ়) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশলাভ করে। গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে ইহার বহুলাংশ পরিবর্জিত হয়।

নিশিকান্ত সেন এই উপন্যাসখানির সমালোচনা করেন কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী সম্পাদিত 'জাহ্নবী' নামক পত্রিকায় ৩য় বর্ষের (মাঘ, ১৩১৪) ১০ম সংখ্যায়। নিশিকান্ত সেন উক্ত সময়কার একজন সুলেখক ও সমালোচক ছিলেন। শিশু-সাহিত্যেও তাঁহার খ্যাতি ছিল।

প্রয়োজন। বিচিত্র বৃহৎ ঘটনাকে স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে হইলে তদনুকূল ক্ষুদ্র ঘটনাকে একেবারে অবহেলা করিলে চলে না। বৃহৎ ঘটনাকে পাঠকের সমক্ষে সত্যবৎ ফুটাইয়া তুলিতে হইলে, তাহাকে দৈনন্দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার সঙ্গে জুড়িয়া দিয়া অগ্রসর হইতে হয়।

দুঃখের বিষয় বাঙ্গালার অধিকাংশ উপন্যাসের নায়কনায়িকাগণই শুধু 'আকাশের জ্যোছনা' ও 'মলয় সমীরণে' জীবন ধারণ করেন, কিন্তু তাঁহারা যে প্রতিদিন কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্য দিয়া আহারে-অনাহারে সুখেদুঃখে গল্পগুজবে জীবনধারণ করেন, ইহা উপন্যাসের লেখকগণ যেন ধারণাই করিতে পারেন না এবং ধারণা করিতে পারিলেও যে তাহাই আবার কাগজে-কলমে লিখিতে হইবে, ইহা কল্পনাও করিতে সাহস করেন না। তাঁহারা মনে করেন তাহা অবান্তর, অনাবশ্যক ও অকিঞ্চিৎকর।

তবে অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে, বৈচিত্র্যহীন দৈনন্দিন ঘটনাই ঔপন্যাসিকের অবলম্বনীয় নহে, কেন না তদ্দ্বারা বিস্ময়ের উদ্রেক একেবারেই অসম্ভব। আমার বক্তব্য এই যে, বিচিত্র বৃহৎ ঘটনাকে দৈনন্দিন জীবনের যোগ-সূত্রে বাঁধিয়া না দিলে তাহাকে পাঠকের চিত্তপটে অবিকল মুদ্রিত করিয়া দেওয়া সহজ ও সম্ভব নহে।

চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিলে বনের তৃণটিকেও সুন্দর দেখায়, এবং অঙ্কিত করিতে না পারিলে অপ্সরার চিত্রের দিকেও চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় না। তবে যাঁহারা রঙ্গ দেখিলেই আত্মহারা হয়েন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু আমাদের দেশে আবার এই শ্রেণীর লোকেরই দল পুষ্ট; ইঁহারা যে সাহিত্যে শিল্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নহেন, একথা প্রকাশ্যে বলিলেও বোধ হয় অন্যায় হইবে

'নৌকাডুবি' সম্বন্ধে বিভিন্ন সমালোচকের বিভিন্ন ধরনের অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে—

…'নৌকাডুবি'তে সংস্কারগত ধর্মবোধ ও নীতিজ্ঞানই নরনারীর জটিল সম্বন্ধকে সুন্দরের পথে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।"—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

"…'নৌকাডুবি' 'চোখের বালি'র পরে লেখা; কিন্তু আর্টের দিক দিয়া ইহা 'চোখের বালি' অপেক্ষা অপরিণত।…ইহা প্রধানতঃ ঘটনাপ্রধান উপন্যাস।"—সুবোধ সেনগুপ্ত।

"…'নৌকাডুবি'র গল্প-বর্ণনার ভঙ্গী অত্যন্ত লঘু ও সরল; গল্প-বর্ণিত চরিত্রগুলিও স্বচ্ছ ও সহজ।"—নীহাররঞ্জন রায়।

না। বলা বাহুল্য এই শ্রেণীর পাঠকগণের কৃপাতেই বাঙ্গালায় অসার উপন্যাসের এত উৎপাত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পাইতেছে।

বস্তুতঃ বাঙ্গালাদেশে উৎকৃষ্ট উপন্যাসের রসাস্বাদনের ক্ষমতা অতি অল্পমাত্র পাঠকেরই আছে। এই জন্যই আমাদের শ্রদ্ধেয় সাহিত্যসেবী ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলিয়াছিলেন—'বাংলায় প্রকৃত পাঠকের একান্ত অভাব, পাঠক সৃষ্টি করিতে না পারিলে, উৎকৃষ্ট পুস্তকও বাজারে মজুত রহিয়া যাইবে।'

রবীন্দ্রবাবুর নৌকাডুবির ন্যায় উপন্যাসেরও যে বাজারে তাদৃশ আদর হইতে পারিবে, আমাদের এরূপ ভরসা নাই; কিন্তু ইহার শিল্পচাতুর্যে আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে এবং কতিপয় সাহিত্যসেবী যে এই উপন্যাসখানি পড়িয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন আমরা তাহাও অবগত হইয়াছি।

রবীন্দ্রবাবু নৌকাডুবিতে যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা এমন স্বাভাবিক হইয়াছে যে, সাক্ষাৎ মাত্রে পাঠকের নয়ন সমক্ষে তাহা একেবারে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে। আলোচ্য গ্রন্থে উমেশ, ভট্টাচার্য খুড়ো, যোগেন্দ্র এবং নবীনকালী চারিটি গৌণ চরিত্র, কিন্তু অঙ্কনকৌশলে তাহারাও এমন যথাযথরূপে প্রকাশ পাইয়াছে যে, গ্রন্থ সমাপনান্তে ইহাদের কাহাকেও ভুলিতে পারা যায় না।

ভট্টাচার্য খুড়ো অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির লোক, রসিক এবং বৃদ্ধ, কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর এই চরিত্র-সৃষ্টিটি নূতন নহে। আমার মনে হয় এই সুরসিক বৃদ্ধটি বৌঠাকুরাণীর হাটের বসন্তরায়, এবং চিরকুমার সভার রসিকদাদারই তৃতীয় সংস্করণ। অপর দুই স্থলে রবীন্দ্রবাবু অবশ্য তাঁহাদের টাকের বর্ণন করিতে ভুলেন নাই; কিন্তু নৌকাডুবিতে তিনি এ সম্বন্ধে ভট্টাচার্য খুড়ার প্রতি একটু বিশেষ ভুল করিয়া বসিলেও আমরা তাহাকে চিনিতে ভুল করি নাই। অপর দুই স্থলে ঐ দুইটি চরিত্রে রবীন্দ্রবাবুর মানবচরিত্রের যে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, এ চরিত্রটিও সর্বাংশে তদনুরূপ হইয়াছে। তাহার পর যোগেন্দ্রের সরলতা এবং অসহিষ্ণু ভাব, নবীনকালীর স্বার্থপরতা নীচাশয়তা এবং অতিরিক্ত সতর্কতা রবীন্দ্রবাবু অতি দক্ষতার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন।

এই চিত্রগুলি এতদুর স্বাভাবিক ও সুন্দর হইবার কারণ এই যে, কবি তুলি চিত্রাঙ্কনের সময় কাহাকেও অবহেলা করে নাই। যেখানে যে চিত্রে

আবশ্যক, সামান্য হইলেও কবি তাহাকে উহারই মধ্যে সম্পূর্ণতা দান করিয়া গিয়াছেন। যেন সুকৌশলী চিত্রকর বনের চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া শুধু পুষ্পবৃক্ষই অঙ্কিত করেন নাই, তিনি চিত্রে বনতলের মাটি এবং সামান্য তৃণরাশিকেও স্থানদান করিয়াছেন।

কিন্তু নৌকাডুবির আখ্যানবস্তুও নিতান্ত সামান্য নহে। আশ্চর্য ও বৃহৎ ঘটনাকে কবি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার সঙ্গে নিয়মিত করিয়া পরিণতি দান করিয়াছেন, ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মাধুর্য যেমন পরিস্ফুট হইয়াছে, অপর দিকে বৃহৎ ঘটনাও তেমনি অতি সহজ স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। অসামান্য ঘটনাগুলিকেও আর অসম্ভব বলিয়া উপলব্ধি হয় না।

এমন কি—নৌকাডুবির নায়ক-নায়িকাগণ ক্ষুধার্ত হইলে অন্নব্যঞ্জনে রসনার পরিতৃপ্তি সাধন করেন; সময় সময় তাহাদের কলার পাতে মোচার ঘণ্টের প্রাচুর্যও দেখা যায়। সেখানে আধুনিক নব্যতন্ত্রীয়েরা প্রভাতে উঠিয়া সংবাদপত্র পড়িতে পড়িতে চা পান পর্যন্ত করিয়া থাকেন।

এই উপন্যাসখানির আর এক বিশেষত্ব এই যে, ইহার নায়কনায়িকাগণ কথাবার্তার মধ্যে যেখানে বেদনা বা উত্তেজনা অনুভব করেন, কবি দক্ষতার সহিত তখন তাহার অন্তরের ভাবটি মুখে বা কণ্ঠস্বরে যে ভাবে প্রকাশ পায় অবিকল সেই ভাবটি পাঠকের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করেন, তাহাতে পাঠক কবি-চিত্রিত প্রত্যেকের চরিত্রের সঙ্গেই সহজে পরিচিত হইয়া উঠেন। ইহা একদিকে লেখকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণাশক্তি ও অপরদিকে তাঁহার যথাযথ অঙ্কননিপুণতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

নৌকাডুবি উপন্যাসের প্রধান নায়ক,—রমেশ, সে একালের কালেজে পড়া যুবক; সুতরাং তাহার ভাব ভাষা সম্পূর্ণ 'একেলের ধরনের'—তাহার বৃদ্ধ পিতার চরিত্র ঠিক তাহার বিপরীত। কলিকাতায় অধ্যয়নকালে রমেশ হেমনলিনীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়; কিন্তু রমেশের পিতা হঠাৎ রমেশকে গৃহে লইয়া আসিয়া এক দরিদ্রা কন্যার সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিয়া দেন। এই অপরিচিতা কন্যার সহিত পরিণীত হইবার ইচ্ছা রমেশের ছিল না, কিন্তু পিতার বিরুদ্ধে কোনও কাজ করিবার ক্ষমতাও তাহার ছিল না, সুতরাং দায়ে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করিতে হইল।

বিবাহের পর গৃহে ফিরিবার সময় জলপথে হঠাৎ ঝড় উঠিয়া নৌকাডুবি

হইল। এই নৌকাডুবিই, আলোচ্য গ্রন্থের ঘটনাবৈচিত্র্যের এক প্রধানতম কারণ। এই দুর্ঘটনায় রমেশের পিতৃবিয়োগ হইল এবং সে নিজে অতি কষ্টে বাঁচিয়া গেল। রমেশ যে চরের উপর সংজ্ঞালাভ করিয়াছিল, তাহার নিকটেই এক চেলীপরা নববধূকেও পাওয়া গিয়াছিল। রমেশ তাহাকেই আপনার বধূ বলিয়া গৃহে লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কবি পরে প্রকাশ করিয়াছেন এই বধূ রমেশের পত্নী নহে—নলিনাক্ষ ডাক্তারের পত্নী। রমেশ একসঙ্গে অনেকদিন অবস্থানের পর তবে এই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে।

"রমেশ তখন কর্তব্য সম্বন্ধে ভাবিতে বসিয়া গেল, খুব সম্ভব ইহার স্বামী ডুবিয়া মরিয়াছে। যদিও শ্বশুরবাড়ীর সন্ধান পাওয়া যায়, সেখানে পাঠাইলে তাহারা ইহাকে গ্রহণ করিবে কি না সন্দেহ। এতকাল বধূভাবে এক বাড়ীতে বাস করার পর আজ যদি প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পায়, তবে সমাজে ইহার গতি কি হইবে? স্বামী যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে সে কি ইহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা বা সাহস করিবে? এখন এই মেয়েটিকে যেখানেই ফেলিয়া যাইবে সেখানেই সে অতল সমুদ্রের মধ্যে পড়িবে।

"ইহাকে স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনও রূপেই রমেশ নিজের কাছে রাখিতে পারে না, অন্যত্রও কোথাও ইহাকে রাখিবার স্থান নেই; কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে নিজের স্ত্রী বলিয়াও গ্রহণ করা চলে না। রমেশ বালিকাকে ভবিষ্যতের পটে নানাবর্ণের স্নেহসিক্ত তুলির দ্বারা ফলাইয়া যে গৃহলক্ষ্মীর মূর্তি আঁকিয়া তুলিতেছিল, তাহা আবার তাড়াতাড়ি মুছিতে হইল।"

আবার কলিকাতায় আসিয়া রমেশ হেমনলিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল; কিন্তু কমলাকে সে অত্যন্ত ঢাকিয়া রাখিতে লাগিল। তাহাকে ঢাকিয়া না রাখিলে চলে না, যেহেতু তাহাকে লোকসমক্ষে কোনও প্রকারেই রমেশের পরিচয় দিবার উপায় নাই। কমলার সংবাদ পূর্বে হেমনলিনী জানিত না, জানিলে অবশ্যই সে রমেশের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারিত না, যেহেতু হেমনলিনী ইউরোপীয় আদর্শে গঠিত; যে রমেশ অপর রমণীর সঙ্গে একত্রে বাস করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার সঙ্গে হেমনলিনী কখনই হৃদয় বিনিময় করিতে রাজী নহে; কিন্তু রমেশ এতকাল কমলার সঙ্গে ঠিক বিবাহিত স্ত্রীর মত ব্যবহার করে নাই; সে কথা কি আর হেমনলিনী বিশ্বাস করিতে পারে? সেইজন্য রমেশ বহুকাল কমলাকে লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু হেমনলিনীর

প্রেমার্থী অক্ষয়, রমেশকে হেমনলিনীর স্নেহপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য, রমেশের চরিত্রকে হেমনলিনী ও তাহার পিতার নিকট নিরতিশয় কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া উপস্থিত করিতেছিল। কমলা যে রমেশের স্ত্রী ও মেসে রমেশের সঙ্গেই একত্র বসবাস করিয়া থাকে ; ইহা প্রমাণ করিবার জন্য অক্ষয় প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছে। এই ব্যক্তি এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক, হেমনলিনী তাহাকে কখনই ভালবাসে নাই ; তথাপি সে হেমনলিনীর আশা একেবারে বিসর্জন দিতে পারে নাই। সে অপমানিত হইয়াও বার বার নির্লজ্জের ন্যায় হেমনলিনীর গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। লেখক বলিয়াছেন, 'লোকটা ট্যাঁকসই—' কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। এই চরিত্রটি রবীন্দ্রবাবুর অদ্ভুত ও নূতন সৃষ্টি সন্দেহ নাই ; কিন্তু সচরাচর দুর্লভ নহে।

রমেশ লোকটা প্রকৃতপক্ষে জটিল প্রকৃতির নহে, কিন্তু ঘটনা-বিপাকে তাহাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছিল। সে ভাবুক সদাশয় ও কর্তব্য-বোধী, তাহার সংযমও অনন্যসুলভ। তাহার অবস্থা কল্পনা কর, সৌন্দর্যপ্রতিমাকে নিকটে পাইয়াও সে কেমন আত্মসংযম করিতে পারিয়াছে। নিশীথে একই গৃহে দুই বিভিন্ন শয্যায় দুইজনে নিদ্রাগত হইয়াছে, কখনও বা গভীর রাত্রে রমেশ অনুভব করিয়াছে তাহারি চরণতলে যৌবনপুষ্পিতা কমলা নিঃশব্দে আসিয়া শুইয়া আছে, রমেশ কমলার অন্তর বুঝিতে পারিত, বেদনাও বুঝিতে পারিত ; কিন্তু তথাপি বিচলিত হয় নাই। কবি রমেশকে এমন ভয়ানক পরীক্ষাক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়াও এমন সতর্কতার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন যে, তাহার চরিত্রের উপর পাঠকের বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক হয় নাই। সে যেন অনায়াসে অক্লেশে এই ভীষণ পরীক্ষাক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু কর্তব্যতার অনুরোধেই হউক অথবা সাহচর্যের জন্যই হউক, কমলার উপর তাহার একটা আকর্ষণ জন্মিয়াছিল ; ইহার জন্য রমেশকে অপরাধী করা চলে না, মানুষ মানুষের নিকট থাকিলে তাহার প্রতি কি আকর্ষণ না হইয়া যায় ? রমেশ নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছে, "আমি একদিনের জন্যও কমলার সঙ্গে স্ত্রীর মত ব্যবহার করি নাই, তথাপি ক্রমশঃ সে যে আমায় আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল একথা আমার স্বীকার করা কর্তব্য।" তাহার পরেই সে বলিয়াছে, "দেখিলাম, এখনও কমলাকে সম্পূর্ণ ভুলিতে পারি নাই ; ভুলি বা না ভুলি তাহাতে সংসারে আমি ছাড়া, আর কাহারও কোনও ক্ষতি নাই।

আমারি বা ক্ষতি কিসের ? সংসারে যে দুটি রমণীকে আমি হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিয়াছি, তাহাদিগকে বিস্মৃত হইবার সাধ্য আমার নাই এবং তাহাদিগকে চিরজীবন স্মরণ করাই আমার পরম লাভ।"

রমেশ এই যে দুটি রমণীকে অন্তরে স্মরণ করিয়া সুখী হইতেছে, ইহারা তাহার নির্মল প্রীতির নিদর্শন। সে ইহার প্রতিদানে আর কিছুই প্রার্থনা করে না এবং সে ইহাও জানে যে তাহার এই প্রকার ভালবাসায় জগতের আর কাহারও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। পরস্ত্রীকে ভালবাসিয়া প্রতাপ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন দিয়াছিল ; কিন্তু রমেশের সম্বন্ধে কবি সেরূপ কোনও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেন নাই বলিয়া আক্ষেপ করিবার কারণ নাই। জীবন দিলেই কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় ? প্রতাপ কি মরিত ? প্রতাপ যদি জানিতে পারিত যে শৈবলিনীর নিকট সে প্রলোভনের হেতু নহে, শৈবলিনী স্বামীর মুখ দেখিয়া তাহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারিবে ; তাহা হইলে বীর প্রতাপ কি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইত ? কখনই নহে। প্রতাপ মরিয়া শৈবলিনীকে, প্রলোভনের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল, স্বার্থত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিল ; কিন্তু রমেশ জানিত তাহার প্রতি কমলার আকর্ষণ নাই ; রমেশ কমলার প্রলোভন নহে— কিছুই নহে।

অপর দিকে কমলা দীর্ঘকাল আপনার যৌবনশ্রী লইয়া উপেক্ষিতার ন্যায় কাটাইয়াছে। রমেশকে সে পূর্বে স্বামী বলিয়াই জানিত, সুতরাং সে কেন যে তাঁহাকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করিতেছে না ; তাহা সে কোনও মতে বুঝিতে পারিত না। রমেশ নিকটে থাকিয়াও যেন কমলার নিকট সুদূর—সে যেন কোনও ক্রমেই তাহাকে পাইতেছে না, অগ্রসর হইলেই রমেশ যেন পিছাইয়া পড়িতেছে, রমেশের ব্যবহারে এমন একটি সঙ্কোচের ভাব থাকায় কমলার চিত্ত তাহার প্রতি ক্রমে বিমুখ হইয়া গেল। উত্তরকালে সে শুধু কর্তব্যতার অনুরোধেই রমেশের পরিচর্যা করিয়া যাইতে লাগিল ; কিন্তু রমেশের অনুগ্রহে, স্নেহে ও প্রেমে যেমন কমলার হৃদয়ের প্রেম বিকসিত হইতে পারিত, তাহার উদাসীনতায় যেন সেই প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইতে না হইতে শুকাইয়া গেল।

অবশেষে কমলা যেদিন জানিতে পারিল যে, সে রমেশের স্ত্রী নহে— সে নলিনাক্ষের স্ত্রী, সেইদিন তাহার অন্ধকার অতীত জীবন যেন বিদ্যুতালোকে

উন্মুক্ত হইয়া গেল, "লজ্জা যেন তাহাকে বার বার করিয়া তপ্তশেলে বিঁধিতে লাগিল। প্রতিদিনের বিচিত্র ঘটনা মনে করিয়া সে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল।" কমলা গৃহ ছাড়িয়া পলাইল। সে রমেশের দত্ত দ্রব্যাদি পথে ফেলিয়া দিয়া গেল। কমলা রমেশের স্মৃতি ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়া যেন স্বামীর উদ্দেশে যাত্রা করিল, পশ্চাতে একবার ফিরিয়াও তাকাইল না।

হিন্দুঘরের বধূ কমলা, ঘটনা-বিপর্যয়ে নরকের দ্বারে উপস্থিত হইতে যাইতে-ছিল হঠাৎ আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া যেন জ্ঞানশূন্যের ন্যায় ছুটিয়া চলিল। কে আশ্রয় দিবে, কোথায় যাইবে, কমলা কিছুই জানে না; তথাপি সে স্থির থাকিতে পারিল না। এই ঘটনাতেই প্রমাণ হয়, কমলা রমেশকে স্বামীর ন্যায় ভালবাসিতে পারে নাই। পারিলে রমেশের নিকট হইতে পলাইয়া বাঁচিতে পারিত না। সতীলক্ষ্মী পুনরায় স্বামীরত্ন লাভ করিয়া সুখী হইয়াছিল; কিন্তু স্বামীকে পাইবার পূর্বে সে স্বামীর গৃহে অপরিচিতার ন্যায় স্থান পাইয়াছিল। স্বামীর পরিচর্যার সুযোগ পাইয়াছিল; পাইয়া ভাবিয়াছিল, যদি সে স্বামীকে স্বামীরূপে লাভ করিতে না পারে তাহাতেই বা ক্ষতি কি? সে তাঁহার গৃহে দাসী হইয়া দিন কাটাইবে, শুশ্রূষা করিবে,—ইহার বেশী সে আর কিছুই প্রার্থনা করে না। বস্তুতঃ রবীন্দ্রবাবু কমলাকে হিন্দুঘরের সম্পূর্ণ আদর্শ করিয়াই চিত্রিত করিয়াছেন। কমলাকে ঘটনাবর্তে পড়িয়া যে রমেশের দিকে ইতিপূর্বে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল, তাহার জন্য কমলাকে দোষী করা চলে না, কেন না সে স্বামীবোধেই তাহার দিকে অগ্রসর হইয়াছিল; সে ঘটনার বিপাক—সে দোষ কমলার নহে, কবিরও নহে; কিন্তু সে দুর্দিনে কমলা পথভ্রষ্ট হয় নাই, ভগবান তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

তাহার পর শেষ বিদায়ের দিনে যখন রমেশ কমলার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গেল, কমলা তাহাকে ভূমিতে মাথা নোয়াইয়া নমস্কার করিল; আর কিছুই বলিতে পারিল না। অন্য পুরুষের হাতে পড়িলে কমলার কি দুর্গতি হইত বলা যায় না। কমলা যে ইহার জন্য তাহাকে ধন্যবাদ দিল না বা দিতে পারিল না তাহার জন্য রমেশের প্রতি পাঠকের কেমন একটা সহানুভূতির উদ্রেক হইতে থাকে। হতভাগ্য রমেশের জন্য পাঠকের একবিন্দু অশ্রু যেন অজ্ঞাতে গড়াইয়া পড়ে। নির্মম কবি হতভাগ্যের জন্য কোন প্রকার সুখের ব্যবস্থাই করেন নাই। সে দেখিয়া গেল—কমলা আশ্রয় পাইয়াছে, সে মনে

করিল তাহার হেমনলিনী অপরে প্রাণ সমর্পণ করিয়া সুখী হইতে চলিয়াছে—সে ইহাদের সুখকুঞ্জে আর ব্যাধের ন্যায় প্রবেশ করিল না; বন্ধু যোগেনকে এক টুকরা কাগজে লিখিয়া গেল 'পালাই'। পাঠকের চিত্ত রমেশের জন্য আকুল হইয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। রমেশের জন্য পাঠকের করুণার উদ্রেক করাই কবির উদ্দেশ্য, তাহা সিদ্ধ হইল; সুতরাং হেমের সঙ্গে তাহার মিলন হইল না বলিয়া আমরা গ্রন্থের ত্রুটি দেখাইতে পারি না।

গ্রন্থের অন্যতমা নায়িকা হেমনলিনী, সে সম্পূর্ণ ইঙ্গ-বঙ্গসমাজের চিত্র। সনাতন হিন্দু-সমাজের সহিত তাহার আচারব্যবহার ও চালচলনের মিল নাই; তথাপি আমাদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যবশতঃ সমাজের একস্তরে যখন এমন বিজাতীয় ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, তখন তাহার চিত্র অঙ্কিত করিতে বিশেষ দোষ দেখি না। সমালোচক দেখিবেন, বিচার করিবেন যে, তাহার ফটো যথাযথ হইয়াছে কিনা। এতকাল যাঁহারা এই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাঁহারা চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া শ্লীলতা ও সহৃদয়তার পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাঁহারা ঐ সমাজের dark side অর্থাৎ দোষের দিক লইয়া ঠাট্টাতামাসা ও কৌতুকে আসর জমাইয়াছেন। রবীন্দ্রবাবু সেই চিত্র সহৃদয়তার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। যদিও হেমনলিনী তাহার পিতার সহিত তাহার বিবাহের প্রসঙ্গ তুলিয়াছে, রমেশের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছে, তথাপি সেই ভাবের প্রতিমা যখন সামান্য আঘাতেই পীড়িতা হইয়াছে, আমরা তখন কৌতুক উপভোগ করিতে পারি নাই। তাহার দুঃখে আমাদেরও সহানুভূতির উদ্রেক হইয়াছে, হেমনলিনীর চরিত্র সম্বন্ধে আমরা এই পর্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারি।

গোরা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

উপন্যাসের সারাংশ এই :—গোরা একজন অনাথ আইরিশ বালক। কৃষ্ণদয়াল ও তাঁহার স্ত্রী আনন্দময়ী গোরার মাতার মৃত্যুর পর তাঁহাকে স্বীয় পুত্ররূপে পালন করেন। গোরা বড় হইয়াও একথা জানিতে পারেন নাই। তিনি জানিতেন যে, কৃষ্ণদয়াল তাঁহার পিতা ও আনন্দময়ী তাঁহার মাতা।

বিনয় গোরার বন্ধু। তিনি ব্রাহ্ম পরেশবাবুর কন্যা ললিতাকে বিবাহ করেন। গোরা স্বয়ং আইরিশম্যান জানিবার পর পরেশবাবুর পালিতা কন্যা রাধারাণী ওরফে সুচরিতাকে বিবাহ করেন।

অন্য বিশেষ কোন ঘটনা উপন্যাসে নাই। অন্যান্য ঘটনার মধ্যে মহিম তাঁহার কন্যা শশীমুখীর সহিত বিনয়ের বিবাহ দিবার জন্য বহু প্রয়াস পাইয়া নিষ্ফল হন; সুচরিতার মাতৃষসা হরিমোহিনী, সুচরিতার সহিত তাঁহার দেবর কৈলাসের বিবাহকার্য সম্পাদন করিতে ব্যর্থকাম হন; গোরা আর্তরক্ষার্থে জেলে যান; ললিতা বিনয়ের সহিত ষ্টিমারে চড়িয়া পিত্রালয়ে চলিয়া আসেন; এবং ব্রাহ্ম সমাজের চাঁই হারাণবাবু সুচরিতাকে বিবাহ করিবার জন্য তাঁহার বহু উদ্যম ব্যর্থ দেখিয়া সেই রাগে ব্রাহ্ম সমাজে ইহা লইয়া একটা বিশেষ ঘোঁট করেন।

এই ব্যাপার লইয়া এই বৃহৎ ৬০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী উপন্যাস এমনভাবে রচিত হইয়াছে যে, আদ্যোপান্ত আমি মুগ্ধ হইয়া এ উপন্যাসখানি পাঠ করিয়াছি।

গোরার চরিত্র অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার একান্ত নিষ্ঠা ও হিন্দু সমাজ রক্ষণে একান্ত জিদ অসাধারণ কৌশলের সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। এই প্রদীপ্ত হিতৈষণার কাছে তাঁহার বন্ধুত্ব, পিতৃভক্তি, মাতৃস্নেহ পর্যন্ত ম্লান

দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথের অন্যতম আলোড়ন সৃষ্টিকারী সমস্যামূলক দীর্ঘ উপন্যাস 'গোরা'। ১৩১৪ (ইং ১৯০৭) সালের ভাদ্র হইতে ১৩১৬ (ইং ১৯১০) সালের ফাল্গুন পর্যন্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রিকায় ইহা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'প্রবাসী'তে ইহা সমাপ্ত হইবার অব্যবহিত পরেই ১৩১৬ (ইং ১৯১০, ফেব্রুয়ারী) সালে গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে। উক্ত বৎসরেই রথীন্দ্রনাথের বিবাহ হয় এবং রবীন্দ্রনাথ বিবাহোপলক্ষে এই গ্রন্থ রথীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন

'প্রবাসী' পত্রিকায় এই উপন্যাসের প্রকাশ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেন যে—

হইয়া যায়। তাহার উপর তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা, সাহস, উত্তম, পরার্থে আত্মবিসর্জন তাঁহাকে বঙ্গ-সাহিত্যের মহাচরিতগুলির সহিত একাসনে বসাইয়া দিয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার ভক্তিহীন সামাজিকতা নিজের হিন্দুত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত—মহাকল্যাণের উপর নহে। যে মুহূর্তে তিনি জানিলেন যে তিনি হিন্দু নহেন, আইরিশম্যান—তৎক্ষণাৎ তাঁহার মতের পরিবর্তন হইল; ভারতবর্ষের সমস্ত মানবজাতি তাহার আপন হইয়া গেল। যে ব্যক্তি স্বয়ং হিন্দু বলিয়া হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠাসাধনে ব্রতী হয়, তাহার মতের বল কাল্পনিক—তাহার দেশানুরাগ প্রকৃত দেশানুরাগ নহে—তাহা বিজাতি বিদ্বেষ। ধর্ম বলিয়া যে অনুরাগ তাহাই ধর্ম; আমার ধর্ম বলিয়া যে অনুরাগ, তাহা 'আমারত্ব' ঘুচিলেই গেল! গোরার হিন্দুধর্মে অনুরাগ সেই রকমের অনুরাগ। কবি অসামান্য কৌশলে দেখাইয়াছেন যে এরূপ স্বার্থসেবা কি জীর্ণ ভিত্তি!

পৃথিবীতে দুই সৈন্য পরস্পরের প্রতি চক্ষু রক্তবর্ণ করিতেছে—এক ধর্ম সৈন্য আর এক অধর্ম সৈন্য। যোগ দিতে হইবে ধর্ম সৈন্যের সঙ্গে—সে সৈন্য ইংরাজের হউক, মুসলমানের হউক, হিন্দুর হউক, কিছু যায় আসে না। ইংরাজ প্রদত্ত উপকারগুলি ভুলিয়া অপকারগুলি স্মরণ করিয়া যদি আমরা কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই, তাহাকে স্বদেশভক্তি বলে না, তাহা প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি। ধর্মে ঈর্ষ্যা প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি দেশানুরাগ নহে, তাহা স্বার্থসেবার নামান্তর মাত্র। হিন্দু জাতিকে যদি সত্যই ভালবাসি, তাহা হইলে ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, ইংরাজ রাজত্বে অমঙ্গলের চেয়ে মঙ্গল বেশী কিনা; আমাদের হস্তে রাজত্ব আসিলে আমরা এই অবস্থায় রাজ্য চালাইতে পারি কিনা; হিন্দুর সঙ্কীর্ণতা ও অবিচার তাহার বিরোধী কিনা। গোরা এ সব ভাবিবার অবসর পান নাই। তিনি হিন্দুর যাহা আছে তাহাই ভাল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। তাহা রক্ষা করিবার জন্য জীবনের সমস্ত

"একদিন রামানন্দবাবু আমাকে কোন অনিশ্চিত গল্পের আগাম মূল্যের স্বরূপ পাঠালেন তিন-শ টাকা। বললেন, যখন পারবেন লিখবেন, নাও যদি পারেন আমি কোন দাবি করব না। এতবড়ো প্রস্তাব নিষ্ক্রিয়ভাবে হজম করা চলে না। লিখিতে বসলুম, গোরা আড়াই বছর ধরে মাসে মাসে নিয়মিত লিখেছি, কোন কারণে একবারও ফাঁক দিইনি। যেমন লিখতুম তেমনি পাঠাতুম। যে-সব অংশ বাহুল্য মনে করতুম, কালির রেখায় কেটে দিতুম, সে-সব অংশের পরিমাণ অল্প ছিল না। নিজের লেখার প্রতি অবিচার করা আমার

সাধনা উৎসর্গ করিয়াছিলেন, ও আপনাকে ও আপনার জাতিকে ইংরাজ দ্বারা অপমানিত বিবেচনা করিয়াছিলেন। এই জন্য এত উত্তম, সাহস, নিষ্ঠা এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ হইল।

এক কথায় গোরার ধর্ম প্রবৃত্তিমূলক—ভক্তিমূলক নহে। সে প্রবৃত্তিও একটা মহৎ প্রবৃত্তি নহে। সে প্রবৃত্তি প্রতিহিংসা—হদ্দমদ্দ আত্মরক্ষা, তাহার অধিক কিছু নহে। 'তুমি বল আমার সব খারাপ, অতএব যাহা খারাপ তাহা পরিত্যাগ করিব না, বরং প্রমাণ করিব যে তাহা ভাল এবং দ্বিগুণ জোরে তাহাই আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিব, গোরার এইরূপ প্রকৃতি। কিন্তু যেই সেই 'আমারত্ব' গেল—আর সব ভাসিয়া গেল। মেঘ কাটিয়া গেল। অমনই গোরা দেখিলেন উপরে নির্মুক্ত নীল আকাশ—সূর্য হাসিতেছে। গোরার এই চরিত্র এই অপূর্ব উপন্যাসে একেবারে জ্বল জ্বল করিতেছে।

বিনয় গোরার বন্ধু। গোরার প্রতি তাঁহার ভক্তি অসীম। কিন্তু তাঁহার যে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে তাহা আমরা গ্রন্থে ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাই। ক্রমে ক্রমে তিনি গোরার সমকক্ষ এবং শেষে তিনি গোরাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় কোমল। গোরা যেরূপ কঠোর দিক দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছেন, বিনয় সেইরূপ কোমল দিক দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছেন। গোরার জীবনের মূলমন্ত্র কর্তব্যজ্ঞান—বিনয়ের জীবনের শেষ মূলমন্ত্র প্রেম। সেই প্রেম প্রথমে গোরার দোর্দণ্ড প্রতাপে দিবসের চন্দ্রমার মত পাণ্ডুর; পরে গোরার প্রভাব চলিয়া গেলে নিশীথে স্থির জ্যোৎস্নায় পরিণত হইয়াছে। গোরা সত্য খুঁজিয়াছেন আত্মরক্ষার তন্ত্র দিয়া; বিনয় সত্য খুঁজিয়াছেন আত্মদান দিয়া। গোরার ভ্রান্তি কাটিয়া গেল আকস্মিক বিপ্লবে, বিনয়ের ভ্রান্তি কাটিয়া গেল ধীর সহিষ্ণু বিবেচনায়। গোরা ও বিনয় উভয়েই প্রেমের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়াছেন। কিন্তু গোরা সুচরিতাকে বিবাহ করিলেন—তখন বাধা আপনি সরিয়া গেল: বিনয় ললিতাকে বিবাহ করিলেন—বাধা চরিত্রবলে নিজে সরাইয়া

অভ্যাস। তাই ভাবি সেই বর্জিত কপিগুলি আজ যদি পাওয়া যেত তবে হয়তো সেদিনকার অনাদরের প্রতিকার করতুম।"

আলোচিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচনাটি ১৩১৭ সালে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'বাণী' নামক পত্রিকার ৩য় বর্ষের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

'গোরা' রবীন্দ্র-রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

দিয়া। গোরার বিবাহে উৎসর্গের লেশমাত্র নাই; বিনয়ের বিবাহে উৎসর্গ আছে। গোরা সমাজ ত্যাগ করিলেন বাধ্য হইয়া; বিনয় সমাজ ত্যাগ করিলেন—স্বেচ্ছায়। গোরার চেয়ে বিনয়ের চরিত্র মহৎ, উদার, পরিণত তাঁহার সহিত গোরার বন্ধুত্বেও একটা যেন দাম্ভিকতা, স্পর্ধা আছে। কিন্তু গোরার সহিত তাঁহার বন্ধুত্বে কেবল সহিষ্ণুতা, কোমল নম্রতা ও আত্মবিস্মৃতি আছে। বিনয়ের চরিত্র হইতে গোরা কিছু লাভ করিতে পারেন নাই, স্বীয় ধারণা হইতে এক পদও বিচলিত হন নাই। কিন্তু বিনয় গোরার চরিত্র হইতে যাহা গ্রহণীয় তাহা অকুণ্ঠিতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার মর্যাদা বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই। মহত্তের একটি লক্ষণ এই যে শিশু হইতে, পথের ভিক্ষুক হইতে, অধম হইতেও সার সংগ্রহ করিতে সে লজ্জিত হয় না। পৃথিবীতে কিছুই ফেলা যায় না। আবর্জনাকেও কৌশলে সারে পরিণত করা যায়। কিন্তু গোরা এতদূর স্বেচ্ছাচারী, এতদূর egoistic যে তাঁহার যেন কাহারও কাছে কিছুই শিখিবার নাই; জীবনে যাহা কিছু সার তাহা যেন তিনিই একা বুঝিয়াছেন; তাঁহার কাজ যেন শিক্ষা দান করা, ভ্রমক্রমেও শিক্ষা গ্রহণ করা নহে। বিনয় এত বিনীত, যেন তাঁহার নিজের একটা কোন দৃঢ় মত নাই, তিনি যেন সকলের শিষ্য, তাঁহার কাজ যেন জ্ঞান কুড়াইয়া বেড়ানো। গোরা যখন তর্ক করেন তখন যেন তিনি প্রচার করিতে বেদীতে বসিয়াছেন, আরও যেন বলিতেছেন যে, When I do open my lips let no dog bark. বিনয় যখন তর্ক করেন তখন যেন তিনি দীক্ষিত হইতে বসিয়াছেন, তিনি যেন বলিতেছেন—'তুমি বল, আমি শুনি।' বিনয়ের মত ব্যক্তিই শেষে জগতের প্রকৃত গুরু হয়।

পরেশ ব্রাহ্ম। এ চরিত্রটি এত সুন্দর যে, তাঁহার প্রতি একটা প্রগাঢ় ভক্তির উদ্রেক হয়। স্নেহশীল, কর্তব্যপরায়ণ স্বামী, পরেশ চিন্তাশীল, পরম ধার্মিক, বিপদে অটল, পারিবারিক বিপ্লবে স্থির। পরেশ একটি আদর্শ চরিত্র। তিনি ধীর, বিবেচক; কদাচ কাহারও প্রতি রুক্ষ হন নাই; নিজে সহ্য করিয়াছেন, কখনও কাহারও হৃদয়ে বেদনা দেন নাই; যখন যাহা উচ্চ ধর্ম অনুসারে কর্তব্য বুঝিয়াছেন তাহাই করিয়া গিয়াছেন; একপদও তিনি কখনও কর্তব্য পথ হইতে স্খলিত হন নাই। তাঁহার স্ত্রী বরদাসুন্দরীর নীচতা ও ক্ষুদ্রতা তিনি নীরবে দেখিয়াছেন, কখন তাঁহাকে একটিও কটুবাক্য বলেন

নাই। অধম হারাণবাবুর অযথা তিরস্কারও তিনি মাথা পাতিয়া লইয়াছেন; প্রতি-তিরস্কার করেন নাই। তাঁহাকে দেখিয়া গোল্ডস্মিথের ভিকারকে মনে পড়ে। এই পুস্তকের যথার্থ নায়ক এই ব্রাহ্ম পরেশ। রবীন্দ্রবাবুরই 'বিসর্জনে' অতুল চরিত্র রাজর্ষিকে মনে পড়ে। তাঁহারই প্রদর্শিত পথে গোরা আর বিনয় গিয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগকে অপার স্নেহ দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন।

অন্যান্য পুরুষ চরিত্রের মধ্যে হিন্দু কৃষ্ণদয়াল, অধমাধম হারাণ, সাংসারিক মহিম, নির্বোধ কৈলাস আর গোরার ভক্ত অবিনাশ আছেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছু নাই। কবিবর যেরূপ যে চরিত্রটি ফুটাইতে চাহিয়াছেন সে চরিত্র সেইরূপই ফুটিয়াছে, কিন্তু তাহাদের বিশেষত্ব এমন কিছুই নাই।

স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে চারিটি চরিত্র—সুচরিতা, ললিতা, হরিমোহিনী ও বিশেষতঃ আনন্দময়ী চমৎকার।

সুচরিতা ধীরা, স্নেহময়ী, তেজস্বিনী। তাঁহার চরিত্রের একটি শান্ত শক্তি আছে। তিনি কদাচিৎ উত্তেজিত হন। তিনি তাঁহার মাসী হরিমোহিনীর জন্য হিন্দু আচার মানিয়া চলিতে প্রস্তুত, আবার ভগিনী ললিতার জন্য সে আচার ভাঙ্গিবার জন্য প্রস্তুত। তিনি ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য উৎসুক। তিনি গোরার চরিত্রবলে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে একেবারে গুরু বলিয়া মানিয়া লইতে দ্বিধা করেন না। একটা সংযত তেজ, শান্ত ধার্মিকতা, স্বপ্রকাশ স্নেহ, ধীর কর্তব্যপরায়ণতা তাঁহার চরিত্রের ভূষণ!

আর ললিতা? তাঁহার চরিত্র গোরার চরিত্রের মত দৃঢ় উজ্জ্বল। যাহা বুঝিব, ঠিক তাহাই করিব, কোন বাধা মানিব না। প্রথমে, গোরার প্রতি তাঁহার ক্রোধ শেষে উদ্দাম ভক্তিতে পরিণত হইল। গোরা যে বিনয়কে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাঁহার চরিত্রের মৌলিকতা নাশ করিতেছেন, এ চিন্তা তিনি সহ্য করিতে পারেন না। আবার পরে তিনিই গোরার লাঞ্ছনায় উদ্দীপ্ত হইয়া অসম সাহসিক কার্য করিতে দ্বিধা অনুভব করেন না। তিনি কালেক্টর সাহেবের গৃহে অভিনয়ে প্রথমে যেমন উৎসাহী, শেষে সেইরূপ বিদ্রোহী। তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি প্রথমে যেরূপ আগ্রহে নিষ্ঠাবতী, শেষে সেইরূপ আগ্রহে তাহার প্রতি আক্রোশবতী। যাহা উচিত তাহা তাঁহার পক্ষে কর্তব্য। এই চরিত্র অদ্ভুত, সুন্দর এবং অনিবার্যরূপে হৃদয়কে আকৃষ্ট করে।

বিনয়ের সহিত ললিতার এবং গোরার সহিত সুচরিতার বিবাহে কবি মনুষ্যচরিত্রের একটি নিগূঢ় তত্ত্ব দেখাইয়াছেন যে, চরিত্রগত পার্থক্যই অনেক সময়ে প্রেমের অনুকূল হয়।

হরিমোহিনীর চরিত্র নিষ্ঠাবতী হিন্দু মহিলার বিধবার চরিত্র। আচার মানিয়া চলা তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ম। তিনি ব্রাহ্ম পরেশবাবুর গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিজের আচার হইতে অণুমাত্র স্খলিত হন নাই। সুচরিতা তাঁহার আদর্শে হিন্দুত্বে আস্থাবতী হইয়াছিলেন—যদিও মনে হয় গোরার প্রতি অনুরাগই ইহার প্রধান কারণ। কিন্তু সর্বাপেক্ষা সুন্দর চরিত্র—আনন্দময়ীর। তিনি চরণের রেণু হইতে শিরের সিন্দূরবিন্দু পর্যন্ত মাতা। স্নেহে গলিয়া পড়িতেছেন। গোরার প্রতি তাঁহার যেমন অনুরাগ, 'বনয়ের প্রতিও সেইরূপ। তিনি হিন্দু আচার ত্যাগ করিয়াছেন—গোরার জন্য। গোরার মৃদু তিরস্কারে তাই তাঁহার চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া আসে। বিনয়ের বিবাহে গোরা যোগ দিবেন না, কিন্তু স্নেহময়ী আনন্দময়ী থাকিতে পারিলেন না—গোরার এমন স্নেহময়ী মাতা, এ সময়ে যে দিকে কঠোরতা সে াদকে যাইতে পারিলেন না, বিনয়ের দিকে স্নেহভরে অবনত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ধার্মিকতা পরেশের ধার্মিকতার অনুরূপ। তাহাতে গোঁড়ামির লেশমাত্র নাই। তিনি ধর্মের মর্ম বুঝিয়াছিলেন। আর তাঁহার আচারে প্রয়োজন কি? যাহা উত্তম তাহা উত্তম—সে হিন্দু ধর্মে থাকুক বা খ্রীষ্ট ধর্মে থাকুক কিছু যায় আসে না। ‍াচরন্তন সত্য তাঁহার অন্তরে বিরাজমান—আর কি তিনি আচারের ধার ধারেন? তাই গোরা শেষে এই মাতার মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষকে পাইয়াছিলেন।

গ্রন্থে একটি বালক—পরেশের পুত্র সতীশের চরিত্র অত্যন্ত মনোহর। এ চরিত্রটি অতি সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে।

এই উপন্যাসে বহুল পরিমাণে তর্ক-বিতর্ক আছে, কিন্তু তাহাতে পাঠকের বিতৃষ্ণা হয় না বরং সেইগুলি বোধ হয় যেন মাণিক্যের মত পুস্তক মধ্যে বিক্ষিপ্ত আছে। এ তর্কগুলির মজা এই যে, যখন যে উক্তিটি যে পক্ষে উক্ত হইয়াছে তখনই সে উক্তি সেই পক্ষের চরম যুক্তি বলিয়া বোধ হয় এবং বিপক্ষবাদী তাহার উত্তরে কি বলিবে তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল বাড়ে। আমি সে তর্কের আবর্তের মধ্যে পড়িব না—নইলে সমালোচনা শেষ করিতে পারিব না।

উপন্যাসখানির উদ্দেশ্য বোধ হয় ব্রাহ্মধর্মের একটি চরম লক্ষ্য নির্দেশ করা। চমৎকার কৌশলের সহিত দেখান হইয়াছে যে, হিঁদুয়ানীর গোঁড়ামির চেয়ে আধুনিক ব্রাহ্ম গোঁড়ামি কম অনিষ্টকর নহে। সত্যই ধর্ম, আচার-ভেদে সমাজভেদ নীতিবিরুদ্ধ—এই মহাসত্য প্রচার জন্যই যেন এই উপন্যাস রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সে মহা উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

বস্তুতঃ এত সুন্দর সামাজিক উপন্যাস কদাচিৎ নয়নগোচর হয়। ব্রাহ্ম-সমাজের সৌন্দর্য ও কদর্যতা এক সঙ্গে আর কোন উপন্যাসে দেখি নাই। জ্ঞান ও প্রেম, যুক্তি ও অনুভূতি, সহিষ্ণুতা ও বিদ্রোহ এ অপূর্ব উপন্যাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় জ্বলিয়া উঠিতেছে। আর অপর দিকে স্বার্থসেবা, ক্ষুদ্রতা, হিংসা ও নিষ্ঠুরতা, কুৎসাপ্রিয়তা ও অত্যাচার তাহাদের অঙ্গে থাকিয়া তাহাদের আরও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

উপন্যাসখানি Vicar of Wakefield-এর ধরনে লিখিত। ইহা শুধু উপন্যাস নহে। ইহা ধর্মগ্রন্থ। একদিকে যেমন ৬০০ পৃষ্ঠা পড়িতে পড়িতে কেবল কৌতুহল বাড়িতে থাকে এবং পাঠ অসমাপ্ত করিয়া উঠিতে অনিচ্ছা হয়, অন্যদিকে ইহা হইতে অনেক শিক্ষালাভ করা যায়। এ উপন্যাস বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব। সকলেরই (বিশেষতঃ প্রত্যেক ব্রাহ্মের) এ উপন্যাসখানি পাঠ করা উচিত।

গীতাঞ্জলি

ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

নৈবেদ্যে যাহার উদ্বোধন, খেয়ায় তাহার আরম্ভ আর গীতাঞ্জলিতে তাহার আপেক্ষিক পরিণতি (Relative perfection)। নৈবেদ্য হইতে গীতাঞ্জলিকে কাব্য না বলিয়া সাধক কবি-জীবনের দশ বৎসরের ইতিহাস বলা যায়। মানুষ একদিনে কবি হইতে পারে, কিন্তু একদিনে ধার্মিক হইতে পারে না—একদিনে সাধক পদবীতে উন্নীত হইতে পারে না। নৈবেদ্য, খেয়া ও গীতাঞ্জলি এই তিনখানি কাব্য একত্রে পাঠ করিলে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই একটি স্পষ্ট ধারাবাহিকতা ও কবি-জীবনের আধ্যাত্মিকতার ক্রমবিকাশ বেশ স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করিতে পারিবেন। কবির চেষ্টা নাই অথচ তাঁহার জীবনের নিগূঢ় তত্ত্বসকল আপনি কাব্যের মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। কবির প্রাণপণ চেষ্টা নীরব হইবার জন্য, কিন্তু কি এক অনাস্বাদিতপূর্ব 'নবীনতা' তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে—

> "কি নিরখি আজি, একি অফুরান লীলা,
> একি নবীনতা বহে অন্তঃশীলা।
> পুরাতন ভাষা মরে এল যবে মুখে,
> নবগান হয়ে গুমরি উঠিল বুকে,
> পুরাতন পথ শেষ হয়ে গেল যেথা
> সেথায় আমারে আনিলে নূতন দেশে।"

ইহাই গীতাঞ্জলির গীতাভাস—Keynote. কবি কতভাবে কত বার বলিতেছেন—

দ্রষ্টব্য: 'গীতাঞ্জলি' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য হিসাবে বিশ্ব-সাহিত্যে বিশেষ পরিচিত গ্রন্থ। বাংলায় 'গীতাঞ্জলি' সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ৩১ শে শ্রাবণ, ১৩১৭ (ইং ১৯১০ সালে।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটী কর্তৃক 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী সংস্করণ প্রধানতঃ ইউরোপীয় পাঠকগণের জন্য প্রকাশিত হয়। ইহা 'গীতাঞ্জলি'র বাংলা সংস্করণের যথাযথ অনুবাদ নহে। ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'র কবিতাগুলি প্রধানতঃ 'নৈবেদ্য', 'শিশু', 'খেয়া

"এবার নীরব করে দাও হে তোমার
মুখর কবিরে—"

কিন্তু সুর আসিয়া তাঁহাকে আর স্থির থাকিতে দেয় না—নবগান হইয়া বুকে গুমরিয়া উঠে। এই নীরবতা চাহিবার পূর্বে কবি অনেকটা পথ হাঁটিয়া আসিয়াছেন—সেই পথের মাঝখানে খেয়াঘাটের ধারে তাঁহাকে একবার দেখিতে হইবে। কবি বলিতেছেন—

"ঘরে যারা যাবার তারা কখন গেছে
ঘরপানে
পারে যারা যাবার গেছে পারে;
ঘরেও নহে পারেও নহে যে জন আছে
মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে।"

যাহার ফুল ফসলের দিন গিয়াছে, যাহার দিনের আলো ফুরাইয়া গিয়াছে কিন্তু সাঁঝের আলো যাহার চক্ষে ফুটিয়া ওঠে নাই ওগো, তাহাকে বেলা-শেষের শেষ খেয়ায় দয়া করিয়া কে পার করিবে বলিয়া দাও।

এই তো প্রার্থনা, এই তো ডাকের মতন ডাক্। এমন ডাক্ এমন প্রার্থনার পর ভক্তবৎসল কখনো ধরা না দিয়া পারেন? তবে যে তাঁহার ভক্তবৎসল নামে কলঙ্ক পড়িত!

কবির আত্মা একটি কুমারী-হৃদয়!—অনাঘ্রাত পুষ্পের সৌরভের মত স্বর্গীয় প্রেমে ভরপুর! আজ তাহার ঘরের 'সমুখ-পথ' দিয়া 'রাজার দুলাল' চলিয়া যাইবে; ওগো সে কুমারী আজ কোন্ সাজে রাজার দুলালের দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইবে তাই ভাবিয়াই আকুল। তারপর যখন রাজপুত্র পথ দিয়া চলিয়া গেল তখন কুমারী তাহাকে কেমন করিয়া অভ্যর্থনা করিল—

'গীতাঞ্জলি' ও 'গীতিমাল্য' গ্রন্থ হইতে সংকলিত হইয়াছে। ইহাতে 'চৈতালি', 'কল্পনা', 'স্মরণ', 'উৎসর্গ' ও 'অচলায়তন'-এর কতকগুলি কবিতাও স্থান পাইয়াছে।

এই রচনাংশ ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'কবি রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব' নামক পুস্তিকা হইতে গৃহীত। ১৩১৭ সালের ৬ই পৌষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক 'দেবালয়' নামক প্রতিষ্ঠানে ইহা পঠিত হয়। 'কবি রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব' (পৃঃ ২২, মূল্য ৵০) লোটাস লাইব্রেরি, ৫০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে অঘোরনাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। পুস্তকখানিতে 'নৈবেদ্য',

"ঘোমটা খসায়ে বাতায়ন থেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি মা দেখে,
ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার
পথের ধূলার পরে ॥"

কিন্তু রাজার দুলাল সে মণিহার কি গ্রহণ করিয়াছে?—না, না, সে মণিহার রথের চাকায় চূর্ণীকৃত হইয়া গিয়াছে—তবু সে কুমারী-হৃদয় ব্যথিত নয়, কারণ আর কারো নয়, তাহার প্রিয়তম। চিরজীবনের সাধনার ধন, রাজার দুলালের রথের চাকাতেই তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

যাঁহার আশঙ্কা ছিল হৃদয়দুয়ার কবে কোন্ শুভ মুহূর্তে বন্ধ থাকিবে, আর জীবনদেবতা আসিয়া ফিরিয়া যাইবেন, তিনি আজ প্রস্তুত, যখনি রাজা আসিবেন তখনি তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত, কোনো আয়োজন নাই থাক্, রিক্ত-করে শূন্য ঘরেই তাঁহার অভ্যর্থনা হইবে।

"ওরে দুয়ার খুলে দেরে—
বাজা শঙ্খ বাজা।
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা!
বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
বিদ্যুতেরি ঝিলিক্ ঝলে,
ছিন্ন শয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা,
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এলো
দুঃখরাতের রাজা!"

'খেয়া' ও 'গীতাঞ্জলি' এই তিনটি কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 'গীতাঞ্জলি' সম্বন্ধে প্রথম সমালোচনার নিদর্শন হিসাবে এই পুস্তিকা তৎকালে বিশেষ খ্যাতিলাভ করে।

ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও একজন বিশিষ্ট লেখক এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে বহু জ্ঞানগর্ভ রচনা তিনি বিভিন্ন পত্রিকাদিতে লিখিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত লিখিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

আজ আর ভয় নাই—

"দুঃখের বেশে এসেছ বলে
তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা
নিবিড় করে' ধরিব হে।
আঁধারে মুখ ঢাকিলে, স্বামী,
তোমারে তবু চিনিব আমি,
মরণরূপে আসিলে, প্রভু,
চরণ ধরি মরিব হে—
যেমন করে দাওনা দেখা
তোমারে নাহি ডরিব হে।"

যিনি রাজা, যিনি রাজার দুলাল, তিনিই আবার বর, বঁধু, স্বামী। তাঁহার কাছে মানবাত্মা নবীনা, বুদ্ধিবিহীনা বালিকা-বধূ মাত্র। কিন্তু বধূ বরের কাছে লজ্জিতা, কুণ্ঠিতা নয় দেখিয়া গুরুজনে বলিয়া দেন—

"ও যে তোর পতি, ও তোর দেবতা—"

কিন্তু সে দেবতাকে কেমন করিয়া পূজা করিবে তাহা ঠিক বুঝিতে পারে না। এখন যে সম্বন্ধ কাছাকাছি, অপরের মুখে শুনিয়া এখন আর পূজার সম্পর্ক পাতাইতে ইচ্ছা হয় না—তাহাতে বুঝি ব্যবধানের সৃষ্টি হইবে—নৈকট্যের অভাব হইবে! আত্মায় পরমাত্মায় বরবধূর চেয়ে আর কি নিকট সম্বন্ধ হইতে পারে? যখন এ সম্বন্ধ সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয় তখনি উপাসনার সময়টি বিবাহ-লগ্নে পরিণত হইয়া যায়—তখনি শুধু গোধূলি-লগ্নের সোনালি গগন বিবাহের রঙে রাঙা হইয়া আসে—চারিদিক মধুময় হইয়া যায়। সেই শুভলগ্নের প্রতীক্ষায় বধূ কি শুধু বসিয়া থাকে? তা' নয়,—তাহার জীবন-দেবতা, তাহার বরের জন্ম যূথীদল দিয়া নিজের অবগুণ্ঠনখানি বয়ন করিতে থাকে, নিবিড় রাতের বাসক-শয়ন রচনা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ করে। তারপর—

"শেষে গভীর ঘুমের মধ্য হ'তে
ফুটল যখন আঁখি
চেয়ে দেখি, কখন এসে
দাঁড়িয়ে আছ শিয়রদেশে

তোমার হাসি দিয়ে আমার
অচৈতন্ত ঢাকি।"

নৈবেদ্যে যাহা কেবল 'বেন' ছিল, যাহা আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনার বস্তু ছিল, খেয়ায় কবি তাহার সন্ধান পাইয়াছেন, কিন্তু সে সন্ধান খুব স্পষ্ট নয়। স্বপ্নের মধ্যে আভাসে ইঙ্গিতে কবি জীবন-দেবতার পরিচয় পাইয়াছেন। কিন্তু যেটুকু পরিচয় পাইয়াছেন তাহাতেই তিনি দেবতাকে বর, বঁধু বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন। নৈবেদ্য হইতে গীতাঞ্জলিতে পৌঁছিতে খেয়া মধ্যপথ। এই মধ্যপথে যখন কবি চলিয়াছেন তখন তাঁহার কথা, ভাব ও ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ কিছু অস্পষ্ট ছিল বলিয়া মনে হয়। সেই অস্পষ্টতার ছায়া কোন কোন কবিতায় পড়িয়াছে। অথবা এরূপ হইতে পারে যে সাধক-জীবনের মধ্যাবস্থা অনেক সময়েই যেরূপ রহস্যপূর্ণ এবং দুর্বোধ, কবির জীবনও সেইরূপ। তিনি যে সময়ে নিজেকেই ভালো করিয়া বুঝিতে পারিতে-ছিলেন না খেয়া সম্ভবতঃ সেই সময়েরই রচনা। কিন্তু তাহা হইলেও মাঝখানে এই খেয়াখানি না থাকিলে নৈবেদ্য ও গীতাঞ্জলিতে পারাপারের কোনই সম্ভাবনা থাকিত না। খেয়া দুইটি ভাবকিনারের মাঝে অবস্থিত বলিয়াই উহার মূল্য এত অধিক। বিচ্ছিন্নভাবে ধরিলে উহার বিশেষ কোনো সার্থকতা বা সঙ্গতি আছে কিনা বলিতে পারি না। খেয়াতে কবি জীবনদেবতাকে সবচেয়ে বড় করিয়া দেখিয়াছেন। যখন গৃহের সম্পর্কে দেখিতেছেন তখন তিনি প্রিয়তম স্বামী, হৃদয়েশ্বর। যখন রাজ্যের মধ্যে তাঁহাকে দেখিয়াছেন তখন তিনি রাজা—তাঁর চেয়ে বড় আর কেহ নাই,—এইখানেই তাঁহার উপাস্যের অনন্তত্বের আভাস পাওয়া যায়—সব চেয়ে বড় যিনি তিনিই কবির প্রিয়তম, তিনিই তাঁহার রাজা আর কাহারো শাসন তাঁহার উপর চলে না—দুঃখদিনের রাজাকেও তিনি বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত, কারণ তিনি রাজা—তিনি বড়। ঐক্য ও সাম্যসামের সুর কবির কর্ণে যখন পৌঁছিল তখন 'সব পেয়েছির দেশে'র সংবাদ আর কবির অগোচর রহিল না। সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে যিনি এক, এবং এক হইয়াও যিনি বহুধা প্রকাশিত সেই মহান্ পুরুষের চিদাভাস পাইলেই ভক্ত 'সব পেয়েছির দেশে'র ছবি দেখিতে পাইয়া কৃতার্থ হন। যখন কবি বলেন—

"তুমি সন্ধ্যাবেলা ওপার পানে
তরণী বাও বেয়ে,

দেখে মন আমার কেমন সুরে
ওঠে যে গান গেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।
কালো জলের কলকলে
আঁখি আমার ছলছলে,
ওপার হতে সোনার আভা
পরান ফেলে ছেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।”—

তখন আমার মনে হয় কবির কবিত্বের প্রচ্ছদপটান্তরালে সেই প্রাচীন ঋষিদের উদাত্ত বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে—

“বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।”

আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। আর্য ঋষিগণ ‘আদিত্যবর্ণ’, ‘রুক্মবর্ণ’ অর্থাৎ স্বর্ণ-বর্ণ যে পুরুষকে অন্ধকারের অপর পারে দেখিতে পাইয়া ঋষিত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন, বর্তমান শতাব্দীর এক-জন গৃহস্থকবির চক্ষে সেই চিরন্তন পরম-পুরুষের ‘সোনার আভা’ ওপার হইতে আসিয়া পড়িয়া আজ তাঁহার প্রাণটি কাড়িয়া লইয়াছে।

‘গীতাঞ্জলি’র গীতাভাসটি (keynote) আগেই বলা গিয়াছে। গীতাঞ্জলিতে কবিকে আমরা আর কোনোমতেই কবি বলিতে পারি না, অর্থাৎ এখানে তিনি ভক্ত ও ঋষিপ্রকৃতিসম্পন্ন। খেয়াতে তাঁহার কবিরূপ ঘুচে নাই—ছন্দ, শব্দ, যতি, ভাব ও ভাষা প্রভৃতির মোহ তখনো তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই, অনেক সময়ে সোজা কথাটিও অলঙ্কার বা রূপককে আশ্রয় করিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। গীতাঞ্জলিতে তাহা নাই বলিলেই হয়। কবির যখন আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি (spiritual insight) খুলিয়া যায় তখনি তিনি ঋষিরূপে প্রকাশ পান, একথা সত্য হইলে গীতাঞ্জলিতে তাঁহার আর্যদৃষ্টির পরিচয় সর্বত্র। সাধনার উচ্চতর মার্গে উন্নীত হইলে ব্রহ্মের সহিত সাধকের যে নিত্যযোগ স্থাপিত হয়, গীতাঞ্জলিতে কবির সহিত আদি-কবির যে সে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে আর বাকি থাকে না। খেয়াতে কবি যেন বলিয়াছেন—“ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে।” পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ-বৈচিত্র্যে কবি তখনো

হাবুডুবু খাইতেছেন, কিন্তু গীতাঞ্জলিতে সে ভাব আর নাই, নিঃসন্দেহ পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কবিতাগুলিকে অনেক ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, তাহা হইতেই সম্বন্ধের আভাস পাওয়া যাইবে। যথা—সম্ভোগে, আভাসে, প্রার্থনায়, প্রকাশে, আহ্বানে, মিলন-ব্যবধানে, নিবেদনে, যাচ্ঞায়, আলাপে, অদর্শনে, রুদ্ররূপদর্শনে ইত্যাদি। এই নামগুলি আমার কল্পিত—কবিতাগুলির প্রধান চিন্তা বা ভাবসূত্র ধরিয়া (leading thought বা theme) আমি কবিতাগুলিকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু এই বিভাগের ফলে কবির আধ্যাত্মিক যোগের স্ফূর্তির পরিচয়ই সহস্রভাবে পাইয়াছি। যে সম্বন্ধের কথা বলিতেছি তাহা পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে একথা বলিতে পারি না, তবে চিরদিনের মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই। আমাদের চক্ষে যে সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহা আপেক্ষিক পূর্ণতা (relative perfection) ছাড়া আর কিছুই লাভ করে নাই—সে সম্বন্ধ দিন দিন চরম পূর্ণতার দিকেই অগ্রসর হইতে থাকিবে।

গীতাঞ্জলিতে কবির ব্রহ্মসম্ভোগের পরিচয় পাওয়া যায়। যদি ধ্যানদৃষ্টির পরিচয় পাইতে হয় তবে তাহাও এই গীতাঞ্জলিতে পাওয়া যাইবে। ধ্যানমুগ্ধ কবি যখন বলিতেছেন—

"হঠাৎ খেলার শেষে আজ কি দেখি ছবি,
স্তব্ধ আকাশ, নীরব শশী রবি
তোমার চরণ পানে নয়ন করি নত
ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত,"—

তখন তাহার আড়াল হইতে আবার ঋষিদের কণ্ঠে শুনিতে পাই—

"ন তত্র সূর্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বম্
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥"

অদর্শনে, বিরহে কবি ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন—

"কতবার আমি ভেবেছিনু উঠি উঠি
আলস ত্যজিয়া পথে বাহিরাই ছুটি,
উঠিনু যখন তখন গিয়েছ চলে

দেখা বুঝি আর হল না তোমার সাথে
সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে ॥"

যোগে কবি বলিতেছেন—

"কথা ছিল এক-তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে,
ত্রিভুবনে জান্‌বে না কেউ আমরা তীর্থগামী
কোথায় যেতেছি কোন্ দেশে সে কোন্ দেশে।
কূলহারা সেই সমুদ্র মাঝখানে
শোনাব গান একলা তোমার কানে,
ঢেউয়ের মত ভাষা—বাঁধনহারা
আমার সেই রাগিণী শুন্‌বে নীরব হেসে।"

এই যে অকারণে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ভাসিয়া যাওয়া, ইহা কি ঋষিদের কথা নয়? প্রাচীন ঋষিগণ প্রকারান্তরে এই কথাই বলিয়াছেন—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং
পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥"

এখানেও কবির সেই ঋষিদৃষ্টির পরিচয়। সম্ভোগেও কবি বলিতেছেন—

"আমার নয়ন-ভুলানো এলে!
আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে।
শিউলিতলার পাশে পাশে,
শিশির-ভেজা ঘাসে-ঘাসে
অরুণরাঙা চরণ ফেলে
নয়নভুলানো এলে।"

আবার বলিতেছেন—

"আলোয় আলোকময় করে হে
এলে আলোর আলো!
আমার নয়ন হতে আঁধার
মিলালো মিলালো।"

নববর্ষার বারিধারায় যখন ধরণী সিক্ত ও শ্যামলীকৃত, যখন তাহার মেঘময়

বেণী আকাশের কোলে এলায়িত, যখন কবি নিতান্তই নিঃসঙ্গ তখনো তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়াছে—

"আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে
গোপনে তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।"

কবি যখন একাকী গান গাহিতে থাকেন তখন এমনি সহজে তাঁহার বিজন ঘরের দ্বারের কাছে জীবন-দেবতা আসিয়া দেখা দিয়া যান। এখন কবির কাছে দর্শনের পুলক সুলভ কিন্তু অদর্শনের বেদনা দুঃসহ। কিন্তু আলোর সঙ্গে ছায়া যেমন অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত, তেমনি দর্শন ও অদর্শন পাশাপাশি বাস করে। কবি পরমাত্মাকে দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছেন না, ধরিয়াও ধরিতে পারিতেছেন না, বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না। কখনো ব্রহ্মপ্রকাশে কবি আত্মহারা, কখনো ব্রহ্মধ্যানে কবি তন্ময়—অন্যজ্ঞানবিরহিত; কখনো বা তিনি প্রার্থনায় ব্যাকুল—আবার কখনো বা সেই পরব্রহ্মের আভাস-মাত্র পাইতেছেন, কখনো বা সে আভাসেরও অভাব অনুভব করিয়া নিজেকে ধিক্কার দিতেছেন। ইহাই তো স্বাভাবিক, ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ এ বিষয়ের সাক্ষ্য দিয়া বলিতেছেন—

"নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যোনস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥"

অর্থাৎ—"আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি, এমন মনে করি না। আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনো নহে, জানি যে এমনো নহে। এই বাক্যের মর্ম যিনি আমাদিগের মধ্যে জানেন তিনিই তাঁহাকে জানেন।" এই হেতুই ঋষি-প্রকৃতিসম্পন্ন কবি তাঁহার জীবন-দেবতাকে বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন নাই, জানিয়াও সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। গীতাঞ্জলির ভাষা, ভাব, ছন্দ, শব্দ সকলি ব্রহ্মের উদ্দেশে ক্ষরিত, উহার আর স্বতন্ত্র ভাব ভাষা ছন্দ শব্দ নাই। যিনি একই কালে জগতের আদি ও অনাদি কবি, যাঁহা হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয় এবং যাঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, সূর্য উত্তাপ দেয়, মেঘ বারি বর্ষণ করে, বায়ু সঞ্চালিত হয় ও মৃত্যু সঞ্চরণ করে,

তাঁহারি মহিমা, বরণ, আরাধনা ও ধ্যান যে কাব্যে প্রকটিত হইয়াছে সে কাব্যের ছন্দ ভাষা সকলে ব্রহ্মময়—প্রকাশমান ব্রহ্মসত্তায় পূর্ণ। পরমহংসের নিজস্ব ভাষা ছিল, ব্রহ্মানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ ও বিবেকানন্দেরও নিজস্ব ভাষা ছিল—মহর্ষিপুত্রের তেমনি নিজস্ব জিনিস কবিতা। তিনি যখন গদ্যে কথা কহেন তখনো তাহার মধ্য হইতে কাব্য ধ্বনিত হইয়া উঠে। পরমহংসের কথামৃত, ব্রহ্মানন্দের জীবন-বেদ ও রবীন্দ্রনাথের বক্ষ্যমাণ কাব্যত্রয় একই উপাদানের সামগ্রী। ময়রা যেমন ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচে ফেলিয়া একই সামগ্রীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ দিয়া থাকে, তেমনি বিভিন্ন সাধকের জীবনেতিহাস বিভিন্ন ছাঁচে প্রকাশ পায়—কিন্তু মূলতঃ তাহারা একই পদার্থ। নৈবেদ্য, খেয়া ও গীতাঞ্জলি মহর্ষিপুত্র, ঋষিপ্রকৃতিসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথের জীবন-বেদ।

ভক্তিভাজন আচার্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি লইয়া প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছিলাম, তাঁহারি কথার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তিনি বলিতেছেন,—"ঋষির কার্যের ফলের ন্যায় কবির কার্যের ফলও উদ্দীপনা। যে সৌন্দর্যবোধ তোমার আমার সকলেরই অন্তরে অপ্রবুদ্ধ অবস্থাতে থাকে, তাহা প্রকৃত কবির সংস্পর্শে প্রস্ফুটিত হয়।...ঋষি ও কবি উভয়ের কার্য পরস্পরের এত সন্নিকট যে, ঋষি এক সময়ে কবি এবং কবি এক সময়ে ঋষি। ঋষি সসীম জগতের অন্তরালে অসীম জ্ঞান ও শক্তি দেখেন; ব্রহ্মাণ্ডের আবরণের মধ্যে এক জ্ঞানবস্তুর আভা দেখিতে পান; কবি সৃষ্টিরাজ্যের সর্বত্র সৌন্দর্য ও প্রেম দেখিয়া থাকেন। এ কারণেই দেখিতে পাই যে, প্রাচীনকালে অর্থাৎ লৌকিক ও পারমার্থিকের মধ্যে বর্তমান সুস্পষ্ট প্রাচীর যত দিন উত্থিত হয় নাই, ততদিন ঋষিত্ব ও কবিত্ব একসঙ্গে মিলিয়াছিল; প্রত্যেক ঋষিই কবি এবং প্রত্যেক কবিই ঋষি ছিলেন।

আমাদের সুখ ও সৌভাগ্যের কথা এই বর্তমান কালেও আমরা এমন একজন কবির সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি যিনি একাধারে কবি ও ঋষি।

কিন্তু সকলের চেয়ে বড় ও শেষ কথা যাহা বলিতে বাকি ছিল তাহা এই যে স্থূলভাবে যাহাকে আমরা ঋষি বলি সেই অনুসারে রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব নৈবেদ্য খেয়া ও গীতাঞ্জলিতে সর্বপ্রথমে প্রতিভাত হইয়াছে। কিন্তু তিনি এ সাধনার পথে তো আজকার নূতন পথিক নয়—এ পথে তিনি আজীবনই চলিতেছেন—

"কবে আমি বাহির হলেম তোমারি
গান গেয়ে
সে ত আজকে নয় সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আস্‌চি তোমায় চেয়ে
সে ত আজকে নয় সে আজকে নয়।"

আর এ পথের তো শেষ নেই, অনন্ত কালই এ পথে চলিতে হইবে—

"তোমার অন্ত নাই গো অন্ত নাই,
বারে বারে নূতন লীলা তাই।
আবার তুমি জানিনে কোন্ বেশে
পথের মাঝে দাঁড়াবে নাথ হেসে,
আমার এ হাত ধরবে কাছে এসে,
লাগ্‌বে প্রাণে নূতন ভাবের ঘোর
তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর।"

গীতাঞ্জলি

বিপিনবিহারী গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি বিলাতে প্রকাশিত হইয়াছে ; নানা প্রকার আলোচনাও দেখা দিয়াছে। আমাদের দেশে কে কি বলিতেছেন এখন সে কথার উত্থাপন করিতেছি না। বিলাতের সাহিত্যিক সমালোচকবর্গ কি কথা বলিতেছেন, কবি ইয়েটস্ মুখবন্ধে কি বলিলেন, তাহাই দেখা যাউক।

ইয়েটস্ বলেন—'the work of a supreme culture'; সুপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক পত্রিকা 'এঁথিনিয়মের' সমালোচক বলেন—'the product of a century of culture'। 'এথিনিয়মের' কথায় প্রথমটা যেন আমাদের একটু রাগ হয় ; আমরা মনে করি, এই সব ইংরাজ সমালোচক মনে করেন যে যেদিন হইতে ইংরাজ—

> "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল,
> পোহালে শর্বরী, রাজদণ্ড রূপে,"

সেদিন হইতে আমাদের culture-এর সূত্রপাত হইয়াছে ; রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি এই বিদেশী সভ্যতাপ্রসূত culture-এর ফল। ইঁহারা জানেন না যে গীতাঞ্জলি এক শতাব্দীর নহে, বহু শতাব্দীর culture-এর ফল। আমাদের দেশে যখন বৈষ্ণব কবিরা গান গাহিয়াছিলেন ; যখন হাটে, মাঠে, ঘাটে সেই সকল গান গীত হইত, তখনকার culture-এর কথা ইঁহারা অবগত নহেন, সে culture বিগত এক শতাব্দীর coterie culture নহে, তাহাই যথার্থ national culture ছিল ; সমস্ত জাতির মধ্যে যে ভাব স্ফুরিত হইয়াছিল তাহাই বৈষ্ণব

দ্রষ্টব্য : 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী ও বাংলা উভয় সংস্করণই যেমন রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য তেমনি বহু আলোচিত গ্রন্থ। বিলাতের ইণ্ডিয়া সোসাইটী কর্তৃক এই ইংরেজীগ্রন্থের সংস্করণ প্রথম প্রকাশিত হইবার পর (১৯১২ সাল, ১০৩টি কবিতার সংগ্রহ, মূল্য ১০ শিলিং ৬ পেন্স) ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ 'নোবেল প্রাইজ' লাভ করার মহান্ গৌরব অর্জন করেন। কবি ইয়েট্স্ লিখিত এই গ্রন্থের সপ্রশংস ভূমিকা রবীন্দ্র-প্রতিভাকে পাশ্চাত্য দেশে পরিচিত করার বিষয়ে প্রভূত সাহায্য করে। ১৯১৩ সালেই বিলাতের মেসার্স ম্যাকমিলান কোম্পানী কর্তৃক ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি' সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশিত হয়।

সাহিত্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া শত তরঙ্গভঙ্গে বঙ্গের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে উদ্বেলিত হইয়াছিল। ইংরাজের যন্ত্রবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালীতে আমাদিগের মধ্যে যে culture সৃষ্টি হইল সেটার সহিত সমস্ত বাঙ্গালী জাতির হৃদয়তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হয় নাই; যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিল, তাহাতে পুরাতন বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাবপ্রবাহ পরিলক্ষিত হয় নাই। পাশ্চাত্য মদ্য প্রাচ্য সাহিত্যভাণ্ডে ফেনাইয়া উঠিল মাত্র; বাঙ্গালী সাহিত্যিক তান্ত্রিকের মত সেই কারণভাণ্ড সম্মুখে রাখিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কঙ্কালের উপর উপবেশন করিয়া শবসাধনায় নিযুক্ত হইলেন। সাধনার ফল ফসিল;—শ্মশানের চিতাভস্মের মধ্য হইতে উত্থিত হইল 'দুর্গেশনন্দিনী', 'চন্দ্রশেখর', 'সীতারাম', 'পলাশীর যুদ্ধ', 'বৃত্রসংহার', 'মেঘনাদ বধ'। বৈষ্ণবকবিদিগের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সেনের যুগের মধ্য দিয়া সাহিত্যের যে ভাবপ্রবাহ অপ্রতিহতভাবে চলিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ ঈশ্বর গুপ্তের যুগে তাহা শুকাইয়া গেল। সেই বালুতটে নব্যতন্ত্রী কাপালিক পুরাতন ভাবপ্রবাহকে উৎসারিত করিতে চাহিলেন না; তাঁহার হস্তে পাশ্চাত্য শ্যাম্পেন ঢল ঢল করিতে লাগিল। তাঁহার স্নায়ুতরঙ্গে যে আনন্দে হিল্লোলিত হইয়া উঠিল, যন্ত্রবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালীতে শিক্ষিত মুষ্টিমেয় বাঙ্গালীর হৃদয়েও সে আনন্দ পঁহুছিল; কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালীজাতি সাড়া দিল না, নাচিয়া উঠিল না, তালে তালে পা ফেলিল না। সে যে coterie culture-এর জিনিস, সমগ্র জাতির সহিত তাহার নাড়ির যোগ কোথায়?

আমি এই নব্যতন্ত্রী সাহিত্যরথিগণের নিন্দা করিতেছি না, তাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যকে যে সম্পদ দিয়াছেন তাহা অমূল্য, যে গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছেন তাহা অপরিমেয়। কিন্তু যখন এই নূতন সাহিত্যলক্ষ্মীটিকে সাত সমুদ্র তের নদীর পারের দেশ হইতে আনয়ন করিয়া আমাদিগের আচার্যগণ বঙ্গসারস্বতকুঞ্জে

উক্ত সময়ে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের কয়েকটি পত্রিকায় যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাদের দুই-তিনটির অংশবিশেষ বঙ্গানুবাদ এস্থলে প্রকাশিত হইল—

"...এই কবিতাগুলির প্রকাশ ও প্রচার সমগ্র মানবজাতির অধ্যাত্ম-জীবনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা।"—নেশন

"...এগুলি (অর্থাৎ এই কবিতাগুলি) ইংলণ্ডের বর্তমান কবি-সমাজের সম্মুখে একটি নতুন আদর্শ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে, নূতন পন্থা নির্দেশ করিয়াছে, ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ দেশের (ইংলণ্ডের) ভবিষ্যৎ কাব্য

প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তখন পুরাঙ্গনাগণ হুলুধ্বনি দেন নাই, বন্দী ও চারণগণের গীত শ্রুত হয় নাই, গ্রামে গ্রামে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠে নাই।

সে দিন কি বিষম দিন—যখন মনীষী ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ বীটন সোসাইটীর (Bethune Society) এক অধিবেশনে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আমাদের দেশে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা যথার্থই প্রসার লাভ করিয়াছে এমন ত বোধ হয় না; যতদিন না দেখিতেছি যে অশনে, বসনে, ভূষণে আমরা ইউরোপীয়দিগের মত হইয়াছি ততদিন পর্যন্ত আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না যে আমরা শিক্ষিত। সিবিলিয়ন রমেশচন্দ্র দত্ত বলিতেন, আমরা প্রতি বৎসরে বাড়ির বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া দেখিতাম বিজয় দশমীর দিন প্রতিমা গঙ্গাভিমুখে বিসর্জনের জন্য লইয়া যাইত। সর্বসমেত কতগুলি প্রতিমা গেল তাহাই গণিতাম; যদি দেখিতাম যে পূর্ববৎসরের চেয়ে দু'একখানা কম, তাহা হইলে মনে বড় আনন্দ হইত, বুঝিতে পারিতাম যে ইংরাজি শিক্ষার সুফল হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি কি সেই century of culture-এর ফল। সমাজের সেই বিষম দুর্দিনে কিশোর কবি ভানুসিংহ বৈষ্ণব কবির পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সফলকাম হন নাই।

"বাঁশরি বাজাতে গিয়ে, বাঁশরি বাজিল কই!" রবীন্দ্রনাথ পরে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই পঞ্চাশৎ বর্ষে পদার্পণ করিয়া তিনি ভানুসিংহের পদাবলীর জন্য লজ্জাবোধ করিয়াছেন। কিন্তু আমার বেশ মনে আছে যে, পঁচিশ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে—

"গহন কুসুম কুঞ্জমাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে"

গান শোনা যাইত। ভাগ্যদোষে রবীন্দ্রনাথ এই century of culture-এ

ও উচ্ছ্বাসের মধ্যে যদি এই প্রকার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারেন, তবে ইংলণ্ডেও একদিন এইরূপ উচ্চ শ্রেণীর কবিতা জন্মিতে পারিবে।...ইঁহার কবিতা পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন বাইবেলের psalm রচয়িতা রাজা ডেভিডের মত আর এক ডেভিডকে আমরা লাভ করিয়াছি।"—টাইমস্

"...মিষ্টার ঠাকুরের অনুবাদগুলি যথাবেশের মত সুন্দর ও মনোহর।...তর্জমাতেও যাহা এমন পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের আধার, আসলে না জানি, তাহা আরও কত চমৎকার!...

জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই আবহাওয়ায় পড়িয়া তিনি বৈষ্ণব কবির মধুররস নূতন পাত্রে বণ্টন করিয়া দিতে পারিলেন না; তাঁহার মধ্যে দ্বৈতভাব পরিলক্ষিত হইল; যে দ্বৈতভাবের সহিত বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়াছেন, সেই প্রাচ্য প্রতীচ্যের duality-র হাত তিনি এড়াইতে পারিলেন না। তাই—

"বাঁশরি বাজাতে গিয়ে, বাঁশরি বাজিল কই?"

তাই এতদিন পরে শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্তী ব্রাউনিং, শেলি, হুইটম্যানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবি হিসাবে filiation সাব্যস্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন; পাশ্চাত্য চিন্তাস্রোতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাবপ্রবাহ কোনও এক জায়গায় আসিয়া মিশিয়াছে এই রকম একটা কিছু যেন তিনি দেখিতে পাইতেছেন; এবং সেই হিসাবে জগতের সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্থান নির্দেশ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। ইহার মধ্যে যে আংশিক সত্য নিহিত আছে তাহা অস্বীকার করা না যাইতেও পারে; কিন্তু তাহাই যদি সম্পূর্ণ সত্য হইত, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের দীনতা অত্যন্ত রূঢ়ভাবে আমাদের চক্ষুর সমক্ষে প্রকট হইয়া উঠিত। কিন্তু আমি যে দ্বৈতভাবের কথা বলিলাম তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে এই পাশ্চাত্যভাবপ্রবণতা কবিহৃদয়ে কতটুকু চাঞ্চল্য দান করিয়াছিল তাহার পরিমাপ করা যাইতে পারে। তাঁহার এই চমৎকার duality 'গোরা'য় প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। 'গোরা' এই century of culture-এর চরম কাব্য।

বৈষ্ণব কবির বাঁশি রবীন্দ্রনাথের হাতে ঠিক বাজিল না বটে, কিন্তু সে

পড়িতে পড়িতে যেন একটি নূতন সৌন্দর্যমাহাত্ম্যে মনঃপ্রাণ পরিপূর্ণ ও অভিভূত হইয়া উঠে।"—এথিনিয়ম্

'গীতাঞ্জলি'র সমালোচনা প্রসঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখিয়াছেন, "'গীতাঞ্জলি'র গানগুলিতে কবির অধ্যাত্মসাধনার বার্তার ভাগই বেশি, পরিপূর্ণ উপলব্ধির বাণীর ভাগ কম।" তিনি আবার অন্যত্র লিখিয়াছেন, "গীতাঞ্জলিতে শুধু উপলব্ধির কথা তো নাই, কেমন করিয়া সেই উপলব্ধি সম্ভাবনীয় হইল তাহার সাধনার ইতিবৃত্তও আছে।"—কাব্যপরিক্রমা

রবীন্দ্র-রচনাবলীর একাদশ খণ্ডে 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' প্রভৃতি গ্রন্থের সহিত 'গীতাঞ্জলি' মুদ্রিত হইয়াছে।

বিপিনবিহারী গুপ্তর এই রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'মানসী' মাসিক পত্রিকার ৪র্থ বর্ষের (১৩১৮-১৯) মাঘ সংখ্যায়।

কাহার দোষ ? যে সপ্তস্বরা বীণায় তিনি ঝঙ্কার দিয়াছেন তাহাতে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মধুররস ফুটিয়া উঠিল না বটে, কিন্তু যে রসধারা উৎসারিত হইয়াছে [illegible]াহাতেই সাহিত্যের মরা [illegible] [illegible]াসিয়াছে। [illegible]াহার কণামাত্র পাইয়া দেবকুমার, প্রমথনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, মুনীন্দ্রনাথ, রমণীমোহন, যতীন্দ্রমোহন, করুণানিধান, কালিদাস কবি হইয়া উঠিয়াছেন, কণামাত্র আস্বাদ করিয়া ইংরাজ-কবি ইয়েট্‌স্‌ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন ; ইংরাজ সাহিত্যসমালোচক একেবারে দু'হাজার বৎসর অতিক্রম করিয়া হিব্রু ডেভিড ও সলোমনের গানের কথা স্মরণ করিতেছেন, সমগ্র মধ্যযুগের য়ুরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র সেণ্ট ফ্রান্সিসের ভগবৎপ্রেম এই গীতাঞ্জলির ভগবৎপ্রেমের কতকটা কাছাকাছি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কোথায় রহিল ব্রাউনিং, শেলি, হুইটম্যান ? আর সেই duality, সেই প্রাচ্য প্রতীচ্যের দ্বন্দ্ব ইহার মধ্যে ধরা পড়ে কি ?

তাই বলিতেছিলাম, এথিনিয়মের কথায় প্রথমটা যেন আমাদের একটু রাগ হয় ; বিদ্রোহী মন বলিয়া উঠে—

"নহে, নহে, নহে, কখনই নহে।"

কিন্তু যখনই আমি রবীন্দ্রনাথের ভাবপ্রবাহের দ্বৈততরঙ্গের বিষয় স্মরণ করি, তাঁহার মধ্যে প্রাচ্য প্রতীচ্যের দ্বন্দ্ব দেখি, প্রবীণ কবি রবীন্দ্রনাথ কিশোর কবি ভানুসিংহকে কেন চাপা দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করি, তখনই যেন বুঝিতে পারি এথিনিয়মের শব্দভেদী বাণ লক্ষ্যে পৌঁছিয়াছে ; [illegible]কন্তু লক্ষ্য বিঁধিতে পারিয়াছে কি ? গীতাঞ্জলির মধ্যে সেই দ্বন্দ্বের কোনও আভাস নাই কি ? খেয়া ও নৈবেদ্য বিপুল বিশ্বের মানবের সামগ্রী ; কিন্তু সেখানে উচ্চ নীচ, প্রাচ্যপ্রতীচ্য, সাদাকালোর দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া গিয়াছে কি ? পাশ্চাত্য কবি ইয়েট্‌স্‌ যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে গিয়া পড়িতেছেন—a world I have dreamed of all my lifelong। আমাদের সৌভাগ্য যে বাঙ্গালী কবির সহিত ইংরাজের প্রথম পরিচয় এই অধ্যাত্মক্ষেত্রে হইল। তাপস কবির—

"এ যে সংগীত কোথা হতে উঠে,
এ যে লাবণ্য কোথা হতে ফুটে,
এ যে ক্রন্দন কোথা হতে টুটে
অন্তর বিদারণ",

তাহা ষ্টপফোর্ড ব্রুক বা ইয়েট্‌স্‌ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন কি ?

তাঁহারা বলেন—বাঙ্গালীর নব-অভ্যুদয় হইতেছে ; একটা নবীন Renaissance-এর ভরা জোয়ারে বাঙ্গালী গা ভাসাইয়াছে ; আমরা তাহার ভাষা জানি না, শুধু লোকমুখে এই নবজীবনের বার্তা শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিতে হইবে।

এই Renaissance-এর কথাটা আমার যেন কেমন কেমন লাগে। যে Renaissance-এর য়ুরোপ এত গর্ব করে, সেটা লইয়া এক একবার লাভ লোকসানের খতিয়ান করিতে বসি। সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী সাধনার ফলে য়ুরোপ যাহা লাভ করিয়াছিল তাহার অধিকাংশই বর্জন করিয়া সাহিত্যে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে pagan সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল ; অধ্যাত্মজীবনের সৌন্দর্য যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, লুথার তাহা সাবাড় করিয়া দিলেন। সেই দিন হইতে সমগ্র য়ুরোপের মধ্যে সেণ্ট ফ্রান্সিসের মত ভগবদ্ভক্ত পুরুষ দুর্লভ হইল। তাই ইংরাজের মনে সেণ্ট ফ্রান্সিসের ভগবৎপ্রেম ব্যতীত আর কাহারও প্রেম রবীন্দ্রনাথের প্রেমের সহিত তুলনীয় হইল না।

আমাদের দেশেও অনেকবার Renaissance দেখা গিয়াছে। যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হইয়াছে, তখনই মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। আমাদের Renaissance-এর বৈশিষ্ট্যই ঐ—ধর্মের সহিত তাহার নিবিড় সম্পর্ক। সুন্দর যদি সত্য না হয়, তবে তাহা অসুন্দর। ভারতের সাহিত্যে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে গ্রীকদিগের pagan সৌন্দর্যের স্থান থাকিতে পারে, কিন্তু সে কখনও ভারতের নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ আত্মাকে প্রকাশ করিবার স্পর্ধা করে না। যে সভ্যতালোক ভারতের তপোবন হইতে বিকীরিত হইয়াছে, যুগে যুগে তাহারই নব নব কিরণসম্পাতে নব নব Renaissance অভ্যুদিত হইয়াছে। ভোগে নহে, ত্যাগে ; অর্জনে নহে বর্জনে ; সৌন্দর্য-পিপাসায় নহে, কঠোর সন্ন্যাসে সেই নবজীবনের প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছে।

তাই ভাবিতেছি, বাঙালী কি একটা নবীন Renaissance-এর ভরা জোয়ারে গা ভাসাইয়াছে ? গীতাঞ্জলি দেখিয়া কবি ইয়েট্‌স্ যদি এইরূপ মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, তিনি ভারতের ঠিক মর্মস্থানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে পারিয়াছেন ; ভারতের Renaissance-এর মূলে সাধকের সাধনা, সন্ন্যাসীর ত্যাগ, যোগীর প্রবুদ্ধ চৈতন্য থাকা চাই। তাই ইংরাজ-কবি ভাবিয়াছেন যে, যখন বাঙ্গালী কবির হৃদয় হইতে এমন সুন্দর, সরল, গভীর প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই বাঙ্গালীর সুপ্ত

আত্মা প্রবুদ্ধ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে, তিনি "আসিবে, সে দিন আসিবে" বলিয়া বহুপূর্বে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, যে দিন তরুণ তপন "নূতন জীবন করিবে বপন", সে দিন আসিয়াছে।

কিন্তু সত্যই কি আসিয়াছে? রেলওয়ে, কলকারখানা, আপিস, জবরদস্ত প্রাথমিক শিক্ষা, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, Industrialism ইত্যাদি হৈচৈ ব্যাপারের মধ্যে আমরা আমাদের হারান জিনিসের সন্ধান পাইয়াছি কি? এত বড় প্রকাণ্ড নাট্যশালার মধ্যে তপোবনের 'স্বচ্ছ পবন' আমাদিগের সুষুপ্ত আত্মাকে জাগাইয়া তুলিতেছে কি? আমরা নিজেকে সত্যই কি সম্পূর্ণভাবে চিনিতে পারিয়াছি? সমস্ত জাতিটা একটা রঙিন নেশায় মাতিয়া উঠে নাই ত?

এ সকল প্রশ্নের সদুত্তর কেহ দিতে পারিবেন এমন আশা এখন করি না।

বিলাতের কথা লইয়া এতক্ষণ আলোচনা করিলাম, কিন্তু আসল কথাই বলা হইল না। গীতাঞ্জলি ইংরাজের এত ভাল লাগিল কেন?

হৃদয়দেবতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কবি বলিতেছেন—

"মাতৃস্নেহ-বিগলিত স্তন্য ক্ষীররস
পান করি হাসে শিশু আনন্দে অলস,—
তেমনি বিহ্বল হর্ষে ভাবরসরাশি
কৈশোরে করেছি পান, বাজায়েছি বাঁশি
প্রমত্ত পঞ্চম সুরে; প্রকৃতির বুকে
লালন-ললিত চিত্ত শিশুসম সুখে
ছিনু শুয়ে; প্রভাত-শর্বরী-সন্ধ্যা-বধূ
নানা পাত্রে আনি দিত নানাবর্ণ মধু
পুষ্পগন্ধে মাখা।

আজি সেই ভাবাবেশ
সেই বিহ্বলতা যদি হয়ে থাকে শেষ,
প্রকৃতির স্পর্শমোহ গিয়ে থাকে দূরে,—
কোন দুঃখ নাহি। পল্লী হতে রাজপুরে
এবার এনেছ মোরে—দাও চিত্তে বল।
দেখাও সত্যের মূর্তি কঠিন নির্মল।"

কঠিন, নির্মল, সত্যের মূর্তি দেখাইতে হইবে, ভক্তি দাও। কিন্তু—

"যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল-ফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি নাথ!"

কবি অন্যত্র বলিতেছেন—

"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।"

গীতাঞ্জলিতে যদি খুঁজিতে যাওয়া যায় বৈষ্ণব কবির সুর অথবা রাম-প্রসাদ কি অন্য কোনও সাধকের সুর তাহা হইলে ব্যর্থমনোরথ হইতে হইবে। দাস্য, সখ্য, মধুররসের সমাবেশ আছে বটে, কিন্তু কতকটা সংযত; ভক্তের অভিমান, আব্দার, জুলুম এখানে নাই।

উপনিষদের কথা তুলিয়া কবি বলিতেছেন—

"তোমারে বলেছে যারা পুত্র হতে প্রিয়,
বিত্ত হতে প্রিয়তর, যা কিছু আত্মীয়
সব হতে প্রিয়তম নিখিল ভুবনে,
আত্মার অন্তরতর, তাঁদের চরণে
পাতিয়া রাখিতে চাহি হৃদয় আমার!
সে সরল শান্ত প্রেম গভীর উদার,—
সে নিশ্চিত নিঃসংশয়, সেই সুনিবিড়
সহজ মিলনাবেগ, সেই চিরস্থির
আত্মার একাগ্রলক্ষ্য, সেই সর্ব কাজে
সহজেই সঞ্চরণ সদা তোমা মাঝে
গম্ভীর প্রশান্ত চিত্তে, হে অন্তরযামী
কেমনে করিব লাভ?"

গীতাঞ্জলির বিরহ, মিলন ও প্রতীক্ষায় বেশ একটি সংযম আছে; ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান আছে। এই সংযম, এই ব্যবধান বৈষ্ণব সাধকদিগের ছিল না; কিন্তু ক্যাথলিক সেণ্টদিগের ছিল। তাই মনে হয়, এখানেও রবীন্দ্রনাথ সেই duality-র, সেই প্রাচ্যপ্রতীচ্য ভাবদ্বন্দ্বের হাত

এড়াইতে পারেন নাই। তাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মনে গীতাঞ্জলি হিব্রু বাইবেলের অধ্যায়বিশেষের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। তাই বিলাতে উহা এত আদরের সামগ্রী হইয়াছে।

য়ুরোপের আদরের সামগ্রী হইয়াছে শুধু এইটুকু বলিলেই কি যথেষ্ট বলা হইল? এইটুকু লইয়াই কি আমরা গৌরব বোধ করিব? এমন song offering আর কোন বাঙ্গালী কবি কি ভগবানকে গত শতাব্দীর মধ্যে দিতে পারিয়াছেন? যে নৈবেদ্য মাথায় করিয়া লইয়া বঙ্কিমবাবুর সমসাময়িক প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার আনন্দে নৃত্য করিতে পারেন, তাহার তুলনা আমাদের সাহিত্যে মিলে কি? রূপসনাতন, রামানন্দ, জ্ঞানদাসের বৈষ্ণবী প্রীতির কথা উত্থাপন করিবার আবশ্যকতা নাই; বৈষ্ণব কবির সহিত তুলনা করিয়া হয়ত রবীন্দ্রনাথের প্রতি অবিচার করিতেছি। তিনি যে দেশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দেশের মাটির রস তাঁহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভরিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; ভারতের যুগযুগান্তরের জন্মজন্মান্তরের সুখদুঃখপ্রবাহের বিচিত্র বিপুল স্পন্দন তাঁহার হৃদয়বীণায় ঝঙ্কার তুলিয়াছে; তাঁহার ভয় হয়, পাছে তিনি এই বাংলার মাটিতে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে না পান! তিনি বলেন—"আমি প্রায় রোজই মনে করি, এই তারাময় আকাশের নীচে আবার কি কখনো জন্মগ্রহণ করব? আর কি কখনো এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায় এই নিস্তব্ধ গোরাই নদীটির উপর বাংলাদেশের এই সুন্দর একটি কোণে এমন নিশ্চিন্ত মুগ্ধমনে জলিবোটের উপর বিছানা পেতে পড়ে থাকতে পাব? হয়ত আর কোনো জন্মে এমন একটি সন্ধ্যাবেলা আর কখনো ফিরে পাব না। তখন কোথায় দৃশ্য পরিবর্তন হবে—আর, কি রকম মন নিয়েই বা জন্মাব?_ এমন সন্ধ্যা হয়ত অনেক পেতেও পারি, কিন্তু সে সন্ধ্যা এমন নিস্তব্ধভাবে তার সমস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে আমার বুকের উপরে এত সুগভীর ভালবাসার সঙ্গে পড়ে থাকবে না। আমি কি ঠিক এমনি মানুষটি তখন থাকব! আশ্চর্য এই আমার সব চেয়ে ভয় হয় পাছে আমি য়ুরোপে গিয়ে জন্মগ্রহণ করি।"

আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, আত্মনিমগ্ন, ধ্যানাবস্থিত কবি ভাবিতে-ছেন—"এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত

হতে থাকত—আমি কত দূরদূরান্তর কত দেশদেশান্তরের জল স্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধ ভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎ-সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে।" কত যুগ ধরিয়া এই আনন্দপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে! গীতাঞ্জলিতে সেই আনন্দের নৈবেদ্য লইয়া ভবনদীর খেয়ায় পাড়ি দেওয়া হইয়াছে; সোনার তরী এক প্রকাণ্ড রহস্যাভিমুখে চলিয়াছে! কবি বলিতেছেন—"আমি একটা সজীব পিয়ানো যন্ত্রের মতো—ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে অনেকগুলো তার এবং কলবল আছে—কখন কে এসে বাজায় কিছু জানিনে—কেন বাজে তাও সম্পূর্ণ বোঝা শক্ত—কেবল কি বাজে, সেইটেই জানি—সুখ বাজে কি ব্যথা বাজে, কড়ি বাজে কি কোমল বাজে, তালে বাজে, কি বেতালে বাজে এইটুকুই বুঝতে পারি। আর জানি আমার অক্টেভ নীচের দিকেই বা কতদুর, উপরের দিকেই বা কতদুর। না—তাও কি ঠিক জানি?" কবি যেন বলিতেছেন—আমার এই "রাত্রি দিন ধুক্‌ধুক্, তরঙ্গিত দুঃখ সুখ"-পূর্ণ বুকের ভিতরে রহস্যময়ের বিচিত্র লীলা যেন কতকটা অনুভব করিতে পারি। যখন আমার জীবন-দেবতা রাজার দুলাল আমার ঘরের সমুখ পথ দিয়া চলিয়া গেলেন, আমার বুকের হার ছিঁড়িয়া একটি মণি তাঁহার চরণতলে নিক্ষেপ করিলাম; কিন্তু—

"মোর হারছেঁড়া মণি নেয় নি কুড়ায়ে
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে"—

তবু, এই ত্যাগটুকুতেই আমার আনন্দ। যখন তিনি মহারাজার ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হইয়া গভীর নিশীথে সুপ্ত পুরীর মধ্যে আমার কুটীরদ্বারে আঘাত করিলেন, তখন কোথায় শঙ্খ কোথায় সিংহাসন! রিক্ত দরিদ্র ভক্তের জীর্ণ আসনে তাঁহাকে উপবেশন করাইলাম। বৈষ্ণব কবির বৈরাগ্যপূর্ণ ভাবোন্মাদের সহিত তুলনা করিয়া দেখি নাই, কিন্তু আমিও কি বালিকাবধূর মত, দাসীর মত, নায়িকার মত তাঁহার প্রেম ভিক্ষা করি নাই? যে দিন তিনি বাসরশয্যায় তাঁহার তরবারিখানা রাখিয়া গেলেন, ভক্তিবিনম্রচিত্তে অবনত-মস্তকে আমি সেই দান কি শিরোধার্য করিয়া লই নাই?

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

এমন কথা আমি বলিতে পারি না বটে, কিন্তু আমার—

"ফেলিতে নিমেষ
দেখা হোলো শেষ,"

এইটুকুতেই আমার প্রেম চরিতার্থ হইয়াছে।

"লাখ লাখ যুগ হিয়া পর রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ন না গেল,"

প্রেমের এই তীব্র অতৃপ্তির সৌভাগ্য হইতে হয়ত আমি বঞ্চিত; কিন্তু আমি তাঁহাকেই যেন শতরূপে শতবার দেখিয়াছি ও ভালবাসিয়াছি; সেই শান্ত আনন্দটুকু চিরদিন "একমাত্র আমার নিতান্ত আপনার" জিনিস হইয়া আছে।

"আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয়
সখি, বহে যাহা মর্মমাঝে রক্তময়
বাহিরে তা কেমনে দেখাব?"

ডাকঘর

অজিতকুমার চক্রবর্তী

"We live within the shadow of a veil that no man's hand can lift. Some are born near it, as it were, and pass their lives striving to peer through its web, catching now and again visions of inexplicable things; but some of us live so far from the veil that we not only deny its existence but delight in mocking those who perceive what we cannot."

Laurence Alma Tadema.

উপরের কয়েকটি ছত্র পাঠ করিয়া সমালোচনা লিখিতে আর ভরসা হয় না, কারণ 'veil'-এর কাছাকাছি আছি এমন কথা তো বলিতে সাহস হয় না, অবগুণ্ঠনের ভিতরকার কথা তো কিছুই জানি না। তবে যাঁহারা জানেন তাঁহাদের পরিহাস করিতে আনন্দ পাই, এতবড়ো বর্বরতার অপবাদ ঘাড়ে করিতে রাজী নই।

যাঁহারা উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব শিক্ষা দেন তাঁহারা ফুলকে ছিঁড়িয়া তাহার অংশ-প্রত্যংশের কোন্‌টার কী কাজ তাহা বুঝাইয়া দেন। কিন্তু সাহিত্যের বাগানে যে ভাবের ফুলটি ফোটে তাহার সম্বন্ধে কি সেই একই প্রণালীতে তত্ত্ব খবর লওয়া যায়? সে বাগানে যাহারা যায় তাহারা কি তত্ত্বের জন্য যায়, না আনন্দের জন্য যায়? অনেকগুলি দল যে একটি বাঁধনে ধরা দিয়া অখণ্ড একটি ফুল হইয়া উঠিয়াছে ইহাতেই তো আনন্দ, আবার যদি ছুরি ধরিয়া সেই অখণ্ডতাকে খণ্ড খণ্ড করা যায় তবে আনন্দ থাকে কেমন করিয়া?

দ্রষ্টব্য: ১৩১৬ (ইং ১৯১০) সালে প্রকাশিত 'রাজা' নাটকের পর ১৩১৮ (ইং ১৯১২) সালের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত 'ডাকঘর' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাটক।

এই নাটক দুইটি সম্বন্ধে 'রবীন্দ্রজীবনকথা' গ্রন্থের লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আলোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "রবীন্দ্রনাথের যে দুটি নাটক বিশ্বসাহিত্যে স্থান পেয়েছে তা হচ্ছে 'রাজা' ও 'ডাকঘর'। এ দুটি নাটকের কোন 'জাত' নেই, অর্থাৎ যে-কোনো দেশের যে-কোনো লোকের মনের ব'লে এ দুটি স্বীকৃত হতে পারে।" এই উক্তি ব্যতীত তিনি আরও উল্লেখ

আমার মনে হয় যে, ভাল কাব্য বা সাহিত্যগ্রন্থ সম্বন্ধে এইটুকু বলাই পর্যাপ্ত যে, ইহা আমার খুব ভাল লাগিয়াছে বা ইহা পড়িয়া আমি বড়ো আনন্দ পাইয়াছি। কবির সৃষ্টির যে আনন্দ তাহাই পুনরায় নিজের মধ্যে সৃজন করিয়া তোলা, ইহারই নাম সমালোচনা। কবি যে ফুল ফোটান সমালোচক ঠিক তারই পাশে তারই অনুরূপ আর একটি ফুল ফোটান, ভালো সমালোচনা সেইজন্যই এক রকমের সৃষ্টি। কিন্তু হায়, তেমন সমালোচনার শক্তি কিংবা সুযোগ কোথায়? ইচ্ছা থাকিলেও ঠিক মনের আনন্দটুকু জ্ঞাপন করিয়া এখন বিদায় লওয়া যায় না। তাহার কারণ, কবির সঙ্গে পাঠকদের সঙ্গে এখন বোঝাপড়া নাই। কবির আসরে পাঠকেরা স্থান পায় না; কবি থাকেন 'hidden in the light of his thought'—আপনার চিন্তার আলোকে আপনি আবৃত। কাজেই বেচারা সমালোচককে মধ্যস্থের কাজ করিতে হয়। একবার কবির দরবারে, একবার পাঠকদের আড্ডায়, দুই জায়গায় ঘুরিয়া তাহাকে সংবাদ বহন করিয়া বেড়াইতে হয়। যদি লেখকে পাঠকে কোন ব্যবধান না থাকিত তবে সমালোচকও আপনার কাজ সহজে করিতে পারিতেন। অনেক কথার জঞ্জাল জড়ো করিবার উপদ্রব তাঁহাকে সহ্য করিতে হইত না।

'ডাকঘর' ও তাহার পূর্ববর্তী 'রাজা' যে ধরনের নাটক, এ ধরনের নাটক বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে নূতন। বলা বাহুল্য এ দুইটিই 'হেঁয়ালি'-শ্রেণীভুক্ত। ইহার পূর্বে বোধ হয় 'সোনার তরী' এবং 'পরশপাথর' ধরনের কবিতা ছাড়া কবি আর এমন কিছুই লেখেন নাই যাহার জন্য তাঁহাকে লোকে দুর্বোধ বলিয়া অপবাদ দিয়াছে। ঐ কবিতাগুলিই ঠিক কোন নির্দিষ্ট অর্থের মধ্যে ধরা দিতে নারাজ।

করিয়াছেন যে, "এই দুটি নাটক য়ুরোপের শিক্ষিত চিত্তকে খুবই আকর্ষণ করে; য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে এর অভিনয় হয়।"

রবীন্দ্র-ভক্ত ও বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক অজিতকুমার চক্রবর্তীর এই আলোচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'ভারতী' (চৈত্র, ১৩১৮) পত্রিকার ৩৫শ বর্ষের ১২শ সংখ্যায়। রবীন্দ্রনাথের এই নাটকটি ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়; তৎকালে ইহার মূল্য ছিল মাত্র ছয় আনা। পরবর্তীকালে ১৩২২ সালে অজিতকুমারের 'কাব্যপরিক্রমা' গ্রন্থে ইহা প্রথম মুদ্রিত হয়।

'ডাকঘর' রবীন্দ্র-রচনাবলীর একাদশ খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

অথচ সেই পূর্বের রূপকজাতীয় কবিতার সঙ্গে আর এখনকার এই নাটকগুলির সঙ্গে আমি ভারী একটি মিল এক জায়গায় দেখিতে পাই। আমার মনে হয়, ইহাদের মূল ভাব একই, কেবল রূপ স্বতন্ত্র। কতকগুলি রস যাহা কাব্যের বিষয়ীভূত বলিয়া নির্দিষ্ট আছে তাহাদের সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত আছি, কিন্তু তাহাদের মধ্যেই যে মানুষের সমস্ত ইমোশন্‌ অর্থাৎ হৃদয়াবেগের প্রকাশ নিঃশেষিত হয়, তাহা নহে। প্রেম ভক্তি করুণা সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তি যে রসোদ্রেক করে তাহার ধারণা আমাদের মনে সুস্পষ্ট, কিন্তু অনন্তের জন্য পিপাসা যে রসকে জাগায়, তাহার ধারণা তো তেমন স্পষ্ট হইবার নহে। কারণ, সেই বিশেষ অনুভূতিটাই কোনো নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ধরা দেয় না, সেই কারণে তাহাকে ভাষায় প্রকাশ করা আরও কঠিন হইয়া বসে। তখন symbol অথবা বিগ্রহকে আশ্রয় করিতে হয়, অর্থাৎ ইঙ্গিতে ইশারায় সেই রসের খানিকটা আভাস দিতে হয়।

'সোনার তরী' মানেই কোন বিশেষ রূপ নয়, কিন্তু অপরূপ। কালিদাস বলিয়াছেন যে, 'রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্‌'—রম্য দৃশ্য দেখিয়া এবং মধুরধ্বনি শ্রবণ করিয়া, মন যখন পর্যুৎসুক হয় তখন 'জননান্তরসৌহৃদানি', জন্মজন্মান্তরের ভালোবাসার কথা মনে পড়ে। এই যে একটি রস ইহাকে কী নাম দিব? উপলক্ষটা হয়ত কোনও বিশেষ রূপ বা বিশেষ ধ্বনি, কিন্তু তাহাকে ছাড়াইয়া মন যে উতলা হয় সে এমন একটি অপরূপ সুদূরের জন্য, যাহার কোন নাম নাই, রূপ নাই। বর্ষার ভরা নদী হয়তো 'সোনার তরী'র উপলক্ষ, কিন্তু সে যে বিরহকে জাগায় তাহা আর তাহাকে আশ্রয় করিয়া তো থাকে না।

কিন্তু কেনই বা symbol লইয়া এত বকাবকি করিতেছি? আমাদের দেশে এটা তো অপরিচিত জিনিস নহে। হিন্দুর ধর্মকর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, শিল্প, সমস্তই ভাবের বিগ্রহে আগাগোড়া মণ্ডিত। হিন্দু তো এ কথা বলে না যে, ভাবকে কোনোদিন কেহ জানিয়া, ব্যবহার করিয়া, বলিয়া শেষ করিয়া দিতে পারে। সেইজন্যই তো সে চিহ্ন মানে, বিগ্রহ মানে—সে জানে যে, ভাব অসংখ্যরূপে আপনাকে ক্রমাগত লীলায়িত করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে এবং সেই-সমস্ত রূপরূপান্তরকে অনন্তগুণে অতিক্রম করিয়াও বিরাজ করে। হিন্দুর চিত্ত কেন না বলিবে যে, 'সোনার তরী' বল, 'চিঠি' বল, 'পরশপাথর'

বল, 'রাজা' বল, ও সমস্তই ছল ;—অনন্ত সৌন্দর্যকে একটি মূর্তির মধ্যে ক্ষণকালের মত বাঁধিবার আয়োজন ;—ও যে ছল এইটুকু উহাকে দিয়া বলানোই উহার চরম সার্থকতা ?

আসল কথা, অনন্তের রসবোধ যখন সাহিত্যের দরবারে আসিয়া রূপ প্রার্থনা করে, তখন সাহিত্যস্রষ্টাকে বিপদে পড়িতে হয়। তাহাকে পণ করিতে হয় কী করিয়া রূপ দিয়াও রূপ না দেওয়া যায়। কারণ, রূপ যে সীমাবদ্ধ, সে এমন ভাবকে কী করিয়া প্রকাশ করিবে যাহা সীমায় ধরা দিবে না ? তখন তাহার একমাত্র সম্বল হয় উপমা বা রূপক। উপমা খানিকটা বাঁধে, খানিকটা আলগা রাখে। সে বাঁধন এতই সুকুমার যে তাহার আবরণ সরাইয়া ভাবকে দেখা কিছুমাত্র কঠিন হয় না।

আশা করি, আমি কেন পূর্ব পূর্ব কোন কবিতা এবং আধুনিক নাটক-গুলির মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করিয়াছি তাহা পাঠকের নিকট স্পষ্ট হইয়াছে। আমি বলিতে চাই এই যে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রূপের ভিতরে অপরূপকে দেখিবার জন্য একটা বেদনা আছে বলিয়াই তাঁহাকে অপরূপের ভাবটিকে এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হইয়াছে যাহাতে সে নির্দিষ্ট না হইয়া উঠে। অর্থাৎ, তাঁহাকে symbol আশ্রয় করিতে হইয়াছে।

Symbol লইয়া এত ব্যখ্যাবাহুল্য করিবার আর একটু কারণ আছে। symbol-এর ঠিক অর্থটি হৃদয়ঙ্গম না করিয়া অনেকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করিয়া বসেন, তবে 'সোনার তরী'টা কী, তাহার উদ্দিষ্ট মানুষটি কে ? সোনার ধানটা কী ? অমল কি তবে মানবাত্মা ? চিঠি মানে কি মুক্তি ? অর্থাৎ, তাঁহারা সমস্ত একেবারে সুনির্দিষ্ট করিয়া লইতে চান। আধ্যাত্মিক সত্যকে এই সকল লোকই বৈজ্ঞানিক সত্যের মত পরিষ্কার না দেখিতে পারিলে অধীর হইয়া উঠেন এবং ধর্মকে কল্পনা বলিয়া উপহাস করিতে উদ্যত হন। ইঁহারা একটা কথা মনে রাখেন না যে বুদ্ধির উপরেও মানুষের একটা intuition, একটা সহজ প্রত্যয় আছে ; বুদ্ধি যেখানে নাগাল পায় না, সেই-খানে তাহার শরণাপন্ন হইতে হয়।

'ডাকঘর'কে symbolical অর্থাৎ বিগ্রহরূপী নাট্য নামকরণ করা গেল। এটা ঠিক নাম নয়, কিন্তু নির্দেশমাত্র। এখন দ্বিতীয় কথা এই যে, ইহা নাটিকা বটে, অথচ ইহার মধ্যে নাটকত্ব কিছুই নাই। অর্থাৎ কোন গল্পও নাই, ঘটনাও

বড়ো নাই। তবে ইহাকে 'সোনার তরী' গোছের কবিতার মত করিয়া লিখিলেই হইত, নাটিকা বলিয়া আড়ম্বর করিবার কী প্রয়োজন ছিল?

একটি রুগ্ন বালকের সৌন্দর্য-মুগ্ধ কল্পনা-পীড়িত চিত্ত বিশ্বের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য ব্যাকুল, শুধু এই ভাবটুকু যদি থাকিত তবে তাহা গীতে ব্যক্ত করা যাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু অমলের সঙ্গে সঙ্গে মাধবদত্ত, ঠাকুরদা, মোড়ল, সুধা প্রভৃতি যে মানুষগুলিকে উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যে নানা বৈচিত্র্য আছে। কেহ বা অনুকূল, কেহ বা প্রতিকূল। সুতরাং ঐ মূলভাবটুকুকে সূত্রের মত করিয়া এই সকল বৈচিত্র্যকে তাহার সহিত সম্মিলিত করিয়া একটি স্ফাটিক ব্যূহ রচনা করিতে হইয়াছে। এই বিচিত্রতার সমাবেশেই তো নাট্যরস। শুধু একটিমাত্র ভাবের রস হইলে গীতিকবিতার রূপ গ্রহণ করা উচিত ছিল। সুতরাং এ নাটিকার শেষ পর্যন্ত না পড়িলে পুরা রসাস্বাদন হয় না, ইহা মাঝখানে পড়িয়া থামিবার জো নাই।

ঘটনার পর ঘটনা সাজাইলেই কি সব সময়ে ঔৎসুক্য বেশি করিয়া জাগে? আমার তো মনে হয় ভিতরের চিন্তা কল্পনা ও অনুভূতির একটা ক্রমবিকাশের গতিবেগ, বাহিরের ঘটনাপুঞ্জের গতিবেগের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল। যেমন ধরো 'গোরা' উপন্যাসটি। তাহার উপাখ্যান-অংশটুকু এক নিশ্বাসে শেষ করা যায়। কিন্তু মানবহৃদয়ের কী বেগবান্ প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাত ঐ উপন্যাসে তরঙ্গিত হইয়া চলিয়াছে—অধ্যায়ে অধ্যায়ে, এমন কি ছত্রে ছত্রে, যে ঔৎসুক্য খাড়া হইয়া জাগিয়া থাকে—এমন কোন্ ঘটনা-বহুল উপন্যাসে থাকে আমি তো জানি না।

এই নাটিকাটিতেও কবি-জীবনের যে সকল নিগূঢ় অভিজ্ঞতা, প্রকৃতির সৌন্দর্যের যে সকল সূক্ষ্ম অনুভাব নানা স্থানে মূর্তিলাভ করিয়াছে, কল্পনা-প্রবণ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা পাঠ করিতে করিতে পদে পদে বিস্ময় অনুভব করিতে থাকিবেন। ঠিক যেন একটি অজানা দেশের মত। তাহার পথের প্রত্যেক মোড়ে, প্রত্যেক বাঁকে নব নব বিস্ময়—তাহা ছাড়া তাহার নানা গলিঘুঁজির তো কথাই নাই। সেই বিস্ময়ের আলোড়নেই সমস্ত নাটিকাটি সজীব হইয়া আছে।

মাধবদত্ত সংসারী লোক, সে তাহার স্ত্রীর গ্রামসম্পর্কে ভাইপো অমলকে পোষ্য লইয়াছে। ছেলেটি রুগ্ন—শরতের রৌদ্র আর হাওয়া যাহাতে ছেলেটি

না লাগায়, সে বিষয়ে কবিরাজ মাধবদত্তকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে। অমলের মন বাহিরে যাইতে না পারিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। সে তাহার বাড়ীর জানালার নিকটে বসিয়া থাকে—দূরে পাহাড় দেখা যায়—পাহাড়ের নীচে ঝরনা, ঝরনাতলায় ডুমুরগাছ। জানালার সাম্‌নেই রাজপথ—ফিরিওয়ালা সুর করিয়া ফিরি করে, রাজার প্রহরী মধ্যাহ্নের স্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজায়। ঐ দুর পাহাড়, ঐ ঝরনা, ঐ ফিরিওয়ালার সুর, ঘণ্টার ঢং ঢং তাহাকে আনমনা করিয়া দেয়—কোন্‌ সুদূরের একটি ডাক তাহার বুকের মধ্যে বহন করিয়া আনে।

'জীবনস্মৃতি' এবং 'ডাকঘর' প্রায় একই সময়ে বাহির হইয়াছে, সুতরাং এ দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কল্পনা করিতে পারি না কি? সেই ফিরিওয়ালার ডাক, রাত্রে ঘণ্টার শব্দ, সেই কল্পনাভারাক্রান্ত মন—এ তো কোনমতেই আমাদের অপরিচিত নয়?

'ক্ষণিকা'য় 'কবির বয়স' কবিতায় কবি তাঁহার কেশে পাক ধরিয়াছে শুনিয়া মহা রাগ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তিনি সকলের সঙ্গে একবয়সী। প্রৌঢ় বয়সে তিনি যে কবিতা লিখিয়াছেন—

"আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী!
দিন চলে যায়, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে"—

তাহার সুরের সঙ্গে বাল্যজীবনস্মৃতির সুর মেলে এবং ডাকঘরেরও সুর মেলে। কবির বয়স যে চিরকাল সমানই থাকিয়া যায়, তাহার প্রমাণ হাতে হাতে পাওয়া যায় বটে।

বাস্তবিক এই সুদূরের জন্য ব্যাকুলতার ভাবটিই ডাকঘরের মূল ভাব।

কবির মুখে অনেকবার শুনিয়াছি যে, তিনি অনেক সময় এই পৃথিবীর পরিচিত দৃশ্য শব্দ গন্ধকে এমন ভাবে অনুভব করিতে চেষ্টা করেন যেন এই পৃথিবীতে তিনি সদ্য আসিয়াছেন। এখানে সমস্তই যেন নূতন, কিছুই যেন তাঁহার পরিচিত নহে। এই যে নিকটতম, অভ্যস্ততম, পরিচিততম জিনিসকে বহুদূরের একটি বিরলব্যাপ্ত সৌন্দর্যের মধ্যে ছাড়া দিয়া দেখা, ইহাতেই

অভ্যাসের ও পরিচয়ের জড় আবরণ তাহার মুখের উপর হইতে সরিয়া যায়—সে আশ্চর্য সুন্দর হইয়া উঠে।

এমন করিয়া দেখিলে সমস্তই কী রহস্যময়! দইওয়ালা যে রাস্তা দিয়া দই হাঁকিয়া চলিয়াছে, সে তো একটি স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন মানুষ নয়। তাহার চারি দিকে কত দূরদূরান্তরের কত সৌন্দর্য ঘিরিয়া আছে—সেই পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায় সৌন্দর্য, সেই শামলী নদীর সৌন্দর্য, সেখানকার সেই লাল মাটির রাস্তাটি, বড় বড় গাছের ছায়া, পাহাড়ের গায়ে যে গরু চরিতেছে তাহাদের সৌন্দর্য, সেই যে গোপবধূরা ডুরেশাড়ি পরিয়া জল তুলিয়া লইয়া যাইতেছে তাহাদের সৌন্দর্য, সেই গ্রামের সমস্ত স্নেহ-প্রেম-মাধুর্যের কত সৌন্দর্য! এই সবই সেই দইওয়ালাকে বেষ্টন করিয়া আছে। তাই তো সে এমন রমণীয়। তাই তাহার ফিরির সুরটিকে বিশ্ব-বাঁশির মত সকরুণ করিয়া দিয়াছে। বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে তাহার কোন মাহাত্ম্যই নাই।

তেমনি ঐ যে সম্মুখের পথটি, তাহারও রহস্য ঐখানে—সে যে বহুদূরের যাত্রীকে ক্ষণিকের মত, চকিতের মত, একবার ঐ একটি জায়গায় দাঁড় করাইয়া দেখাইতেছে—বলিতেছে, অনন্ত প্রবাহের একটিমাত্র পরিপূর্ণ মুহূর্তের ছবিখানি দেখ! অনন্ত সমুদ্রকে একটিমাত্র তরঙ্গের মধ্যে দেখ! ইহার পশ্চাতে অনন্ত সমুদ্র—ইহার সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র—সেই সমস্ত প্রবাহ যেন এই একটি তরঙ্গে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে।

তার মানে কী? তার মানে এই যে, আমরা এখানে যাহা কিছু দেখিতেছি বা পাইতেছি তাহা ক্রমাগতই চলিবার মুখে, সরিবার মুখে। আমরা তাহার আদিও জানি না, তাহার অন্তও জানি না, জানি শুধু তাহার মাঝখানের খণ্ড একটুখানি কালের কথা। সেই খণ্ডকালে যেটুকু যাহা দেখিতেছি, তাহাকেই বাস্তব বলিয়া, সত্য বলিয়া যে আমরা চাপিয়া ধরি, তাহাতেই তাহাকে হারাই, তাহার যথার্থ সত্তাকে পাই না। যদি সেই খণ্ডকালের খণ্ড জিনিসের উপর তাহার অনাদি অতীত এবং অনন্ত ভবিষ্যতের একটি আলো ফেলিয়া সে খণ্ডের মধ্যে একটি অখণ্ডের পরিচয় পাই, তবেই সেই জিনিস আশ্চর্য অপরূপ বলিয়া প্রতিভাত হইবে। তাহা তখন এক দিকে ব্যক্ত, অন্য দিকে অব্যক্ত; এক দিকে সসীম, অন্য দিকে অসীম; এক দিকে রূপ, অন্য দিকে অপরূপ। তখন সে কী বিস্ময়, কে তাহা বর্ণনা করিবে?

এ তত্ত্বের কথা নয়, কিন্তু দৃষ্টির কথা। এই দৃষ্টি লইয়াই কবি রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বুদ্ধি যে মানুষের শেষ সম্বল নয়, তাহার সঙ্গে যে কেবল বহির্বিষয়মাত্রের যোগ, মানুষের অধ্যাত্মপ্রকৃতির গভীরতা পরিমাপ করিতে বুদ্ধি যে অক্ষম, এ-সকল কথা আধুনিক যুগে ইউরোপের তত্ত্বজ্ঞানীদল স্বীকার করিতেছেন দেখিতে পাই। দার্শনিকশ্রেষ্ঠ আঁরি বের্গসঁ (Henry Bergson) বলেন, "আমাদের বুদ্ধি এবং বাহিরের বিষয় পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষা রাখে; (Creative Evolution, ১৯৭ পৃ)। চৈতন্যকে যদি বুদ্ধির গণ্ডী দিয়া ঘিরিয়া রাখ তবে তাহা বাহ্যবিষয়ের সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়িবে।" সুতরাং বুদ্ধির দৃষ্টি খণ্ডিত দৃষ্টি—আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সমগ্রতা তাহার নাই। কিন্তু যাঁহারা মানবচিন্তা যে কতদূর অগ্রসর হইতেছে তাহার কোন সংবাদ রাখেন না, তাঁহারা সকল বড় জিনিসকেই পরিহাস করিতে থাকিবেন। ইহাদেরই জন্য কি ম্যাথু আর্নল্ড্‌কে 'ফিলিস্‌টাইন' কথাটা উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল?

ডাকঘরের মূলভাব না হয় বুঝা গেল, কিন্তু 'ডাকঘর', 'চিঠি', 'রাজা' প্রভৃতি ব্যাপার কী? এই যে কল্পনাব্যাকুল সৌন্দর্যানুভূতিময় চিত্ত ইহাকে রুগ্ন করিয়া, ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিবারই বা তাৎপর্য কী এবং রাজার চিঠির জন্য উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিবারই বা অর্থ কি?

আমরা যে রুগ্ন এবং বদ্ধ কেন, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার কী প্রয়োজন আছে? আমরা বাহির হইতে চাই, এ কথাটা যতখানি সত্য, ততখানি সত্য এই কথাটাও যে, আমাদের অন্তরে বাহিরে নানা বাধা জড়াইয়া আছে। বারবার কি আমাদের বদ্ধ ঘরে অভিসারের বাঁশির ডাক আসে না? কিন্তু হায়, বাঁধন কি একটি, নিষেধ কি সামান্য?

মাধবদত্ত-কবিরাজরূপী সংসার তো আছেই, সুধাও আসিয়া যে আধখানা দরজা খোলা আছে তাহাও বন্ধ করিয়া দিতে চায়!

"ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
সে কথা যে যাই পাসরি!"

কিন্তু কল্পনা তো বাঁধ মানে না, সে যে পাখা মেলিয়া সর্বত্র উড়িতে চায়!

তার পথ, সে সব দেখিবে, সব কিছুর আনন্দ সম্ভোগ করিবে। কিন্তু সন্ধ্যা-বেলায় তাহাকেও কুলায়ে ফিরিতে হয়। তখন বলিতে হয়—

"অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা!
এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি।"—খেয়া

এইরূপে কবির জীবন যখন গিয়া আধ্যাত্মিক জীবনে মিলিয়া যায়, তখন ঐ একটিমাত্র ইচ্ছা প্রাণ জুড়িয়া বাজে যে, তাঁর চিঠি চাই—তিনি কবে আসিবেন? সেইখানেই যে সমস্ত বিচিত্রতার অবসান, সেইখানেই সমস্ত জীবনের পরিপূর্ণ পরিসমাপ্তি!

নাটিকার মধ্যে এই যে এক ভাব হইতে আর এক ভাবে গিয়া পড়িতেছি, (Progression of thought), ইহাতেই তাহার মধ্যে একটি গতিসঞ্চার হইয়াছে। এখন আর পথের ধারে অনেকের সনে দেখা নয়, এখন ঘরের মধ্যে চিঠির জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকা, এখন আর বহুবিচিত্রতাময় দিন নয়, এখন শীতল অন্ধকারপূর্ণ রাত্রি!

নাটিকার পরিণামটা আমার স্পষ্টতই মৃত্যু বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাঠকমাত্রেই জানেন যে তিনি জীবনকে এবং মৃত্যুকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখেন না, তিনি মৃত্যুকে জীবনেরই পূর্ণতর পরিণাম বলিয়া মনে করেন। 'সিন্ধুপারে' কবিতাটিতে এই ভাব, 'ঝরনাতলা' কবিতাটিতেও এই একই ভাব, যে, জীবনে যেটা ঝরনারূপে সাত পাহাড়ের সীমানার মধ্যে রহিয়াছে, মৃত্যুর পরে তাহাই সেই সীমা অতিক্রম করিয়া নদী হইয়া বহিয়া গিয়াছে, মৃত্যু ছেদ নয়, সে পরিপূর্ণতা।

শুধু তাই নয়। পূর্বের কোন কোন কবিতাতে কবি মৃত্যু-মাধুরীর কথাও বলিয়াছেন।

"পরান কহিছে ধীরে, হে মৃত্যু মধুর
এই নীলাম্বর একি তব অন্তঃপুর?"—চৈতালি

মৃত্যু যেন একটি পরিপূর্ণ সুদূর—সমস্তই তাহাতে বিলম্বিত হইয়া সীমা-আবরণ উন্মোচন করিয়া মধুর হইয়া উঠে। আমরা একটু আগে ডাকঘরের যে মূল ভাবটির কথা আলোচনা করিয়াছি, মৃত্যুকে এমন পরিপূর্ণ ও মাধুর্যময় করিয়া দেখিলে সে ভাব মৃত্যুর সঙ্গে দিব্য সংগত হয়।

কারণ, কিছুই যে থাকিবে না, সেইজন্যই তো বাস্তবিক সমস্তই এমন সকরুণ, এমন সুন্দর। মৃত্যু আছে বলিয়াই জগতের কোথাও কোন ভার নাই। সমস্তই একটি সুদূরের ব্যাপ্ত বিষাদে বেদনার মত বাজিতেছে। সুতরাং এখানে মৃত্যু যদি পরিণাম হয়, তবে তাহাকে কোনমতেই খাপছাড়া বা আকস্মিক বলা চলে না। কবি যে বলিয়াছেন,

"সে এলে সব আগল যাবে ছুটে
সে এলে সব বাঁধন যাবে টুটে!"

মৃত্যু যেন সেই একটি বন্ধনমোচনের আনন্দ হইয়া উঠিবে।

তবে কি রাজার চিঠির জন্য অমলের যে ব্যাকুলতা সে এই মৃত্যুর জন্য ব্যাকুলতা?

না। সে কথা বলিলে রাজার চিঠিকে অত্যন্ত ছোট করিয়া দেখা হইবে।

রাজা যে অমলের মত ছোট মানুষেরর কাছে আসিতে পারেন এই কথাই তো মোড়ল-জাতীয় লোক বিশ্বাস করে না—তাহারা পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দেয়। তাহারা জানে যে, তিনি রাজা—তিনি কেবল বড় বড় মানুষকেই দেখা দেন। কিন্তু তাঁহার যে একটি আনন্দ ঐ ছোট বালকের উপরেও অনন্ত হইয়া আছে, উহার নামে যে তিনি কোন্ অনাদিকাল হইতে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, কতবার যে সেই লিপির আহ্বান কত প্রভাতে সন্ধ্যায় বহিয়া গিয়াছে,—তাহা কি মোড়ল-জাতীয় বুদ্ধিজীবী অবিশ্বাসীরা জানে? না মাধবদত্তের মত ঘোর সংসারীরা জানে? একমাত্র লোক যে সেই বার্তা জানে সে ঠাকুরদা।

'শারদোৎসব' নাটকের সময় হইতেই এই ঠাকুরদাকে কবির প্রয়োজন হইয়াছে। এই একটি মুক্তপ্রাণ মানুষ—যে সকলের সঙ্গে সব হইয়া আছে, যে পরিপূর্ণ আনন্দকে জানে—ইহাকে নহিলে কবির কল্পনাগুলি সমর্থন পাইবে কেমন করিয়া? সোনার তরী, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, হাল্কা দেশ প্রভৃতি ব্যাপার যে সত্যসত্যই আছে—সে কথার সাক্ষ্য ঠাকুরদা ভিন্ন দিবে কে? ফিলিস্টাইন্-দলকে শাসাইয়া সংযত করিয়াই বা রাখিবে কে?

ঠাকুরদা বলিতেছেন—'শুনেছি ত তাঁর চিঠি রওনা হয়ে বেরিয়েছে।' কিন্তু কবে?

"আমার মিলন লাগি তুমি
আস্‌ছ কবে থেকে ?"

* * *

অমল উত্তর করিতেছে—"তা আমি জানি নে। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই—মনে হয় যেন আমি অনেকবার দেখেছি—সে অনেক দিন আগে—কতদিন তা মনে পড়ে না। বলব? আমি দেখতে পাচ্ছি, রাজার ডাক-হরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই নেমে আসছে—বাঁ হাতে তার লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি। কত দিন কত রাত ধ'রে সে কেবলি নেমে আসছে। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝরনার পথ যেখানে ফুরিয়েছে সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধরে সে কেবলি চলে আসচে—নদীর ধারে জোয়ারির খেত; তারি সরু গলির ভিতর দিয়ে দিয়ে সে কেবলি আসচে—তার পর আখের খেত—সেই আখের ক্ষেতের পাশ দিয়ে উঁচু আল চলে গিয়েছে, সেই আলের উপর দিয়ে সে কেবলি চলে আসচে—রাত দিন একলাটি চলে আসচে; * * * যতই সে আসচে দেখচি, আমার বুকের ভিতরে ভারি খুশী হয়ে হয়ে উঠছে।"

সুতরাং এ চিঠি কখনই সে চিঠি নয় যে, অমুক দিন অমুক সময়ে তোমার মৃত্যু ঘটিবে। এ চিঠি সেই চিঠি যে, 'আমি তোমাকে বড়ো আদর করিয়া আমার এই আহ্বানলিপি পাঠাইলাম। তুমি আমার, তোমাতে আমার আনন্দ আছে।'

আমি এই জায়গায় আমার পাঠকদিগকে রবীন্দ্রনাথের 'চিঠি' নামক কবিতাটি স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। সে চিঠিখানিও বিশ্ব-চিঠি, তাহার লিখন কবি জানেন না, কে লিখিয়াছে তাহাও জানেন না—কিন্তু পাইয়াছেন এই সুখেই তিনি খুশি, তাঁহার বুকের ভিতরটা আনন্দিত হইয়া উঠিতেছে।

অমল তাই ঠাকুরদাকে বলিতেছে যে, প্রথমে যখন তাহাকে ঘরে বসাইয়া রাখিয়াছিল, তাহার মন ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, এখন ডাকঘর দেখিয়া অবধি প্রত্যহই তাহার ভালো লাগে, "ঘরের মধ্যে বসে বসেই ভাল লাগে।" 'একদিন আমার চিঠি এসে পৌঁছবে সে কথা মনে করলেই আমি খুশী হ'য়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারি।'

এইবার পরিণামে আসা গিয়াছে। চিঠি পাইবার ভরসার পর পরিণাম সত্যই পরিণাম, পরিণাম পরিপূর্ণতা!

প্রথমে আমরা বিশ্বে বাহির হইবার ব্যাকুলতা দেখিলাম, তার পর রাজার চিঠির প্রত্যাশায় ঘরে চুপ করিয়া থাকিতেও ভাল লাগে দেখিলাম।

এখন দেখি * * * "চোখের উপরে থেকে থেকে অন্ধকার হয়ে আসচে। কথা কইতে আর ইচ্ছে করচে না। রাজার চিঠি কি আসবে না?"

বোধ হয় জগতের কোন কবিই মৃত্যুকে জীবনের বর বলিয়া কল্পনা করেন নাই—জীবনে মৃত্যুতে যে বিবাহের অতিনিবিড় সম্বন্ধ সে কথা বলেন নাই। রবীন্দ্রনাথের মাঝের বয়সের কবিতায় জীবন ছিল 'বালিকা বধূ', তখন তাহার বরকে ভয় করিত—'প্রতীক্ষা' প্রভৃতি কবিতায় তাই তিনি আরও কিছু-দিনের মত খেলাধুলার ঘরের মধ্যে বাস করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শেষবয়সের কবিতায় ক্রমাগতই তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

> "ওগো আমার এই জীবনের শেষ
> পরিপূর্ণতা
> মরণ, আমার মরণ, তুমি কও
> আমারে কথা!"

সুতরাং রাজদূতকে তিনি যদি মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে উপস্থিত করেন তাহাতে কিছুই আশ্চর্য নাই!

তবু শেষমুহূর্ত পর্যন্ত সংশয় যায় না। বাহির হইতে মোড়লের অবি-শ্বাসের পরিহাসের খোঁচাও আছে। কিন্তু যে অবিশ্বাসী সে সত্যকেই অবিশ্বাস করে কিনা, সে হাঁ-কেই না বলিতে চায় কিনা, তাই তাহার অবিশ্বাসই তাহার বিশ্বাসকে যথার্থরূপে পাইবার উপায় হইয়া দাঁড়ায়। সত্যকে সে যত আঘাত করে, ততই তাহার নিজের অবিশ্বাসের প্রাচীর একটু একটু করিয়া ভাঙিয়া যায়, শেষে সে দেখে যে সে পরিহাসচ্ছলে যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য সত্যই ঘটে। সে জানে না যে, অক্ষরশূন্য কাগজেই রাজার চিঠি আসে। কারণ, তাঁহার চিঠির তো বাহ্যিক কোন নিদর্শন নাই, সে চিঠি আমাদের আশা এবং নির্ভরের ভিতরে আসিয়া যে পৌঁছায়। মুড়িমুড়কি খাইতেও তিনি সামান্য লোকের ঘরেই আসেন—কারণ, তাঁহার আসা যে নিঃশব্দ গোপন—তিনি তো আগে

ভাগে জানাইয়া কাহাকেও দেখা দেন না। সে একেবারেই আচমকা হঠাৎ আবির্ভাব, তাহার জন্য কেহই কখনই প্রস্তুত থাকে না।

মোড়লের পরিহাসের মধ্যে ঠাকুরদা এই সত্যটিকেই দেখিতে পাইলেন। তিনি অমলকে ইহা পরিহাস বলিয়া বুঝিতেই দিলেন না। রাজারই চিঠি আসিয়াছে। রাজাই স্বয়ং আসিতেছেন! হাঁ, এই কথাই সত্য!

তারপর রাজদূতের প্রবেশ এবং রাজ-কবিরাজের আগমন। দ্বার ভাঙিয়া গেল, প্রদীপ নিবিয়া গেল, ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা এক নিমেষে খুলিয়া গেল; অর্ধরাত্রে রাজা আসিবেন শোনা গেল। অমল স্থির করিল যে, সে তাঁহার ডাকহরকরার কাজটি প্রার্থনা করিবে। বাস্তবিক কবি কি সেই কাজই করেন না? শূন্য কাগজে অক্ষর পড়িয়া দেওয়াই তো তাঁহার প্রধান কাজ!

নাটিকা সমাপ্ত হইল।

রবীন্দ্রনাথের এইখানেই আশ্চর্য কৃতিত্ব যে, তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন-নাট্যের নানা অঙ্কের বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলিকে এমন সরল একটি সূত্রের মধ্যে ভরিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা, সৌন্দর্যব্যাকুলতা, আধ্যাত্মিক বেদনা, সংশয়, দ্বন্দ্ব, অপেক্ষা, শান্তি সমস্তই এই নাটিকায় কোথাও হয়ত একটি ছত্রে বা আধখানি পংক্তিতে তিনি ছুঁইয়া ছুঁইয়া গিয়াছেন;—কোথাও বা সোজা পথ ছাড়িয়া গলিতে ঘুঁজিতে এমন সব রহস্য ছড়াইয়াছেন যে, বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। যেমন সুধার কথা। সে অমলের আধখানা দরজা বন্ধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল;—তাহার সেই ক্ষনিক মোহটুকু সে অমলের মৃত্যুর পরেও রাখিয়া গেল,—সে বলিল—"ও যখন জাগবে তখন বোলো যে সুধা তোমাকে ভোলেনি।" এই এতটুকুর মধ্যে সমস্ত নারী-প্রকৃতির একটি রহস্য কবি কৌশলে ছুঁইয়া গিয়াছেন। শেষ ক'টি কথা ব্রাউনিং-এর Evelyn Hope-এর শেষ ছত্রগুলি মনে করাইয়া দেয়—মৃত Evelyn-এর প্রণয়ী বলিতেছে—"এই একটি পল্লব আমি তোমার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিলাম, ঘুমাও, যখন জাগিবে তখন তোমার মনে পড়িবে, তখন সব বুঝিতে পারিবে।"

এমন ইঙ্গিত কতই আছে!

ইউরোপেও Symbolical নাটকের যুগ শুরু হইয়াছে। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের এই নাটিকাটি মেটারলিঙ্কের নাট্যগুলি স্মরণ করাইয়া দেয়। লরেন্স

অ্যাল্‌মা টেডেমা প্রভৃতি মেটারলিঙ্কের সমালোচকবর্গ তাঁহার নাটকের মধ্যে প্রাচীন ধর্মের জীর্ণ ভিত্তির উপর নূতন অধ্যাত্মবোধের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষ্য করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও কি সে চেষ্টা নাই? তিনিও আমাদের দেশের পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম দৃষ্টি লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল। বৈষ্ণবতন্ত্রের সাধনায় সেই অধ্যাত্মবোধ যেমন অন্তর্নিগূঢ় হইয়াছিল, তেমনি বিশ্বানুপ্রবিষ্ট হয় নাই। সেইজন্য আমাদের দেশ ভেককে বিশ্বাস করে, বাস্তবকে করে না—স্বাভাবিকের চেয়ে অলৌকিককেই বেশি শ্রদ্ধা করে।

সেই অন্তর্নিগূঢ় অধ্যাত্মবোধকে কোন গোপন পন্থায় হারাইতে না দিয়া তাহাকেই বিশ্বের দিকে ব্যাপ্ত করিবার, সত্য করিবার জন্য কি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি একান্ত প্রয়াস নাই?

অচলায়তন

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

'বহুধাপ্যাগমৈর্ভিন্নাঃ পন্থানঃ সিদ্ধিহেতবঃ।'

ধর্মসাধনার একাধিক পন্থা আছে। কর্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ তিনেরই এক উদ্দেশ্য, কিন্তু উপায় ভিন্ন ভিন্ন। কর্মমার্গ আচার, নিয়ম, ব্রত, সংযম উপবাস, তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা জটিল ও গহন। ভক্তিমার্গ শুধু হৃদয়ের প্রীতি-শ্রদ্ধার স্নিগ্ধরসে সুগম ও সরল। জ্ঞানমার্গ আত্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতির প্রভাবে শুষ্ক ও কঠোর। তবে জ্ঞান ও ভক্তির মণিকাঞ্চনযোগ ঘটিলে উজ্জ্বলে মধুরে মিশে।

ভারতীয় আর্যধর্ম মন্ত্রোচ্চারণ, বেদগান, যজ্ঞ, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠানবাহুল্যে সংহিতাব্রাহ্মণ আরণ্যকাদি প্রপীড়িত। পুরাণ স্মৃতি তন্ত্রাদিও ঐ ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠানবাহুল্য লইয়া বিব্রত। হৃদয়ের ভক্তি, প্রাণের আকুলতা, আত্মার পিপাসা এই সব ক্রিয়াকাণ্ডের ভিতর যেন হাঁফাইয়া উঠে। ক্রিয়াকাণ্ডের পাষাণচাপে হৃদয়টা একেবারে নিষ্পিষ্ট হইয়া যায়; প্রাণ স্তব্ধ হয়, আত্মা অসাড় হয়, মানুষ একটা যন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। সেইজন্য ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে; আচার, অনুষ্ঠান, বাছ-বিচার, জাতিভেদ, সমাজভেদ, ধর্মভেদ, অধিকারভেদ প্রভৃতি বিবিধ ভেদের বিরুদ্ধে চিরদিন মানুষের প্রাণের ভিতর একটা বিদ্রোহ, একটা সংগ্রাম চলিতেছে। যুগে যুগে প্রকৃত সাধক আবির্ভূত হইয়া জলদগম্ভীর স্বরে মানুষকে শুনাইয়াছেন—

জপতপ আর দেব আরাধনা
পূজা হোম জাগ প্রতিমা-অর্চনা

দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্র-রচনাবলীর একাদশ খণ্ডে 'অচলায়তন' মুদ্রিত হইয়াছে। আচার্য, দাদাঠাকুর ও মহাপঞ্চকের দল লইয়া ইহা একটি বিশেষ ধরনের নাটক। ১৩১৮ সালের ১৫ই আষাঢ় (ইং ১৯১২) 'অচলায়তন' প্রথম প্রকাশিত হয়। এই বৎসরেই রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' ও 'মালিনী' নামক আরও দুইখানি নাটকের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

এই নাটকখানি সম্বন্ধে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার রচিত 'রবীন্দ্রজীবনকথা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

এসকলে এবে কিছুই হবে না
প্রাণের প্রভুরে কররে পূজা।

য়িহুদিধর্মে ফ্যারিসিয়দিগের আচারপ্রিয়তার বিরুদ্ধে যীশুখৃষ্ট দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং বন্ধনমুক্ত স্বাধীন হৃদয় হইতে স্বতঃ উৎসারিত ভক্তিধারা দ্বারা ঐ পাষাণস্তূপ ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। ভারতে এরূপ ঘটনা একাধিক বার ঘটিয়াছে, বৈদিক ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে বুদ্ধদেবের বিদ্রোহ বোধ হয় সর্বপ্রথম। এক হিসাবে গীতাও এইরূপ একটা বিদ্রোহের ফল। 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' যখন যখন আচার অনুষ্ঠানের নাগপাশ-বন্ধন আঁটিয়া বসিয়াছে, তখনই এক এক জন প্রেমাবতার 'দাদাঠাকুর' আসিয়া এই সঙ্কীর্ণতা, এই বাহ্যশুদ্ধিপ্রিয়তা, এই আচারনিষ্ঠা অবহেলা করিয়া হৃদয়ের স্বভাবজ প্রেমভক্তির উৎস খুলিয়া দিয়াছেন, তাহাতে রাশীকৃত অনুষ্ঠানের শেহালা ভাসিয়া গিয়াছে। কবীর, তুকারাম, গুরু নানক প্রভৃতি এই পথের পথিক। বাঙ্গালার চৈতন্যদেব এই রসের রসিক। সেদিনও রামপ্রসাদ সেন পৌরাণিক দেবতার উপাসক হইয়াও অনুষ্ঠানকে ঠেলিয়া ফেলিয়া ভক্তিকে সেই আসনে বসাইয়া গিয়াছেন—

'ভক্তি হতে মুক্তি হয় এই সার যুক্তি।'
'ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।'

শত শত বাউল ও আউলিয়া সম্প্রদায় এই ভক্তির ধর্ম, এই প্রেমের ধর্ম, এই বিশ্বপ্রকৃতির ধর্ম, এই বিশ্বজনীন ধর্ম কর্মভূমি ভারতভূমিতে প্রচার করিয়াছেন। ভারতীয় সমাজে একদিকে যেমন আচার অনুষ্ঠানের, মন্ত্রতন্ত্রের,

"রবীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে কোনদিন নিন্দা করেন নি; কিন্তু হিন্দু-সমাজে 'ধর্ম' নামধেয় যে লোকাচারের আবর্জনা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জমে আসছে, মানুষের মন যার চাপে পঙ্গু হয়ে রয়েছে, সেই আচারসর্বস্ব 'হিন্দুত্ব'কে তিনি কখনো অনুমোদন করতে পারেন নি। 'অচলায়তন' সেই সমাজব্যাপী অন্ধ সংস্কার ও অযৌক্তিক লোকাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ব্যঙ্গ।" তিনি আরও বলিয়াছেন—

"অচলায়তন প্রকাশিত হলে, দেশের মধ্যে একদল লোক খুবই ক্ষুব্ধ হন।"

এই ক্ষুব্ধতার নিদর্শন আলোচিত নিবন্ধটির মধ্যেও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। বিচক্ষণ সাহিত্যিক ও সমালোচক হিসাবে তৎকালে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

ব্রতনিয়মের শুষ্কতা ও কঠোরতা আছে, অপরদিকে তেমনই ভক্তির চিরন্তন উৎস ভারতীয় মানব-প্রকৃতিকে চিরসরস করিয়া রাখিয়াছে। উপনিষদের 'রসো বৈ সঃ' হইতে 'রসের নবগোরা' পর্যন্ত এই রসে ওতপ্রোত। ভারতবর্ষ চারিযুগ ধরিয়া এই গুহ্যাতিগুহ্য তত্ত্বের গোপ্তা। বৈদিক কালের ঋষি হইতে শান্তিনিকেতনের মহর্ষিনন্দন পর্যন্ত বিশ্বের সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের ভিতর সেই পরম পুরুষের 'সত্যং শিবং সুন্দরং' রূপ দেখিয়াছেন।

'অচলায়তন' এই চিরন্তন সত্য—আজ বিশ্বেশ্বরীর পূজার উৎসব দিনে নূতন করিয়া আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়াছে; দৃশ্যকাব্যের সজীব চিত্র—বিচিত্র ভাষায় ও ছলাকলায় মূর্ত করিয়া—কবির প্রতিভার আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া—সাধকের হৃদয়রসে সরস করিয়া, আমাদের প্রাণের কাছে আনিয়া দিয়াছে। এই 'অচলায়তন'-নামক অধিষ্ঠান য়িহুদির Impregnable Rock বা Mount Zion, খৃষ্টানের Holy Catholic Church, বৌদ্ধের মঠ, হিন্দুর বেদস্মৃতিতন্ত্র-পুরাণ-শাসিত বিরাট সমাজ। ফলকথা, সকল অনুষ্ঠান-বাহুল্য-বিশিষ্ট প্রাচীরে ঘিরিয়া লৌহকবাটে বন্ধ করিয়া নিয়মে বাঁধিয়া আচারে আঁটিয়া মন্ত্রবলে সাধনার গণ্ডী নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। নিসর্গসৃষ্ট বিশ্বজনীন পরিপূর্ণাঙ্গ সজীব গতিশীল ধর্মের প্রাণভরা প্রেমভক্তি, হৃদয়ভরা আলোক, মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস, এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর—এই পাষাণ-প্রাচীরের ভিতর—এই অচ্ছিদ্র পুরীর ভিতর প্রবেশ করিতে পায় না। প্রবেশ করিলে সে সঙ্কীর্ণতা, সে অনুষ্ঠানপ্রিয়তা, সে যান্ত্রিক আড়ষ্টভাব, সে পাথরচাপা অসাড়তা দুরীভূত হয়। উচ্চ-অঙ্গের ভক্তি-সাধনতত্ত্বের এই সার সত্য।

এইভাবে দেখিলে 'অচলায়তন' সত্য শিব ও সুন্দরের সমাবেশে মনোহারী, হৃদয়দ্রবী, প্রাণস্পর্শী ও আত্মার তৃপ্তিকারী হইয়াছে, ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিব। সাধনার যে উচ্চস্তরে পৌঁছিলে শিবদুর্গা, কালীকৃষ্ণ ভেদবুদ্ধি থাকে না, সেই

'অচলায়তন' প্রকাশিত হইলে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত 'আর্যাবর্ত' মাসিক পত্রিকায় (২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, কার্তিক) ললিতবাবুর এই সমালোচনাটি মুদ্রিত হয়।

'আর্যাবর্ত' পত্রিকায় উক্ত সমালোচনাটি পাঠ করিয়া, রবীন্দ্রনাথ ললিতবাবুকে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন (৩রা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৮)। 'আর্যাবর্তে'র পরবর্তী অগ্রহায়ণ সংখ্যায় পত্রখানি মুদ্রিত হয়।

এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট [ক] অংশে উক্ত পত্রখানি মুদ্রিত হইয়াছে।

স্তরে পদন্যাস করিয়া রবীন্দ্রনাথ পরিস্ফুটরূপে দেখাইতেছেন যে, আচারনিষ্ঠ সম্প্রদায়ের গুরুদেব এবং পতিত অনাচরণীয় (নমঃশূদ্র) দর্ভকগণের গোঁসাই এবং আহার বিহারে অনাচারী ম্লেচ্ছযবনের দাদাঠাকুর একই বস্তু। তেদ কেবল উপাসনার প্রণালীতে। দাস্য ও মাধুর্য পূজাঅর্চা জপতপ হোমযজ্ঞ অপেক্ষা অধিকতর মহৎ ও পবিত্র। কবি এই সনাতনী কথা কাব্যচ্ছলে শিখাইতেছেন।*

কিন্তু 'অচলায়তনে'র আর একটা দিক আছে। সেটা বোধ হয় বর্ণাশ্রমধর্মী, তন্ত্রস্মৃতিপুরাণভক্ত হিন্দুর মনঃপ্রীতিকর হইবে না। বিবেকানন্দ যাহাকে ছুঁৎমার্গ বলেন, বর্তমান কবি তাহার উপর, এই আচারমার্গের উপর, বিষদিগ্ধ বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছেন। 'হিং টিং ছট'-এর কবি আবার অনেক দিনের পর তাঁহার অক্ষয় তূণ বাহির করিয়াছেন। 'গোরা'য় কৃষ্ণদয়ালবাবুর ঘেরণ্ড-সংহিতায় একান্ত অভিনিবেশ দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম, রবীন্দ্রনাথের অক্ষয় তূণের তীক্ষ্ণ বাণ নিঃশেষ হয় নাই। কিন্তু গোরায় যেমন ব্রাহ্মসমাজের দুই শ্রেণীর লোক—পানুবাবু ও পরেশবাবু—চিত্রিত হইয়াছেন, তেমনই হিন্দু সমাজেরও দুই শ্রেণীর লোক কৃষ্ণদয়ালবাবু ও আনন্দময়ী চিত্রিত হইয়াছেন। কিন্তু 'অচলায়তন' হিন্দুসমাজেরই একচেটিয়া অধিকার। জপতপ মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকাণ্ড স্নানদান উপবাসব্রতনিয়ম সমস্তই তীব্র শ্লেষবিষে জর্জরিত। অবশ্য এই শ্লেষ কবির প্রতিভার গুণে পাঠকের উপভোগ্য হইয়াছে।

পঞ্চক তোতাপাখীর মত "তট তট তোতয় তোতয়" মুখস্থ করিতে করিতে গলদঘর্ম। ইহাতে আমাদেরই গায়ত্রী মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া তান্ত্রিক বীজমন্ত্র পর্যন্ত সমস্ত মন্ত্রতন্ত্রের উদ্দেশে তীব্র শ্লেষ। ইন্দ্রতৃণ আমাদেরই কুশ, খেসারিডাল আমাদেরই মাসকড়াই, একজটাদেবী আমাদেরই 'বাঘের পৃষ্ঠে দেবী যান, সম্মুখে দক্ষিণে ধরিয়া খান।' কবি করন্যাসের পরিবর্তে আমাদিগকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়াছেন। বালক সুভদ্র যখন 'মহাতামস' করিবার জন্য প্রাণের আকুলতা জানাইতেছে এবং কবি সেই উপলক্ষে বলিতেছেন, 'হাজার বছরের নিষ্ঠুর বাহু অতটুকু শিশুর মনকেও পাথরের মুঠোয় চেপে ধরেছে, একেবারে

* বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবর্তিত যুগের শেষবীর অক্ষয়চন্দ্রের 'সনাতনী' এবং রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হইল, significant নহে কি?

পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়েছে রে! কখন সময় পেল সে? সে কি গর্ভের মধ্যেও কাজ করে', তখন বুঝিতেছি এ ত রঘুনন্দনশাসিত হিন্দুসমাজের বাল-বিধবার নির্জলা একাদশীর কথা। মহাপঞ্চককে বেশ চিনিয়াছি, তবে পরিচয়টা আর খোলসা করিয়া দিব না।

অনুষ্ঠানবাহুল্যে হৃদয় শুষ্ক হয়, মন আড়ষ্ট হয়। প্রাণ অচেতন হয়, আত্মা অসাড় হয়, তাহা অচলায়তনের আচার্য যেমন বুঝিয়াছেন, পঞ্চক যেমন বুঝিয়াছে, আমরা যে তেমন বুঝি না তাহা নহে। মন্ত্র তন্ত্র আচমন আসন অঙ্গন্যাস যে আসল বস্তু হইতে আমাদিগকে দূরে লইয়া যায় তাহাও বুঝি। বুঝিয়াও বলিতে ইচ্ছা হয়—ইহার শেষ মীমাংসা কি? পৃথিবীর সর্বত্র সকল ধর্মেরই ত এই দশা। যে খ্রীষ্টপ্রচারিত ধর্ম য়িহুদীধর্মের জটা ভাঙিয়া ধর্মকে ঋজু করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাও কি কাথলিক মঠমন্দিরে অনুষ্ঠানবাহুল্যে ভারাক্রান্ত নহে? যে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম ধর্মাচার্য পোপের আসনে ধর্মের সার সত্য বসাইতে বদ্ধপরিকর হইয়া ধর্মসংস্কার করিয়া বসিল, সে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মমন্দিরের উপাসনা-প্রণালীতে পিউরিট্যান সম্প্রদায় কেবল অনুষ্ঠানের আবর্জনা দেখিয়াছেন, যে বৌদ্ধধর্ম বৈদিক আচার, অনুষ্ঠান, যজ্ঞ, হোম, মন্ত্র, তন্ত্র, প্রভৃতি নির্মূল করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহাতেও ত শেষে অনুষ্ঠানের জটা বাধিয়াছে। Buddhistic Prayer Wheel-এর মত মন্ত্রগত সাধনামার্গ ত বৌদ্ধধর্মেরই উৎকট উদ্ভাবনা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্প্রদায়ও যে মালাজপ প্রভৃতি নিত্যকর্ম ছাড়িয়া শুধু প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গড়াগড়ি দিতেছেন এ সংবাদ পাই নাই। 'গুরু চলে গেলেন, আমরা তাঁর জায়গায় পুঁথি নিয়ে বসলুম', কথাটা পাকা। গীতার আমল থেকেই বোধহয় আমরা এ অপকর্ম করিয়া আসিতেছি। 'বদ্ধ জলেই জল বাঁধে, এ কথাটা ঠিক। কিন্তু মানুষ চিরকাল দুর্বল, তাহার মনের বল পরিমিত, সে চিরকালই নিয়মের মোহে অভিভূত। একটা বিরাট মনুষ্যসমাজ সে মোহ কাটাইয়া 'শুধু আলো, শুধু প্রীতি' লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবে, শুধু দাদাঠাকুরকে লইয়া ছুটোপুটি খেলিবে, তাহার লক্ষণ খুব সুস্পষ্ট দেখিতেছি না। যেদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাধনার বলে দাদাঠাকুরের সঙ্গে আচার্যদেবকে মিলিয়ে দিতে পারবেন সেদিন আমাদের অচলায়তনের সব দুঃখ ঘুচবে। সেদিন ঘনাইয়া আসিতেছে কিনা জানি না, কিন্তু সেই শুভ অবসর আসিবার পূর্বে সাবধান, যেন আগাছার সঙ্গে ফসলশুদ্ধ নষ্ট না হইয়া যায়।

অনেকে হয়ত বলিবেন, প্রতিভাবান কবি একটা সমাজগত বা ধর্মগত উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া নাটকখানি লিখেন নাই, ইহা written with a purpose নহে। অতএব কেবল কাব্যকলার দিক হইতেই ইহার দোষগুণ বিচার করিতে হইবে। কিন্তু গ্রন্থখানি যে উদ্দেশ্যহীন একথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। যাহা হউক, আর্ট হিসাবে দেখিতে গেলে নাটকখানির বহু গুণ আছে। বিদ্রূপ বাক্যগুলি উপভোগ্য, পূর্বেই বলিয়াছি, পঞ্চকের গানগুলি পড়িলে বুঝা যায় রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা কত উচ্চগ্রামে পৌঁছিয়াছে। ইহাতে সাধকের প্রেমময় হৃদয়ের একটি স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। ভাষা যেমন সরল তেমনই মধুর। গানের নৃত্য-দোদুল ছন্দে ব্যাকুল হৃদয়ের আকুল আহ্বান শুনিয়া পাঠকের প্রাণমন ভরিয়া যায়।

আর্ট হিসাবে নাটকখানির একটি দোষ দেখা যায়। রচনাটি যেন অত্যন্ত diffuse, হিং টিং ছটের সে compactness ইহাতে নাই, হেঁয়ালিনাট্যের সে খোলা প্রাণের রসিকতা (wit) যেন ঈষৎ অম্লত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ধর্মের দিক হইতে অচলায়তনের বিচার করা চলে। রাজনীতির দিক হইতেও ইহার বিচার করা চলে। 'অচলায়তন' রাজনীতির Chinese wall, অর্থনীতির Closed door, কিন্তু সে বিচার বিশেষজ্ঞ করিবেন। আমরা যেভাবে কাব্যখানি বুঝিয়াছি, সেই ভাবেই সমালোচনা করিলাম। বলা বাহুল্য, এই কয়টি কথা বলিয়া কাব্যখানির বিচিত্র সৌন্দর্য নিঃশেষ করা যায় না। অপেরা-গ্লাসে দুই একটা পার্থিব দৃশ্য সুস্পষ্ট দেখান যাইতে পারে। কিন্তু রবির দীপ্তির কাছে এই ক্ষুদ্র কাচখণ্ড অকিঞ্চিৎকর।

ফাল্গুনী

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ফাল্গুনী দুটো নাটকের সমষ্টি,—একটি বহিঃপ্রকৃতির, অপরটি অন্তঃপ্রকৃতির। একদিকে বৃদ্ধ শীত চলে যেতে চাইছে, নব বসন্তের নূতন প্রাণের চরেরা তাকে বল্‌ছে 'যাবে কি ? তোমাকে যে আমাদের খেলার সাথী হ'তে হবে।' তাদের উৎসাহের আতিশয্যে এবং টানাটানির হুড়াহুড়িতে শেষে কম্বলবস্ত শীতের কম্বল এবং পাকা দাড়ি খসে পড়ল, দেখা গেল, সে প্রকৃত বুড়ো নয়, সে তরুণ—সে স্বয়ং পুষ্পকিরীটী ঋতুরাজ বসন্ত।

তখন, হিমের বাছুর বাঁধন টুটে পাগলাঝোরা ছুটি পেয়ে গেল, উত্তুরে হাওয়া উজান বইল। প্রমাণ হ'য়ে গেল চির-পুরাতনের বুকের ভিতর থেকেই চির নূতনের স্ফূর্তি। বিশ্বকর্মার কারখানার কুৎসিত গুটিপোকার ভিতরেই সুন্দর প্রজাপতি তৈরী হ'য়ে ওঠে। 'Evil is good in the making' শীত হচ্ছে বসন্ত-সম্ভব কাব্যের খসড়া-খাতা। মৃত্যু নেই, আছে পরিবর্তন; জীবন চঞ্চল হ'লেও, নশ্বর নয়, তার নিত্যনূতন মূর্তি, নিত্যনূতন বেশ।

এদিকে বহিঃপ্রকৃতিতে যখন এই সব অঘটন ঘট্‌ছে, তখন মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিও চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে, চুপ ক'রে নেই। নব-যৌবনের দল, বনে বনে ফাল্গুন লেগেছে দেখে একেবারে দক্ষিণের হাওয়ার মতন উল্লাসিত হয়ে উঠেছে। তারাও আজ অঘটন না ঘটিয়ে ছাড়বে না। তারা তাদের প্রবীণ দাদার উপদেশপূর্ণ চৌপদীগুলির প্রতি কর্ণপাত না ক'রে ছুটির দিনের ছেলের দলের মত প্রাণের প্রাচুর্যে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। বিশ্ব-সংসারে তারা জীবনকে

দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ববহুল নাটকগুলির মধ্যে 'ফাল্গুনী' অন্যতম। ইহা প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩২২ সালের (ইং ১৯১৬) ফাল্গুন মাসে। 'সবুজপত্র'র ১৩২১ সালের চৈত্র সংখ্যায় ইহা সম্পূর্ণ একত্রে প্রকাশিত হয়।

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতদের সাহায্যকল্পে ১৩২২ সালের মাঘ মাসে কলিকাতায় কবির জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'ফাল্গুনী' নাটকের অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্য-সংগীত-কলানিপুণ সুরসিক ব্যক্তিগণ এবং বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

শুধু সর্দার বলে মানে, সেই সর্দারই তাদের 'মিত্র, মন্ত্রী, মনীষা এবং মশালধারী পথ-প্রদর্শক।' তাকেই নেতা ক'রে নব-যৌবনের দল মরিয়া হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তারা ঠিক করেছে যে, যে-বুড়োটা যৌবনের হাসি ম্লান করে দেয়, দুনিয়ার পাঁজরের মধ্যে যার বাসা, যে ধুলো উড়িয়ে রথ হাঁকিয়ে চলে যায়, জীবনে কেউ কখনো যার মুখ দেখেনি অথচ যাকে সবাই ভয় করে সেই আদ্যিকালের বুড়োটাকে ধরে এনে এবার বসন্ত-উৎসবের খেলা খেলতে হবে, ভয়-ভাঙা আনন্দে উৎসবকে সম্পূর্ণতা দান করতে হবে। যেমন সঙ্কল্প অম্নি সন্ধানে বেরিয়ে পড়া। যে ক্ষ্যাপামির তালে সাগরের পাগল ঢেউ নাচে সেই ক্ষ্যাপামির তালে পা ফেলে এরা চল্‌ল,—রাস্তা ঘাট ঠিক না করেই চল্‌ল—কারণ নব-যৌবনের দলের ধ্রুববিশ্বাস চলার বেগেই পায়ের তলায় রাস্তা জেগে উঠবে।

পথে তারা মাঝিকে জিজ্ঞাসা করে, কোটালকে জিজ্ঞাসা করে, কেউ বুড়োর ঠিকানা বল্‌তে পারে না; কারণ মাঝির দৌড় ঘাট পর্যন্ত, ঘর পর্যন্ত নয়, কোটালের এলাকা রাস্তা, তার বেশী নয়।

বেলাশেষে ঘুরে ঘুরে নব-যৌবনের দল উদ্দেশ্যসিদ্ধির সম্বন্ধে একটু যেন সংশয়াপন্ন হয়ে পড়ল। হয় তো বুড়োকে ধরতে পারবে না, প্রতিজ্ঞা রাখতে পারবে না। এমন সময়ে এই দলের সদানন্দমূর্তি চন্দ্রহাস কোথা থেকে একজন অন্ধ বাউলকে নিয়ে হাজির হ'ল। বাউল চোখে দেখতে পায় না, সে গান গেয়ে বিজনের মধ্যে পথ আবিষ্কার করে। কিন্তু সে তো নিজে অন্ধ, কি সাহসে সে অপরকে পথ দেখাতে উদ্যত হ'ল? অন্ধতার অন্ধকারে সে যে পরম বন্ধুকে লাভ করেছে তাঁরই চরণশব্দ সে আপনার হৃৎ-স্পন্দনে শুনতে পায়, সেই চরণশব্দ বরণ করে সে চলে—এই তার সাহসের কারণ—এই তার ভরসার মূল। সে চোখের দৃষ্টি হারিয়ে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছে।

রবীন্দ্র-ভক্ত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই অভিনয়-দর্শনে 'রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনী অভিনয়' শীর্ষক একটি সমালোচনা 'ভারতী' পত্রিকার ১৩২২ সালের ফাল্গুন-সংখ্যায় প্রকাশ করেন। এস্থলে উক্ত সমালোচনাটি হইতে মূলতঃ 'ফাল্গুনী' নাটকখানি সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন, সেই অংশটুকুই গৃহীত হইয়াছে।

'ফাল্গুনী' নাটক সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লিখিয়াছেন—

দুঃখের সংকীর্ণ সুড়ঙ্গপথে ঢোকবার সময় তাকে রিক্ত হাতেই ঢুকতে হয়েছে, সেই জন্যে তার মনের-পাওয়াই এখন তার সর্বস্ব। সেই মনের রত্ন-প্রদীপের আলো সম্বল ক'রে সে চির-জ্যোতির রাজ্যে চলেছে। জীবনে প্রথম যারা সংশয়ের ধাক্কা পেয়েছে এই আত্মপ্রত্যয়বান্ অন্ধই তাদের একমাত্র পথের সাথী। কারণ এই অন্ধ দুঃসহ দুঃখের আঘাত সহ্য ক'রে অটল নিষ্ঠা লাভ করেছে, চিত্ত-সাগর মথন করে চিন্তামণির আলোয় ওর অন্ধ-করা অন্ধকার জন্মের মত তিরোহিত হয়েছে। এই অন্ধের নির্দেশমত যৌবন-নিঃশঙ্ক চন্দ্রহাস চির-রহস্যময় গুহার মধ্যে দুঃসাহসের ভরে ঢুকে পড়ল।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে দলের লোক তার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ল, তারা বাউলের উপর ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌ল। কিন্তু বাউলের কোন ভয় নেই, সে গাইতে লাগল—

"হবে জয়! হবে জয়! হবে জয় রে
ওহে বীর! হে নির্ভয়!
জয়ী প্রাণ চির প্রাণ
জয়ী রে আনন্দ গান
জয়ী প্রেম জয়ী ক্ষেম জয়ী জ্যোতির্ময় রে।
এ আঁধার হবে ক্ষয়! হবে ক্ষয় রে
ওহে বীর, হে নির্ভয়!
ত্যজ ঘুম মেল চোখ
অবসাদ দূর হোক্
আশার অরুণালোক হোক অভ্যুদয় রে।"

সত্যিই অবসাদ দূর হোল, চন্দ্রহাস ফিরে এসে বল্‌লে সে বুড়োর দেখা পেয়েছে, অন্ধকার গুহার ভিতর থেকে সে ঐ আস্‌ছে। সে আর কেউ নয়—সে আমাদের জীবন—আমাদের সর্দার, বারে বারেই সে নূতন। এইবার

"এই ছোট গীতিনাট্যটির ভিতর দিয়ে সমস্ত প্রকৃতির একটি গূঢ় মর্মকথা ব্যক্ত হয়ে উঠেছে। বসন্তের মধ্যেই শীতের পরিণতি। শীতে বসন্তে সত্য পরিচয় হলেই তারা পরস্পর দেখতে পায় তারা একাত্মা। বিরোধ ঘটল বলেই তাদের মিলন ঘটল। ব্রাউনিং-এর সঙ্গে আমাদের রবীন্দ্রনাথের এইখানেই একটু তফাত আছে।"—রবি-দীপিতা

রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ডে 'ফাল্গুনী' মুদ্রিত হইয়াছে।

পুরোদমে উৎসব আরম্ভ হ'ল। অন্তঃপ্রকৃতিও বুঝলে যে, যাকে চিরকালের বুড়ো বলে মনে করে আসা হয়েছে সে চির-তরুণ—সে জীবন; জরা তার ছদ্মবেশ, মৃত্যু তার মুখোস্। সংশয়ের ভিতর দিয়ে সন্ধানী নব-যৌবনের দল এই সত্যকেই আবিষ্কার করলে, চির-যৌবনের দলিল পাকা হ'ল, তাদের সঙ্কল্প সিদ্ধ হ'ল, বুড়োকে চিরতরুণ ক'রে নিয়ে বসন্ত-মহোৎসবে তারা ছেলে-বুড়ো সকলকেই আহ্বান করে গেয়ে উঠল—

"তোরা আয়রে তবে মাতরে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।
অকূল প্রাণের সাগরতীরে
ভয় কিরে তোর ক্ষয় ক্ষতিরে
যা' আছে রে সব নিয়ে তোর
ঝাঁপ দিয়ে পড় আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।"

কবিশেখর নব-যৌবনের দলকে দিয়ে যে বুড়োকে বন্দী করে এনে জগতের সামনে তার আসল চেহারা বার করে দিলেন, একদিন শাক্যসিংহ সেই বুড়োর সম্বন্ধে লোকের ভয় ভেঙ্গে দেবার জন্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন। বুড়ো বড় সোজা মানুষ নয়। নব-যৌবনের দল আজ যে সিদ্ধিলাভ করলে তা সিদ্ধার্থের সিদ্ধি নয়, আনন্দের সিদ্ধি। এ আনন্দ আরামের নামান্তর নয়, আরামকে যাবার পালা শুনিয়ে এর আরম্ভ। এ আনন্দের খেলা হচ্ছে বাঁচা-মরা, লড়াই করা, ভাঙাগড়া। এর খেলাই কাজ, আবার কাজই খেলা, এ বলে—

"মোদের যেমন খেলা তেম্নি যে কাজ
জানিস্নে কি ভাই
তাই কাজকে কভু আমরা না ডরাই।"

এ আনন্দ ভয়ডর জানে না, ক্ষয়ক্ষতি মানে না। এই আনন্দ থেকেই 'খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।' এই আনন্দ সম্বল করেই 'জাতানি জীবন্তি' আর যারা শেষ চলা চলেছে তারাও এই আনন্দে 'অভিসংবিশন্তি।'

ফাল্গুনীর আনন্দ-অভিব্যক্তির চারিটি স্তর। প্রথম স্ফূর্তি বা সংকল্প; দ্বিতীয় সন্ধান; তৃতীয় সংশয়; চতুর্থ আবিষ্কার বা পরম সিদ্ধি।

স্ফূর্তি অঙ্কে কবি যে নূতন নূতন সুরের ফোয়ারা ছুটিয়েছেন, যে আনন্দের

উৎস উৎসারিত করেছেন তাতে মন এবং চোখ পলকহারা হয়ে যায়। সন্ধানের অঙ্কে উদ্দাম নির্ভীক যুব-হৃদয়ের 'শূন্য ব্যোম অপরিমাণ মত্তসম পান' করবার ইচ্ছাটা সংক্রামক হ'য়ে ওঠে, পঙ্গুদের মনেও গিরিলঙ্ঘনের আশা জাগাতে থাকে। সংশয়ের অঙ্ক অবসাদের অতলে ডুবিয়ে ধরে, কাউকে মাথা তুলতে দেয় না। কিন্তু সংশয়ের অন্ধকার তেমন জমাট নয়; মেটারলিঙ্কের 'দৃষ্টিহারা' নাটকের অন্ধদের সংশয়ের মত এ সংশয় একেবারে কূলহারা নয়; এ নাটকে দৃষ্টিহারা বাউল মনের মধ্যে আশার মণি-প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে, তাই সংশয় এখানে হৃদয়কে একেবারে হতাশ ক'রে ফেলবার অবকাশ পায়নি। আরো বোধ হয় যে, যে-কবি আনন্দলোকের সংবাদ পেয়েছেন তাঁর কাছে সংশয় জিনিসটা আর তেমন মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে না। সংশয় তার কাছে মানুষের অধ্যাত্ম ইতিহাসের একটা কৌতুককর পরিচ্ছেদ মাত্র—বড় জোর একটা দুঃস্বপ্নের মত। ফাল্গুনীর সংশয়ের অঙ্ক বোধহয় কতকটা সেইজন্যে তেমন ঘনিয়ে উঠতে পারেনি। তাছাড়া এ যে নব-যৌবনের সংশয়, এ যে মেঘের ছায়া, বড়জোর সূর্য-গ্রহণের ফিকা অন্ধকার—এ তো জমবার কথা নয়—এ তো স্থায়ীহবার কথা নয়—এর পিছনে তীব্র হাস্যেরপ্রচণ্ড রশ্মিচ্ছটা যে সংহতহ'য়েরয়েছে—আশপাশ দিয়ে ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে।

এরপর হচ্ছে আবিষ্কারের অঙ্ক, এই অঙ্কে যার হাসি চন্দ্রের মত উজ্জ্বল সেই মূর্ত যৌবনানন্দ নির্ভীক চন্দ্রহাসকে অন্ধ বাউলের ধ্রুববিশ্বাস পাথেয় স্বরূপ দিয়ে, কবি দুর্গম পথে প্রেরণ করেছেন। সে গুহার ভিতর থেকে—যা চিরকালের অথচ চিরনূতন—তাকে আবিষ্কার করে এনেছে; নব-যৌবন দলের প্রতিজ্ঞা রেখেছে, মৃত্যুরহিত আনন্দরূপের জয়গান করেছে।

ফাল্গুনীর কবি সুরের আলোয় রাশি রাশি সৌন্দর্য কলাপের মত বিকাশ ক'রে অন্তরের আনন্দে চিরসত্যকে চিরসুন্দর ক'রে তুলেছেন। 'ফাল্গুনী' বিশ্ব-সাহিত্যের একটি মহামূল্য রত্ন। এর আদর জগতের সর্বত্র হচ্ছে, হবে এবং হতে বাধ্য। কবির মানস-সরোবরের কমলে-কামিনী হাতী হয়তো গিলতে পারবেন না, কারণ তা হলে জগৎ থেকে দিগ্‌গজ পণ্ডিত দিঙনাগের বংশ লোপ হয়ে যাবে; হস্তী-মূর্খদের শুঁড় আস্ফালন এবং "খড়িসনঃ লাঙ্গুনৃত্যম্" মূর্দভর্ৎসন হ'য়ে পড়বে। কিন্তু যা করেছেন তা' অতুলনীয়, পুলকাঙ্কিত পত্রের মধ্যে ব্রজমণি দেখিয়ে দিয়েছেন।

ঘরে-বাইরে

যতীন্দ্রমোহন সিংহ

এবার আমরা বিবাহিতা স্ত্রীর পরকীয় প্রেমাসক্তির বিষয়ে আলোচনা করিব। সৌভাগ্যের বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার একখানা উপন্যাসেও এইরূপ প্রেমচিত্র অঙ্কিত করিয়া তাঁহার লেখনী কলঙ্কিত করেন নাই। হয়ত তাঁহার সময়ে art for art's sake এই নীতি fashionable হয় নাই; অথবা তিনি সমাজের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন বলিয়া এরূপ চিত্রাঙ্কনে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কবিবর স্যার রবীন্দ্রনাথই এইরূপ চিত্রের পথপ্রদর্শক। তাঁহার 'নষ্ট-নীড়' যখন 'ভারতী'তে বাহির হইত, তখন আমার এক সমালোচক বন্ধু বলিয়াছিলেন, এরূপ উপন্যাস আমাদের কন্যা বা ভগিনীদিগের হস্তে দেওয়া নিতান্ত অবৈধ। এই 'নষ্ট-নীড়ে' যাহার অঙ্কুর দেখা গিয়াছিল, 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে তাহার পূর্ণ বিকাশ। আবার রবীন্দ্রনাথের 'নষ্ট-নীড়' ও 'চোখের বালি'র একটা মিলিত সংস্করণ বাহির হইয়াছে—তাহার নাম শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'চরিত্রহীন'।

কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস এই 'নষ্ট-নীড়ে'র রাজকীয় সংস্করণ (royal edition)। এই উপন্যাসে কবিবর art for art's sake এই নীতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। আমরা অতি সংক্ষেপে এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

নিখিলেশের এক সাবেকি আমলের রাজার ঘরে জন্ম। তিনিই এ বংশে প্রথম রীতিমত লেখাপড়া শিখিয়া এম. এ পাশ করেন। আবার তাঁহার স্ত্রী বিমলাকেও বিলাতী মেম রাখিয়া রীতিমত লেখাপড়া শিখাইয়াছেন।

দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস সম্বন্ধে এই আলোচনাটি যতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জন প্রণীত 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' নামক পুস্তকের 'সধবার প্রেম' (বিবাহের পরে জাত) র্ষিক অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। শেষোক্ত অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের 'নষ্ট-নীড়' নামক বড় গল্প ও 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস সম্বন্ধে বিশদ এবং শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে।

সাহিত্যে সনাতনপন্থী ও রক্ষণশীল মনোবৃত্তিসম্পন্ন যতীন্দ্রমোহনের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল

নিখিলেশ মনে করিতেন স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের প্রেমের সম্বন্ধও সমান। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা স্ত্রীকে বাহিরে বের করেন। কিন্তু সংসারের কর্ত্রী তাঁহার পিতামহী যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন এ সম্বন্ধে বেশী উচ্চবাচ্য করিতে পারেন নাই। সংসারে বিমলার দুই বিধবা বড় জা ছিলেন—তাঁহার মধ্যে সকলের বড়টি জপ তপ ব্রত উপবাস লইয়া থাকিতেন, মধ্যমটির সে সব 'ভড়ং' ছিল না, বরং তাঁহার কথাবার্তায়, হাসিঠাট্টায়, রসের বিকার ছিল। বিমলা প্রথমে স্বামীর ইচ্ছামত বাহিরে যাইতে অনিচ্ছুক ছিলেন। সে সম্বন্ধে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে এইরূপ কথাবার্তা হইয়াছিল—

বিমলা বলিলেন,—'বাইরেতে আমার দরকার কি?' স্বামী বলিলেন, 'তোমাকে বাইরের দরকার থাকতে পারে—আমি চাই, বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও, আমি তোমাকে পাই। ঐখানে আমাদের দেনা পাওনা বাকী আছে।' বিমলা বলিলেন,—'কেন, ঘরের মধ্যে পাওয়ার কমতি হ'ল কোথায়?' স্বামী বলিলেন,—'এখানে আমাকে দিয়ে তোমার—সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে—তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েচ তাও জান না।'

হইয়াছিল যে, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাস ও গল্প বাংলা সাহিত্যের বিশুদ্ধ আবহাওয়াকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। সে কারণ, 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির অনুরোধে ১৩২৭ সালের 'সাহিত্য' পত্রিকায় তিনি 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' নামক একটি নিবন্ধ রচনা করেন। উক্ত নিবন্ধটিই পরে পুস্তকাকারে (প্রকাশক: ভট্টাচার্য এণ্ড সন্স, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২৭, মূল্য ৷৷০) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করিয়া দেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গ্রন্থখানির উৎসর্গপত্রে সাল তারিখ লিখিত আছে: কৃষ্ণনগর, ৩০শে ফাল্গুন, ১৩২৮।

'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' রচনা করিয়াই যতীন্দ্রমোহন রবীন্দ্র-বিদূষণে ক্ষান্ত হন নাই। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন,' 'অচলায়তন' এবং 'চতুরঙ্গ' গ্রন্থাদির উপরও যথেষ্ট বিরুদ্ধ বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে-কালে রমাপ্রসাদ চন্দ 'মাসিক বসুমতী'তে ধারাবাহিকভাবে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে লিখিতে আরম্ভ করেন, উক্ত সময়েই 'মাসিক বসুমতী'তে (১৩৩৯, ফাল্গুন) যতীন্দ্রমোহনের 'বিশ্বকবির অনধিকার চর্চা' শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

'ঘরে-বাইরে' ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয় প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত ২য় বর্ষের 'সবুজপত্র'তে (বৈশাখ, ১৩২২)। বহু সমস্যামূলক এই উপন্যাস ইংরেজী ১৯১৬ সালে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে গ্রন্থাকারে। এই গ্রন্থ প্রমথনাথ চৌধুরীকে উৎসর্গীকৃত। ইহা 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র অষ্টম খণ্ডে স্থানগ্রহণ করিয়াছে।

অর্থাৎ, নিখিলেশের মতে তাঁহার স্ত্রী ঘরের বাহিরে গিয়া আর দশজন পুরুষের সঙ্গে প্রেমের যাচাই করিয়া যদি অবশেষে তাঁহার নিকটেই আবার ফিরিয়া আসেন, তবেই তাঁহার সেই প্রেম খাঁটি প্রেম হইবে। তবে কথা এই, কৈমাছ পুকুরে তেমন বাড়িতেছে না মনে করিয়া তাহাকে যদি নদীতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে সে আবার পুকুরে নাও ফিরিয়া আসিতে পারে। না আসে না আসুক, সে বাড়িবে ত। যাহা হউক, 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতী তাদৃশী,'—বাঙ্গলা দেশে তখন স্বদেশীর খুব ধুম পড়িয়াছিল। নিখিলেশের মনেও বিলক্ষণ দেশভক্তি ছিল। সেই কারণে তাঁহার এক স্বদেশ-সেবক বন্ধু সন্দীপ তাঁহাকে একেবারে পাইয়া বসিল। সে নিখিলেশের মাথায় হাত বুলাইয়া স্বাদেশিকতা প্রচার করিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে নিজের খরচও চালাইতে লাগিল। অবশেষে সে প্রচারকার্য উপলক্ষে নিখিলেশের বাড়িতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল। সে এক বক্তৃতা করিয়া বিমলার শোণিতে আগুন ধরাইয়া দিল। বিমলা বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে চিকের বাহিরে মুখ বাহির করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন—তাঁহার মনে

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিশ্বপতি চৌধুরী লিখিয়াছেন—

> "ঘরে-বাইরে যে আমাদের ভাল লাগে, সে চরিত্র বিশ্লেষণের নৈপুণ্যের জন্যও নয়, ঘটনা-বিন্যাসের কৌশলের জন্যও নয়, সে কেবল তার বুদ্ধিদীপ্ত, যুক্তিধর্মী, সুতীক্ষ্ণ, শাণিত অথচ উচ্ছ্বাসময় অপূর্ব প্রকাশভঙ্গীর জন্য।" —কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ

সুকুমার সেনের মতে—

> "ঘরে-বাইরের সমস্যা ঠিক ব্যক্তি-সংঘর্ষ নয়, আদর্শ-সংঘর্ষও নয়। সব ব্যক্তির মধ্যেই দ্বৈধ থাকে, ইংরেজীতে যাহাকে বলে স্প্লিট্ পার্সোনালিটি। এই ব্যক্তি-দ্বৈধের সংঘর্ষই ঘরে-বাইরের সমস্যা।"—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড)

সেন মহাশয় ষ্টিভেন্সনের 'Prince Otto' উপন্যাসের সঙ্গে ঘরে-বাইরের বিশেষ ভাবসাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রিয়রঞ্জন সেন তাঁহার 'ওয়েষ্টার্ণ ইনফ্লুয়েন্স ইন্ বেঙ্গলী নভেল' নামক রচনার মধ্যে তুর্গেনিভের 'রুডিন' গ্রন্থের সহিত ঘরে-বাইরের সাদৃশ্য উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন—

> "ঘরে-বাইরের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে দুইটি স্তর আছে—প্রথমটি রাজনৈতিক ও দ্বিতীয়টি সমাজনীতিমূলক।"—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

হইল, 'কালপুরুষের নক্ষত্রের মত সন্দীপবাবুর উজ্জ্বল ছুই চোখ আমার মুখের উপর এসে পড়্‌ল। কিন্তু আমার হুঁস ছিল না। আমি কি তখন রাজবাটীর বউ? আমি তখন বাংলা দেশের সমস্ত নারীর একমাত্র প্রতিনিধি— আর তিনি বাংলাদেশের বীর।' বস্—অমনি কেল্লা ফতে হইয়া গেল। বিমলা সন্দীপকে নিজে উপস্থিত থাকিয়া খাওয়াইবার অভিপ্রায় স্বামীর নিকট ব্যক্ত করিলেন। অবশ্য নিখিলও ইহাই চান। এই সূত্রে সন্দীপের সহিত বিমলার প্রত্যক্ষভাবে আলাপ পরিচয় হইল। সন্দীপও সুযোগ বুঝিয়া তাহার কথার বুকুনি দিতে লাগিল। 'আজ আপনিই আমার কাছে দেশের রাণী। এ আগুন ত আমি কোন পুরুষের মধ্যে দেখিনি। না, না, লজ্জা করবেন না—মিথ্যা লজ্জা সঙ্কোচ বিনয়ের অনেক উপরে আপনার স্থান। আপনি আমাদের মৌচাকের মক্ষীরাণী—আমরা আপনাকেই চারিদিকে ঘিরে কাজ করব—সেই কাজের শক্তি আপনারই—সেই কাজের কেন্দ্র আপনিই।' এই সকল চাটুবাক্যের ফল অবশ্যই ফলিল। নিখিল বিমলাকে লইয়া দার্জিলিঙ যাইতে চাহিল। বিমলা যাইতে স্বীকৃত হইল না। সন্দীপ কি প্রকৃতির লোক তাহা তাহার নিজের কথায়ই প্রকাশ পায়—'আমি যা চাই, তা আমি খুবই চাই। তা আমি দু'হাতে ক'রে চটকাব, দুই পায়ে ক'রে দলব,—সমস্ত গায়ে তা মাখব, সমস্ত পেট ভরে তা খাব। চাইতে আমার লজ্জা নেই, পেতে আমার সঙ্কোচ নেই···আমি যা চাই তা আমি সিঁদ কেটে নিতে চাই।' 'যে শক্তিতে এই মেয়েদের পাওয়া যায়, সেইটেই হচ্ছে বীরের শক্তি'— ইত্যাদি। এই প্রকৃতির সন্দীপের সহিত দেশের কথা লইয়া বিমলার যতই পরামর্শ চলিতে লাগিল, ততই সে তাহার মায়াজালে হরিণীর মত জড়াইয়া পড়িল। ক্রমে সন্দীপ তাহাকে বুঝাইতে লাগিল, 'প্রবৃত্তিকে বাস্তব বলে স্বীকার করা ও শ্রদ্ধা করাই হচ্ছে মডার্ণ। প্রবৃত্তিকে লজ্জা করা, সংযমকে বড় জানাটা মডার্ণ নয়।'—অবশেষে একদিন সন্দীপের মনে হইল—'বিমল যে আমার কামনার বিষয় হ'য়ে উঠেচে সে জন্যে আমার কোন মিথ্যে লজ্জা নেই। আমি যে স্পষ্ট দেখ্‌চি ও আমাকে চায়—ওই ত আমার স্বকীয়া, আমি জানি দু'বার তিনবার এমন এক একটা মুহূর্ত এসেচে যখন আমি ছুটে গিয়ে বিমলার হাত চেপে ধরে তা'কে আমার বুকের উপর টেনে আন্‌লে সে একটি কথাও বল্‌তে পারত না; কিন্তু সময়টা ব'য়ে যেতে দিয়েচি।'

এদিকে এসব দেখিয়া শুনিয়া নিখিলেশের মনে কাঁদুনি আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু তিনি কান্নাকে আমল দিতে চান না—'আর কিছু না—জীবনটাকে কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে হেসে উড়িয়ে দেওয়াই ভাল। বিমল যদি তোমার না হয় ত সে তোমার নয়ই, যতই চাপাচাপি রাগারাগি করবে, ততই ঐ কথাটা আরো বড় করে প্রমাণ হবে। বুক ফেটে যায় যে—তা' যাক্।...বিমল যদি বলে সে আমার স্ত্রী নয়, তা' হ'লে আমার সামাজিক স্ত্রী যেখানে থাকে আমি বিদায় হলুম—'

সন্দীপ একদিন বিমলার কাছে তাহার স্বদেশী কার্যের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা চাহিয়া বসিল। বিমলা তাহাকে না বলিতে পারিল না। কিন্তু এত টাকা কোথা হইতে দিবে? তাহার গয়না বিক্রয় করিয়া দিতে চাইল, সন্দীপ বলিল, সে হবে না, গয়না এখন হাতে রাখিতে হইবে, তোমার স্বামীর টাকা থেকে দাও। যখন দেশের প্রয়োজন হয়েছে, তখন এ টাকা নিখিলেশ দেশের কাছ থেকে চুরি ক'রে রেখেছে। বন্দে মাতরং এই মন্ত্রে লোহার সিন্দুকের দরজা খুলবে। বল, বন্দে মাতরং—বিমলাও বলিল বন্দে মাতরং। কিন্তু সন্দীপ অবশেষে তাহার পঞ্চাশ হাজারের দাবী পাঁচ হাজারে কমাইয়া আনিল। মহিষমর্দিনীর পূজার জন্য এই টাকার এখনই দরকার। তাহার উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া বিমলাই সেই টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইল।

কিন্তু সে এই পাঁচ হাজারও কোথায় পাইবে? তাহাদের শোবার ঘরের পাশে একটা ছোট কুঠরিতে লোহার সিন্দুকে নিখিল তাহার বড় ও মেজ ভাজের বাৎসরিক প্রণামীর জন্য ছয় হাজার টাকা মজুত রাখিয়াছিল। বিমলা নিখিলের পকেট হইতে সেই লোহার সিন্দুকের চাবি সংগ্রহ করিয়া সেই ছয় হাজার টাকার গিনি চুরি করিল এবং পরদিন তাহা সন্দীপের হাতে দিল। ইহাই বিমলার প্রেম-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি—অথবা স্বদেশ-সেবা-ব্রতের দক্ষিণা।

এই কার্য করার পর বিমলার মনে ঘোর আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। অমূল্য নামে সন্দীপের একটি চেলা ছিল, সে বিমলাকে দিদি বলিয়া ডাকিত। বিমলা তাহাকে নিজের গহনার বাক্স দিয়া বলিল, যে রূপেই হউক এই গহনা বিক্রয় করিয়া আমাকে ছয় হাজার টাকা কালই আনিয়া দেও।

অমূল্য সেই গহনার বাক্স লইয়া তাহার তোরঙ্গের মধ্যে রাখিল, সে কিছুতেই গয়না বিক্রয় করিবে না। সে নিখিলের এক কাছারী লুট করিয়া ছয় হাজার টাকা আনিয়া বিমলাকে দিতে গিয়া দেখিল সন্দীপ সেই গয়নার বাক্স চুরি করিয়া আনিয়া বিমলাকে দিতেছে। সন্দীপ বলিল, 'মক্ষীরাণী, এ গয়না আজ আমি নেব ব'লে আসিনি—তোমাকে দেব বলেই এসেছিলুম। কিন্তু অমোর জিনিস যে তুমি অমূল্যর হাত থেকে নেবে সেই অন্যায় নিবারণ করবার জন্যেই প্রথমে এ বাক্সে আমার দাবী স্পষ্ট ক'রে তোমাকে দিয়ে বলিয়ে নিলুম। এখন আমার এই জিনিস তোমাকে আমি দান করচি—এই রইল।' অমূল্য সেই ছয় হাজার টাকার নোট দিতে চাহিলে, বিমলা তাহা ফিরাইয়া দিয়া বলিল—এ টাকা যেখান থেকে আনিয়াছ সেখানে রাখিয়া আইস। অমূল্য বলিল—সে বড় শক্ত কথা—সে প্রথমে সন্দীপের নিকট থেকে সেই গিনিগুলি ফেরত আনিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সন্দীপ তাহা কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে—অগত্যা তাহাকে অন্য উপায়ে এই ছয় হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে হইল—'দিদি তোমার কাছে এলুম বলেই ত ওকে চিনতে পেরেছি—দিদি ওর মন্ত্র একেবারে ছুটে গেচে—তুমিই ছুটিয়ে দিয়েচ।' বিমলা বলিল,—'ভাই আমার, আমার জীবন সার্থক হয়েচে। কিন্তু অমূল্য এখনও বাকী আছে। শুধু মায়া কাটালে হবে না, যে কালি মেখেচি সে ধুয়ে ফেলতে হবে।'

সন্দীপ বিমলার সঙ্গে কথা কহিতেছে এই সময়ে নিখিল আসিয়া সন্দীপকে বলিল, 'কাল কলকাতায় যাচ্ছি, তোমাকে যেতে হবে।' সন্দীপ বলিল, 'কেন, বল দেখি, আমি কি তোমার অনুচর নাকি?' 'আচ্ছা তুমিই কলকাতায় চল, আমিই তোমার অনুচর হব।' 'কলকাতায় আমার কাজ নেই।' 'সেই জন্যেই ত কলকাতা যাওয়া তোমার দরকার। এখানে তোমার বড্ড বেশী কাজ।' 'আমি ত নড়চিনে।' 'তা হ'লে তোমাকে নাড়াতে হবে।' 'জোর?'—'হাঁ জোর।'—'আচ্ছা বেশ নড়ব।' ইহার পরে সন্দীপ বিমলাকে সম্বোধন করিয়া এক লম্বা বক্তৃতা ঝাড়িল 'মক্ষীরাণী, আমি তোমাকে বন্দনা করি—আমি তোমারই বন্দনা করতে চল্লুম—তোমাকে দেখার পর থেকে আমার মন্ত্রবদল হয়ে গেচে—বন্দে মাতরং নয়, বন্দে প্রিয়াং, বন্দে মোহিনীং—মা আমাদের রক্ষা করেন—প্রিয়া আমাদের বিনাশ করেন—বড় সুন্দর

সে বিনাশ।...আজার দিন আর নেই—প্রিয়া, প্রিয়া, প্রিয়া,—দেবতা স্বর্গ ধর্ম সত্য সব তুমি তুচ্ছ করে দিয়েচ, পৃথিবীর আর সমস্ত সম্বন্ধ আজ ছায়া, নিয়ম সংযমের সমস্ত বন্ধন আজ ছিন্ন' ইত্যাদি।

বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, বিমলা আবার এই কথার ছটায় ভুলিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, 'যাকে ছাই ব'লে দেখেছিলুম তার মধ্যে থেকে আগুন জ্বলে উঠেচে। একেবারে খাঁটি আগুন তাতে কোন সন্দেহ নেই—আধ ঘণ্টা আগেই আমি মনে মনে ভাবছিলুম এই মানুষটাকে একদিন রাজা ব'লে ভ্রম হয়েছিল বটে কিন্তু এ যাত্রার দলের রাজা, তা নয়—তা নয়—যাত্রার দলের পোষাকের মধ্যেও রাজা লুকিয়ে থেকে যায়'—ইত্যাদি। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই, নিখিল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সন্দীপের এই প্রিয়ার বক্তৃতা শুনিতে লাগিল। আর কেহ হইলে তখনই সন্দীপকে পদাঘাতে বিতাড়িত হইতে হইত।

যাহা হউক, সন্দীপ, অবশেষে বিদায় নিতে নিতে বলিল, 'দেবী আজ আমার এই বিদায়ের মধ্যেই তোমার বন্দনা সব চেয়ে বড় হ'য়ে উঠল। দেবী আমিও আজ তোমাকে মুক্তি দিলুম। আমার মাটির মন্দিরে তোমাকে ধরছিল না—এ মন্দির প্রত্যেক পলকে পলকে ভাঙবে ভাঙবে করছিল। আজ তোমার বড় মূর্তিতে বড় মন্দিরে পূজা করতে চল্লুম।' বিমলা তাহার গয়নার বাক্স টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া ধরিয়া সন্দীপকে বলিল, 'আমার এই গয়না আমি তোমার হাতে দিয়ে যাকে দিলুম তার চরণে তুমি পৌঁছে দিয়ো।' নিখিল চুপ করিয়া রহিল, সন্দীপ বাহির হইয়া চলিয়া গেল। কিছুদিন হইতে বিমলার স্বামীর সঙ্গে বেশ সহজে কথাবার্তা কওয়ার প্রণালীটা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। স্বামী পৃথক ঘরে শুইতেন। সেদিন লোকজনকে খাওয়াইতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। বিমলার ইচ্ছা হইল তাহার সেই জন্মতিথিতে স্বামীর পায়ের ধুলা সে লইবে। শোবার ঘরে গিয়া দেখিল স্বামী অকাতরে ঘুমাইতেছেন। খুব সাবধানে মশারি একটুখানি খুলিয়া তাহার পায়ের কাছে আস্তে আস্তে মাথা রাখিল। পরে পশ্চিমের বারান্দায় গিয়া মাটির উপর উপুড় হইয়া শুইয়া কাঁদিতে লাগিল, একটা কোনো দয়া কোথাও থেকে চাই, একটা কোনো আশ্রয়, একটু ক্ষমার আভাস, একটা এমন আশ্বাস যে সব চুকেও যাইতে পারে। মনে মনে বলিল, 'আমি দিন

রাত ধর্না দিয়ে পড়ে থাকব—প্রভু আমি খাব না। আমি জল স্পর্শ করব না, যতক্ষণ না তোমার আশীর্বাদ এসে পৌঁছয়।' তাহার প্রার্থনা মিথ্যা হইল না। তাহার স্বামী শিয়রের কাছে আসিয়া বসিলেন, সে বুকের মধ্যে স্বামীর পা চাপিয়া ধরিল, তিনি আস্তে আস্তে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

ইহার পরে বিমলার সেই সিন্দুক হইতে ছয় হাজার টাকা চুরি ধরা পড়িল। সেই সিন্দুকের চাবির খোঁজ হইতেই বিমলা আসিয়া নিখিলকে বলিল, 'চাবি আমার কাছে আছে, আমি চাবি দিয়া সিন্দুক খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া নিয়া সন্দীপকে দিয়াছি।' কিসে খরচ করিয়াছে, তাহা বলিল না, নিখিলও তাহা জানিতে চাহিল না, কিন্তু তাহার মনের মধ্যে এই ছয় হাজার টাকার সহিত সেই ছয় হাজার টাকা ডাকাতির যে যোগ আছে, তাহা বুঝিতে পারিল। তখন নিখিলের মনে হইল—'বিমলা আমার নিকট হইতে তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কারণ বিমলা যা' পারত তা' আমার চাপে উপরে ফুটে উঠতে পারে নি বলেই নীচের তল থেকে রুদ্ধ জীবনের তল থেকে রুদ্ধ জীবনের ঘর্ষণে বাঁধ ক্ষয়িয়ে ফেলেচে। এই ছয় হাজার টাকা ওকে চুরি ক'রে নিতে হয়েছে—আমার সঙ্গেও স্পষ্ট ব্যবহার করতে পারেনি, কেননা ও বুঝেছে এক জায়গায় আমি ওর থেকে প্রবলরূপে পৃথক। সরল মানুষকেও আমরা কপট ক'রে তুলি। আমরা সহধর্মিণীকে গড়তে গিয়ে স্ত্রীকে বিকৃত করি?' শোবার ঘরে বিছানার উপর বসিয়া নিখিল এইরূপ ভাবিতেছিল—তখন বিমলা দরজার কাছে আসিয়া আবার ফিরিয়া যাইতেছিল, নিখিল তাহাকে ধরিয়া ঘরের মধ্যে আনিতেই সে মেজের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। নিখিল তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া নেবার চেষ্টা করিল। সে একটু জোরে হাত ছাড়াইয়া নিয়ে হাঁটু গেড়ে নিখিলের পায়ের উপর মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে লাগল। নিখিল পা সরিয়ে নিতেই সে তাহার পা জড়িয়ে ধরে বলল, 'না, না, না, তোমার পা সরিয়ে নিয়ো না—আমাকে পূজো করতে দিও।'

আখ্যায়িকা এখানেই একপ্রকার শেষ হইল। ইহার পরে যাহা আছে, তাহা আমাদের না শুনিলেও চলে। নিখিল কলিকাতায় যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় খবর আসিল স্বদেশী দলের বিরুদ্ধে মুসলমানের দল

ক্ষেপিয়া উঠিয়া লুটপাট করিতেছে ও স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম নষ্ট করিতেছে। নিখিল তাহা শুনিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া যুদ্ধ করিতে গেল, কাহারও বাধা মানিল না। রাত্রি দশটার সময় সে আহত হইয়া ফিরিল, সঙ্গে সঙ্গে অমূল্যর মৃতদেহও আসিল।

রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসখানির অনেক অনুকূল ও প্রতিকূল সমালোচনা হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাতে তাঁহার আর্টের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাইয়াছেন, কেহ বা এটাকে allegory (রূপক) মনে করিয়া ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আবার কেহ বা অনেক গালি দিয়াছেন। আমরা ভয়ে ভয়ে দুই চারিটি কথা বলিব। আমাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টির একান্ত অভাব, নিতান্ত স্থূল দৃষ্টিতে, সাধারণ জ্ঞান হইতে যাহা বুঝিতে পারি, তাহাই বলিব।

আর্ট স্বভাবের অবিকল নকল হইবে না—সত্য, কিন্তু আর্টকে স্বভাবের অনুগামী হইয়া চলিতে হইবে; নচেৎ কবির সৃষ্ট নরনারী কিম্ভূত-কিমাকার ধারণ করে। একজন চিত্রকর একটা মানুষের ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিয়া যদি তাহার দুই হাতের পরিবর্তে চারি হাত লাগান, তবে সে দেবতা হইবে—নয় দানব হইবে—মানুষ হইবে না। এই গ্রন্থে নিখিল, বিমলা ও সন্দীপ ইহার কেহই মানুষ হয় নাই। কবিশ্রেষ্ঠ মাঘ শিশুপালকে রাবণের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এই সন্দীপও আমাদের নিকট সেই রাবণের একটি ক্ষুদ্র অবতার বলিয়া মনে হয়। হউক তাহাতে দোষ নাই—কিন্তু এতদূর পাশবতা, এতদূর নির্লজ্জতা, এতদূর কাপুরুষতা প্রকৃত মানুষে কখনও সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না,—সন্দীপ প্রকৃতই একটা দানব বা রাক্ষস। এই কারণেই কবিবর তাহার মুখ দিয়া সীতাদেবীর গ্লানিকর একটা কথা বাহির করিয়াছেন, যে জন্য অনেকে রবীন্দ্রনাথকে গালি দিয়াছেন। সন্দীপ বলিতেছে—

'যে রাবণকে আমি রামায়ণের প্রধান নায়ক বলে' শ্রদ্ধা করি, সেও এমনি করেই মরেছিল। (অর্থাৎ নিঃসঙ্কোচে বল-প্রকাশ না করে) সীতাকে আপনার অন্তঃপুরে না এনে সে অশোকবনে রেখেছিল···অতএব বীরের অন্তরের মধ্যে ঐ এক জায়গায় একটু যে কাঁচা সঙ্কোচ ছিল, তারই জন্যে সমস্ত লঙ্কাকাণ্ডটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। এই সঙ্কোচটুকু না থাকলে সীতা আপন সতী নাম ঘুচিয়ে রাবণকে বরত।'

এই শেষ কথাটি নকল করিতে করিতে আমার চিত্ত শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জাতীয় সংস্কার হইতে এতদূর মুক্ত হইয়াছেন যে, অবলীলাক্রমে তাঁহার নিজের মনে এইরূপ ভাবের কল্পনা করিয়া কলম দিয়া তাহা লিখিয়াছেন। কবিকে অবশ্যই ভালমন্দ সব বিষয়ের কল্পনা করিয়া লিখিতে হয়। তিনি সন্দীপের যে চরিত্রাঙ্কন করিয়াছেন, তাহার মুখে অবশ্য এ কথা খুবই মানায়*—কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি কাব্যের মধ্যে কবির নিজের ছাপও কিছু কিছু পড়ে, তাহা না হইলে চিত্র কেবল ফটোগ্রাফ হইয়া দাঁড়ায়। মাইকেল নাকি তাঁহার মেঘনাদবধে রাম ও লক্ষ্মণকে নিতান্ত হীন করিয়া আমাদের জাতীয় গৌরব নষ্ট করিয়াছেন। এই জন্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই মাইকেলকে এইরূপ ভাবে দুষিয়াছেন, 'মহৎ চরিত্র যদি নিজে সৃষ্টি করিতে না পারিলেন, তবে কবি কোন্ মহৎ কল্পনার বশবর্তী হইয়া অন্যের সৃষ্ট মহৎ চরিত্র বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? কবি বলেন—'I despise Ram and his rabble'—সেটা বড় যশের কথা নহে। তাহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, তিনি মহাকাব্য রচনার যোগ্য কবি নহেন।" আমরাও এখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলিতে পারি, মাইকেল যেটুকু বাকী রাখিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সন্দীপ চরিত্রের মধ্য দিয়া, সীতার চরিত্র খর্ব করিয়া তাহা শেষ করিয়া দিলেন। থাক সে কথা, সন্দীপ নিজেই রাবণের অবতার, কাজেই রাবণের সহিত তাহার যথার্থ সহানুভূতি আছে। সে সময় বুঝিয়া বিমলাকে হরণ করিল না কেন, সেজন্য অনুতাপ করিতেছে, কিন্তু নিখিলও মানুষ, সে কোন্ প্রাণে সন্দীপকে এইরূপ সুযোগ দিল। স্বয়ং রামচন্দ্র যিনি বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজিত, তিনি পর্যন্ত রাবণকে ক্ষমা করিতে পারিলেন না—নিখিল কোন্ প্রাণে স্বয়ং মধ্যস্থ হইয়া দিনের পর দিন বিমলার এই অধঃপতনে সাহায্য করিল? একজন এম. এ পাশ করা সুশিক্ষিত স্বামীর পক্ষে ইহা কি স্বাভাবিক? হয়ত স্ত্রীকে পরপুরুষের সঙ্গে

* কোনো গৃহস্থ নিতান্ত সর্বস্বান্ত না হইলে 'লক্ষ্মীর কৌটার' পুরুষানুক্রমে রক্ষিত স্বর্ণমুদ্রা খরচ করিবার জন্য বাহির করে না। সাহিত্যসম্রাট রবীন্দ্রনাথ ভাবরাজ্যে কি এতদূর দরিদ্র হইয়াছিলেন? আবার কোনো ব্যক্তি নিতান্ত বিপদে না পড়িলে নিজের পিতামাতার প্রতি কলঙ্কারোপ করে না। রবীন্দ্রনাথ এরূপ কোন্ বিপদে পড়িয়াছিলেন? তিনি বিশ্বকবি হইয়াছেন বলিয়া কি জাতীয় ভাবের কোন ধার ধারেন না।

শিখিতে দিয়া তাহার মনুষ্যত্ব ফুটাইয়া তোলার একটা খেয়াল তাহার মাথার মধ্যে ঢুকিয়াছিল; কিন্তু নিখিল ত একেবারে পাগল হয় নাই, সে সন্দীপের সঙ্গে স্বদেশী ব্যাপার লইয়া যে সকল তর্ক করিয়াছে, তাহাতে তাহাকে ধীর প্রকৃতির লোক বলিয়াই ত মনে হয়; সেই নিখিল বিমলার অধঃপতনের সূচনায় তাহাকে থামাইল না কেন? কাপুরুষের মত নিজে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া না দিয়া একটু শক্ত কঠোর হইয়া সন্দীপকে আগেই তাড়াইল না কেন? স্ত্রীর মধ্যে মনুষ্যত্ব ফুটিয়ে তোলা ত একটা theory—কোন্ স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি সেই theory নিজের স্ত্রীর উপর experiment করিতে বসিয়া তাহাকে রাজরাণী হইতে পথের কাঙ্গালিনী করিতে পারে? যে সকল ডাক্তার ঔষধ লইয়া experiment করেন, তাঁহারা প্রায়ই ইতর প্রাণীর শরীরের উপরেই করিয়া থাকেন। সংসারে এরূপ মূর্খ কয়জন আছে, যে নিজের স্ত্রীর শরীরে রোগের সূচনা দেখিয়া তাহা ঔষধ প্রয়োগে বন্ধ করিতে চেষ্টা না করিয়া, রোগের হাতে স্ত্রীকে ছাড়িয়া দিয়া তামাসা দেখে যে, তাহার স্ত্রীর শরীর রোগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার বল বাড়াইতে পারে কিনা? সুতরাং কবির এই যে idea, তাহা কখনও অনুভূতিমূলক নহে, ইহা আকাশকুসুমের মত কল্পনা। Tolstoy-এর সেই আর্টের সংজ্ঞা অনুসারে এইরূপ আকাশকুসুম-কল্পনা প্রকৃত আর্ট নহে।

নিখিলের ন্যায় বিমলাও সুশিক্ষিতা রমণী। তাহার যেরূপ গভীর বিদ্যা, তাহাতে তাহার নিকট কি আমরা একটু সাধারণ বৈষয়িক জ্ঞান—একটু common sense আশা করিতে পারি না? অবশ্য প্রবৃত্তির তাড়নায়—অনেকেই হিতাহিতজ্ঞান-বর্জ্জিত হয়—এমন কি common sense-ও সব সময়ে থাকে না। কিন্তু কবি তাহার মনের যেরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহাতে সে প্রথম হইতেই ত উদ্দাম প্রবৃত্তির বশীভূত হয় নাই, প্রথম অবস্থায় ত তাহার ভালমন্দ, হিতাহিত-জ্ঞান ছিল। তবে তাহার মত শিক্ষিতা রমণী প্রথম হইতেই সন্দীপের চাটুবাক্যে কেন আত্মহারা হইল? সন্দীপ যেই তাহাকে বলিল, 'তুমি বঙ্গের রাণী; তুমি বঙ্গরমণীর একমাত্র প্রতিনিধি, তুমি দেবী' অমনি সে গলিয়া গেল কেন? কেবল গলিয়া যাওয়া নয়, তাহার স্বামীকে ভুলিয়া সন্দীপকে একেবারে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিল, মন কি যখন সন্দীপকে মন্দ লোক বলিয়া বুঝিল, তখনও তাহার লোভ

চরিতার্থ করিবার জন্য নিজে চুরি পর্যন্ত করিল! অবশ্য এরূপ রমণীও দেখা যায়, যাহারা স্বামীর টাকা চুরি করিয়া লইয়া পরপুরুষের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। কিন্তু তাহাদের সঙ্গে বিমলার তুলনা হয় না। বিমলাকে কবি ভিন্ন আবহাওয়ার মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন, তাহার পক্ষে সন্দীপের কথার ছটায় মুগ্ধ (fascinated) হইয়া এতটা অধোগামী হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক বোধ হয়। সুতরাং বিমলার চরিত্রও আকাশকুসুমের ন্যায় অবাস্তব, এখানেও কবির আর্ট বিফল হইয়াছে।

এইরূপে আমরা দেখিলাম, এই উপন্যাসের যে তিনটি প্রধান চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া কবি তাঁহার মায়াজাল বিস্তার করিয়াছেন, তাহার তিনটিই নিতান্ত অস্বাভাবিক। কাজেই তাহারা কেহই আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে না। সন্দীপের ন্যায় অতিমানুষ (super human) দানব লইয়া পুরাণ রচনা চলে, কিন্তু উপন্যাস রচনা ব্যর্থ হয়। সেই পুরাণের দেবতা হইবেন শীতলা, কারণ তাঁহার মধ্যে সংক্রামক রোগের বীজ লুক্কায়িত এবং নিখিল হইতেছে তাঁহার বাহন। বিমলা সুশিক্ষিতা যুবতী হইয়াও নিতান্ত শিশু। শিশুকে রাস্তায় পাইয়া যদি কোন লোক তাহার হাতের মোয়া কাড়িয়া লয়, তখন আমরা সেই শিশুর দোষ দিই না, দোষ দিই তাহার বাপ-মায়ের। সেই শিশুর কান্না দেখিয়া আমাদের দয়া হয় না, বরং তাহার সৃষ্টিকর্তার উপরে রাগ হয়।

কেহ হয়ত বলিবেন, এই উপন্যাসখানির কলা-কৌশল অতি সূক্ষ্ম। আমাদের ন্যায় স্থূলবুদ্ধি লোকের বোধগম্য নহে। তাহা হইলে কেবল সেই কারণেই ইহাতে আর্টের অভাব বলিতে হইবে। কারণ টলষ্টয়ের সূত্র অনুসারে যে কাব্য অধিকাংশ পাঠকের মনে কবির হৃদয়ের অনুভূতি সংক্রামিত করিতে না পারে, তাহাতে যথার্থ আর্ট নাই। (A work of art that united every one, with the another and with one another would be perfect art.)

এই কাব্যে মানসিক ভাব বিশ্লেষণের চূড়ান্ত ছড়াছড়ি, ইহার আখ্যায়িকা গ্রন্থকার নিজের কথায় ব্যক্ত না করিয়া পাত্রপাত্রীদের আত্মকথার দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে ক্রমাগত নিখিল, বিমলা ও সন্দীপের Sick Sentimentalism পাঠকের চিত্তে বিরক্তি উৎপাদন করে। সময় সময়

তাহাদের পূতিগন্ধময় ভাবের বিশ্লেষণ দ্বারা পাঠকপাঠিকার মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। তখন মনে হয় যেন এই তিন ব্যক্তি তাহাদের পেটের নাড়ীভুঁড়ি বাহির করিয়া ক্রমাগত চটকাইতেছে, এবং তাহার দুর্গন্ধে চতুর্দিকের আব-হাওয়া ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কবি অবশ্যই স্কুলমাষ্টারী করিতে বসেন নাই এবং তাঁহার নিকট আমরা কোন উচ্চ শিক্ষার আশা করি না। কিন্তু এই পূতিগন্ধময় কাব্য রচনা করিয়া সমাজের নৈতিক বায়ু (moral atmosphere) কলুষিত করিবার তাঁহার কোন অধিকার আছে কিনা ইহাই সুধীগণের বিবেচ্য।*

* 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা'য় অন্যান্য যে সকল চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা আছে সেগুলি হইতেছে, বঙ্কিম-চন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর'-এর শৈবলিনী, 'বিষবৃক্ষে'র কুন্দনন্দিনী ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর রোহিণী; এবং শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস'-এর পার্বতী, 'স্বামী'র সৌদামিনী ও 'শ্রীকান্ত'র রাজলক্ষ্মী ও অভয়া।

বলাকা

সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক দুই একজন বন্ধুর সহিত যখনই আলাপ ও আলোচনার সুযোগ হইয়াছে তখনই শুনিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্য অনেকাংশে দুর্বোধ এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যে তাহার স্থান কোথায় তাহা নির্দেশ করা কঠিন। একদিন রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ক্লাসে যখন পাওয়া গিয়াছিল তখন তাঁহাকেও এই প্রশ্ন করা হইয়াছিল। কবি তাহার উত্তরে তাঁহার সুললিত কণ্ঠে 'বলাকা'র কয়েকটি কবিতা পড়িয়া শুনান। 'বলাকা'য় তিনি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা তিনি 'বলাকা'র কবিতাগুলির মধ্যে যেরূপ সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন তাহা অপেক্ষা স্পষ্ট সরল গদ্যে তাহা বুঝান সম্ভব নয়, ইহাই বোধহয় কবির ব্যঞ্জনা। অধ্যাপক বন্ধুরা আমাকেও মধ্যে মধ্যে এই সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন। যখন যতটুকু সুযোগ পাইয়াছি বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। আজ এই প্রবন্ধে 'বলাকা' সম্বন্ধে মোটামুটি একটু আলোচনা করিব। কবির মর্মকথা উদ্‌ঘাটন করিতে পারিব কিনা জানি না। তবে আমি নিজে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে করি তাহাই বলিতে চেষ্টা করিব।

'বলাকা' গ্রন্থখানি ৪৬টি পৃথক পৃথক কবিতার সঞ্চয়ন। ইহাদের মধ্যে কবি প্রথম আটটি কবিতার নাম দিয়াছেন, তাহার পর নাম দেন নাই। নাম দিলে নাম দেওয়া যাইত না—এমন কথা বলা যায় না; তবে হয়ত তাহাদের সমষ্টিগত তাৎপর্যটি ক্ষুণ্ণ হইত, একথা মনে করিলে দোষ হয় না। 'বলাকা' নামটির সহিত সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা সুপরিচিত। বলাকারা

দ্রষ্টব্য: 'বলাকা' ১৩২৩ সালে (ইং ১৯১৬) প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই বৎসরটি কবির বিবিধ গ্রন্থ-প্রকাশের দিক হইতেও অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৎসর। এই বৎসর 'শান্তিনিকেতন' (১৫-১৭ ভাগ) ভাষণ, 'ফাল্গুনী' নাটক, 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস, 'সঞ্চয়' প্রবন্ধ, 'পরিচয়' প্রবন্ধ, 'বলাকা' কবিতা, 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস ও 'গল্পসপ্তক' প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'বলাকা'র একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। 'গীতাঞ্জলি'র পর 'বলাকা'য় এক বিশেষ ভাব-সংক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। এই গ্রন্থে মুদ্রিত সমূহ কবিতাগুলিই বিভিন্ন

যখন আকাশে আবদ্ধমালা হইয়া দুলিতে দুলিতে ব্যোমমার্গে মানসসরোবরের দিকে উড্ডীন হয়, তখন তাহাদের প্রত্যেকের পৃথক ও স্বতন্ত্র মূর্তি আমাদের কাছে তেমন প্রতিভাত হয় না, যেমন প্রতিভাত হয় তাহাদের গতিভঙ্গী, গতিচ্ছন্দ। বলাকার কবিতাগুলির প্রত্যেকটির হয়ত একটি স্বতন্ত্র তাৎপর্য আছে, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও তাহাদের ফলগুলিকে লইয়া আরও একটি স্বতন্ত্র তাৎপর্য স্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বলাকার অধিকাংশ কবিতার মধ্য দিয়া এই সমূহাত্মক তাৎপর্যের এক একটি বিশেষ প্রকাশ, বিশেষ ভঙ্গী ফুটিয়া উঠিয়াছে। বোধ হয় সেই জন্যই নাম দিতে দিতে কবি সজাগ হইয়া নাম বন্ধ করিয়া প্রক্রম ভঙ্গ করিয়াছিলেন।

নামের মধ্যে যাহা বাঁধা থাকে তাহার স্বতন্ত্রতা নামের আবরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেখানে প্রত্যেকটি কবিতার মধ্য দিয়া একটি চঞ্চল গতি-নৃত্যের পাদবিক্ষেপ সূচিত হয়, সেখানে সেই পাদবিক্ষেপকেই সমস্ত নৃত্যের মধ্যে এক করিয়া দেখিলে তাহার তাৎপর্য বুঝা যায়। নৃত্যচ্ছন্দ হইতে পৃথক করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে দেখিতে গেলে সমুদয়ের সহিত তাহার যে সামঞ্জস্যের সম্বন্ধ রহিয়াছে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি না পড়িতে পারে। দোদুল্যমান মালার ন্যায় বলাকা-পঙ্‌ক্তি যখন আকাশ দিয়া উড়িয়া যায় তখন প্রত্যেকটি বলাকার যে স্থান-সন্নিবেশের বিচিত্র পরিবর্তন ঘটে তাহা আমাদের দৃষ্টি তেমন আকর্ষণ করে না। এই স্থান-সন্নিবেশের বৈচিত্র্যের ফলে বলাকার মালাটি যে বিচিত্রভাবে

সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। অধিকাংশ কবিতার মর্মকথা ও ব্যাখ্যা কবি নিজেই বিভিন্ন কালে করিয়াছিলেন। উক্ত রচনাগুলি 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র দ্বাদশ খণ্ডের গ্রন্থ-পরিচয় অংশে মুদ্রিত হইয়াছে। 'বলাকা'র প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের কবিতাগুলি শিরোনামা-বর্জিতভাবে মুদ্রিত হয়।

রবীন্দ্রানুরাগী সুপণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা' নামে একখানি মূল্যবান গ্রন্থে 'বলাকা' কাব্যের প্রেরণা, উৎস, ছন্দ ও প্রত্যেকটি কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবসম্পদের তাৎপর্য কবির বক্তব্যের মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ কবি বলিয়া যাইতেছেন এবং লেখক তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছেন,—অনুরূপ পদ্ধতিতে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের 'নিবেদন'-এ সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—

> "বলাকার যে-সব আলোচনা কবির মুখে শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল সেইগুলির আলোচনা একই সময়ে ধারাবাহিকভাবে হয় নাই। ১৯২১ সালে বিশ-

বিচিত্ররূপে আমাদের মন হরণ করে, সেই বর্ণনাই বলাকার বর্ণনা। আকাশে ঘনকৃষ্ণ মসীতুল্য মেঘ উঠিয়াছে, ঝড় উঠিয়াছে, বলাকার মালাগুলি মধ্যে মধ্যে ছিঁড়িয়া যাইতেছে। বলাকাদের এই দুর্দাম বিপদের মধ্যে, মেঘ-ঝঙ্কার মধ্যে, কোন ভয় নাই, তাহাদের মালা যেমন একবার ছিঁড়িয়া যাইতেছে, আবার তাহারা গাঁথিয়া তুলিতেছে, মেঘের সম্মুখে আসিয়া বিপদের সম্মুখীন হইয়া তাহারা যেন নূতন জীবনের সন্ধান পায়।

গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ
সেবিষ্যতে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ।

তাহারা মানসসরোবরের যাত্রী, বিপদের মধ্যেই তাহাদের সম্পদ; তাই সমস্ত বিপৎপাতকে অতিক্রম করিয়া তাহারা তাহাদের অজানা মানসলোকের দিকে যাত্রা করে। 'বলাকা' বলিলেই আমাদের মনে সর্ববিপজ্জয়ী এই একটা অজানার উদ্দেশ্যে অন্তহীন গতিচ্ছন্দের কথা মনে পড়ে। 'বলাকা' গ্রন্থখানিতেও এমনি একটা গতিচ্ছন্দের লীলাভঙ্গী চিত্রিত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

বলাকার কবিতাগুলি ১৩২১ হইতে ১৩২৩-এর মধ্যে লিখিত। ১৩২৪-এর আশ্বিন ও কার্তিকের 'সবুজপত্রে' রবীন্দ্রনাথ 'আমার ধর্ম' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেন। কালগত ঐক্যবশতঃ মনে করা যাইতে পারে বলাকার কবিতার

> ভারতীর উত্তর বিভাগে সাহিত্যের ক্লাসে 'বলাকা' সম্বন্ধে কবির একটি আলোচনা কিছুদিন ধরিয়া চলে।···ইহা ছাড়াও তাহার পরে তাঁহার কাছে ছিলাম বলিয়া প্রায় বিশ-পঁচিশ বৎসর ধরিয়া নানা জনের সঙ্গে বলাকা সম্বন্ধে তাঁহার যে-সব আলোচনা শুনিয়াছি, তাহাই একত্র করিয়া এখন সকলের কাছে উপস্থিত করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি।"

'বলাকা' গ্রন্থ সম্বন্ধে মোহিতলাল মজুমদার বলিয়াছেন—

> "গীতি-রসসাধনার কালে রবীন্দ্রনাথ একবার কতকগুলি কবিতায় এক অভিনব কাব্যজগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন—এই কবিতাগুলির নাম 'বলাকা'। এমন একটি সম্পূর্ণ সৃষ্টির নিদর্শন একালের রচনায় আর নাই।"

সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তর 'রবি-দীপিতা' গ্রন্থের 'বলাকা' সম্বন্ধে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ হইতে আংশিকভাবে এই আলোচনাটি গৃহীত। উক্ত গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন ও আধুনিক কালের কয়েকখানি গ্রন্থের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আছে।

'বলাকা' 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র দ্বাদশ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

মধ্যে যে ভাবধারার ইশারা আছে এই প্রবন্ধে তাহার নিদর্শন বা সঙ্কেত পাওয়া যাইতে পারে। এই প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন 'কোন্' ধর্মটি তার ? যে ধর্ম মনের ভিতরে গোপনে থেকে তাকে সৃষ্টি করে তুলেছে। জীব-জন্তকে গ'ড়ে তোলে তার অন্তর্নিহিত প্রাণধর্ম। সেই প্রাণধর্মটির খবর রাখা জন্তর পক্ষে দরকারই নাই। মানুষের আর একটি প্রাণ আছে সেটা শারীর প্রাণের চেয়ে বড়—সেইটে তার মনুষ্যত্ব। এই প্রাণের ভিতরকার সৃজনীশক্তি হচ্ছে তার ধর্ম। এইজন্য আমাদের ভাষায় ধর্মশব্দ খুব একটা অর্থপূর্ণ শব্দ। জলের জলত্বই হচ্ছে জলের ধর্ম, আগুনের আগুনত্বই হচ্ছে আগুনের ধর্ম, তেমনি মানুষের ধর্মটা হচ্ছে অন্তরতম সত্য।

* * * রবীন্দ্রনাথের ধর্মের মধ্যে প্রধান কথাই বলা হইতেছে এই যে, একটি সৃজনীশক্তির গতির আবর্তে মানুষের ব্যক্তি-জীবন গড়িয়া উঠে! প্রথম অবস্থায় মানুষ একটা অবিচ্ছিন্ন শান্তিতে থাকে, সেটা হইতেছে মূঢ়তার শান্তি। তারপর আসে একদিকে প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, অপরদিকে বিরাট মনুষ্যসমাজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, আসে স্বার্থে স্বার্থে সঙ্ঘাত, আসে বিপদের উল্কাপাত, আসে বিভীষিকা। কবি তখন প্রার্থনা করেন,

"বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে যেন করিতে পারি জয়।"

এই বিপদ বিভীষিকা একান্তভাবে অনিয়মের আবির্ভাব নয় কারণ এই বিপদ বিভীষিকা সেই অসীমেরই আত্মপ্রকাশের উপায়মাত্র। ইহারা আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আমাদের সৃজনীশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। সেইজন্য যখনই আমরা বিপদের সামনে আসি তখনই আমাদের মনে রাখা উচিত যে ইহাতে ভয় পাইবার কিছুই নাই। যখনই কবি বিঘ্ন-বিপদের সম্মুখে আসিয়াছেন তখনই তিনি আপন সৃজনীশক্তিকে আপন যৌবনবেগকে আপন চলন-ধর্মকে 'আবিরাবির্মএধি' বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন এবং বিঘ্ন-বিপদের মধ্যে তাহা উত্তরণের জয়ডঙ্কা শুনিয়াছেন এবং তাহার অরাজকতার মধ্যে লোকোত্তর নিয়ম-শৃঙ্খলকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বাধার আঘাতে সৃজন-শক্তির ক্রমবিকাশ, বাধার জয়ে এবং তাহাকে নিজের মধ্যে সংহরণের লীলাতে নিজের আত্ম-প্রকাশের পূর্ণতর আবির্ভাব ও নিজের পরম সত্যের সাক্ষাৎকারের আনন্দ। এই গতির মধ্যেই কবি তাঁহার ধর্মের সাক্ষাৎকার পাইয়াছেন এবং এই

গতিধর্মের সহিত তাঁহার জীবনের, তাঁহার ব্যক্তিত্ব-প্রসারণের এমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক যে তিনি তাহাকে তাঁহার জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে প্রস্তুত নহেন। অন্তর্ধাতুর সৃজনীশক্তির ক্রমবিকাশে, নিজের ব্যক্তিত্বের পরিণতিতে, যে একটি অবিচ্ছেদ্য ক্রমচ্ছন্দ আছে তাহাকেই তিনি তাঁহার ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন, "আমার ধর্ম আমার জীবনের মূলে। সেই জীবন এখনও চলেছে কিন্তু মাঝ থেকে কোন এক সময়ে তার ধর্মটা এমনি থেমে গিয়েছে যে তার উপরে টিকিট মেরে তাকে যাদুঘরে কৌতূহলী দর্শকের চোখের সম্মুখে ধরে রাখা যায় একথা বিশ্বাস করা শক্ত,...যেখানে আমি থামিনি, সেখানে আমি থেমেছি, এমন ভাবের একটা ফটোগ্রাফ তুললে মানুষকে অপদস্থ করা হয়। চলতি ঘোড়ার আকাশে পা-তোলা ছবি থেকে প্রমাণ হয় না যে বরাবর তার পা আকাশেই তোলা ছিল এবং আকাশেই তোলা আছে।" রবীন্দ্রনাথের এই উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তি কয়টি হইতে এই কথা বোঝা যায় যে, তাঁহার জীবনে কোন এক বয়সের কবিতা হইতে কিংবা তাহার কবিতার কয়েকটি অবান্তর নমুনা হইতে তাঁহার জীবনের ধর্মের পরিচয় নিবার চেষ্টা কখনও সফল হইতে পারে না। তাঁর জীবনের ধর্ম বুঝিতে হইলে যে ধারাটি অবিচ্ছিন্নভাবে তাঁহার মধ্য দিয়া সমস্ত জীবন জুড়িয়া স্তরে স্তরে ধাপে ধাপে প্রকাশ পাইয়াছে তারই অনুসন্ধান করিতে হয়। যে সৃজনীশক্তিকে তিনি নিজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সমস্ত বিশ্বময় তিনি তারই লীলা দেখিয়াছেন। যে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া, যে অভিঘাতের মধ্য দিয়া, আমাদের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিতেছে সমস্ত বিশ্বময় প্রাণের যে লীলা চলিয়াছে তাহার মধ্যেও তিনি সেই লীলাই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বলাকা' কাব্যে, তাঁহার অন্তরাত্মাতে তিনি যে গতিধর্ম অনুভব করেন সেই গতিধর্ম নিজের মধ্যেই ও বাহিরের জগতে ও নিজের সঙ্গে বাহিরের দ্বন্দ্বে কি ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই প্রধানতঃ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'বলাকা'র প্রথম কবিতাটির নাম 'সবুজের অভিযান' এই কবিতাতে তিনি প্রাণের সৃজনীশক্তির যে ধর্মটির দ্বারা পুরাতনকে ভাঙিয়া নূতনকে আনা হয় তাহারই সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। এই সৃজনীশক্তি যখন আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে তখন সম্মুখে নানা বাধা-বিঘ্ন, আবরণ আসিয়া তাহার গতিরোধ করে।

"তোরে হেথায় করবে সবাই মানা।
হঠাৎ আলো দেখবে যখন
ভাববে এ কি বিষম কাণ্ডখানা!
সজ্ঘাতে তোর উঠ্‌বে ওরা রেগে,
শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে,
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়।
আয় প্রচণ্ড আয়রে আমার কাঁচা॥"

জীবনী-শক্তির এই অভিযানের পথে হয়ত অনেক ভুল ক্রটি দোষ বিচ্যুতি ঘটিতে পারে।

"ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলি সব আনরে বাছাবাছা।"

কিন্তু সে ভুলের দিকে দৃষ্টি দেবার কোন প্রয়োজন নাই কারণ অবাধ অজানার দেশে যাইতে গেলে অনেক পরিশ্রম ব্যর্থ হইতে পারে। সৃজনী-শক্তির মধ্যে যে বেগ আছে সে বেগ কেবলমাত্র এই জানে যে অনন্তের বুকে তাহাকে ছুটিতে হইবে। সেটি নির্বাধ অনন্ত জীবনপ্রবাহ "An infinite vital impulse—spontaneous creativity"—তার গতির ছন্দ আসে তার বাধাধারা, সেই জন্য বাধার সঙ্গে বিরোধেই আপন গতিক্রম নির্দিষ্ট হয়।

"আন্‌রে টেনে বাঁধা-পথের শেষে!
বিবাগী কর অবাধ পানে,
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।
আপদ আছে, জানি আঘাত আছে,
তাই জেনে তো বক্ষে পরান নাচে,
ঘুচিয়ে দে ভাই পুঁথি পোড়োর কাছে
পথে চলার বিধি-বিধান যাচা।
আয় প্রমুক্ত, আয়রে আমার কাঁচা।"

এই সৃজনীশক্তি পুরাতনকে নূতন করিয়া, মৃতকে সঞ্জীবিত করিয়া, শীতের আঘাতে পাতা ঝরাইয়া দিয়া, বসন্তের বকুলফুল ফুটাইয়া তুলে। 'সর্বনেশে' কবিতাটিতে এই জীবনীশক্তির ভাঙনের দিকটার ছবি আঁকা হইয়াছে—

"ঝড় এসে তোর ঘর ভ'রেছে,
এবার যে তোর ভিত নড়েছে,
শুনিস নি কি ডাক পড়েছে,
নিরুদ্দেশের দেশে গো।
এবার যে এল ঐ সর্বনেশে গো।"

কিন্তু এই ভাঙনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কবি ভয় পান নাই,

"কণ্ঠে কি তোর জয়ধ্বনি ফুটবে না?
চরণে তোর রুদ্রতালে
নূপুর বেজে উঠবে না?
এই লীলা তোর কপালে যে
লেখা ছিল,—সকল ত্যেজে
রক্তবাসে আয়রে সেজে।
আয় না বধুর বেশে গো।"

কবি শুধু যে ভাঙন দেখিয়া ভয় পান নাই তাহা নহে এই ধ্বংসের আঘাতকে অতিক্রম করিয়াই যে তিনি জয়মাল্যের অধিকারী হইবেন এবং এই দ্বন্দ্বের মিলনের দ্বারাই যে তিনি পরম মিলনের সাক্ষাৎকার পাইবেন তাহা বুঝিয়া বধূর ন্যায় ইহাকে বরণ করিয়া লইতেছেন। যাহারা নির্ভীকভাবে এই জীবনের উদ্দাম শক্তির সহিত আপনাকে এক করিয়া দিয়া দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সহিত সংগ্রাম করিতে ভীত হইয়া পশ্চাতে পড়িয়া থাকে তাহাদের সেই আলস্যে তাহাদের ব্যর্থতা—

"রইল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।"

সেই জন্য 'আহ্বান' কবিতাটিতে 'সর্বনেশে' কবিতাটির ভাবই কবি ফুটাইয়া তুলিয়া বলিতেছেন—

"জাগবে ঈশান, বাজবে বিষাণ,
পুড়বে সকল বন্ধ।
উড়বে হাওয়ায় বিজয় নিশান
ঘুচবে দ্বিধা দ্বন্দ্ব।

মৃত্যু-সাগর মথন করে
অমৃতরস আন্‌বো হ'রে
ওরা জীবন আঁকড়ে ধ'রে
মরণ-সাধন সাধবে
কাঁদবে ওরা কাঁদবে ॥"

পশ্চাতে পড়িয়া থাকাতেই মৃত্যু, সাগরে সাঁতার দেওয়াতেই অমৃত।

যখন আরাম-আলস্যে জীবনের মধ্যে একটি শৈথিল্য আসে, বাধাবিঘ্ন যখন জীবনীশক্তিকে উত্তেজিত, উৎফুল্ল করিয়া না তুলে, তখন এই নিশ্চেষ্টতার ব্যর্থতা অনুভব করিয়া কবি বলিয়াছেন—

"তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে,
কেমন করে সইবো ?
* * * এ কি রে দুর্দৈব।"

তখন কবি বাধাবিঘ্নকে আহ্বান করিয়া বলেন—

"অন্ধ দিকে দিগন্তরে
জাগাও না আতঙ্ক।
দুই হাতে আজ তুলবো ধরে
তোমার জয়শঙ্খ।...
ব্যাঘাত আসুক নব নব
আঘাত খেয়ে অচল রবো
বক্ষে আমার দুঃখে তব
বাজবে জয়ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি ল'ব
অভয় তব শঙ্খ ॥"

গহন রাত্রিকালে গভীর অন্ধকারের মধ্য দিয়া মানুষ অজানা সাগরে পাড়ি দেয়, তার জীবনী-শক্তির প্রবাহ তাহাকে কোথায় লইয়া যায় তাহার পথ সে জানে না, দুঃখ-দৈন্যের অগৌরবের মধ্যে অনন্তের পিয়াসী চিত্ত তার দুর্দাম অন্বেষণের মধ্যে তাহার জীবনের যথার্থ গৌরবের সাক্ষাৎ পায়। রজনীগন্ধার গন্ধের ন্যায় অনন্তের একটি সুগন্ধ তাহার হৃদয়কে আবিষ্ট করিয়া রাখে, তাহার বিশ্বাস যে এই গন্ধের সঙ্কেতে সে যাহাকে পাইয়াছে একদিন

তাহার সাক্ষাৎ পাইবে। সে সাক্ষাৎকারের কোন বাহ্যিক লক্ষণ নাই, সেটি একটি অন্তরের প্রস্ফুরণ মাত্র। রাত্রির অন্ধকার কাটিয়া গিয়া প্রভাতের আলোর দর্শনের ন্যায় তার অনুভব। তাই 'পাড়ি' কবিতাটিতে কবি বলিয়াছেন—

"বাজবে নাকো তূরী ভেরী, জানবে নাকো কেহ,
কেবল যাবে আঁধার কেটে, আলোয় ভরবে গেহ,
দৈন্য যে তার ধন্য হবে পুণ্য হবে দেহ
পুলক পরশ পেয়ে
নীরবে তার চিরদিনের ঘুচিবে সন্দেহ
কূলে আসবে নেয়ে॥"

কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কবি তাঁহার অন্তরের মধ্যে যে অন্তর্যামীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, যে শিবমদ্বৈতম্‌কে প্রকৃতির সঙ্গে যোগে তিনি তাঁহার জীবনের প্রভাতে একটি শান্তির আবেষ্টনের মধ্যে অনুভব করিয়াছিলেন, যে একটি পরিপূর্ণতার সন্ধান তাঁহার সমস্ত কবিচিত্তের অনুভূতিকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার সহিত এই সৃজনীশক্তির দ্বিধাদ্বন্দ্বের যুদ্ধের সম্পর্ক কোথায়। সেই শিবমদ্বৈতম্ নিশ্চল, শান্ত, নিরঞ্জন। অথচ বাহিরের জগতে ও অন্তরের মনোজগতে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, সেখানে অনবরতই গতির ঘূর্ণাবেগ চলিয়াছে। এই গতিবেগ যদি সত্য হয় তবে সেই শান্তি নিরঞ্জন কি মিথ্যা? সে কি শুধু পটে লিখা ছবির ন্যায় গভীর মর্মতলে রেখাপাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ? ধ্যানের মধ্যে যাহাকে উপলব্ধি করা যায় দ্বন্দ্বের মধ্যে আসিয়া কি সে নিঃশেষে তাহার সত্তা হারাইয়া ফেলে? এই যে—

"সহস্র ধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন-নির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী"

ইহার মধ্যে 'আনন্দরূপমমৃতং যৎ বিভাতি' তাঁহার স্থান কোথায়? যখন সংসারের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে নিরন্তর অসি ঝঞ্চনের প্রবল আঘাত বিক্ষোভের মধ্যে আমরা তাহার অনুভব বিস্মৃত হই তখন কি তাহার অস্তিত্ব শেষ হইয়া যায়? যাহা চঞ্চল তাহা যদি সত্য হয়, তবে যাহা স্থির অচঞ্চল তাহার সত্যতা কোথায়? এই স্থিরের সহিত চঞ্চলের কি সম্পর্ক? তাহার উত্তরে কবি বলেন যে, নদীর তরঙ্গবেগের মধ্যে, মেঘের নিরন্তর পরিবর্তনশীল

বর্ণচ্ছটার মধ্যে তাহার মূল শক্তিরূপে সেই শিবমদ্বৈতম্ বিরাজ করিতেছে। বিস্মৃতির মর্মে বসিয়া রক্ত সঞ্চারের দোলা দিতেছেন। 'যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি, যেন চক্ষুংষি পশ্যন্তি প্রাণেন যঃ প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে,' অর্থাৎ যাঁহাকে চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না অথচ যিনি চক্ষু দর্শনময় করিয়াছেন, প্রাণ যাঁহাকে পায় না অথচ প্রাণের সাড়া যাহা দ্বারা জাগিয়া উঠিয়াছে তিনিই ব্রহ্ম।

"নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই ;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।

নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে ;
কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি ?"

তাহারই সুর কবির প্রাণে বাজিয়া উঠিয়া তাঁহাকে কাব্যস্পন্দনে কবি করিয়া তুলিয়াছিল। স্থির হইয়াও তিনি সমস্ত চঞ্চলতার মধ্য দিয়া তাহারই অচঞ্চল মূর্তিকে সার্থক করিয়া তুলিতেছেন। আমাদের অন্তরের নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে তিনিই সামঞ্জস্যের মূল সূত্র, বিরোধের মধ্য দিয়া তিনিই তাঁহার এই সাম্য মূর্তিকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। বিরোধ না হইলে সাম্যের সার্থকতা নাই। বিরোধ ছাড়া যে সামঞ্জস্য, তাহা শূন্যতার সামঞ্জস্য, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আঘাতে, বিক্ষোভের তাড়নার মধ্যে, তাহাকে হারাইয়া ফেলিয়াছি বলিয়া মনে করিলেও তাহাকে হারাইতে পারি নাই। অন্ধকার অজানার পথে অগোচরে তাহারই সহিত আবার সাক্ষাৎকার ঘটে। বিরহের ছায়ার আড়াল কাটিয়া জীবনের পূর্ণতায় তাহারই পরিস্ফুরণ জাগিয়া উঠে।

"তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে,
তার পরে হারায়েছি রাতে

তার পরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি
নও ছবি নও তুমি ছবি।"

* * *

বলাকার প্রধান বক্তব্য এই যে আমাদের অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তির বেগে আমরা সমস্ত বাধাবিপদ উত্তীর্ণ হই, এই সৃজনীশক্তির আপন স্বাভাবিক গতি কোন্ অজানার দিকে ছুটিয়াছে তাহা আমরা জানি না। অথচ এই বাধা-বিপত্তির সহিত সংগ্রামে এই সৃজনীশক্তির গতিচ্ছন্দ নিয়মিত হয় ইহাই আমাদের জীবনের ব্যাপক ধর্ম, ব্যাপক স্বভাব এবং আমাদের পরম আত্মীয় প্রকৃতি। প্রথম প্রশ্ন উঠিয়াছিল এই যে তাহা হইলে আমাদের কূটস্থ অন্তর্যামী পুরুষের সহিত আমাদের এই গতির, প্রাকৃতিক জীবনের সম্বন্ধ কোথায়, 'ছবি' কবিতাটিতে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠিয়াছিল এই যে প্রেম যখন আমাদিগকে জীবনের গতিবেগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনে এবং আর্টের দ্বারা যখন সেই জীবন-প্রবাহ হইতে একটি বিন্দুকে, জীবনের মালা হইতে একটি বীজকে স্বতন্ত্র করিয়া, চিরন্তন করিয়া আমরা প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করি তখন সেই সীমাবদ্ধের মধ্যে আমাদের চরম সার্থকতা হয় কিনা?

সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে শা-জাহান কবিতায়। বিচ্ছিন্ন প্রেমের মধ্যে, আর্টের বিচ্ছিন্ন সৃষ্টির মধ্যে জীবনের যথার্থ সার্থকতা নাই। জীবনের যথার্থ সার্থকতা সেইখানে যেখানে স্রষ্টা তাঁহার নিজের সৃষ্টিকে অতিক্রম করেন। উপনিষদ বলিয়াছেন; 'তদৈক্ষত বহু স্যাম্' তিনি বহু হইতে আরম্ভ করিয়া আপন ঈক্ষণ ক্রিয়ায়, আপন স্বরূপদর্শনের সুদর্শন-চক্রে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎ তাঁহারই স্বরূপের প্রতিবিম্ব মাত্র। কিন্তু এই প্রতি-বিম্বের মধ্যে তিনি তাহাকে নিঃশেষে ক্ষয় করিয়া ফেলেন নাই। নার্সিসাস্-এর মতন আপন প্রতিবিম্বের সৌন্দর্য দেখিয়া মোহান্ধ হইয়া আপনাকে জড় করিয়া ফেলেন নাই। কিন্তু নিরন্তর সৃষ্টির কার্যের মধ্য দিয়া তিনি আপনার স্বরূপকে সার্থক করিয়া তুলিতেছেন। সৃষ্টির মুখে বাধা উত্তীর্ণ হইয়া আবার সৃষ্টি, এমনি করিয়া চিরচঞ্চল স্বভাবের মধ্য দিয়া আপনার অচঞ্চল সত্য-স্বরূপকে সার্থক করিয়া তুলিতেছেন। কোন সৃষ্টিতেই তিনি বাঁধা পড়িয়া যান নাই। সৃষ্টিই অপর একটি সৃষ্টির কারণীভূত হইয়া সমগ্রের মধ্যে

তাহার আত্ম-পরিচয় লাভ করিয়াছে। 'বলাকা'র প্রথম সাতটি কবিতায় অন্তর্জগতের দিক দিয়া এই লীলাটি চিত্রিত করা হইয়াছে। যদি 'বিশ্বভারতী'র অভিভাবকগণের তরফ হইতে কোন খেসারৎ দাবীর ভয় না থাকিত তবে 'বলাকা'র কোনও নূতন সংস্করণ করিতে গেলে আমি এইখানে 'বলাকা'র প্রথম পর্ব বলিয়া সূচনা করিতাম। 'চঞ্চলা' কবিতা হইতে আরম্ভ করিয়া এই লীলারই বাহ্য জগতের পরিচয় ও বাহ্য হইতে অন্তরে আসিবার সেতুর পরিচয় আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু 'চঞ্চলা' কাবতাটি আরম্ভ করিবার পূর্বে ঠিক শা-জাহান কবিতাটির পরে,—

"কে তোমারে দিল প্রাণ
রে পাষাণ!"

এই কবিতাটি বসান উচিত ছিল। এই কবিতাটিতে আর্টে মানুষের বেদনাকে কি উপায়ে সর্বমানবের অনুভূতির মধ্যে চিরন্তন সাক্ষাৎরূপে প্রকাশ করিতে পারে তাহাই বলা হইয়াছে। মানুষের জীবন-প্রবাহ হইতে একটি খণ্ড অনুভূতিকে বাহির করিয়া আনিয়া ঐন্দ্রিয়ক উপায় দ্বারা (Sensuous form) তাহাকে বাহ্যজগতে মূর্ত করিয়া সর্বকালের সর্বমানবের তাদৃশ অনুভূতির মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত করা, ইহাই আর্টের কাজ। মানুষের অন্তরের যে মনটি তাহার একান্ত আপনার, তাহার একান্ত নিজস্ব, সেখানে অপর কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। সেখানে মানুষ আপন সার্থকতা আপনিই উপলব্ধি করে। জীবনযাত্রার পথে বহির্জগতের সহিত মানুষের যে নানা সম্পর্ক ঘটে, নানা উপকরণের পুঞ্জীভূত ভারের সহিত মানুষ যে আপনাকে ভারগ্রস্ত করে তাহা তাহার একান্ত অনাত্মীয়। মানুষের সৃজনীশক্তির সহিত তাহার আত্মস্বভাবের সহিত তাহার কোন যোগ নাই। তাই তাহাদের মধ্যে মানুষের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বস্তুনিচয়ের পরস্পর সঙ্ঘাতে বস্তুরা আসিয়া এক জায়গায় জমিয়া উঠে আবার বিশীর্ণ হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। মানুষ অন্তরে যে সত্যকে অনুভব করে আর্টের দ্বারা তাহা সর্বসাধারণের করিয়া প্রকাশ করে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একদিকে যেমন তার ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা আছে অপর দিকে তাহার মধ্যে একটি বিশ্বপুরুষ আছে। সমস্ত মানুষের মধ্যেই একই সৃজনীশক্তির লীলা আত্মপ্রকাশ লাভ করিতেছে; তাই একটি পুরুষের অন্তর্জীবনের লীলার মধ্যে যে বেদনাটি পরম সত্য বলিয়া

অনুভূত হয় তাহা বিশ্বমানবের অনুভূতির মধ্যে চিরন্তনভাবে সত্য হইয়া রহিয়াছে। তাই কোন মানুষ যখন তাহার অন্তর্যামী পরম সত্যের আহ্বানে আপনার সৃজনীশক্তি দ্বারা কোনও একটি অনুভবকে পরম সত্য বলিয়া অনুভব করে এবং ঐকান্তিক উপায় দ্বারা সর্বসাধারণের নিকট মূর্ত করিয়া তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে তখন সর্বকালের সর্বমানব সেই ব্যক্তির সেই বিশেষ অনুভবটিকে তাহাদেরই মধ্যের একটি অনুভব বলিয়া আবিষ্কার করে ও গ্রহণ করে। এইজন্য আর্টের পথে একদিকে যেমন আমাদের জীবন-প্রবাহ হইতে একটি অনুভূতিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মূর্ত করিয়া জগতের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে পারি, অপরদিকে তেমনি বিশ্বমানবের অনুভূতির মধ্যে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া সর্বমানবের একটি বিরাট সাম্যের পরিচয় পাই—

"সম্রাট-মহিষী
তোমার প্রেমের স্মৃতি সৌন্দর্যে হয়েছে মহীয়সী,
যে স্মৃতি তোমারে ছেড়ে, গেছে বেড়ে
সর্বলোকে
জীবনের অক্ষয় আলোকে।
অঙ্গ ধরি' যে অনঙ্গ স্মৃতি
বিশ্বের প্রীতির মাঝে মিলাইছে সম্রাটের প্রীতি।"

"আজ সর্বমানবের অনন্ত বেদনা
এ পাষাণ সুন্দরীরে
আলিঙ্গনে ঘিরে
রাত্রিদিন করিছে সাধনা।"

কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গেই কবি এই কথাটি বারম্বার আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন যে আমাদের জীবনের সমস্ত অনুভূতির যে ছবি আমরা আর্টের দ্বারা বহির্জগতে প্রকাশ করি তাহা আমাদের সৃষ্টিময় অন্তর্জীবনের যথার্থ রূপ নহে। তাই যখন 'দান' কবিতাটিতে কবি বলিতেছেন—

"হে প্রিয় আজি এ প্রাতে
নিজ হাতে

কী তোমারে দিব দান ?

প্রভাতের গান ?

প্রভাত যে ক্লান্ত হয় তপ্ত রবিকরে

আপনার বৃন্তটির 'পরে ;

অবসন্ন গান

হয় অবসান।"

আর্টের যে প্রাপ্তি তাহা চরম প্রাপ্তি নয়। তাহা মানুষের শ্রেষ্ঠ ধন নয়,

"আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে,

দেখা দেয় মিলায় পলকে

বলে না আপন নাম, পথেরে শিহরি দিয়া সুরে

চলে যায় চকিত নূপুরে।

সেথা পথ নাহি জানি,

সেথা নাহি যায় হাত নাহি যায় বাণী।

বন্ধু তুমি সেথা হতে আপনি যা পাবে

আপনার ভাবে,

না চাহিতে না জানিতে সেই উপহার

সেই তো তোমার।

আমি যাহা দিতে পারি সামান্য সে দান

হোক ফুল হোক তাহা গান।"

অন্তঃপুরুষের সৃজনীশক্তির মধ্যে, তাহার নিরন্তর আত্মপ্রকাশের গতিশীলতার মধ্যে তাহার অজানার দিকের অভিসারের আপন স্বচ্ছন্দ চমকে ঝলকে যাহা ফুটিয়া উঠে তাহাই মানুষের অন্তর্যামীর হাতে দিবার উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ ধন, যাহা নিজের ইচ্ছায় টানিয়া বাহির করিয়া আনে তাহা নহে। কোন্ অজানার স্রোতের ঘূর্ণি হইতে কাব্যের ফুল ফুটিয়া উঠে এবং জীবনের সহিত আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেশে দেশে দিকে দিকে ভাসিয়া বেড়ায়, যেখানে তাহারা জন্ম লইয়াছে, সেখানে তাহাদের মূলের সহিত তাহারা তাহাদিগকে গাঁথিয়া রাখিতে পারে নাই। তাহাদের বাসা নাই, সঞ্চয় নাই, আলোর আনন্দ নিয়া জলের তরঙ্গে তাহারা নাচিয়া বেড়ায়। তাহারা অজানা অতিথি, তাহারা কবে আসে কবে যায় তাহার কোন নিশ্চয় নাই।

'চঞ্চলা' কবিতাটিতে চিরচঞ্চল স্রোতে চাহিয়া কবি আপন অন্তরের মধ্যে সৃজনীশক্তির যে সাক্ষাৎ পাইয়াছেন তাহাকেই যেন বাহিরে মূর্তরূপে প্রত্যক্ষ করিতেছেন—

*　　　　*　　　　*

"স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে ;
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে ;

*　　　　*

হে ভৈরবী ওগো বৈরাগিনী
চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী
　　শব্দহীন সুর,
　　অন্তহীন দূর
তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া ?

*　　　　*　　　　*

শুধু ধাও শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও,
　　উদ্দাম উধাও ;
　　ফিরে নাহি চাও,
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
　কুড়ায়ে লও না কিছু, কর না সঞ্চয় ;
　　নাই শোক, নাই ভয়,
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় করো ক্ষয়।
যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,
　　তুমি তাই
　　　পবিত্র সদাই।

যদি তুমি মুহূর্তের তরে
　　ক্লান্তি ভরে
　দাঁড়াও থমকি,

তখনি চমকি

উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে ;

*　　　　*

অণুতম পরমাণু আপনার ভারে

সঞ্চয়ের অচল বিকারে

বিদ্ধ হবে আকাশের মর্মমূলে

কলুষের বেদনার শূলে।

*　　　　*

যুগে যুগে এসেছি চলিয়া

স্খলিয়া স্খলিয়া

চুপে চুপে

রূপ হতে রূপে

প্রাণ হতে প্রাণে।

নিশীথে প্রভাতে

যা কিছু পেয়েছি হাতে

এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হতে দানে

গান হতে গানে।

তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক তীরে,

তাকাস্‌নে ফিরে!

সম্মুখের বাণী

নিক্ তোরে টানি

মহাস্রোতে

পশ্চাতের কোলাহল হতে

অতল আঁধারে—অকূল আলোতে।"

এই কবিতাটি পড়িলে দেখা যায় যে-সৃজনীশক্তি এই জগৎ রচনা করিয়াছে তাহা একটি প্রাণস্রোত, একটি প্রাণবেগ মাত্র, a vital impulse। যে

শক্তির নিজের কোন রূপ নাই বস্তু নাই অথচ তাহা হইতে নিরন্তর রূপ-বস্তু ফুটিয়া উঠিতেছে। তাহার শব্দ নাই, কোন অন্তহীন দূরের আহ্বানে সে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার গতিবেগে সে যাহা উৎপন্ন করিতেছে তাহার দিকে তাহার দৃষ্টি নাই, মায়া নাই, মোহ নাই। সে ঘূর্ণির প্রবাহিণী সমস্ত ঘূর্ণিতে আপনাকে নিরন্তর প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। প্রকাশের ফলে তাহার লোভ নাই, প্রকাশের বিকাশে তাহার আনন্দ। যদি এই ক্রিয়াশক্তি, এই সৃজনীশক্তি মুহূর্তের জন্য বন্ধ হইত তবে বিশ্ব মৃত জড়পুঞ্জের সমাবেশে মহা-কলুষতার সৃষ্টি করিত। কিন্তু শক্তির নিত্য-মন্দাকিনী মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবনকে নিরন্তর শুচি করিয়া তুলিতেছে। মৃত্যুকে জীবনের মধ্যে স্থান দিয়াছে বলিয়াই মৃত্যুর মধ্যে আমরা মৃত্যুকে পাই না, চিরনবীনের অমৃতের মধ্যে মৃত্যুর যথার্থরূপ প্রত্যক্ষ করি। এই জাতীয় আর একটি কবিতাতে (১৬) কবি বলিয়াছেন যে মানুষ যখন তাহার লক্ষ লক্ষ অলক্ষ্য ভাবনা ও অসংখ্য কামনাকে আশ্রয় করিয়া বাহিরের জড় পদার্থের মধ্যে কাষ্ঠ লোষ্ট্রের মধ্যে আপনাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চায় তখনই তাহাকে জড় পদার্থের কঠিন নিপীড়নে নিগৃহীত হইতে হয়। মানুষের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা, কলকারখানা প্রভৃতি যাহা কিছু আমরা চারিদিকে দেখিতে পাই তাহাই মানুষের জড় পরিণতি। অতীতের কত অশ্রুতবাণী আমাদের অন্তরের মধ্য দিয়া উড়িয়া চলিয়াছে। নীরব কোলাহলে চিত্তগুহা ছাড়িয়া কোথায় কোন অদৃশ্যের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়াছে তাহাদের কোনটিকে হয়তো ধরিয়া আমরা রূপের বাঁধনে বাঁধিয়া রাখি। আবার তাহাদের মধ্যে কত অসংখ্য অগণিত অস্ফুট ভাবনা চিত্তের মধ্যে ক্ষণিক ঝংকার দিয়া কোথায় কোন্ গহনে আপনাদিগকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। আবার হয়তো কোন সুদূরকালে কোন কবির কোন শিল্পীর সুকৌশলে তাহাদের কেহ কেহ রূপের বাঁধনে ধরা পড়িয়া মূর্তভাবে প্রকাশ লাভ করিবে। সকল মানবের মধ্য দিয়াই একটি সৃষ্টিক্রিয়া চলিয়াছে। কোন্ আলোকের উদ্দেশ্যে চিত্তের ভাব-যাত্রীদের তীর্থযাত্রা চলিয়াছে। সকলের মধ্যে এই একই ইতিহাস। এক কবির কাছে যাহা মূর্তিলাভ করিল না, তাহা হয়ত সহস্র শতাব্দী পরে অন্য কবির নিকট মূর্তিলাভ করিবে। চিরন্তন কালের মানবের মধ্যে এই যে চিরন্তম লীলা চলিয়াছে কালে কালে লোকে লোকে তাহারই অংশবিশেষ চিত্রে ছন্দে গানে মূর্তিলাভ

করিয়া প্রত্যেকের মধ্যে অবস্থিত বিশ্বমানবের ঐক্যরূপটিকে সাক্ষাৎ করাইয়া দেয়।

রবীন্দ্রনাথ 'আমার ধর্ম' এই প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, মানুষের ভিতরে যে সত্যরূপ সেইটিই তার ধর্ম। মানুষের ভিতরে তার আত্মস্বরূপে যে সৃজন-শক্তি আপনাকে প্রকাশ করিয়া তুলিতেছে, তাহা ক্রমশঃ আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতেছে। সেইজন্য তাহার ধর্মও এই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার আপন স্বভাবকে প্রকাশ করিয়া তুলিতেছে। মানুষ একটি বস্তুভূত জড়পদার্থ নয়। সেইজন্য কোন স্থিতিশীল গুণের দ্বারা তাহার পরিচয় প্রকাশ করা যায় না। সে প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, তাঁহার জীবনের প্রভাতকাল হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার মধ্যে যে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া চলিয়াছিল তাহা বিশেষ বিশেষ রূপে তাঁহার বিভিন্ন কালের কাব্যরচনার মধ্য দিয়া প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। তাঁহার জীবন শেষ হয় নাই। তাই তাঁহার ধর্মও শেষ হয় নাই। তাঁহার মতে ধর্ম কোন একটা মত বা কোন একটা বিশ্বাস নয়, ধর্ম হইল গতিশীল অন্তঃস্বরূপের আপন সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার স্বভাব। তাহাকে সেই অন্তরের ক্রিয়াস্বরূপ হইতে পৃথক করিয়া ধরা যায় না। রবীন্দ্রনাথের এই ধর্মের ও তাঁহার অন্তররূপের যে নানা ছবি 'বলাকা'র কবিতাগুলির মধ্য দিয়া প্রতিবিম্বিত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা পরম্পরাক্রমে সাজাইয়া তাহার মূর্তি পরিকল্পনা করিবার একটা চেষ্টা এতক্ষণ করা হইয়াছে, তাহার মুখ্য তাৎপর্য এই যে, এক অখণ্ড সত্যস্বরূপ তাহার বস্তুহীন নিরাকার অমূর্ত সৃজনীশক্তি দ্বারা আপনাকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছেন, সেই চেষ্টার ফলে একদিকে হইয়াছে জড়জগৎ, সাধারণ জীবজগৎ ও অপরদিকে হইয়াছে মানুষ। সমস্ত জীবনীশক্তির লীলা মানুষের মধ্যে আসিয়া প্রবুদ্ধ হইয়াছে। বিশ্বসংসার মানুষের চেতনলোকের মধ্যে আসিয়া অর্থপূর্ণ হইয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছে। মানুষ যাহা অন্তরের সৃজনীশক্তির মধ্যে অনবরতই অনুভব করে যে, সে যাহা পাইয়াছে, পাইতেছে, তাহার বাহিরে কোন এক অজানা হইতে যেন কি আহ্বান আসিতেছে এবং সেই আহ্বানের প্রেরণায় সে আপনাকে নিরন্তর গতিভঙ্গীর মধ্য দিয়া অগ্রসর করাইয়া চলিতেছে। বাধা না হইলে গতি হয় না, সেইজন্য গতির মুখেই আসে বাধা এবং এই বাধাকে জয় করাতে গতির সার্থকতা। জরামৃত্যু, পাপদুঃখ, জড়তা সমস্তই

এই বাধার বিভিন্ন স্বরূপ মাত্র। বাধার সহিত দ্বন্দ্বের প্রতি ভঙ্গীতেই আমাদের আত্মার চলৎস্বরূপ নির্মিত হইতেছে। বাধা জয়ের আনন্দই চলার আনন্দ, এবং এই চলার আনন্দেই মানুষের চরম সার্থকতা। অজানার মূর্তি মানুষের জানা নাই, কিন্তু আমাদের প্রত্যেক বিকাশের মধ্য দিয়াই যে নূতন নূতন গতি পরিণাম আবর্তিত হইয়া চলিয়াছে, ইহার মধ্যে অজানার রূপ প্রতিবিম্বিত হইতেছে, কাজেই অজানা আমাদের একান্ত অজানা নহে।

রবীন্দ্রনাথ কোন দার্শনিকতত্ত্বের বিচার করিতে বসেন নাই, কিন্তু তথাপি এই অনুভবের মধ্যে তাঁহার কাব্য রক্তমাংসে সজীব হইয়া উঠিয়াছে। এই অনুভবটির সহিত Bradley, Bosanquet, Pringle, Pattison, Bergson প্রভৃতির মতবাদের যে একটি গভীর সামঞ্জস্য ও ঐক্য আছে তাহা যাঁহারা ঐ সকল গ্রন্থকারদের গ্রন্থ পড়িয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসেই উপলব্ধি করিবেন। Idealistic বা বিজ্ঞানবাদের মতের মূল লক্ষণ এই যে Reality is Spiritual অর্থাৎ তত্ত্ব-মাত্রই আত্মিক। এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে Idealist বা বিজ্ঞানবাদী বলা চলে। কিন্তু যে সকল Idealist-রা জগৎকে কেবলমাত্র মায়াপ্রপঞ্চ বলেন, রবীন্দ্র-নাথ সে দলের লোক নহেন। মানুষের সহিত জগতের যে একটা organic relation বা অঙ্গাঙ্গিভাব-সম্বন্ধ রহিয়াছে, সে কথা রবীন্দ্রনাথ কোথাও স্পষ্টতঃ বলেন নাই; তাঁহার অধিকাংশ কবিতার মূলে সেই দ্যোতনা তাঁহার অনুভবের জ্যোতিঃরেখার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। আধুনিক ইউরোপীয় দার্শনিকদের মধ্যে এই organic relation বা অঙ্গাঙ্গিভাব সম্বন্ধটি যেভাবে অনুভূত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের অনুভবটি তাহা হইতে একটু স্বতন্ত্র। আধুনিক ইউরোপীয় দার্শনিকদের organic relation-এর কথায় যাহা দেখিতে পাই, তাহার তাৎপর্য এই যে মানুষ প্রাকৃতিক জগৎ হইতে ক্রমবিকাশ ধারায় উৎপন্ন হইয়াছে। গাছের যেমন চরম পরিণতি তাহার ফুলে ও ফলে, মানুষও তেমনি সমস্ত প্রকৃতিবৃক্ষের একটি পুষ্পস্বরূপে তাহারই দেহসম্বন্ধ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য প্রকৃতির সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষকে দেখিতে পারি না এবং মানুষের সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রকৃতিকে দেখিতে পারি না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে organic relation-টির পরিচয় পাই তাহা এইরূপ যুক্তিপরম্পরার মধ্য দিয়া আসে নাই।

টি রসানুভবের দ্বারা প্রকৃতির সহিত একটা গভীর প্রীতিবন্ধনে রসোজ্জ্বল
গোজ্জ্বল একটি অনুভূতি লইয়া কবি যাত্রা সুরু করেন। পরে যখন
প্রকৃতির ও মানুষের সহিত তাঁহার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল, যখন গর্ভবাসের
হইতে বিচ্যুত হইয়া ধরার ধূলার সহিত জীবনমরণের যুদ্ধ বাধিল,
খনই তিনি আবিষ্কার করিলেন যে, দ্বন্দ্ব শুধু মানুষে মানুষে বা মানুষে
প্রকৃতিতে নয়, এ দ্বন্দ্ব প্রকৃতির মধ্যেও বিরাজ করিতেছে। এই দ্বন্দ্বই
জীবনের রহস্য ও জীবনের লীলা। মানুষের সহিত প্রকৃতির এই গভীর
সাম্য দেখিয়া প্রকৃতির সহিত তাঁহার যে অজ্ঞাত প্রেমবন্ধন ছিল তাহা নব-
চেতনার জাগরণে নূতন বল লাভ করিল এবং সেই সঙ্গেই এই অনুভব
আসিল যে, প্রকৃতি ও মানুষ লইয়া একই সৃজনীশক্তির লীলা চলিয়াছে।
উভয়ের মধ্যে সখ্যের নিগূঢ় রহস্যটি যখন প্রকাশ হইল তখনই এই অনুভব আসিল
যে, প্রকৃতির লীলা মানুষের লীলার অনুরূপ। প্রকৃতির লীলাটি ঘুমন্ত, মানু-
ষের লীলাটি সচেতন। সেই সঙ্গেই এ অনুভবও আসিল যে, প্রকৃতি ও
মানুষের এই যে সাখিত্ব এই যে প্রেমবন্ধন ইহার তাৎপর্য এইখানেই যে, প্রকৃতিকে
লইয়াই মানুষের অনুভূতির আরম্ভ, গতি ও পর্যবসান এবং মানুষের মধ্যে আসিয়াই
প্রকৃতির সার্থকতা, মানুষের চেতনার মধ্যে আসিয়া প্রকৃতি তাহার নিজের
রাজ্যকে জাগ্রত করিয়া পাইয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মধ্যে এই
বৈষম্যটিও লক্ষিত হইল যে, প্রকৃতির মধ্যে যে সৃজনীশক্তি কাজ করিতেছে
তাহা একটা সীমাপদ্ধতির মধ্যে একটা প্রাপ্ত-স্বরূপকে পুনঃ পুনঃ আবর্তিত
করিতেছে। তাহার নূতনতার মধ্যে যথার্থ নূতনতা নাই। পুরাতনকে বরা-
বর ফিরিয়া পাওয়াতেই তাহার নূতনতা। কিন্তু মানুষের মধ্যে যে সৃজনী-
শক্তি কাজ করিতেছে তাহা অপ্রাপ্তকে, অনাগতকে, অপ্রত্যাশিতকে নিরন্তর
উৎপন্ন করিতেছে এবং সেইজন্যই সেই সৃষ্টি যথার্থ সৃষ্টি। প্রকৃতির মধ্য হইতেও
মানুষ যাহা পায় তাহাকে আপন সৃজনীশক্তির বলে নূতন করিয়া লয়। এই যে
আপনার মধ্য হইতে আপন ভাণ্ডারে যাহা নাই তাহাকে মানুষ উৎপন্ন করে, এই-
জন্যই মানুষ ভগবানের প্রতিরূপ। প্রকৃতি ভগবানের নিকট হইতে যাহা পাইয়াছে
তাহাই দান করে, কিন্তু ভগবান মানুষের মধ্যে জন্ম নিয়াছেন বলিয়া যাহা
পায় নাই তাহা সৃষ্টি করে। সৃজনীশক্তির ইহাই চরম সার্থকতা। সেই-
জন্যই মানুষে আসিয়া সৃষ্টির শেষ। এই আলোচনা হইতে দেখা যায় যে,

ইউরোপীয় দার্শনিকেরা যুক্তিবিচারের ক্রমধারায় যে তথ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, প্রেম ও অনুভূতির অন্তর্নিহিত অধীক্ষা দ্বারা রবীন্দ্রনাথও প্রায় সেই এক-জাতীয় তথ্যেই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই মতে এইখানেই আমাদের সংশয় আসে যে, যদি জীবনী-শক্তির চরম লক্ষ্যই হয় গতি, জানা হইতে অজানায় ক্রমাবরোহণ, তবে তাহার মধ্যে ভালমন্দ উচ্চনীচ প্রভৃতি শ্রেয়োবোধের অবকাশ কোথায়? তিনি বলাকায় অনেক স্থলে এই কথা বলিয়াছেন যে, আমাদের চলার আনন্দেই আমাদের চরম আনন্দ। আজ যেটা গন্তব্য, কাল সেটা গত; আজ যে স্থান আমাদের লক্ষ্য, কাল সেখানে দাঁড়াইয়া আমরা বলি এখানে নাই আরও আগে।

"অসংখ্য পাখীর সাথে
দিনেরাতে
এই বাসা-ছাড়া পাখী ধায় আলো-অন্ধকারে
কোন্ পার হ'তে কোন্ পারে!
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার
এ গানে—
"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য
কোনখানে!"

এই যে "অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে" এই যে অজানার রূপ, তাহার মধ্যে শ্রেয়োমূর্তির কোন রূপ দেখিতে পাই না। সৃজনীশক্তির তাপ দিয়াই মানুষ গঠিত। যাহা অনাগত তাহাই তাহার অপ্রাপ্ত, তাহাই তাহার অন্য কোনখান। সেই অন্য কোনখানে এবং অন্য কোনখান হইতে আরও অন্য কোনখানে মানুষ নিরন্তরই চলিতেছে। কেবলমাত্র অনাগতের অন্য কোনখানকে মানুষের আদর্শ বলিয়া মানা যায় না। সুন্দর, কুৎসিত, ভালমন্দ সমস্তই মানুষের সৃজনীশক্তির মধ্যে অন্য কোনখান রূপে তাহাকে আহ্বান করিতেছে। যে লোভী তাহারও লোভের শেষ নাই, যে গৃধ্র তাহার তৃষ্ণার কোন শেষ নাই। ইহাদের সকলের মধ্য দিয়াই একটা অজানার আকাঙ্ক্ষা ও আহ্বান প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আবার যে ত্যাগী, যোগী, ভক্ত, জ্ঞানী তাহারও মধ্যে আরও আরও আগে চল, "আগে কহ আর" ইহার

সন্ধান চলিয়াছে। পথ চলার আনন্দই যদি চরম আনন্দ হয়, তবে এই উভয় দিকের পথিকের মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষের কোনও বিচার করা চলে না।

রবীন্দ্রনাথের এই বড় জীবনব্যাপী অনুভবের মধ্যে, এই চলনশীল ধর্মের মধ্যে তিনি তাঁহার কাব্যে কিভাবে শ্রেয়োবোধের মর্যাদা পরিস্ফুট করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের প্রাচীনেরা বলিতেন, দুঃখবিমুক্তি আমাদের চরম সার্থকতা, আর সেই দুঃখবিমুক্তি আসে তৃষ্ণাক্ষয়ে ও কর্মক্ষয়ে। রবীন্দ্রনাথ বলেন দুঃখবিমুক্তিই চরম সার্থকতা, কিন্তু সে বিমুক্তি কোন্ এক সুনির্দিষ্টকালে নিষ্পাদ্য নহে। দুঃখ ও দুঃখ জয় উভয়ই আমার স্বভাব। এই উভয়ের মধ্যের সেতু আমাদের চরম ধর্ম, কিন্তু দুঃখ ও দুঃখবিমুক্তি বা চরম ধর্ম ইহার কোনটিই মানুষের পক্ষে চরম কথা নহে। মানুষের মধ্যে চরম কথা এই যে, তাহার শ্রেয়োবোধ তাহার প্রেয়োবোধের উপরে উঠিয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ শ্রেয়োবোধের দাবী মানেন না, এমন অসম্বদ্ধ প্রলাপবাক্য কেহ বলিতে পারে না, কিন্তু আমাদের এই আশঙ্কা হয় যে, তিনি কেবল কালগতিতে যাহা ক্রমবিসারী, সেই সরলরেখার প্রান্তভাগে যেন তাঁহার শ্রেয়োবুদ্ধিকে সন্নিবেশিত করিয়া দেখিয়াছেন এবং সেই জন্যই শ্রেয়োবুদ্ধির স্বতন্ত্র মর্যাদা দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। দার্শনিকের দিক হইতে তাঁহার মতের বিরুদ্ধে অনেক গুরুতর অভিযোগ আনিতে পারিতাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক বিচার করেন নাই, তত্ত্ববিচারের প্রণালীও অবলম্বন করেন নাই, সেইজন্য যুক্তিতর্কের অবতারণা করা নিষ্ফল। কিন্তু তাঁহার কাব্যানুভূতির মধ্যে শ্রেয়োবুদ্ধির যথার্থ মর্যাদা দেওয়া হয় নাই, এ অভিযোগটি আমরা কেবলমাত্র অনুভূতির দিক দিয়াও আনিতে পারে।

তাঁহার জীবনে শ্রেয় ও প্রেয়ের এমন একটা আশ্চর্য মিলন আছে, প্রকৃতির রসানুভবের মধ্যে আপনাকে অনুভব করার মধ্যে শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্বের দিকটি এমন একটি কৌশলে দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া যায় যে, কবি বোধ হয় এই বিষয়ে সচেতন হইবার অবসর পান নাই। কবি যখন বলেন—

"আজ প্রভাতের আকাশটি এই
শিশির-ছলছল
নদীর ধারের ঝাউগুলি ঐ
রৌদ্রে ঝলমল,

এমনি নিবিড় ক'রে
এরা দাঁড়ায় হৃদয় ভ'রে
তাইতো আমি জানি
বিপুল বিশ্বভুবনখানি
অকূল মানস-সাগর জলে
কমল টলমল।"

প্রকৃতির প্রীতিবন্ধনের মধ্যে দিয়া যখন বিশ্বের রস জীবনপাত্রে উছলিয়া উঠে তখন শ্রেয় ও প্রেয়ের ভেদ থাকে না, শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্বের কথা আমাদের লক্ষ্যের বাহিরে চলিয়া যায়। কিন্তু অজানার দিকে বিশ্বের চলনস্বভাবটা যেমন একটা গভীর সত্য, মানুষের মনের মধ্যে শ্রেয়োবোধের প্রকাশও তেমনি মনুষ্য জীবনের একই পরম মহিমময় সত্য। মানুষ যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছে তাহার মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিসই হইতেছে তাহার এই শ্রেয়োবোধ ; যে কোন ব্যাপক অনুভূতির মধ্যে মনুষ্যজীবনের এই পরম নূতন সৃষ্টির অনুভব আমরা দেখিতে প্রত্যাশা করি। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন যে, তাঁহার চলন শেষ হয় নাই, কাজেই তাঁহার ধর্মও তাহার পূর্ণতায় আসে নাই। সেইজন্য আমরা আশা করি যে, প্রকৃতি ও মনুষ্যজীবনের অনেকগুলি সারসত্য যেমন তাঁহার অনুভূতির মধ্যেই ধরা পড়িয়া রসোজ্জ্বল হইয়া জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিয়াছে, মনুষ্যজীবনের এই পরম সত্যটিও তেমনি তাঁহার আগামীস্তরের অনুভূতিতে হয়তো রসোজ্জ্বল হইয়া দেদীপ্যমান হইবে। মানুষের প্রাপ্তি শুধু জীবনীশক্তির ক্রিয়াব্যাপারে নয়, শুধু কল্পলোকের লোকোত্তর বিহারে নয়, শুধু অজানার সন্ধানে দুঃখঝঞ্ঝার উপর বিজয়কেতন উড্ডীন করাতে নয়, তাহার শ্রেয়োবোধকে তাহার জীবনবোধের মধ্যে সার্থক করিয়া তোলাতেই তাহার যথার্থ লোকোত্তরত্ব। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ যদিও আমাদিগকে তাঁহার অজস্রদানে গৌরবময় করিয়া তুলিয়াছেন, তথাপি তাহাতে যেন কিছু বাকী রহিয়া গিয়াছে। আমরা তাঁহার ধর্মকে উদ্দেশ্য করিয়া বলি,—

"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।"

কড়ি ও কোমল ও মানসীর যুগে কবির কাব্যজীবনের যে প্রাথমিক বিকাশ দেখা যায় তাহাতে কবি কেবলমাত্র ভোগের সম্পর্কে আসিয়া ভোগের মধ্যে

তলাইয়া যাইতে যাইতে যেন অনুভব করিলেন যে, শুধু ভোগের মধ্যে তলাইয়া যাওয়ায় নিজেকে পূর্ণ করা যায় না, ভোগের তলা হইতে কোনও এক অতল, কোনও এক ভোগাতীত যেন সঙ্কেত করে, 'এহ বাহ্য আগে কহ আর'। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবন কোনও theory বা মতকে অবলম্বন করিয়া যাত্রা করে নাই। সৌন্দর্যপিপাসু, ভোগপিপাসু চিত্ত তার আপন স্বাভাবিক গতিতে প্রকৃতি ও মানুষকে যে চক্ষুতে দেখিয়াছে তাহা লইয়াই তাঁহার কাব্যজীবনের আরম্ভ, সেই ভোগই তাঁহার কাব্যে ভোগাতীতকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের মধ্যযুগের অনেক কবিতা ও গানের মধ্য দিয়া শ্রেয়োবোধের যে এই অঙ্গুলিসঙ্কেত তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতির সহিত ও মানুষের সহিত যে শান্তিময় স্পন্দন তাঁহার কাব্যজীবনকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা যখন নানা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া একটি নবীন জাগরণে তাঁহার চিত্তকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিল, তাহারই একটি পূর্ণ পরিণতি আমরা বলাকার মধ্যে পাই। বলাকা রচিত হইবার প্রায় বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব হইতেই যে এই ভাবধারাটি তাঁহার চিত্তের মধ্যে গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহাও এই প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। যখন একথা বলা যায় যে, শ্রেয়োবোধের পরম সত্য ও পরম বাণীটি রবীন্দ্রনাথের কাব্যবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে নাই, তখন আমরা ইহাই বুঝি যে, যে জাগরণের মধ্যে, যে চলৎস্বরূপের মধ্যে, যে অজানার সন্ধানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য একটি অদ্ভুত বিশ্বজাগরণের মহিমায় জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারি সহিত তুল্য সামঞ্জস্যে সেই শ্রেয়োবোধের বাণীটি স্ফুট হইয়া উঠে নাই, সে অজানার স্বরূপকে আমাদের নিকট পূর্ণতর ভাবে পরিচিত করিয়া দেয় নাই। তবে এই সঙ্গে একথাও বলা আবশ্যক যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে বিশ্বজাগরণের কথা এই প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে, সেটি যে কেবল তত্ত্বান্বেষণ বা জীবনস্বরূপের একটি চলন্ত ছবি তাহা নহে, তাহার অজানা যে কেবল ধ্যানগম্য বা জ্ঞানগম্য তাহা নহে তাহা প্রেমগম্যও বটে। এই অজানাকেই তিনি অন্তর্যামীরূপে সাক্ষাৎ করিয়াছেন ও পরম প্রভু বলিয়া বারংবার ইঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিয়াছেন। ইঁহার সহিত বিরহে ও মিলনে তাঁহার সমস্ত কাব্য-শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে। শ্রেয়োবোধের যে আকর্ষণ মানুষের নিস্পন্দ জীবনকে সর্বদা উত্তেজিত করিতে থাকে—প্রেমের

আলিঙ্গনের নিবিড় বন্ধনে শ্রদ্ধাঞ্জলির পুষ্পসম্ভারের মধ্যে তাহাও যেন তন্দ্রা-লীন হইয়া পড়ে। সেইজন্য যেখানে প্রেমের আতিশয্য সেখানে শ্রেয়োবোধের আত্মমহিমা প্রকাশের আবশ্যকতা ন্যূন হইয়া আসে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জ্ঞান-জাগরণের মধ্যে সর্বদাই একটি প্রেমের জাগরণ অনুভব করেন। সেইজন্যই অনেক সময়ে শ্রেয়োবোধের উন্মেষ তাঁহার কাব্যের মধ্যে যথেষ্ট স্ফুট হইয়া উঠে নাই। দ্বৈতবোধ যেখানে প্রবল শ্রেয়োবোধের উন্মেষ সেইখানেই তাহার আপন শক্তিকে প্রকাশ করে। প্রেমের আলিঙ্গনে যেখানে দ্বৈতবোধ থামিয়া আসিতে থাকে, সেখানে শ্রেয় ও প্রেমের বিরোধ স্পষ্ট হইয়া উঠিতে চাহে না। সেখানে মানুষ বলে,—

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।"

কিংবা,

"হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।"

কিংবা,

"গায়ে আমার পুলক লাগে
চোখে ঘনায় ঘোর।
হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে রাঙা রাখীর ডোর।"

সেখানে শ্রেয়োবোধের দ্বন্দ্বের পদসঞ্চার মৃদু হইয়া আসে।*

* 'বলাকা'র ছন্দ সম্বন্ধে এস্থলে কিছু উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত মনে করি। ছন্দতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ প্রবোধ-চন্দ্র সেন তাঁহার 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' নিবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন,"··রবীন্দ্রনাথ প্রবহমান ছন্দে পঙ্‌ক্তিনির্দিষ্ট অক্ষরসংখ্যার গণ্ডী দৃঢ় হস্তে ভেঙে দিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের এই চরম মুক্তি ঘটেছিল 'সবুজপত্র' বা 'বলাকা'র যুগে; 'বলাকা'য় যে মুক্তছন্দের সন্ধান পাই তাতে কৃত্রিম বন্ধনের সম্পূর্ণ অবসান ঘটেছে।"—সম্পাদক

চতুরঙ্গ

সরসীলাল সরকার

'চতুরঙ্গ' কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের একটি অপূর্ব কথা-সাহিত্য। ইহার রচনা কিছু নূতন ধরনের,—গল্পের মধ্যে চারিটি প্রধান চরিত্র আছে, জ্যাঠা-মহাশয়, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস; এই চারিটি চরিত্র লইয়া চারিটি অধ্যায়ে পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই পুস্তক লেখার ভঙ্গি দেখিয়া বোঝা যায় বিভিন্ন চরিত্রে মনোবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্র কি ভাবে পরিস্ফুরিত হইতেছে।

এই পুস্তকের মধ্যে শচীশই সর্বপ্রধান চরিত্র। প্রথম অধ্যায়ে অর্থাৎ 'জ্যাঠামহাশায়'-এ শচীশের তরুণ-জীবনে মনের মধ্যে কিরূপ ঘাত-প্রতিঘাত হইয়াছিল, তাহারই ছবি আমাদের চোখের সম্মুখে ধরা হইয়াছে; পরে শচীশের জীবন যে পথে বিকশিত হইয়াছিল তাহার মধ্যেও তার এই প্রথম জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের ক্রিয়া প্রচ্ছন্নভাবে চলিয়াছে। আমাদের গভীরতম মনের মনোবৃত্তির ক্রিয়াগুলি এত প্রচ্ছন্নভাবে সম্পন্ন হয় যে সাধারণ দৃষ্টিতে তাহা ধরা যায় না। আমরা মানুষের জীবনের যে সমস্ত পরিবর্তন চোখের উপর সর্বদা দেখিতে পাই, তাহাতে এক এক ব্যক্তির জীবনের পরিবর্তন দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া যাই, কিন্তু তাহাদের জীবনের এই পরিবর্তনের মধ্যেও বাল্যকাল হইতে একটা যোগসূত্র থাকে।

শচীশের চরিত্রে ও তাহার জীবন-কাহিনীতে আশ্চর্য পরিবর্তন দেখানো হইয়াছে। শচীশকে যখন আমরা প্রথম দেখি, তখন তাহাকে নাস্তিক জ্যাঠামহাশয়ের একনিষ্ঠ চেলারূপে দেখি। জ্যাঠামহাশয়ই তাহার পিতা,

দ্রষ্টব্য: 'চতুরঙ্গ' 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র সপ্তম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ-যোগ্য এই গল্পোপন্যাসখানি প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্রে' ১৩২১ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়—'জ্যাঠামহাশয়,' 'শচীশ,' 'দামিনী' ও 'শ্রীবিলাস' নামক চারটি স্বতন্ত্র গল্পের আকারে। ১৩২৩ (ইং ১৯১৬) সালে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ সময়ে ইহা নানাভাবে সংস্কৃত হয় এবং একই যোগসূত্রে উপন্যাসের রূপ ধারণ করে। 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত ও প্রথম সংস্করণের বর্জিত অংশগুলি লইয়া ১৩৪১ সালে একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

শিক্ষক ও আদর্শ সবই একাধারে ছিলেন, এবং তাঁহার উপর তাহার যে শ্রদ্ধা তার কোনখানেই কোন ফাঁক ছিল না।

তাহার পর জ্যাঠামহাশয়ের মৃত্যুর পর সে কোথায় চলিয়া গেল, দুই বৎসর তাহার কোন ঠিকানা পাওয়া গেল না। কিছুদিন পরে শোনা গেল চাটগাঁয়ের কোন এক জায়গায় শচীশ লীলানন্দ স্বামীকে গুরুরূপে বরণ করিয়া তাঁহার সহিত কীর্তনে মাতিয়া করতাল বাজাইয়া পাড়া অস্থির করিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে।

অনেক দিন এইরূপ মাতামাতিতে কাটিল। তারপর একদিন জানা গেল আবার শচীশের মতের বদল হইয়াছে। একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে না মানিত জাত না মানিত ধর্ম; তারপর আর একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে খাওয়া-ছোঁওয়া স্নান তর্পণ যোগ যাগ কিছুই মানিতে বাকি রাখিল না; তারপর আর একদিন এই সমস্তই মানিয়া লওয়ার ঝুড়ি ঝুড়ি বোঝা ফেলিয়া দিয়া সে নীরবে শান্ত হইয়া বসিল, কি মানিল আর কি না মানিল তাহা বোঝা গেল না। কেবল ইহাই দেখা গেল যে, আগেকার মত সে আবার কাজে লাগিয়া গেছে, কিন্তু তার মধ্যে ঝগড়া বিবাদের ঝাঁজ কিছুই নাই।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সুবোধ সেনগুপ্ত লেখেন—

> …"চতুরঙ্গ রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গদ্য-কাব্য।…চতুরঙ্গের সত্যিকার অঙ্গ হইতেছে দুইটি—ইহার মধ্যে কেহ কেহ বুদ্ধি ও অনুভূতির উপর ভর করিয়াছে আর কেহ কেহ রসের সন্ধান করিয়াছে। রূপ ও রসের এই লুকোচুরিই এই কাব্যের প্রধান উপজীব্য।" —জয়ন্তী উৎসর্গ (ক্ষিতিমোহন সেনের সভাপতিত্বে রবীন্দ্র-পরিচয়-সভা কর্তৃক প্রকাশিত; ১১ই পৌষ, ১৩৩৮)।

বুদ্ধদেব বসু লিখিয়াছিলেন—

> …"চতুরঙ্গ সাধুভাষায় তাঁর শেষ বই। কিন্তু সে-সাধুভাষাই যেন সাধুভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ যেন জেদ ক'রে 'চতুরঙ্গে'র কথোপকথন পর্যন্ত সাধুভাষায় লিখেছিলেন (যা তিনি 'গোরা'য় করেন নি), শুধু এইটে দেখাতে যে সাধুভাষাও কতটা চলতি ভাষার মতো হতে পারে।"—কবি-প্রণাম, নলিনীকুমার ভদ্র কর্তৃক সম্পাদিত (সংকলন গ্রন্থ, বাণীচক্র-ভবন, শ্রীহট্ট; ১৩৪৮)।

সরসীলাল সরকারের এই রচনাটি প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা' ১৩৩৮-এর পৌষ-সংখ্যায়। উক্ত সালের আশ্বিন-সংখ্যা রবীন্দ্রজয়ন্তী-সংখ্যা হিসাবে কতকগুলি মূল্যবান রচনাসহ প্রকাশিত হয়।

শচীশের এইরূপ বিচিত্র মত-পরিবর্তনের হেতু সম্বন্ধে গ্রন্থকার স্পষ্টভাবে কিছুই বলেন নাই; তবুও গল্পটি এমনভাবে লেখা হইয়াছে যে গল্প পড়িতে গিয়া পাঠকের রসভঙ্গ হয় না, খাপছাড়া রকম কথা কিছু পড়িতেছি, গল্পে কোন অসামঞ্জস্য আছে এমন কথা পাঠকের মনে উদয় হয় না। একটা সরস অনুভূতির মধ্য দিয়া 'জিনিসটা বেশ ঠিকই হইতেছে' এই রকম ভাবই পাঠকের মনে আসে। অর্থাৎ এই গল্পের ভাবের সঙ্গে বিশ্বমানবের যে রসবোধ তাহার সহিত সংযোগ আছে, পাঠকের পরিতৃপ্তিতে তাহাই বুঝায়।

গল্পের শেষাশেষি শচীশ তাহার নিজের জীবনবিকাশের ঘাত-প্রতিঘাতে যে একটা নিজস্ব philosophy লাভ করিয়াছে সে সম্বন্ধে সে এইরূপ বলিয়াছে—

শচীশ বলিল, "আজ আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ কথাটার অর্থ কি। আর সব জিনিস পরের হাত হইতে লওয়া যায় কিন্তু ধর্ম যদি নিজের না হয় তবে তাহা মারে, বাঁচায় না। আমার ভগবান অন্যের হাতের মুষ্টিভিক্ষা নহেন, যদি তাঁকে পাই ত আমিই তাঁকে পাইব, নহিলে নিধনং শ্রেয়ঃ।"

আর একস্থানে শচীশ ভগবানের সম্বন্ধে বলিয়াছে—"তিনি রূপ ভালবাসেন, তাই কেবলি রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়।"

রূপের ভিতর দিয়া অরূপের উপলব্ধি এই যে একটা দার্শনিক তত্ত্ব, ইহা বঙ্গদেশে নানাভাবে প্রচলিত আছে। চণ্ডীদাসের কবিতায়, বাউল সম্প্রদায়ের সাধনরহস্যে এই তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দার্শনিক কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সকল রচনার মধ্যেই এই তত্ত্বটি বিশেষভাবে ফুটাইতে চাহিয়াছেন। নব মনোবিজ্ঞান, অবচেতন মনের ক্রিয়াই যাহার আলোচনার বিষয়,—সেই আলোচনায় দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছে যে রূপের মধ্যে এই অরূপের উপলব্ধি ইহা আমাদের গভীরতম মনের একটি স্বাভাবিক ক্রিয়া। এই গল্পটির মধ্যেও গভীর মনের এই ক্রিয়ার আভাস অনেক স্থলেই আছে।

'চতুরঙ্গ' পুস্তকখানি নানাভাবে আলোচনা করা যায়। আমরা কেবল মনস্তত্ত্বের দিক দিয়াই আমাদের আলোচনার সীমা নিবদ্ধ রাখিব। আলোচনার পূর্বে কবিবর mystic উপলব্ধি সম্বন্ধে যে পত্রখানি আমাকে লিখিয়াছিলেন তাহার কিছু উদ্ধৃত করিলাম—

"মিষ্টিক উপলব্ধি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলা চলে না। ইন্দ্রিয়-বোধের মতই সেটা অনির্বচনীয়। ব্যোমতরঙ্গকে চোখ কেন আলোকরূপে দেখে তা নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই—দেখে বলেই দেখে এইটিই হোল চরম কথা। চৈতন্যের নানা দিক আছে, এক আলো থেকেই নানা রঙের বোধ যেমন এও তেমনি। কেউ বা লাল রং দেখতে পায় না কেউ বা নীল, কেউ বা এটা বেশী দেখে কেউ বা ওটা। আমি আজকাল ছবি আঁকি, সেই ছবিতে বর্ণ সংঘটনের বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বের কারণ আমার চৈতন্যে রংয়ের বিশেষ ধারণার মধ্যে। আমি সব রংকে সমান ভাবে দেখি না, পক্ষপাত আছে, কেন আছে কে বলবে? গাছের পাতা কেন সবুজ রংকে প্রক্ষিপ্ত করে? গাছের ফুল কেন করে লালকে? মিষ্টিক উপলব্ধিও একরকম নয়, নিশ্চয়ই তার বৈচিত্র্য আছে। সে বৈচিত্র্য ঠিক বর্ণনা করা যায় না, কেননা সে তো চোখে দেখবার জিনিস নয়। কবিদের উপলব্ধিকে যদি মিষ্টিক বল তবে সেই উপলব্ধি প্রকাশের ভাষা তাঁদের আছে এইখানেই কবিত্ব। কবীর প্রভৃতি প্রাচীন সাধকেরা ভাষাবান ছিলেন। তবে সে ভাষা সম্পূর্ণ বুঝতে গেলে কিছু পরিমাণে তাঁদের মতো চিত্ত থাকা চাই। উপলব্ধি ও ভাষা এই দুই-এর যোগে জিনিয়াস্। ভাষা মানে কেবল শব্দের ভাষা নয়, সংকেতের ভাষা, যুক্তির ভাষা, রেখার ভাষা, কর্মের ভাষা, চরিত্রের ভাষা, এমন কত কি।"

কবিবর তাঁহার পত্রে বলিয়াছেন, মানব-জীবনে ইন্দ্রিয়বোধের ন্যায় মিষ্টিক উপলব্ধিও সকলের মধ্যেই আছে। ইন্দ্রিয়-বোধের ন্যায় ইহাও অনির্বচনীয়, কেবল কবিরাই এই উপলব্ধিকে রূপদান করিতে পারেন এবং ভাষার প্রকাশ করিতে পারেন। আমরা সেই মিষ্টিক উপলব্ধির দিক দিয়া এই গ্রন্থে বাণত চরিত্রসমূহের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারি।

কবিবর এই পত্রে যে মিষ্টিক উপলব্ধির উল্লেখ করিয়াছেন, এই পুস্তকে সেই উপলব্ধিকে ভাষাবান করিয়া তিনি চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত আঁকিয়াছেন। যেমন এই পুস্তকের প্রথমেই আছে, "শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক—তার চোখ জ্বলিতেছে। তার লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা; তার গায়ের রং যেন রং নহে, তাহা আভা। শচীশকে যখন



ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়



সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

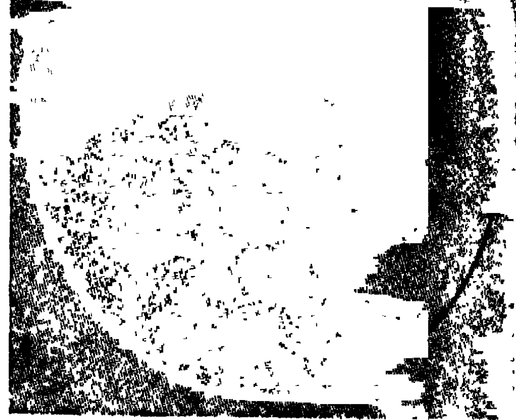


ইন্দুপ্রকাশ [illegible]



[illegible]





সতীশচন্দ্র রায়

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত





দেখিলাম অমনি যেন তাঁর অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাইলাম,—তাই এক মুহূর্তে তাহাকে ভালবাসিলাম।”

আবার অন্যত্র আছে, “এমনি করিয়া জ্যাঠামহাশয়ের ভিতর দিয়াই শচীশ আপনার যাহা কিছু পাইয়াছে, এবং তাঁর মধ্য দিয়াই সে আপনার যাহা কিছু দিয়াছে।”

এই পুস্তকে একটি গান আছে। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গানের ন্যায় এটিও একটি মিষ্টিক উপলব্ধি প্রকাশের চেষ্টা—

“পথে যেতে তোমার সাথে
মিলন হ'ল দিনের শেষে।
দেখতে গিয়ে, সাঁঝের আলো
মিলিয়ে গেল এক নিমেষে।...

দেখা তোমার হোক্ বা না হোক্
তাহার লাগি করব না শোক,
ক্ষণেক তুমি দাঁড়াও, তোমার
চরণ ঢাকি এলোকেশে।*

এই পুস্তকের প্রথম চরিত্র ‘জ্যাঠামহাশয়’ জগমোহন। ইঁহার চরিত্রে সর্বপ্রধান বিশেষত্ব যে ইনি নাস্তিক। এই নাস্তিকতা সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিয়াছেন :

---

* অর্থাৎ তোমার সঙ্গে আমার পূর্বপরিচয় ছিল এখন নয়, জীবনের পথে হঠাৎ তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল, আর সে সাক্ষাৎ যে হ'ল তাহাও দিনের শেষে—অর্থাৎ যখন জীবনযাত্রায় আমি নিজের মতে চলেই আমার জীবনটা এক রকম শেষ করেছি।

দেখতে গিয়ে সাঁঝের আলো
মিলিয়ে গেল এক নিমেষে।

দেখা যে হ'ল তাও স্পষ্ট দিবালোকে নয়—সন্ধ্যার আলোয় ; তাও এত শীঘ্র মিলিয়ে গেল যে ভালো করে দেখা হ'ল না। দিনের আলোয় নয় ;—অর্থাৎ সংসারিক ভাবের মধ্য দিয়ে নয়, যেন এক নূতন রহস্যময় অস্পষ্ট ভাবের মধ্য দিয়ে দেখা হ'ল। আর সে দেখাও এত ক্ষণিক যে, যে-আলোকে তোমাকে দেখেছিলাম তাও এক নিমেষেই মিলিয়ে গেল।

দেখা তোমার হোক বা না হোক
তাহার লাগি করব না শোক,

"তিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিতেন বলিলে কম বলা হয়—তিনি না-ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন। যুদ্ধজাহাজের কাপ্তেনের যেমন জাহাজ চালানোর চেয়ে জাহাজ ডোবানোই বড় ব্যবসা, তেমনি যেখানে সুবিধা সেখানেই আস্তিক্য ধর্মকে ডুবাইয়া দেওয়াই জগমোহনের ধর্ম ছিল।"

এই কথাগুলির দ্বারা বোঝা যায় জগমোহনের যে 'ধর্ম' একেবারেই ছিল না তাহা নয়। তাঁহার একটা নিজস্ব ধর্ম ছিল এবং সেটি খুব প্রবল ভাবেই ছিল। তিনি তাঁহার নিজের সেই ধর্মমতকে এরূপভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"ঈশ্বর যদি থাকেন তবে আমার বুদ্ধি তাঁরই দেওয়া;—সেই বুদ্ধি বলিতেছে যে ঈশ্বর নাই, অথচ তোমরা তাঁর মুখের উপর জবাব দিয়া বলিতেছ যে ঈশ্বর আছেন। এই পাপের শাস্তিস্বরূপ তেত্রিশ কোটী দেবতা তোমাদের দুই কান ধরিয়া জরিমানা আদায় করিতেছে।"

এখানে জগমোহন 'তোমরা' কথাটিতে তাঁহার ভাই হরিমোহনকে ও তাঁহার দলের লোককে বুঝাইতেছেন।

তাঁহার ভাই হরিমোহনের—(শচীশের পিতা) সম্বন্ধে গ্রন্থকার এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন—

"হরিমোহন শিশুকালে অসুস্থ ছিলেন। তাগাতাবিজ, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, সন্ন্যাসীর জটা-নিংড়ানো জল, বিশেষ বিশেষ পীঠস্থানের ধুলা, অনেক জাগ্রত ঠাকুরের প্রসাদ ও চরণামৃত, গুরু-পুরোহিতের অনেক টাকার আশীর্বাদ তাঁকে যেন সকল অকল্যাণ হইতে গড়বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল।...বিশেষতঃ তাঁর পিতার অল্প বয়সে মৃত্যুর নজীরের জোরে মা-মাসীর সেবাযত্ন তিনি নিজের দিকে টানিয়া লইলেন। কেবল মা-মাসীর নয়, তিনি যেন তিন

দিবালোকে তোমার দেখা পেলাম না সেজন্য আমার শোক করবার কিছু নেই, কেননা সেই নিমেষের দেখাতেই আমার জীবনের কর্তব্য নিরূপণ হয়ে গিয়েছে।

এখন— ক্ষণেক তুমি দাঁড়াও, তোমার
চরণ ঢাকি এলোকেশে।

তুমি এখন অন্ধকারেই একটু দাঁড়াও আমি আমার মাথার এলোকেশ দিয়ে তোমার চরণ ঢেকে দেব এতেই আমি পূর্ণকাম হব। অর্থাৎ আমার জীবনের যা কিছু সবচেয়ে সার্থকতা তাই দিয়ে তোমার পা ঢেকে দেব। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে মিষ্টিক অনুভূতির ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন তাও এইরূপ ভাবের দিক দিয়াই।

ভুবনের সমস্ত ঠাকুর দেবতার বিশেষ জিম্মায়, এ তিনি কখনও ভুলিতেন না। কেবল ঠাকুর দেবতা নয়, সংসারে যেখানে যার কাছে যে পরিমাণ সুবিধা পাওয়া যায় তাকে তিনি সেই পরিমাণই মানিয়া চলিতেন—থানার দারোগা, ধনী প্রতিবেশী, উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ, খবরের কাগজের সম্পাদক, সকলকেই যথোচিত ভয় ভক্তি করিতেন, গো-ব্রাহ্মণের তো কথাই নাই।"

এইরূপ ধর্মে আস্তিকতা কম-বেশী বহুস্থলেই দেখা যায় এবং জগমোহন তাঁহার ভাই-এর প্রকৃতিতে ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাই বাস্তবিক পক্ষে কিরূপ চরিত্রহীন নীচ স্বার্থপর ছিলেন এবং সেইটি ধর্মের আবরণে ঢাকিয়া কিরূপভাবে সাধু সাজিতেন এটিও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাহার ফলে তাঁহার মনের মধ্যে একটি প্রতিক্রিয়া হইল এবং বিদ্রোহী মনের গতি ঠিক উল্টো দিকে গেল। তাঁহার সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিয়াছেন—

"জগমোহনের ভয় ছিল ঠিক উল্টো দিকে। কারো কাছে তিনি লেশ-মাত্র সুবিধা প্রত্যাশা করেন এমন সন্দেহমাত্র পাছে কারো মনে আসে এই ভয়ে ক্ষমতাশালী লোকদিগকে তিনি দূরে রাখিয়া চলিতেন। তিনি যে দেবতা মানিতেন না তার মধ্যে তাঁর ঐ ভাবটা ছিল। লৌকিক বা অলৌকিক কোন শক্তির কাছে তিনি হাত জোড় করিতে নারাজ।"

এই থেকে আমরা বুঝিতে পারি যে জগমোহন তাহার ভাই হরিমোহনের আস্তিকতার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাহার জন্য তাঁহার মনের মধ্যে একটি প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়। ইহার ফলে তাঁহার নাস্তিকতা ঘটন হয়।

কবি-সম্রাট মিষ্টিক রহস্য সম্বন্ধে তাঁর পত্রে লিখিয়াছেন, পৃথিবীতে রং সম্বন্ধে লোকের পক্ষপাত থাকে, সকলে এক রঙের পক্ষপাতী হয় না; এ-স্থলে সেই রকমই ঘটিল। হরিমোহনের বড় ছেলে পুরন্দর তার পিতার রঙের পক্ষপাতী হইল। কিন্তু অন্য ছেলে শচীশ সে-রঙের ধার দিয়াও ঘেঁষিল না; সে তাহার উল্টা রং অর্থাৎ জ্যাঠামহাশয়ের রঙেরই একান্ত পক্ষপাতী হইল; অর্থাৎ পুরন্দর তাহার পিতার আদর্শ গ্রহণ করিয়া নাস্তিক হইয়া গেল।

তাহার পরের ঘটনা এই:—এই ধার্মিক পুরন্দর ননীবালা নামে একটি

পিতৃমাতৃহীনা বিধবা বালিকাকে তাহার মাতুলগৃহ হইতে ভুলাইয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল; কিন্তু কিছুদিন পরে আবার তাহাকে অপমানের এক-শেষ করিয়া নিজের আশ্রয় হইতে তাড়াইয়া দিল, মেয়েটি তখন সন্তান-সম্ভাবিতা। নাস্তিক শচীশ এই ঘটনা জানিতে পারিয়া মেয়েটিকে উদ্ধার করিয়া জ্যাঠামহাশয়ের আশ্রয়ে রাখিয়া দিল।

ইহার পর পুরন্দরের নানারূপ উৎপাত আরম্ভ হইল। ননীবালার দুশ্চরিত্র মামাতো ভাই পুরন্দরের বন্ধু ছিল। পুরন্দর তাহাকে অভিভাবক খাড়া করিয়া জ্যাঠামহাশয়ের নিকট হইতে ননীবালাকে কাড়িয়া আনিবার চেষ্টা করিল এবং সেই ভাই-এর মুখ দিয়া প্রমাণ করিতে চাহিল যে শচীশই ননীর পতনের কারণ।

তখন পর্যন্ত ননীর সঙ্গে শচীশের উদ্ধার করা ছাড়া আর দেখাশুনা হয় নাই। ননী শচীশ সম্বন্ধীয় অযথা অপবাদ শুনিয়া মনে মনে বলিতে লাগল, "ধরণী দ্বিধা হও।"

শচীশ তার জ্যাঠামহাশয়কে বলিল, "ননীকে এই সব উৎপাত থেকে বাঁচাবার একটি উপায় আছে, সেটা এই যে আমি ননীকে বিবাহ করিব।"

জগমোহন ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া মত দিলেন।

কিছুদিন পরে এই সব ব্যাপারের উপসংহার হইল ননীর আত্মহত্যায়। মৃত্যুর সময় তাহার হাতে একখানি চিঠি ছিল, তাহাতে লেখা ছিল,—"বাবা পারিলাম না, আমাকে মাপ কর। তোমার কথা ভাবিয়া এতদিন আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু তাঁকে আজও ভুলিতে পারি নাই।

তোমার শ্রীচরণে শতকোটী প্রণাম।

পাপিষ্ঠা ননীবালা।

নব্য মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে এই ঘটনার মধ্যে একটি অর্থ পাওয়া যায় যেটা আমাদের সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না।

বিবাহ সম্বন্ধে শচীশ তাহার পিতাকে বলিয়াছিল, "কুলের কলঙ্ক মুছিবার জন্যই আমার এই চেষ্টা নহিলে বিবাহ করিবার শখ আমার নাই।" এই কথার মধ্যে শচীশ বিবাহ সম্বন্ধে তাহার যে মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছিল, সেটি সত্য। কিন্তু তাহার মনের ভিতর এই ব্যাপার লইয়া যে ক্রিয়া চলিতেছিল তাহার সবটা সে প্রকাশ করিতে পারে নাই। কারণ তাহার

এই ক্রিয়ার কতকটা তাহার অবচেতন মনের মধ্যে ঘটিতেছিল যেটা তাহার চেতন মনে পৌঁছিতেছিল না, যদিও তাহার এই অজ্ঞাত অনুভূতি ভাবের মধ্যে দিয়া তাহাকে অভিভূত করিতেছিল।

শচীশের ননীবালাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাবের মধ্যে যে মহত্ত্বের ভাব আছে, তাহা আমরা কেবল যুক্তির দিক দিয়া বুঝিতে গেলে ধরিতে পারি না। মনোবিজ্ঞান-শাস্ত্রের গবেষণায় একটা কথা প্রমাণ করার চেষ্টা আছে, যে যখন কেহ কোন একটি পতিতা রমণীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করে, তখন তাহার মনের মধ্যে অনেক প্রকার ভাবের সমষ্টি থাকে। প্রথমতঃ, সে মনের মধ্যে স্বীকার করিয়া লয় যে এই রমণীটি তাহার স্খলনের জন্য নিজে দোষী নয়, সে অত্যাচারিতা, অতএব করুণার পাত্রী। দ্বিতীয়তঃ, তার উপর যে অত্যাচার করা হইয়াছে তাহার জন্য কাহারও শাস্তিভোগ করা দরকার; আর সেই শাস্তির ভাগ যে বিবাহ করিতেছে সে যেন নিজের ঘাড়ে লইতেছে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, আর একজনের অপরাধের শাস্তি সে নিজের স্কন্ধে লয় কেন? মনোবিজ্ঞান গবেষণার দ্বারা, এরূপ স্থলে একটা হেতু নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে, সেটি প্রণিধান করিয়া দেখিবার বিষয়। মনোবিজ্ঞানের মতে এরূপ স্থলে নারীর প্রতি পুরুষের এই অত্যাচার মনের গভীরতম স্তরে এইভাবে প্রতিফলিত হয় যে—"আমার বাবা আমার মার উপর অত্যাচার করিয়াছেন। আমার মা নিরীহ কিন্তু বিশেষভাবে অত্যাচারিতা।" মায়ের উপর বাবা দারুণ অত্যাচার করিয়াছেন এরূপ ভাব, কোন কারণে মনের মধ্যে পূর্ব হইতেই থাকে। যেখানে পতিতার সহিত বিবাহের প্রস্তাব আন্তরিকভাবে উপস্থিত হয়, মনোবিজ্ঞান বলে সেই স্থানে ঐ পতিতার মধ্যে প্রস্তাবকর্তার জননীর ভাবের একটা মিষ্টিক উপলব্ধি হয়। অত্যাচারিতা এরূপ স্থলে মায়ের প্রতীক, আর অত্যাচারকর্তা তাহার পিতা, পিতার সহিত সন্তানের যে সংযোগ, সেই সংযোগানুসারে সেও পিতার অত্যাচারের জন্য দায়ী এবং তদনুসারে তাহারও এই অন্যায়ের প্রতিকার করা উচিত, এরূপ উপলব্ধির ছাপও তাহার মনের গভীরতম প্রদেশে থাকে, কিন্তু এই উপলব্ধি বাহিরের দিক দিয়া সে নিজেও বুঝে না এবং অন্য লোকও বুঝে না।

এই কাহিনীতে শচীশের মায়ের উপর পিতার অত্যাচার সম্বন্ধে কোন

উল্লেখ নাই, কিন্তু তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পুরন্দর—যে পিতার প্রতীক—তাহার দ্বারা তাহার ভ্রাতৃজায়ার উপর অত্যাচার হইতেছিল এবং পিতা হরিমোহনও তাহার সমর্থক ছিলেন এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। সুতরাং মাতৃস্থানীয়ার প্রতি অত্যাচার হইতেছে এরূপ অনুভূতির হেতুর এখানে অভাব নাই।

শচীশ যে ভাবে 'কুলের কলঙ্ক' মুছিবার চেষ্টার কথা বলিয়াছিল তাহার ভাবার্থ এইরূপই হয়। আর কথাটা তাহার পিতাকে বলিয়াছিল, এই কুলের কলঙ্কের মধ্যে যাহার বিশেষ হাত আছে।

ননীবালার আত্মহত্যা ও চিঠির মধ্যেও শচীশের এই প্রস্তাবের একটা উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ননীবালা শচীশ সম্বন্ধীয় অপবাদ শুনিয়া যখন মনে মনে বলিয়াছিল 'ধরণী দ্বিধা হও', শচীশের উপর তাহার মনের ভিতর একটা যে বিশেষ শ্রদ্ধা আছে ইহা সেই কথাতেই বুঝা যায়। ননীবালাকে গ্রন্থকার এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, নিতান্ত কচিমুখ, অল্প বয়স, সে মুখে কলঙ্কের কোন চিহ্ন পড়ে নাই। ফুলের উপর ধুলা লাগিলেও যেমন তাহার আন্তরিক শুচিতা দূর হয় না, তেমনি শিরীষ ফুলের মত মেয়েটির ভিতরের লাবণ্যও ঘোচে নাই।

ননীবালা তাহার পত্রে লিখিয়াছিল, "বাবা পারিলাম না, তাঁহাকে যে আজিও ভুলিতে পারি নাই।" এই কথায় আমরা বুঝিতে পারি যে যদিও সে শিরীষ ফুলের মত পবিত্র ছিল কিন্তু উপরে যে ধুলা লাগিয়াছিল তাহা সে বুঝিয়াছিল এবং ভুলিতে পারিল না, সেইজন্য সে শচীশকে আত্মসমর্পণ করিতে পারিল না। তদপেক্ষা আত্মহত্যা করাই শ্রেয় মনে করিল। এই জন্যই সে চিঠিতে নিজের নামের পূর্বে 'পাপিষ্ঠা' এই কথা লিখিয়াছিল।

শচীশ যখন বিবাহের প্রস্তাব করে তখন তাহার মনের মধ্যে মায়ের যে মিষ্টিক অনুভূতি জাগ্রত হইয়াছিল, ননীবালার পরের ব্যবহারে অর্থাৎ তাহার সেই পত্রে ও আত্মহত্যায় সে শচীশের মনের অবচেতনে সেই 'মাই' রহিয়া গেল। ননীবালার সেই আত্মত্যাগ শচীশের মনের মধ্যে যে একটা ভাব দাগিয়া রাখিয়া গেল তাহা শচীশের ডায়েরীর একস্থানে এইরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ আছে—

"ননীবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি—অপবিত্রের

কলঙ্ক যে নারী আপনাতে গ্রহণ করিয়াছে, পাপিষ্ঠের জন্য যে নারী জীবন দিয়া ফেলিল, যে নারী মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর করিল।”

নারী সম্বন্ধে এইরূপ মিষ্টিক উপলব্ধি নারীর জননীরূপ লইয়াই সম্ভব। যাহাকে পৃথিবীতে দাম্পত্য প্রেম বলা হয়, এই মনোভাব তাহা হইতে বিভিন্ন প্রকারের, অর্থাৎ মনটি তখন দাম্পত্য প্রেমের স্তর,—যাহাতে দেহের আকর্ষণ থাকে ভোগের ইচ্ছা থাকে তাহা হইতে যেন একটি উচ্চস্তরে উঠিয়া গিয়াছে দাম্পত্য প্রেম উপলব্ধি করিতে হইলে মনকে এই অবস্থা হইতে টানিয়া নামাইতে হয়। যাহাদের জীবনের মধ্যে একবার মায়ের এই মিষ্টিক উপলব্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহারা পরে আর দাম্পত্য প্রেমের জীবন অবলম্বন করিতে পারে না। শচীশের জীবনের পরের ঘটনায় দেখা যায় যে শচীশের বেলাও তাহাই ঘটিয়াছিল।

পূর্বে আমরা জ্যাঠামহাশয়ের নাস্তিকতা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, জ্যাঠামহাশয়ের নাস্তিকতা তাঁহার ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত ছিল না। এইটির ভিত্তি ছিল নিছক একটা বিদ্রোহের ভাব। এই বিদ্রোহের ভাবটি শচীশ আহরণ করিয়াছিল। আবার এই বিদ্রোহের ভাবটি শচীশ এক দিক দিয়া জ্যাঠামহাশয়ের উপরই প্রয়োগ করিয়াছিল। ব্যাপারটি এইরূপে ঘটিয়াছিল।

এই 'বিদ্রোহকে' পূর্ণ সজাগ রাখিবার জন্য জ্যাঠামহাশয় কোন অস্তিভাব মনের মধ্যে আসিতে দেন নাই। জ্যাঠামহাশয়ের নীতি ছিল 'প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখ সাধন।' তিনি সর্বদা এই নীতি মানিয়া চলিতেন। শচীশকে যখন তিনি স্বেচ্ছায় বিদায় দিলেন, তখন তিনি দরজা বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে মেঝের উপর শুইয়া পড়িলেন।

গল্পের কথক শ্রীবিলাস এখানে বলিতেছেন, “হায় রে প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখ সাধন! মানুষের সম্বন্ধে বিজ্ঞানের পরিমাপ যে খাটে না। মাথা গণনায় যে মানুষটি কেবল এক হৃদয়ের মধ্যে সে যে সকল গণনার অতীত। শচীশকে কি এক দুই তিনের কোঠায় ফেলা যায়? সে যে জগমোহনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সমস্ত জগৎকে অসীমতায় ছাইয়া ফেলিল।”

জগমোহন 'আস্তিক্য'কে এড়াইতে গিয়া এইভাবে সেই সকল অনুভূতিকে নিরোধ করিতে চেষ্টা করিতেন যেগুলি মানব-ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ। কিন্তু

এই নিরোধের চেষ্টা সকল সময়ে সফল হইত না, কখনও কখনও এই ভাবের অনুভূতি তাঁহার নাস্তিকতাকে অতিক্রম করিয়া যাইত। যেমন—

ননী তাঁর হাত ধরিয়া বলিল—"বাবা তুমি আজ আমাকে আশীর্বাদ কর।"

"মা, আমি স্পষ্টই দেখিতেছি, বুড়া বয়সে তুমি এই নাস্তিককে আস্তিক করিয়া তুলিবে। আমি আশীর্বাদে শিকি-পয়সা বিশ্বাস করি না, কিন্তু তোমার ঐ মুখখানি দেখিলে আমার আশীর্বাদ করিতে ইচ্ছা করে।"

জ্যাঠামহাশয়ের মৃত্যুবিবরণ বলিতে গিয়া বক্তা বলিতেছেন, শচীশ তার জ্যাঠামহাশয়কে প্রণাম করে নাই, মৃত্যুর পর আজ প্রথম ও শেষ বারের মত তাঁহার পায়ের ধুলা লইল।"

ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে জ্যাঠামহাশয়ের এইরূপ বিদ্রোহ শচীশকে পীড়া দিত। জ্যাঠামহাশয়ের মৃত্যুর পর—

"অসহ্য যন্ত্রণার দায়ে শচীশ কেবল বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, শূন্য এত শূন্য কখনই হইতে পারে না। সত্য নাই এমন ভয়ংকর ফাঁকা কোথায়ও নাই। একভাবে যাহা 'না' আর একভাবে তাহা যদি 'হ্যাঁ' না হয়, তবে সেই ছিদ্র দিয়া সমস্ত জগৎ যে গলিয়া ফুরাইয়া যাইবে।"

এই জন্য বিদ্রোহের ভাব লইয়া জ্যাঠামহাশয়ের মৃত্যুর পর সে এমন একটি লোককে গুরুরূপে বরণ করিল যিনি জ্যাঠামহাশয়ের ঠিক উল্টা প্রকৃতির এবং সেই উল্টা প্রকৃতির গুরুবরণে যেন সে জ্যাঠামহাশয়ের শিক্ষাই মানিয়া চলিল, কেননা জ্যাঠামহাশয়ও উল্টা পথে কি চলেন নাই?

জ্যাঠামহাশয়ের অভাবে শচীশের মনে একটি 'সত্যবস্তু' অর্থাৎ positive জিনিসের অভাবের অনুভূতি হইতেছিল, এবং সেইজন্য তাহার মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল।

রাত্রে শচীশকে নিরালা পাইয়া শ্রীবিলাস শচীশকে জিজ্ঞাসা করিল—

"শচীশ, জন্মকাল হইতে তুমি মুক্তির মধ্যে মানুষ, আজ তুমি এ কি বন্ধনে নিজেকে জড়াইলে? জ্যাঠামহাশয়ের মৃত্যু কি এত বড় মৃত্যু?"

শচীশ বলিল,—"জ্যাঠামহাশয় যখন বাঁচিয়া ছিলেন, তখন তিনি আমাকে জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়াছিলেন, ছোট ছেলে যেমন মুক্তি পায় খেলার আঙিনায়; জ্যাঠামহাশয়ের মৃত্যুর পর তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন রসের সমুদ্রে, ছোট ছেলে যেমন মুক্তি পায় মায়ের কোলে।"

শচীশের এই উক্তিতে এই অনুমান হয় যে সে মায়ের কোলে ছোট ছেলের মতন মুক্তি পাইবার ইচ্ছায় লীলানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। আমরা যুক্তিতর্কদ্বারা এই ইচ্ছার কোনও সার্থকতা বা কারণ বুঝিতে পারি না। শচীশও কোন যুক্তিতর্কের দিক দিয়া একথা বলে নাই। গল্পের বক্তা শ্রীবিলাস বলিতেছেন, "বুঝিলাম শচীশ এমন একটা জগতে আছে আমি যেখানে একেবারেই নাই।" অর্থাৎ সে বাস্তব জগতে নাই সে একটা আই-ডিয়ার জগতে আছে।

শ্রীবিলাস বলিতেছেন, "এই ধরনের আইডিয়া জিনিসটা মদের মত— নেশার বিহ্বলতায় মাতাল যাকে-তাকে বুকে ধরিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে পারে, তখন আমিই কি আর অন্যই কি!"

এই সমস্ত কথায় বোঝা যায় শচীশ লীলানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব লইয়াছিল একটা আইডিয়ার ঝোঁকে—সে আইডিয়া এই যে, "আমি মায়ের কোলের রসাস্বাদনের মুক্তি চাই।" আর এই আইডিয়ার আবেগেই সে লীলানন্দ স্বামীর তামাক সাজা ও পা টেপা হইতে আরম্ভ করিয়া জপতপ কীর্তন নৃত্য প্রভৃতি সমস্তই করিত। মনের ভিতর এরূপ ভাবের আবির্ভাব অব-চেতন মনের ক্রিয়ারই ফল, মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান এইরূপ নির্ধারণ করিয়াছে। অবচেতন মনের ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন এই ভাবের শক্তি অতি প্রবল, তাহা সজ্ঞান মনের বিচার বুদ্ধি যুক্তি প্রভৃতিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। রবীন্দ্রনাথের কথায় ইহা একটা মিষ্টিক উপলব্ধি।

ভক্ত-জীবনের অনুভূতির মধ্যে ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন বোলপুরের প্রসিদ্ধ উকিল হরিদাস বসু বিখ্যাত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন। যতদূর স্মরণ হয় তিনি তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, যেদিন তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথের প্রসাদ ভক্ষণ করিয়াছিলেন সেদিন সারারাত্রি ধরিয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে রাধাকৃষ্ণের মূর্তির আবির্ভাব হইল। এই দুই মূর্তি মিলিয়া গিয়া এক মূর্তি হইল আবার পৃথক হইয়া গিয়া দুই মূর্তি হইল। এইরূপ সারা রাত্রি চলিল। এই জগন্নাথের প্রসাদের মধ্য দিয়া শ্রীরাধার প্রতীকের দ্বারা তাঁহার মায়ের একটা মিষ্টিক উপলব্ধি হইয়াছিল। এরূপ স্থলে লীলানন্দ স্বামীর কীর্তনের মধ্যে মায়ের মিষ্টিক উপলব্ধির আশা করা বিশেষ একটা অসম্ভব ব্যাপার নহে। দেশ-প্রেমিকেরা দেশের জন্য

সর্বস্ব বিসর্জন দিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে কেহ কেহ দেশকে father-land বা পিতৃভূমি বলিয়া মনে করেন আবার কেহ কেহ দেশকে দেশ-মাতা বা motherland বলিয়া উপলব্ধি করেন। হৃদয়ের অন্তরস্থ ভাব লইয়া দেশকে পিতা বা মাতা বা একসঙ্গে উভয়ভাবে গ্রহণ করা যায়।

এই বাহিরের রূপের জগতের ঘাতপ্রতিঘাতেই এই অরূপভাব সৃষ্টি হয়—যাহা নিজেকে নানা রূপের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে। এই মিষ্টিক উপলব্ধিরও ক্রমবিকাশ আছে। জীবনের মধ্যে আবার একটা নূতন মিষ্টিক উপলব্ধি আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে—যাহা পূর্বের উপলব্ধিতে নিজের রং মিশাইয়া তাহাকে আবার এক অভিনব রঙে রঞ্জিত করিতে পারে। শচীশের বেলায় এইরূপই হইয়াছিল।

শচীশের 'মায়ের কোলে মুক্তি'র ইচ্ছা ননীবালার ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া উদয় হইয়াছিল একথা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। সম্ভবতঃ এই নূতন ইচ্ছার অনুভূতির সহিত একটা বেদনার অনুভূতিও ছিল, রসাস্বাদনের আনন্দে সেই বেদনাদাহকে সে শীতল করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহার বাস্তবিক অভিজ্ঞতা অন্যরূপ হইল।

একদিন শচীশ কল্পনার খোলা ভাঁটিতে পূর্ব ও পশ্চিমের, অতীতের ও বর্তমানের সমস্ত দর্শন ও বিজ্ঞান, রস ও তত্ত্ব একত্র মিশাইয়া একটা অপূর্ব আরক বানাইতেছিল, এমন সময় যে ঘটনা তাহার মনে সর্বাপেক্ষা অধিক আঘাত করিয়াছিল—অর্থাৎ ননীবালার আত্মহত্যা—সেইরূপ একটি আত্মহত্যা লীলানন্দের ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে দেখিতে পাইল। নবীনের স্ত্রী স্বামীপ্রেমে বঞ্চিতা হইয়া, নিজেই তাহার স্বামীর প্রেমিকার সঙ্গে বিবাহ দিয়া বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিল। গুরুজীর কাছে অনেক শিষ্য জুটিল, তাহারা তাঁকে কীর্তন শুনাইতে লাগিল—তিনি কীর্তনে যোগ দিয়া নাচিতে লাগিলেন।

এই সময়ে দামিনী নামক লীলানন্দের এক শিষ্যপত্নী শচীশের মনের মিষ্টিক রাজ্যের মধ্যে একরূপ উপলব্ধির প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল যাহা কবিসম্রাট অতি নিপুণভাবে তুলিকায় আঁকিয়াছেন। দামিনীর মনে শচীশের প্রতি প্রথমে একটা দাম্পত্য প্রেমের ভাব ছিল, কিন্তু শচীশের মনে সে ভাবের উপর একটা বিতৃষ্ণা ছিল। সেই বিতৃষ্ণা কবিসম্রাট শচীশের গুহার মধ্যের একটা স্বপ্নময় অনুভূতির ভিতর দিয়া এমন পরিস্ফুটভাবে আমাদের

সম্মুখে ধরিয়াছেন যে, আমরা মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়া এরূপ অবস্থায় যেরূপ স্বপ্ন সম্ভব তাহার সহিত আশ্চর্য মিল দেখিতে পাই। এই ঘটনা লইয়া দামিনী ও শচীশের যে পরস্পরের মনোভাবের পরিবর্তন দেখানো হইয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথের কথায় মিষ্টিক উপলব্ধির মধ্যে নূতন রং-এর অনুভূতি হইল, এরূপ বলা যাইতে পারে। আবার মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়া মনোভাবের sublimation হইল তাহাও বলা যাইতে পারে। পুস্তকে এইরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

দামিনী শচীশকে কহিল, আমি তোমার গুরুর কাছ হইতে কিছুই পাই নাই। তিনি আমার উতলা মনকে এক মুহূর্ত শান্ত করিতে পারেন নাই। আগুন দিয়া আগুন নেবানো যায় না। তোমার গুরু যে পথে সবাইকে চালাইতেছেন সে পথে ধৈর্য নাই, বীর্য নাই, শান্তি নাই। ঐ যে মেয়েটা মরিল, রসের পথে রসের রাক্ষসীই তো তার বুকের রক্ত খাইয়া তাকে মারিল। কি তার কুৎসিত চেহারা সে তো দেখিলে? প্রভু, জোড় হাত করিয়া বলি ঐ রাক্ষসীর কাছে আমাকে বলি দিও না। আমাকে বাঁচাও। যদি কেউ আমাকে বাঁচাইতে পারে তো সে তুমি।

শচীশ বলিল, বল আমি তোমার কি করিতে পারি?

দামিনী বলিল, তুমি আমার গুরু হও। আমি আর কাহাকেও মানিব না। তুমি আমাকে এমন কিছু মন্ত্র দাও যা এ সমস্তের চেয়ে অনেক উপরের জিনিস—যাহাতে আমি বাঁচিয়া যাইতে পারি। আমার দেবতাকেও তুমি আমার সঙ্গে মজাইয়ো না।

শচীশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তাই হইবে।

দামিনী শচীশের পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল। গুনগুন করিয়া বলিতে লাগিল, তুমি আমার গুরু, তুমি আমার গুরু, আমাকে সকল অপরাধ হইতে বাঁচাও, বাঁচাও।

এইরূপে দু'জনের মধ্যে পিতা ও কন্যা বা গুরু-শিষ্যার সম্বন্ধ স্থাপিত হইল।

শচীশ যে 'ছোট ছেলের মায়ের কোলে মুক্তি' চাহিয়াছিল তাহার জন্য আর লীলানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব করিতে হইল না, দামিনীর স্নেহ ও সেবাযত্নের মধ্যে তাহা পরিস্ফুরিত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ যে মিষ্টিক উপলব্ধির কথা বলিয়াছেন, এই গল্পের মধ্য দিয়া সেই মিষ্টিক উপলব্ধির স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করাই আমাদের এই আলোচনার উদ্দেশ্য। শচীশ যে বলিয়াছে—"স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ" এই কথার সত্যতাও আমরা মিষ্টিক উপলব্ধির দিক দিয়া বুঝিতে পারি। কারণ যথার্থ ধর্মবোধের বিকাশ মিষ্টিক উপলব্ধির দ্বারাই হয়। প্রত্যেকেই নিজের মিষ্টিক উপলব্ধির দ্বারাই নিজের ধর্ম সৃজন করে এবং নিজের মধ্যে তাহা অনুভব করে। সেইজন্যই আর সব জিনিস পরের হাত হইতে দান-স্বরূপ লওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম কখনও লওয়া যায় না।

আর শচীশ বলিয়াছে—"আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়," এ কথাটির অর্থও মিষ্টিক উপলব্ধির দিক দিয়া আমরা বুঝিতে পারি। কারণ ভগবান তাঁর সৃষ্টির ভিতর দিয়া হয়তো তাঁর নিজের মিষ্টিক উপলব্ধিটাই প্রকাশ করিতেছেন। আমাদের দিক হইতে সেই সৃষ্টির রূপের মধ্যে যতটা অরূপ মিষ্টিক উপলব্ধি অনুভূতিতে ধরিতে পারি, ততটাই বিকাশের পথে অগ্রসর হই। এই গল্পের অনেকগুলি চরিত্রের দৃষ্টান্ত হইতেই আমরা একথা বুঝাইতে পারি। যেমন হরিমোহন ও তাহার ছেলে পুরন্দরের একেবারেই মিষ্টিক উপলব্ধি হয় নাই—তাহারা মনুষ্যাকারে পশুই রহিয়া গিয়াছে। শচীশের জ্যাঠামহাশয় এই পশুত্বের কদর্যতা সম্বন্ধে একটা তীব্র অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহা একান্তভাবে পরিহার করিবার মনোভাবের দিক দিয়া নিজের জীবনের বিকাশ করিয়াছিলেন। সাধারণভাবে এইরূপ মনে হইলেও তাঁর নাস্তিকতার মধ্যে নিশ্চয়ই বিশ্বপ্রেম বা মানব-প্রেম অথবা ঐ ভাবেরই কোনও 'অস্তি' বস্তু ছিল, তাঁহার অত্যুগ্র অহংকার সেই 'অস্তি'কে আবৃত করিয়া রাখিতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকিত।

শ্রীবিলাস ও দামিনী, শচীশের মধ্যে একটা অপার্থিবতা উপলব্ধি করিয়া সেই উপলব্ধির সহায়ে নিজ নিজ জীবন বিকাশ করিয়াছিল।

শচীশের মিষ্টিক উপলব্ধির ভিন্ন ভিন্ন স্তর গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, এবং তাহার চরিত্র গঠনের ভঙ্গীতে মনে হয় যে নিষ্কাম কর্মী ও ইন্দ্রিয়জয়ী শচীশ এখনও নব উপলব্ধির পথে চলিয়া নূতনভাবে নিজেকে গড়িয়া লইতে পারে গ্রন্থকার তাহার সম্বন্ধে এই অসমাপ্তির ইঙ্গিতটি রাখিয়া দিয়াছেন।

নব মনস্তত্বে Super-ego-র কথা বলা হইয়াছে; এই Super-ego-র

formation অর্থাৎ কিভাবে ইহা গঠিত হয় বলিতে গিয়া একভাবে রবীন্দ্রনাথ মিষ্টিক উপলব্ধির কথা যাহা বলিয়াছেন তাহাই বলা হইয়াছে।

ডাঃ ফ্রয়েড তাঁহার মনস্তত্ত্বের গবেষণায় স্থির করিয়াছেন যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে অহং-বোধ থাকে তাহার এক অংশ ব্যক্তিগত বিকাশের সঙ্গে যেন পরিবর্তিত হইয়া Super-ego বা শ্রেষ্ঠ অহং স্বরূপ পৃথক সত্তা লাভ করে। আমরা যাহাকে বিবেক বলি তাহা ইহারই ক্রিয়া। এই শ্রেষ্ঠ অহং যেন অহং-এর রক্ষকস্বরূপ; যেমন পিতামাতা সন্তানের রক্ষক। এই শ্রেষ্ঠ অহং, অহং-এর প্রত্যেক কার্যের ও উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি রাখে, প্রয়োজন হইলে অহং-এর উদ্দেশ্য প্রকাশ হইতে দেয় না। আমরা যে দোষ করিয়াছি এই ভাব, অন্যায়ের জন্য অনুতাপ অর্থাৎ বিবেকলব্ধ শাস্তি ইহা হইতেই উৎপন্ন হয়। নিম্নে ডাঃ ফ্রয়েডের কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল—

"The Super-ego is an agency or institution in the mind whose existence we have inferred ; consceince is a function we ascribe among others to the Super-ego ; it consists in watching over and judging the actions and intentions of the ego, exerciseing the function of a censor. The sense of guilt, the severity of Super-ego is therefore the same thing as the rigour of conscience."

(Civilization and its Discontents, p. 127)

ইহার পর ডাঃ ফ্রয়েড আরও একটি আশ্চর্য নূতন কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শ্রেষ্ঠ অহং যেমন ব্যক্তির মধ্যে বিকশিত হয়, সেইরূপ ব্যক্তি-সমষ্টি সমাজের মধ্যেও বিকশিত হয়, তাহারই প্রভাবে সমাজে কৃষ্টির (culture) বিকাশ হইতে থাকে।

ফ্রয়েডের মতে সমাজে শ্রেষ্ঠ অহং-এর বিকাশ এইভাবে হয়;—সমাজের মধ্যে বিশেষভাবে ব্যক্তিত্বের শক্তি লইয়া অনেকে জন্মগ্রহণ করেন, কিংবা এমন কোনও অসাধারণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন যাঁহার মধ্যে কোনও গুণ অসাধারণ প্রবল ও পবিত্রভাবে প্রকাশ পায়। অনেক স্থলে (অবশ্য সকল স্থলে নহে) এই সমস্ত অসাধারণ ব্যক্তি জনসাধারণের নিকট বিদ্রূপ অথবা মন্দ ব্যবহার পান, কোনও কোনও স্থানে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। কিন্তু নিহত হইলেও এই সমস্ত মহান্ পুরুষগণ পৃথিবীর জন্য যে ভাবরাশি

রাখিয়া যান তাহাই সমাজের পক্ষে শ্রেষ্ঠ অহং-এর কাজ করে। তাঁহারা জগতের সম্মুখে যে আদর্শ স্থাপন করিয়া যান তাহা পালন না করিলে মনের মধ্যে বিবেকের তাড়নার ন্যায় একটা গ্লানির দাহ অনুভব হয়। নিম্নে ডাঃ ফ্রয়েডের কথা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল—

"It can be maintained that the community, too, developes a Super-ego, under whose influence cultural evolution proceeds.

* * *

The Super-ego of any given epoch of civilization originates in the same way as that of an individual ; it is based on the impression left behind them by great leading personalities, men of astounding force of mind or men in whom some one human tendency has developed in unusual strength and purity, and often for that reason very disproportionately. In many instances analogy goes still further in that during their lives—often enough even if not always such persons are ridiculed by others, ill used or even cruelly done to death."

ডাঃ ফ্রয়েড যাহা বলিয়াছেন সেগুলি ঘটে কিরূপ করিয়া তাহা বুঝিতে হইলে রবীন্দ্রনাথ যেমন বলিয়াছেন সেইরূপ মিষ্টিক উপলব্ধির মতন কিছু একটা ধরিয়া লইতে হয়।

আমাদের জীবনের যাহা যথার্থ বিকাশ তাহা এই মিষ্টিক উপলব্ধির ভিতর দিয়া। যথার্থ আর্ট এই মিষ্টিক উপলব্ধিকে যথাযথ প্রকাশ করে। আমরা এইরূপ আর্টের সন্ধান রবীন্দ্রনাথের পুস্তকের মধ্যে পাইয়া থাকি।

যোগাযোগ

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এই উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকাটি না জানলে এর মধ্যে যে সব সমস্যা উপস্থিত করা হয়েছে এবং সেগুলি মীমাংসার দিকে কতখানি অগ্রসর হয়েছে তা বোঝা যাবে না। তাই আমরা সংক্ষেপে গল্পের প্লটটি বলতে বলতে প্রসঙ্গত সমস্যা মীমাংসা ও চরিত্রগুলির বিশেষত্ব আলোচনা করে যাব। আমার এই আলোচনা আলোচনা নয়, কবিগুরুর অসংখ্য শ্রদ্ধান্বিত পাঠকের মধ্যে একজনের মনে এই উপন্যাসখানি কেমন লেগেছে তারই পরিচয় 'প্রবাসী'র পাঠকপাঠিকাদের সম্মুখে এনে উপস্থিত করছি। তাঁরা অনেকেই এই বই পড়েছেন। কারণ এ বই ছাপা হয়েছে ১৩৩৬ সালের আষাঢ় মাসে, তারপর সুদীর্ঘ আড়াই বৎসর অতীত হয়ে গেছে। যাঁরা পড়েছেন তাঁদের মনে এর এক রকম ছাপ পড়েছে, তাঁরা মিলিয়ে দেখতে পারবেন যে, একই বই ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনে কি রকম ভিন্ন ভিন্ন ছাপ ফেলে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বলেছেন—"কাব্যের একটা প্রধান গুণ এই যে, কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজনশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়, তখন স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য, কেহ বা নীতি,. কেহ বা তত্ত্ব, সৃজন করিতে থাকেন। এ যে আতস-বাজিতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া—কাব্য সেই অগ্নিশিখা,—পাঠকের মন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আতসবাজি।" (পঞ্চভূত কাব্যের তাৎপর্য)। আর যাঁরা এ বই এখনও পড়েন নি, তাঁরা আমার আলোচনা পড়ে যদি বইখানি পড়তে অগ্রহান্বিত হন তাহলে তাতেও আমার শ্রম সফল হবে।

দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসটি প্রথম 'তিন পুরুষ' নামে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৩৩৪ সালের আশ্বিন হইতে ১৩৩৫-এর চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রথম দুই সংখ্যার পর কবি ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া 'যোগাযোগ' রাখেন। এই 'নামান্তর'-উপলক্ষে লেখকের একটি কৈফিয়তও প্রকাশিত হয়। ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ (ইং ১৯২৯) সালের আষাঢ় মাসে। গ্রন্থের প্রারম্ভে 'নামান্তর'টিও মুদ্রিত হইয়াছিল। অনেকের ধারণা উক্ত সময় জলধর সেনের 'তিন-পুরুষ' নামে একখানি উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার জন্যই সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উপন্যাসের নাম পরিবর্তন করিয়াছিলেন।

এক গ্রামে দুই জমিদারের বাস ছিল, ঘোষাল-বংশ আর চাটুজ্যে-বংশ। উভয় বংশে রেষারেষি ছিল নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা নিয়ে। "ঘোষালেরা স্পর্ধা করে চাটুজ্যেদের চেয়ে দু-হাত উঁচু প্রতিমা গড়িয়েছিল।" চাটুজ্জেরা রাতারাতি বিসর্জনের রাস্তা জুড়ে তুললে এক তোরণ, তাতে ঘোষালদের প্রতিমার মাথা গলে না। তার ফলে দু-পক্ষের অনেক লোকের মাথা ভাঙল। কাজেই মামলা মকদ্দমা থেকে উভয় পক্ষই জেরবার হয়ে গেল, বিশেষ করে ঘোষালেরা। শেষকালে তাদের বংশমর্যাদা উচ্চ নয় বলে তাদের সমাজেও হেয় করা হ'ল। তখন ঘোষালেরা সর্বস্বান্ত হয়ে দেশ ছেড়ে অন্য গ্রামে চলে গেল। সেই ঘোষাল বংশের আনন্দ ঘোষাল রজবপুরের আড়তদারদের মুহুরী হ'ল। তার ছেলে মধুসূদন ছেলেবেলা থেকেই আড়তে মানুষ হয়ে ব্যবসার হাটহদ্দ জেনে নিলে, আর লেখাপড়া ছেড়ে ব্যবসায় ঢুকে ক্রমে মহারাজ হয়ে উঠল। মধুসূদন ছেলেবেলা থেকে হিসাবে দক্ষ, দৃঢ়স্বভাব এক কথার মানুষ, যা ধরে বা বলে তা করে। সে অর্থ সঞ্চয়ে এমন মন দিলে যে তার মা পুত্রবধূর মুখদর্শনের আশা ত্যাগ করেই পরলোকে প্রস্থান করলেন। যখন মধুসূদন কারবার খুব ফলাও করে তুলে রাজা মহারাজা খেতাব পেয়ে সমাজে লোকমান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, তখন সে বললে এই বার বিবাহের ফুরসৎ হয়েছে।

নানা জায়গা থেকে বিবাহের সম্বন্ধ আসতে লাগল। মধুসূদন চোখ পাকিয়ে বললে ঐ চাটুজ্যেদের মেয়ে চাই। মধুসূদন তার পূর্বপুরুষদের

'যোগাযোগ' রবীন্দ্র-রচনাবলীর নবম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

'যোগাযোগ'-এর কুমু ও বিপ্রদাসের চরিত্রালোচনা প্রসঙ্গে নিরুপমা দেবী লিখিয়াছেন—

> "যোগাযোগে কুমু ও বিপ্রদাসের যে ভালবাসা, তাহার ভিত্তি জ্ঞানের ও ধর্মের উপর। সংস্কারবর্জিত মার্জিত উন্নত হৃদয়ের এমন একনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগ্নী-প্রীতি অন্য কোন গ্রন্থে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।"

রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত গুণগ্রাহী ভক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'যোগাযোগ'-এর এই সমালোচনাটি প্রকাশ করেন 'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩৩৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। বইখানির পরিচয় সম্পর্কে ফুটনোটে পরিচিতি ছিল: "যোগাযোগ—কবিসার্বভৌম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপাদেয় উপন্যাস। ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে প্রকাশিত। পাইকা টাইপে পরিষ্কার ছাপা। ডবল ক্রাউন ১৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ২।০; বাঁধাই ২৸০।

লাঞ্ছনার কথা একদিনও ভোলেনি। যারা তাদের কুলের খোঁটা দিয়ে দেশ-ছাড়া করেছিল, চাই তাদেরই ঘরের মেয়ে। মধুসূদন পণ করেছিল—টাকার জোরে সে চাটুজ্যেদের কুলগর্ব খর্ব করে ছাড়বে।

নুরনগরের চাটুজ্যেদের অবস্থাও এখন ভাল নয়, তাদের জমিদারী দেনায় জড়িয়েছে। তাদের পরিবারের মধ্যেও ভাগাভাগি হয়ে গেছে। একভাগে আছে দুই ভাই বিপ্রদাস আর সুবোধ, আর পাঁচ বোন। চার বোনের বিয়ে হয়ে গেছে,—তাদের বাপ মা বেঁচে থাকতেই তাঁরাই অনেক পণ দিয়ে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে গেছেন; ছোট বোন কুমুদিনীর বিবাহ হবার আগেই তার বাবার অসচ্চরিত্রতার জন্য তার মা রাগ করে বৃন্দাবনে চ'লে যান, সেই শোকে কুমুদিনীর বাবা অল্পদিনের মধ্যেই মারা যান, এবং তার অল্প দিন পরেই তার মাও স্বামীর সহগমন করেন। তখন তার রক্ষণ ও শিক্ষার ভার পড়ে তার বড়দাদা বিপ্রদাসের উপর। বিপ্রদাস বোনকে লেখাপড়া গানবাজনা বন্দুক-ছোঁড়া প্রভৃতি বহু বিষয়ে সুশিক্ষিতা করে তোলেন। কুমুদিনীর বয়স হয়েছে উনিশ। এখন তার বিয়ে দিতে হবে। অথচ চাটুজ্যে-বংশের মেয়ের বিবাহের উপযুক্ত পণের টাকার সংগতি তখন বিপ্রদাসের নেই। এই সময় হঠাৎ বিপ্রদাসের মাড়োয়ারী মহাজন বিপ্রদাসকে টাকার তাগাদা দিয়ে বসল, এবং সেই সময়েই একজন বন্ধু অনেক দিন পরে হঠাৎ এসে বিপ্রদাসকে পরামর্শ দিলে যে,—মহারাজা মধুসূদনের কাছ থেকে এক থোকে এগার লাখ টাকা ধার নিয়ে সে-সব খুচরা দেনা মিটিয়ে ফেলুক। বিপ্রদাস তাই করলে। ছোট ভাই সুবোধ বললে এখন উপার্জনের পথ দেখতে হবে, সে বিলাত গিয়ে ব্যারিষ্টার হয়ে আসবে। সে গেল বিলাত। মাড়োয়ারীর তাগাদা আর বিপ্রদাসের বন্ধুর অকস্মাৎ আবির্ভাব হয়ত কৌশলী মধুসূদনের কৌটিল্য-নীতিরই ফল।

কুমুদিনীর বিবাহের পণ জোটানো আর পাত্র জোটানোর কথা কল্পনা করতেই দাদা বিপ্রদাসের আতঙ্ক হয়। তাই কুমুদিনী নিজের জন্যে নিজে সংকুচিত। তার বিশ্বাস সে অপয়া। সে মনে মনে কেবল ভাবে—"কোথায় আমার রাজপুত্র, কোথায় তোমার সাত রাজার ধন মানিক, বাঁচাও আমার ভাইদের, আমি চিরদিন তোমাদের দাসী হয়ে থাকব।"

কুমুদিনী "বংশের দুর্গতির জন্যে নিজেকে যতই অপরাধী করে, ততই

হৃদয়ের সুধাপাত্র উপুড় করে ভাইদের ওর ভালবাসা দেয়,—কঠিন দুঃখে নেঙড়ানো ওর ভালবাসা। কুমুর 'পরে তাদের কর্তব্য করতে পারছে না বলে ওর ভাইরাও বড় ব্যথার সঙ্গে কুমুকে তাদের স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছে

বিপ্রদাস সাবেক চাল বজায় রাখা কঠিন দেখে কুমুদিনীকে নিয়ে কলকাতায় এলেন। দেশ ছেড়ে কুমুদিনীর মন খাঁ খাঁ করে। বিপ্রদাস বেশী করে বোনকে সাহিত্য এসরাজ বন্দুক-ছোঁড়া শেখান, একসঙ্গে দাবা খেলেন। এখানে এসে ভাইবোন পরস্পরের সঙ্গী হ'ল। কিন্তু কুমুদিনীর মনটা জন্ম-একলা। বিপ্রদাসও নানা চিন্তায় গম্ভীর প্রশান্ত।

কুমুদিনী "দেখতে সে সুন্দরী, লম্বা ছিপছিপে যেন রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড, চোখ বড় না হোক একেবারে নিবিড় কালো, আর নাকটি নিখুঁত রেখায় যেন ফুলের পাপড়ি দিয়ে তৈরী। রঙ শাঁখের মত চিকন গৌর; নিটোল দু'খানি হাত; সে হাতের সেবা কমলার বরদান, কৃতজ্ঞ হয়ে গ্রহণ করতে হয়। সমস্ত মুখে একটি বেদনার সকরুণ ধৈর্যের ভাব। একরকমের সৌন্দর্য আছে তাকে মনে হয় যেন একটা দৈব আবির্ভাব, পৃথিবীর সাধারণ ঘটনার চেয়ে অসাধারণ পরিমাণ বেশী। কুমুদিনী ঘরে লেখাপড়া করছে। বাইরের পরিচয় নেই বললেই হয়। পুরান নূতন দুই কালের আলো-আঁধারে তার বাস।" তার দাদা তাকে দেখে ভাবেন—"ও যে চাঁদের আলোর টুকরো, দৈন্যের অন্ধকারকে একা মধুর করে রেখেছে।

আর "বিপ্রদাসের দেবতার মত রূপ, বীরের মত তেজস্বী মূর্তি, তাপসের মত শান্ত মুখশ্রী তার সঙ্গে একটি বিষাদের নম্রতা। তাঁর মুখে সেই বিষাদ তাঁর অন্তরের মহত্ত্বের ছায়া, ধৈর্যের আশ্চর্য গভীরতা। তখনকার কালে শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত পজিটিভিজম্ তাঁর ধর্ম ছিল, দেবতাকে বাহিরে থেকে প্রণাম করা তাঁর অভ্যাস ছিল না, অথচ 'দেবতা আপনিই তাঁর জীবন পূর্ণ ক'রে আবির্ভূত ছিলেন।" অতি ক্রোধের সময়েও তাঁর শান্ত কণ্ঠস্বর, মুখের মধ্যে উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ পেত না।

বিপ্রদাসের ভাই সুবোধ বিলাতে গিয়ে অপব্যয় করছে, আর ক্রমাগত দাদার কাছে টাকা চেয়ে পাঠাচ্ছে। বিপ্রদাস ভাইয়ের অবিবেচনায় বিব্রত ও ব্যথিত হয়, কিন্তু কষ্ট করে টাকা পাঠায়। একবার সুবোধ এক থোকে দেড়-শ পাউণ্ড চেয়ে পাঠালে। দাদাকে চিন্তিত দেখে কুমুদিনী ব্যাপার বুঝতে পারলে, এবং

তার মায়ের গহনা বেচে ছোটদাদাকে টাকা পাঠাতে অনুরোধ করলে। কিন্তু সে গহনা বিপ্রদাস কুমুদিনীর বিবাহের জন্য সম্বল করে রেখেছিল। বিপ্রদাস টাকা পাঠাতে পারবেন না লেখাতে সুবোধ লিখলে তার অংশের জমিদারী বিক্রি ক'রে টাকা পাঠিয়ে দিতে। সুবোধের এই প্রস্তাব বিপ্রদাস আর কুমুদিনীর বুকে বাজল। বিপ্রদাস নিজের তালুক পত্তনী দিয়ে টাকা পাঠালেন।

এমন সময় এল মধুসূদনের ঘটক। বিপ্রদাস বেশী বয়সী পাত্রে বোন সম্প্রদান করতে নারাজ হলেন। কুমুদিনী ভাবে তার দিদিদের কথা তারা তো তাদের স্বামী বেছে নেয়নি, মেনে নিয়েছে, যেমন করে মা মেনে নেয় ছেলেকে। কুমুদিনী ভাবে সতীসাধ্বীদের কথা যারা নির্বিচারে স্বামীর সব আচরণ সহ্য করে। সে ক'দিন ভেবে ভেবে অচেনা, অদেখা মধুসূদনকেই পতিত্বে বরণ করে ফেললে। সে দেবতার কাছে সংকেত মানত করে মনে করলে, সে দৈবসংকেতে তার মনোনয়নের সমর্থনই পেয়েছে। তার দাদা তার মত জিজ্ঞাসা করলে সে জোর দিয়ে বললে—সে মধুসূদনকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না।

সম্বন্ধ অগত্যা পাকা হ'ল। কুমুদিনী খুশী। তার অন্তরে বাহিরে যেন একটা নূতন প্রাণের রঙ লাগল।

কিন্তু মধুসূদন মহাসমারোহে নিজের লোকজন নিয়ে এক মধুপুরী নির্মাণ করিয়ে ঐশ্বর্যের রাজসিক আড়ম্বরে চাটুজ্যেদের উপর টেক্কা দিতে লেগে গেল। সে বিপ্রদাসকে খাটো করে নিজের বাহাদুরি নেবার যতরকম চেষ্টা করে তাতে কুমুদিনীর কষ্ট হয়। চাটুজ্যেরা যখন মধুসূদনের ঐশ্বর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছিল না, তখন তারা মধুসূদনের বংশমর্যাদার হীনতা নিয়ে তাকে খোঁটা দিতে লাগল, তবু কি পরাজয়ের গ্লানি মিটতে চায়? মধুসূদনের জাতকুলের কথাটাকে কুমুদিনী তার ভক্তি দিয়ে চাপা দিয়েছিল। কিন্তু মধুসূদনের ধনের বড়াই করে শ্বশুরকুলকে খাটো করার নীচতা দেখে তার মন বিষাদে ভ'রে উঠল। ঘোষালদের লজ্জায় আজ যেন ওরই সব চেয়ে বেশী লজ্জা।

কুমুদিনী দাদার সামনে এসে কেঁদে ফেল্‌লে, বিপ্রদাস বললেন—"কুমুদিনীর মনে যদি কোনও খট্‌কা থাকে, তবে তিনি বিয়ে এখনও ভেঙ্গে দিতে পারেন।" কুমুদিনী বললে—"ছি ছি সেকি হয়।" এখন থেকে কুমুদিনী মনে মনে জোরের সঙ্গে জপতে লাগল, তিনি ভালই হোন, মন্দই হোন তিনি আমার পরম গতি।

কিন্তু মধুসূদনের ব্যবহার ক্রমশই অভদ্র উদ্ধত হয়ে উঠতে লাগল। কুমুদিনীর ভাবে আর বাস্তবে দ্বন্দ্ব বেধে গেল। বাল্যকালে যখন সে পতিকামনায় শিবের পূজা করেছে, তখন পতির ধ্যানের মধ্যে সেই মহাতপস্বী শিবকেই দেখেছে। সাধ্বী নারীর আদর্শরূপে সে আপন মাকেই জানত—কি স্নিগ্ধ শান্ত কমনীয়তা, কত ধৈর্য, যদিও তাঁর স্বামীর দিকে ব্যবহারের ত্রুটি ছিল, চরিত্রের স্খলন ছিল। দময়ন্তীর মতন তারও মনের মধ্যে কি নিশ্চিত বার্তা এসে পৌঁছেনি যে মধুসূদনকেই তার বরণ করতে হবে? বরণের আয়োজন সব প্রস্তুতই ছিল, রাজাও এলেন, কিন্তু মনের মানুষের সঙ্গে বাহিরের মানুষের মিল হ'ল কই? রূপেতেও বাধে না, বয়সেও বাধে না, কিন্তু সত্যকার রাজা কোথায়?

বিবাহ হয়ে গেল। বিপ্রদাস অসুখে শয্যাগত, তিনি মধুসূদনের অভদ্র ব্যবহারের কোন খবরই পেলেন না। কুমুদিনী শুভদৃষ্টির সময় ভাল করে বরের দিকে চাইতেই পারলে না, মধুসূদনের ব্যবহারে তার কেমন ভয় ধরে গেছে।

মধুসূদন দেখতে কুশ্রী নয়, কিন্তু বড় কঠিন। কালো মুখের মধ্যে মস্ত বড় বাঁকা নাক। প্রশস্ত কপাল, ঘন ভ্রূ। গোঁপদাড়ি কামানো, ঠোঁট চাপা, চিবুক ভারী, কড়া চুল কাফ্রীদের মত কোঁকড়া, মাথার তেলো ঘেঁষে ছাঁটা। খুব আঁটসাঁট শরীর, কেবল দুই রগের কাছে চুলে পাক ধরেছে। বেঁটে, মাথায় প্রায় কুমুদিনীর সমান। হাত দুটো রোমশ, দেহের তুলনায় খাটো, সবসুদ্ধ মনে হয় মানুষটা একেবারে নিরেট, মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বদাই কি একটা প্রতিজ্ঞা যেন গুলি পাকিয়ে আছে। যেন ভাগ্য-দেবতার কামান থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে একাগ্রভাবে চলেছে একটা একগুঁয়ে গোলা। দেখলেই বোঝা যায় বাজে কথা, বাজে বিষয়, বাজে মানুষের প্রতি মন দেবার ওর একটুও অবকাশ নেই। মধুসূদনের সাজটা ছিল বিচিত্র, বাড়ির চাকর দাসীরা অভিভূত হবে এমনতর বেশ—ডোরাকাটা বিলিতি শার্টের উপর একখানা রঙীন ফুলকাটা সিল্কের ওয়েস্ট-কোট, কাঁধের উপর পাটকরা চাদর, যত্নে কোঁচান কালাপেড়ে শান্তিপুরী ধুতি, বার্নিশ করা কালো দরবারী জুতো, বড় বড় হীরেপান্নাওয়ালা আঙটিতে আঙুল ঝলমল করছে। প্রশস্ত উদরের পরিধি বেষ্টন করে মোটা সোনার ঘড়ির শিকল, হাতে একটা সৌখিন লাঠি, আর সোনার হাতলটি হাতীর মুণ্ডের আকারে নানা জহরতে খচিত।

প্রথম মিলনেই বরবধূর বিচ্ছেদ সুরু হ'ল। ফুলশয্যার রাত্রে কুমুদিনী

লজ্জাকম্পিত কণ্ঠে স্বামীর কাছে প্রার্থনা জানালে তার দাদার অসুখ আর দুটো দিন সে বাপের বাড়িতে থেকে যেতে চায়। তার প্রার্থনা নামঞ্জুর হ'ল। কলকাতায় নেমেই এক গাড়িতে যেতে যেতে মধুসূদন দেখলে কুমুদিনীর হাতে একটা নীলার আংটি। অমনি সে হুকুম করলে এ আংটি তার আর পরা চলবে না। মধুসূদন কেবল কুমুদিনীর আংটি খুলিয়েই নিরস্ত হ'ল না, তার দাদার দেওয়া আংটিটিকে সে কেড়ে নিলে।

কুমুদিনী স্বামীর কাছে কেবলই হুকুম শোনে, প্রীতির পরিচয় পায় না। আর সে ভাবে—"যেমন করে অভিসারে বেরোয় তেমনি করেই বেরিয়েছি, অন্ধকার রাত্রিকে অন্ধকার বলেই মনে হয়নি। আজ আলোতে চোখ মেলে অন্তরেই বা কি দেখলুম, বাইরেই বা কি দেখছি? এখন বছরের পর বছর, মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটবে কি করে?" এতদিন কুমু স্বামীর বয়স ও রূপ নিয়ে কোন চিন্তাই করেনি। সাধারণতঃ যে-ভালবাসা নিয়ে স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ সত্য হয়, যার মধ্যে রূপগুণ দেহমন সমস্তই মিলে আছে, তার যে প্রয়োজন আছে একথা কুমুদিনী ভাবেও নি। এখন সে যে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বামীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারছে না তা মনে হচ্ছে মহাপাপ, কিন্তু সে পাপেও তার তেমন ভয় হচ্ছে না, যেমন হচ্ছে শ্রদ্ধাহীন আত্মসমর্পণের গ্লানির কথা মনে করে।

মধুসূদনের বাড়ির মেয়েদের কাছ থেকেও কুমুদিনী বিশেষ কোনও মমতা পেলে না, তারা সবাই তার কেবল সমালোচনা করে। এই মেয়েলী সমালোচনার বিবরণটি চমৎকার, তা আর উদ্ধার করলাম না। সেই বাড়িতে কেবল মধুসূদনের ছোটভাই নবীন ও তার স্ত্রী মোতির মা কুমুদিনীর প্রকৃত মর্যাদা বুঝে তাকে শ্রদ্ধা যত্ন করতে লাগল।

মোতির মা কিন্তু এইটুকু বুঝতে পারে না স্ত্রী হয়ে স্বামীর কাছে আত্মোৎসর্গ করার মধ্যে বাধা কোথায় থাকতে পারে। সে তো সেকেলে ধারণার বশীভূতা গৃহস্থ বধূ।

মধুসূদনের পক্ষে কুমু হ'ল একটি নূতন আবিষ্কার। স্ত্রীজাতির পরিচয় পায় এ পর্যন্ত এমন অবকাশ এই কেজো মানুষের অল্পই ছিল। মধুসূদন মেয়েদের অতি সংক্ষেপে দেখেছে ঘরের বউ-ঝিদের মধ্যে। ওর স্ত্রীও যে জগতের সেই অকিঞ্চিৎকর বিভাগে স্থান পাবে, এবং দৈনিক গার্হস্থ্যের তুচ্ছতায় ছায়াচ্ছন্ন হয়ে কর্তাদের কটাক্ষ-চালিত মেয়েলী জীবন-যাত্রা অতিবাহিত

করবে, এর বেশী সে কিছুই ভাবেনি। স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করবারও যে একটা কলানৈপুণ্য আছে, তার মধ্যেও যে একটা পাওয়া বা হারাবার কঠিন সমস্যা থাকতে পারে, একথা তার হিসাব-দক্ষ সতর্ক মস্তিষ্কের কোণে স্থান পায়নি। মধুসূদন তার অবচেতন মনে নিজের অগোচরে কুমুদিনীকে এক-রকম অস্পষ্টভাবে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বোধ করতে লাগল। কিন্তু মধুসূদনও স্বামীগিরির সেকেলে ধারণাই মনে পুষে এসেছে, আর তার উপরে আবার সে সকলের উপর প্রভুত্ব করে অভ্যস্ত, সে স্বামী, সকলের উপরে এ বোধ তার অস্থিমজ্জাগত হয়ে আছে। তাই সে ভাবলে—আমিই যে ওর একমাত্র, এ কথাটা যত শীঘ্র হোক কুমুদিনীকে জানান দেওয়া চাই।

স্বামীর ব্যবহারে কুমুদিনীর যে পরিমাণ কষ্ট না হচ্ছিল তার চেয়ে বেশী কষ্ট হচ্ছিল তার নিজের কাছে নিজের অপমানে। এই কষ্টটা বুঝতে পেরেছিল মোতির মা। সে ভাবলে—আমাদের যখন বিয়ে হয়েছিল তখন আমরা তো কচি খুকী ছিলুম, মন বলে একটা বালাই ছিল না। কিন্তু কুমুদিনী বেশী বয়সে লেখা-পড়া শিখে স্বামীর ঘর করতে এসেছে, এ মেয়ের পক্ষে অপরিচিত একজন পুরুষকে অকস্মাৎ স্বামী বলে মেনে নেওয়া বিড়ম্বনা। বড়ঠাকুর এখনও ওর পর, আপন হতে অনেক সময় লাগে। ধন পেতে বড়ঠাকুরের কতকাল লাগল আর মন পেতে দু'দিন সবুর সইবে না? সেই লক্ষ্মীর দ্বারে হাঁটাহাঁটি করে মরতে হয়েছে, আর এই লক্ষ্মীর দ্বারে একবার হাত পাততে হবে না।

কুমুদিনী স্বামীর ব্যবহারে মর্মাহত হয়ে মনে করলে এ বাড়িতে আমার যদি বধুর অধিকার নাই থাকে, তবে আমি এ বাড়িতে থাকি কিসের সম্পর্কে? তাই সে বাড়ির দাসীপনা করতে নিযুক্ত হ'ল। সে আলো বাতি রাখার ময়লা ঘরের এককোণে নিজের বাসস্থান করে নিলে।

মধুসূদন কিন্তু মনে মনে কুমুদিনীর জন্য প্রতীক্ষা করে। রাত্রে উঠে চুপিচুপি যায় কুমুদিনীর ঘরে সে কি করছে দেখতে। সে গিয়ে একদিন দেখলে কুমুদিনী দিব্য নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছে। মধুসূদনের মনে হ'ল যে তার যেমন ঘুম নেই কুমুদিনীরও তেমনি ঘুম না থাকাই উচিত ছিল। কুমু-দিনীর মুখের উপর লণ্ঠনের আলো পড়তেই সে একটু নড়ল। গৃহস্থের জাগার লক্ষণ দেখে চোর যেমন করে পালায়, মধুসূদন তেমনি করে তাড়াতাড়ি পালাল। তার ভয় হ'ল পাছে কুমুদিনী ওর পরাভব দেখে মনে মনে

হাসে মধুসূদন বুঝতে লাগল যে, তার দিনের চরিত্রের সঙ্গে রাতের চরিত্রের অনেকটা প্রভেদ ঘটছে। এই রাত্রি দু'টোর সময় চারিদিকে লোকের দৃষ্টি বলে যখন কিছুই নেই, তখন কুমুদিনীর কাছে মনে মনে হারমানা তার কাছে অস্বীকৃত রইল না।

কুমুদিনীকে কঠিনভাবে শাসন করার শক্তি মধুসূদন হারিয়ে ফেলেছে, এখন তার নিজের তরফে যে অপূর্ণতা তাই তাকে পীড়া দিতে আরম্ভ করেছে। চাটুজ্যেদের ঘরের মেয়েকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল চাটুজ্যেদের পরাজিত করবে বলে, কিন্তু সে যে এমনি মেয়ে পাবে, বিধাতা আগে থাকতেই যার কাছে হার মানিয়ে রেখে দিয়েছেন, এ সে মনেও ভাবেনি। অথচ এখন সে একথা বলবারও জোর মনে পাচ্ছে না যে তার ভাগ্যে একজন সাধারণ মেয়ে হলেই ভাল হ'ত যার উপর তার শাসন খাটত। একদিন সে কুমুদিনীর সামনে নবীন আর মোতির মাকে ডেকে বলে দিলে—"কাল থেকে বড়বৌয়ের সেবায় আমি তোমাদের নিযুক্ত করলুম।" মধুসূদন কুমুকে বুঝিয়ে দিলে তোমার কাছে আমি অসংকোচে হার মানছি।

এইবার আবার কুমুদিনীর পালা আরম্ভ হ'ল। সে ভাবতে লাগল—এর বদলে কি আছে তার দেবার? বাইরে থেকে জীবনে যখন বাধা আসে তখন লড়াই করবার জোর পাওয়া যায়, তখন স্বয়ং দেবতাই হন সহায়। হঠাৎ সেই বাইরের বিরুদ্ধতা একেবারে নিরস্ত হলে যুদ্ধ থামে কিন্তু সন্ধি হতে চায় না।

মধুসূদন যেদিন কুমুদিনীর আংটি হরণ করেছিল সেদিন ওর সাহস ছিল, সে মনে করেছিল কুমুদিনী সাধারণ মেয়েরই মতন সহজেই শাসনের অধীন হবে, কিন্তু সে এখন দেখছে কুমুদিনী সহজ মেয়ে মোটেই নয়। এখন মধুসূদনের মনে হতে লাগল—কুমুদিনীকে নিজের জীবনের সঙ্গে শক্ত বাঁধনে জড়াবার একটি মাত্র রাস্তা আছে সে কেবল সন্তানের মায়ের রাস্তা। সেই কল্পনাতেই এখন ওর মন ব্যগ্র।

কুমুদিনী যাকে ভালবাসে নি তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে সংকোচ বোধ করে, হোক না সে তার বিবাহের মন্ত্রপড়া স্বামী। কুমু করে বিদ্রোহ, আর দোষ পড়ে মোতির মার ঘাড়ে, কারণ মধুসূদন মনে করে মোতির মা যেহেতু কুমুদিনীকে আদর-যত্ন করে সেই হেতু কুমুদিনীকে বশ মানানো

যাচ্ছে না, তার শাসন প্রতিহত হয়ে ফিরে আসছে। তাই সে মোতির মাকে বাড়ি থেকে বিদায় করে দেবার কল্পনা করে, কিন্তু মনের মধ্যে জোর বাঁধতে পারে না। সে জানে যে তার সংসারে মোতির মার গৃহিণীপনা নিতান্ত অপরিহার্য। অথচ যে-বিবাহিত স্ত্রীর দেহ-মনের উপর সম্পূর্ণ দাবি সেও তার পক্ষে নিরতিশয় দুর্গম হয়ে থাকে এও তার সহ্য হচ্ছিল না। মধুসূদনের সকল কাজে শৈথিল্য আর অবহেলা দেখা দিতে লাগল এবং সে নিজে আর অপর সকলে এই দেখে আশ্চর্য হতে লাগল।

কুমুদিনী নিরন্তর তার অন্তরের ঠাকুরের কাছে কর্তব্য-নির্ধারণের নির্দেশ চায়। মধুসূদন যেদিন ভাবলে আমি নিজের মান খর্ব করে কুমুর মান ভাঙব, এবং তার হাতে ধরে মিনতি করলে, সেই দিন কুমুদিনী পড়ল মুস্কিলে। মধুসূদন যখন ক্ষুদ্র হয়, কঠোর হয়, তখন সেটা সহ্য করা কুমুদিনীর পক্ষে তত কঠিন নয়। কিন্তু আজ মধুসূদনের এই নম্রতা, এই তার নিজেকে খর্ব করা সম্বন্ধে কুমু যে কি করবে তা সে স্থির করতে পারে না। হৃদয়ের যে-দান নিয়ে সে এসেছিল তা তো স্খলিত হয়ে ধুলায় পড়ে গেছে। তথাপি কুমু স্বামীর হুকুম মানে, কিন্তু তার আন্তরিক সতীত্ব তাকে ধিক্কার দেয়, সে তার ঠাকুরের কাছে নালিশ করে তার ঠাকুরেরই বিরুদ্ধে, কেন তিনি তাকে এই অশুচিতা থেকে বাঁচাবার পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন না। তার মনে হচ্ছে, একটা কালো কঠোর ক্ষুধিত জন্তু বাহির থেকে তাকে যেন গ্রাস করছে। যে পরিণত বয়স শান্ত স্নিগ্ধ সুগম্ভীর, মধুসূদনের তা নয়; যা লালায়িত, যার প্রেম বিষয়াসক্তিরই স্বজাতীয়, তারই স্বেদাক্ত স্পর্শে কুমুর এত বিতৃষ্ণা। কুমুদিনী এই অশুচিতা থেকে পালাবার একমাত্র উপায় দেখে শিশু মোতির সংসর্গে। এই শিশু মোতি তার জেঠিমাকে পরিপূর্ণভাবে ভালবাসে।

কুমুদিনী মোতির সাহচর্যে নিজের অশুচিতা শোধন করে নিতে চায় ব'লে মধুসূদন বালকটির উপরও রূঢ় ব্যবহার করে, আর তার সকল আঘাত গিয়ে লাগে কুমুদিনীকে, আর সে হয়ে উঠে আরও আপনার মধ্যে আপনি অবরুদ্ধ। মধুসূদন বুঝতে পারে না যে সে যা চায় তা পাবার বিরুদ্ধে ওর স্বভাবের মধ্যেই একটা মস্ত বাধা রয়েছে।

মধু যখন হুকুম ক'রে কুমুদিনীর প্রেম আদায় করতে চায়, তখন একদিন কুমুদিনী দেখলে নবীন আর মোতির মা-র মধ্যে প্রেমলীলা। তাদের

সেই প্রেমলীলা কেমন সহজ আর সুশ্রী, আর তার পাশে মধুসূদনের ব্যবহার কি বিশ্রী, কুৎসিত, বীভৎস।

মধুসূদন দেখেছে কুমুদিনীর দাদা বিপ্রদাসের মধ্যে ঔদ্ধত্য একটুও নেই, আছে একটা দূরত্ব। বিপ্রদাসের কাছে মধুসূদন মনে মনে খাটো হয়ে থাকে, তাইতে তার রাগ ধরে। সেই একই সূক্ষ্ম কারণে কুমুর উপরেও মধুসূদন জোর করতে পারছে না—আপন সংসারে যেখানে সব চেয়ে তার কর্তৃত্ব করবার অধিকার সেইখানেই সে যেন সব চেয়ে হ'টে গিয়েছে। এবং সেই জন্যেই কুমুর প্রতি তার রাগের বদলে আকর্ষণ দুর্নিবার বেগে প্রবল হয়ে উঠছে, আর রাগ বাড়ছে কুমুদিনীর দাদা বিপ্রদাসের উপর, কারণ মধুসূদনের সন্দেহ যে বিপ্রদাসের আদর্শ ও শিক্ষাতেই কুমুদিনী এমনভাবে গঠিত হয়ে উঠেছে। তার সন্দেহ অমূলকও নয়।

মধুসূদন হিংস্র হয়ে বিপ্রদাসকে পীড়ন করতে লাগল, তার মনে মনে এও ছিল যে, বিপ্রদাসকে শাস্তি দিলে কুমুদিনীকেও শাস্তি দেওয়া হবে। বিপ্রদাস শান্ত-ভাবে মধুর সব কুব্যবহার সহ্য করতে লাগলেন। বিপ্রদাস বনেদী ঘরের অভিজাত ভদ্রলোক, তাঁর কাছে হীনতা কপটতার লেশমাত্র ছিল না। তাঁর চরিত্র ঔদার্যে মহৎ, পৌরুষে দৃঢ়, তাঁর ছিল নিজেদের ক্ষতি করেও অক্ষত সম্মানের গৌরব রক্ষা, অক্ষত সঞ্চয়ের অহংকার প্রচার নয়।

মধুসূদনের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা কুমুকে কেবল যে আঘাত করেছে তা নয়, ওকে গভীর লজ্জা দিয়েছে। ওর মনে হয়েছে সেটা যেন অশ্লীল। মধুসূদন তার জীবনের আরম্ভে একদিন দুঃসহ ভাবেই গরীব ছিল, সেই জন্যে পয়সার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সে কথায় কথায় যে মত ব্যক্ত করত সেই গর্বোক্তির মধ্যে তার রক্তগত দারিদ্র্যের একটা হীনতা ছিল। এই পয়সা-পূজার কথা মধুসূদন বার বার তুলত কুমুর পিতৃকুলকে খোঁটা দেবার জন্যে। ওর সেই স্বাভাবিক ইতরতায়, ভাষার কর্কশতায়, দাম্ভিক অসৌজন্যে, সবসুদ্ধ মধুসূদনের দেহ-মনের ও ওর সংসারের অশোভনতায় প্রত্যহই কুমুর সমস্ত শরীর মনকে সংকুচিত করে তুলছে। স্বামীপূজার কর্তব্য সম্বন্ধে সংস্কারটাকে বিশুদ্ধ রাখবার জন্যে ওর চেষ্টার অন্ত ছিল না, কিন্তু তার কত বড় হার হয়েছে তা এর আগে এমন করে সে বোঝেনি।

মধুসূদন যখন কুমুদিনীর সঙ্গে মিলনটাকে সহজ করে তুলতে কিছুতেই

পারলে না, তখন সে মন দিল অন্য দিকে। মধুসূদনের বাড়িতে তার দাদার এক বিধবা বৌ থাকত তার নাম শ্যামাসুন্দরী। শ্যামা ধনী ঠাকুরপোকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সদাই ব্যগ্র, কায়মনোবাক্যে সে তাকে সেবা করতে প্রস্তুত। মধুসূদন এত-দিন তাকে আমল দেয়নি, প্রশ্রয় দেয়নি। কিন্তু এখন কুমুকে শাস্তি দেবার জন্য মধু তার দ্বারস্থ হ'ল। শ্যামা কৃতার্থ হয়ে গেল।

এই শ্যামাসুন্দরী পরিণত বয়সী আঁটসাঁট গড়নের শ্যামবর্ণ একটি সুন্দরী বিধবা, মোটা নয়, কিন্তু পরিপুষ্ট শরীর নিজেকে যেন বেশ একটু ঘোষণা করছে। এক-খানি সাদা শাড়ীর বেশী গায়ে কাপড় নেই, কিন্তু দেখে মনে হয় সর্ব্বদাই পরিচ্ছন্ন। বয়স যৌবনের প্রায় প্রান্তে এসেছে, কিন্তু এখনও জরা আক্রমণ করেনি। তার ঘন ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ কালো চোখ অল্প একটু দেখে সমস্তটা দেখে নেয়। তার টসটসে ঠোঁট দুটির মধ্যে একটা ভাব আছে যেন অনেক কথাই সে চেপে রেখেছে। সংসার তাকে বেশী কিছু রস দেয় নি, তবু সে ভরা। সে নিজেকে দামী বলেই জানে, সে কৃপণও নয়, কিন্তু তার মহার্ঘতা ব্যবহারে লাগল না বলে নিজের আশ-পাশের উপর তার একটা অহংকৃত অশ্রদ্ধা। যৌবনের যাদুমন্ত্রে সে মধুসূদনকে বশ করে নেবে এমন দুরাশা তার অনেক দিন থেকেই ছিল, কিন্তু এতদিন মধুসূদনের মন মাঝে মাঝে টললেও হার মানে নি। শ্যামাও মধুর মনের ঝোঁকটা ধরতে পেরেছিল, কিন্তু কোন দিন তার মনের ভয় আর ঘুচছিল না। শ্যামাসুন্দরী মনে মনে মধুসূদনকে ভালও বেসেছিল। তাই মধুসূদনের বিবাহের পর থেকে সে আর থাকতে পারছিল না। মধু যদি কুমুকে অন্য সাধারণ মেয়েরই মত অবজ্ঞা করত, তবেও বা সেটা একরকম সহ্য হ'ত। কিন্তু শ্যামা যখন দেখলে যে এতদিন যে-মধু তাকে অবহেলা করে এসেছে সে-ই এখন কুমুদিনীর মন পাবার জন্য তপস্যা করছে, তখন আর সে সহ্য করতে পারলে না। সে সাহস করে এগিয়ে এসে দেখলে মধুসূদন তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে।

কিন্তু যখন মধু শ্যামার কাছে থাকে তখনও তার মনের মধ্যে জাগে কুমুদিনীর কথা। কুমু মধুসূদনের আয়ত্তের অতীত, সেইখানেই তার অসীম জোর; আর শ্যামা তার এত বেশী আয়ত্তের মধ্যে যে তার ব্যবহার আছে, কিন্তু মূল্য নেই। তাই ঈর্ষার পীড়নে শ্যামার মনে একটুও শান্তি নেই। সে মধুর পথ আগ্‌লে আগ্‌লে বেড়ায়, তার মনে সদাই আশঙ্কা করে কুমু আপন সিংহাসনে ফিরে আসে।

কুমুদিনী যেদিন প্রথম শ্যামাকে দেখেছিল, সেইদিনই তার মনে হয়েছিল, শ্যামা

আর মধু যেন একই মাটিতে গড়া একই কুমারের চাকে। যখন শ্যামার আর মধুর আচরণে আর কোনও অপ্রকাশ্যতা থাকল না, তখন কুমুদিনী তার পীড়িত দাদার কাছে চলে গেছে, এবং সে খবর সেখানে তাদের কাছেও গিয়ে পৌঁচেছে।

শান্ত গম্ভীর বিপ্রদাস শ্যামার আর মধুর আচরণের সংবাদ পেয়ে ক্রোধে উগ্র হয়ে উঠলেন। তিনি কুমুদিনীকে বললেন—"কুমু, অপমান সহ্য হয়ে যাওয়া শক্ত নয়, কিন্তু সহ্য করা অন্যায়। সমস্ত স্ত্রীলোকের হয়ে তোমার নিজের সম্মান তোমাকে দাবি করতে হবে, এতে সমাজে তোমাকে যত দুঃখ দিতে পারে দিক।" মোতির মা আর নবীন এলো কুমুদিনীকে নিয়ে যেতে, সে না গেলে যে তার স্বামী ঘরসংসার সব বেদখল হয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু বিপ্রদাস তার বোনকে ঐ অশুচি বাড়িতে পাঠাতে অস্বীকার করলেন, কুমুদিনীও যেতে চাইলে না। বিপ্রদাস মোতির মাকেও বললেন—"স্ত্রী যদি সে অপমান মেনে নেয় তবে সকল স্ত্রীলোকের প্রতিই তাতে করে অন্যায় করা হবে। এমনি করে প্রত্যেকের দ্বারাই সকলের দুঃখ জমে উঠেছে।"

এরপর মধু এল নিজে কুমুকে নিয়ে যেতে। সে যে শ্যামাকে হুকুম করে, শাসন করে, প্রহার করে, কিন্তু তাকে তো একদিনও সম্মান করতে পারেনি, সে তাকে চাকর দিয়ে নিজের শোবার ঘরে ডেকে পাঠাতেও দ্বিধা করেনি। কিন্তু সকল অবস্থার মধ্যেই মধুর মনে জেগেছে কুমুদিনীর দৃপ্ত নারীত্বের অসামান্য মহিমা। তাই সে তার কাছে পরাভব স্বীকার করে নিজে তাকে নিতে এল। কিন্তু কুমু কিছুতেই যেতে সম্মত হ'ল না। তখন সে ক্রোধান্ধ হয়ে কুমুদিনীকে বললে—"জানো, তোমাকে আমি পুলিস দিয়ে ঘাড়ে ধরে নিয়ে যেতে পারি।" এখানেও তার প্রভুত্বের ক্ষমতার দম্ভ।

কুমুদিনী স্বামীর কাছে যেতে অস্বীকার করছে জেনে বিপ্রদাসের পুরাতন বিশ্বাসী কর্মচারী কালু বিষম ভীত হয়ে যখন বললে—সর্বনাশ! তখন বিপ্রদাস বললেন—সর্বনাশকে আমরা কোন কালে ভয় করিনে, ভয় করি অসম্মানকে।

মধুসূদন মনে করলে নবীন আর মোতির মা-র কাছে প্রশ্রয় পেয়েই কুমুদিনী তার বিরুদ্ধতা করতে সাহস করেছে। তাই সে তার ছোটভাই ও ভাইবৌকে বাড়ি থেকে তাড়াবে। তারা এল কুমুদিনীর কাছ থেকে বিদায় নিতে। সেই সময় মোতির মা দেখলে যে কুমুদিনী গর্ভবতী। তারা বিদায় নিয়ে চলে গেল।

যখন কুমুদিনীর গর্ভ সম্বন্ধে আর সন্দেহ রইল না, তখন বিপ্রদাস আর মধু দুজনেই শুনলেন। বিপ্রদাস কুমুদিনীকে ডেকে বললেন—"এখন তোর বন্ধন কাটাবে কে?" কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করলে তবে কি আমাকে যেতে হবে দাদা? বিপ্রদাস কুমুকে বললেন—"তোকে নিষেধ করতে পারি এমন অধিকার আর আমার নেই। তোর সন্তানকে তার ঘরছাড়া করব কোন্ স্পর্ধায়?"

কুমুদিনী বিনা আহ্বানে এবার নিজে যেচে স্বামীর বাড়ি চলে গেল। যাবার সময় সে তার দাদাকে বলে গেল—কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, কোন-দিন কোন কারণেই তুমি ওদের বাড়ি যেতে পারবে না। জানি দাদা তোমাকে দেখবার জন্যে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠবে, কিন্তু ওদের ওখানে যেন তোমাকে না দেখতে হয়। সে আমি সইতে পারব না।

তারপর কুমুদিনী আরও বললে যে, যেদিন সে সন্তান প্রসব করে মুক্ত হবে সেদিন সে স্বাধীন হয়ে তার দাদার কাছেই চলে আসবে, কারণ মানুষের জীবনে এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোয়ান যায় না।

কুমুদিনীকে বিদায় দিয়ে বিপ্রদাস নিতান্ত একাকী নিঃস্ব অসহায়। আর কুমু? কে জানে তার এর পরে কি ঘটেছিল। লেখক এ সম্বন্ধে কিছু বলেন নি।

এই উপন্যাসখানির মধ্যে তিনটি প্রধান আর তিনটি অপ্রধান চরিত্র আঁকা হয়েছে, আর কয়েকটি আছে আনুষঙ্গিক চরিত্র। সব কয়টিই জীবন্ত মানুষ হয়েছে। তার মধ্যে সব চেয়ে ফুটেছে মধুসূদন, বিপ্রদাস, আর কুমুদিনী। নবীন, মোতির মা ও শ্যামা অল্পের মধ্যে স্পষ্ট আকার ধারণ করেছে। আনুষঙ্গিক চরিত্রের মধ্যে আমাদের মনে ছাপ রাখে হাবুল বা মোতি, আর কালুদাদা।

মধুসূদনের চেহারা আর চরিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিচয় পূর্বে দিয়েছি। কুমু-দিনীরও পরিচয় আমরা পেয়েছি। এদের দুজনের চরিত্রের বৈপরীত্য লেখক অতি চমৎকার দেখিয়েছেন, প্রতিদিন যে হুকুম করে লোককে অবিশ্বাস করে অভ্যস্ত, সেই মধুসূদনের কাছে সহজ অথচ অনমনীয় আত্মমর্যাদাবোধ অবোধ্য হয়ে যত বিভ্রাট সৃষ্টি করেছে। বিপ্রদাস আর নবীন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী অথচ খাঁটি মানুষ। কুমুদিনী তার এই দাদার হাতে তৈরী। বিদায়ের দিন সে তার দাদাকে বলেছিল—"সমস্ত গিয়েও তবু বাকী থাকে, সেই আমার অফুরানো সেই আমার ঠাকুর। এ যদি না বুঝতুম তা'হলে সেই গারদে ঢুকতুম না। দাদা, এ সংসারে

তুমি আমার আছ বলেই তবে এ কথা আমি বুঝতে পেরেছি।" অতএব বিপ্রদাস ঠিক নাস্তিক ছিলেন বলা যায় না। তাঁর ধর্ম মনুষ্যত্বের ও ন্যায়নিষ্ঠার, আত্ম-সম্মান ও আত্মমর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই উপন্যাসে হঠাৎ-ধনী আর বনিয়াদী অভিজাত ব্যক্তির চরিত্রের তারতম্য অতি সুন্দর করে দেখানো হয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে গত উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ধনীগৃহের ছবি অত্যন্ত সুন্দর ভাবে আঁকা হয়েছে।

সমাজে স্ত্রীলোকের অধিকার, গৃহে তার স্থান আর মর্যাদা, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, প্রভৃতি বহু সমস্যার সমাধান এর মধ্যে পাওয়া যাবে। একদিকে জোর করে শ্রদ্ধা প্রীতি আদায় করবার চেষ্টা, আর তার পাশেই অনায়াসে উৎসারিত শ্রদ্ধাভক্তির চিত্র চমৎকার হয়েছে।

বিপ্রদাস যেন গ্রন্থকারের প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'গোরা'র পরেশবাবুরই একটি প্রতিচ্ছবি। শান্ত, সমাহিত অথচ দৃঢ়, বলিষ্ঠ প্রকৃতি, তাঁকে জানলেই শ্রদ্ধা করতে হয়, তাঁর কাছে মাথা আপনি নত হয়।

এই উপন্যাসে মূল কথাটি হচ্ছে যে লোকের হার-জিত বাইরে থেকে দেখা যায় না, তার ক্ষেত্রটা লোকচক্ষুর অগোচরে। জগতে যাঁরা 'মার্টার,' যাঁরা বাস্তবিক বড়লোক, তাঁরা কালে কালে অযোগ্যের হাতে মার খেয়েই নিজেদের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করে গেছেন। যারা সামান্য সাময়িক পশুশক্তিতে বলবান তারা ভিতরে ভিতরে যাকে শ্রেষ্ঠ বলে জানে বাইরে তাকেই মারে। এই জন্যে মধুসূদনের হাতে কুমুদিনীর লাঞ্ছনা, আর বিপ্রদাসের অপমান।

এই বইখানিকে অসমাপ্ত বলতে হবে। কুমুদিনী স্বামীর বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর তার অভ্যর্থনা সেখানে কিরকম হয়েছিল, তার সন্তান হওয়ার পর সে কি করেছিল, আর সুবোধ—বিপ্রদাসের ছোট ভাই, কুমুদিনীর ছোটদাদা বিলাত থেকে ফিরে এলেই বা তাদের পরিবারে কি পরিবর্তন ঘটল, এসব খবর লেখক আমাদের দেননি। তাছাড়া বইখানির আরম্ভ হয়েছে কুমুদিনীর পুত্র অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিন উপলক্ষ্য করে। তখন তার বয়স হয়েছে বত্রিশ। এই বত্রিশ বৎসরের ছেলে অবিনাশ পিতামাতার মাঝখানে থেকে তাদের জটপাকানো জীবনের জট কতখানি খুলেছে বা আরও পাকিয়ে তুলেছে, তারও খবর আমরা কিছু জানতে পারিনি। আরম্ভেরও পূর্বে যে আরম্ভ আছে তার কথাতেই এই বই সমাপ্ত হয়েছে, আসল গল্পের উপসংহার বাকী থেকে গেছে, অবিনাশের বয়সের বত্রিশ

বৎসরের ইতিহাস ব্যক্ত হয়নি। সেই অপ্রকাশিত ইতিহাস জানবার জন্য মনের মধ্যে একটা আগ্রহ থেকে যায়, আর বইখানিকে অসমাপ্ত মনে হয়। আশা করি লেখক এর একটা উপসংহার লিখে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করবেন।

এই উপন্যাসের বিষয় হচ্ছে দাম্পত্য সম্পর্কের সমস্যা। সেই জন্য এর মধ্যে নরনারীর সম্পর্কের আর অধিকারের অনেক ব্যাপার উপস্থিত করা হয়েছে, এবং সেগুলির নিপুণ বিশ্লেষণ ও সমাধান করা হয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথই আমাদের বাংলা উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ প্রথম প্রবর্তন করেন, এবং এই কর্মে তার অনন্য-সাধারণ দক্ষতা সর্বজনবিদিত।

নরনারীর আকর্ষণ-বিকর্ষণের তত্ত্ব সমাধানের জন্য এই উপন্যাসে শ্যামাসুন্দরীর অবতারণা করতে হয়েছে, এবং সে যেন কুমুদিনীর চরিত্রের পটভূমিকা হয়ে কুমুর চরিত্র ও শুচিতা আরও ফুটিয়ে তুলেছে, এবং মধুসূদনেরও চরিত্রকে স্পষ্টতর করেছে। কিন্তু শ্যামার আচরণ এমন লালসাময় এবং কুশ্রী যে তার কথা পড়তে গেলে মনে জুগুপ্সা উদিত হয়। এইটি সমস্যার অপরিহার্য অঙ্গ হলেও মনে হয় এই দৃশ্যটা না থাকলেই ভাল হ'ত।

উপন্যাসের আগাগোড়াই ঘাত-প্রতিঘাত আর সংঘাত, কাজেই মন ক্লান্ত হয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু লেখকের স্বভাবসিদ্ধ স্বচ্ছ অনাবিল হাস্যরস প্রায় সকল কথোপকথনের ভিতর প্রচ্ছন্ন থেকে উপাখ্যানের কঠোরতাকে সরস করেছে। আর স্বার্থ, মান, অভিমান, মর্যাদা, সম্মান, বৈষয়িকতা, অবনিবনাও আর ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে বালক হাবলু বা মোতির সরল একাগ্র প্রীতি আর ভালবাসা সমস্ত বইখানিকে বিশুদ্ধ করে রেখেছে। সর্বোপরি বিরাজ করছে বিপ্রদাসের বলিষ্ঠ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। বিপ্রদাসের চরিত্র যেন মধুসূদনের সকল কলুষতা আর ক্ষুদ্রতা ডুবিয়ে দিয়ে সমস্ত পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া বিশুদ্ধ করে তুলেছে।

শেষের কবিতা

রমাপ্রসাদ চন্দ

অনেকেই হয়ত বলিবেন, ৪০ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সৃষ্টি এবং সাহিত্য-সমালোচনা সম্বন্ধে যে সংকীর্ণ মত প্রচার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার তৎকালের পরবাদের আলোচনায় যে সংকীর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়, অনেক দিন যাবৎ তিনি তাহা অতিক্রম করিয়া, নিজেকে নিজে লঙ্ঘন করিয়া, অনেকগুলি মহাকাব্য উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। সুতরাং পুরাতন কথার আলোচনা রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী রচনা বুঝিবার পক্ষে কোন সহায়তা করে না। এই আশঙ্কা সত্য কিনা, রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ গীতিকবির হৃদয়বৃত্তি মহাকবির হৃদয়বৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে তাঁহার উপন্যাসের সমালোচনা করা কর্তব্য। এখানে অবশ্য তাঁহার সকল উপন্যাসের সমালোচনা সম্ভব নহে; এই প্রস্তাবে দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার সকলের শেষ উপন্যাস, 'শেষের কবিতা'র আলোচনা করিব।

'শেষের কবিতা'র নায়ক অমিত রায়, এবং শেষকালে অমিতের সহিত বিবাহ না হইলেও নায়িকা, লাবণ্য। অমিতটি প্রাণহীন প্রাণী, অদ্ভুত রকম সংযমী, কেন না, বিকারের হেতু বর্তমানেও তাঁহার বিকার ছিল না, অথচ রসের কথা বলিয়া মেয়েদের চিত্তবিকার উৎপাদন করিবার জন্য তিনি সতত যত্নবান্ ছিলেন। তবে সত্য কথা বলা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ। তাঁহার প্রেমের কথায় "যতখানি সত্য সে কেবল ঐ বলার কায়দাটুকুর মধ্যে।" একদিন লিলি গাঙ্গুলীর সঙ্গে এইরূপ রসিকতা করিতে গিয়া অমিত পাখার বাড়ি তাড়না খাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের

দ্রষ্টব্য: ১৩৩৬ সালের ভাদ্র মাসে (ইং ১৯২৯) 'শেষের কবিতা' প্রথম বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে রায়সাহেব জগদানন্দ রায় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রেমতত্ত্বের রহস্য উদ্‌ঘাটনে এই কাব্য-ধর্মী যুগান্তকারী উপন্যাসটি রচনা করেন 'যোগাযোগ'-এর অব্যবহিত পরেই। 'যোগাযোগ'-এর বেদনাদায়ক ঘটনাবলীর পর 'শেষের কবিতা'য় কবি মধুর প্রেমের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়া পরিণতির দিকে কাহিনীকে প্রসারিত করিয়াছেন।

'শেষের কবিতা' সম্বন্ধে ক্ষিতীশ রায় একটি রচনায় লিখিয়াছেন—

"দেশ-কাল-পাত্র ভেদে মানুষের রুচি বদলায়, সেই সঙ্গে তাঁর প্রকাশভঙ্গীও।

স্পষ্ট এই সমাজে যুবক-যুবতীর মধ্যে অস্পৃশ্যতা নাই। এই নির্জীব জীবটির মধ্যে প্রাণের স্পন্দন তখনই দেখা যায়, যখন তিনি রবীন্দ্রনাথের অংশাবতারের মত কথা কহেন। যথা—

"অমিত বলে, ফ্যাশানটা হ'লো মুখোশ, ষ্টাইলটা হ'লো মুখশ্রী; ওর মতে, যারা সাহিত্যের ওমরাও দলের, যারা নিজের মন রেখে চলে, ষ্টাইল তাদেরই। আর যারা আমলা দলের, দশের মন রাখা যাদের ব্যবসা, ফ্যাশান তাদেরই। বঙ্কিমী ষ্টাইল বঙ্কিমের লেখা বিষবৃক্ষে, বঙ্কিম তাতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েচেন,"

The Concise Oxford Dictionary of Current English-এ এ-ষ্টাইলের এই সংজ্ঞা আছে—

"Collective characteristics of the writing of diction or artistic expression or way of presenting things or decorative methods proper to a person or school or period or subject, manner of exhibiting these characteristics."

লেখা, শিল্প প্রভৃতির বিশিষ্ট লক্ষণগুলির সমষ্টি 'ষ্টাইল' নামে কথিত হয়। এই সকল লক্ষণ দেশগত, কালগত, বস্তুগত, ব্যক্তিগত হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের অমিত 'ষ্টাইল' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত রীতি অর্থে। "যারা নিজের মন রেখে চলে," অর্থাৎ ১২৯৯ সনের কার্তিকের 'সাহিত্যে' প্রকাশিত চিঠির ভাষায়, যাঁহারা "নিজেকে নিজে লঙ্ঘন" করেন না, 'ষ্টাইল' তাঁহাদেরই। পুরুষ-চরিত্রে পুরুষ সাহিত্যিকের নিজেকে নিজে লঙ্ঘন না করিয়া শুধু বিশ্লেষণের জোরে উপন্যাস লেখা চলিতে পারে। কিন্তু পুরুষ লেখক নিজেকে লঙ্ঘন করিতে না পারিলে স্ত্রী-চরিত্র গড়িতে পারেন না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী-চরিত্র-সৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। নায়িকা লাবণ্য একজন কলেজের অধ্যাপকের মেয়ে;

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমের সাহিত্য-জগতে এরকম একটা হাওয়াবদল লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্চর্য উপন্যাস লিখলেন 'শেষের কবিতা'—ভাষায়, ভাবে, ভঙ্গীতে আনকোরা আধুনিকতার ঝলক।"

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

"শেষের কবিতা সমন্বয় সুষমা ও কবিত্বমণ্ডিত বিশ্লেষণশক্তির দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানের দাবি করিতে পারে।"

'উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ' নামক নিবন্ধে 'শেষের কবিতা' সম্বন্ধে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখিয়াছিলেন—

এম্-এ পাশ করিয়া বিপত্নীক বাপকে বিধবা-বিবাহ করাইয়া, মাষ্টারী করিতেছিল। রাস্তায় মোটর ঠোকাঠুকি হওয়ায় শিলং-এ অমিতের সঙ্গে লাবণ্যের দেখা হইয়াছিল; এবং ক্রমে খুব আলাপ হইয়াছিল। একদিন নির্জনে অমিত লাবণ্যের হাত চাপিয়া ধরিয়াছিল; লাবণ্য হাত ছাড়াইয়া লয় নাই; অমিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল, কিছুই বলে নাই।

কিন্তু যখন অমিত কর্তামার (যোগমায়ার) দোহাই দিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিল, তখন লাবণ্য অসম্মত হইল। এই অসম্মতির কারণস্বরূপ লাবণ্য যাহা বলিল, তাহা, হাত চাপিয়া ধরিলে যে নীরবে নায়কের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, এমন যুবতীর মুখে শোভা পায় না; মানব-মনের বিশ্লেষণক্ষম (Psycho-analyst) বৈজ্ঞানিকের মুখে শোভা পায়। কিন্তু লাবণ্য রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিশেষ ভক্ত ছিল, এবং ঐ কবিতার সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের পুরাতন সুরই ধরিয়াছিল। একদিন অমিত যেমন বলিল, "তোমরা সবাই মিলে তাকে (রবিঠাকুরকে) নিয়ে বড় বেশি"···লাবণ্য তাহাতে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "ও-কথা বলো না, মিতা। আমার ভালো-লাগা আমারই, তাতে যদি আর কারো সঙ্গে অমিল হয় বা তোমার সঙ্গে মিল না হয়, সেটাতে কি আমার দোষ?" অর্থাৎ মনে মনে লাবণ্যও স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া রবীন্দ্রনাথ বনিয়াছিল। সুতরাং অমিতের চিত্ত বিশ্লেষণ করিয়া সে বুঝিয়াছিল, অমিত সহধর্মিণী চায় না, চায় কাব্য-সাধনার একজন স্থায়ী উত্তর-সাধক। লাবণ্য জানিত, অমিতের মতে পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা নহে; কবিতা

"···Action-এর পরিমাণ তাঁর উপন্যাসে যৎসামান্য, এবং বিবর্তন-মুখে সে পরিমাণ ক্রমশই কমিয়া আসিয়া 'শেষের কবিতা'য় দুটি যুবক-যুবতীর নিরবচ্ছিন্ন প্রেমালাপে আসিয়া ঠেকিয়াছে।"

'শেষের কবিতা'র এই আলোচনাটি 'মাসিক বসুমতী'তে (১৩৩৯, অগ্রহায়ণ) প্রকাশিত, লেখকের 'গোড়ার কথা এবং শেষের কবিতা' নামক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। ইহার প্রথমার্ধে লেখক চন্দ্রনাথ বসুর সহিত রবীন্দ্রনাথের মসীযুদ্ধের সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। একদা 'সোনার তরী'র সমালোচনার উপসংহারে যে চন্দ মহাশয় কবিকে 'ধন্য ঋষি' বলিয়া উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনিই পরবর্তীকালে 'মাসিক বসুমতী'র 'রবীন্দ্র বিদূষণ' প্রভৃতি প্রবন্ধাদির মধ্যে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব আসলে ভাঁওতামাত্র। প্রথম দিকে যে রমাপ্রসাদ চন্দ রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, শেষ-জীবনে তিনিই তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরূপ হইয়া উঠেন।

রচনার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। "যে সব কথা ওর মনে বরফ হয়ে, জমে আছে, ও নিজে যার ভার বোধ করে কিন্তু আওয়াজ পায় না, আমার উত্তাপ লাগিয়ে তাকে গলিয়ে ঝরিয়ে দিতে চায়।" যখন কর্তামা—যোগমায়া স্বয়ং লাবণ্যকে এই বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন লাবণ্য সোজাসুজি বলিয়া ফেলিল,—

"কিন্তু উনি ত' আমাকে চান না। যে-আমি সাধারণ মানুষ, ঘরের মেয়ে, তাকে উনি দেখতে পেয়েছেন ব'লে মনেই করিনে। আমি যেই ওঁর মনকে স্পর্শ করেচি, অমনি ওঁর মন অবিরাম অজস্র কথা ক'য়ে উঠেছে। সেই কথা দিয়ে উনি কেবলি আমাকে গ'ড়ে তুলচেন।···বিয়ে করলে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গ'ড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না।"

তারপর অমিত বাসা বদল করিল। যোগমায়া সেই ভাঙ্গা ঘরে লাবণ্যকে লইয়া গিয়া অমিতের হাতে সম্প্রদান করিলেন। কলিকাতায় মুক্তা-বসান আংটির অর্ডার গেল। "ঠিক হয়ে গেলো আগামী অঘ্রাণ মাসে এদের বিয়ে। যোগমায়া কলকাতায় গিয়ে সমস্ত আয়োজন করবেন।" এখন সহজেই মনে প্রশ্ন উঠে, হঠাৎ এটা হইল কি? আমরা বলিব, এটা হ'ল সৃষ্টি-বিভ্রাট, তার পর ঘটিয়াছিল বিবাহ-বিভ্রাট। সাত বৎসর পূর্বে অমিত যখন অক্সফোর্ডে ছিল, তখন সেখানে কে, টি, মিটার (কেতকী মিত্র) নাম্নী একটি বাঙ্গালী মেয়ে ছিল। অক্সফোর্ডে "একজন পাঞ্জাবী যুবক ছিল কেটির প্রণয়-মুগ্ধ।" একদিন অমিতের সঙ্গে আপোষে সেই পাঞ্জাবী যুবকের নৌকা-বাচখেলা হইয়াছিল, এবং অমিত জিতিয়াছিল। ইহাতে সে কেটিকেও জিতিয়া লইল এবং তাহার হাতে আংটি পরাইয়া দিল। অমিতের বোনেরা এবং কেটি যখন শুনিল, লাবণ্যের সহিত অমিতের বিবাহ স্থির, তখন তাহারা শিলং-এ আসিল এবং একদিন যোগমায়ার বাসায় গিয়া কেটি সকলের সামনে আংটিটি টেবিলের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল। ইহার ফলে লাবণ্যের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল।

যোগমায়া এক সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি। তিনি "হোটেলে চপ্-কাটলেট্ খাওয়া রামলোচন বাঁড়ুজ্যের কন্যা।" রামলোচন বাঁড়ুজ্যে, হোটেল ছাড়া আর কোথাও, বিশেষতঃ বাড়িতে চপ-কাটলেট্ খাইতেন কিনা, গ্রন্থকার তাহা সুস্পষ্ট করিয়া লেখেন নাই। সুতরাং চপ-কাটলেটের এনভাইরনমেণ্ট (environment) বা

সৎসঙ্গে যে যোগমায়ার শৈশব কাটিয়াছিল এমন কোন প্রমাণ নাই। যোগমায়ার স্বামী বরদাশংকর—

"মনসাকেও হাত জোড় করেন, শীতলাকেও মা ব'লে ঠাণ্ডা করতে চান, মাদুলি ধুয়ে জল খাওয়া সুরু হলো, সহস্র দুর্গানাম লিখতে লিখতে দিনের পূর্বাহ্ণ যায় কেটে,"...

"অতি অল্পকালের মধ্যেই ক্রিয়াকর্মে, জপে, তপে, আসনে, আচমনে, ধ্যানে, স্নানে, ধূপে, ধুনোয়, গো-ব্রাহ্মণ-সেবায় শুদ্ধাচারের অচল দুর্গ নিশ্ছিদ্র ক'রে বানালেন। অবশেষে গো-দান স্বর্ণদান ভূমিদান কন্যাদায় পিতৃদায় মাতৃদায় হরণ প্রভৃতির পরিবর্তে অসংখ্য ব্রাহ্মণের অজস্র আশীর্বাদ বহন ক'রে তিনি লোকান্তরে গেলেন, তখন তাঁর সাতাশ বছর বয়স।"

৩৭ বৎসর পূর্বে চন্দ্রনাথ বসুর প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ যে সুর ধরিয়াছিলেন, এখানে তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। চরিত্র-সৃষ্টির বেলা যেমন রবীন্দ্রনাথ নিজেকে নিজে লঙ্ঘন করিতে অক্ষম, হিন্দুয়ানির বিচারকালেও তেমনি নিজেকে নিজে লঙ্ঘন করিতে অসম্মত। বরদাশংকর সাতাশ বছরে পৌঁছিবার পূর্বে যোগমায়ার কি দশা ঘটিয়াছিল? রামলোচন বাঁড়ুজ্যের বাড়ির বাইরে বেরোন' "মেয়ের শুচি সংস্করণে যাতে অনুস্বার বিসর্গের ভুলচুক না থাকে সে চেষ্টায় লাগলেন তাঁর স্বামী। সনাতন সীমান্ত রক্ষার নীতির অটল শাসনে যোগমায়ার গতিবিধি বিবিধ পাস্‌পোর্ট প্রণালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'লো। চোখের উপর তাঁর ঘোমটা নামলো, মনের উপরেও।...এই পৌরাণিক লোহার সিন্ধুকের মধ্যে নিজেকে সেফ্‌ডিপজিটের মতো ভাঁজ করে রাখা যোগমায়ার পক্ষে সহজ ছিল না, তবু বিদ্রোহী মনকে শাসনে রেখেছিলেন। এই মানসিক অবরোধের মধ্যে তাঁর একমাত্র আশ্রয় ছিলেন দীনশরণ বেদান্তরত্ন।" দীনশরণ পণ্ডিত যোগমায়াকে বলিতেন, হিন্দুর ক্রিয়াকর্ম জঞ্জাল,—কিছু নয়, এবং কখনও গীতা কখনও ব্রহ্মভাষ্য ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন। তারপর—

"এমনি ক'রে কিছুকাল নিরবকাশ ব্রত-উপবাসের মধ্যে পঞ্জিকার শিকলি-বাঁধা দিনগুলো কোনোমতে কেটে গেলো। জীবনটা আগাগোড়াই হ'য়ে উঠল আজ-কালকার খবরের কাগজি কিম্ভূত ভাষায় যাকে বলে 'বাধ্যতামূলক'। স্বামীর মৃত্যুর পরেই তাঁর ছেলে যতিশংকর এবং মেয়ে সুরমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। শীতের সময় থাকেন কল্‌কাতায়, গরমের সময়ে কোনো একটা পাহাড়ে।"

দেখা যাইতেছে, বরদাশংকর যত দোষই করিয়া থাকুন, এই বেরিয়ে পড়ার—কলিকাতায় এবং পাহাড়ে আনাগোনার খরচার টাকাটা রাখিয়া গিয়াছিলেন। বরদাশংকরের মৃত্যুর সময় যোগমায়ার বয়স বোধ হয় বিশের কম ছিল না এবং পঁচিশের বেশী ছিল না। তারপর ১৫।২০ বৎসর পরে যোগমায়ার দেখা পাই আমরা শিলং-এর একটি বাড়িতে।

"চল্লিশের কাছাকাছি তাঁর বয়স, কিন্তু বয়সে তাঁকে শিথিল করেনি, কেবল তাঁকে গম্ভীর শুভ্রতা দিয়েচে। গৌরবর্ণ মুখ টস্‌টস্ করচে। বৈধব্য-রীতিতে চুল ছাঁটা; মাতৃভাবে পূর্ণ প্রসন্ন চোখ; হাসিটি স্নিগ্ধ।"

"পায়ে জুতো নেই (ফ্যাশান), দুটি পা নির্মল সুন্দর।" যোগমায়া সকালে স্নান করে, এবং ফুল তুলিয়া আহ্নিকও (পূজা) করে। মোটরে ধাক্কা লাগার পর অমিত যখন লাবণ্যের সঙ্গে যোগমায়ার বাসায় আসিল তখন—

"অমিতর সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ হ'তে না হ'তেই তিনি ঠিক করে বসে আছেন এদের দুজনের বিয়ে হওয়া চাই।"

যদিও বিবাহটা ফ্যাশানের সামিল, তথাপি যোগমায়ার অমিতের সঙ্গে লাবণ্যের বিবাহ ঘটাইবার সংকল্পকে স্টাইল বলা যাইতে পারে, কারণ, ইহাতে দশের অর্থাৎ বর-কন্যার আত্মীয়স্বজনের মন রাখার কোন কল্পনাই ছিল না। বরদাশংকরের মৃত্যুর পর, ১৫।২০ বৎসরকাল যোগমায়া যে কিভাবে জীবন যাপন করিতেছিলেন, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু তাঁহার পূর্বেকার অবস্থার কথা স্মরণ করিলে মনে হয়, হিন্দু সমাজের কতকগুলি শাসন তাঁহার অভ্যাসসিদ্ধ হওয়া সম্ভব। দীনশরণ বেদান্তরত্নের উপদেশ সত্ত্বেও যোগমায়া আহ্নিক করিতেন, এবং ফুল যখন তুলিতেন, তখন বোধ হয়, পূজাও করিতেন। এইরূপ চরিত্রের প্রৌঢ়া বিধবার পক্ষে বর-কন্যার আত্মীয়স্বজনকে উপেক্ষা করিয়া সম্বন্ধ ঠিক করা অনেকটা অস্বাভাবিক মনে হয় নাকি?

তারপর যেদিন লাবণ্য অমিতের বুকে মাথা রাখিয়া নিজের আঙুল হইতে অমিতের দেওয়া আংটি খুলিয়া বিনা বাধায় তাহার হাতে পরাইয়া দিল, তাহার সাত দিন পরে অমিত যোগমায়ার বাসায় গিয়া দেখিল, "ঘর বন্ধ, সবাই চ'লে গেছে। কোথায় গেল, তার কোনও ঠিকানা রেখে যায় নাই।" তারপর এই পরিবারের একজন যতিশংকরের দেখা পাই কলুটোলায় প্রেসিডেন্সি কলেজের মেসে। অমিত তাহাকে প্রায়ই বাড়িতে লইয়া আসেন। ক্রমে সে অমিতের

ছোট বোন্ লিসির স্বহস্তে ঢালা চা খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কেটি মিত্রের সঙ্গে অমিতের বিবাহ ঠিক হইল। লাবণ্যের সহিত শোভনলালের বিবাহের খবরও আসিল। কিন্তু কেহ আর যোগমায়ার নাম মুখে আনিল না; তাঁহার পাতান বোন্‌পো অমিতও অনিল না; তাঁহার পুত্র যতিশংকরও না। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উপন্যাসের শেষভাগে যোগমায়ার জন্য কোন স্থান করিতে পারেন নাই, তাই যতিশংকরকে প্রেসিডেন্সি কলেজের মেসে রাখিয়া যোগমায়াকে সৃষ্টি-ছাড়া করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে, এত ত্রুটি সত্ত্বেও 'শেষের কবিতা' কাব্যাংশে মন্দ নহে। কবি যাহা দেখাইবার জন্য এই উপন্যাস রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, পুরুষ কবি যদি স্বাধীনভাবে সুশিক্ষিতা যুবতীর সহিত মেলামেশা করিতে পারেন, এবং ভালবাসাবাসির খেলা খেলিতে পারেন, তবে অতি সহজে তাঁহার কবিত্বশক্তি উদ্দীপিত (inspired) হইতে পারে। গোল বাধিয়াছে বিবাহ লইয়া। লাবণ্য এবং কেটি মিটার এই দুইজনের মধ্যে কেহই 'সবলা' ছিলেন না; ইঁহারা কেহই বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিতে পারিতেন না—

> "যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে
> কিঙ্কিণী,
> আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।"

লাবণ্য এবং কেটি উভয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে অবলা বলিয়াই 'শেষের কবিতা' গল্পে বিবাহ-বিভ্রাট অনিবার্য হইয়াছে। যিনি নিজেকে নিজে লঙ্ঘন করিয়া অপরকে বুঝিতে অসমর্থ, তিনি আত্মপ্রকাশে যতই পটু হউন, সাহিত্যগুরুর পদারূঢ় হইয়া তিনি যদি অপরকে আত্মপ্রকাশের পথ দেখাইতে যান, তবে বিভ্রাট অবশ্যম্ভাবী। রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ করিতে গিয়া অনেক উদীয়মান সাহিত্যিকের সর্বনাশ ঘটিয়াছে; রবীন্দ্রনাথের হৃদয়বৃত্তির জারক-রসে জারিত হইয়া তাঁহারা আলোহীন তাপবিহীন রবিখণ্ডে পরিণত হইয়াছেন।

হিন্দুর উত্তমাঙ্গের দিকে রবীন্দ্রনাথের চক্ষু মুদ্রিত দেখিয়া চন্দ্রনাথ বসু ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। 'শেষের কবিতা' এবং রবীন্দ্রনাথের এই শেষ কালের কবিতা পাঠ করিলে মনে হয়, সে চক্ষু এখনও মুদ্রিত রহিয়াছে।

শেষের কবিতা

মোহিতলাল মজুমদার

সাহিত্যের আদর্শ লইয়া নানা দলের রচনা কিছুকাল হইতে কবির মনে অশান্তির সৃষ্টি করিতেছিল ; চারিদিক হইতে ভক্ত ও অভক্তের উৎপীড়নে তিনি কখনও বামে কখনও দক্ষিণে হেলিতেছিলেন। আসনখানিতে অটল হইয়া থাকিলেও এই ভূত-প্রেত-প্রমথগণের দৌরাত্ম্য তাঁহাকে যে একটুও চঞ্চল করে নাই, এমন কথা বলিলে কবিকে অসম্মান করাই হইবে। কারণ, বাংলা-সাহিত্যের অতি-আধুনিক গতি-প্রকৃতির দিকে একবার যখন তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছে, তখন—ব্যাপারটা যে অতিশয় তুচ্ছ—এমন কথা ভাবিতে তিনি পারেন নাই, বরং তাহাকে বুঝিবার ও তাহার সম্বন্ধে নিজের ধারণা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা তিনি এই স্বল্পকালের মধ্যে নানা উপলক্ষে ও নানা প্রবন্ধে করিয়াছেন। যাহারা এই সাহিত্য রচনা করে ও তাহার গুণগানে পঞ্চমুখ, এবং যাহারা তাহা রচনা করে না ও তাহার নিন্দায় দশমুখ, এই উভয় দলের কাহারও সহিত তাঁহার বনিল না, কারণ তিনি আজীবন সরস্বতীরই সেবা করিয়াছেন। সে-সরস্বতী মল্লভূমির অধিষ্ঠাত্রী নহেন ; তাঁহার পূজায় যে অভ্র-আবীর লাগে তাহার একটি—বর্ণের, অপরটি—আলোকের প্রতীক। তাই সরস্বতীর নামে যখন দুষ্ট-সরস্বতীর পূজা চলিতেছে, এবং যখন সেই পূজায় এক-পক্ষ পাঁক, গোবর ও ঘেঁটুফুল সাজাইতেছে, এবং অপর-পক্ষ আসল দেবতার নাম না লইয়া অপদেবতা-দমনের জন্য ক্রমাগত মারণ-মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে, তখন দেবীর একনিষ্ঠ পূজারী স্থির থাকিতে পারেন নাই। আজ দেখা যাইতেছে, কবি আত্মস্থ হইয়াছেন ; যে আনন্দে কবির মুক্তি—সেই রসসৃষ্টির আনন্দে কবি বাস্তবের সমস্যা উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

দ্রষ্টব্য : 'শেষের কবিতা.' 'প্রবাসী' মাসিক পত্রিকায় ১৩৩৫ সালের ভাদ্র হইতে চৈত্র পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহাকে গদ্য-পদ্যময় চম্পূকাব্য বলিয়া অভিহিত করেন। এই উপন্যাসটির অন্তর্গত 'ঝরনা'র উপর লিখিত একটি কবিতা সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় একাধিক মন্তব্য আত্মপ্রকাশ করে।

যে বৎসর 'শেষের কবিতা' প্রকাশিত হয়, সেই ১৩৩৬ (ইং ১৯২৯) সালটি রবীন্দ্রনাথের একাধিক গ্রন্থ প্রকাশের দিক হইতেও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উক্ত বৎসরের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'যাত্রী'

'শেষের কবিতা'র যেটুকু পড়িলাম তাহাতেই বুঝিতেছি, এই আঘাত ও বৃথা-বিতর্কের ক্ষোভ তাঁহার চিত্ততলে কোন্ রসের সঞ্চার করিতেছিল। সকল রূঢ়তা, নির্লজ্জতা ও নির্মমতার উপরে তিনি একটি তীক্ষ্ণ, বিদ্রূপগুণ্ঠিত করুণ হাস্য বিকীর্ণ করিয়াছেন; রসে ও রূপে, ছন্দে ও দীপ্তিতে এ রচনা ঝলমল করিতেছে। বিতর্ক ও বচসার ক্ষেত্রে যে বস্তু অতিশয় কঠিন ও কর্কশ হইয়া উঠিয়াছে, কবি-কল্পনা তাহারই একটি রস-রূপ আবিষ্কার করিয়াছে। সহসা একটি বিদ্যুৎশিখা ভাবঘন পুঞ্জমেঘ বিদীর্ণ করিল,—অমনি মন্ত্রধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ধারাবর্ষণ শুরু হইয়াছে, গুমট ভাঙ্গিয়াছে, ধূলি-ঝঞ্ঝার ঘূর্ণানৃত্য আর আমোল পাইবে না। কবি এখন মুক্ত, তৃপ্ত; যাঁহারা রসিক তাঁহারাও কৃতার্থ হইলেন।

আমাদের সৌভাগ্য যে কবি এখনও বাঁচিয়া আছেন,*—এখনও এমন করিয়া আমাদের দুঃস্বপ্ন দূর করিতেছেন। 'শেষের কবিতা' পড়িতে পড়িতে মনে হয়—

"বিপাকের বিভীষিকা রজনীর 'পরে
করধৃত-শুকতারা শুভ্র উষাসম
কে তুমি উদিলে আসি—?

কবির সঙ্গে আমরাও কবি-স্বর্গে উত্তীর্ণ হই,—কল্পনার যাদুবলে, রসের অতর্কিত সংক্রমণে, ভাষার মণিশিলাবিচ্ছুরিত বিদ্রূপচ্ছটায় যেন নিমেষে নিরাময় হইয়া যাই—বাস্তবের তুচ্ছতা, মলিনতা ও সংকীর্ণতার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়। ইহাই কাব্য, এই কাব্য আছে বলিয়াই আমরা জীবন-যুদ্ধে

('পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি' ও 'জাভা যাত্রীর পত্র'); 'পরিত্রাণ' নাটক ('প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের পরিবর্তিত রূপ); আষাঢ় মাসে 'যোগাযোগ' উপন্যাস; ভাদ্র মাসে 'শেষের কবিতা' উপন্যাস; 'তপতী' নাটক ('রাজা ও রাণী'র আখ্যানভাগ অবলম্বনে গদ্যনাট্য); আশ্বিনে 'মহুয়া' কবিতা এবং বৎসরের শেষে চৈত্র মাসে 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' প্রকাশিত হয়।

সুকুমার সেন এই গ্রন্থ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন—

"বৈষ্ণব সাধনার 'পরকীয়া' তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসে যেভাবে রূপান্তর লাভ করিয়াছিল, 'শেষের কবিতা'য় তারই পরিচয় পাই। ইহাতে অতি-আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্যের এবং সমাজের ফ্যাশানের কৃত্রিমতার উপর কটাক্ষ আছে।"

'শেষের কবিতা'র এই আলোচনাটি মোহিতলাল মজুমদার 'রডোডেনড্রন-গুচ্ছ' নামে প্রথম প্রকাশ করেন সাময়িক পত্রে এবং পরবর্তীকালে তাঁহার 'রবি-প্রদক্ষিণ' নামক গ্রন্থে সংক্লিষ্ট হয়।

* প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় কবির জীবদ্দশায়।

ক্ষণেক বিশ্রামসুখ উপভোগ করি। দিবাবসানে রণশ্রান্ত সৈনিক যখন ধূলিশয্যায় নিষণ্ণ হয়, তখন নক্ষত্রখচিত নৈশাকাশ তাহার চক্ষে যে পরিপূর্ণ শান্তি উন্মীলিত করে, যে স্বপ্নাঞ্জন পরাইয়া দেয়—এ সেই বেদনা-হরণ সুধা। তর্কে যাহার মীমাংসা হয় না, শাস্ত্র যাহাকে শাসন করিতে পারে না, সুবুদ্ধি যেখানে সংশয়যুক্ত—যেখানে জিজ্ঞাসার তৃপ্তি নাই, সেখানে রসই মুহূর্তে নিশ্চিন্ত করিয়া দেয়। অন্তরের অন্তস্তলে যে আনন্দ জাগে তাহাতে সকল দ্বন্দ্ব উবিয়া যায়, সমাধানের অপেক্ষাও রাখে না। যেখানে এই অবস্থা হয়, সেখানে বাক্য অন্তর্ধান করে এবং বাণীর অধিষ্ঠান হয়,—যাহা অনির্বচনীয় তাহাই অন্তরকে নির্বাক করিয়া দেয়। আমাদের কাব্য-কলহে কবি এতদিন কূল পাইতেছিলেন না, আজ সেই কলহকেই তিনি রূপান্তরিত করিয়াছেন—কাগজের মসীচিহ্নগুলিই হঠাৎ তাঁহার চক্ষে সঙ্গীতের স্বরলিপি হইয়া উঠিয়াছে, বাদ-বিসম্বাদের উদ্যত ও উদ্ধত যুক্তি এবং কুযুক্তি মৃণালশোভী কণ্টকের মত জলতলে নির্বাসিত হইয়াছে!

এমনই হয়, কাব্যের এই যাদুশক্তির কথা কে না জানে? কবিরই কি এ কাজ নূতন? সারাজীবন তিনি কি এই কাজই করিয়া আসিতেছেন না? বাস্তবের এই বাধা, এই ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার গ্লানি যখনই তাঁহাকে পীড়িত করিয়াছে, তিনি ক্ষণমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছেন—কিন্তু তখনই তাঁহার কল্পনা-বিহঙ্গী সবলে পঙ্কজড়িমা দূর করিয়া ঊর্ধ্বাকাশে বিচরণ করিয়াছে। যখনই মনে হইয়াছে—

লাভক্ষতি-টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ ভাগ,
কলহ সংশয়—
সহে না সহে না আর—জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি'
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

'রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা' গ্রন্থে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'বাঁশরী' নাটক প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"শেষের কবিতার অমিত লাবণ্যকে এবং লাবণ্য অমিতকে ভালোবাসিয়াছিল। লাবণ্যই অমিতের রস রুচিসর্বস্ব পরিবর্তনশীল আর্টিষ্টের প্রকৃতিকে ভয় করিয়া, বিবাহের বন্ধনদ্বারা এই প্রেমের অমর্যাদা হইবে মনে করিয়া স্বেচ্ছায় তাহাকে ত্যাগ করিল।...শোভনলালও লাবণ্যের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা বুকে করিয়া দীর্ঘদিন অপেক্ষা করিয়াছিল। দুইটি বিবাহেই একপক্ষ ভালোবাসিয়াছিল, সুতরাং এইরূপ বিবাহের ফাঁকিটা আমাদের বিশেষ নজরে পড়ে না। তারপর ইহা উচ্চাঙ্গের শিল্প-সৃষ্টি এবং গল্পের বিশ্লেষণের দ্বারা চরিত্রগুলির স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে।"

তখনই সেই আর্তস্বরের মধ্যেই সুধানিস্যন্দিনী বাণীর আবির্ভাব হইয়াছে, বেদনার তীর্থজলে আনন্দের অভিষেক হইয়াছে। তথাপি, আজিকার এই অভিনব স্বপ্ন-প্রয়াণের মধ্যে কবি-মানসের এমন একটি পরিচয় আছে যে, মনে হয়, কবির প্রাণটিকে আমরা আরও স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইতেছি। বাহিরের আঘাত চিরদিনই কবিকে আরও বেশী করিয়া অন্তরের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে; 'প্রত্যহের কুশাঙ্কুর' তাঁহার চরণে যখনই বিঁধিয়াছে তখনই তিনি দেশ ও কাল অতিক্রম করিয়া শাশ্বত-সুন্দরের আরতি করিয়াছেন। তাঁহার অসংখ্য রচনায় সেই কুশাঙ্কুরের ক্ষতচিহ্ন আমরা খুঁজিয়া পাই না। সে ব্যথা এতই বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার স্পন্দন-পরিধি এতদুর বিস্তৃত হইয়াছে যে, তাহার উৎপত্তি বা কেন্দ্রবিন্দু আর লক্ষ্য করা যায় না। 'শেষের কবিতা'য় সেই ব্যথার চিহ্ন আছে; সেই ব্যথাকে কবি কেমন করিয়া আত্মস্থ করিতেছেন—তাহার হৃদয়ের রসায়নাগারে তাহার সেই রস-পরিণতির প্রক্রিয়াটিকে আমরা যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই কারণেই এ রচনায় রসের একটি নূতনতর স্বাদ আছে।

গল্পটির যতটুকু আমরা এ পর্যন্ত পড়িয়াছি তাহাতে একটা বিষয়ে আমাদের কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। অতি-আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে যে অক্ষমতার দম্ভ ও নবত্বের প্রমত্ততা আছে তাহার অন্তর্গত ভঙ্গীটিকে কবি এই গল্পে একটি বিশেষ রূপ দিয়াছেন—একটি অভিনব চরিত্র-রূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই চরিত্রের পরিকল্পনায় কবি শ্রীহীন বাস্তবকে একটি শ্রী ও সুষমায় মণ্ডিত করিয়াছেন। যে-বাস্তবের সঙ্গে আমরা পরিচিত, কবির রস-কল্পনা তাহাকেই রূপান্তরিত করিয়াছে —তাহার মধ্যে যে হৃদয়-দৌর্বল্য, মনের অপরিচ্ছন্নতা ও চিন্তার দৈন্য আছে, তাহাই তাঁহাকে পীড়িত করিয়াছিল। তাই কবি তাঁহার ভাবদৃষ্টি প্রসারিত করিয়া ইহার অন্তরালে, সকল অক্ষমতার মধ্যে, একটি প্রাণের আকুতি আবিষ্কার করিলেন। না করিয়া উপায় নাই,—যাহা ভগ্ন, অসম্পূর্ণ, তাহাকে সম্পূর্ণ করিয়া না লইলে কবির শান্তি বা সান্ত্বনা নাই। বাংলার সাহিত্য-পল্লীতে শীত-সন্ধ্যায় যে ধূমবাষ্প উত্থিত হইতেছে তাহার মধ্যস্থলে বাস করিলে শ্বাসরোধ হয় বটে, কিন্তু একটু দূর হইতে চাহিয়া দেখিলে দেখা যায়, সেই ধূম একটি নীল মণ্ডল-রেখায় গ্রামখানিকে বলয়িত করিয়াছে। অস্তমিত সূর্যের শেষ আভায় সে দৃশ্য যথার্থই সুন্দর। যাহা ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত কুণ্ডলায়িত অবস্থায় অসম্পূর্ণ ও নিরর্থক, তাহাই

দূর হইতে দেখিলে সুনীল ও মণ্ডলাকার। বিরূপের মধ্যেও এমনই একটি রূপের লীলা রহিয়াছে,—জগতের কোন কিছুই সুষমাহীন নয়। তাই অসংখ্য বিকট ও বিরূপের একাকার হইতে কয়েকটি ভাঙা ও টুকরা উপাদান সংগ্রহ করিয়া, কবি একটি রস-রূপের প্রতিষ্ঠা করিলেন—তাহার নাম 'অমিত রায়'।

যে পরম আদর্শের সাধনা কবি আজীবন করিয়াছেন, যাহাকে নিজের দেব-দুর্লভ প্রতিভায় তিনি বঙ্গবাণীর রূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার প্রতি নব-নবীনের এই শ্রদ্ধাহীনতায় কবি কতখানি ব্যথা পাইয়াছেন, তাহা আমরা জানি। তাঁহার মনের এই অভাবাত্মক গ্লানি আবার সেই নিয়ত উৎসারিত ভাবধারায় ধুইয়া-মুছিয়া গেল; বাহিরের এই বাস্তব 'experience'-টিকে তিনি তাঁহার দিব্যানুভূতির দ্বারা 'perfect' করিয়া লইলেন, এই 'flying vapours'-কে একটি 'art pattern'-এ বাঁধিয়া ফেলিলেন; কুশাঙ্কুর পুষ্পকেশরে পরিণত হইল।

যৌবনের দম্ভকে সংসার-পণ্ডিত সহ্য করিতে পারে না—কান মলিয়া দিতে অগ্রসর হয়। দার্শনিক তাহাকে একেবারেই উপেক্ষা করে; দার্শনিক যে সত্যের সন্ধানে নিযুক্ত সে দেশকাল-নিরপেক্ষ একটা অমোঘ অব্যর্থ তত্ত্ব; তাই সকল বৈচিত্র্যই তাহার চিত্তবিক্ষেপের কারণ। কিন্তু কবির ধর্ম যুক্তি নয়, অনুভূতি। যে নিয়ম বা তত্ত্বকে বুঝিতে হইলে সকল বৈচিত্র্যকে একাকার করিয়া দেখিতে হয়, কবির দৃষ্টি তাহাতে নিবদ্ধ নয়। তিনি সেই নিয়মকে উপলব্ধি করেন আর এক রূপে। তাঁহার কাছে সে বস্তু পরমাশ্চর্য, তাহা দেশে ও কালে পরিব্যাপ্ত—সর্ব-বিরোধের মধ্যেই একটি সংগতি রক্ষা করিতেছে। বিচিত্রকে একাকার করিয়া যে-ঐক্য তাহা সে-ঐক্য নয়, তাহা একই কালে—এক ও বিচিত্র। তাহার প্রবাহ নতোন্নত,—তরঙ্গধারার মত; তাহার যে অংশই পৃথক করিয়া দেখি, তাহারই মধ্যে সেই সমগ্রতার ছন্দ রহিয়াছে। এই অদ্ভুত বস্তুর নাম প্রাণধারা। ইহাকে ব্যাকরণ-শাসিত বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব, যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিবে কে? বিশ্বের এই প্রাণস্পন্দনকে প্রাণের মধ্যেই অনুভব করা সম্ভব। কবিই ইহাকে অনুভব করেন, ও প্রকাশ করেন ছন্দে। যাহা তোমার আমার কাছে অসংগত, প্রাণমন্ত্রে দীক্ষিত কবির চক্ষে তাহার মধ্যেই সংগতি ধরা পড়ে।

সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বিশ্বায়ত প্রাণধারার প্রবল পরিচয় পাওয়া যায় তাহার যৌবনে। যৌবন সর্বপাবন, তাহার অগ্নিতাপে নিকৃষ্ট ধাতুও

আলোক বিকিরণ করে। তাই এই যৌবনের প্রতি কবির একটি বিশেষ মমতা আছে; কারণ তাহার দম্ভের মধ্যেও একটা প্রবল প্রাণের বেগ আছে। যখন শাশ্বতকে অস্বীকার করিয়া সে ক্ষণিকের জয়গান করে, তখন কবির প্রাণে রস উছলিয়া উঠে, কবি তাহার মধ্যে একটি অপূর্ব সংগতি লক্ষ্য করেন। যৌবন যাহাকে অস্বীকার করে—অস্বীকার করে বলিয়াই তাহার সম্মান বৃদ্ধি হয়! বিরোধের দ্বারা সে যাহাকে উৎক্ষিপ্ত করে, তাহাকেই সে উজ্জ্বল করিয়া তোলে। যৌবনের এই বিমূঢ়তা, এই আত্মবিস্মৃতিই পরম কৌতুককর। বিশ্বব্যাপ্ত বৈচিত্র্য, বৈষম্য ও বন্ধুরতাই যে প্রাণের ছন্দ—বা ছন্দেরই প্রাণ! যৌবনের বিদ্রোহের মধ্যে এই সত্যের প্রতিই loyalty আছে, —ছন্দকে ভাঙিয়াই এই যে ছন্দানুসরণ, বিদ্রোহাচরণের দ্বারাই এই যে বশ্যতা—ইহাই তো লীলা! যাহাকে প্রতি মুহূর্তে মানিতেছি, যাহাকে না মানিয়া উপায় নাই—যিনি পরমপ্রিয় প্রাণেশ্বর, তাঁহারই গোপন ইঙ্গিতে তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া এই যে নৃত্য, এ যে তাঁহাকেই বেড়িয়া বেড়িয়া করিতেছি,—এ আনন্দ যে তাঁহাকেই সমর্পিত হইতেছে!

'অমিত রায়ে'র মধ্যে এই আত্ম-বিরোধের লীলা কবি পরম কৌতুকসহকারে উপভোগ করিতেছেন। যৌবনের অবিমৃষ্যকারিতার মধ্যে যে রস আছে, শুধু তাহাই নয়—একটা সজ্ঞান বিরোধ, আত্মপ্রবঞ্চনার জিদ, জাগিয়া ঘুমাইবার চেষ্টাও কবি তাহাকে যোগ করিয়া দিয়াছেন। বাংলাদেশের বর্তমান সাহিত্যিক আবহাওয়ায়, সুন্দরের প্রতি যে একটা আক্রোশের ভাব আছে, তাহার মূলে আছে অ-শিক্ষার বর্বরতা। ইহাকে ভর্ৎসনা করা চলে, মাষ্টারী করা ছাড়া ইহার সম্বন্ধে আর কোন ব্যবস্থা নাই। ইহাকে লইয়া যে রসের সৃষ্টি হইতে পারে তাহাও অতিশয় প্রাকৃত-জনসুলভ বিদ্রূপ-রস, কবির পক্ষে তাহা উপাদেয় নয়। তাই কবি এই বাস্তবকে একটা সুদৃশ্য pattern-এ বুনিয়া তুলিলেন। অমিত রায়—আর যাই হোক, বর্বর নয়। সুন্দর কি, সে তা জানে। সেও স্বপ্ন দেখে—

"কিন্তু লিলি, কোটি কোটি যুগের পর যদি দৈবাৎ তোমাতে আমাতে মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যের ছায়ায় তার কোন-একটা হাজার-ক্রোশী খালের ধারে মুখোমুখি দেখা হয়, আর যদি শকুন্তলার সেই জেলেটা বোয়াল মাছের

পেট চিরে আজকের এই অপরূপ সোনার মুহূর্তটিকে সামনে এনে ধরে, চমকে উঠে মুখ-চাওয়া-চাউয়ি করব, তারপরে কি হবে ভেবে দেখ!"

—কাব্য ইহার চেয়ে বেশী সুন্দর আর কি হইবে? যে-রবিঠাকুরের বিরুদ্ধে সে কোমর বাঁধিয়া তর্ক করে, তাঁহার কাব্য-কল্পনার অপরাধ কি ইহার চেয়েও গুরুতর? বরং, ইহাই মনে হয় যে, রবিঠাকুরের কাব্যরসে তাহার চিত্ত ভরপুর; রবিঠাকুর তাহার মনোহরণ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার প্রতি এত আক্রোশ। সে যখন বলে—"ফজ্‌লি আম ফুরোলে বলব না, আনো ফজ্‌লিতর আম, বলব, নতুন বাজার থেকে বড় দেখে আতা নিয়ে এত ত হে," তখন সে নিশ্চয় জানে, ফজ্‌লি আমের সময় ফজ্‌লি আম প্রতি বৎসরই নূতন হইয়া দেখা দিবে; সে বুদ্ধিমান—ফজ্‌লিতর কিছু সে চায় না, সে চায় স্বাদ বদলাইতে। সে ভোগক্লান্ত blasé নয়, রসনাকে একটু চান্‌কাইয়া লইতে চায় মাত্র। এই spirit of contradiction তাহার যৌবন-ধর্ম,—সে রবিঠাকুরকে অর্থাৎ আপনাকেই contradict করিয়া সুখ পায়, তাই রবিঠাকুরের বিরুদ্ধে তাহার যুক্তিগুলি এমন তীক্ষ্ণ, অথচ absurd। মনে হয় 'অমিত রায়' কবির নিজেরই একটি complex। যৌবন ধর্মের প্রতি তাঁহার নিজের যে একটা নিগূঢ় সহানুভূতি আছে, আবার জীবনের ক্ষেত্রবিশেষে তাহার একরূপ ব্যাধির প্রতিও তাঁহার যে কুণ্ঠার ভাব আছে—এই উভয়ের রাসায়নিক সংযোগে তিনি নিজেরই একটি মানস-আত্মীয়কে মূর্তি ধারণ করাইয়া রস-পিপাসা মিটাইতেছেন।

কারণ, বাহিরে কোন বাস্তব 'অমিত রায়' নাই। বাহিরে যে যৌবন নবত্বের দম্ভ করিতেছে, তাহার মধ্যে ব্যাধি আছে, বোধশক্তি নাই। সে কখনও ফজ্‌লি আম খায় নাই—যাহার স্বাদ সে জানে না, তাহার বদলে আতাই বা চাহিবে কেন? সে ফজ্‌লিও বোঝে না, আতাও বোঝে না—স্বাদ বদলাইবার জন্য সে বড়জোর সোনার বদলে আঁশ-ফল চাহিবে। একথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, 'অমিত রায়' নামক ব্যক্তিটির মধ্যে একটু বাস্তবের ছায়া আছে, অথচ কায়ার সঙ্গে ছায়া যেন একটুও মেলে না। ইহাই রসসৃষ্টির রহস্য। 'A poem is a very image of life'—বলিলে কথাটা হঠাৎ স্বীকার করিতে বাধে, কিন্তু তার সঙ্গে যদি যোগ করা যায়—'expressed in its eternal truth,' তবে আর বাধে না। নবত্বের দম্ভের

উপর কবি যে একটি কঠোর অথচ সহানুভূতি-কাতর হাস্য বিকীর্ণ করিয়াছেন, তাহার দ্বারাই তিনি উহার eternal truth-টিকে ধরিয়া দিয়াছেন। 'অমিত রায়'কে একটু দূরে ধরিয়া—তাহাকে যেমন একদিকে একটি সুতীক্ষ্ণ পরিহাসের অঙ্ক করিয়া তুলিয়াছেন, তেমনই, আর একদিকে তাহাকে অতিশয় অন্তরঙ্গ আত্মীয়রূপে বুকের কাছে টানিয়া লইয়াছেন; এজন্য তাহার পরিণামও যে পরম রমণীয় হইবে, এমন আশা করা যায়। এই বিরোধাভাসই গল্পটির প্রাণ। ইহার মধ্যে যে সত্যটি কৌতুক-কটাক্ষে উঁকি মারিতেছে, তাহাই কবি-কল্পনার আবিষ্কার। সকল বাস্তবের এই রূপান্তরই তাহার সত্যকার রূপ, এই জন্যই সকল কাব্যই—'is a very image of life expressed in its eternal truth।'

'অমিত রায়ে'র আত্মবিরোধের মধ্যে যে কৌতুকরস ঘনাইয়া উঠিয়াছে তাহা কি অনেকটা সজ্ঞান নহে? ইহার কারণ, কবি তাহাকে আপনারই সত্তায় সত্তাবান করিয়াছেন। কবি যেন 'অমিত রায়' হইয়া এই নবত্বের উৎসাহে নিজেও মাতিয়া উঠিয়াছেন। ইহার মধ্যে যে হাস্যকর absurdity আছে,—রবিঠাকুরের বিরুদ্ধে যে প্রকাণ্ড স্পর্ধার বিলাস আছে, সেটা কবিরও আত্মদ্রোহ বটে। কবি যেন বিপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রূপের খরশাণ শর যোজনা করিয়া আপনিই আপনাকে বিদ্ধ করিতেছেন, নবত্বের উন্মাদনাকে উপহাস করিতে করিতে আপনিও সেই উন্মাদনায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। সমগ্র রচনাটির রসকল্পনাই তাহার প্রমাণ বটে, কিন্তু তাহার চেয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। যে দুইটি কবিতায় তিনি এই নবত্বের ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার প্রথমটিতে বিরোধের আভাস আছে, নিজেকে বাঁচাইবার চেষ্টা আছে। কিন্তু দ্বিতীয় কবিতাটির মধ্যে যে পরিপূর্ণ সুরের আবেগ আছে—যে আশ্চর্য ছন্দের নৃত্য উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, তাহা খাঁটি subjective, অতিশয় personal ও sincere। 'অমিত রায়ে'র গান তিনি নিজের কণ্ঠে লইয়াছেন, এখানে আর এতটুকুও বিদ্রূপের আক্রু নাই।

"নাই আমাদের কনকচাঁপার কুঞ্জ;
বন-বীথিকায় কীর্ণ বকুলপুঞ্জ।

হঠাৎ কখন সন্ধ্যেবেলায়
নামহারা ফুল গন্ধ এলায়,
প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে
অরুণ মেঘেরে তুচ্ছ,
উদ্ধত যত শাখার শিখরে
রডোডেনড্রন্‌-গুচ্ছ ॥”

তাঁহার অন্তরের কবি-বাউলটি আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না, যৌবনের নবত্ব-লালসায় কবির প্রাণ অসংবৃত হইয়া পড়িল। এই কবিতাটির মধ্যে তাঁহার নিজেরই সেই নর-দুর্লভ যৌবন অতীত-জীবনের প্রান্ত হইতে প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে। পশ্চিমের অস্তরাগ যেমন পূর্বাকাশে প্রতিফলিত হইয়া উষার স্মৃতি জাগাইয়া তোলে, এই কবিতাটিতে আমরা তেমনই করিয়া কবির সেই যৌবন-উষার আভাস পাইতেছি। পশ্চিম-আকাশে অস্তমিত-প্রায় রবি পূর্বাকাশের স্বপ্ন দেখিতেছেন! কিন্তু উষার আর সে রূপ নাই। এ উষায় ‘কনকচাঁপার কুঞ্জ’ অথবা ‘বনবীথিকায় কীর্ণ বকুলপুঞ্জ’ একটি অতি কোমল শুভ্র রূপপ্রভায় চিরন্তনী কাব্যসুন্দরীকে বরণ করিতেছে না,—অতি স্নিগ্ধ মৃদু সৌরভে মুগ্ধ-হৃদয়ের প্রীতি জ্ঞাপন করিতেছে না। আজিকার উষায় ‘উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন্‌-গুচ্ছ’, ‘অরুণ মেঘেরে তুচ্ছ’ করিয়া রাগরক্ত নবত্বের জয়ধ্বজা তুলিয়াছে। ক্ষতি কি? কাব্যশ্রীর বধূজনোচিত ব্রীড়াকে যাহারা উপহাস করিতেছে, তাহারা যে যৌবনের আবেগেই আত্মহারা—মনের ঐশ্বর্য নয়, প্রাণের প্রাচুর্যই তাহাদের যৌবনধর্ম। এই আবেগ কবিতাটির ছত্রে ছত্রে যে ছন্দে উৎসারিত হইয়াছে, তাহা অর্থকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে,—পড়িবার সময়ে ছন্দের উন্মাদনাই যেন পাঠককে পাইয়া বসে, আর কোনদিকে মনঃসংযোগ করিতে ইচ্ছাই হয় না। এই একটি পদের ধ্বনি—‘রডোডেনড্রন্‌-গুচ্ছ’—শিরায় শিরায় স্পন্দিত হইয়া উঠে, ফিরিয়া ফিরিয়া কানে কানে বাজিতে থাকে—

“আমরা চকিত অভাবনীয়ের
কচিৎ কিরণে দীপ্ত।”

একদিন এমনি করিয়া কবির কাব্য পাঠ করিতাম। তখন অর্থ বুঝিতাম

না, বুঝিতে চাহিতাম না—ছন্দের অপরূপ লীলাই প্রাণের মধ্যে উৎসব করিত, যৌবনের মোহমদিরায় হৃদিপাত্র উচ্ছল হইয়া উঠিত। সে কি কুহক, কি অভাবনীয় স্বপ্নসম্ভার! সে-ভাষা কি অর্থের অপেক্ষা রাখিত! সে যেন রূপময়! বাংলা কবিতার সেই প্রথম অপ্সরী-বেশ দেখিলাম—ছন্দ তাহার চরণে নূপুর হইয়া বাজিতেছে! রূপময় বলিতেছি এইজন্য যে, সে-ভাষা যেন নৃত্যপরা অপ্সরার মতই ছন্দের উপর ভর করিয়া স্বপ্ন-সৌন্দর্যের হিল্লোল তুলিত, যেখানে যেটুকু অর্থের আভাস দিত সে যেন সেই ছন্দেরই রূপানুবাদ। আজ প্রতি কবিতার মূল প্রেরণা বুঝি, স্বপ্ন ও সংগীতের অন্তরালে কবি-হৃদয়ের যে রহস্যময় অনুভূতি রহিয়াছে তাহার অর্থ বুঝি; কিন্তু ভাষা ও ছন্দের যে কুহকে সদ্যবিকশিত প্রাণপদ্ম থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিত—আজ বিশ বছরের উজান ঠেলিয়া সেই যাদুস্পর্শটি একবার ফিরিয়া পাইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সে আর পাই না! সেই 'কনকচাঁপার কুঞ্জ' এবং 'বন-বীথিকায় কীর্ণ বকুলপুঞ্জ' একটি ঘনঘোর অশ্রু-কুয়াশার মধ্য হইতে অভিসার-সংকেত করিতেছে, কিন্তু সে পথ আর খুঁজিয়া পাই না! আজিকার দিনে সেই নবত্বের উন্মাদনা জাগাইবে 'রডোডেনড্রন্-গুচ্ছ'! অদৃষ্টের পরম পরিহাসই বটে। তথাপি এই 'রডোডেনড্রন্-গুচ্ছ'ই মুহূর্তের জন্য সেই ছন্দটিকে ফিরাইয়া আনিয়াছে, মুহূর্তের জন্য প্রাণের ভিতরে সেই সেকালের পুলক-নৃত্য জাগিয়াছে। তাই সব ভুলিয়াছি; সাহিত্যের বিচার-বচসা ভুলিয়াছি, 'দুই একজন কলেজের অধ্যাপক' যাহা বলিতেছেন তাহা ভুলিয়াছি। এমন কি নিবারণ চক্রবর্তী ও অমিত রায়ের আসল কথাটিও ভুলিয়াছি। আজ আবার সেই সেকালের মতই কবিতা পড়িবার সময়—

> "হঠাৎ-আলোর ঝল্‌কানি লেগে
> ঝলমল করে চিত্ত।"

চার অধ্যায়

রাজশেখর বসু

বিখ্যাত লেখকের গল্প পড়বার সময় কেউ কেউ একটা ভুল করে ফেলেন। লেখক তাঁর পাত্র-পাত্রীকে দিয়ে যে কথা বলান তার অনেক কথা পাঠক অকারণে লেখকের মতামত বলে মনে করেন। গল্পে যদি সেকেলে রীতিতে কেবল আদর্শচরিত নায়ক নায়িকা আর খাঁটি দুরাত্মা চিত্রিত হয় তবে লেখকের টান কোন্ দিকে তা বুঝতে বাধা হয় না। কিন্তু লেখক যদি এমন চরিত্র আঁকেন যারা স্বাভাবিক সদসৎ-নরধর্মী এবং যাদের মনের সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব মনোহর ভাষায় প্রকাশ পায়, তবে অসাবধান পাঠক পাত্র-পাত্রীর অনেক উক্তি নির্বিচারে লেখকের উপর আরোপ করে বসেন। যে লেখক অনতিখ্যাত তাঁর রচনা পড়বার সময় এই ভুল বড় একটা হয় না, কারণ পাঠকের কৌতূহল পাত্র-পাত্রীর উপরেই নিবদ্ধ থাকে, লেখক অন্তরালে থেকে নিস্তার পান। কিন্তু যেখানে লেখক স্বয়ং পরম কৌতূহলের বিষয়, সেখানে পাত্র-পাত্রী সাধারণের কাছে সব সময়ে সুবিচার পায় না। পাঠক ছত্রে ছত্রে লেখককেই সন্ধান করে এবং তার ফলে সৃষ্টিকেই স্রষ্টা বলে ভুল করে। রবীন্দ্রনাথের পাত্র-পাত্রী এই কারণে একটু বিপন্ন। তাই একদল পাঠক সন্দীপের উক্তি সইতে পারেন না এবং আর একদল অনুযোগ করেন যে গ্রন্থকার কমলার সহজ নারীধর্ম হঠাৎ ঘুচিয়ে দিয়ে বেচারীকে সনাতনী সতী বানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ পূর্বে যে সব গল্প লিখেছেন, তাতে তিনি নিরপেক্ষ স্রষ্টা, তাঁর পাত্র-পাত্রীর মতিগতির তিনি অনুমন্তাও নন অবমন্তাও নন। কিন্তু

দ্রষ্টব্য: 'চার অধ্যায়' উপন্যাসখানি ১৩৪১ সালের (ইং ১৯৩৪) অগ্রহায়ণ মাসে পুস্তকাকারে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে কিশোরীমোহন সাঁতরা কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের 'আভাষ' নামধেয় ভূমিকায় ব্রহ্মবান্ধব সম্বন্ধে একটি উক্তির জন্য বিভিন্ন সাময়িক পত্রে রবীন্দ্রনাথ তীব্রভাবে সমালোচিত হন। ১৩৪২ সালে বৈশাখ-সংখ্যার 'প্রবাসী'তে কবি এই সকল সমালোচনার একটি উত্তর দেন। উক্ত উত্তরের শেষাংশে তিনি লেখেন যে—

"চার অধ্যায়ের রচনায় কোনো বিশেষ মত বা উপদেশ আছে কিনা সে-তর্ক

'চার অধ্যায়' গল্প ভিন্ন পদ্ধতিতে লেখা। তার লক্ষণ—'আভাস' শীর্ষক মুখবন্ধ। তাঁর কোনও আধুনিক গল্পে মুখবন্ধ নেই। 'চার-অধ্যায়'-এর উদ্দেশ্য কি তার আভাস প্রথমেই পাওয়া যায়। গল্পের প্রধান পাত্র-পাত্রীরা ঘোরা-চারী বিপ্লবী। রাজনৈতিক বিক্ষোভের ফলে আমাদের দেশে যে বিজাতীয় হিংস্রতা দেখা দিয়েছে, গ্রন্থকার তারই ব্যর্থতা চিত্রিত করেছেন। শরৎ-চন্দ্রের 'পথের দাবী' গল্পেও হিংস্র নরনারীর সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু তাতে বিপ্লবী দলের যে বিবরণ আছে তা গল্পের সূত্র মাত্র, মুখ্য বিষয় নয়। সেই নিরীহ গল্পটির প্রধান ব্যাপার চরিত্র-চিত্রণ, আর কিঞ্চিৎ রোমহর্ষণ। 'চার অধ্যায়' গল্পের ধারা অন্যরকম। নায়ক অতীন্দ্র, নায়িকা এলা ও উপ-

---

সাহিত্যবিচারে অনাবশ্যক। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এর মূল অবলম্বন কোনো বাঙালী নায়ক-নায়িকার প্রেমের ইতিহাস। সেই প্রেমের নাট্য-রসাত্মক বিশেষত্ব ঘটিয়েছে বাংলাদেশের বিপ্লব প্রচেষ্টার ভূমিকায়। এখানে সেই বিপ্লবের বর্ণনা-অংশ গৌণ মাত্র; এই বিপ্লবের ঝোড়ো আবহাওয়ায় দুজনের প্রেমের মধ্যে যে তীব্রতা যে বেদনা এনেছে সেইটেতেই সাহিত্যের পরিচয়। তর্ক ও উপদেশের বিষয় সাময়িক পত্রের প্রবন্ধের উপকরণ।"

'চার অধ্যায়' 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র ত্রয়োদশ খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে এবং রাজশেখর বসুর এই আলোচনাটি 'প্রবাসী'তে (১৩৪১, মাঘ) প্রকাশিত হইয়াছে। রাজনীতির আবহাওয়া-পুষ্ট এই উপন্যাসখানি সম্পর্কে শচীন সেন তাঁহার 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে গণ-আন্দোলন' নামক প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন—

> "বঙ্গবিভাগের উত্তেজনার দিনে একদল যুবক রাষ্ট্রবিপ্লবের দ্বারা দেশে যুগান্তর আনবার উদ্যোগ করেছিলেন। তাঁদের ত্যাগ প্রশংসনীয় ও বরণীয়, কিন্তু সেই ত্যাগ সফল হতে পারেনি, কারণ তার সঙ্গে দেশের জনসাধারণের জাগ্রত চিত্ত জড়িত ছিল না। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে সেই উত্তেজনাপূর্ণ রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রচেষ্টাকে রবীন্দ্রনাথ সার্থক বলে গ্রহণ করতে পারেন নি।"

এই উপন্যাস সম্বন্ধে সুবোধ সেনগুপ্ত তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

> "ইহাতে ভাষার ঐন্দ্রজালিক শক্তির যে পরিচয় আছে তাহার তুলনা অন্য কোন সাহিত্যিকের রচনায় পাওয়া যায় না।··মূলনীতি ও কথোপকথনের ভাষা অনবদ্য তবুও অভিব্যক্তি হইয়াছে খণ্ডিত।"

প্রমথনাথ বিশী তাঁহার 'রবীন্দ্র-বিচিত্রা' গ্রন্থে প্রসঙ্গত বলিয়াছেন—

> 'দুইবোন, মালঞ্চ, চার অধ্যায় পড়িলে এই ধারণাই হয় যে, গল্প বিবৃতির

নায়ক ইন্দ্রনাথের বিচিত্র আলাপে তাদের চরিত্র ও মানসিক দ্বন্দ্ব যেমন আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে, সেই সঙ্গে লেখকের মতামতও নিঃসংশয়ে ধরা দিয়েছে। আপদধর্মের রূপ ধরে আমাদের দেশে যে সব অপধর্ম মাথা খাড়া করেছে, গ্রন্থকার তার উপর তাঁর তীব্র বিরাগ গোপন করেন নি।

এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ একাধিক মৌচাকে কাঠি দিয়েছেন। তার ঝংকার শোনবার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি।

প্রতি, চরিত্রসৃষ্টির প্রতি লেখকের মনোযোগ একেবারেই শিথিল, ন্যূনতম যে প্রয়োজন পূরণ না করিলেই নয়, মাত্র তাহারই পূরণ করিয়া লেখক দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছেন… লেখক গল্প বলিতে বসেন নাই, গল্পকে শিখণ্ডীরূপে দাঁড় করাইয়া অন্য উদ্দেশ্য সাধনে উদ্যত।"…

'চার অধ্যায়' প্রথম প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রচ্ছদপটটি নিজে আঁকিয়া দেন।

পরিশিষ্ট

॥ ক ॥

রবীন্দ্র-রচনাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকে প্রকাশিত বিশিষ্ট লেখক-লেখিকাগণের প্রাসঙ্গিক আলোচনা।

॥ খ ॥

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার রচনাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকে প্রকাশিত টীকা-টিপ্পনী এবং ব্যক্তি-বিশেষের খণ্ড মন্তব্য।

পরিশিষ্ট

॥ ক ॥

আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রতি একটি বক্তৃতা করেন। তাহা অগ্রহায়ণের ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রস্তাবটির শিরোনাম, 'একটি পুরাতন কথা।' বক্তৃতাটি শুনি নাই, মুদ্রিত প্রবন্ধটি দেখিয়াছি। নিম্ন স্বাক্ষরকারী লেখক তাহার লক্ষ্য।

ইহা আমার পক্ষে কিছুই নূতন নহে। রবীন্দ্রবাবু যখন ক, খ, শিখেন নাই, তাহার পূর্ব হইতে এরূপ সুখ দুঃখ আমার কপালে অনেক ঘটিয়াছে। আমার বিরুদ্ধে কেহ কখন কোন কথা লিখিলে বা বক্তৃতায় বলিলে এ পর্যন্ত কোন উত্তর করি নাই। কখন উত্তর করিবার প্রয়োজন হয় নাই। এবার উত্তর করিবার একটু প্রয়োজন পড়িয়াছে। না করিলে যাহারা আমার কথায় বিশ্বাস করে, (এমন কেহ থাকিলে থাকিতে পারে) তাহাদের অনিষ্ট ঘটিবে। কিন্তু সে প্রয়োজনীয় উত্তর দুই ছত্রে দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রবাবুর কথার উত্তরে ইহার বেশী প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্রবাবু প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎস্বভাব, এবং আমার বিশেষ প্রীতি, যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি তরুণবয়স্ক। যদি তিনি দুই একটা কথা বেশী বলিয়া থাকেন, তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্তব্য।

তবে যে এ কয় পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ, এই রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি। রবীন্দ্রবাবু আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। সম্পাদক

দ্রষ্টব্য : ঊনিশ শতকের অষ্টম দশকে ধর্মমত লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার এবং চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে মসীযুদ্ধ হয় তাহার প্রধান বাহন ছিল তত্ত্ববোধিনী, ভারতী, নবজীবন, প্রচার প্রভৃতি পত্রিকা। 'প্রচার' প্রথম প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাহায্যে ও উৎসাহে' ১২৯১ সালের ১৫ই শ্রাবণ— কলিকাতা, ২নং ভবানীচরণ দত্তের গলি হইতে। সনাতন হিন্দুধর্মের সমর্থনমূলক তাঁহার কতকগুলি প্রবন্ধ 'প্রচারে' প্রকাশিত হইবার পর আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত যে কয়জন লেখক দ্বারা পর পর 'চারি বার' তিনি আক্রান্ত হন, 'বিশেষ প্রীতি

না হইলেও আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ, তাহা বলা বাহুল্য। বক্তৃতাটি পড়িয়া আমার আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্বন্ধে কতকগুলি কথা মনে পড়িল। আদি ব্রাহ্মসমাজের লেখকদিগের নিকটে আমার কিছু নিবেদন আছে। সেইজন্যই লিখিতেছি। কিন্তু নিবেদন জানাইবার পূর্বে পাঠককে একটা রহস্য বুঝাইতে হইবে।...

গত শ্রাবণ মাসে 'নবজীবন' প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহাতে সম্পাদক একটি সূচনা লিখিয়াছিলেন। সূচনায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রশংসা ছিল, বঙ্গদর্শনের প্রশংসা ছিল। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তত্ত্ববোধিনী অপেক্ষা বঙ্গ-দর্শনের প্রশংসাটা একটু বেশী ঘোরাল হইয়া উঠিয়াছিল।

তারপর 'সঞ্জীবনী'তে একখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইল। পত্রখানির উদ্দেশ্য নবজীবন সম্পাদককে এবং নবজীবনের সূচনাকে গালি দেওয়া। এই পত্রে লেখকের স্বাক্ষর ছিল না, কিন্তু অনেকেই জানে যে, আদি ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রধান লেখক এই পত্রের প্রণেতা। তিনি আমার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র।...

নবজীবন-সম্পাদক অক্ষয়বাবু এ পত্রের কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু নবজীবনের আর একজন লেখক এখানে চুপ করিয়া থাকা উচিত বোধ করিলেন না। আমার প্রিয় বন্ধু চন্দ্রনাথ বসু ঐ পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন এবং গালাগালির রকমটা দেখিয়া 'ইতর' শব্দটা লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন।

তদুত্তরে 'সঞ্জীবনী'তে আর একখানি বেনামি পত্র প্রকাশিত হইল। নাম নাই বটে, কিন্তু নামের আদ্য অক্ষর ছিল,—'র'। লোকে কাজেই বলিল

যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র' রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক, রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তৃতা 'একটি পুরাতন কথা' এই শিরোনামায় ১২৯১ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। ইহার পাল্টা জবাব হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র 'আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়' শীর্ষক যে প্রবন্ধটি 'প্রচার'-এ মুদ্রিত করেন তাহাই অংশতঃ এখানে সংকলিত হইল।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার এই বিরোধের কথা রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতিতে' বলিয়াছেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র যে চিত্তের ঔদার্যগুণে বিরোধের কাঁটা সমূলে উৎপাটিত করিয়াছিলেন সে কথারও উল্লেখ করিয়াছেন।

পত্রখানি রবীন্দ্রবাবুর লেখা। রবীন্দ্রবাবু ইতর শব্দটা চন্দ্রবাবুকে পাল্‌টাইয়া বলিলেন।

নবজীবনের পনর দিন পরে, 'প্রচারের' প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রচার আমার সাহায্যে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয়। নবজীবনে আমি হিন্দু ধর্ম—যে হিন্দু ধর্ম আমি গ্রহণ করি তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়ম-ক্রমে লিখিতেছিলাম। প্রচারেও ঐ বিষয়ে নিয়মক্রমে লিখিতে লাগিলাম। সেই ধর্ম আদি ব্রাহ্ম সমাজের অভিমত নহে। যে কারণেই হোক প্রচার প্রকাশিত হইবার পর আমি আদি ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত লেখকদিগের দ্বারা চারি বার আক্রান্ত হইয়াছি। রবীন্দ্রবাবুর এই আক্রমণ চতুর্থ আক্রমণ।*

চতুর্থ আক্রমণ, আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের দ্বারা হইয়াছে। গালি-গালাজের বড় ছড়াছড়ি, বড় বাড়াবাড়ি আছে। আমরা প্রায়ই দেখিয়াছি, গালিগালাজে প্রভুর অপেক্ষা ভৃত্য মজবুত। তবে প্রভু ভৃত্যের মত মেছো-হাটা হইতে গালি আমদানি করেন নাই; প্রার্থনা-মন্দির হইতে আনিয়াছেন। উদাহরণ—"অসাধারণ প্রতিভা ইচ্ছা করিলে স্বদেশের উন্নতির মূল শিথিল করিতে পারেন কিন্তু সত্যের মূল শিথিল করিতে পারেন না।" আরও বাড়াবাড়ি আছে। মেছো-হাটার ভাষা এতদূর পৌঁছে না। পাঠক মনে করিবেন, রবীন্দ্রবাবু তরুণবয়স্ক বলিয়াই এত বাড়াবাড়ি হইয়াছে। তাহা নহে। সুর কেমন করিয়া পরদা পরদা উঠিতেছে, তাহা দেখাইয়া আসিয়াছি। সমাজের সহকারী সম্পাদকের কড়ি মধ্যমের পর, সম্পাদক স্বয়ং পঞ্চমে না উঠিলে লাগাইতে পারিবার সম্ভাবনা ছিল না।

রবীন্দ্রবাবু বলেন, যে আমার এই মত যে, সত্য ত্যাগ করিয়া প্রয়োজন-মতে মিথ্যা কথা বলিবে। বরং আরও বেশী বলেন: পাঠক বিশ্বাস না করেন, তাঁহার লিপি উদ্ধৃত করিতেছি, পড়ুন—

---

* ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র তিনটি আক্রমণের কথা বিশদভাবে বলিয়াছেন। প্রথমটি তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা, দ্বিতীয়টি সম্ভবতঃ রাজনারায়ণ বসুর দ্বারা এবং তৃতীয়টি আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র সিংহের দ্বারা।

ইঁহার সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—

"শুনিয়াছি, ইনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর মহাশয়দিগের একজন ভৃত্য—নাএব না কি আমি ঠিক জানি না।"

"আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্যভাবে, অসঙ্কোচে, নির্ভয়ে, অসত্যকে, সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন। সাকার নিরাকার উপাসনা ভেদ লইয়াই সকলে কোলাহল করিতেছেন, কিন্তু অলক্ষ্যে ধর্মের ভিত্তিমূলে যে আঘাত পড়িতেছে, সেই আঘাত হইতে ধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কেহ দণ্ডায়মান হইতেছেন না। একথা কেহ ভাবিতেছেন না যে, যে সমাজে প্রকাশ্যভাবে কেহ ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সাহস করে, সেখানে ধর্মের মূল না জানি কতখানি শিথিল হইয়া গিয়াছে। আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চারিত না হইত, তাহা হইলে কি আমাদের দেশের মুখ্য* লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্দ্ধা সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। (ভারতী—অগ্রহায়ণ, ৩৪৭ পৃ)

সর্বনাশের কথা বটে। আদি ব্রাহ্মসমাজ না থাকিলে আমার হাত হইতে দেশ রক্ষা পাইত কিনা সন্দেহ। হয়ত পাঠক জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কবে এই ভয়ংকর ব্যাপার ঘটিল। কবে আমি পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্দ্ধা সহকারে লোক ডাকিয়া বলিয়াছি, "তোমরা ছাই ভস্ম সত্য ভাসাইয়া দাও—মিথ্যার আরাধনা কর।" কথাটার উত্তর দিতে পারিলাম না। ভরসা ছিল, রবীন্দ্রবাবু এ বিষয়ে সহায়তা করিবেন, কিন্তু বড় করেন নাই। তাঁহার কুড়ি স্তম্ভ বক্তৃতার মধ্যে মোটে ছয় ছত্র প্রমাণ প্রয়োগ খুঁজিয়া পাইলাম; তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"লেখক মহাশয় একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন, তিনি যদি মিথ্যা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্বক যেখানে লোক-হিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেই খানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।"

প্রমাণ প্রয়োগ এই পর্যন্ত; তারপর আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বলিতেছেন, "কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না; শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।"

---

* বক্তৃতার সময়ে শ্রোতারা এই শব্দটা কিরূপ শুনিয়াছিলেন?

আমি বলিলেও মিথ্যা সত্য না হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও না হইতে পারে, কিন্তু বোধ করি আদি ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ বলিলে হয়। উদাহরণ স্বরূপ 'একটি আদর্শ হিন্দু-কল্পনা' সম্পাদক মহাশয়ের মুখ-নিঃসৃত এই চারটি শব্দ পাঠককে উপহার দিতেছি।

প্রথম 'কল্পনা' শব্দটি সত্য নহে। আমি আদর্শ হিন্দু 'কল্পনা' করিয়াছি, একথা আমার লেখার ভিতরে কোথাও নাই। আমার লেখার ভিতরে এমন কিছু নাই যে, তাহা হইতে এমন অনুমান করা যায়। প্রচারের প্রথম সংখ্যার হিন্দুধর্ম শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কথাটা রবীন্দ্রবাবু তুলিয়াছেন। পাঠক ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিবেন, যে, 'কল্পনা' নহে—আমার নিকট পরিচিত দুইজন হিন্দুর দোষ গুণ বর্ণনা করিয়াছি। একজন সন্ধ্যা আহ্নিকে রত, কিন্তু পরের অনিষ্টকারী। আদি ব্রাহ্মসমাজের কেহ যদি চাহেন, আমি তাহার বাড়ী তাঁহাদিগকে দেখাইয়া আনিতে পারি। স্পষ্টই বলিয়াছি যে, আমি ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়াছি। ঐ ব্যক্তির পরিচয় দিয়া বলিয়াছি, "আর একটি হিন্দুর কথা বলি।" ইহাতে কল্পনা বুঝায় না, পরিচিত ব্যক্তির পরিচয় বুঝায়।

তার পর 'আদর্শ' কথাটি সত্য নহে। 'আদর্শ' শব্দটা আমার উক্তিতে নাই। ভাবেও বুঝায় না। যে ব্যক্তি কখন কখন সুরাপান করে, সে ব্যক্তি আদর্শ হিন্দু বলিয়া গৃহীত হইল কি প্রকারে?

এই দুইটি কথা 'অসত্য' বলিতে হয়। অথচ সত্যের মহিমা কীর্তনে লাগিয়াছে। অতএব কৃষ্ণের আজ্ঞায় মিথ্যা সত্য হউক না হউক, আদি ব্রাহ্মসমাজের বাক্য-বলে হইতে পারে।

প্রয়োজন হইলে এরূপ উদাহরণ আরও দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর সহিত এরূপ বিচারে আমার প্রবৃত্তি নাই। আমার যদি মনে থাকিত, যে আমি রবীন্দ্রবাবুর প্রতিবাদ করিতেছি, তাহা হইলে এতটুকুও বলিতাম না। এই রবির পিছনে যে ছায়া আছে, আমি তাহারই প্রতিবাদ করিতেছি বলিয়া এত কথা বলিলাম।*

* ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র সত্য ও মিথ্যা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন।

"ভাই হাততালি"

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

আর একদিকে, আর এক পথে আমাদের আশার স্থল, ভরসার সম্বল, রবীন্দ্রনাথ। বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্কিমবাবু বা অন্যান্য খ্যাতনামা বর্ষীয়ান্‌গণের কথা ধরি না। তোমার অসার আস্ফালনে উদাসীনতা প্রদর্শনের উপহাস্যে হাস্য করিবার অধিকার অনেক দিন হইল তাঁহাদের হইয়াছে। বয়স বিগুণে রবীন্দ্রনাথের সে অধিকার এখনও হয় নাই;—ভাই হাততালি তাঁহার জন্য, আমাদের রবীন্দ্রনাথের জন্য আজি তোমার কাছে আমাদের এই উপাসনা।

রবীন্দ্রনাথ প্রতিভার দীপাশিখা; ধীরে স্থিরে জ্বলিলে এই শিখা স্বীয় বর্দ্ধমান আলোকে চারিদিক আলোকিত করিবে; প্রাচীন হিন্দুর সুগন্ধি তৈল নিষেবিত দীপের ন্যায় সেই অমল আলোকের সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত করিবে। সেই অমল, কোমল, কমল-শোভা-সমন্বিত মুখশ্রী,—সেই উজ্জ্বল, সলজ্জ ভাসা ভাসা, ভ্রমর-ভর-স্পন্দিত-পদ্মপলাশলোচন—সেই ঝামর চামর-নিন্দিত, গুচ্ছে গুচ্ছে স্বভাব-বেণী বিনায়িত চিকুর ঝল ঝল মুখমণ্ডল, সেই রহস্যে আনন্দে মাখান, হাসি খুসী ভরা অধরপ্রান্ত, সেই সৎচিন্তার প্রসর ক্ষেত্র, সুন্দর, শুভ্র, পরিষ্কার দর্পণোপম ললাট—ভগবানের এরূপ অতুল সৃষ্টি কখনও বৃথা হইবার নহে। না, এখনও রবীন্দ্রনাথ আমাদের আশার স্থল, ভরসার সম্বল; তুমি না লাগিলে তিনি এখনও আমাদের দেশের গৌরব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। তুমি না লাগিলে—আর তুমি লাগিলে? তোমার সেই লক্ষ হস্তের দশ লক্ষ চটচটি একবার প্রতিনিয়ত ধ্বনি করিলে,

---

দ্রষ্টব্য: অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রিকায় (১২৯১, মাঘ) প্রকাশিত 'ভাই হাততালি' নামক প্রবন্ধের অংশবিশেষ এখানে গৃহীত হইয়াছে। 'নবজীবন'-এর প্রবন্ধটিতে লেখকের নাম নাই, কিন্তু ইহা যে অক্ষয়চন্দ্রেরই রচনা তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সুহৃদ এবং বঙ্কিমমণ্ডলীর অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অক্ষয়চন্দ্র সরকার ছিলেন 'নবজীবন'-এর সম্পাদক। নবজীবন প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯১ সালের শ্রাবণ মাসে। পত্রিকাখানি মুদ্রিত হইত '৫১নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে, সাধারণী প্রেসে।' বার্ষিক মূল্য ছিল ৩৲ টাকা। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, চন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর বসু (রাজশেখর বসুর পিতা), রজনীকান্ত গুপ্ত প্রমুখ সে যুগের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিকগণ ছিলেন এই পত্রিকার লেখক। প্রথম বৎসরের প্রথম সংখ্যাতেই (শ্রাবণ, ১২৯১) 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' শীর্ষক একটি ব্যঙ্গরসাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে লেখকের নাম

বীরের বীরাসন টলে, তা কোমল বঙ্গসন্তানের কি আর স্থৈর্য থাকিবে! ভাই স্বীকার করিলাম তুমি বাহাদুর,—তুমি মনে করিলে বাজপাত করিতে পার, কিন্তু তোমার হাতে ধরি, বিনয় করি, তুমি দিনকতক ক্ষান্ত থাকিবে নাকি?

না থাকিলেও ইহা যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা তাহার প্রমাণ আছে। ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের অন্য রচনাও 'নবজীবন'-এ প্রকাশিত হইয়াছিল।

অক্ষয়চন্দ্র যে রবীন্দ্রনাথের রূপ এবং গুণমুগ্ধ ছিলেন, উদ্ধৃত রচনাংশটিতে তাহা সুপরিস্ফুট। তাহা সত্ত্বেও কিন্তু ধর্মমত লইয়া 'নবজীবন' প্রভৃতি পত্রিকায় তিনিও রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে লেখনী-চালনা করিয়াছিলেন।

কাব্যে-নীতি

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দুর্নীতি কাব্যে সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইতেছে। তাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে। যাঁহারা ধর্ম ও নীতির দিকে, তাঁহারা আমার সহায় হউন।

কবিতা লিখিতে বসিলেই নব্য কবিগণ প্রেম লইয়া বসেন। নভেল নাটকও প্রায় তাই। যেন পৃথিবীতে মাতা নাই, ভ্রাতা নাই, বন্ধু নাই। সব নায়ক, আর নায়িকা। বঙ্কিমবাবুর অনুকরণে একটি নায়ক আর দুইটি নায়িকা হইলেই ভালো হয়। নায়িকা ততোধিক হইলেও ক্ষতি নাই।

আর তাও যদি কবিরা দাম্পত্য প্রেম লইয়া কাব্য লেখেন, তাহাও সহ্য হয়। ইঁহাদের চাই—হয় বিলাতী কোর্টশিপ্, নয়ত টপ্পার প্রেম, নহিলে প্রেম হয় না। অবিবাহিত পুরুষ ও নারী চাই-ই। এখন, আমাদের দেশে

দ্রষ্টব্য: একদা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠিয়াছিল যে, তাঁহার রচিত কাব্য-উপন্যাসাদির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে তিনি দুর্নীতির বীজ ছড়াইতেছেন। সেকালের যে সকল প্রখ্যাত লেখক এজন্য তাঁহাকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করিয়া সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহাদের অন্যতম। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' তখন এই রবীন্দ্র-বিদূষণের প্রধান বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনায়' সমাজপতি নিজে তো রবীন্দ্রনাথের রচনা লইয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিতেনই, উপরন্তু মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথ

অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর প্রেম অবৈধ প্রেম। কারণ, সমাজে ১২ বৎসর বয়সের অধিকবয়স্ক ভদ্র-ঘরের অনূঢ়া কন্যা একরূপ পাওয়াই যায় না। আর ১২ বৎসরের পূর্বে প্রেম হয় না। ফল দাঁড়ায় এই যে, এইরূপ প্রেম হয় ইংরাজি (অতএব আমাদের দেশে অস্বাভাবিক), না হয়—দুর্নীতিমূলক। সাহিত্যক্ষেত্র হইতে উভয়েরই উচ্ছেদ আবশ্যক।

ইংরাজিতেও কোর্টশিপ অবস্থার গান অনেক আছে বটে, কিন্তু 'দাম্পত্য প্রেমে'র গানেরও অভাব নাই। কিন্তু আমাদের দেশে যেখানে 'দাম্পত্য প্রেম' ভিন্ন অন্যরূপ বিশুদ্ধ প্রেম নাই, সেখানে 'দাম্পত্য প্রেমে'র গান নাই বলিলেই হয়। হা অদৃষ্ট!

উদাহরণ দিতে হইবে? রবীন্দ্রবাবুর প্রেমের গানগুলি নিন। 'সে আসে ধীরে,' 'সে কেন চুরি করে চায়,' 'দু'জনে দেখা হলে' ইত্যাদি বহুতর খ্যাত গান—সবই ইংরাজি কোর্টশিপের গান। তাঁহার 'তুমি যেও না এখনই,' 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না,' ইত্যাদি গান লম্পট বা অভিসারিকার গান। তাঁহার যে কয়টি গানকে 'দাম্পত্য প্রেমের গান' নামে অভিহিত করা যাইতে পারে,—তাহারা সেরূপ খ্যাতি লাভ করে নাই।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এরূপ গানে মৌলিকতাও নাই। শয়ন রচনা

সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখকের বিরুদ্ধ সমালোচনাও প্রকাশ করিতেন। তবে রবীন্দ্রনাথের অনুকূল সমালোচনাও যে 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইত না তেমন নয়।

এখানে 'কাব্যে নীতি' শীর্ষক দ্বিজেন্দ্রলালের যে প্রবন্ধটি গৃহীত হইয়াছে তাহা ১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের (২০শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা) সাহিত্যে প্রকাশিত হয়। সাহিত্য ছাড়া অন্য কোনো কোনো পত্রিকায়ও দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কলম চালাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া তিনি 'আনন্দ-বিদায়' নামক যে ব্যঙ্গনাট্য রচনা করেন তাহাকে রবীন্দ্র বিদূষণের পরাকাষ্ঠা বলা যাইতে পারে। এই ব্যঙ্গনাট্য সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীতও হইয়াছিল।

কিন্তু ইহা সাময়িক ব্যাপার মাত্র। দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচক ছিলেন না, তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার প্রশস্তিতেও যে মুক্তকণ্ঠ ছিলেন তাহার প্রমাণ তাঁহার লিখিত, এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট, 'গোরা'র সমালোচনা। দ্বিজেন্দ্রলালের 'মন্দ্র' প্রকাশিত হইবার পর রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'র তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া এক সমালোচনা লেখেন। তাহা তাঁহার 'আধুনিক সাহিত্যে' স্থান পাইয়াছে।

করা, মালা গাঁথা, দীপ জ্বালা, এ সকল ব্যাপার বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা হইতে অপহরণ! স্থানে স্থানে পংক্তিকে পংক্তি উক্তরূপে গৃহীত। তবে রবিবাবুর সঙ্গে এই বৈষ্ণব কবিদিগের এই প্রভেদ যে, রবিবাবুর কবিতায় বৈষ্ণব কবিদিগের ভক্তিটুকু নাই, লালসাটুকু বেশ আছে।

রবিবাবুর খণ্ড কবিতায়ও ঐ একইরূপ পদ্ধতি দেখিতে পাই। নায়িকা হিসাবে ছাড়া রমণীজাতির অন্যরূপ কল্পনা তিনি করেন নাই বলিলেই হয়। নারীজাতিকে দেখিয়া এই কবির মাতৃত্বের স্বস্বত্বের কথা মনে পড়ে না। নারীজাতিকে দেখিয়া কেবল তাঁহার "মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।"

দোষ পাঠক ও শ্রোতারই অধিক, স্বীকার করি। তাহাদের বিশেষতঃ রবীন্দ্রবাবুর এই ভক্তদের এই লালসা, সম্ভোগটুকু যেমন মধুর লাগে, নারীর সেবা, করুণা, সহিষ্ণুতা তেমন মধুর লাগে না। কিন্তু বড় কবিদের উচিত নয়—পাঠক যাহা চায়, তাহাই দেওয়া। তাঁহাদের উচিত—পাঠক তৈরি করা।

'এই সম্বন্ধে একটি বড় রকমের উদাহরণ না দিলে চলে না।'*

এই দুর্নীতি বঙ্গসাহিত্যে ব্যাপিয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালা কাব্য খুলিলেই 'দুজনে দেখা হোল,' 'প্রতি অঙ্গ কাঁদে,' 'সে চারু বদন,' 'রচেছি শয়ন'—এই-ই পাওয়া যায়। বাঙ্গালা কাব্যে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনার অভাব, অন্য দিকে তেমনই মানুষের মনঃপ্রকৃতির বর্ণনার অভাব। বাইরণ, শেলি, কীট্‌স্‌ ইত্যাদি কবিগণ প্রকৃতির নামে উন্মাদ। তাঁহাদের প্রাণ ফাটিয়া স্বভাবের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা বাহির হইতেছে। আর আমাদের দেশের কবিরা রমণীর পীন পয়োধর ও সরস অধর ছাড়া আর কিছুই জানিলেন না, বুঝিলেন না। যে দেশের প্রকৃতি নীলিমায়, শ্যামলতায়, পর্বতে, উপত্যকায়, ক্ষেত্রে, নির্ঝরে, সৌরভে, ঝংকারে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশকে পরাস্ত করিয়াছে, তাহার সন্তানগণ সে দিকে একবার চাহিয়াও দেখিলেন না; আর ধূমাচ্ছন্ন, মেঘাচ্ছন্ন ইংলণ্ডের কবিগণ তাঁহাদের সেইটুকু সৌন্দর্য লইয়াই উন্মত্ত। এ দুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে?

তাহার উপরে মানুষের অন্তর্জগৎ। জননীর স্নেহ, স্ত্রীর তন্ময়তা, কন্যার

*এই প্রবন্ধের অংশবিশেষ 'চিত্রাঙ্গদা'র সমালোচনা পূর্বে স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইয়াছে।

সেবা, বন্ধুর সৌহার্দ্য, ভক্তের ভক্তি, ত্যাগীর ত্যাগ, কৃতজ্ঞের কৃতজ্ঞতা,—এই সকল মহিমময় কাহিনী ছাড়িয়া দিয়া, 'সে কেন চুরি করে চায়' আর 'জাগি পোহাল বিভাবরী,' এই কি চিরদিন শুনিতে হইবে? রবীন্দ্রবাবু তো সহস্রাধিক খণ্ড কবিতা ও গান লিখিয়াছেন। পতিপত্নীর পবিত্র প্রেম—যাহার মূলে সম্ভোগ নহে, যাহার মূলে স্বার্থত্যাগ—সে প্রেম কি তাঁহার তিনটি কবিতায়ও আছে?

কেহ কেহ আমায় মনে মনে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, আমি রবীন্দ্রবাবুকেই এত আক্রমণ করি কেন? আমি উত্তরে জিজ্ঞাসা করি, 'তাহা না করিয়া কি হরি ঘোষকে আক্রমণ করিব?' তাহার দোষ কি? সে বেচারী অন্ধ অনুকারক মাত্র। সে রবিবাবু minus প্রতিভা। সে সকল ব্যক্তি সমালোচকের অবজ্ঞেয়। তাহাদের কাব্যের জন্য দোষী অর্ধেক তাহারা, অর্ধেক দোষী তাহাদের আদর্শ কবি রবীন্দ্রবাবু। শুদ্ধ পাপে বড় যায় আসে না; কিন্তু, দুর্নীতি plus শক্তি বড় ভয়ংকর। তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে। বাজীরাও পেশোয়াই বোধ হয় বলিয়াছিলেন,—'বৃক্ষকাণ্ড কর্তন কর, শাখাগুলি আপনিই শুকাইয়া যাইবে।'

রবিবাবুর কবিতার প্রাণহীন, ভাবহীন অনুকরণের জ্বালায় মাসিক-পত্রের সম্পাদক ও পাঠক উভয়েই জ্বালাতন। সেদিন 'প্রবাসী'র সম্পাদক এই প্রেমের পদ্য-রচয়িতাদের সম্বোধন করিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি বলি, সে বেচারীদের দোষ কি? তাঁহারা ভাবেন যে, যেই 'জলভরে'র সঙ্গে 'ছলভরে' মিলাইতে শিখিলেন, অমনিই কবি হইলেন! তাঁহাদের যেমন শেখাও, তেমনই ত তাঁহারা শিখিবেন। রবিবাবুর গুণগুলি আয়ত্ত করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত; কিন্তু দোষগুলি হুবহু নকল করিয়াছেন! এমন কি, অনেক সময়ে they have out-Heroded Herod!

"পসারিণী"

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব কিসে নামক স্তবে 'দেবালয়ে'র পাতাল হইতে চূড়া পর্যন্ত বোঝাই হইয়া গিয়াছে। চারু প্রথমেই একটি নূতন সংবাদ দিয়াছেন,—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি—সমসাময়িক সমগ্র জগতে তাঁহার তুল্য প্রতিভাবান কবি কেহ প্রাদুর্ভূত হয় নাই।" বিজ্ঞানাচার্য ডাক্তার রায় উদক্ষারযান ও যবক্ষারযানের সাহায্যে বকযন্ত্রে এই মত প্রতিপন্ন করিলে, সত্যই বাঙ্গালীর বুক দশহাত হইয়া উঠিবে। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সমালোচনায় এই অভিমত প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে বাঙ্গালী জগতের সাহিত্যের দরবারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। সমসাময়িক সমগ্র জগৎ যতই উদ্ভট হউক, সেই জগতের সমগ্র সাহিত্যের এমনতর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও তুলনায় সমালোচনা করিবার শক্তি এ মর জগতে সকলের নাই। আমরা ত আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর রাখিতেই পারি না! অতএব, বাঙ্গালীর এই গৌরবটুকু অম্লানবদনে পরিপাক করিবার চেষ্টা করিব। আর 'বিশ্বসাহিত্যের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ' মনীষী শীল ও ডাক্তার রায় চারু সমালোচককেও যে সমসাময়িক সমগ্র জগতের একমাত্র 'সমালোচক' বলিয়া স্বীকার করিবেন, সে বিষয়েও আমাদের সন্দেহ নাই!—রবীন্দ্রনাথ প্রতিভাশালী কবি, কিন্তু তাঁহার সকল কবিতাই কামধেনুর মত দোহন করিলেই 'আধ্যাত্মিক' দুগ্ধ দান করে, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। লেখক রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতাকে পীড়ন করিয়া আধ্যাত্মিক রস নিঙ্‌ড়াইয়া বাহির করিয়াছেন। 'পসারিণী' কবিতার আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই শ্রেণীর অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বিশ্লেষণী শক্তির উজ্জ্বল উদাহরণ। চারু সমালোচক লিখিয়াছেন,—"বাহিরে যিনি বিচিত্র চঞ্চল, অন্তরে তিনিই

দ্রষ্টব্য: সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী হইলেও তাঁহার বহু রচনার অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। 'সাহিত্যে'র 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' বিভাগে রবীন্দ্র-রচনার দোষগুণ দুইই দেখানো হইত। 'পসারিণী' কবিতাটি 'সোনার তরী'তে স্থান পাইয়াছে। এই কবিতার সমাজপতি লিখিত প্রতিকূল ও ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনাটি 'দেবালয়' (কার্তিক, ১৩১৭—২১শ বর্ষ), পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এক অচপল। অন্তরের প্রশান্তি একই, বাহিরের বিচিত্ররূপিণী!" বিস্ময়কর নহে কি? এ দার্শনিকতা যে রবারের অপেক্ষাও অধিকতর স্থিতিস্থাপক, তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন কি? তর্কের অনুরোধে চারুর এই দার্শনিক mandate না হয় শিরোধার্য করিলাম। তাহার পর, চারু সমালোচক লিখিয়াছেন—'ইনি "পসারিণী" বেশে আমাদের কাছে গতায়তি (গতায়াত নহে। উহা ত মুটে মজুর সকলেই লেখে!) করেন। পসারিণী 'কোথা কোন বহুদূরে বিদেশের রাজপুরে' রতনের হাটে বিকিকিনি করিতে চলিয়াছে। আজ এই নিস্তব্ধ নির্জন দুপ্রহরে—

"সম্মুখে দেখ ত চাহি, পথের যে সীমা নাহি,
তপ্ত বায়ু অগ্নিবাণ হানে।"

এখন আমি নিশ্চিন্ত নীরবে একাকী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম করিতেছি—

"হেথা দেখ শাখা-ঢাকা বাঁধা বটতল;
কূলে কূলে ভরা দীঘি, কাকচক্ষু জল।
থাক তব বিকিকিনি ওগো শ্রান্ত পসারিণী,
এইখানে বিছাও অঞ্চল।"

'তুমি রতনের হাটে যে পসরা লইয়া চলিয়াছ, তাহা আমার কাছে নামাইয়া আমায় একবার দেখাইয়া যাও। ওগো প্রত্যক্ষ, ওগো immediate, তুমি পরোক্ষের সংবাদ, infinity-র তত্ত্ব আমাকে বলিয়া যাও।' পাঠক! মূল ও ব্যাখ্যা দেখিয়া বলুন,—এই কবিতার এই ব্যাখ্যা কি উৎকট দার্শনিকতার ও উদ্ভট আধ্যাত্মিকতার উন্মত্ত-প্রলাপ নহে? 'নির্জন দুপ্রহরে' কবি যদি শাখা-ঢাকা বাঁধা বটতল দেখাইয়া কোনও পসারিণীকে আহ্বান করেন, তাহা হইলে কি মনে হয় যে, সসীম অসীমকে আহ্বান করিতেছে? এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পড়িয়া কেহ যদি বলে,—তলস্পর্শ infinite অর্থাৎ অতলস্পর্শকে আহ্বান করিতেছে, তাহা হইলেও বিস্ময়ের কোনও কারণ থাকে কি? সে ব্যাখ্যাও এত অসমঞ্জস, এত উদ্ভট হয় কি? 'পসারিণী অন্তরের এক'; কেন না, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, সে তাই। অতএব, নির্জন দুপুরে শাখা-ঢাকা বাঁধা বটতলায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন হইয়া গেল। ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথের পসারিণীর হাতে ঝাঁটা ছিল না, তাই রক্ষা। নতুবা কি হইত, বলা যায়

না! হে ভগবন্, রবীন্দ্রনাথ নবযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব ;—তুমি তাঁহাকে এই চারুসম্প্রদায়ের নির্লজ্জ স্তাবকতা, নির্জলা খোশামুদি ও নিরবচ্ছিন্ন বিড়ম্বনার নরক হইতে উদ্ধার কর।

বাঙ্গালা ভাষা

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

"বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গদ্যের যে আকার ঠিক করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর সহজে বদলাইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র ছাঁচের উপর একটু কারিকরী করিয়াছিলেন মাত্র, ছাঁচ বদলান নাই। রবীন্দ্রনাথ ছাঁচ বদলাইতে চাহিতেছেন, তাহা হইবার নহে। কারণ, বিদ্যাসাগরী ছাঁচ বাঙ্গালার সর্বত্র পঞ্চাশ বৎসরকাল স্কুলে, কলেজে, পাঠশালায় সমানভাবে চলিতেছে, সকল সমাচারপত্র ঐ ছাঁচে লেখা। যেমন বিদ্যাসাগরের টাইপের কেস্ বদলাইবার উপায় নাই, তেমনি ভাষাও বদলাইবে না। উহা যে সর্বজনসমাদৃত এবং ব্যবহৃত। উহার ব্যাপ্তি অত্যধিক, উহার গভীরতা প্রগাঢ়। একা রবীন্দ্রনাথ জনকয়েক চেলাচামুণ্ডার সাহায্যে বাঙ্গালার গদ্যসাহিত্যের ছাঁচ বদলাইতে পারিবেন না। এইটুকু আমরা স্থির জানি বলিয়াই রৈবী-ঢঙ্গকে এতদিন হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি, পরেও দিব। রবীন্দ্রনাথ যত বড় কবি হউন না, যেমন মেধাবী মনস্বী হউন না, বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি করিবার উৎকট সাধনা তাঁহার নাই। তিনি বিদেশের ঠাকুর হইলেও স্বদেশের ছত্রিশ জাতির দেবতা হইতে পারেন নাই ; তাঁহার ভাষায় ব্যাপ্তি

দ্রষ্টব্য : বাংলা গদ্যের বাহনরূপে চলতি ভাষা ব্যবহারের স্বপক্ষে প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্রে'র মাধ্যমে যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, তাহা রবীন্দ্রনাথের সমর্থন লাভ করে এবং চলতি ভাষায় লেখা তাঁহার গদ্য রচনাসমূহ 'সবুজপত্রে' প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রাচীনপন্থী লেখকগণ তাঁহার এই নূতন প্রচেষ্টাকে সুনজরে দেখিতে পারেন নাই। ফলে তখনকার দিনের কতকগুলি সাময়িক পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠে। খ্যাত-অখ্যাত উভয় শ্রেণীর লেখকরাই তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।*

কেশবচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'অর্চনা' পত্রিকায় 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' নামে একটি বিভাগ ছিল।

নাই, বিস্তার নাই—হইবেও না। কলিকাতার ছোক্‌রা-মহলে তিনি ঋষি হইতে পারেন, স্বয়ংসিদ্ধ দুই একজন সাহিত্য-সেবীর গাত্রকণ্ডূতির হেতু তিনি হইতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গালার সাধারণ শিক্ষিত সমাজে তাঁহার প্রভাব বড়ই কম। তিনি যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন ততদিন একটা হুজুগ চলিতে পারে,—চলিবেও। যাহারা দেশের দশজনকে লইয়া চলে, তাহারা রবির খোস্‌খেয়াল অবহেলা করে। তবে স্বেচ্ছাচারের শাসন হওয়া কর্তব্য।”

ঐ বিভাগে বিভিন্ন লেখকের রচিত সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। ১৩২৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যার 'অর্চনা'য় অমূল্যচরণ সেন 'ভারতী' এবং 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের ভাষার বিরূপ সমালোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের 'সবুজতন্ত্র' প্রসঙ্গে তিনি 'নায়কে' প্রকাশিত, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে রচনাংশটি উদ্ধৃত করেন তাহা এখানে সংকলিত হইল। 'নায়ক' ছিল পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সে যুগের একখানি বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র।



রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা

বিপিনচন্দ্র পাল

রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভাকে কেবল বাঙ্গালার নহে, সমগ্র সভ্যজগতের কবিসমাজে অতি উচ্চ আসন দিতেই হইবে। শব্দসম্পদে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ কবি আরও আছেন। চিত্রাঙ্কনের চাতুর্যেও তাঁর সমকক্ষ কিংবা তাঁহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিল্পীও পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু রসানুভূতির তীক্ষ্ণতা ও অধ্যাত্মদৃষ্টির প্রসার ও গভীরতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পরে, বাঙ্গালায় জন্মিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না আর কালধর্মবশতঃ বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যেও যতটা প্রসারতা ফুটিয়া উঠিবার

দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের অন্তরঙ্গ সুহৃদ, 'ফুলজানি' নামক বিখ্যাত উপন্যাস রচয়িতা শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের ভ্রাতা শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদকতাকালে ১৩১৮ সালের চৈত্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন'-এ বিপিনচন্দ্র পাল লিখিত 'চরিত-চিত্র' নামে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় তাহারই অংশবিশেষ এখানে গৃহীত হইয়াছে। সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি বিপিনচন্দ্রের 'চরিত-কথা' নামক পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন একাধারে রাজনীতিজ্ঞ, দার্শনিক ও সাহিত্যিক। দেশবন্ধু

অবসর পায় নাই, যুগপ্রভাবে রবীন্দ্রনাথের সে প্রসারতা ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবে রবীন্দ্রনাথ অনুভূতির বিস্তৃতিতে ও অনুভাব্য বিষয়ের বিচিত্রতাতে যতটা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, অন্যদিকে সেই পরিমাণে তাঁর রসানুভূতির গভীরতা ও বাস্তবতা বৈষ্ণব-কবিদিগের অপেক্ষা হীন বলিয়াই মনে হয়। বৈষ্ণব-কবিগণ কেবল কবি ছিলেন না, অতি উচ্চ অধিকারের সাধকও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথেরও ধর্মপিপাসা প্রবল, সাধনার আকাঙ্ক্ষাও বহুদিন হইতেই জন্মিয়াছে। আপনার অলৌকিক কবি-প্রতিভার স্ফুরণেই তিনি জীবনের সার্থকতা লাভ হইল মনে করেন না। ধর্মকে এবং ব্রহ্মকে না পাইলে, তাঁর সকলি বিফল ও ব্যর্থ হইয়া গেল,—রবীন্দ্রনাথের এ ভাবটা ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাঁর আপনার সম্প্রদায়মধ্যে যে সাধন প্রচলিত আছে, সে সাধনেও রবীন্দ্রনাথ এখন আর উদাসীন নহেন। কিন্তু বৈষ্ণব-কবিদিগের সাধনার এমন একটা বস্তুতন্ত্রতা ছিল, আমাদের এই নবীনযুগের প্রমুক্ত সাধনায় সে বস্তুতন্ত্রতা নাই। প্রাচীন ধর্ম সকলেই গুরু-মুখী। সকলেই অবতাররূপে বা গুরুরূপে ভগবানের একটা বহিঃপ্রকাশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বৈষ্ণব-কবিগণ ভগবানের দ্বিবিধ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এক অন্তরে—চৈত্যগুরুরূপে; অপর বাহিরে—মোহান্তগুরুরূপে। এইজন্যই তাঁদের সাধনা যুগপৎ অন্তর্মুখীন ও বস্তুতন্ত্র হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তে ও সাধনায় কেবল চৈত্যগুরুরই স্থান আছে, বৈষ্ণবেরা যাঁহাকে মোহান্তগুরু বলেন, তার স্থান নাই। ভগবান চৈত্যগুরুরূপে জীবের অন্তরে, তার ভিতর-কার জ্ঞানভাবাদির ভিতর দিয়া, তার স্বানুভূতকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হন। চৈত্যগুরুকে অগ্রাহ্য করিলে চলে না। কিন্তু এই চৈত্যপ্রকাশ আংশিক,

চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় দর্শন ও সাহিত্য সম্পর্কিত তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে দীনেশচন্দ্র সেন ও বিজয়চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে তিনি 'বাংলার নবযুগের কথা' লিখিয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় রচিত তাঁহার বইগুলির মধ্যে 'চরিত-কথা' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহাতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বরণীয় বাঙালীদের চরিত্র বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। 'চরিত-কথা'য় সন্নিবিষ্ট রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধটির অংশবিশেষ মাত্র এখানে দেওয়া হইল। ইহা পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ (ভট্টাচার্য এণ্ড সন, কালকাতা। প্রকাশকাল—ভাদ্র, ১৩৩৬) হইতে সংগৃহীত।

পূর্ণ নহে। এই প্রকাশে জীবের অহংবুদ্ধি ভগবানকে ওতপ্রোতভাবে ঘেরিয়া থাকে। এখানে জীব অনেক সময় আপনার প্রাকৃত বুদ্ধির সিদ্ধান্ত ও অসংস্কৃত প্রবৃত্তির খেয়ালকেই আপনার ইন্দ্রিয়বিকার-প্রসূত বিবিধ রসরাগে রঞ্জিত করিয়া, ভগবৎপ্রকাশ বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে। মোহান্তগুরু এই ভ্রম নিরস্ত করিয়া থাকেন। চিত্তে যে ভগবৎপ্রকাশ হয়, তাহা যখন মোহান্ত-গুরু বা সদ্‌গুরুতে যে অধিষ্ঠান হয়, তার সঙ্গে মিলিয়া যায়,—চৈত্যপ্রকাশ ও মোহান্তপ্রকাশ যখন একে অন্যের সমর্থন ও পরস্পরকে প্রতিষ্ঠিত করে, তখনই ভিতরকার আদর্শ ও ভাব সত্যোপেত ও বস্তুতন্ত্র হয়। বৈষ্ণব-সাধনাতে ভিতর-বাহিরের এই অপূর্ব সমাবেশ আছে বলিয়া, বৈষ্ণবকবিগণ একান্ত অন্তর্মুখীন হইয়াও অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কদাপি বস্তুতন্ত্রতা-ভ্রষ্ট হন নাই। রবীন্দ্রনাথের সাধনার সঙ্গে তুলনায় বৈষ্ণবকবিদিগের ইহাই বিশেষত্ব। আর এই বস্তুতন্ত্র সাধনগুণেই তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে কোন কোন দিকে একান্তভাবেই অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন, নতুবা তাঁদের প্রতিভা ও রবীন্দ্র-নাথের প্রতিভাতে জাতিগত শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট-ভেদে কোনো বিশেষ তারতম্য আছে কিনা সন্দেহ।

রবি-কীর্তি

নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য

আমি রবিকীর্তি নামক প্রাচীন কবির কথা বলিতে বসি নাই; এ কালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের একটা কীর্তির কথাই বর্ণনা করিব। গোপিনীরা সেকালে কৃষ্ণকলঙ্ক যমুনার জলে ধৌত করিয়াছিলেন; আমরা

দ্রষ্টব্য: 'শব্দতত্ত্ব' প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ যখন সাময়িক পত্রে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করেন, তখন খ্যাত ও অখ্যাত উভয় শ্রেণীর লেখকরাই ইহা তাঁহার অনধিকার-চর্চা মনে করিয়া ত্রুটিপ্রদর্শনে তৎপর হইয়া উঠেন; এবং শুধু 'সাহিত্যে' নয়, অন্যান্য পত্রিকায়ও বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য লিখিত 'রবি-কীর্তি' শীর্ষক ব্যঙ্গাত্মক রচনাটি দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত 'নব্যভারত,' (কার্তিক, ১৩১৮—উনত্রিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা) হইতে গৃহীত।

উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশবাসী বাঙ্গালী, পঞ্জাবের পূর্বসীমান্তে আসিয়া পড়িয়া, বাঙ্গালা ভাষাজ্ঞানের কলঙ্কটুকু ঐ যমুনার জলে প্রায় ধুইয়া বসিয়াছিলাম; কিন্তু আমাদের একদিনকার 'প্রবাসী' কবি রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গালা ব্যাকরণের প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়া সে কলঙ্ক ঘুচাইতে দিতেছেন না। যখন কবির ক্ষুদ্রায়তন 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থ বেঙাচির মত সাহিত্য-সরস্বতীতে সাঁতার দিল, তখনই বুঝিয়াছিলাম যে, অচিরাৎ লেজ পরিহার করিয়া উহা লম্ফ প্রদান করিতে আরম্ভ করিবে।

কিন্তু এ যে বেজায় লম্ফ! ভাষার phonology প্রভৃতির সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া নিরঙ্কুশ কবির ব্যাকরণ অতি দীর্ঘ লম্ফ দিতেছে। 'গোটা' শব্দের 'গো' বধ করিয়া একটা নির্দেশক 'টা' জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যদিও উহার জ্ঞাতি 'ঠো' উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে কোন 'গো'-বংশজাত নহে। একালের গোরক্ষিণী সভার প্রযত্নে ঐ বিচ্ছিন্ন 'টা' আবার গোটা হইয়া উঠিতে পারিবে কি?

কোন্ স্বর-বিজ্ঞানের নিয়মে 'গোটা' শব্দটি বহুবচনে 'গুলা' হইয়া উঠিল, রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধে তাহার একমাত্র নির্দেশ এই দেখিলাম যে, যিনি লিখিতেছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ। এ প্রমাণ আজি-কালির দিনে অকাট্য হইলেও, আমরা পাঠকদিগকে কবির মতের সমর্থনে দু'চারিটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। 'গোটা' শব্দের বহুবচনে যেমন 'গুলা' তেমনি কোটা (ভানা) শব্দের বহুবচনে হইয়াছে কুলা, কেননা অনেক ধান ভানিলে কুলার প্রয়োজন হয়, মোটা শব্দের বহুবচনে হয় মূলা; কেননা একালের সটনের বীজে মূলা বৃদ্ধি হইলেই মোটা হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আদর অর্থ বুঝাইলে 'খানা' প্রয়োগ হয় বলিয়া কবি নূতন ভাষা সৃষ্টি করিয়া 'প্রদীপখানা' লিখিয়াছিলেন। কিন্তু অতি আদরের নাকখানা, কানখানা বজায় রাখিতে গেলে উহার অনুকরণ করা চলে না। কবি সর্বদাই আপনার ইচ্ছামত ভাষা গড়িয়া আসিয়াছেন; তাঁহার 'খেয়া' গ্রন্থের উৎসর্গে 'লজ্জাবতী লতার' সহিত মিলাইবার জন্য লিখিয়াছিলেন—"ফুলগুলি সব নীলনয়নে কোন্ খেয়ানে রতা।" কবির চক্ষে ফুলগুলির সৌন্দর্য রমণীরূপ সূচিত করিতে পারে, কিন্তু তাহাদিগকে খাঁটি স্ত্রী করিয়া তোলা কেবল রবীন্দ্রবাবুর সাহসেই কুলায়। তিনি সিন্ধুকেও রমণী সাজাইয়াছিলেন। হয়ত বা একদিন

আকাশটিকে আকাশিকা করিয়া লইবেন। এ সংসারে স্ত্রী না হইলে চলে না, কিন্তু তাই বলিয়া সকল পুরুষকেই দীর্ঘ কেশে ভূষিত করিয়া স্ত্রী করিলে চলিবে কেন?

ভাষার এই অবাধ নিরঙ্কুশ প্রসঙ্গ, পূর্বে 'সাহিত্য'-সম্পাদক একটু দমন করিতে চেষ্টা করিতেন; তিনি হয়ত এখন 'মৌনং হি শোভনং' বলিয়া গা-ঢাকা দিয়াছেন। তিনি চুপ করিয়া আছেন, কিন্তু আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, রবীন্দ্রবাবুর কোন কোন ভক্ত আমার এ প্রবন্ধ পড়িয়া অস্ত্র শানাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্বে একবার একজন কৃতী লেখক যখন রবীন্দ্রবাবুর রচনা-বিশেষের সমালোচনা করিয়াছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ নিজে আসরে না নামিয়া কয়েকজন ভক্তকে রণসাজে সজ্জিত করিয়াছিলেন। মকরাক্ষ যখন যুদ্ধে নামিয়াছিল, তখন—"রথেতে আনিয়া গোরু বাঁধিল বিস্তর।" গো-বধ ভয়ে কেহ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে পারিল না বলিয়া মকরাক্ষের ক্ষণিক জয় হইয়াছিল, একথা কৃত্তিবাস লেখেন। যুক্তিযুক্ত হইলেও রবীন্দ্রবাবু কাহারও এঁটো কথা শুনিবার লোক নহেন; ভক্তেরাও তাঁহার পন্থা ছাড়িবেন না। তবে সাধারণ পাঠকেরা এই অদ্ভুত ব্যাকরণ পড়িয়া যাহাতে ভ্রমে না পড়েন, সেইজন্য প্রবন্ধটি লিখিলাম।

ভাগ্যক্রমে প্রবন্ধগুলি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইতেছে। অন্য পত্রিকায় যদি প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে 'প্রবাসী'র কষ্টিপাথর'-এর* স্পর্শে ঐ অসার ধাতু সোনা বলিয়া কীর্তিত হইত। রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহার সে যশ বঙ্গভাষায় অক্ষুণ্ণ রহিবে, মনে করি। আমাদের বিশেষ অনুরোধ, তিনি যেন অনধিকারচর্চায় ব্যাপৃত হইয়া অদ্ভুত সাহিত্যের সৃষ্টি না করেন।

* তখনকার 'প্রবাসী'তে 'কষ্টিপাথর' বিভাগে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা হইতে রচনা সংকলিত হইত। লেখক এখানে তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

“সাহিত্য-ধর্মের সীমানা”-বিচার

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী

কুরুক্ষেত্র-সমরে দ্রোণবধের পর অর্জুন শোক, বিষাদ ও আত্মগ্লানিতে নিতান্ত মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে সাবাস্ত করতে শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরকে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। আমাদের বঙ্গসাহিত্য-রণক্ষেত্রের স্বয়ং-নির্বাচিত গাণ্ডীবী বৃদ্ধ সাহিত্যগুরুর প্রতি বাণ নিক্ষেপ ক'রে সেরূপ বিষাদগ্রস্ত হয়েছেন কিনা জানিনে। যদি হয়ে থাকেন তাঁকে আশ্বস্ত করতে পারি, তিনি নিশ্চিন্ত হোন্। তাঁর হাতের গাণ্ডীব-টংকারে তাঁর নিজের কানে তালা ও শিশু-দর্শকদের চমক লাগলেও তা বস্তুতঃ লাল শালুমণ্ডিত বংশখণ্ড-নির্মিত ক্রীড়াগাণ্ডীবমাত্র। বৃদ্ধ রণগুরুর সুশুভ্র কেশরাজি বা সুশুভ্রতর শ্মশ্রুরাশি তাঁর বাণনিক্ষেপে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি।

ব্যাপারটা একটু খুলে বলা দরকার। কিছুদিন হতে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রের অঙ্গনে আর্টের স্বাধীনতার নামে নানারূপ উচ্ছৃঙ্খলতার যে তাণ্ডব-নৃত্য শুরু হয়েছে, তা সকলেই লক্ষ্য করেছেন। স্বাধীনতার অর্জন ও পরিচালনে যে সুদৃঢ় সংযম ও বলিষ্ঠ সুস্থ বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন তার অভাববশতঃই এইরূপ বিপরীত ব্যাপারের উদ্ভব হয়েছে। যৌন-সম্মিলনের যে অংশ, মানুষ স্বাভাবিক শ্রী বশতঃ চিরদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন রেখে এসেছে,—বর্বর পরুষহস্তে তার আবরণ উন্মোচন করে এঁরা বিজয়গর্বে স্ফীত হয়ে উঠেছেন। এঁদের কেউ বা, আপনাকে আর্ট-জগতের নূতন মহাদেশ আবিষ্কার-কর্তা কলম্বস্ বলে মনে করেছেন; কারো ভাব বা দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর সাহের

দ্রষ্টব্য: ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'সাহিত্য-ধর্মের সীমানা' শীর্ষক রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যে নূতনপন্থীরা শালীনতা ও শোভনতার সীমা লঙ্ঘন করিতেছেন, উপরোক্ত প্রবন্ধের ইহাই ছিল প্রতিপাদ্য।

রবীন্দ্রনাথের রচনাটি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই নূতনপন্থীদের পক্ষ সমর্থন করিয়া দুইজন সাহিত্যরথী সাময়িক পত্রিকার আসরে অবতীর্ণ হন: একজন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অপর জন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। রবীন্দ্রনাথের যুক্তিখণ্ডনের চেষ্টা করিয়া শরৎচন্দ্র যে প্রবন্ধ লেখেন তাহা প্রকাশিত হয় দীনেশচন্দ্র সেন ও বিজয়চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায়। আর ১৩৩৪, ভাদ্র মাসের 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন নরেশচন্দ্র। ঐ বৎসরেই আশ্বিনের 'বিচিত্রা'য় কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী নরেশচন্দ্র-কৃত বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রতিবাদ করিয়া যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহাই আংশিকভাবে এস্থলে মুদ্রিত হইল।

মতো। শুনেছি সেকেন্দর সাহ সমস্ত পৃথিবী জয় করার পর 'আর একটা পৃথিবী নেই' বলে দুঃখ করেছিলেন। এঁরাও মানবের যুগ-পরম্পরাব্যাপী সাধন-সঞ্চিত, সুকুমার-সন্তর্পণে রক্ষিত পবিত্র ভাবগুলির গায়ে যে-ভাবে পঙ্ক-লেপনের হোলিখেলা শুরু করেছেন, তাতে ঐরূপ দুঃখ করার আর বেশী বিলম্ব আছে বলে মনে হয় না। এঁরাও অচিরে রণজিৎসিংহের মত বলতে পারবেন—'বাস্, সব কালো হো গিয়া'—অবশ্য, যদি ইতিমধ্যে মানব-ইতিহাসের ভগবান যোগনিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে—'যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত'—গীতার এই প্রতিশ্রুতি-বাক্য পালন না করে বসেন।

যা হোক্ সাহিত্য-রাজ্যের এই শোচনীয় অনাচারে সাহিত্য ও সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষী মাত্রেই একান্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছেন। অনেকে এই উচ্ছৃঙ্খল অনার্য আচরণের প্রতিবাদও করেছেন। তবে প্রতিবাদটা বেশীর ভাগ সমাজ-নীতির পক্ষ হতেই হয়েছে। যাঁরা আর্টের নামে সাত-খুন মাপ হয় মনে করেন, আমি সে-দলের লোক নই। আর্টের উপদ্রবে সমাজের অকল্যাণ-আশঙ্কা ঘটলে আর্টকে সংযত করার অধিকার—সামাজিকদের আছে এ-কথা আমি পুরাদস্তুর বিশ্বাস করি। তথাপি, আমি মনে করি যে, এ-ক্ষেত্রে প্রতিবাদটা আর্টের নিজের তরফ হতে হলে বেশী ফলপ্রদ হওয়ার সম্ভাবনা।

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইবার পর 'কৈফিয়ত' নাম দিয়া নরেশচন্দ্র ইহার যে পাল্টা জবাব দেন তাহা প্রকাশিত হয় ঐ বৎসরেরই অগ্রহায়ণ মাসের 'বিচিত্রা'য়। উক্ত সংখ্যা 'বিচিত্রা'তেই কালো-বর্ডার-দেওয়া, নরেশচন্দ্রের 'নিবেদন' হইতে দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের আকস্মিক পরলোকগমনের কথা জানিতে পারা যায়।

নরেশচন্দ্র তাহাতে লিখিয়াছিলেন—

> "আমার প্রবন্ধটি ছাপা হইবার পর গত ২৭শে কার্তিক তারিখে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার জীবিতকালে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা প্রকাশিত হইল তাঁহার দেহান্তের পর। অনেক কথাই আমার প্রবন্ধে বলিয়াছি যাহা এখন লিখিলে বলিতাম না।"...

সেকালে পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী ছিলেন একজন বিশিষ্ট কবি ও রবীন্দ্রনাথের একান্ত অনুরাগী। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যখন 'সাহিত্যে সুরুচি,' 'সাহিত্যে ফিরিঙ্গিয়ানা' প্রভৃতি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেন, তখন তাঁহার পক্ষ লইয়া যাহারা ঐ সকল প্রবন্ধের জবাব দিয়াছিলেন, কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ তাঁহাদেরই অন্যতম।

কিছুদিন পূর্বে দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে শ্রীমান অমল হোম তাঁর পঠিত অভিভাষণে, সে-কাজ বেশ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করেছেন। শ্রীমানের প্রবন্ধে ধার যতই থাকুক না কেন, 'সাহিত্যিক'-পদমর্যাদা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিমর্যাদা ও বয়োমর্যাদার ভার না থাকায়, উহা যথাযোগ্য সমাদর লাভ করেছে বলে মনে হয় না।

সাহিত্য-সমাজের এই বারোয়ারি অনাচার রবীন্দ্রনাথ কেন নীরবে উপেক্ষা করছেন, সে-প্রশ্ন স্বভাবতই মনে উঠত। বাংলা সাহিত্যের চেয়ে ব্যাপকতর বিষয়ে সত্যের সন্ধানে ও প্রচারে তিনি ব্যাপৃত আছেন বলে, হয়তো, এদিকে তাঁর নজর পড়েনি, এই কথা মনে করতাম। কিন্তু মনের প্রচ্ছন্ন কোণে এ গোপন আশা বরাবরই পোষণ করে এসেছি যে, একদিন তাঁর নজর এদিকে পড়বেই, এবং এই তথাকথিত আর্টের প্রকৃত স্বরূপ লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রকট হতে বিলম্ব হবে না। সকলেই জানেন গত শ্রাবণ মাসের 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথ 'রসলোকের অমল-শুভ্র আলোকে ফেলে' বাংলা-সাহিত্যের নূতন ধারার মর্মগত কদর্য স্বরূপটা প্রকাশ করে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের হাতের বজ্র কুসুমাবৃত হলেও উহা বজ্র এবং তার আঘাতও যেমন অমোঘ, তার বেদনাও তেমনি মর্মন্তুদ। নূতনপন্থীরা চমক ভেঙ্গে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বলছেন—'এ কি হোলো! **Et tu Brute!**' এক অদ্ভুত আত্মম্ভরিতার মোহে তাঁরা মনে করতেন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ চিন্তা ও ভাবজগতে যে চিরন্তন সংগ্রাম শুরু করে গেছেন, তাঁরাই উত্তরাধিকার সূত্রে তারই ধ্বজা বহন করে চলেছেন। হঠাৎ তাঁদের সে মোহ টুটে যাওয়া যে নিরতিশয় মর্মভেদী সকরুণ ব্যাপার, সেকথা স্বীকার করতেই হবে। মহাত্মাজীর বার্দোলী সিদ্ধান্তের পর অসহযোগ সংগ্রামের অনেক বড় বড় মহারথীর যে-দশা দাঁড়িয়েছিল, এঁদেরও অবস্থা অনেকটা সেইরকম।

নূতনপন্থীদের দলের প্রধান সেনাপতি শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্-এ, ডি-এল্, ভাদ্রের 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সেনাপতিপ্রবর নিজের ও তাঁর সেনার যে শোচনীয় দশা বর্ণনা করেছেন তাতে, তাঁদের উপর অস্ত্রক্ষেপ করা ক্ষাত্রনীতিসম্মত হবে কিনা ঘোর সন্দেহস্থল। নরেশবাবুর আত্মদশা-বর্ণনাটুকু উদ্ধৃত করে দেওয়ার লোভ সংবরণ করা কঠিন :—"কুরুক্ষেত্র সমরে দ্রোণাচার্যকে আপনার বিরুদ্ধে রথারূঢ়

দেখিয়া গাণ্ডীবীর ক্লৈব্যের উদয় হইয়াছিল। যাঁহাকে নিত্য নূতন রসের পূজারী, নূতন ধারার মন্ত্রগুরু ও অগ্রদূত বলিয়া নব-সাহিত্য এতদিন পূজা করিয়া আসিয়াছে, আজ তাঁহার হাতে আঘাত খাইয়া সে যদি হঠাৎ বিভ্রান্ত ও বিচলিত হইয়া উঠে তবে তাহা বিচিত্র নয়।" অর্জুনের 'সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতে' ইত্যাদি আরো বহুবিধ দুরবস্থা ঘটেছিল। 'নব-সাহিত্যের অর্থাৎ 'নব-সাহিত্যের নবরত্নের' সে সব ঘটেছে কিনা নরেশবাবু খোলসা জানান নি। বোধ হয় এক 'ক্লৈব্যের' মধ্যেই সে সব উহ্য রেখে দিয়েছেন। ও-শব্দটি আবার বহুব্যাপকার্থবাচী। যা হোক্, অর্জুনের এই শোচনীয় দুর্দশা দূর করার জন্য স্বয়ং শ্রীভগবানকে রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে গোটা অষ্টাদশ অধ্যায় গীতাখানি extempore রচনা করে শোনাতে হয়েছিল, তবেই নাকি অর্জুনের ক্লৈব্যের অপগম ঘটে। শাস্ত্রে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোনও অবতারের আবির্ভাবের উল্লেখ না থাকায় নরেশবাবুর বোধ হয় সে সৌভাগ্যলাভ ঘটেনি। কাজেই তাঁর লেখাটিতে 'ক্লৈব্য,' 'বিভ্রান্ত' ও 'বিচলিত' হওয়া প্রভৃতির লক্ষণ আগাগোড়া দেদীপ্যমান হয়েই ফুটে আছে।

কথাটা অপ্রিয় নিশ্চয়ই—কিন্তু অসত্য মোটেই নয়। প্রমাণের অভাব নেই।

প্রথম প্রমাণ :—খামকা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অবতারণা করে অর্জুন সেজে নরেশবাবুর গাণ্ডীবহস্তে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মতের মিল না হলে তিনি অনায়াসেই তো জিজ্ঞাসু শিষ্যের মত আপনার সংশয় জানাতে পারতেন, পরস্পরের সম্বন্ধ-বিবেচনায় সেইটেই তো শোভন ও সংগত হোতো। দ্রোণাচার্য অর্জুনের যুদ্ধ-কল্পনা এরূপ ক্ষেত্রে, দেশ-কাল-পাত্র জ্ঞানশূন্য কল্পনার উৎকট বিকার মাত্র।

দ্বিতীয় প্রমাণ :—সাহিত্যিক প্রতিপক্ষগণের প্রতি 'উন্মত্তের মত' 'ইট পাটকেল যা খুশী' প্রভৃতি নানাবিধ সুরুচিবহির্ভূত ভাষা প্রয়োগ। সাহিত্যিক বা সামাজিক কোনও আদর্শেই ও-গুলি শিষ্টাচারসম্মত নয়।...

তৃতীয় প্রমাণ :—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও যথার্থ বিনয়নম্র শ্রদ্ধার ভাবের ন্যূনতা। অবশ্য অন্যান্য প্রতিপক্ষদের তুলনায় নরেশবাবু তাঁর সম্বন্ধে অনেক বেশী ভাষার সংযম রক্ষা করে চলেছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু ভাবের অসংযম অনেক সময় ভাষার আড়াল হতেও ফুটে বেরিয়েছে। একটা উদাহরণ দিলেই কথাটা পরিষ্কার হবে। নরেশবাবু লিখেছেন—"তাঁর সাহিত্য-

ধর্ম প্রবন্ধে যে সমালোচনা করিয়াছেন, তার তলায় তলায় যে এই কথাগুলিই তাঁকেও অনবরত খোঁচা মারিতেছে তা স্পষ্টই দেখা যায়। তবু সাহিত্যের প্রকৃতি বিচারে যে এই সব কথা একেবারে অবান্তর রসজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ সে-কথাটা নিজের কাছে একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাই তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন," ইত্যাদি।

উদ্ধৃত অংশের মধ্যে 'অনবরত খোঁচা মারিতেছে,' 'একেবারে অস্বীকার,' 'বাধ্য হইয়াছেন' এই কথাগুলি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সোজা কথায় নরেশবাবুর মতে রবীন্দ্রনাথের আপত্তিও তাঁর পূর্বগামীদের মতই সমাজনীতির দিক হতে। তবে তিনি নাকি সাহিত্যরসজ্ঞ-শিরোমণি, কাজেই তাঁকে পদ-মর্যাদার খাতিরে আসল আপত্তিটাকে সাহিত্যিক আপত্তির সাজ পরিয়ে সাহিত্য-সমাজে বের করতে হয়েছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ সত্যগোপনের অপরাধে অপরাধী তো বটেই—মিথ্যা প্রচারও সম্ভবতঃ করেছেন। রবীন্দ্র-নাথ সম্বন্ধে এত বড় গুরুতর অভিযোগ ইতঃপূর্বে শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

যা হোক রবীন্দ্রনাথ যে উক্তিটির দ্বারা এরূপ গুরুতর অপরাধ করেছেন তা দেখার ঔৎসুক্য পাঠকদের স্বভাবতই হতে পারে। সে উক্তিটি এই—"সাহিত্যে যৌন-সমস্যার তর্ক উঠেছে, সামাজিক হিতবুদ্ধির দিক দিয়ে তার সমাধান হবে না—তার সমাধান কলারসের দিক থেকে।" ভাবটাও কাটা-ছাঁটা পরিষ্কার, ভাষাও নির্মল স্বচ্ছ। কোথাও আবছায়া বা ধোঁয়াটে কিছুমাত্র নাই। অথচ ওর মধ্য হতেই 'খোঁচা মারিতেছে' প্রভৃতি হরেক রকমের জিনিস নরেশবাবুর অদ্ভুত ভেল্কিবাজিতে বেরিয়ে পড়ল। শাস্ত্রে বলে শব্দ ব্রহ্ম—এক ওঁ-শব্দ হতেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ। আশ্চর্য কিছুই নাই।

নরেশবাবু যদি ক্ষমা করেন, তা' হলে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি যে-সব আপত্তি তুলেছেন অতি সহজেই তার মীমাংসার পথ বাৎলিয়ে দিতে পারি। একেবারে অমোঘ মুষ্টিযোগ। তিনি শুদ্ধাচারে শুদ্ধাসনে বসে নিবিষ্ট শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি অষ্টোত্তর শতবার পাঠ করুন, তাঁর সকল আপত্তির উত্তর তাঁর আপনার মনের মধ্যেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। কথাটা পরিহাসের মতো শোনালেও মোটেই পরিহাস নয়। যে কেহ দুটি প্রবন্ধ অভিনিবেশ সহকারে পড়বেন, তিনিই একথার সত্যতা উপলব্ধি

করবেন। কিন্তু নরেশবাবু রাজী হলেও 'বিচিত্রা'র সম্পাদকপ্রবর যে রাজী হবেন, সে সম্ভাবনা কম। তাঁর যে আবার কাগজ পোরাবার গরজ আছে।

নরেশবাবু রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি পড়েছেন স্কুলমাষ্টার ও উকীলের চোখ দিয়ে, রসজ্ঞ তত্ত্বজিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে নয়। তাঁর প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে তার পরিচয় আছে।*

* * *

রবীন্দ্রনাথ 'হাট ও হট্টগোল' সম্বন্ধে যে কথা ব্যঙ্গাত্মকভাবে বলেছেন, সেটা যে তাঁর মতো দীর্ঘপ্রবাসী ও নির্জন নিবাসীর পক্ষে নিতান্ত অনধিকার-চর্চা তা নরেশবাবু প্রতিপন্ন করে দিয়েছেন। তবুও তো নরেশবাবু বোধ হয় খবর রাখেন না রবীন্দ্রনাথ একান্ত অবজ্ঞাভরেই হাটকে দূরে দূরে রেখেই চলে থাকেন। তা নইলে তিনি কদাচই লিখতেন না—

"আকাশ ঘিরে জাল ফেলে তারা ধরাই ব্যবসা
থাকগে তোমার পাটের হাটে মথুর কুণ্ডু শিবুসা।"

উপসংহারে নরেশবাবু মহাশয় হট্টগোল যে হাটের পূর্বগামী, ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাস হতে সে-কথা নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন করে (এ দেশের ইতিহাসেও উদাহরণ মিলতো যেমন রামরূপহাটের ষাট হাজার বছর পূর্বের রামায়ণরূপ হট্টগোলের সৃষ্টি।) সর্বশেষে জোর-গলায় ঘোষণা করেছেন—

"এদেশে যদি হাট নাও বসে থাকে, আমরা পশ্চিমের হাট হতে হট্টগোল সওদা করে গ্রামোফোনে ধরে এনে বীণাপাণির বাণীকুঞ্জে ও মানসসরোবরের কূলে পাঁচ হাত অন্তর একটি করে বসিয়ে দিব। আজ বিশ্বব্যাপী ভাব বিনিময়ের দিনে আমাদের এই জন্মগত অধিকার (Birth-right) হতে কে আমাদের বঞ্চিত করতে পারে?"

হায় রবীন্দ্রনাথ! যা-না লেখার জন্য চতুরাননের নিকট এত মর্মান্তিক কাতর মিনতি, চতুরানন 'শিরসি' কি ঠিক তাই-ই লিখে বসলেন!

* ইহার পর লেখক বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়া নরেশচন্দ্রের যুক্তিগুলি খণ্ডন করিয়াছেন। বাহুল্যবোধে সেগুলি বাদ দিয়া কেবলমাত্র প্রবন্ধের শেষাংশটুকু এখানে উদ্ধৃত হইল।

সাহিত্যে স্বেচ্ছাচার

গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

বঙ্কিমের তীব্র সমালোচনা যেদিন হইতে বন্ধ হইয়াছে, সেই দিন হইতে বাঙ্গালা সাহিত্য নিরঙ্কুশ বলা যাইতে পারে। 'বঙ্গদর্শনে'র পর সাহিত্যের যুগান্তর-প্রবর্তক, শক্তিশালী সাহিত্য-পত্রের আর উদয় হয় নাই। 'বঙ্গদর্শনে'র পরবর্তী 'বান্ধব' বা 'আর্যদর্শন,' 'নবজীবন' বা 'প্রচার' কেহই তেমন প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতে পারে নাই। না করুক্, তাহারা 'বঙ্গদর্শনে'র পন্থানুসরণ করিয়া সাহিত্যের ইষ্টসাধনই করিয়াছিল—তখনও কিন্তু বঙ্কিমের লেখনী বিশ্রামলাভ করে নাই। তারপর, উক্ত সাহিত্য-পত্র-চতুষ্টয়ের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর সাহিত্যের অভ্যুদয়। অবশ্য তৎপূর্বে 'ভারতী' ঠাকুর-বাড়ীর অন্তঃপুরে অবগুণ্ঠনবতী বধূরূপেই ছিলেন। কচিৎ ঠাকুরবাড়ীর আত্মীয়-অন্তরঙ্গের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিলেও বাহিরের সঙ্গে বড় একটা পরিচয় ছিল না। সুতরাং সাহিত্যে 'ভারতী'র প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। তারপর, রবীন্দ্রনাথের উদয়ে গদ্য-পদ্যে সাহিত্যের ভঙ্গীর একটু পরিবর্তন হইয়াছে। তাহাই বর্তমানে ঠাকুরবাড়ীর সাহিত্য বলিয়া পরিচিত। সেই নিরঙ্কুশ সাহিত্যের কথাই আমরা বলিব। 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথ যেরূপে দেখা দিয়াছিলেন, তাহাতে কে ভাবিয়াছিল, কবি-রবীন্দ্রনাথ ঋষি-রবীন্দ্রনাথ হইয়া বিশ্বামিত্রের মত পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন সাহিত্যজগৎ গড়িতে বসিবেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব-সাধনা যে নিষ্ফল হইয়াছে, তাহার প্রমাণ তাঁহার বর্তমান রচনা। তিনি 'সবুজপত্রে'র স্কন্ধে ভর করিয়া—ব্যারিষ্টার-জামাতা বীরবলকে

দ্রষ্টব্য : গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন সে যুগের একজন প্রথিতযশা কবি। গদ্য-পদ্য উভয়বিধ রচনায় তাঁহার নৈপুণ্য ছিল। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন 'বীরবলী' ভাষার পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন, গিরিজানাথ তখন প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়কে আক্রমণ করিয়া 'রাণাঘাট বার্তাবহে' দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। একটির নাম 'সাহিত্যে কালাপাহাড়।' প্রমথ চৌধুরীই এই 'সাহিত্যের কালাপাহাড়'। চলতি ভাষা প্রবর্তন সম্বন্ধে অনুকূল সমালোচনা করিলেও গিরিজানাথ তাঁহার প্রতিভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'সাহিত্যে স্বেচ্ছাচার' রবীন্দ্রনাথের নূতন ভাষাসৃষ্টির প্রচেষ্টা সম্বন্ধে প্রতিকূল সমালোচনা। পূর্বোদ্ধৃত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধের ন্যায় এটিও অমূল্যচরণ সেনের উদ্ধৃতি হইতে সংকলিত।

সাহিত্যের নূতন বিশ্বকর্মারূপে খাড়া করিয়াছেন। বলিতে কি, তাঁহার জামাতৃ-প্রীতির ফলে সাহিত্যের দেবতা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। যে বীরবলকে একদা আমরা বন্ধুবান্ধবের বৈঠকে, পরিহাসের পরিষদে বাহবা লইতে দেখিয়াছি, সেই বীরবলকে তিনি সাহিত্যের রাজসভায় আহ্বান করিয়াছেন—আসন দিয়াছেন। ইয়ারকির হাল্কা চটুল ভাষা খেয়ালের খাতায় থাপ খাইতে পারে, মজলিসে উত্তম হইতে পারে, কিন্তু রাজসভার একেবারেই অযোগ্য। রবীন্দ্র-নাথও যে সে কথা বুঝেন না, ইহা সম্ভব নহে। কিন্তু জানি না, কেন তিনি হঠাৎ এই বীরবলী ভাষার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। 'সবুজপত্র' বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ সাহিত্যের যে আদর্শ খাড়া করিয়াছে, তাহা বীরবলের ইংরাজীনবীশ ব্যারিষ্টার-বৈঠকের যোগ্য হইতে পারে, বাঙ্গালার সাহিত্য-মন্দিরের যোগ্য নহে। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে গদ্য-সাহিত্যের এমন কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি আমরা আর দেখি নাই। তাই বলিতেছি, রবীন্দ্রনাথ,—তুমি আর যাহাই কর, সাহিত্যের মাথা খাইও না—সাহিত্যের সুপ্রতিষ্ঠিত উন্নত আদর্শকে খর্ব করিও না। তুমি শক্তিমান্, তাই তোমাকে এত কথা বলিলাম। যদি পার তো 'সাধনা'র যুগ আবার ফিরাইয়া আন। আমরা তোমাকে 'সাধনা'র কবিরূপে আবার দেখিতে চাই, কবিরূপে,—বিশ্বামিত্ররূপে নহে।

* *
*

ভেল্কীবাজি

অকিঞ্চন দাস

"* * * ভেল্কী জগতে চিরদিন টিকে না, মানুষের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভেল্কীবাজিও চিরকালের মত অবসান প্রাপ্ত হয়। আমার বিশ্বাস,

দ্রষ্টব্য: তখনকার দিনে রবীন্দ্র-বিদূষণ শুধু যে কলিকাতার সাময়িক পত্রিকাগুলিতেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, মফস্বলেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহার প্রমাণ '২৪ পরগণা-বার্তাবহ' নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত অকিঞ্চন দাসের এই রচনাটি। ইহাও অমূল্যচরণ সেনের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ হইতে সংকলিত। এই রচনাটি হইতে অখ্যাত পল্লী-পত্রিকাখানির রবীন্দ্র-বিদ্বেষ অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচনা যে ক্ষেত্রবিশেষে কিরূপ তীব্র এবং ঝাঁঝালো হইয়া উঠিত এটির ছত্রে ছত্রে তাহা সুপরিস্ফুট।

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব শুধু তাঁহার জীবনকাল পর্যন্ত। অতঃপর আবার বাঙ্গালা সাহিত্যে নবযুগের উদয় হইবে। আমি সাহিত্যের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি চাই; তাই দেশের ও দশের দিকেও আমায় চাহিতে হয়। কবিজনোচিত দানের অপেক্ষা ব্যর্থ অনুকরণ-লালসাই তাঁহার বেশী।

* * *

"রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রকৃত আন্তরিকতারই প্রধান অভাব। আন্তরিকতা-গুণেই প্রতিভার পরিচয়—সে পরিচয় রবীন্দ্রনাথের ভিতর বড়ই অল্প। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতাই বাহ্যাড়ম্বরময়। তাহা কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে না। তাহার কারণ কি?—তাহার কারণ অনুকরণ।"

"রবীন্দ্রনাথের রূপ বহু; তিনি সাজিতে আসিয়াছিলেন, সাজিয়া যাইবেন। তিনি প্রথম বয়সে শেলি সাজিয়াছিলেন, তাহার পর হুইটম্যান, মেটরলিঙ্ক এবং এখন 'সবুজপত্রে' ইবসেন সাজিতেছেন—কি গদ্যে, কি পদ্যে, কি যৌবনে, কি প্রৌঢ়ে তিনি কেবলই সাজিতেছেন। তিনি যাহা নন তাহা সাজিতে গিয়াই তো পদে পদে তাঁহার প্রয়াস ব্যর্থ! অবশ্য তাঁহার আর্থিক সুবিধা আছে বটে, স্কট-এর ন্যায় যথেষ্ট আয় হইতেছে বটে, কিন্তু আমি বলিতে পারি তাঁহার এই অভাবনীয় উত্থান জীবদ্দশা অবধিই থাকিবে। এখন তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার চক্ষে ধাঁধা লাগাইতে পারেন, কিন্তু শেষ রক্ষা হইলে হয়। এখন তিনি মূর্খ বাঙ্গালী জাতির চক্ষে ধূলি দিয়া বাহবা লইতে পারেন বটে, কিন্তু এ সুযোগ চিরকাল রহিবে না। যখন বঙ্গের সাহিত্যসেবী মাত্রেই তিন-চারিটি করিয়া পাশ্চাত্য ভাষায় দীক্ষিত হইবে, তখন রবীন্দ্রনাথ যে কত বড় অনুকরণপ্রিয় কবি তাহা ধরা পড়িয়া যাইবে। কবি বলিয়াছেন, "Talent is the god of moments whereas Genius is the god of ages." রবীন্দ্রনাথের talent-ই বা কতটা এবং genius-ই বা কতটা তাহা এখনও নিরূপণ করিবার সময় আসে নাই। রবীন্দ্রনাথের নিজস্বই বা কতটা এবং অনুকরণবাহুল্যই বা কিরূপ, সময়ই তাহার মীমাংসা করিবে।"

"রবীন্দ্রনাথের ভাব যেমন বিকট, ভাষাও তেমনি উদ্ভট। এ মনগড়া ভাষা কতদিন টিকিবে, তাহাতেও আমাদিগের সন্দেহ আছে। * * * অথচ রবীন্দ্রনাথের মনে মনে একটা অহংকার আছে যে, তিনি তাঁহার প্রাদেশিকতা-

দুষ্ট ভাষায় দেশের চাষা-মজুরদের বেশ বুঝাইতেছেন। হায় ভাগ্য, যে ভাষা ব্রজেন্দ্র শীল প্রভৃতি ক্ষণজন্মা পণ্ডিতগণই বুঝিতে পারেন না, সে ভাষা চাষা-মজুরে কেমন করিয়া বুঝিবে? মাননীয় কাশিমবাজারাধিপতি বলিতেছেন—"ঐ ভাষা ও ভাব লেখকের ভাষা ও ভাবদৈন্যের সূচক। অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা একটি ভান মাত্র।"

"রবীন্দ্রনাথ genius কিনা, তাই ভাষাদেবীকেও মনগড়া করিয়া লইয়াছেন। সাধারণের ভাষাকে অসাধারণ করিয়া তুলিয়াছেন। দেখুন, একবার চাষা-মজুরদের বুঝাইবার পদ্ধতি। যথা—

"সে যে দেখেছি আমার চিত্তাকাশে ভোর বেলাকার অরুণরাগরেখার মত। আমার জীবনের দিন যে সেই সোনার পাথেয় নিয়ে যাত্রা করে বেরিয়েছিল। তারপরে? পথে কালের মেঘ কি ডাকাতের মত ছুটে এল? সেই আমার আলোর সম্বল কি এক কণাও রাখল না। কিন্তু জীবনের ব্রাহ্মমুহূর্তে সেই যে উষা সতীর দান, দুর্যোগে সে ঢাকা পড়ে তবু সে কি নষ্ট হবার?"

"সুধী পাঠকবর্গ কিছু বুঝিতে পারিলেন কি? ইহাই কি সহজবোধ্য ভাষা? আমরা মূর্খ হইলেও ইব্‌সেন বুঝিয়াছি, নীটসে বুঝিয়াছি, হুইটম্যান বুঝিয়াছি, এমন কি রবিবাবুর আদর্শ মেটরলিঙ্ককেও বুঝিয়াছি, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ রবীন্দ্রনাথের ভাবের ভিতর বহু আয়াস স্বীকার করিয়াও প্রবেশ করিতে পারিতেছি না। তারপর আরও মজা দেখুন। রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী' পণ্ডিত ব্রজেন্দ্র শীলের দুর্বোধ্য হইলেও রবিভক্তেরা বেশ বুঝিতে পারে। বাঙ্গালার প্রবীণ দার্শনিকশ্রেষ্ঠ যে রচনার ভিতর তলাইতে পারেন না, বাঙ্গালার নবীন-নবীনাগণ তাহা অনায়াসে বুঝিয়া চলে, ইহার অর্থ কি? ইহা কি ব্রজেন্দ্র শীল প্রভৃতি মনীষিগণের প্রবীণ বয়সের দোষ, না নবীন-নবীনাগণের সবুজ যৌবনের দোষ? বুঝি তাহাদের চশমা বুঝে, চোখ বুঝে না—কান বুঝে, মন বুঝে না। ইহাই রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব।"

কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা

মোহিতচন্দ্র সেন

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণ ১৩০৩ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩০৩ সালের পর কণিকা, কথা, কাহিনী, কল্পনা, ক্ষণিকা ও নৈবেদ্য এই কয়টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং এতদ্ব্যতিরিক্ত অনেকগুলি কবিতা বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। রবীন্দ্রবাবুর সমুদয় কবিতাগুলি একত্রে পাইবার ইচ্ছা তাঁহার পাঠকগণের স্বাভাবিক এবং সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতেই এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

এই সংস্করণে তাঁহার পূর্বপ্রকাশিত কতকগুলি কবিতা বাদ গিয়াছে এবং যেগুলি ছন্দ ও ভাবসৌন্দর্যে মনোহর ও মর্মস্পর্শী সেগুলিকে রক্ষা করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। আদর্শ কবিতার লক্ষণ বিজ্ঞানসম্মত ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য হইলেও এরূপ কবিতা চিনিয়া লওয়া যে খুব শক্ত তাহা বোধ হয় না। যাহা যথার্থ কবিতা, দিব্য কল্পনা যাহাকে জন্ম দিয়াছে, অকৃত্রিম ছন্দঃ-সৌন্দর্য তাহাকে বাহিরে ভূষিত করে এবং ভাবের গভীরতা তাহাকে অন্তরে পরিপূর্ণ করিয়া থাকে। তাহার আনন্দ কল্যাণকে আবাহন করে এবং সৌন্দর্যে তাহা জগতের নিত্যসুন্দর অনির্বচনীয় পদার্থসমূহের সমতুল হয়। সাধারণভাবে সংক্ষেপে সংকেত স্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, যে কবিতা অনির্বচনীতায় সংগীতের যত সদৃশ এবং যে কবিতায় পাঠক মানবজীবনের প্রসারতা যত অধিক অনুভব করেন, তাহা তত শ্রেষ্ঠ। যিনি কথার সাহায্যে একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করেন তিনি কবি, কিন্তু উচ্চতর কবি তিনি যিনি শুধু চিত্রাঙ্কনে পরিতুষ্ট না হইয়া তাঁহার ছন্দের মর্মে মর্মে সংগীতের অপূর্ব অপরূপ ঝংকারগুলি আনিতে পারেন, যিনি জীবনের একটি সামান্য-

দ্রষ্টব্য : কবির ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০৩ সালে। ইহাই 'টালি এডিসন' নামে খ্যাত।

মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের সংস্করণটি ১৩১০ সালে ২০নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা, মজুমদার লাইব্রেরী হইতে এস. সি. মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৬০। ইহার অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলিকে যাত্রা, হৃদয়-অরণ্য, নিষ্ক্রমণ, বিশ্ব এই কয়ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই সংস্করণে সন্নিবিষ্ট সম্পাদকের ভূমিকাটি এস্থলে গৃহীত হইয়াছে।

তম সত্যকে পরিস্ফুট ও সুন্দর করিয়া তুলিতে পারেন, তিনি কবি, কিন্তু উচ্চতর কবি তিনি—যাঁহার কবিতায় সমগ্র জীবনের সুগম্ভীর বিজয়গীতি শ্রুত হয়। যিনি সত্য ও ছন্দের সাহায্যে পাঠকের মনে আনন্দ সৃজন করেন, তিনি কবি, কিন্তু উচ্চতর কবি তিনি—যাঁহার নিজের আনন্দ এত স্বাভাবিক ও যথেষ্ট যে পাঠক কণামাত্র আস্বাদন করিয়া বুঝিতে পারেন, আমি আগন্তুক মাত্র, আমার অপেক্ষা কবির নয়ন অশ্রুতে অধিক সমাকীর্ণ, আমার অপেক্ষা কবির হাস্য আনন্দে অধিক উদ্ভাসিত।

এইখানেই রবীন্দ্রবাবুর কৃতিত্ব। ছন্দ ও ভাবসৌন্দর্যে শ্রেষ্ঠ কবিতা তিনি এত রচনা করিয়াছেন যে বঙ্গদেশ তাঁহার কাছে অশেষ ঋণে ঋণী। এই সকল কবিতা তাঁহার পাঠকদিগের নিকট সুপরিচিত। শারদপ্রাতে, চৈত্র-রজনীতে অথবা 'ঘনঘোর বরষায়,' একাকী বা বন্ধুসনে, ইহাদের লইয়া অনেকেই আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন এবং 'কখনও সুখে কখনও দুখে,' কখনও আশায়, নৈরাশ্যে, আশঙ্কায়, সংকল্পে, ব্যথায়, উচ্ছ্বাসে, হৃদয়ের সহিত ইহারা যথার্থ আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছে। তবু শঙ্কা হয় যে, কবি সাধারণের নিকট গানের দ্বারা যত পরিচিত, কবিতার দ্বারা তত নন। এ আশঙ্কা সত্যমূলক হইলে বাস্তবিক দুঃখের কারণ। যাঁহার কবিতা এই দেশের ও সময়ের উপযোগী একটি সুমহান্ সংবাদ লইয়া আসিয়াছে, সর্ববিধ মঙ্গল অনুষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ দিব্য কল্পনা যাঁহার কবিতাকে বরণ করিয়াছে, যিনি আমাদের আধুনিক জটিল, কর্মক্লিষ্ট জীবনসমস্যার উপর নূতন আলোক বিকীর্ণ

মোহিতচন্দ্র সেন ছিলেন রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশিষ্ট বোদ্ধা। তাঁহার সম্পাদিত এই কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতার বিভিন্ন অংশ বর্জিত হইয়াছিল। ইহা কোন কোন ক্ষেত্রে পাঠকের অপ্রীতির কারণ হইয়া উঠে। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলিয়াছিলেন, "ইহার জন্য মোহিতবাবু বড় দায়ী নহেন, উহা আমারই দোষ। এখন এমন হইয়াছে যে, নিজের কবিতা পাইলে তাহার ভিতর কলম না চালাইয়া থাকিতে পারি না।"—শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ('সুপ্রভাত,' শ্রাবণ, ১৩১৯)।

পুলিনবিহারী সেন ও শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় সংকলিত 'রবীন্দ্রকাব্যে পাঠভেদ' ('দেশ,' রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা—বৈশাখ, ১৩৬৯) প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত সংস্করণে উক্ত কবিতার প্রথমাংশ (১-৮৭ ছত্র) সম্পূর্ণ বর্জিত হয়।

করিয়াছেন, তাঁহাকে যথার্থভাবে গ্রহণ না করিয়া আমাদের দেশ শুধু নিজের হতভাগ্যতারই পরিচয় দিয়াছে।

রবীন্দ্রবাবুর কবিতা বুঝিতে গেলে কোন কোন পাঠকের পক্ষে কোনও অন্তরায় থাকা সম্ভব, কিন্তু আশা করি তাহা অচিরে দূর হইবে। বর্তমান সংস্করণ তাঁহাদিগকে দুই একটি বিষয়ে সাহায্য করিলেও করিতে পারে। এই সংস্করণে রবীন্দ্রবাবুর কতকগুলি কবিতা এবং কোনও কোনও কবিতার কতক অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে। পত্রবাহুল্য কখনও পুষ্পকে পূর্ণসৌন্দর্যে প্রকাশিত হইতে দেয় না এবং পুষ্পিত স্তবকে সকল পুষ্পই কিছু সমানভাবে প্রস্ফুটিত হয় না। বাদ দিয়াও যে কবিতা কয়টি অবশিষ্ট রহিল তাহাদের সংখ্যা ও বিষয়বৈচিত্র্য উভয়ই পাঠকের বিস্ময়ের কারণ হইবে সন্দেহ নাই। বিষয়গুণে যে সকল কবিতা পরস্পরের সদৃশ সেগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিতর একত্র করা হইয়াছে।

পাঠকের সুবিধার্থে এখানে শ্রেণী কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি—

১ম ভাগ (ক)। যাত্রা, হৃদয়ারণ্য, নিষ্ক্রমণ, বিশ্ব।
১ম ভাগ (খ)। সোনার তরী, লোকালয়।
২য় ভাগ (ক)। নারী, কল্পনা, লীলা, কৌতুক।
২য় ভাগ (খ)। যৌবনস্বপ্ন, প্রেম।
৩য় ভাগ। কবিকথা, প্রকৃতিগাথা, হতভাগ্য।
৪র্থ ভাগ। সংকল্প, স্বদেশ।
৫ম ভাগ। রূপক, কাহিনী, কথা, কণিকা।
৬ষ্ঠ ভাগ। মরণ, নৈবেদ্য, জীবনদেবতা, স্মরণ।
৭ম ভাগ। শিশু।
৮ম ভাগ। গান।
৯ম ভাগ (ক)। নাট্য—সতী, নরকবাস, গান্ধারীর আবেদন, কর্ণ-কুন্তী সংবাদ, বিদায়-অভিশাপ, চিত্রাঙ্গদা, লক্ষ্মীর পরীক্ষা।
৯ম ভাগ (খ)। নাট্য—রাজা ও রাণী।

এই শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে হয়। সকলেই জানেন কবিতা শ্রেণীভুক্ত করা কত কঠিন। সুন্দর বস্তুকে অবলম্বন করিয়া মনে যে ভাববৈচিত্র্য উৎপন্ন হয়, তাহা সান্ধ্য-গগনে বিকশিত বর্ণ-

বৈচিত্র্যের ন্যায়। কোন্ ভাব বা কোন্ বর্ণ প্রাধান্যলাভ করিয়াছে তাহা বলা সুকঠিন। ভাবের ছন্দোময় প্রকাশ অর্থাৎ কবিতা সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে। বিশেষতঃ রবীন্দ্রবাবুর কবিতা সম্বন্ধে এ কথা বড় খাটে। তাঁহার কবিতা সম্পূর্ণ অকৃত্রিম, তাহার ভিতর বানানো কিছুই নাই, কোন একটি ভাবকে খাড়া করিয়া তাহার চতুর্দিকে রঙ ফলানো নাই, কোন একটি মর‍্যাল বা নৈতিক বিধি শিক্ষা দিবার সজ্ঞান চেষ্টাও নাই। তাঁহার অনেকগুলি কবিতা দেবনিশ্বসিতের ন্যায় অহৈতুকী, 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি' উঠিয়াছে। বুদ্ধিদ্বারা তাহাদের অর্থ ছাঁকিয়া বাহির করা এক প্রকার দুঃসাধ্য। সোনার তরীর উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি কে? হৃদয়-যমুনায় কাহাকে আহ্বান করা হইয়াছে? এ সব প্রশ্ন আমরা বৃথা জিজ্ঞাসা করি। অথচ এই দুইটি কবিতাতে হৃদয়ের যে ভাবটি প্রকাশিত তাহা কত পরিষ্কার, যে বেদনা ধ্বনিত হইয়াছে তাহা কত সুস্পষ্ট। কবি যে ভাবজয়ী মূর্তিটি সৃজন করিয়াছেন আমরা বিস্মিত ব্যথিত হৃদয়ে তাহার দিকে চাহিয়া থাকি এবং তাহার ভাষার সহিত আমাদের হৃদয়ের ভাষা মিশিয়া যায়। কিন্তু তাহার কি নাম দিব? কোন্ শ্রেণীতে তাহাকে রাখিব। সহজে এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারি না।

এইরূপ কতিপয় কবিতাকে একত্র করিয়া 'সোনার তরী' নাম দেওয়া হইয়াছে। সেগুলির সাধারণ লক্ষণ দুই চারিটি কথায় বলিতে চেষ্টা করিব। রবীন্দ্রবাবুর পাঠকমাত্রেই জানেন তাঁহার প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ কত গভীর, তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্যে কিরূপ মুগ্ধ। এ সম্বন্ধে তিনি একটি অপ্রকাশিত চিঠিতে লিখিয়াছেন* "আমি অনেকবার ভেবে দেখেছি, প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গূঢ় গভীর আনন্দ পাওয়া যায় সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা সুবৃহৎ আত্মীয়তার সাদৃশ্য অনুভব ক'রে—এই নিত্য সঞ্জীবিত সবুজ সরস তৃণলতা তরুগুল্ম, এই জলধারা, এই বায়ুপ্রবাহ, এই সতত ছায়ালোকের আবর্তন, এই ঋতুচক্র, এই অনন্ত আকাশপূর্ণ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রবহমান স্রোত, পৃথিবীর অনন্ত প্রাণীপর্যায়, এ সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ীর রক্তচলাচলের যোগ রয়েছে—সমস্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে আমরা একই

* ২৩এ আগষ্ট, ১৮৯৪।

ছন্দে বসানো, এই ছন্দের যেখানে যতি পড়ছে যেখানে ঝংকার উঠছে, সেইখানেই আমাদের মনের ভিতর থেকে সায় পাওয়া যাচ্ছে—প্রকৃতির সমস্ত অণুপরমাণু যদি আমাদের সগোত্র না হ'ত, যদি প্রাণ সৌন্দর্যে এবং নিগূঢ় একটা আনন্দে অনন্তকাল স্পন্দমান না থাকত, তা'হলে কখনই এই বাহ্য-জগতের সংসর্গে আমাদের এমন একটা আন্তরিক আনন্দ ঘটত না। যাকে আমরা অন্যায়পূর্বক জড় বলে থাকি সেই জগতের সঙ্গে আমাদের চেতনার একটা যোগাযোগের গোপন পথ আছে। নইলে কখনই, নির্জীবের প্রতি জীবের, জড়ের প্রতি মনের, বাইরের প্রতি অন্তরের এমন একটা অনিবার্য ভালবাসার বন্ধন থাকতেই পারে না। আমার সঙ্গে এই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম পরমাণুর বাস্তবিক কোন জাতিভেদ নেই, সেই জন্যেই এই জগতে আমরা একত্রে স্থান পেয়েছি, নইলে আমাদের উভয়ের জন্য দুই ভিন্ন জগৎ সৃজিত হয়ে উঠত। আমি যখন মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে যাব, তখনও আমার অনন্ত প্রাণময় বিশ্বাত্মীয়ের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন হবে না। আমি আমার নিজের ভিতরকার সহজ আনন্দ থেকে এইটে অনুভব করি। আমার আর কোন যুক্তি নাই।"

প্রকৃতির প্রতি কবির অনুরাগ কত গভীর এবং তাহার আত্মীয়তা-সুখে তিনি কত সুখী, তাঁহার কাব্য হইতে যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। মাকে মা বলিয়া সন্তান যেমন সার্থক হয়, প্রকৃতিকে সুন্দর বলিয়া কবি তেমনি আপনার কবিতাকে সার্থক করিয়াছেন। আমরা 'বিশ্ব'খণ্ডের কবিতা-গুলিতে কোনও কোনও সুন্দর বস্তুবর্ণনায় এই সার্থকতা দেখিতে পাই। কিন্তু অনির্বচনীয়কে কে বর্ণনা করিবে? এই আলো-আঁধারের স্পন্দনের সহিত কত ভাব কত সংকেতই হৃদয়ের উপর দিয়া ভাসিয়া যায় তাহাদিগকে কে ধরিয়া রাখিবে? তাহাদিগের মর্ম কিসে পরিস্ফুট হইবে?

আমাদের হাতে শুধু একটিমাত্র জাল আছে যাহাতে প্রকৃতির এই অনির্বচনীয় ক্ষিপ্রগতি ক্ষণিক ভাবগুলিকে ধরিয়া রাখা যায়, তাহা সংগীত। বাস্তবিক ভাষাহীন সংগীতের সুরের ভিতরে কি একটি বেদনা, আনন্দ, আকুলতা বা শান্তি নিহিত থাকে যাহার কাছে বিশ্বের চঞ্চল শোভা ও সৌন্দর্য মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিশ্চল হইয়া যায় এবং সমবেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু এই নির্বাক সংগীতকে ভাষায় যিনি ব্যক্ত করিতে পারেন

তাঁহাকেই প্রকৃত কবি বলিয়া স্বীকার করি এবং সোনার তরী প্রভৃতি কবিতার যদি কোন অর্থ বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহা এই যে, ঘন বর্ষা, ভরা নদী, সঞ্চিত ধান দ্রুত বহমান তরী প্রাণে যে আকুলতা সঞ্চার করে তাহার সহিত মানবহৃদয়ের একটি অতি চিরন্তন ও গভীর বেদনা মিলিত হইয়া একটি অপূর্ব রাগিণী সৃজন করিয়াছে। যে রাগিণীকে একটি চিত্রে অথবা অবস্থা বিন্যাসে পরিণত করা হইয়াছে। 'সোনার তরী' শীর্ষক কবিতাগুলির ইহাই বিশেষত্ব।

'লীলা' খণ্ডের কবিতাগুলির ভিতর পাঠক একটি বিশেষ মাধুর্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। প্রেমের যে সুখ বা দুঃখ তাহার এমন একটি গাম্ভীর্য আছে যে তাহা লইয়া লীলাকৌতুক চলে না। কিন্তু লৌকিক প্রেম অনেক সময় প্রেমের ছায়া মাত্র। কল্পনা করিতে পারি যে এই অবান্তর ছায়া যথার্থ প্রেমের নিকট তিরস্কারভাজন না হইয়া কৌতুকভাজন হইয়াছে এবং তাহার কৌতুকমিশ্রিত কটাক্ষ দ্বারা লজ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। এই কৌতুক হাস্যেই লীলার কবিতাগুলি দীপ্তিমান। তাহাদের প্রত্যেকটির ভিতর গভীর অর্থ লুক্কায়িত আছে। কিন্তু—

"গভীর সুরে গভীর কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই,
হাল্কা তুমি কর পাছে
হাল্কা করি তাই
আপন ব্যথাটাই।"

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—"ভালবাসা আপনাকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতায় কেবল সত্যকে নহে অলীককে, সংগতকে নহে অসংগতকে আশ্রয় করিয়া থাকে। স্নেহ আদর করিয়া সুন্দরমুখকে পোড়ারমুখী বলে, মা আদর করিয়া ছেলেকে দুষ্টু বলিয়া মারে, ছলনাপূর্বক ভৎর্সনা করে। সুন্দরকে সুন্দর বলিয়া যেন আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না, ভালবাসার ধনকে ভালবাসি বলিলে যেন ভাষায় কুলাইয়া উঠে না, সেইজন্য সত্যকে সত্য কথার দ্বারা প্রকাশ করা সম্বন্ধে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া ঠিক তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে হয়। তখন বেদনার অশ্রুকে হাস্যচ্ছটায়, গভীর কথাকে কৌতুক পরিহাসে এবং

আদরকে কলহে পরিণত করিতে ইচ্ছা করে। প্রেমলীলার এই অঙ্গটি এই গ্রন্থাবলীর লীলাখণ্ডে পাঠকেরা পাইবেন। ইহা ছাড়া লীলার মধ্যে আর একটি জিনিষ আছে তাহা বিদ্রোহ। প্রতিকূলতার কাছে বেদনা স্পর্ধাপূর্বক আপনাকে বিরূপ মূর্তিতে প্রকাশ করিতেছে। 'মাতাল' যাহা বলিতেছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে, তাহা বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া গায়ের জোরের কথা। বিদ্রোহী অভিমানে বলে, আমি সমাজসংগত ভব্যতার ধার ধারি না—বিদ্রোহী প্রেম বলে, আমি ক্ষণকালের খেলা মাত্র, আমি চিরস্থায়ী একনিষ্ঠতার ধার ধারি না—একান্ত বেদনাকে স্পর্ধিত অত্যুক্তির মধ্যে গোপন করিয়া রাখিবার এই আড়ম্বর। এই সকল কথার যথার্থ তাৎপর্য গ্রহণ করিতে গেলে অনেক সময়ে ইহাদিগকে উল্টা করিয়া বুঝিতে হয়।"

আর একটি শ্রেণী সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সেটির নাম 'জীবনদেবতা'। এই জীবনদেবতা কে? কাহাকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন—

"ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম!"

কাহাকে লইয়া তিনি মিলন-উৎসবে মগ্ন এবং কে তাঁহার মুখের ভাষা কাড়িয়া কথা কহিয়াছেন—'মিলায়ে আপন সুরে?' ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেই এই জীবনদেবতার সহিত বিশ্বদেবতার সৌসাদৃশ্য কল্পনা করিবেন। কিন্তু ইঁহাকে বিশ্বদেব বলিলে কবির আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভোগের যথার্থ তাৎপর্য বুঝা যায় না। আমার মনে হয় ফুলফলভারে অবনত কোনও তরু নিজের অন্তর্যামী প্রাণকে সম্বোধন করিয়া কবির ন্যায় প্রশ্ন করিতে পারে—'আমাতে কি এখন তুমি সার্থক হইয়াছ?' এই প্রাণ অনন্ত প্রাণ নহে ইহা শুধু এই বৃক্ষটিতেই আবদ্ধ। কিন্তু প্রথম হইতে ইহাই বৃক্ষকে অধিকার করিয়াছে এবং ক্রমশঃ পত্রপুষ্প পর্যায়ের ভিতর দিয়া তাহাকে নৈপুণ্য সহকারে গঠিত করিয়া সার্থকতা দিয়াছে। মানবজীবনও এইরূপ দুইভাগে বিশ্লিষ্ট করা যায়। রবীন্দ্রবাবু এক স্থানে লিখিয়াছেন—"আমাদের অন্তরতম প্রকৃতি সমস্ত সুখ দুঃখের ভিতর দিয়ে একটি বৃদ্ধি অনুভব করতে থাকে। আমাদের ক্ষণিক জীবন এবং চিরজীবন দুটো একত্র সংলগ্ন হয়ে আছে কিন্তু দুটো এক নয়, এ আমি মাঝে মাঝে

স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারি। আমাদের ক্ষণিক জীবন যে সুখ দুঃখ ভোগ করে, আমাদের চিরজীবন তার থেকে সারাংশ গ্রহণ করে।"* এই যে দুইটি জীবন ইহার ভিতর কবি প্রণয় কল্পনা করিয়াছেন। একজন সুনিপুণ গৃহিণীর ন্যায় অন্তঃপুরবাসিনী, আর একজন তাঁহার যত কিছু দৈনিক সুখ দুঃখ, সত্য মিথ্যা ধারণা চিন্তা ও ভাব জড় করিয়া আনিতেছেন, অন্তর্যামী প্রকৃতি তাহারি ভিতর হইতে উৎকৃষ্ট এবং অনির্বচনীয় আনন্দের উপাদান সকল গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু যদিও ইনি গৃহিণী তবু ইঁহার সহিত কবির যথেষ্ট পরিচয় এখনও হয় নাই। তিনি কতকটা মূঢ়ভাবে ইঁহার অধীন। তাই যখন ইঁহার রাগিণী তাঁহার কবিতায় ধ্বনিত হয়, তিনি অবাক হইয়া শুনিতে থাকেন।[১] সে পরিচয় যে আছে তাহা কি করিয়া বলা যায়? ইনি কত সুন্দর তাহা কি কবি জানেন? ইঁহার বাণীর গভীর অর্থ কি তিনি পরিমাণ করিয়াছেন? ইহার আনন্দের উচ্চশিখরে তিনি কি আরোহণ করিয়াছেন? কত যুগযুগান্তর লোকলোকান্তর হইতে ইনি কত বর্ণ ও শব্দ, ভাব ও ভাষা, সংগীত ও সৌন্দর্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, এবং কত বস্তুর সহিত কি প্রগাঢ় আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছেন, কবি তাহা ত বলিতে পারেন না।[২]

তিনি শুধু জানেন যে সময়ে সময়ে আশাতীত সৌভাগ্যের ন্যায় তাঁহার চিত্তে তাঁহার জীবনদেবতার সৌন্দর্য প্লাবিত হয় এবং তিনিই বিচিত্ররূপিণী

* অপ্রকাশিত চিঠি, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

১। আজকাল আমার কবিতার প্রশংসা শুনিলে আমার মনে সে রকম একটা পুলকসঞ্চার হয় না। আসল তার কারণ, যে-আমাকে লোকে প্রশংসা করছে, সেই-আমিই যে কবিতা লিখে থাকি, এ আমার সম্পূর্ণ হৃদয়ংগম হয় না। আমি জানি যে সমস্ত ভাল কবিতা আমি লিখেছি, সে আমি ইচ্ছা করলে কখনই লিখতে পারিনে—তার একটা লাইন হারিয়ে গেলেও বহু চেষ্টায় সে লাইন গড়তে পারি কিনা সন্দেহ।—অপ্রকাশিত চিঠি, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫।

২। এই যে যুগযুগান্তর লোকলোকান্তর হইতে বহমান অনুভূতি ইহা মিথ্যা কল্পনা নহে, সুদৃঢ় সত্যে প্রতিষ্ঠিত। দৃষ্টান্তরূপে বলা যাইতে পারে, যদি স্থান ও কালের ধারণা আমাদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিত, তাহা হইলে আমরা কি তাহাদের বিশালত্ব হৃদয়ংগম করিতে পারিতাম? জানি না কোন্ ভূমা প্রজ্ঞাকে আশ্রয় করিয়া এই ক্ষুদ্র পুষ্পের চারিদিকে অসীম স্থান দেখিতেছি এবং বুঝিতে পারিতেছি যে, অনাদি অতীত তাহার সমস্ত শুশ্রূষা দ্বারা

হইয়া তাঁহাকে 'সুখের ব্যথায়' উদ্‌ভ্রান্ত করেন। তাঁহাকে তিনি 'শত জনমের চির সফলতা' বলিয়াছেন এবং তাঁহারই সহিত অচ্ছেদ্য মিলন কামনা করিয়াছেন।

'গান' 'শিশু' খণ্ডে কতকগুলি অন্যান্য খণ্ডে প্রকাশিত কবিতা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। পাঠক সহজেই ইহার কারণ বুঝিতে পারিবেন।

রবীন্দ্রবাবুর কবিতা সম্বন্ধে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। সেটি তাঁহার সমুদয় কবিতার অন্তরের কথা এবং সেটি ভারতবর্ষেরও কথা। ভারতবর্ষের সাধনা কি? শান্তং শিবমদ্বৈতং। ভারতবর্ষই বলিয়াছেন—'যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।" আমরা দেখিতে পাই রবীন্দ্রবাবু যে বিষয়েরই অবতারণা করেন, তাঁহার প্রয়োগ-কৌশলে তাহা আপনার সামান্যতা পরিহার করিয়া সেই ভূমানন্দের অন্তরঙ্গ আত্মীয়রূপে প্রকাশিত হয়। ইহা সামান্য কথা নহে, কারণ দেখিতে পাই আনন্দকে আনন্দ হইতে বিচ্ছিন্ন করা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখকে উচ্চতর সুখের বিদ্রোহী করিয়া চিত্রিত করা, প্রতিযোগিতা-বিষে কলুষিত করিয়া আনন্দকে কেবলমাত্র একটি জাতি বা দেশের উপভোগ্য করা, সৌন্দর্যকে সীমাবদ্ধ করিয়া সৌখীন ক্ষুদ্রতা সৃজন করা, ইত্যাদি আজকালকার অবনতশীল (বিশেষতঃ ইউরোপীয়) আর্টের একটা খেয়াল দাঁড়াইয়া গেছে। আমাদের কবি তাঁহার ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি অনুসরণ করিয়া আমাদিগকে বাঁচাইয়াছেন। তাঁহার কাব্যের শিক্ষা আমরা শান্তি, প্রীতি, পবিত্রতা, মঙ্গল এবং যে আনন্দ চিরন্তন, গভীর ও সার্বজনীন তাহা হইতে বিচ্যুত করিতে পারি না। এমন কেহই নাই যিনি তাঁহার কবিতার মর্ম বুঝিতে পারিয়া আর্দ্রচিত্ত, শান্ত, শ্রদ্ধান্বিত ও আনন্দিত হন নাই।

এই যে অদ্বৈতানন্দস্পৃহা তাঁহার কবিতাতে দেখিতে পাই ইহা তাঁহাকে বারংবার এক আদর্শলোকে উন্নত করিয়াছে এবং তথাকার সংবাদ দিয়াছে।

পুষ্পটিকে বিকশিত করিয়াছে এবং অনন্ত ভবিষ্যৎ তাহাকে কোনও না কোন আকারে রক্ষা করিবে। সৌন্দর্য-অনুভবও এইরূপই হয়। শুকতারার জ্যোতি আমাদের মনে ক্ষণেক সুখসঞ্চার করে বলিয়া তাহাকে সুন্দর বলি না। কিন্তু যুগযুগান্তরব্যাপী চিরন্তন মানবহৃদয়কে উহা সংক্ষুব্ধ, আকুলিত বা আবৃত্ত করিয়া আসিয়াছে বলিয়া উহা সুন্দর। আমরা যখন উহার সৌন্দর্য অনুভব করি, বিশাল গভীর মানবহৃদয় আমাদের সহিত সায় দেয় এবং তাহার স্পন্দনগুলি আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ 'প্রতিধ্বনি' ও 'উর্বশী' দুইটি কবিতার উল্লেখ করি। প্রথমটিতে দেখিতে পাই সমুদয় সুন্দর বস্তু অনন্ত আদর্শ-সৌন্দর্যের প্রতিধ্বনি বা প্রতিবিম্ব বলিয়া সুন্দর হইয়াছে। দ্বিতীয়টি নারীপ্রকৃতিকে তাহার সমুদয় মানবীয় সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত করিয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপটি দেখাইয়াছে। এ বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

ভূমিকা দীর্ঘ হইয়া পড়িল। গল্পে পড়িয়াছিলাম যে এক ব্যক্তি জ্যোতিষ্ক দেখাইতে বর্তিকার সাহায্য লইয়াছিল। এই ভূমিকা লিখিবার সময়ে উক্ত ব্যক্তির সহিত সাদৃশ্য অনুভব করিয়া লজ্জিত ছিলাম। যাহা হউক বর্তমান সংস্করণ কোনও পাঠকের নিকট রবীন্দ্রবাবুর কবিতার অর্থকে সুগম করিলে কৃতার্থ হইব।

* *
*

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রহস্য

রমাপ্রসাদ চন্দ

রবীন্দ্রনাথের সকল প্রকার রচনার, বা সকল কাব্যের সমালোচনার সময় সামগ্রী, বা সামর্থ্য আমার নাই। অনেকের মতে, রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রধান দোষ অস্পষ্টতা। কিন্তু যাহা উৎকৃষ্ট, যথা 'গান,' 'নৈবেদ্য,' 'গীতাঞ্জলি' তাহাও কি অস্পষ্ট? রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের রচিত অনেক কবিতাও যে আমাদের কাছে অস্পষ্ট একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু নিবিষ্টভাবে অধ্যয়ন করিলে দেখা যায়, এ অস্পষ্টতা ক্রমশঃ উজ্জ্বল—উজ্জ্বলতর, হইয়া উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ অস্পষ্টতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ দুইটি কবিতা আলোচনা করিব। আমার ভক্তিভাজন শিক্ষক মোহিতচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, "সোনার তরীর উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি কে? 'হৃদয়-যমুনা'য় কাহাকে আহ্বান করা

দ্রষ্টব্য: 'সোনার তরী' প্রকাশিত হইবার পর ইহার অন্তর্ভুক্ত 'সোনার তরী' এবং 'হৃদয়-যমুনা' এই দুইটি কবিতাই দুর্বোধ্যতা এবং অস্পষ্টতার জন্য বিরুদ্ধ সমালোচকগণ কর্তৃক বিশেষভাবে নিন্দিত হইয়াছিল। এই সময় উক্ত কবিতা দুইটির আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক রমাপ্রসাদ চন্দ 'রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রহস্য' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেই প্রবন্ধটিই ১৩২০ সালের পৌষ মাসের 'সাহিত্য' (২৪ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা) হইতে এস্থলে সংকলিত হইয়াছে।

হইয়াছে ? এসব প্রশ্ন আমরা বৃথা জিজ্ঞাসা করি।" প্রথমোক্ত 'সোনার তরী' কবিতা লইয়া মহারথগণের মধ্যে একবার একটা দ্বৈরথ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। 'সুদূর পশ্চিম ছাড়িয়া গান্ধার'—সিরাজের সেখ সাদীর নিকট হইতে হাতিয়ার আনিয়া এই যুদ্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল—আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, নিষ্কাম ধর্ম ত প্রয়োগ করা হইয়াছেই। পুঁথিগত বিষয় বা দোষা-নুসন্ধিৎসা ছাড়িয়া রবীন্দ্রনাথের ভাবে ভাবিয়া দেখিলে,—অসীমের সীমায় পৌঁছিবার জন্য যে তাঁহার গভীর সাধন, সেই হিসাবে দেখিলে—মনে হয়, 'সোনার তরী' কবিতার উদ্দেশ্য ভ্রমজনিত বেদনা-প্রকাশ। গোড়াতেই কৃষকের ভ্রমের কথা ; সে কূলে একা, ছোট ক্ষেতে ধান কেটে মনে করেছে, 'রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হল সারা,' অর্থাৎ সীমার গণ্ডির ভিতর থাকিয়া নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজগুলিকে বড় মনে করে বসে আছে। এমন সময় 'তরী বেয়ে' অর্থাৎ একটু আস্তে, 'যেন মনে হয় চিনি,' কিন্তু ঠিক সনাক্ত করিতে পারিতেছি না,—এইভাবে মনোমধ্যে অসীমের জ্ঞানের প্রবেশ, এবং অমনি 'ভরা পালে' দ্রুত পলায়নের উদ্যোগ। তখন নেয়েকে ডাকিয়া ফিরাইয়া সাহংকারে 'এতকাল নদীকূলে যাহা লয়ে ছিনু ভুলে' তাহা প্রদর্শন। সোনার তরীর নেয়ে সেই সমস্ত লইয়া গেল, অর্থাৎ তাহা লইয়া কৃষকের যে গর্ব তাহা তিরোহিত করিয়া দিল। কিন্তু কৃষক নিজে যখন সেই তরীতে উঠিতে চাহিল, তখন তাহার হৃদয়ে তীব্র বেদনা দিয়া সোনার তরী লইয়া নেয়ে

বাংলার প্রাচীন ইতিহাস এবং পুরাতত্ত্বের গবেষণায় রমাপ্রসাদ চন্দ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'র সঙ্গেও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁহার 'গৌড়রাজমালা' প্রাচীন গৌড়ের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ। ১৩৪৮ সনে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-বৎসরেই রমাপ্রসাদ পরলোকগমন করেন।

এই প্রসঙ্গে 'সোনার তরী' সম্বন্ধে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের একটি উক্তি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি 'দাসী' পত্রিকায় (ডিসেম্বর, ১৮৯৭) 'চৈতালি'র একটি বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রকাশ করেন। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধের প্রারম্ভিক আলোচনাতেই তিনি 'সোনার তরী' সম্বন্ধে লেখেন যে, "রবীন্দ্রবাবু কি ভাবিয়া 'সোনার তরী' লিখিয়াছেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন। তবে এ-কথা নিঃসংকোচে বলা যাইতে পারে যে, রবীন্দ্রবাবুর আর যে আক্ষেপ করিবার কারণ থাকুক, তিনি যে পাঠকদিগের নিকট আশানুরূপ আদর পান নাই, এ তাঁহার আক্ষেপ করিবার কোনই কারণ নাই। আর এই আদর যে রবীন্দ্রবাবুর প্রতিভার ন্যায্য প্রাপ্য তাহাতেও সন্দেহ নাই।"

অন্তর্হিত হইল। 'সোনার তরী' রবীন্দ্রনাথের সাধন-তরী এবং তাহার নেয়ে অসীমতার অর্ধস্ফুট জ্ঞান। কৃষকের অপরাধ হইয়াছিল, সে 'সোনার তরী' দেখিবামাত্রই নেয়ের কাছে আত্মসমর্পণ না করিয়া ছোট ক্ষেতের তুচ্ছ ফসল দেখাইয়া বলিয়াছিল, 'যত চাও তত লও তরণী 'পরে।' এই গর্বোক্তি না করিয়া যদি বলিত, আগেই 'আমারে লহ করুণা করে,' তবে শূন্য নদীর তীরে পড়িয়া থাকিয়া কাঁদিতে হইত না। রবীন্দ্রনাথ কেবল এই কবিতায়ই যে তাঁহার সাধনাকে সোনার তরীরূপে কল্পনা করিয়াছেন এমন নহে। 'সোনার তরী' নামক নিবন্ধের শেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রায়'ও সেই একই কথা।—

"আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরি!
বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী?

নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি,'
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি,'
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন
গগন-কোণে।
কি আছে হোথায়—চলিছে কিসের
অন্বেষণে?"

'গীতাঞ্জলি'তে সোনার তরীর যাত্রীর যাহা কর্তব্য তাহা স্পষ্টাক্ষরে বিহিত হইয়াছে। যথা—

"ঐ রে তরী দিল খুলে।
তোর বোঝা কে নেবে তুলে!

ঘরের বোঝা টেনে টেনে
পারের ঘাটে রাখলি এনে,
তাই যে তোর বারে বারে
ফিরতে হল, গেলি ভুলে

ডাক্‌রে আবার মাঝিরে ডাক্,
বোঝা তোমার যাক ভেসে যাক্,
জীবনখানি উজাড় করে
সঁপে দে তার চরণ-মূলে।"

'হৃদয়-যমুনায়' কবি বিশ্ববাসী সকলকেই আহ্বান করিয়াছেন। প্রথমতঃ হৃদয়কে দুই তীরে সীমাবদ্ধ যমুনারূপে কল্পনা করিয়া তাহার ভাব-রস যাহারা উপভোগ করিতে চাহেন তাহাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে। শেষ অংশে ঋষি কম্পিতহৃদয় যমুনাকে অসীম বিশ্বহৃদয়ে লীন দেখিয়া যাঁহারা 'মরণ' বা জীবন্মুক্তি কামনা করে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া পড়িয়াছেন—

"যদি মরণ লভিতে চাও, এস তবে ঝাঁপ দাও
সলিল মাঝে!
স্নিগ্ধ, শান্ত, সুগভীর,
নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যুসম নীল নীর
স্থির বিরাজে।
যাও সব যাও ভুলে,
নিখিল বন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এস কূলে
সকল কাজে।"

এই কবিতায় ভোগীর যমুনার পার্শ্বে যোগীর অতল অকূল সাগরের চিত্রে কবির সৃষ্টিকৌশল এবং দৃষ্টির ফল অতি মধুরভাবে মিলিত করা হইয়াছে। 'মানসীর উপহার' নামক কবিতায় কাব্যরচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়া রাখিয়াছেন—

"এ চির-জীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি' শুধু অসীমে সীমা,
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে, তাহে ভালবাসা দিয়ে
গড়ে' তুলি মানসী প্রতিমা।"

আবার অসীমের সীমা প্রত্যক্ষ করিয়া গীতাঞ্জলিতে ঋষি গাহিয়াছেন—

'সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে,
কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়-পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।"

অরূপের রূপের সুমধুর লীলা দেখা—ইহাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যের রহস্য।

প্রশ্ন উঠিয়াছে, এ কেমন দেখা? এ কি শুধু কথার কথা, না আর কিছু? রবীন্দ্রনাথ বিলাসী জমিদার, সদ্‌গুরুর উপদেশমতে যথারীতি সাধন ভজন করেন নাই,—তাঁহার দেখা কথার কথা বই আবার কি? তোমরা যাহাকে সাধন ভজন বল, তাহা করিলেই যে অরূপের রূপ দেখা যায় তাহার আদালতগ্রাহ্য প্রমাণ মাসিকের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করা সম্ভব কি? যে অরূপের রূপ দেখিয়াছে তাহার কথা ভিন্ন সেই দেখার আর কোনও প্রমাণ এ পর্যন্ত কেহ হাজির করিতে পারে নাই। যদি পারিত, তাহা হইলে জগতে ধর্মভেদ, সম্প্রদায়-ভেদ মোটেই উৎপন্ন হইত না।

"তর্কে তারে পরিহাসে, মর্ম তারে সত্য বলি জানে।" তোমার মর্ম যদি রবীন্দ্রনাথের কথা সত্য বলিয়া মানিতে না চায় তাহা বল, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু সাধন ভজনের তর্ক উত্থাপন করার সার্থকতা কি? তোমরা যাহাকে সাধন বল, রবীন্দ্রনাথ তোমাদিগকে জানাইয়া শুনাইয়া সেই সাধন করেন নাই, শুধু এই অছিলায় তাঁহার বাণীকে মিথ্যা বলিলে পাদ্রি-সাহেবসুলভ সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা প্রকাশ করা হয় মাত্র,—সেটা কাব্য-সমালোচনা হয় না। আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের কোন একটি মন্ত্র এক-মনে গাহিয়া বা শুনিয়া যে বলিতে পারে ইহা শুধু কথার কথা, এমন লোক অতি দুর্লভ। যদি এমন লোক থাকে তবে বলিতে হইবে, তাহার হৃদয়-বীণার তারগুলি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। হৃদয়ে সংশয়, বাহিরে বঞ্চনা

তামাদের ইহ-পরকাল অন্ধকারময় করিয়া তুলিতেছে। দেশে কলরব উঠিয়াছে, "দেশের লোক না খেয়ে মল, দেশের অন্ন সংস্থান কর, দেশের ধনবৃদ্ধি কর।" কত শত ব্যাঙ্ক, কত শত কোম্পানী মাথা তুলিয়া উঠিতেছে, আবার অমনি লিকুইডেশন-লীলা সংবরণ করিতেছে। দেশের দুঃখদৈন্যের কারণ দারিদ্র্য নয়, যাঁহাদের ধন আছে বা হুজুকে যাঁহাদের ধনার্জনের সুযোগ ঘটিতেছে তাঁহাদের হৃদয়ের দারিদ্র্য। যে ধনে এই দারিদ্র্য ঘুচিবে রবীন্দ্রনাথের কাব্য সেই ধনের অলংকার-ভাণ্ডার। ধন্য ঋষি—

"তোমার রাগিণী জীবন-কুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো!
সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন
তব মঙ্গল মন্ত্রে,
বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে
তব সঙ্গীত ছন্দে।"

* *
*

বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান অবস্থা

শশাঙ্কমোহন সেন

বিহারীলালের অপূর্ণতা তাঁহার শিষ্য রবীন্দ্রনাথে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ গুরুকে অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু গুরুকে বিস্মৃত হন নাই। কবি রবীন্দ্রনাথ মৌলিক প্রতিভার অধিকারী।...তাঁহার 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ,' 'পুরীতে সমুদ্রদর্শনে,' 'মানসসুন্দরী,' 'বসুন্ধরা,' 'পুরস্কার' ও আরও অনেকগুলি

দ্রষ্টব্য: এই রচনাংশটি ১৩১২ সালের শ্রাবণ মাসের 'সাহিত্যে' (১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা) প্রকাশিত 'বঙ্গসাহিত্যে বর্তমান অবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে লওয়া হইয়াছে। প্রবন্ধটির রচয়িতা শশাঙ্কমোহন সেন তখনকার দিনে সাহিত্যসমালোচক হিসাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি শুধু যে সূক্ষ্ম রসবোধেরই অধিকারী ছিলেন তাহা নয়, তাঁহার অধ্যয়নও ছিল ব্যাপক এবং গভীর। তাঁহার 'বঙ্গবাণী' এবং 'মধুসূদন' বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

ক্ষুদ্র কবিতা ও অনেকগুলি সনেট আমরা জগতের সাহিত্য-প্রদর্শনীতে নির্ভয়ে পাঠাইতে পারি।

* * *

রবীন্দ্রনাথ প্রেমের উপাসক।...সেই প্রেম প্রথমে ভাব-প্রবণ ও অগভীর ছিল। এই সময়ে প্রবীণ বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রভাবে, তাঁহার ভাব ও ভাষা উভয়ই অতি আশ্চর্য মূর্তিতে 'ভানুসিংহের পদাবলীতে' পরিস্ফুরিত হইয়াছে।...এই প্রেম বারে বারে নানারূপ প্রেম-সংগীতে ও 'কড়ি ও কোমলের' ক্ষুদ্র কবিতায় ঘনতা ও অবয়বপ্রাপ্ত হইয়াছে; এবং 'চিত্রাঙ্গদা'য় একাধারে কবির সমস্ত পূর্ণভাবের সন্নিবেশ করিয়াছে। 'মানসী'র ধ্যান-ধারণার রাজ্যে নিগূঢ় অন্তর্লীনতা প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গসাহিত্যকে কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা দিয়াছে। পরিশেষে কবিকে 'সোনার তরী'তে ভাসাইয়া 'চিত্রা'র ভিতর দিয়া এমন এক রাজ্যে উপনীত করিয়াছে, যাহাকে 'যোগ' বলিলেও বলা যায়। তিনি মানবীর প্রেমের ভিতর দিয়া জগৎলক্ষ্মীর নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার 'মানসসুন্দরী,' 'চিত্রা,' 'উর্বশী,' 'অন্তর্যামী' প্রভৃতি কবিতায় পরিস্ফুট। ভাবোন্মত্ততা হইতে যোগে উন্নতি, জগতে অল্প কবির ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। এইরূপে বৈষ্ণবকবিদের প্রেম, কবির মৌলিক প্রতিভায় ও ইউরোপীয় প্রভাবে, ক্রমে পরিণত হইয়া, বঙ্গসাহিত্যে সমুন্নত প্রেম-কবিতার সৃষ্টি করিয়াছে।

* * *

ইদানীং রবীন্দ্রনাথের ভাষা ভাবকে আবৃত ও আচ্ছন্ন করিতেছে। 'চিত্রা'র কবিতাগুলি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ছন্দের নৃত্যে, ভাষার ঝংকারে, আকুলতার

শশাঙ্কমোহন রবীন্দ্র-প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য করেন নাই, কিন্তু শুধু রবীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াই তাঁহার লেখনী ক্ষান্ত হয় নাই, তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির ত্রুটি প্রদর্শনের চেষ্টাও তিনি করিয়াছেন। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির পর রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্বকবিরূপে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করিলেন তখন যে কয়জন শক্তিমান লেখক তাঁহার বিরোধিতা করেন, শশাঙ্কমোহন তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার 'বঙ্গবাণী' গ্রন্থে রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্র-দর্শন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। শশাঙ্কমোহন তাহাতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, রবীন্দ্র-দর্শনের ভিতরে আসলে কোনো বস্তু নাই। তাঁহার মতে রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটকগুলি (Symbolical Drama) নিতান্ত খামখেয়ালের সৃষ্টি এবং অসংলগ্নতাদোষদুষ্ট।



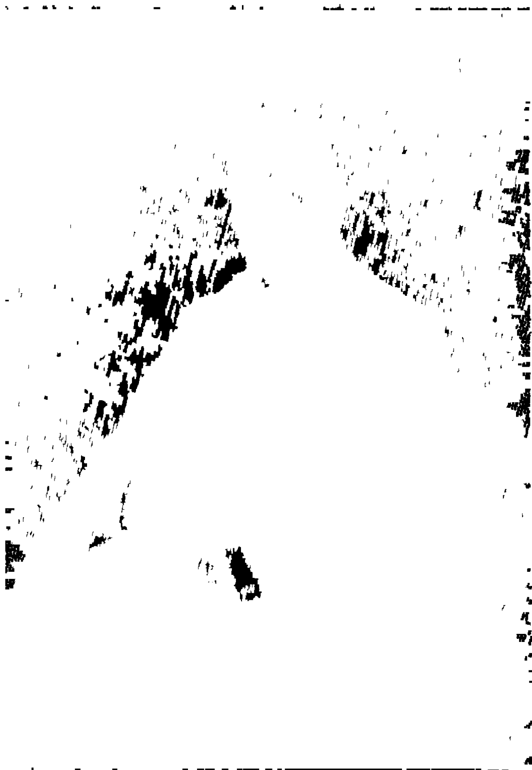
রাজশেখর বসু



অক্ষয়চন্দ্র সরকার

মোহিতলাল মজুমদার

[illegible]



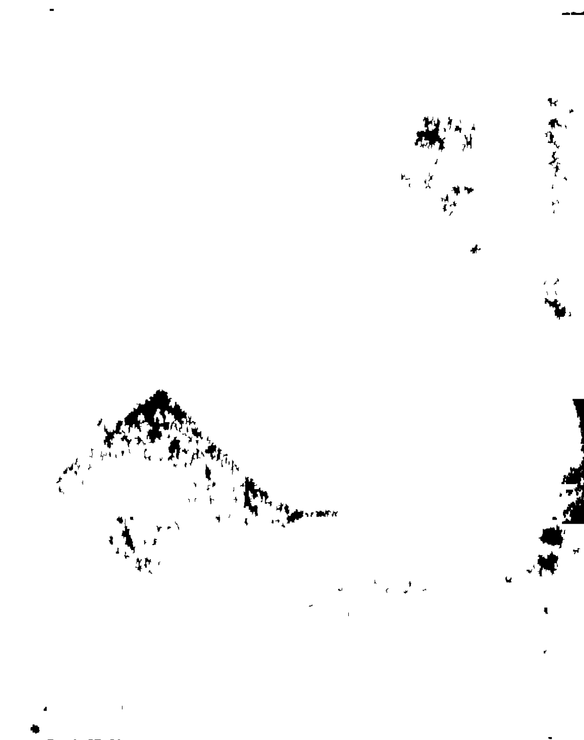
বিপিনচন্দ্র পাল



শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



[illegible] বাগচী



[illegible]

আবেগে, ভাবের সুচিক্কণ সূক্ষ্মরশ্মি ডুবিয়া গিয়াছে। অনেক স্থলে অস্তিত্ব পর্যন্ত অনুভব করা দায় হইয়াছে।...রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অনেক স্থলে গ্রামের সরলতা অপেক্ষা নগরের ভদ্রতাই অধিক।...এখন তিনি অল্পে অল্পে স্বভাবের রাজ্য অধিকার করিতেছেন। তাঁহার ক্ষুদ্র গল্পগুলিতে ও 'চৈতালি'র কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতায় তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছে।...পূর্বোক্ত কারণগুলির সমবায়ে রবীন্দ্রনাথ এ দেশের সাধারণ পাঠকের নিকট অস্পৃশ্য ও দুর্জ্ঞেয় হইয়া পড়িয়াছেন।

* * *

তিনি (রবীন্দ্রনাথ) উপন্যাস-রচনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার দৃষ্টি ক্ষুদ্রের ভিতর মহত্ত্ব-দর্শনে বিশেষ পটু। ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্যে ও মানবচরিত্রের অধ্যয়নের ফলে তাঁহার অনেক গল্প সাহিত্যে উচ্চশ্রেণীস্থ হইবার উপযুক্ত। এই সমস্ত গল্পে বঙ্গভাষার বর্তমান শক্তি ও গতি বুঝিতে পারা যায়।

* * *

রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রেমসংগীত দিয়াছেন। এই সমস্ত সংগীত ইউরোপীয় গীতিকবিতার আদর্শে রচিত। সুতরাং রসোদ্রেক অপেক্ষা ভাবোদ্রেকই তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীতগুলি ভাবের উদ্দীপক ও বিরাট পুরুষের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক; তাই সংগীত-সাহিত্যে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু, ব্রহ্মের প্রাচীন যোগমূলক ধারণায় ও আন্তরিকতায় রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত চিরঞ্জীব প্রভৃতি সাধু সাধকগণের সংগীতকে অতিক্রম করিতে পারে নাই।

বাঙ্গালায় সর্বপ্রথম প্রকৃত হাস্যরসের কবিতা রবীন্দ্রনাথ 'মানসী'তে লিখিয়াছিলেন।

প্রতিভাশালী রবীন্দ্রনাথ নাটক লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নাটকগুলি আমাদের দুর্গাপ্রতিমার মত। সুন্দর রং, বিচিত্র গঠন, রাঙ্গতার চাকচিক্য, সকলই আছে, নাই কেবল প্রাণ।

রবীন্দ্রনাথের পাঞ্চভৌতিক সভায় ক্ষিতি, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশের সংমিশ্রণে যে ভাষা বহিয়াছে, তাহা বঙ্গভাষার রত্নৈশ্বর্যস্বরূপ সাহিত্য-ভাণ্ডারে সংরক্ষিত থাকিবে।

কবিবরের শাক্ত ভাব

বিনয়কুমার সরকার

রবীন্দ্রনাথ শাক্তই কি বড় কম ? একজন বাঙ্গালী সাধক গাহিয়াছেন—

"শ্মশান ভালবাসিস্ বলে শ্মশান করেছি হৃদি।
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি ব'লে নিরবধি।
মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে, রাখিয়ে মা পদতলে,
নাচ দেখি মা তালে তালে
হেরি আমি নয়ন মুদি॥"

আর একজন শাক্ত কবি 'জগদ্ধাত্রী পূজা'য় গাহিয়াছেন—

"জননী মোদের জগদ্ধাত্রী, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্রী,
ঈপ্সিত বর-অভয়-দাত্রী, অধিষ্ঠাত্রী ত্রিলোকীর।
শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত মোরা, অভয়া চরণে নম্রশির,
শুধু মায়ের চরণে নম্রশির।"

কবি রবীন্দ্রনাথও এইরূপ শাক্ত, এইরূপ শক্তিশিষ্য। আর একজন হিন্দু কবি গাহিতেছেন—

"ছুটে চল ছুটে চল, হে পদ্মা আমার
পূর্ণ হোক সংহারিণী লীলা।
অন্ধগতি বন্ধহারা নৃত্য তালে তালে
বুকে রুদ্র বাজুক বাজনা।
নিষ্ঠুর ভ্রূভঙ্গে তব চূর্ণ হয়ে যাক্
তরুগ্রাম নগর-কান্তার,

দ্রষ্টব্য : এই প্রবন্ধটি বিনয়কুমার সরকারের 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী' নামক পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহা 'গৃহস্থ' গ্রন্থাবলীর ২য় সংখ্যক পুস্তক। ১৩২০ সালের ফাল্গুন মাসে ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত কর্তৃক ষ্টুডেন্টস লাইব্রেরী, ৬৭নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। মূল্য ৷৶০ পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২৩।

'রবীন্দ্র সাহিত্যে ভারতের বাণী'তে 'রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয়,' 'কাব্যরচনা ও স্বদেশসেবা,' 'কবিবরের শাক্তভাব,' 'রবীন্দ্রনাথের হিন্দুত্ব' ইত্যাদি কুড়িটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—তন্মধ্যে কেবলমাত্র একটি প্রবন্ধ ('কালিদাসের পরিপূর্ণ হিন্দুজগৎ') রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কীয় বিষয় বহির্ভূত

গ্রন্থস্থ সমূহ রচনাগুলিই 'গৃহস্থ' মাসিক পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়। 'রবীন্দ্রনাথে

লুপ্ত হয়ে যাক শোভা সমস্ত সুষমা ;—
ধন্য হোক বাসনা তোমার।
কালী তুমি করালিনী,
নমি তব পায়,
হিয়া মোর জবাঞ্জলি তায়।"

খুঁজিয়া দেখিলে এরূপ শাক্তভাব রবীন্দ্রনাথে অনেক পাইবে। দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া প্রবন্ধ বড় করিব না। রবীন্দ্রনাথ গাহিতেছেন—

"আমার প্রভুর চরণতলে
শুধুই কিরে মাণিক জ্বলে ?
ও তাঁর পায়ে পায়ে বাজে কত
কঠিন মাটির ঢেলারে !
পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দেরে ?
খসে যাবার, ভেসে যাবার ভাঙবারই আনন্দেরে ?"

রবীন্দ্রনাথ 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে'ও এই শক্তিপূজার মন্ত্রই প্রচার করিয়াছেন—

"কাঁদে গ্রহ, কাঁদে তারা,
শ্রান্ত দেহে কাঁদে রবি,
জগৎ হইল শান্তিহীন,
চারিদিক হতে উঠিতেছে
আকুল বিশ্বের কণ্ঠস্বর ;—
'জাগ' 'জাগ' 'জাগ' মহাদেব,
কবে মোরা পাব অবসর !

দিগ্বিজয়' ১৩২০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। ঐ বৎসরেরই পৌষ সংখ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের ভাবুকতা' অভিধাযুক্ত যে বিরাট প্রবন্ধ বাহির হয়, 'কবিবরের শাক্তভাব' তাহারই অংশবিশেষ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই সকল প্রবন্ধের রচয়িতার নাম 'গৃহস্থ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। এমন-কি 'গৃহস্থ' পত্রিকার সম্পাদকের নামটি পর্যন্ত গোপন ছিল।

যতদূর জানা যায়, 'গৃহস্থ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার। এবং উপরোক্ত প্রবন্ধসমূহ 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে জানা যায় যে এগুলির রচয়িতা ছিলেন—স্বয়ং বিনয়কুমার।

*　　　　*　　　　*

জগতের আত্মা কহে কাঁদি
আমারে নূতন দেহ দাও ;
প্রতিদিন বাড়িছে হৃদয়,
প্রতিদিন বাড়িতেছে আশা,
প্রতিদিন টুটিতেছে দেহ,
প্রতিদিন ভাঙ্গিতেছে বল।
গাও দেব মরণ-সংগীত,
পাব মোরা নূতন জীবন।"

*　　　　*　　　　*

প্রলয়পিনাক তুলি করে ধরিলেন শূলী,—
পদতলে জগৎ চাপিয়া
জগতের আদি-অন্ত থরথর থরথর।
একবার উঠিল কাঁপিয়া।

*　　　　*　　　　*

উঠিলরে মহাশূন্যে গরজিয়া তরঙ্গিয়া
ছন্দোমুক্ত জগতের উন্মত্ত আনন্দ কোলাহল।
ছিঁড়ে গেল রবিশশী গ্রহতারা ধূমকেতু,
কে কোথায় ছুটে গেল, ভেঙ্গে গেল টুটে গেল,
চন্দ্রস্বর্যে গুঁড়াইয়া চূর্ণ চূর্ণ হ'য়ে গেল।
মহা অগ্নি জ্বলিল রে,—
আকাশের অনন্ত হৃদয়—অগ্নি অগ্নি শুধু অগ্নিময়।
মহা অগ্নি উঠিল জ্বলিয়া জগতের মহা চিতানল।
খণ্ড খণ্ড রবি শশী চূর্ণ চূর্ণ গ্রহতারা,
বিন্দু বিন্দু আঁধারের মত বরষিছে চারিদিক হ'তে
অনলের তেজোময় গ্রাসে নিমেষেতে যেতেছে মিশায়ে।"

হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা' কে না পড়িয়াছে ?—

"একে একে জগতের আভরণ খসিল।
চন্দ্র তারা রশ্মিমেঘ অভ্রসনে ডুবিল॥

গিরি নদ পারাবার যত ছিল ভুবনে।
অনুক্ষণ অদর্শন মহাদেব শোষণে॥
স্বর্গপুরী রসাতল হিমালয় ছুটিল।
ধারা-হারা বসুন্ধরা শিব অঙ্গে মিশিল।"

—ইহা হইতে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য কোথায়? আজকালকার সভ্য বাঙ্গালায় যাত্রা উঠিয়া গিয়াছে। রসিক চক্রবর্তীর 'কালকেতু' পালা আর শুনিতে পাই না। নাই বা পাইলাম—রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় আমরা কালকেতুর গান শুনিয়া থাকি—

"মা তোর দুর্লভ পদপল্লব দে মা দে মা
মাথে, ক্ষেমংকরি!
(আমি শুনেছি শুনেছি মাগো)
তুমি দেবের রোদনে দানব নিধনে
নাচ রণে দিগম্বরী।
সেইরূপ রণ-বেশে নাচ হৃদি রঙ্গভূমে শংকরী।
আমি চাই না শক্তি দে মা ভক্তি
স্বগুণে পরমেশ্বরী॥
হয়ে হৃদি-পদ্মাসনা বিলাস-বাসনা নাশ মা
আমার শুভংকরী।"

ইহার সঙ্গে মিলাইয়া লও—

"কিসেরি বা সুখ কদিনের প্রাণ
ঐ উঠিয়াছে সংগ্রাম-গান।
অমর মরণ রক্ত চরণ নাচিছে সগৌরবে॥"

কবিবরের শাক্তভাব দেখিয়া আমাদের সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের কথা মনে পড়ে—

"এবার শ্যামা তোমায় খাব
তুমি খাও কি আমি খাই মা,
দুটোর একটা ক'রে যাব॥"

আর মনে পড়ে বিবেকানন্দের 'নাচুক তাহাতে শ্যামা'। ইহাকে বলে সাধনা।

ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ যাহাই হউন, ধর্মবক্তা রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে যাহাই বক্তৃতা করুন, কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের সনাতনরীতির শৈবশাক্ত-তান্ত্রিক।

এই বৈরাগ্যের বাণী—এই শ্মশানে ঘর করার প্রবৃত্তি—কালী-সাধনার চূড়ান্ত পরিচয়—ভরা বিশ্বাসে শক্তি-শিয়রের ধরায় লুটাইবার আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রচুর রহিয়াছে।

"বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে, কে মোর আত্মপর ?
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে কোথায় আমার ঘর ?
কিসেরি বা সুখ কদিনের প্রাণ ?
ঐ উঠিয়াছে সংগ্রাম-গান।
অমর মরণ রক্ত চরণ নাচিছে সগৌরবে।"

—ইহা বৈষ্ণবের কৃষ্ণপ্রেম, কি শাক্তের কালীপূজা তাহা জানি না। আমরা হিন্দু আমরা বুঝি 'এত নয় নন্দের তনয়, দুষ্ট বনমালী,' আমরা জানি 'যেই কৃষ্ণ সেই কালী'। এজন্য আমরা বলিব, রবীন্দ্রনাথ আজ বৈষ্ণব, আজ শাক্ত—সাম্প্রদায়িক শব্দ ব্যবহারে যদি কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকে, তাহা হইলে বলিব কবিবর ভারতবাসীকে আজ সনাতন বৈরাগ্যের শিক্ষা দিতেছেন। বুদ্ধদেব রাজসিংহাসন তুচ্ছ করিয়াছিলেন যে জন্য, চৈতন্যদেব সংসার ছাড়িয়া পাগল হইয়াছিলেন যে জন্য, যীশুখৃষ্ট জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন যে জন্য, 'পঞ্চ-নদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে' শিখ্‌গুরু আত্মবলি দিয়াছিলেন যে জন্য, বাঙ্গালী কবি ভারতবাসীকে (এবং সম্প্রতি সমগ্র মানবজাতিকে) সেই মুক্তির বাণী নূতন ভাষায় শুনাইতেছেন। পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে যখনই যে কোন ব্যক্তি 'সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে' এই কথা কার্যে পরিণত করিবার উপযুক্ত হইবেন, যুগে যুগে দেশে দেশে তাঁহাকে রবীন্দ্রনাথের এই বাণীর মর্মই উপলব্ধি করিতে হইবে। সেই সকল সাধক-ভক্ত বীরপুরুষগণকে সংসারের নিকট, কাম-কাঞ্চনের নিকট, ভোগ্যবস্তুর নিকট, মায়া-মমতার নিকট স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের নিকট বলিতে হইবে—

"অরুণ তোমার তরুণ অধর, করুণ তোমার আঁখি।
অমিয় রচন সোহাগ বচন অনেক রয়েছে বাকি।

*　　　　*　　　　*

আমিই নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর নির্মম আমি আজি।
আর নাই দেরি ভৈরব-ভেরী বাহিরে উঠেছে বাজি॥

*　　　　*　　　　*

পাখী উড়ে যাবে সাগরের পার
সুখময় নীড় পড়ে রবে তার
মহাকাশ হতে ঐ বারে বার
আমারে ডাকিছে সবে॥"

ত্রেতাবতার রামচন্দ্রকে জাতীয় জীবনের এক অতি বিষম সমস্যাস্থলে এইরূপ নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর হইয়া স্বকীয় সাধনার ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইয়াছিল। অমরকবি কালিদাস কর্তব্যপরায়ণ রামচন্দ্রের কঠোর বৈরাগ্য মধুর ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন—

"বভূব রামঃ সহসা সবাষ্পঃ
তুষারবর্ষীব সহস্য চন্দ্রঃ।
কৌলীনভীতেন গৃহান্নিরস্তা
ন তেন বৈদেহসুতা মনস্তঃ॥"

বৈরাগ্য, ভক্তি, সাধনা, প্রেম, ভাবুকতা, গৃহত্যাগ, সর্বত্যাগ, জীবনোৎসর্গ—এই সকল বৃত্তিপ্রবৃত্তিগুলি একই ভাবের নামান্তর মাত্র—একই পদার্থের বিভিন্ন মূর্তি—মানবচরিত্রগত অনুভূতিপুঞ্জের এবং নিগূঢ় চিত্তপ্রবৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন বাহ্য প্রকাশ বা অভিব্যক্তি। 'যারে বলে ভালবাসা, তারে বলে পূজা।' এই কথা মনে রাখিলে দেখিতে পাইবে, শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণবে কোন প্রভেদ নাই, হিন্দু-মুসলমানে কোন দ্বন্দ্ব নাই। বৈরাগ্যের জগতে, স্বার্থত্যাগের জগতে, ভাল-বাসার জগতে, পূজা-আরাধনার জগতে, ছোট-বড়, দীন-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রভেদ নাই, ধর্ম-কলহ বা সাম্প্রদায়িক গোলমাল নাই।

অচলায়তন

(রবীন্দ্রনাথের উত্তর)

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

সবিনয় নমস্কারপূর্বক নিবেদন,

নিজের লেখা সম্বন্ধে কোন প্রকার ওকালতি করিতে যাওয়া ভদ্ররীতি নহে। যে রীতি আমি সাধারণতঃ মানিয়া থাকি। কিন্তু আপনার মত বিচারক যখন আমার কোন গ্রন্থের সমালোচনা করেন, তখন প্রথার খাতিরে ঔদাসীন্যের ভান করা আমাদ্বারা হইয়া উঠে না।

সাহিত্যের দিক্ দিয়া আপনি অচলায়তনের উপর যে রায় লিখিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে আপনার নিকট আমি কোনো আপিল রুজু করিব না। আপনি যে ডিক্রি দিয়াছেন সে আমার যথেষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু ঐ যে একটা উদ্দেশ্যের কথা তুলিয়া আমার উপরে একটা মস্ত অপরাধ চাপাইয়াছেন সেটা আমি চুপচাপ করিয়া মানিয়া লইতে পারিব না। কেবলমাত্র ঝোঁক দিয়া পড়ার দ্বারা বাক্যের অর্থ দুই তিন রকম হইতে পারে। কোনো কাব্য বা নাটকের উদ্দেশ্যটা সাহিত্যিক বা অসাহিত্যিক তাহাও কোনো কোনো স্থলে ঝোঁকের দ্বারা সংশয়াপন্ন হইতে পারে। পাখী পিঞ্জরের বাহিরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে ইহা কাব্যের কথা—কিন্তু পিঞ্জরের নিন্দা করিয়া খাঁচাওয়ালার প্রতি খোঁচা দেওয়া হইতেছে এমনভাবে সুর করিয়াও হয়ত পড়া যাইতে পারে। মুক্তির জন্য পাখীর কাতরতাকে ব্যক্ত করিতে হইলে খাঁচার কথাটা একেবারেই বাদ দিলে চলে না। পাখীর

দ্রষ্টব্য : 'আর্যাবর্ত' পত্রিকায় (১৩১৮, কার্তিক—২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা) অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'অচলায়তন' সম্পর্কে যে সমালোচনাটি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারই উত্তরে রবীন্দ্রনাথ উক্ত পত্রিকায় প্রকাশের জন্য ললিতবাবুকে এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন ইহা সম্পাদকের মন্তব্যসহ 'আর্যাবর্তে'র পরবর্তী অগ্রহায়ণ (১৩১৮) সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনাটি এই গ্রন্থের মূল অংশে মুদ্রিত হইয়াছে।

এই 'অচলায়তন' নাটক সম্পর্কে 'মানসী' পত্রিকায় (১৩১৮, ফাল্গুন—৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা) সেকালের অন্যতম খ্যাতিমান সমালোচক বিপিনবিহারী গুপ্তর অনুজ কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত নাট্য-সমালোচনা শীর্ষক একটি নিবন্ধে লিখিয়াছিলেন যে—

"এই নাটিকাখানি হিন্দুসমাজের মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে। কবির

বেদনাকে সত্য করিয়া দেখাইতে হইলে খাঁচার বদ্ধতা ও কঠিনতাকে পরিস্ফুট করিতেই হয়।

জগতের যেখানেই ধর্মকে অভিভূত করিয়া আচার আপনি বড় হইয়া উঠে, সেখানেই মানুষের চিত্তকে সে রুদ্ধ করিয়া দেয়—এটা একটা বিশ্বজনীন সত্য। সেই রুদ্ধচিত্তের বেদনাই কাব্যের বিষয় এবং আনুষঙ্গিকভাবে শুষ্ক আচারের কদর্যতা স্বতই সেই সঙ্গে ব্যক্ত হইতে থাকে।

ধর্মকে প্রকাশ করিবার জন্য, গতি দিবার জন্যই আচারের সৃষ্টি—কিন্তু কালে কালে ধর্ম যখন সেই সমস্ত আচারকে, নিয়মসংযমকে অতিক্রম করিয়া বড় হইয়া উঠে, অথবা ধর্ম যখন সচল নদীর মত আপনার ধারাকে অন্য পথে লইয়া যায়, তখন পূর্বতন নিয়মগুলি অচল হইয়া শুষ্ক নদীপথের মত পড়িয়া থাকে,—বস্তুত তখন তাহা শুষ্ক মরুভূমি, তৃষাহরা তাপনাশিনী স্রোতস্বিনীর সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই শুষ্ক পথটাকেই সনাতন বলিয়া সম্মান করিয়া নদীর ধারার সম্মান যদি একেবারে পরিত্যাগ করা যায়, তবে মানবাত্মাকে পিপাসিত করিয়া রাখা হয়। সেই পিপাসার্ত মানবাত্মার ক্রন্দন কি সাহিত্যে প্রকাশ করা হইবে না পাছে পুরাতন নদীপথের প্রতি অনাদর দেখানো হয়?

আপনি যাহা বলিয়াছেন সে কথা সত্য। সকল ধর্মসমাজেই এমন অনেক পুরাতন প্রথা সঞ্চিত হইতে থাকে, যাহার ভিতর হইতে প্রাণ সরিয়া

বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তিনি নাকি এই নাটকে হিন্দুধর্মের উপর অযথা আক্রমণ করিয়াছেন। পত্রিকাবিশেষে এই মর্মে তীব্র সমালোচনাও হইয়া গিয়াছে।

নাটকখানি পাঠ করিয়া গোঁড়া হিন্দুর মনে এরূপ ধারণা হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু বাস্তবিক এরূপ কোন উদ্দেশ্য লইয়া নাটকখানি রচিত হইয়াছে তাহা বিচার করিয়া দেখিবার পূর্বে রবীন্দ্রবাবু নিজে এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অনুধাবন করা প্রয়োজন। সেদিন আমার অগ্রজ বিপিনবিহারী গুপ্তের সহিত রবীন্দ্র-সন্দর্শনে গিয়াছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে 'অচলায়তনে'র কথা উঠিলে তিনি বলিলেন যে, এই নাটকে তিনি কোন ধর্ম বা সমাজের উপর কটাক্ষপাত করেন নাই। উদ্দেশ্যমূলক কবিতা বা নাটক লেখা তাঁহার অভ্যাস নহে। বৌদ্ধগ্রন্থে পঞ্চক ও মহাপঞ্চক নামক দুই ভ্রাতার উপাখ্যান পাঠ করিয়া তাহা তাঁহার নাটকাকারে বিবৃত করিতে অভিলাষ হয়। এই ইচ্ছা হইতেই অচলায়তনের জন্ম। তাঁহার লেখার পদ্ধতি এই যে, তিনি

গিয়াছে। অথচ চিরকালের অভ্যাসবশতঃ মানুষ তাহাকেই প্রাণের সামগ্রী বলিয়া আঁকড়িয়া থাকে, তাহাতে কেবলমাত্র তাহার অভ্যাস তৃপ্ত হয় কিন্তু তাহার প্রাণের উপবাস ঘুচে না—এমন করিয়া অবশেষে এমন একদিন আসে যখন ধর্মের প্রতিই তাহার অশ্রদ্ধা জন্মে—এ কথা ভুলিয়া যায় যাহাকে সে আশ্রয় করিয়াছিল তাহা ধর্মই নহে, ধর্মের পরিত্যক্ত আবর্জনা মাত্র।

এমন অবস্থায় সকল দেশেই সকল কালেই মানুষকে কেহ-না-কেহ শুনাইয়াছে যে, আচারই ধর্ম নহে, বাহ্যিকতায় অন্তরের ক্ষুধা মেটে না এবং নিরর্থক অনুষ্ঠান মুক্তির পথ নহে তাহা বন্ধন। অভ্যাসের প্রতি আসক্ত মানুষ কোনো দিন একথা শুনিয়া খুশি হয় নাই এবং যে এমন কথা বলে তাহাকে পুরস্কৃত করে নাই—কিন্তু ভাল লাগুক আর না লাগুক একথা তাহাকে বারংবার শুনিতেই হইবে।

প্রত্যেক মানুষের একটা অহং আছে—সেই অহং-এর আবরণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সাধকমাত্রের একটা ব্যগ্রতা আছে। তাহার কারণ কি? তাহার কারণ এই, মানুষের নিজের বিশেষত্ব যখন তাহার আপনাকেই ব্যক্ত করিতে থাকে—আপনার চেয়ে বড়কে নহে, তখন সে আপনার অস্তিত্বের উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে। আপনার অহংকার, আপনার স্বার্থ, আপনার সমস্ত রাগদ্বেষকে ভেদ করিয়া ভক্ত যখন আপনার সমস্ত চিন্তায় ও কর্মে ভগবানের ইচ্ছাকে ও তাঁহার আনন্দকেই প্রকাশ করিতে থাকেন তখনই তাঁহার মানবজীবন সার্থক হয়।

ধর্মসমাজেরও সেইরূপ একটা অহং আছে। তাহার অনেক রীতিপদ্ধতি নিজেকেই চরমরূপে প্রকাশ করিতে থাকে। চিরন্তনকে আচ্ছন্ন করিয়া নিজের অহংকারকেই সে জয়ী করে। তখন তাহাকে পরাভূত করিতে না পারিলে

কল্পনাকে সংযত না করিয়া অবাধগতির অবসর দেন। এক্ষেত্রেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। ফলে ইহার অন্তরালে যে একটা বিদ্রোহের ভাব প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু সে বিদ্রোহ হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে নহে, সে বিদ্রোহ মানবোন্নতির অন্তরায় সমস্ত কুপ্রথার বিরুদ্ধে। আমরা যদি আমাদের জাতীয় জীবনের চতুর্দিকে কৃত্রিম অর্থহীন আচারের একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলিয়া দিয়া বাহিরের আলোক বন্ধ করিয়া দিই, তাহা হইলে আমরা যেখানে আছি সেখানেই থাকিয়া যাইব, অগ্রসর হইতে পারিব না। এই প্রাচীর ভাঙিয়া বাহিরালোককে প্রবেশের পথ করিয়া না দিলে জাতীয় উন্নতির উপায় নাই।"

সত্যধর্ম পীড়িত হয়। সেই পীড়া যে সাধক অনুভব করিয়াছে সে এমন গুরুকে খোঁজে যিনি এই সমস্ত সামাজিক অহংকে অপসারিত করিয়া ধর্মের মুক্ত স্বরূপকে দেখাইয়া দিবেন। মানবসমাজে যখনই কোন গুরু আসিয়াছেন তিনি এই কাজই করিয়াছেন।

আপনি প্রশ্ন করিয়াছেন উপায় কি? 'শুধু আলো, শুধু প্রীতি' লইয়াই কি মানুষের পেট ভরিবে? অর্থাৎ আচার অনুষ্ঠানের বাধা দূর করিলেই কি মানুষ কৃতার্থ হইবে? তাই যদি হইবে তবে ইতিহাসে কোথাও তাহার কোন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না কেন?

কিন্তু এরূপ প্রশ্ন কি অচলায়তনের লেখককে জিজ্ঞাসা করা ঠিক হইয়াছে? অচলায়তনের গুরু কি ভাঙিবার কথাতেই শেষ করিয়াছেন? গড়িবার কথা বলেন নাই? পঞ্চক যখন তাড়াতাড়ি বন্ধন ছাড়াইয়া উধাও হইয়া যাইতে চাহিয়াছিল তখন তিনি কি বলেন নাই—না তা যাইতে পারিবে না—যেখানে ভাঙা হইল এইখানেই আবার প্রশস্ত করিয়া গড়িতে হইবে? গুরুর আঘাত নষ্ট করিবার জন্য নহে, বড় করিবার জন্যই। তাঁহার উদ্দেশ্য ত্যাগ করা নহে, সার্থক করা। মানুষের স্থূল দেহ যখন মানুষের মনকে অভিভূত করে, তখন সেই দেহগত রিপুকে আমরা নিন্দা করি; কিন্তু তাহা হইতে কি প্রমাণ হয়, প্রেতত্বলাভই মানুষের পূর্ণতা? স্থূল দেহের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সেই দেহ মানুষের উচ্চতর সত্তার বিরোধী হইবে না, তাহার অনুগত হইবে এ কথা বলার দ্বারা দেহকে নষ্ট করিতে বলা হয় না।

অচলায়তনে মন্ত্রমাত্রের প্রতি তীব্র শ্লেষ প্রকাশ করা হইয়াছে, এ কথা কখনই সত্য হইতে পারে না—যেহেতু মন্ত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য মনকে সাহায্য করা। ধ্যানের বিষয়ের প্রতি মনকে অভিনিবিষ্ট করিবার উপায় মন্ত্র। আমাদের দেশে উপাসনার এই যে আশ্চর্য পন্থা সৃষ্ট হইয়াছে ইহা ভারতবর্ষের বিশেষ মাহাত্ম্যের পরিচয়।

কিন্তু সেই মন্ত্রকে মনন ব্যাপার হইতে যখন বাহিরে বিক্ষিপ্ত করা হয়—মন্ত্র যখন তাহার উদ্দেশ্যকে অভিভূত করিয়া নিজেই চরমপদ অধিকার করিতে চায় তখন তাহার মত মননের বাধা আর কি হইতে পারে? কতকগুলি বিশেষ শব্দসমষ্টির মধ্যে কোনো অলৌকিক শক্তি আছে এই বিশ্বাসে যখন

মানুষের মনকে পাইয়া বসে তখন সে আর সেই শব্দের উপর উঠিতে চায় না—তখন মনন ঘুচিয়া গিয়া সে উচ্চারণের ফাঁদেই জড়াইয়া পড়ে; তখন, চিত্তকে যাহা মুক্ত করিবে বলিয়াই রচিত, তাহাই চিত্তকে বদ্ধ করে। এবং ক্রমে দাঁড়ায় এই, মন্ত্র পড়িয়া দীর্ঘজীবন লাভ করা, মন্ত্র পড়িয়া শত্রুজয় করা ইত্যাদি নানাপ্রকার নিরর্থক দুশ্চেষ্টায় মানুষের মূঢ় মন প্রলুব্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে। এইরূপে মন্ত্রই যখন মননের স্থান অধিকার করিয়া বসে তখন মানুষের পক্ষে তাহা অপেক্ষা শুষ্ক জিনিস আর কি হইতে পারে? যেখানে মন্ত্রের এরূপ ভ্রষ্টতা সেখানে মানুষের দুর্গতি আছেই। সেই সমস্ত কৃত্রিম বন্ধনজাল হইতে মানুষ আপনাকে উদ্ধার করিয়া ভক্তি সজীবতা ও সরলতা লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে—ইতিহাসে বারংবার ইহার প্রমাণ দেখা গিয়াছে। যাগযজ্ঞ মন্ত্রতন্ত্র যখনই অত্যন্ত প্রবল হইয়া মানুষের মনকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরে, তখন ত মানবের গুরু মানবের হৃদয়ের দাবি মিটাইবার জন্য দেখা দেন—তিনি বলেন পাথরের টুকরা দিয়া রুটির টুকরার কাজ চালানো যায় না, বাহ্য অনুষ্ঠানকে দিয়া অন্তরের শূন্যতা পূর্ণ করা চলে না। কিন্তু তাই বলিয়া একথা কেহই বলে না যে, মন্ত্র যেখানে মননে সহায়, বাহিরের অনুষ্ঠান যেখানে অন্তরের ভাবস্ফূর্তির অনুগত, সেখানে তাহা নিন্দনীয়। ভাব রূপকে কামনা করে, কিন্তু রূপ যদি ভাবকে মারিয়া একলা রাজত্ব করিতে চায়—তবে বিধাতার দণ্ডবিধি অনুসারে তাহার কপালে মৃত্যু আছেই। কেন না সে যতদিন বাঁচিবে ততদিনই কেবলই মানুষের মনকে মারিতে থাকিবে। ভাবের পক্ষে রূপের প্রয়োজন আছে বলিয়াই রূপের মধ্যে লেশমাত্র অসতীত্ব এমন নিদারুণ। যেখানেই সে নিজেকে প্রবল করিতে চাহিবে সেই খানেই সে নির্লজ্জ, সে অকল্যাণের আকর। কেন না, ভাব যে রূপকে টানিয়া আনে সে যে প্রেমের টান—রূপ যখন সেই ভাবকে চাপা দেয় তখন সে সেই প্রেমকে আঘাত করে, আনন্দকে আচ্ছন্ন করে—সেই জন্য যাহারা ভাবের ভক্ত তাহারা রূপের এইরূপ ভ্রষ্টাচার একেবারে সহিতে পারে না। কিন্তু রূপে তাহাদের পরমানন্দ যখন ভাবের সঙ্গে তাহার পূর্ণমিলন দেখে। কিন্তু শুধু রূপের দাসখত মানুষের সকলের অধম দুর্গতি। যাঁহারা মহাপুরুষ তাঁহারা মানুষকে এই দুর্গতি হইতেই উদ্ধার করিতে আসেন। তাই অচলায়তনে এই আশার কথাই বলা হইয়াছে যে যিনি গুরু তিনি

সমস্ত আশ্রয় ভাঙিয়া চুরিয়া দিয়া একটা শূন্যতা বিস্তার করিবার জন্য আসিতেছেন না; তিনি স্বভাবকে জানাইবেন, অভাবকে ঘুচাইবেন, বিরুদ্ধকে মিলাইবেন—যেখানে অভ্যাসমাত্র আছে সেখানে লক্ষ্যকে উপস্থিত করিবেন, এবং যেখানে তপ্ত বালু বিছানো খাদ পড়িয়া আছে মাত্র সেখানে প্রাণ-পরিপূর্ণ রসের ধারাকে বহাইয়া দিবেন। একথা কেবল যে আমাদেরই দেশের সম্বন্ধে খাটে তাহা নহে—ইহা সকল দেশের সকল মানুষের কথা। অবশ্য এই সার্বজনীন সত্য অচলায়তনে ভারতবর্ষীয় রূপ ধারণ করিয়াছে—তাহা যদি না করিত তবে ইহা অপাঠ্য হইত।

মনে করিয়াছিলাম সংক্ষেপে বলিব—কিন্তু 'নিজের কথা পাঁচ কাহন' হইয়া পড়ে,—বিশেষত শ্রোতা যদি সহৃদয় ও ক্ষমাপরায়ণ হন। ইতিপূর্বেও আপনার প্রতি জুলুম করিয়া সাহস বাড়িয়া গেছে, এবারেও প্রশ্রয় পাইব এই ভরসা মনে আছে। ইতি—৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩১৮

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিতার ছন্দ ও মিল

বিহারীলাল গোস্বামী

ভাদ্র মাসের 'ভারতী'তে তুলসীদাসের রামচরিত্র মানস সমালোচনায় লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন, "সংস্কৃত ছন্দগুলি প্রাদেশিক ভাষায় আনিতে যাইয়া কোন কবিই সংস্কৃত হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরের নিয়ম উৎকৃষ্ট ভাবে

দ্রষ্টব্য: ১৩০৭ সালের কার্তিক মাসের (চতুর্বিংশ খণ্ড) 'ভারতী' (সরলা দেবী সম্পাদিত) হইতে এই প্রবন্ধটি গৃহীত। এই বিষয়ে 'ছন্দ ও মিলের খুঁটিনাটি' শীর্ষক বিহারীলালের আর একটি প্রবন্ধ ঐ বৎসরেরই মাঘ মাসের 'ভারতীতে' প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গা কবিতার ছন্দ ও মিল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া উভয় প্রবন্ধেই লেখক প্রধানত রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থসমূহ হইতেই উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

পাবনা জেলার সাতবেড়ে গ্রাম বিহারীলালের জন্মস্থান। তিনি পোতাজিয়া হাই স্কুলের

রক্ষা করিতে পারেন নাই।” কথাটি অনেকটা ঠিক হইলেও বোধ হয় যে কবিরা সেরূপ চেষ্টা করেন নাই, অথবা ইচ্ছা করিয়াই ঈষৎ স্খলিত হইয়াছেন। তাঁহারা ভাষার প্রকৃতি বুঝিয়া একটু নূতন নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছেন মাত্র। লেখক-উদ্ধৃত তুলসীদাসের তোটক ছন্দেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—

ভব বারণ দারুণ সিংহ প্রভো,
গুণ সাগর নাগর নাথ বিভো।

ইহাতে লেখক কোন খুঁত দেখিতে পান নাই, কিন্তু 'অজ ব্যাপক মেক অনাদি সদা' চরণে দ্বিতীয় অক্ষর গুরু করা হইয়াছে বলিয়া ভুল বাহির করিয়াছেন। বস্তুত উভয় স্থলেই ভ্রম আছে, একটি তাঁহার চক্ষে পড়িয়াছে, অপরটি পড়ে নাই। সংযুক্ত বর্ণের পূর্বাক্ষর গুরু হয়, সুতরাং 'অজ ব্যাপক' চরণে দ্বিতীয় অক্ষর গুরু হওয়াতে যেমন ভুল হইয়াছে, তেমনি তোটকের তৃতীয় ষষ্ঠ নবম অক্ষর গুরু হওয়ার নিয়মে প্রথম শ্লোকের দশম অক্ষর গুরু করাও সংগত হয় নাই। কিন্তু কবিরা প্রাদেশিক ভাষায় এইটুকু বিশেষত্ব প্রবেশ করাইয়াছেন যে তাঁহারা দুই পদ আবশ্যকমত পৃথক ধরিয়া পাঠ করেন, তাহাতেই সংযুক্ত বর্ণের পূর্বাক্ষর (পূর্ব পদের) গুরু বলিয়া কানে বাজে না। তাঁহারা এক পদের মধ্যে এ নিয়ম সর্বত্র রক্ষা করিয়া চলেন। আমাদের রবীন্দ্রবাবুরও এই নিয়ম। তাঁহার বহু কবিতাই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে সক্ষম—

হেড-মাস্টার ছিলেন। পোতাজিয়া ছিল সাজাদপুর থানায়। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রে'র অনেক-গুলি চিঠি এই সাজাদপুর হইতে লিখিত।

বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথের 'সুপরিচিত' ছিলেন। বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিবার অনুরোধ জানাইয়া ১৩১৪ সালের ৫ই ফাল্গুন শিলাইদহ হইতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে এক পত্র লেখেন। কিন্তু পোতাজিয়া হাইস্কুলের দায়িত্ব ছাড়িতে না পারায় তাঁহার পক্ষে সেই অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভবপর হয় নাই।

গদ্য এবং পদ্য উভয়বিধ রচনায় বিহারীলালের বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। মূল সংস্কৃত হইতে বিভিন্ন ছন্দে অনূদিত তাঁহার 'গীতাবিন্দু' নামক সচিত্র কাব্যগ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিল। ১৯৩১ সালে (১৩৩৮) ষাট বৎসর বয়সে বিহারীলালের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু সংবাদে রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিঙ্ হইতে যে পত্র লেখেন তাহাতে তিনি বলেন—"তাঁহার রচনানৈপুণ্যে আমি বিস্ময় বোধ করিয়াছি।"...

"নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল।
ঊর্ধ্বে পাষাণ তট, শ্যাম শিলাতল।
মাঝে গহ্বর, তাহে পশি জলধার
ছল ছল করতালি দেয় অনিবার।"

ইহার দ্বিতীয় চরণে সংস্কৃত নিয়মে 'তট' শব্দের 'ট' যুক্ত অক্ষরের পূর্বে আছে বলিয়াই যে গুরু পাঠ করিতে হইবে তাহা নয়। কিন্তু গহ্বর শব্দের 'গ' ও 'নিম্ন'র 'নি' একই পদে আছে বলিয়া গুরু উচ্চারিত হইবে।

এখানে বক্তব্য রবীন্দ্রবাবু সংস্কৃত ছন্দে লিখেন নাই, ইহা আমাদের অধম-তারণ পয়ার ছন্দেই লিখিত হইয়াছে; চতুর্থ পংক্তি অক্ষর হিসাবে চৌদ্দই আছে, অবশিষ্টগুলির হিসাব একটু সতর্কভাবে করিতে হইবে—অর্থাৎ একটি গুরু বর্ণ দুইটি অক্ষরের সমান ধরিতে হইবে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, 'তট' শব্দের পর যতি পড়িয়াছে বলিয়াই উহার গুরুত্ব ধরা হয় নাই? আচ্ছা আরও উদাহরণ দেওয়া যাক—

"এমন মেঘস্বরে বাদল ঝর ঝরে,
তপনহীন ঘন তমসায়।"

"তাহারি পদধ্বনি যেন গনি কাননে।
আসিল সে আমার ভাঙ্গা* দ্বার খুলিয়া।"

চিহ্নিত শব্দগুলিতে নিয়মানুসারে 'ঘ' 'দ' ও 'ঙ্গা' গুরু উচ্চারিত হইয়া দুইটি অক্ষরের সমান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কবির উদ্দেশ্য তাহা নয়—সংযুক্ত বর্ণ ভিন্ন পদে আছে বলিয়া পূর্বপদের শেষ বর্ণ গুরু ধরা হয় নাই।

গুরু লঘু উচ্চারণ ভেদে রচিত কবিতার আরও কতিপয় বিশেষত্ব আছে। আমরা একে একে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

সকলেই জানেন সংস্কৃতে দীর্ঘস্বর (আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ) অনুস্বার বিসর্গযুক্ত বর্ণ, ও সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্ণ গুরু হয়। বাঙ্গালা ছন্দে যদি দীর্ঘস্বরের সমস্তই গুরু উচ্চারিত হয় তবে অত্যন্ত শ্রুতিকটুত্ব দোষ

---

* 'ভাঙ্গা' শব্দের গা অনুচ্চার্য: 'ভাঙা' এইরূপ পাঠ করিতে হইবে। এখানে ইহাও বক্তব্য—সংযুক্ত বর্ণ ভিন্ন পদে থাকিয়া পূর্বপদ একাক্ষর হইলে তাহা গুরু হইবে; যথা—

"কহিলাম আমি তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই।"

ঘটে। এইজন্য রবিবাবুর নিয়মে আ, ঈ, ঊ, এ, ও এই স্বরগুলি গুরুর ঘর হইতে বিদায় পাইয়াছে, কেবল ঐ এবং ঔ পরম গৌরবে রক্ষিত হইয়াছে। যথা—

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব রভসে,"

"মৌন সকল পৌর ভবন
সুপ্ত নগর মাঝে।"

"ছাড়ি কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী
জীবনের শেষে কি নূতন বেশে
দেখা দিবে মোরে অয়ি।"

উদ্ধৃত পদ্যাংশগুলিতে ঐকার ও ঔকার গুরু, কিন্তু আকার ঈকার ঊকার একার এবং ওকার গুরু নয়।

অনুস্বারযুক্ত বর্ণ গুরু হয়। যথা—

"আমি নির্মম, আমি নৃশংস,
সবেতে বসাব নিজের অংশ,
পরমুখ হতে করিয়া ভ্রংশ
তুলিব আপন কবলে।"

বিসর্গযুক্ত বর্ণ সংযোগ পূর্ববর্ণের মতই গুরু হয়, কিন্তু পদের অন্তে থাকিলে অকারান্তবৎ লঘু হইবে। যথা—

"অসহ দুঃখ সহি নিরবধি
কেমনে জনম গিয়েছে দগধি।"

"নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম
জননী বঙ্গ ভূমি!"

গুরু লঘু ভেদে অবলম্বিত বাঙ্গলা কবিতার পাঠ সম্বন্ধে এই সাধারণ নিয়ম। যেখানে অক্ষরগণিত ছন্দ রচিত হইয়াছে, সেখানে কিন্তু গদ্যের গুরু লঘু ভেদের নিয়মই রক্ষিত ও সেইরূপই পঠিত হয়। কেবল গুরু একটি বর্ণের গণনায় যে দুইটি বর্ণ ধরা উচিত তাহাই হয় না। অর্থাৎ গুরুবর্ণ কতটি হইবে তাহার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা করা হয় না—প্রত্যেক চরণে নির্দিষ্টসংখ্যা অক্ষর থাকিলেই হইল।

পরিশিষ্ট (ক)

"বৃষ্টি ঘেরা চারিধার ঘনশ্যাম অন্ধকার
ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দ আর ঝরঝর পাতা,
থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে গুরু গুরু গরজনে
মেঘদূত পড়ে মনে আষাঢ়ের গাথা।"

উল্লিখিত রচনায় সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্ণসকল সাধারণ নিয়মে গুরুই উচ্চারিত হইতেছে—এমন কি, 'ঘনশ্যাম' পদদ্বয়ে 'ন' গুরু। পাঠক লক্ষ্য রাখিবেন 'তাহারি পদধ্বনি যেন গণি কাননে' এই চরণের মধ্যস্থ 'পদ' শব্দের 'দ' গুরু নয়—কারণ, ইহা গুরু লঘু ভেদে লিখিত হইয়াছে; 'দ' গুরু হইলে 'পদধ্বনি' পাঁচ অক্ষর ধরা হইত, সুতরাং 'যেন গণি'র চারি অক্ষরে মিল পড়িত না।

মোটের উপর এই দাঁড়াইতেছে যে, সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্ণ বাঙ্গলায় গদ্যে পদ্যে উভয়ত্রই গুরু—পদ্যে যুক্ত বর্ণটি পদের মধ্যে বা শেষে থাকা চাই; প্রথমে থাকিলে, পূর্বপদের শেষ অক্ষর গুরু-লঘুভেদ পদ্যে গুরু হয় না, অক্ষরগণিত-পদ্যে গুরু হয়। কিন্তু পূর্বপদের শেষ বর্ণ হসন্ত উচ্চারিত হইলে হইবে না। অনুস্বার বিসর্গ যুক্ত বর্ণ এবং ঐকার ও ঔকার গুরু হয়; কিন্তু অপরাপর দীর্ঘস্বরের গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রাখা হয় না।

এক্ষণে কথা হইতেছে, কোন্ কবিতা গুরু লঘু ভেদে লিখিত বলিয়া সেই অনুসারেই পঠিত হইবে তাহা কেমন করিয়া জানা যাইবে? ইহার উত্তর খুব সহজ। যেমন সংস্কৃত কবিতায় ছন্দের নাম না জানিলেও দীর্ঘ হ্রস্ব ভেদে উচ্চারণ করিয়া পড়িয়া গেলেই ঠিক মত পাঠ করা হয়, বাঙ্গলায়ও সেইরূপ। যথা—

ইয় মধিক মনোজ্ঞা বল্কলে না পি তন্বী—

এই সংস্কৃত শ্লোক-চরণের এ্যান্টিক টাইপের বর্ণগুলি গুরু উচ্চারণ করিয়া অবশিষ্ট-গুলি লঘু উচ্চারণ করিলেই 'মালিনী' ছন্দে সুন্দর পাঠ করা হইল। একটি কথা মনে পড়িতেছে—বাঙ্গলায় ঐ এবং ঔকার ছাড়া আকারাদি অন্যান্য দীর্ঘস্বর যে প্রায়শঃ গুরু উচ্চারিত হয় না, তাহা 'চিরকুমার সভায়' সেদিন হঠাৎ ঠিক হইয়া গিয়াছে। যদিও 'ইয়মধিক মনোজ্ঞা চাপ কানেনাপি তন্বী' চরণটি সংস্কৃত ছন্দেই পঠিত হইয়াছিল, তথাপি বাঙ্গলা কবিতা ও সংগীতে চিরকাল অভ্যস্ত থাকায় 'চিরকুমার সভায়' ইহার আবৃত্তিকালে উক্ত সভার ভূতপূর্ব

সত্য অক্ষয়বাবুরও 'কানে'র ঠিক ছিল না, নতুবা তিনি ঐ চাপকানটির শেষ-ভাগের আকার হ্রস্ব করিয়া দিতেন।

আর একটি কথা এই যে, পয়ারের কম অক্ষর হইলেই রবিবাবু সাধারণতঃ গুরু-লঘু ভেদে কবিতা লিখিয়া থাকেন। বিরাম আট অক্ষরের কমে পড়িলে, পয়ারাধিকে এবং পয়ারেও কখন কখন এই নিয়ম পালন করেন। আবার কখন বা কবিতা-পংক্তির ক্ষিপ্রগতি ও শব্দের ঝংকারের উপর ঝোঁক দেওয়া বাঞ্ছনীয় হইলেও এই নিয়মে চলিয়া থাকেন; দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

"(দেবি,) অনেক ভক্ত ।৬। এসেছে তোমার চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি,
আমি অভাগ্য । এনেছি বহিয়া অশ্রুজলে
ব্যর্থ সাধনখানি !"

"অঙ্গে অঙ্গে ।৬। বাঁধিছ রঙ্গপাশে,
বাহুতে বাহুতে । জড়িত ললিত লতা ।
ইঙ্গিতরসে । ধ্বনিয়া উঠিছে হাসি,
নয়নে নয়নে । বহিছে গোপন কথা ।"
(পয়ার)

"ঝুলন খেলা ।৫। রাত্রি বেলা !"

"আসিবেক শীত, ।৬। বিহঙ্গ গীত
যাইবে থামি,
ফুল পল্লব । ঝ'রে যাবে সব,
রহিব আমি ।"

"তবে দাও ঢালি ।৬। কেবল মাত্র
দুচারি দিবস । দুচারি রাত্র
পূর্ণ করিয়া । জীবন পাত্র
জন-সংঘাত মদিরা ।"

"কিছুতে নাহি তোষ ।৭। এত বিষম দোষ
গ্রাম্য বালিকার । স্বভাব ও যে ।"

"বুকভরা মধু ।৬। বঙ্গের বধূ
জল লয়ে যায় ঘরে,
মা বলিতে প্রাণ । করে আনচান
চোখে আসে জল ভরে ।"

উপরিলিখিত রচনাগুলিতে যতি আট অক্ষরের কমের উপর (৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম অক্ষরে) পড়িয়াছে, সুতরাং এ্যান্টিক টাইপের প্রত্যেক বর্ণ দুই বর্ণের সমান ধরিতে এবং গুরু করিয়া পড়িতে হইবে ।

কিন্তু আট অক্ষর চরণবিশিষ্ট দীর্ঘ ত্রিপদী কিংবা চৌপদীতে কবিবর কেবল অক্ষর গণনা করিয়াই প্রায় লেখেন । যথা—

'বদ্ধ গৃহে করি বাস ।৮। রুদ্ধ যবে হয় শ্বাস,
আধেক বসনবন্ধ খুলিয়া ;
বসি গিয়া বাতায়নে সুখসন্ধ্যা সমীরণে
ক্ষণ তরে আপনারে ভুলিয়া ।"

"আজি বর্ষা গাঢ়তম ; ।৮। নিবিড় কুন্তল সম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে ।
ওই যে শবদ চিনি, নূপুর রিনিকি ঝিনি,
কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে !
(যদি) ভরিয়া লইবে কুম্ভ ।৮। এস ওগো এস মোর
হৃদয়-নীরে ।"

বোধ করি প্রাদেশিক ভাষায় হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণভেদে কবিতা রচনায় ইহাই সাধারণ ও সুষ্ঠু নিয়ম । অতঃপর মিল সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে ।

দীনেশবাবু প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন—"শুধু সর্বশেষ অক্ষরের মিল হইলেই কবিতা সিদ্ধ হয় না, তৎপূর্ব বর্ণের স্বরের ঐক্য হওয়া চাই । যথা—'ভাগি' এবং 'ভাগী,' 'ধারণ' এবং 'রাবণ' মিলিয়া যায়, কিন্তু 'নীলা' ও 'মূলা' নিষিদ্ধ,

কারণ এই দুই শব্দের পূর্ববর্ণের স্বরের ঐক্য নাই।" কিন্তু এই নিয়মটি দুই অক্ষরবিশিষ্ট শব্দের মিল সম্বন্ধেই খাটে, যদি মিলনের শব্দগুলি তিন চারি কি বেশি অক্ষরের ক্রিয়াপদ হয় তবে ভাল খাটে না। যথা—'করিয়া' এবং 'ঠুকিয়া,' 'রাখিতাম' এবং 'ধরিতাম' এইরূপ মিল দিলে দীনেশবাবুর ধৃত নিয়মটি অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু কোমল কর্ণ কিছু ক্ষুণ্ণ হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় এক রবীন্দ্রবাবু ছাড়া বঙ্গের অন্য কবিগণ ক্রিয়াপদের মিল সম্বন্ধে বিপুল ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ক্রিয়াপদের সুন্দর মিলন রবিবাবুর গ্রন্থে পত্রে পত্রে পাওয়া যায়। একটি উদাহরণ দিতেছি—

"তোমারে আঁকিতাম
রাখিতাম ধরিয়া,
বিরহ ছায়াতল
সুশীতল করিয়া।
কখন দেখি যেন
ম্লান হেন মুখানি,
কখন আঁখিপুটে
হাসি উঠে ভরিয়া!
কখন সারা রাত
ধরি' হাত দুখানি
রহি গো বেশবাসে
কেশপাশে মরিয়া!"

অর্থাৎ তিনি তিনের অধিক অক্ষরান্বিত ক্রিয়াপদের মূল ধাতু হইতেই আরম্ভ করেন। প্রত্যয়গুলি যে সমান হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। উপরি উদ্ধৃত কবিতার শেষ চরণে 'বেশবাসে'র সঙ্গে 'কেশপাশে'র মিল দেওয়া হইয়াছে—এইরূপ মিল বড় মিষ্ট; অর্থাৎ মিল একটি শব্দেই আবদ্ধ নয়, পূর্বের শব্দ হইতেই আরব্ধ। এরূপ সুন্দর মিল ভারতচন্দ্রেও পাওয়া যায়।…

যদিও ক্রিয়ার মিল সম্বন্ধে রবীন্দ্রবাবুর নিয়মের ব্যভিচার ভারতচন্দ্রে ভূরি ভূরি দৃষ্ট হয়, তথাপি এ বিষয়েও যে সেই পছন্দসই ছন্দ-রচয়িতার দৃষ্টি ছিল না তাহা নয়।…

কখন কখন মিলের শেষ শব্দদ্বয় এক হইয়া যায়, তখন পূর্বশব্দের মিলই ধর্তব্য ; যথা—

"তাই যদি সে কাছে আসে পালাই দূরে,
আপন মনো আশা দলে' যাই,
পাছে সে মোরে দেখে' চমকি বলে 'এ কে ?'
দুহাতে মুখ ঢেকে চলে যাই।"

আবার কখন মিলদ্বয়ের একটি এক শব্দ। অপরটি দুই শব্দ ; কিন্তু এক শব্দের অংশগুলির প্রত্যেকের সঙ্গে মিলের অপর দুই শব্দের প্রত্যেকের সঙ্গে মিল পড়ে।

"মনে গোপনে থাকে প্রেম, যায় না দেখা
কুসুম দেয় তাই দেবতায়।
দাঁড়ায়ে থাকি দ্বারে, চাহিয়া দেখি তারে,
কি বলে' আপনারে দেব তা'য়।"

কেহ কেহ বলিবেন এ সকল ত অনুপ্রাস যমকের দৃষ্টান্ত হইল ! ঐ অলংকার-গুলা যে আজকাল ভাষার অঙ্গে শোভা পায় না। তাহার উত্তরে এই মাত্র বলিতে পারি—

কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।

যাহার আকৃতি মধুর তাহার সকলই অলংকার। যে রচনা আন্তরিক কবিত্বপূর্ণা, তাহার গাত্রে দুই একখানি অলংকার দিলে সৌন্দর্য বাড়ে বই কমে না।

যাহা হউক, মিলের কথা এখন শেষ করিতে হইবে। এইরূপ ডবল মিল ইংরাজি ভাষায় বিশেষরূপ প্রচলিত। কিন্তু এইরূপ মিল তখনই বেশি মিষ্ট লাগে, যখন পূর্বভাগের শেষ অনুনাসিক বর্ণে হইয়া পরের ভাগের কোন ব্যঞ্জনবর্ণে ঝংকার দিয়া উঠে। যথা—

"Now, who could be neater
Or brighter, or sweeter,
Or who hum a song so
delightfully low ;

Or who look so slender,
So graceful, so tender,
As Nancy, my Nancy, while kneading the dough ?"

এই কবিতার neater এবং sweeter অপেক্ষা slender এবং tender পদদ্বয়ের মিল বেশি মধুর। বাঙলায়, যথা—

"করি লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন
বসন খোল
দে দোল দোল।" (রবি)

* *
*

"সাহিত্যের মাত্রা"

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণীয়েষু,—শ্রাবণের (১৩৪০) 'পরিচয়' পত্রিকায় শ্রীমান্ দিলীপকুমারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র—সাহিত্যের মাত্রা—সম্বন্ধে তুমি আমার অভিমত জানতে চেয়েছ। এ চিঠি ব্যক্তিগত হলেও যখন সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়েছে, তখন এরূপ অনুরোধ হয়ত করা যায়, কিন্তু অনেক চার-পাতা-জোড়া চিঠির শেষ ছত্রের 'কিছু টাকা পাঠাইবার' মতো এরও শেষ ক'লাইনের আসল বক্তব্য যদি এই হয় যে, ইউরোপ তার যন্ত্রপাতি ধনদৌলত-কামান-বন্দুক-মান-ইজ্জত সমেত অচিরে ডুববে, তবে অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে এই কথাই মনে করবো যে, বয়েস ত অনেক হ'ল, ও-বস্তু কি আর চোখে দেখে যাবার সময় পাবো!

দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্মের সীমানা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ 'বিচিত্রা' (শ্রাবণ, ১৩৩৪) মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ঘটনার আশ্চর্য যোগাযোগে, দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে ১৩৪০ সালের শ্রাবণ মাসের 'পরিচয়' পত্রিকায়, দিলীপকুমার রায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র 'সাহিত্যের মাত্রা' নামে নামাঙ্কিত হইয়া প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধে এই অভিযোগ করা হয় যে, একদল সাহিত্যিক সাহিত্যের চিরন্তন মূলনীতি লঙ্ঘন করিয়া রুচি-বিকৃতির পরিচয় দানে অগ্রণী হইয়াছেন।

কিন্তু এদের ছাড়াও কবি আরও যাদের সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, তোমাদের সন্দেহ তার মধ্যে আমিও আছি। অসম্ভব নয়। এ প্রবন্ধে কবির অভিযোগের বিষয় হ'ল ওরা 'মত্ত হস্তী' 'ওরা বুলি আওড়ালে' 'পালোয়ানি করলে' 'কসরৎ কেরামৎ দেখালে' 'প্রব্লেম সল্‌ভ করলে' অতএব ওদের ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই কথাগুলো যাদেরকেই বলা হোক, সুন্দরও নয়, শ্রুতিসুখকরও। শ্লেষবিদ্রূপের আমেজে মনের মধ্যে একটা ইরিটেশান আনে। তাতে বক্তারও উদ্দেশ্য যায় ব্যর্থ হয়ে, শ্রোতারও মন যায় বিগড়ে। অথচ ক্ষোভ-প্রকাশ যেমন বাহুল্য, প্রতিবাদও তেমনি বিফল। কার তৈরি করা বুলি পাখীর মত আওড়ালুম, কোথায় পালোয়ানি করলুম, কি 'খেল' দেখালুম, ক্রুদ্ধ কবির কাছে এ সকল জিজ্ঞাসা অবান্তর। আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। খেলার মাঠে কেউ রব তুলে দিলেই হ'ল অমুক গু মাড়িয়েছে। আর রক্ষে নেই,—কোথায় মাড়ালুম, কে বললে, কে দেখেছে, ওটা গু নয়, গোবর—সমস্ত বৃথা। বাড়ি এসে মায়েরা না নাইয়ে, মাথায় গঙ্গাজলের ছিটে না দিয়ে আর ঘরে ঢুকতে দিতেন না। কারণ, ও যে গু মাড়িয়েছে! এও আমার সেই দশা!

'সাহিত্যের মাত্রা'ই বা কি, আর অন্য প্রবন্ধই বা কি, এ কথা অস্বীকার করি নে যে, কবির এই ধরনের অধিকাংশ লেখাই বোঝবার মতো বুদ্ধি

রবীন্দ্রনাথের এই পত্র সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত জ্ঞাপনে অনুরুদ্ধ হইয়া শরৎচন্দ্র 'পরিচারক' সম্পাদক অতুলানন্দ রায়কে যে দীর্ঘ পত্র লেখেন, উক্ত পত্রখানিই এস্থলে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল। ইহা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'শরৎচন্দ্রের রচনাবলী'তে (আষাঢ়, ১৩৫৮) এবং 'শরৎচন্দ্রের রচনাসম্ভার'-এর মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছে।

কিন্তু এই শরৎচন্দ্রই রবীন্দ্রনাথের সত্তরবৎসরপূর্তিতে (১৩৩৮) রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছিলেন—

> "কবি, তুমি অনেক দিয়েচো, এই দীর্ঘকাল তোমার কাছে আমরা অনেক পেয়েচি। সুন্দর, সবল, সর্বসিদ্ধিদায়িনী ভাষা দিয়েচো তুমি, দিয়েচো বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ কাব্য, দিয়েচো অপরূপ সাহিত্য, দিয়েচো জগতের কাছে বাঙলার ভাষা ও ভাবসম্পদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, আর দিয়েচো যা সকলের বড়—আমাদের মনকে দিয়েচো তুমি বড় করে। তোমার সৃষ্টির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার আমার সাধ্যাতীত।"···

আমার নেই। তাঁর উপমা উদাহরণে আসে কল-কব্জা, আসে হাট-বাজার হাতী-ঘোড়া জন্তু-জানোয়ার—ভেবেই পাই নে মানুষের সামাজিক সমস্যায় নর-নারীর পরস্পরের সম্বন্ধ বিচারে ওরা সব আসেই বা কেন এবং এসেই বা কি প্রমাণ করে? শুনতে বেশ লাগসই হলেই ত তা যুক্তি হয়ে ওঠে না।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। কিছুদিন পূর্বে হরিজনদের প্রতি অবিচারে ব্যথিত হয়ে তিনি প্রবর্তক-সংঘের মতিবাবুকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। তাতে অনুযোগ করেছিলেন যে, ব্রাহ্মণীর পোষা বিড়ালটা এঁটো মুখে গিয়ে তাঁর কোলে বসে, তাতে শুচিতা নষ্ট হয় না—তিনি আপত্তি করেন না। খুব সম্ভব করেন না, কিন্তু তাতে হরিজনদের সুবিধা হ'ল কি? প্রমাণ করলে কি? বিড়ালের যুক্তিতে এ কথা ত ব্রাহ্মণীকে বলা চলে না যে, যে-হেতু অতি-নিকৃষ্ট-জীব বেড়ালটা গিয়ে তোমার কোলে বসেছে, তুমি আপত্তি করো নি, অতএব, অতি-উৎকৃষ্ট-জীব আমিও গিয়ে তোমার কোলে বসবো, তুমি আপত্তি করতে পারবে না। বেড়াল কেন কোলে বসে, পিঁপড়ে কেন পাতে ওঠে, এ সব তর্ক তুলে মানুষের সঙ্গে মানুষের ন্যায়-অন্যায়ের বিচার হয় না। এ সব উপমা শুনতে ভাল, দেখতেও চক্‌চক্‌ করে, কিন্তু যাচাই করলে দাম যা ধরা পড়ে, তা অকিঞ্চিৎকর। বিরাট ফ্যাক্টরির প্রভূত বস্ত্র-পিণ্ড উৎপাদনের অপকারিতা দেখিয়ে মোটা নভেলও অত্যন্ত ক্ষতিকর, এ কথা প্রতিপন্ন হয় না।

আধুনিক কালের কল-কারখানাকে নানা কারণে অনেকেই আজকাল নিন্দে করেন, রবীন্দ্রনাথও করেছেন—তাতে দোষ নেই। বরঞ্চ, ওইটেই হয়েছে ফ্যাশান। এই বহু-নিন্দিত বস্তুটার সংস্পর্শে যে মানুষগুলো ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় এসে পড়েছে, তাদের সুখ-দুঃখের কারণগুলোও হয়ে দাঁড়িয়েছে জটিল—জীবন-যাত্রার প্রণালীও গেছে বদ্‌লে, গাঁয়ের চাষাদের সঙ্গে তাদের হুবহু মেলে না। এ নিয়ে আপসোস করা যেতে পারে, কিন্তু তবু যদি কেউ এদেরই নানা বিচিত্র ঘটনা নিয়ে গল্প লেখে, তা সাহিত্য হবে না কেন? কবিও বলেন না যে হবে না! তাঁর আপত্তি শুধু সাহিত্যের মাত্রা লঙ্ঘনে কিন্তু এই মাত্রা স্থির হবে কি দিয়ে? কলহ দিয়ে, না কটু কথা দিয়ে? কবি বলেছেন—স্থির হবে সাহিত্যের চিরন্তন মূল নীতি দিয়ে। কিন্তু এই 'মূল নীতি' লেখকের বুদ্ধির অভিজ্ঞতা ও স্বকীয় রসোপলব্ধির আদর্শ ছাড়া

আর কোথাও আছে কি? চিরন্তনের দোহাই পাড়া যায় শুধু গায়ের জোরে আর কিছুতে নয়। ওটা মরীচিকা।

কবি বলছেন, "উপন্যাস-সাহিত্যেরও সেই দশা। মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েছে।" কিন্তু প্রত্যুত্তরে কেউ যদি বলে, "উপন্যাস-সাহিত্যের সে দশা নয়, মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েনি, চিন্তার সূর্যালোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।" তাকে নিরস্ত করা যাবে কোন্ নজীর দিয়ে? এবং এরই সঙ্গে আর একটা বুলি আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, তাতে রবীন্দ্রনাথও যোগান দিয়েছেন এই ব'লে যে, "যদি মানুষ গল্পের আসরে আসে, তবে সে গল্পই শুনতে চাইবে, যদি প্রকৃতিস্থ থাকে।" বচনটি স্বীকার করে নিয়েও পাঠকেরা যদি বলে—হাঁ, আমরা প্রকৃতিস্থই আছি, কিন্তু দিনকাল বদলেছে এবং বয়েসও বেড়েছে; সুতরাং রাজপুত্র ও ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্পে আর আমাদের মন ভরবে না, তা' হলে জবাবটা যে তাদের দুর্বিনীত হবে, এ আমি মনে করি নে। তারা অনায়াসে বলতে পারে, গল্পে চিন্তাশক্তির ছাপ থাকলেই তা পরিত্যাজ্য হয় না কিংবা বিশুদ্ধ গল্প লেখার জন্য লেখকের চিন্তাশক্তি বিসর্জন দেবারও প্রয়োজন নেই।

কবি মহাভারত ও রামায়ণের উল্লেখ করে ভীষ্ম ও রামের চরিত্র আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন, 'বুলি'র খাতিরে ও-দুটো চরিত্রই মাটি হয়ে গেছে। এ নিয়ে আমি আলোচনা করবো না, কারণ ও-দুটো গ্রন্থ শুধু কাব্যগ্রন্থই নয়, ধর্মপুস্তক ত বটেই, হয়ত বা ইতিহাসও বটে। ও-দুটি চরিত্র কেবলমাত্র সাধারণ উপন্যাসের বানানো চরিত্র নাও হতে পারে, সুতরাং সাধারণ কাব্য-উপন্যাসের গজকাঠি নিয়ে মাপতে যেতে আমার বাধে।

চিঠিটায় ইন্‌টালেকৃট শব্দটার বহু প্রয়োগ আছে। মনে হয় যেন কবি বিদ্যে ও বুদ্ধি উভয় অর্থেই শব্দটার ব্যবহার করেছেন। প্রব্লেম শব্দটাও তেমনি। উপন্যাসে অনেক রকমের প্রব্লেম থাকে, ব্যক্তিগত, নীতিগত, সামাজিক, সাংসারিক, আর থাকে গল্পের নিজস্ব প্রব্লেম, সেটা প্লটের। এর গ্রন্থিই সবচেয়ে দুর্ভেদ্য। কুমারসম্ভবের প্রব্লেম, উত্তরকাণ্ডে রামভদ্রের প্রব্লেম, ডল্‌স হাউসের নোরার প্রব্লেম অথবা যোগাযোগের কুমুর প্রব্লেম একজাতীয় নয়। 'যোগাযোগ' বইখানা যখন 'বিচিত্রা'য় চলছিল এবং অধ্যায়ের পর অধ্যায় কুমু যে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল, আমি ত ভেবেই পেতুম না ঐ দুর্ধর্ষ প্রবল-

পরাক্রান্ত মধুসূদনের সঙ্গে তার টাগ্-অফ-ওয়ারের শেষ হবে কি করে? কিন্তু কে জানতো সমস্যা এত সহজ ছিল—লেডী ডাক্তার মীমাংসা করে দেবেন এক মুহূর্তে এসে। আমাদের জলধর দাদাও প্রব্লেম দেখতে পারেন না, অত্যন্ত চটা। তাঁর একটা বইয়ে এমনি একটা লোক ভারি সনস্যার সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু তার মীমাংসা হয়ে গেল অন্য উপায়ে। ফোঁস করে একটা গোখরো সাপ বেরিয়ে তাকে কামড়ে দিলে। দাদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, এটা কি হ'ল? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, কেন, সাপে কি কাউকে কামড়ায় না?

পরিশেষে আর একটা কথা বলবার আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ইবসেনের নাটকগুলি ত একদিন কম আদর পায় নি, কিন্তু এখনি কি তার রং ফিকে হয়ে আসেনি, কিছুকাল পরে সে কি আর চোখে পড়বে?" না পড়তে পারে কিন্তু তবুও এটা অনুমান, প্রমাণ নয়। পরে একদিন এমনও হতে পারে, ইবসেনের পুরনো আদর আবার ফিরে আসবে। বর্তমান কালই সাহিত্যের চরম হাইকোর্ট নয়।

সাহিত্যের রীতি ও নীতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রাবণ মাসের 'বিচিত্রা' পত্রিকায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ধর্ম নিরূপণ করিয়াছেন এবং পরবর্তী সংখ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত উক্ত ধর্মের সীমানা নির্দেশ করিয়া একান্ত শ্রদ্ধাভরে কবির উদাহরণগুলিকে রূপক এবং যুক্তিগুলিকে সবিনয়ে রস-রচনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

উভয়ের মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে প্রধানতঃ আধুনিক সাহিত্যের আব্রুতা ও বে-আব্রুতা লইয়া।

দ্রষ্টব্য : 'কল্লোল,' 'কালিকলম' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে তৎকালীন একদল 'অতি-আধুনিক' শক্তিমান কথা-সাহিত্যিক যখন নূতন বিষয়বস্তু লইয়া বাস্তবধর্মী গল্প-উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে অশ্লীলতা প্রভৃতির অভিযোগ আরোপিত

ইতিমধ্যে বিনাদোষে আমার অবস্থা করুণ হইয়া উঠিয়াছে। নরেশচন্দ্রের বিরুদ্ধদলের শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি'তে আমার মতামত এমনি প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন যে, ঢোঁক গিলিয়া, মাথা চুলকাইয়া হাঁ ও না একই সঙ্গে উচ্চারণ করিয়া পিছলাইয়া পলাইবার পথ আর রাখেন নাই। একেবারে বাঘের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছেন।

এদিকে বিপদ হইয়াছে এই যে, কালক্রমে আমারও দুই চারিজন ভক্ত জুটিয়াছেন; তাঁহারা এই বলিয়া আমাকে উত্তেজিত করিতেছেন যে, তুমিই কোন্ কম? দাওনা তোমার অভিমত প্রচার করিয়া।

আমি বলি, সে যেন দিলাম, কিন্তু তার পরে? নিজে যে ঠিক কোন্ দলে আছি তাহা নিজেই জানি না, তা' ছাড়া ওদিকে নরেশবাবু আছেন যে! তিনি শুধু মস্ত পণ্ডিত নহেন, মস্ত উকিল। তাঁর যে জেরার পরাক্রমে কবির যুক্তি-তর্ক রস-রচনা হইয়া গেল, সে জেরার প্যাঁচে পড়িলে আমি ত এক দণ্ডও বাঁচিব না। কবি তবুও অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তির কোঠায়

হয়। 'বিচিত্রা' (শ্রাবণ, ১৩৩৪) পত্রিকায় 'সাহিত্যধর্মের সীমানা' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের উক্তি করেন যে, এই নবীন লেখকগণ বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য বে-আব্রুতা আমদানী করিতেছেন। কবির এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে লিখিত ও এস্থলে মুদ্রিত 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' নামক শরৎ-চন্দ্রের এই রচনাটি 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় (আশ্বিন, ১৩৩৪) প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গবাণী'র সহিত শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁহার বিখ্যাত রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী' ধারাবাহিক-ভাবে এই পত্রিকাখানিতেই প্রকাশিত হইয়াছিল।

'সাহিত্যধর্মের সীমানা' লইয়া বাদ-প্রতিবাদ কয়েকমাস ধরিয়া চলিয়াছিল। পরিশেষে রবীন্দ্র-নাথ 'প্রবাসী'তে 'সাহিত্যের নবত্ব' নামক একটি প্রবন্ধে বিরুদ্ধপক্ষের প্রতিবাদের উত্তর দিয়াছিলেন।

'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' নামক পত্রাকারে লিখিত শরৎচন্দ্রের এই প্রবন্ধটি পরে দীনেশচন্দ্র বর্মণ কর্তৃক 'আর্য পাবলিশিং হাউস,' ময়মনসিংহ হইতে 'স্বদেশ ও সভ্যতা' (শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধসংগ্রহ) নামক গ্রন্থে স্থানলাভ করে। ইহা ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের লিখিত আরও দুইটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। (১) 'রবীন্দ্রনাথ' (কবির সপ্ততিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে [১৩৩৮] কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত জয়ন্তী-উৎসবে পঠিত)। (২) 'শিক্ষার বিরোধ' ('প্রবাসী'তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধের প্রতিবাদে লিখিত ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় মুদ্রিত)।

পৌঁছিয়াছেন, আমি হয়ত ব্যাপ্তি-অব্যাপ্তি কোনটারই নাগাল পাইব না, ত্রিশঙ্কুর ন্যায় শূন্যে ঝুলিয়া থাকিব! তখন?

ভক্তরা বলে, আপনি ভীরু।

আমি বলি, না।

তাহারা বলে, তবে প্রমাণ করুন।

আমি বলি, প্রমাণ করা কি সহজ ব্যাপার! 'রস-সৃষ্টি' 'রসোদ্বোধন' প্রভৃতির রস-বস্তুটির মত ধোঁয়াটে বস্তু সংসারে আর আছে নাকি? এ কেবল রস-রচনার দ্বারাই প্রমাণিত করা যায়;—কিন্তু সে সময় আপাততঃ আমার হাতে নাই।

এ ত গেল আমার দিকের কথা। ও-দিকের কথাটা ঠিক জানি না, কিন্তু অনুমান করিতে পারি।

প্রিয়পাত্ররা গিয়া কবিকে ধরিয়াছে, মশাই আমরা ত আর পারিয়া উঠি না, এবার আপনি অস্ত্র ধরুন। না, না, ধনুর্বাণ নয়,—গদা। ঘুরাইয়া দিন ফেলিয়া ওই অতি-আধুনিক সাহিত্যিক পল্লীর দিকে। লক্ষ্য? কোন প্রয়োজন নাই। ওখানে একসঙ্গে অনেকগুলি থাকে।

কবির সেই গদাটাই অন্ধকারে আকাশ হইতে পড়িয়াছে। ইহাতে ঈপ্সিত লাভ না হোক শব্দ এবং ধুলা উঠিয়াছে প্রচুর। নরেশচন্দ্র চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন, এবং বিনীত ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে বারংবার প্রশ্ন করিতেছেন, কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন বলুন? কেন করিয়াছেন বলুন? হাঁ কি না বলুন?

কিন্তু এ প্রশ্নই অবৈধ। কারণ, কবি ত থাকেন বারো মাসের মধ্যে তেরো মাস বিলাতে। কি জানেন তিনি কে আছে তোমাদের খড়্গহস্তা শুচি-ধর্মী অনুরূপা, আর কে আছে তোমাদের বংশীধারী অশুচি-ধর্মী শৈলজা-প্রেমেন্দ্র-নজরুল—কল্লোল-কালিকলমের দল? কি করিয়া জানিবেন তিনি কবে কোন্ মহীয়সী জননী অতি-আধুনিক-সাহিত্যিক দলন করিতে ভবিষ্যৎ মায়েদের সূতিকাগৃহেই সন্তান-বধের সদুপদেশ দিয়া নৈতিক উচ্ছ্বাসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, আর কবে শৈলজানন্দ কুলি-মজুরের নৈতিক হীনতার গল্প লিখিয়া আভিজাত্য খোয়াইয়া বসিয়াছে? এ সকল অধ্যয়ন করিবার মত সময়, ধৈর্য এবং প্রবৃত্তি কোনটাই কবির নাই, তাঁহার অনেক কাজ। দৈবাৎ এক-আধটা টুক্‌রা-টাক্‌রা লেখা যাহা তাঁহার চোখে পড়িয়াছে তাহা হইতেও

তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে, আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের আব্রুতা এবং আভিজাত্য দুই-ই গিয়াছে। সুরু হইয়াছে চিৎপুর রোডের খচো-খচো-খচ্‌কার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃপুনঃ আবর্তিত গর্জন। আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি কবির এতবড় অবিচারে শুধু নরেশচন্দ্রের নয়, আমারও বিস্ময় ও ব্যথার অবধি নাই।

ভক্ত-বাক্যের মত প্রামাণ্য সাক্ষ্য আর কি আছে? অতএব, তাঁহার নিশ্চয় বিশ্বাস জন্মিয়াছে আধুনিক সাহিত্যে কেবল সত্যের নাম দিয়া নর-নারীর যৌন-মিলনের শারীর ব্যাপারটাকেই অলংকৃত করা চলিয়াছে। তাহাতে লজ্জা নাই, সরম নাই, শ্রী নাই, সৌন্দর্য নাই, রসবোধের বাষ্প নাই, আছে শুধু ফ্রয়েডের সাইকো-এনালিসিস্‌। অথচ, যে-কোন সাহিত্যিককেই যদি তিনি ডাকিয়া পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন ত শুনিতে পাইতেন তাহারা প্রত্যেকেই জানে যে, সত্যমাত্রই সাহিত্য হয় না, জগতে এমন অনেক নোংরা সত্য ঘটনা আছে যে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া কোন মতেই সাহিত্য রচনা করা চলে না।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধ : "সদুপায়"

অমরেন্দ্রনাথ রায়

মনীষার অধিকারী হইয়া সাহিত্য-রঙ্গমঞ্চে নানাপ্রকার অভিনয় করা চলিতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক মঞ্চে উঠিয়া দেশবাসীর হৃদয় জয় করা কেবল মনীষায় হয় না। অপরের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা লাভ করিতে হইলে নিজের হৃদয় ও মুখ এক করা চাই,—ভাবের ঘরে চুরি থাকিলে চলিবে না। শিবাজী, ম্যাট্‌সিনী প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জীবনচরিত এই কথারই উজ্জ্বল উদাহরণ।

দ্রষ্টব্য : এই রচনাটি অমরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত 'রবিয়ানা' নামক পুস্তক হইতে গৃহীত। অমরেন্দ্রনাথ ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকার নিয়মিত লেখক। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পূর্বাপর মতের অসংগতি দেখাইয়া 'কঠোর সমালোচনা' নামক একটি নিবন্ধে অমরেন্দ্রনাথ লেখেন যে—

অসাধারণ মনীষা এবং প্রগাঢ় প্রেম যাঁহাতে একত্র মিলিত হইয়াছে, কেবল তিনিই রাজনৈতিক মঞ্চে উঠিবার অধিকারী। আর যিনি আত্মনিগ্রহের বিন্দুমাত্র উত্তাপ সহ্য করিতে ভীত, যিনি আপনাকে বাঁচাইয়া ত্যাগের দৃষ্টান্তের জন্য অপরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকেন—তিনি যত বড় মনীষীই হউন, যত বড়ই কবি হউন, তাঁহার এ পথে 'প্রবেশ-নিষেধ'। কারণ, যেখানে আন্তরিকতার অভাব, সেখানে লঘুতাই প্রবেশ করিয়া থাকে। আর যেখানে সেই লঘুতা আশ্রয় গ্রহণ করে, সেখানে মতের কখনও স্থিরতা দেখা যায় না—মত কেবলই পরিবর্তিত হয়। অতএব এরূপ মনীষীর মতানুসারে কার্য করিতে গেলে পদে পদে পতনের সম্ভাবনাই অধিক।

আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই ধরনের মনীষী। রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তাঁহার মতের কোনও ঠিক নাই। যে সকল উপকরণ করতালির অনুকূল, তাঁহার রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলিতে অবশ্য সে সকল উপকরণ যথেষ্ট আছে। তাহাতে ভাষার ঝংকার আছে, ভাবের ঘনঘটা আছে, রাশিরাশি উপমাও আছে। এক-একটি প্রবন্ধকে শব্দরঞ্জিত চিত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু রাজনৈতিক রচনার যাহা প্রাণ—যুক্তি, আন্তরিকতা ও প্রাঞ্জলতা—প্রবন্ধগুলিতে তাহারই একান্ত অভাব।

উপমা জিনিসটা কামধেনু,—তাহার প্রয়োগ দ্বারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ও পরস্পর

"কঠোর সমালোচনার আঘাত রবীন্দ্রনাথ খুব অল্পই সহ্য করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই স্বল্প আঘাতের ফলে যে তাঁহার একটু উপকার হইয়াছিল, সে কথা তিনি আজ কেন বিস্মৃত হইতেছেন? কেন ভুলিয়া যাইতেছেন যে, রাহুর কবলে না পড়িলে তাঁহার 'কড়ি ও কোমল'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ অতটা আবর্জনা-বর্জিত হইত না।"—নারায়ণ, জ্যৈষ্ঠ-১৩২৩ সাল।

অমরেন্দ্রনাথের 'রবিয়ানা' সাহিত্য, রাজনীতি ও সমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি প্রবন্ধ এবং উক্তির বিরূপ সমালোচনামূলক প্রবন্ধ-সমষ্টি। এই গ্রন্থখানি ১৩২৭ সালের শ্রাবণ মাসে (২০ নং জোড়াপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে) গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহার নামকরণ করেন, 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। গ্রন্থখানি উৎসর্গিত হয় 'সাগর-সঙ্গীত'-এর কবি চিত্তরঞ্জন দাশকে। ভূমিকায় গ্রন্থকার সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ব্যতীত আরো 'দুইজন অগ্রজপ্রতিম সুহৃদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন' করিয়াছেন। ইঁহাদের একজন 'অর্চনা' পত্রিকার 'সর্বস্ব' কৃষ্ণদাস চন্দ্র ও অপরজন 'বাঙ্গালী' পত্রিকার সহঃসম্পাদক অমূল্যচরণ সেন।

সম্পূর্ণ বিরোধী মতকে সমর্থন করা কঠিন ব্যাপার নহে। রবীন্দ্রনাথ এই উপমা জিনিসটায় মন্ত্রসিদ্ধ। তিনি যখন যে মতাবলম্বী হইয়া থাকেন, তখন সেই মতকে সমর্থন করিবার জন্য যুক্তির পরিবর্তে রাশি রাশি উপমা সংগ্রহ করিয়া পাঠকবর্গকে মুগ্ধ করিয়া দেন, এবং পাঠক-সাধারণও তাঁহার বাক্যে ও কার্যে সামঞ্জস্য আছে কিনা, তাঁহার মতামতের ধারা ঠিক আছে কিনা, অত ভাবিবার অবকাশ পায় না। তাহারা তাঁহার যে লেখা যখন পড়ে, তখন সেই লেখাকেই অকাট্য যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বিশ্বাস করে।

যাহা হউক, রাজনীতিক বিষয়ে আমরা নিজেদের কোনও মতামত দিয়া অনধিকারচর্চা করিব না। এ প্রবন্ধে শুধু এইটুকুই দেখাইয়া দিব যে, রাজনীতি-ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রবাবু কিরকম ডিগ্‌বাজী খাইয়াছেন।[১]

মনে পড়ে, আজ সে প্রায় পনের যোল বৎসরের কথা—লর্ড ক্রসের বিলের আন্দোলনকালে রবীন্দ্রনাথই বলিয়াছিলেন,—"স্বার্থই যদি ইংরাজ ভারত-

---

রাজনৈতিক বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এই মত-পরিবর্তন সম্বন্ধে মৈত্রেয়ী দেবী কিন্তু ভিন্নপ্রকার মন্তব্য করিয়াছেন, 'কবি সার্বভৌম' নামক পুস্তকের 'জাতীয় জীবন' অধ্যায়ে (১৬১-৬২ পৃ.)। তিনি লিখিয়াছেন—

> "···কোনো পলিসি বা মতকে একেবারে সর্বতোভাবে সত্য বলে মেনে নিয়ে তিনি কখনো অচলায়তন গড়তেন না। হিংসাত্মক প্রবলতাতেই হোক বা সবল অহিংসার দৃঢ়তাতেই হোক যখনই কোনো সত্য বিশ্বাস ও অকপট প্রচেষ্টা দেখেছেন কবি তাকে স্বীকার করেছেন। প্রত্যেক পথে যতটুকু সত্য, যতটুকু ন্যায় আছে, ত্যাগ আছে, মানবধর্মের মহত্ত্ব আছে সেটুকু তিনি সম্পূর্ণরূপেই গ্রহণ করেছেন।"

'সদুপায়' প্রথম প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী' ১৩৩৫ সালের শ্রাবণ সংখ্যায়। ইহা 'সমূহ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৮ সালের ২৫ জুলাই তারিখে। 'সমূহ' 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র ১০ম খণ্ডের অন্তর্গত।

১। কি উদ্দেশ্যে 'রবিয়ানা' রচিত হয়, সে সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লিখিত হইয়াছে—"কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'মত নিতুই নব'। তাঁহার নিকট আজ যাহা 'হাঁ' কাল তাহা 'না'। রাজনীতি, সমাজনীতি ও সাহিত্যনীতি প্রভৃতি সকলরকম নীতিতেই কবিবরের মত নিত্য পরিবর্তিত হইতেছে।—এই সকল কথাই এই পুস্তকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি।"

উক্ত ভূমিকার মধ্যে তিনি আরও বলিয়াছেন—"জিজ্ঞাসা করি, রবীন্দ্রনাথের মতন এই মিনিটে মিনিটে মতপরিবর্তন কি জগতে কাহারও ঘটিয়াছে? এরূপ ডিগবাজি খাওয়াটা মানুষের পক্ষে কি বিশেষ প্রশংসার কথা?"

শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিতেন, তাহা হইলে আজ আমাদিগের এমন দুর্দশা হইত যে, ক্রন্দন করিবার অবকাশ থাকিত না।" এই প্রবন্ধপাঠের কিছু কাল পরে, জানি না কেন, রবীন্দ্রনাথ পূর্ব মত বিস্মৃত হইয়া ইংরাজের প্রতি বক্র কটাক্ষ করিয়া 'অত্যুক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধে বলিলেন,—"আজকালকার সাম্রাজ্য-মদমত্ততার দিনে, ইংরেজ নানাপ্রকারে শুনিতে চায় আমরা রাজভক্ত, আমরা তাহার চরণতলে স্বেচ্ছায় বিক্রীত। এ কথা জগতের কাছে তাহারা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করিতে চাহে। তাই ঠিক যে সময়ে ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর হৃদয়ের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্নপ্রায়,···ঠিক সেই সময়টাতেই অধম ভারত-বর্ষের রাজভক্তি ইংরেজ নানাপ্রকারে বিশ্বজগতের কাছে উদ্‌ঘোষিত করিবার আয়োজন করিতেছে,—আশানুরূপ ফলও পাইয়াছে, শূন্যঘট যথেষ্ট পরিমাণে শব্দ করিতেছে।"

শুধু ঐ অত্যুক্তি প্রবন্ধ পড়িয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। ইংরাজের প্রতি তাঁহার এই 'কড়ি সুর' উত্তরোত্তর চড়িয়াছিল। উহার পর হইতে—"স্বার্থই যে ইংরাজের ভারত-শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য," এই কথা তাঁহার বহু রাজনীতিক প্রবন্ধেই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। তাঁহার 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' নামক প্রবন্ধে ঐ কথাই স্পষ্ট করিয়া বলা হয় যে, "একটা জাতিকে, যে কোন দিকেই হৌক, একেবারে অক্ষম ও পঙ্গু করিয়া দিতে এই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতাবাদী কোন সংকোচ অনুভব করে নাই। ইংরেজ আজ সমস্ত ভারতবর্ষকে বলপূর্বক নিরস্ত্র করিয়া দিয়াছে।···ভারতবর্ষ একটি ছোট দেশ নহে, একটি মহাদেশ বিশেষ। এই বৃহৎ দেশের সমস্ত অধিবাসীকে চির-দিনের জন্য পুরুষানুক্রমে অস্ত্রধারণে অনভ্যস্ত, আত্মরক্ষায় অসমর্থ করিয়া তোলা যে কত বড় অধর্ম, যাহারা এককালে মৃত্যুভয়হীন বীরজাতি ছিল, তাহাদিগকে সামান্য একটা হিংস্র পশুর নিকট শঙ্কিত নিরুপায় করিয়া রাখা যে কিরূপ বীভৎস অন্যায়, সে চিন্তা ইহাদিগকে কিছুমাত্র পীড়া দেয় না।··· অ্যাংলোস্যাক্সান্ যে শক্তিকে সকলের চেয়ে পূজা করে, ভারতবর্ষ হইতে সেই শক্তিকে প্রত্যহ সে অপহরণ করিয়া এ দেশকে উত্তরোত্তর নিজের কাছে অধিকতর হেয় করিয়া তুলিতেছে, আমাদিগকে ভীরু বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে—অথচ একবার চিন্তা করিয়া দেখে না, এই ভীরুতাকে জন্ম দিয়া তাহাদের দলবদ্ধ ভীরুতা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে।"

এইরূপে কবিবরের এই 'কড়ি সুর' ক্রমশই চড়িতে চড়িতে সপ্তমে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। 'পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী'তে২ সভাপতির আসন গ্রহণ করিবা যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতেও ঐ সুর সম্পূর্ণ বজায় আছে। কিন্তু ঐ কড়ি সুরের ঐখানেই শেষ খেলা। তাহার পর সহসা একদিন উহা 'কোমলে' নামিয়া আসিল। সেই 'কোমল সুর' তাঁহার 'ব্যাধি ও প্রতীকার' নামক প্রবন্ধে ঝংকৃত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁহার নিকট হইতে 'পথ ও পাথেয়,' 'সমস্যা' এবং 'সদুপায়' নামক তিনটি পর পর এক সুরে বাঁধা প্রবন্ধ পাইলাম। এই তিনটি প্রবন্ধই পরস্পব পরস্পরের প্রতিধ্বনি মাত্র। এই প্রবন্ধত্রয়ের উক্তির সহিত তাঁহার পূর্বরচিত প্রবন্ধাবলীর উক্তির কোনই সামঞ্জস্য নাই। এক্ষণে তাঁহার শেষোক্ত 'সদুপায়' নামক প্রবন্ধের আলোচনা করিয়া সে কথা প্রমাণ করিয়া দিতেছি।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রবাবু বলিতেছেন,—"আমরা ধৈর্য হারাইয়া, সাধারণের ইচ্ছা অনিচ্ছা, সুবিধা-অসুবিধা বিচারমাত্র না করিয়া বিলাতী লবণ ও কাপড়ের বহিষ্কারসাধনের কাছে আর কোনো ভালোমন্দকে গণ্য করিতে ইচ্ছাই করিলাম না।...আমরা এই কথা মনে লইয়া তাহাদের (দেশের সাধারণ লোকের) কাছে যাই নাই যে, "দেশী কাপড় পরিলে তোমাদের মঙ্গল হইবে, এই জন্যই আমাদের দিনে আহার নাই এবং রাত্রে নিদ্রার অবকাশ ঘটিতেছে না।" আমরা এই বলিয়াই গিয়াছিলাম যে, "ইংরেজকে জব্দ করিতে চাই কিন্তু তোমরা আমাদের সঙ্গে যোগ না দিলে বয়কট সম্পূর্ণ হইবে না, অতএব ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তোমাদিগকে দেশী কাপড় পরিতে হইবে।"

"কখনো যাহাদের মঙ্গল চিন্তা ও চেষ্টা করি নাই, যাহাদিগকে আপন লোক বলিয়া কখনো কাছে টানি নাই, যাহাদিগকে বরাবর অশ্রদ্ধাই করিয়াছি, ক্ষতি স্বীকার করাইবার বেলা তাহাদিগকে ভাই বলিয়া ডাক পাড়িলে মনের সঙ্গে তাহাদের সাড়া পাওয়া সম্ভবপর হয় না।"...

"পূর্বেই বলিয়াছি সত্য কথাটা এই যে, ইংরেজের উপরে রাগ করিয়াই আমরা দেশের লোকের কাছে ছুটিয়াছিলাম, দেশের লোকের প্রতি ভালবাসা বশতই যে গিয়াছিলাম তাহা নহে।"

কিন্তু এই রবীন্দ্রনাথই ইহার কয়েক মাস পূর্বে পাবনা সম্মিলনীতে

২। ১৩১৪ সালে অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন :—"যে সত্য অব্যক্ত ছিল সেটা হঠাৎ প্রথম ব্যক্ত হইবার সময় নিতান্ত মৃদুমন্দ মধুরভাবে হয় না। তাহা একটা ঝড়ের মত আসিয়া পড়ে, কারণ অসামঞ্জস্যের সংঘাতই তাহাকে জাগাইয়া তোলে। আমাদের দেশে কিছুকাল হইতেই ইতিহাসের শিক্ষায়, যাতায়াত ও আদান-প্রদানের সুযোগে, এক রাজশাসনের ঐক্যে, সাহিত্যের অভ্যুদয়ে এবং কংগ্রেসের চেষ্টায় আমরা ভিতরে ভিতরে বুঝিতেছিলাম যে, আমাদের দেশটা এক, আমরা একই জাতি, সুখে দুঃখে আমাদের এক দশা, এবং পরস্পরকে পরমাত্মীয় বলিয়া না জানিলে ও অত্যন্ত কাছে না টানিলে আমাদের কিছুতে মঙ্গল নাই।"...

"এমন সময় লর্ড কর্জন যবনিকার উপর এমন একটা প্রবল টান মারিলেন যে, যাহা নেপথ্যে ছিল তাহার আর কোন আচ্ছাদন রহিল না।... বাংলাকে যেমন দুইখানা করিবার হুকুম হইল অমনি পূর্ব হইতে পশ্চিমে একটিমাত্র ধ্বনি জাগিয়া উঠিল—আমরা যে বাঙ্গালী, আমরা যে এক! বাঙ্গালী কখন যে বাঙ্গালীর এতই কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, রক্তের নাড়ি কখন বাংলার সকল অঙ্গকেই এমন করিয়া এক চেতনার বন্ধনে বাঁধিয়া তুলিয়াছে তাহা ত পূর্বে আমরা এমন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি নাই।"

"আমাদের এই আত্মীয়তার সজীব শরীরে বিভাগের বেদনা যখন এত অসহ্য হইয়া পড়িল তখন ভাবিয়াছিলাম সকলে মিলিয়া রাজার দ্বারে নালিশ জানাইলেই দয়া পাওয়া যাইবে। কেবলমাত্র নালিশের দ্বারা দয়া আকর্ষণ ছাড়া আর যে আমাদের কোন গতিই আছে তাহাও আমরা জানিতাম না। কিন্তু নিরুপায়ের ভরসাস্থল এই পরের অনুগ্রহ যখন চূড়ান্তভাবেই বিমুখ হইল তখন যে ব্যক্তি নিজেকে পঙ্গু জানিয়া বহুকাল অচল হইয়াছিল ঘরে আগুন লাগিতেই নিতান্ত অগত্যা দেখিতে পাইল তাহার চলৎশক্তি আছে। আমরাও একদিন অন্তঃকরণের অত্যন্ত একটা তাড়নায় দেখিতে পাইলাম, এই কথাটা আমাদের জোর করিয়া বলিবার শক্তি আছে যে, আমরা বিলাতি পণ্যদ্রব্য ব্যবহার করিব না।"

"আমাদের এই আবিষ্কারটি অন্যান্য সমস্ত সত্য আবিষ্কারেরই ন্যায় প্রথমে একটা সংকীর্ণ উপলক্ষ্যকে অবলম্বন করিয়া আমাদের কাছে উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে দেখিতে দেখিতে আমরা বুঝিতে পারিলাম উপলক্ষ্যটুকুর

অপেক্ষা ইহা অনেক বৃহৎ। এ যে শক্তি! এ যে সম্পদ! ইহা অন্যকে জব্দ করিবার নহে, ইহা নিজেকে শক্ত করিবার।"

"শক্তির এই অকস্মাৎ অনুভূতিতে আমরা যে একটা মস্ত ভরসার আনন্দ পাইয়াছি সেই আনন্দটুকু না থাকিলে এই বিদেশীবর্জন ব্যাপারে আমরা এত অবিরাম দুঃখ কখনই সহিতে পারিতাম না। কেবলমাত্র ক্রোধের এত সহিষ্ণুতা নাই। বিশেষতঃ প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের ক্রোধ কখনই এত জোরের সঙ্গে দাঁড়াইতে পারে না।"

রবীন্দ্রবাবুর এই উক্তি এবং পূর্বোদ্ধৃত উক্তি উভয়ই সম্পূর্ণ বিপরীত। একের প্রত্যেক ছত্র অপরের প্রত্যেক ছত্রের প্রতিবাদ করিতেছে। তিনি একবার বলিতেছেন যে, "বিদেশীবর্জন অন্যকে জব্দ করিবার নহে ইহা নিজেকে শক্ত করিবার। এ যে শক্তি। এ যে সম্পদ।" আবার অন্যত্র বলিতেছেন, "ইংরাজকে জব্দ করিব বলিয়াই দেশের লোকের কাছে ছুটিয়াছিলাম। ইংরাজের শত্রুতাসাধনে কতটুকু কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না, দেশের মধ্যে শত্রুতাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছি তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।"—এইরূপই আগাগোড়া!

যে রবীন্দ্রনাথ একদিন বলিয়াছিলেন,—"বাহির হইতে এই হিন্দুমুসলমানের প্রভেদকে যদি বিরোধে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হয় তবে তাহাতে আমরা ভীত হইব না—আমাদের নিজেদের ভিতরে যে ভেদবুদ্ধির পাপ আছে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেই আমরা পরের কৃত উত্তেজনাকে অতিক্রম করিতে নিশ্চয়ই পারিব। এই উত্তেজনা কালক্রমে আপনিই মরিতে বাধ্য। কারণ, এই আগুনে নিয়ত কয়লা যোগাইবার সাধ্য গবর্ণমেণ্টের নাই। এ আগুনকে প্রশ্রয় দিতে গেলে শীঘ্রই ইহা এমন সীমায় গিয়া পৌঁছিবে যখন দমকলের জন্য ডাক পাড়িতেই হইবে। প্রজার ঘরে আগুন ধরিলে কোনো দিন কোনো দিক হইতে তাহা রাজবাড়িরও অত্যন্ত কাছে গিয়া পৌঁছিবে। যদি এ কথা সত্য হয় যে, হিন্দুদিগকে দমাইয়া দিবার জন্য মুসলমানদিগকে অসংগতরূপে প্রশ্রয় দিবার চেষ্টা হইতেছে, অন্ততঃ তাবগতিক দেখিয়া মুসলমানদের মনে যদি সেইরূপ ধারণা দৃঢ় হইতে থাকে তবে এই শনি, এই কলি, এই ভেদনীতি রাজাকেও ক্ষমা করিবে না!"—সেই রবীন্দ্রনাথই

পরে স্বীয় উক্তি পদদলিত করিয়া 'সদুপায়'[৩] নামক প্রবন্ধে বলিতেছেন,—"মুসলমান ও হিন্দুর মাঝখানে একটা ভেদ রহিয়া গেছে। সেই ভেদটা যে কতখানি তাহা উভয়ে পরস্পর কাছাকাছি আছে বলিয়াই প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায় নাই;—দুই পক্ষে একরকম করিয়া মিলিয়া ছিলাম। কিন্তু যে ভেদটা আছে রাজা যদি চেষ্টা করিয়া সেই ভেদটাকে বড়ো করিতে চান এবং দুই পক্ষকে যথাসম্ভব স্বতন্ত্র করিয়া তোলেন তবে কালক্রমে হিন্দু-মুসলমানের দূরত্ব এবং পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা-বিদ্বেষের তীব্রতা বাড়িয়া চলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।"

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের আর এক স্থানে বলিতেছেন,—"জিজ্ঞাসা করি, বাজারে আগুন লাগাইয়া অথবা অনিচ্ছুক লোকের মাথা ভাঙিয়া যদি আমরা বিলাতী কাপড় ছাড়াইয়া একদল লোককে দেশী কাপড় ধরাই তবে বাহিরে মাত্র দেশী কাপড় পরাইয়া ইহাদের সমস্ত অন্তঃকরণকে কি স্বদেশীর বিরুদ্ধে চিরদিনের জন্য বিদ্রোহী করিয়া তুলি না?...এইরূপ ঘটনাই কি ঘটিতেছে না?" কিন্তু একথার উত্তরও তাঁহারই লেখায় আছে। অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন,—"যথার্থ প্রেমের স্রোত অব্যাহত ভাবে চলে না। যথার্থ জীবনের স্রোতও সেইরূপ, যথার্থ কর্মের স্রোতেরও সেই দশা। দেশের নাড়ির মধ্যে প্রাণের বেগ চঞ্চল হইয়া উঠাতেই কর্মে যদি মাঝে মাঝে এরূপ ব্যাঘাত পড়ে তবে ইহাতে হতাশ না হইয়া এই কথাই মনে রাখিতে হইবে যে, যে জীবন-ধর্মের অতি-চাঞ্চল্যে পরস্পরকে একবার আঘাত করিয়াছে, সেই জীবন-ধর্মই এই আঘাতকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া পরস্পরের মধ্যে নূতন স্বাস্থ্যের সঞ্চার করিবে।" শুধু ইহাই নহে। 'আমাদের দেশের যে সকল দৃঢ়নিষ্ঠ যুবক সমস্ত সংকট উপেক্ষা করিয়াও স্বদেশহিতের জন্য স্বেচ্ছাব্রত ধারণ করিয়াছেন' কবিবর স্বয়ং তাঁহাদিগের কার্যে মুগ্ধ হইয়া কিছুদিন পূর্বে বলিয়াছিলেন—"তোমরা ভগীরথের ন্যায় তপস্যা করিয়া রুদ্রদেবের জটা হইতে এবার প্রেমের গঙ্গা আনিয়াছ; ইহার প্রবল

৩। 'রবিরাহু' (সাইজ ৫×৩ ইঞ্চি, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৵+৮৭, মূল্য ৷৵০ আনা) দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আছে: কবিতায় 'গন্ধ,' বাস্তব, কঠোর সমালোচনা, সদুপায়, অভিভাষণ, সমাজ-সংস্কার, কঠোর সমালোচনা (পরিশিষ্ট) এই ছয়টি প্রবন্ধ। দ্বিতীয় ভাগে: কবি-জীবনী, সীতাদেবী, রামচন্দ্র, হিন্দুসভ্যতা, ইতিহাস নামক প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথের উক্তির সমালোচনা করা হইয়াছে। 'কঠোর সমালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রথমে 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং ইহার পরিশিষ্ট অংশ লিখিত হয় কিছুকাল পরে।

পুণ্যস্রোতকে ইন্দ্রের ঐরাবতও বাধা দিতে পারিবে না, এবং ইহার স্পর্শমাত্রেই পূর্বপুরুষের ভস্মরাশি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে।"

'সদুপায়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ উপদেশ দিয়াছেন, "বিধাতার ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছাকে সম্মিলিত করাই সফলতার একমাত্র উপায়। অতএব ধর্মের পথে চলাই নিজের শক্তির প্রতি সম্মান এবং উৎপাতের সংকীর্ণ পথ সন্ধান করাই কাপুরুষতা।" অথচ ইহার কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথই বাঙালীকে বুঝাইয়াছিলেন যে, 'বিধাতার ইচ্ছা' অর্থে 'রাজশক্তির সহিত বিরোধ।' 'ব্রতধারণ' প্রবন্ধে তিনিই লিখিয়াছিলেন যে,—"বিদেশীয় রাজশক্তির সহিত আমাদের স্বাভাবিক পার্থক্য ও বিরোধ ক্রমশই সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আজ আর ইহাকে ঢাকিয়া রাখিবে কে? রাজাও পারিলেন না; আমরাও পারিলাম না। এই বিরোধ যে ঈশ্বরের প্রেরিত। এই বিরোধ ব্যতীত আমরা প্রবলরূপে, যথার্থরূপে আপনাকে লাভ করিতে পারিতাম না।...আজ বিরোধের আঘাতে বেদনা পাইতেছি, অসুবিধা ভোগ করিতেছি, সকলই সত্য, কিন্তু নিজেকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিবার পথে দাঁড়াইয়াছি। যত দিন পর্যন্ত আমরা নিজশক্তি আবিষ্কার না করিব, ততদিন পর্যন্ত ধীর শক্তির সহিত আমাদের সংঘর্ষ চলিতে থাকিবে।"

পূর্বেই বলিয়াছি আমি রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ—নিজে কিছু বলিব না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, দেশের লোকেরা কবিবরের কোন্ রাজনীতিক মার্গ অবলম্বন করিবে?[৪]

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিক প্রবন্ধগুলিতে এইরূপ পরস্পরবিরোধী উক্তি আরও রাশি রাশি আছে—তাহা উদ্ধৃত করিলে একখানি অনতিবৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু রচনাকে আর ভারাক্রান্ত করিতে ইচ্ছা করি না। যেটুকু উদ্ধৃত করিয়াছি, আশা করি, তাহাতেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

৪। এই প্রসঙ্গে হুমায়ুন কবিরের একটি উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 'রবীন্দ্র রচনাবলী'র (৪র্থ ও ৫ম খণ্ড) সমালোচনায় তিনি একস্থানে বলিয়াছেন,—"প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক অনুভূতির বৈশিষ্ট্য এই যে, কেবলমাত্র প্রতিবাদ বা সমালোচনার মধ্যে তা বদ্ধ থাকেনি।...তাঁর বক্তব্য এবং চেষ্টা এই যে ভারতীয় চরিত্রের দুর্বলতার যে রন্ধ্রপথে এদেশে শনির আবির্ভাব, তাকে বন্ধ করতে হলে কেবল অন্যের সমালোচনা চলবে না। তার জন্যে প্রয়োজন আত্মশুদ্ধির এবং চরিত্র পূজা।"—চতুরঙ্গ, পৌষ-১৩৪৭

উর্বশী

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

উর্বশী, রম্ভা, মেনকা, তিলোত্তমা। এই সুরললনাদিগের নাম কে না জানে? স্বর্গনর্তকীদিগের সংখ্যা বিস্তর, কিন্তু এই নামগুলি সুপরিচিত। প্রাচীন গ্রন্থে আরও বহু নামের উল্লেখ আছে—ঘৃতাচী, পূর্বচিত্তি, স্বয়ম্প্রভা, মিশ্রকেশী, দণ্ডগৌরী, বরূথিনী, গোপালী, কুম্ভযোনি, প্রজাগরা, চিত্রসেনা, চিত্রলেখা, সহা প্রভৃতি। পৃথিবীতে যে ভোগের প্রবৃত্তি, স্বর্গে সেই ভোগের কল্পনা। যে কালে এই সুন্দরীদিগের নাম আর্যাবর্তে প্রচলিত ছিল, সে কালে মনে হয় স্বর্গের কল্পনা এ সময়কার মত ছিল না। পূর্বকালে স্বর্গ এরূপ দূরস্থিত, নিরুদ্দিষ্ট, অস্পষ্ট স্থান ছিল না। হয় কাশ্মীরে, না হয় হিমালয়ের অন্য কোন স্থানে স্বর্গ ছিল। স্বর্গে মর্ত্যে সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল, মানুষের সঙ্গে দেবতাদিগের কুটুম্বিতা ছিল, মানুষের সকল কর্মে দেবতার দখল ছিল। এই কারণে প্রাচীন স্বর্গকল্পনায় তেমন অলৌকিকতা নাই। যাহা পৃথিবীতে দেখিতে পাই তাহাই স্বর্গে কল্পিত হইত। সেই লালসা, সেই ভোগ, সেই সুখ, সেই দ্বন্দ্ব-কলহ, সেই বিচ্ছেদ-মিলন। তবে পৃথিবীতে যাহা অসম্ভব, স্বর্গে তাহা সহজসম্ভব। পৃথিবীতে যাহা নশ্বর, ক্ষণভঙ্গুর, স্বর্গে তাহা অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী। পৃথিবীতে ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িয়া যায়, ঐশ্বর্য নিঃশেষিত হয়, যৌবন ফুরাইয়া যায়, নিত্যতা কিছুতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। স্বর্গের কল্পনায় সমস্ত অনন্ত—জরা নাই, মৃত্যু নাই, ভোগে অতৃপ্তি নাই, যৌবনের পর বার্ধক্য নাই। সেই স্বর্গবাসিনী অনন্তযৌবনা উর্বশী। অক্ষয়

দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'উর্বশী' কবিতার নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিত এই সমালোচনাটি ১৩০৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রদীপ' (প্রথম ভাগ, ১২শ সংখ্যা) হইতে গৃহীত। 'চিত্রা' 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

নগেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমবয়সী এবং অন্তরঙ্গ সুহৃদ। রবীন্দ্রনাথের কবিতা তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। 'মডার্ন রিভিয়ু'তে তিনি তাঁহার অনেকগুলি কবিতার অনুবাদ করেন। ১৯২৭ সালের জুলাই মাসের 'মডার্ন রিভিয়ু'তে 'রবীন্দ্রনাথ টেগোর দি ম্যান অ্যান্ড দি পোয়েট' নামক নগেন্দ্রনাথের যে ইংরেজী প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, তৎকৃত 'উর্বশী' কবিতার ইংরেজী অনুবাদ তাহাতে স্থান পাইয়াছে। এই 'মডার্ন রিভিয়ু'তেই 'নোটেবল, সেলিব্রিটিস' নামে তাঁহার যে প্রবন্ধসমূহ [illegible]-ভাবে প্রকাশিত হয়, তাহার এক অধ্যায়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নিজের ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

রূপ, অক্ষয় যৌবন, অক্ষয় [illegible]। এই সকল সুরকামিনীগণ একদিকে যেমন চিরসুন্দরী অপরদিকে সেইরূপ ভয়ংকরী। যে স্থলে ইন্দ্রের বজ্র ব্যর্থ হইত সে স্থলে ইঁহারা সফল হইতেন। যখন কোন কঠিন তপস্বীর সাধনায় ইন্দ্রাসন টলিত, দেবরাজ শঙ্কিত হইতেন, তখন তিনি সেই কঠোর সাধকের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিতেন না, কারণ বজ্র তপস্যাবলে প্রতিহত হইত। কিন্তু বজ্রাপেক্ষা অমোঘ অস্ত্র এই সুরনর্তকীদিগকে হতভাগ্য তপস্বীর প্রতি নিক্ষেপ করিতেন; বজ্রাঘাতে যে যোগাসন টলিত না, অপ্সরার বিলোল কটাক্ষে তাহা বিচলিত হইত, তাহার লীলাভঙ্গীতে তপস্যা ভঙ্গ হইত। ইন্দ্র পুনর্বার নিশ্চিন্ত হইয়া ইন্দ্রাসনে উপবেশন করিতেন।

এই মন্দারপারিজাতশোভিত দেবসংকুল, শুচিস্মিতা ইন্দ্রাণীকর্তৃক পবিত্রিত, বিদ্যাধরগন্ধর্বগীতে ধ্বনিত, অপ্সরাশিঞ্জিনীমুখরিত অমরাবতী কিয়দংশ কবি-কল্পিত, কিছু বিশ্বাসগঠিত; কবি যেমন দেখাইয়াছেন আমরা সেইরূপ দেখিয়াছি। প্রাচীন কাব্যাদিতে যে সকল অপ্সরাদিগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে কোন বিশেষত্ব লক্ষিত হয় না। অসামান্য সৌন্দর্য এবং অক্ষুণ্ণ যৌবন, এবং সেই কারণে অহিতসাধন করিবার ক্ষমতা অসাধারণ—ইহাতে স্বর্গে মর্ত্যে বলের ন্যূনাধিক্য ব্যক্ত হয়, বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। কবির বর্ণনাও সেইরূপ।

উর্বশী বেদের সমসাময়িক। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে ৯৫ সূক্তে উর্বশী ও পুরূরবার আখ্যান কথিত হইয়াছে। সে উপাখ্যান রূপকার্থ। মহাভারতে উর্বশীকে মানুষী মূর্তিতে প্রথম দেখিতে পাই। বনপর্বে অর্জুন ইন্দ্রলোকা-

---

বিপিনচন্দ্র পাল 'সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা' প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন—

"উর্বশী রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। জগতের আর কোন সাহিত্যে উর্বশীর মত কোন কিছু আছে কিনা সন্দেহ।"—বিজয়া, ১৩১৯—১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

অমিয়কুমার সেন 'প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে প্রসঙ্গত 'উর্বশী' সম্বন্ধে কবি তাঁর সৌন্দর্য-বোধ, প্রেম ও আনন্দের আপাত পরিপূর্ণতার মধ্যে যে অপূর্ণতার বেদনা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

"উর্বশী কবিতায় সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতীক যে নারীমূর্তি কল্পনা করেছেন, বিশ্বপ্রকৃতির লাবণ্যে গড়া, বিশ্ববাসনার প্রেয়সী সেই নারীমূর্তিও নির্বিশেষ প্রেম বা সৌন্দর্যে অভিষিক্ত হয়ে উঠতে পারেনি। তার পরিপূর্ণতার মধ্যে কোথায় একটু বেদনা রয়ে গেছে।"—পৃ. ১১৭

অভিনন্দন করিয়াছেন। দেবরাজের ইঙ্গিতে উর্বশী রাত্রিকালে অর্জুনের গৃহে অভি-সারে গমন করিতেছেন। মহাভারতের বর্ণনা কিছু বাদ দিয়া উদ্ধৃত করিতেছি।

"তখন সেই পৃথুনিতম্বিনী স্বীয় নিবাস হইতে বহির্গত হইয়া পার্থ-ভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সেই লাবণ্যবতী ললনার সুকোমল কুঞ্চিত, কুসুমগুচ্ছসুশোভিত, সুদীর্ঘ কেশপাশ, ভ্রূবিক্ষেপ, আলাপমাধুর্য ও সৌম্যাকৃতি অনির্বচনীয় সুষমা সম্পাদন করিয়াছিল। তাহার বদন-সুধাকর-সন্দর্শনে শশধরও লজ্জিত হইলেন। সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী দিব্যচন্দনচর্চিত, বিলোল হারাবলিললিত, পীনোন্নত পয়োধরযুগল বিকম্পিত হওয়াতে পদে পদে নমিতাঙ্গী হইয়া গমন করিতে লাগিল। তাহার ত্রিবলীদামমনোহর কটিদেশের কি অনির্বচনীয় শোভা! কিংকিণীকিণলাঞ্ছিত পাদদ্বয় কূর্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত; গূঢ়গ্রন্থি অঙ্গুলিসকল তাম্রবর্ণ ও আয়ততল। একে ত সেই সুরসুন্দরী সহজেই মদনোন্মত্ত, তাহাতে আবার পরিমিত সুরাপানে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া বিবিধ বিলাসবিভ্রম সহকারে বাক্‌পথাতীত প্রিয়দর্শনা হইয়া উঠিল। সেই সুরকামিনী মেঘবর্ণ অতি সূক্ষ্ম উত্তরীয় বসন ধারণ করাতে যেন অভ্রাবৃত-কৃশ চন্দ্রলেখার ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিল।"

এরূপ বর্ণনার জন্য স্বর্গের আবশ্যক নাই। এই পৃথিবীতে অদ্যাবধি এই-রূপ ঘটিয়া থাকে। উর্বশীকে প্রত্যাখ্যান করায় অর্জুনের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়; কিন্তু উর্বশীর আচরণে কোনরূপ অসাধারণতা লক্ষিত হয় না। বিষ্ণুপুরাণেও পুরূরবা-উর্বশী-সংবাদ লিখিত আছে। মহাভারতের যুগ ত্যাগ করিয়া কাব্যের আর এক যুগে বিক্রমোর্বশীতে আমরা উর্বশীকে দেখিতে পাই। কালিদাস রূপের কবি। রূপের এমন কবি এ পর্যন্ত আর জন্মগ্রহণ করে নাই। কালিদাসের কালে আর একালে তেমন অধিক প্রভেদ নাই। মহাভারতের মত কাব্যকল্পনা তখন উঠিয়া গিয়াছে। পুরূরবা ও উর্বশীর উপকথা কালি-দাস নিজের মনের মত করিয়া, নূতন করিয়া নাটকাকারে বলিলেন। বিক্রমোর্বশী নাটকে উর্বশীর পূর্ণ বর্ণনা কোন স্থানে নাই। কালিদাসের এই অপূর্ব কৌশল। বর্ণনায় যেমন অদ্বিতীয়, সেইরূপ প্রতিভাবলে কোথায় বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন তাহাও বুঝিতে পারিতেন। উর্বশী ঋষিবর্ণিতা স্বর্গসুন্দরী—তাহার আর নূতন করিয়া বর্ণনা করিয়া কি হইবে? কালিদাস সে প্রয়াস পান নাই। কেবল চতুর্থ অঙ্কে অভিবিাচন্দ্র কৌশলের সহিত বিরহ-

ব্যাকুল রাজার বিলাপে উর্বশীর খণ্ড বর্ণনা গ্রথিত করিয়াছেন। পুরূরবা বলিতেছেন—

"আরক্তরাজিভিরিয়ং কুসুমৈর্নবকন্দলী সলিলগর্ভৈঃ।
কোপাদ্ অন্তর্বাষ্পে স্মরয়তি মাং লোচনে তস্যাঃ॥"

পুনশ্চ, কালিদাসের প্রিয় পদচিহ্ন বর্ণনা,—

পদ্ভ্যাং স্পৃশেদ্ বসুমতীং যদি সা সুগাত্রী
মেঘাভিবৃষ্টসিকতাসু বনস্থলীষু।
পশ্চান্নতা গুরুনিতম্বতয়া ততোঽস্যা
দৃশ্যেত চারুপদপংক্তিরলক্তকাঙ্কা॥"

সর্বত্র উর্বশীর এই রূপ কল্পনা। হাবভাবলীলাময়ী রূপসী, স্থিরযৌবনা, তপস্যাবিঘ্নকারিণী মায়াবিনী। মহাভারতের যুগ এখন বহু দূরে, কালিদাসও সুদূর অতীতে। এখন উর্বশীকে আমরা কি চক্ষে দেখিব? সেকালে অন্য রূপ কল্পনার প্রয়োজনই হয় নাই। যে স্বর্গসুখভিলাষী, তাহার চিত্তে লালসা; যে যোগী সে কামনা ত্যাগ করিত। সে কালের বিশ্বাস, সে কালের কল্পনা ত্যাগ করিয়া এখনকার কবি আমাদিগকে উর্বশীর আর এক মূর্তি দেখাইয়াছেন। রবীন্দ্রবাবু উর্বশীর যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সুরসুন্দরীর উপযুক্ত হইয়াছে। অতি অপূর্ব, অমূর্ত রূপের কল্পনা। উর্বশীর অতি মহীয়সী প্রতিকৃতি—কামগন্ধবর্জিত, অথচ মদনমদোন্মাদকারী। বন্ধনশূন্য, ভুবনমোহন রূপ, সেই রূপে বিশ্বের যৌবন মুগ্ধ, লুব্ধ হইয়া রহিয়াছে। উর্বশীর কল্পনা আর ব্যক্তিগত রহিল না, প্রকৃতির মূর্তিমতী উদ্দাম যৌবনে লীন হইয়া গেল।

রবীন্দ্রবাবুর এই উৎকৃষ্ট কবিতা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিলে পাঠক ইহার চমৎকারিত্ব বুঝিতে পারিবেন। যেমন ছন্দ, তেমনি ভাষা, তেমনি ভাব। প্রথমে কবি উর্বশীকে মানবীর ন্যায় কল্পনা করিতেছেন। এই বন্ধনমুক্তা, স্বেচ্ছাচারিণীকে কে আপনার বলিবে?

"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।"

কিছুই না। যে সকল সম্বন্ধে রমণী পুরুষের সহিত আবদ্ধ, এই রমণীর সহিত কোন পুরুষেরই সেরূপ কোন সম্বন্ধ নাই। স্বর্গেও না, পৃথিবীতেও

মা৭ কিন্তু এই সম্পর্কশূন্য, স্বেচ্ছাবিহারিণী রমণীকে নির্লজ্জা, সামান্যা নারীর তুল্য মনে করিও না।

"উষার উদয়সম, অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা।"

ঋগ্বেদের মন্ত্রে উর্বশী পুরূরবাকে বলিতেছেন, "আমি প্রথম উষার ন্যায় চলিয়া আসিয়াছি।" অনেকের মতে উর্বশীর আদি অর্থ উষা। ইহার লজ্জাহীনতাও স্বর্গেরই উপযোগী, উষার বিকাশের সহিত তুলনীয়। তাহার পর কবির মানবসুলভ কৌতূহল। চিরকাল প্রাচীন কাব্যগ্রন্থাদিতে উর্বশীর প্রসঙ্গ দেখিয়া আসিতেছি। কে এই উর্বশী? কোথা হইতে অনন্ত রূপ, অনন্ত যৌবন, অনন্ত রাগরঙ্গ লইয়া ইন্দ্রের অনন্ত নৃত্যশালায় উপনীত হইল?

"বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী।"

এ প্রশ্নের উত্তর কবি স্বয়ং দিতেছেন—

"আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে
ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে,
* * *
কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা,
তুমি অনিন্দিতা।"

হয়ত সমুদ্র-মন্থনের মোহিনী এই উর্বশী। যে রূপ দেখিয়া সুরাসুর বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়াছিল, হয়ত সেই রূপের অংশ এই উর্বশীতে বর্তিয়াছে। তাহাতেও কৌতূহল পরিতৃপ্ত হইল না। সমুদ্র-মন্থনের পূর্বে অগাধ জলতলে এই বিশ্ববিমোহন রূপ কোথায় লুক্কায়িত ছিল? উর্বশী কি কোনকালে 'মুকুলিকা বালিকা' ছিল না? কাহার ঘরে এমন কন্যা জন্মিয়াছিল, কে ইহাকে লালন-পালন করিয়াছিল?

"মণিদীপদীপ্তকক্ষে সমুদ্রের কল্লোলসংগীতে
অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবাল-পালঙ্কে ঘুমাইতে
কার অঙ্কটিতে।
যখনি জাগিলে বিশ্বে, যৌবনে গঠিতা
পূর্ণপ্রস্ফুটিতা।"

এই পূর্ণপ্রস্ফুটিতা উর্বশীই বিশ্বসংসারে পরিচিত। বাল্যকালে সমুদ্রগর্ভের অন্ধকারে লুপ্ত, কখন ছিল কিনা তাহাও কেহ জানে না। এই বিশ্বপরিচিত উর্বশীকে কেমন করিয়া সম্ভাষণ করিতে হইবে।

"যুগযুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্ব শোভনা উর্বশী।
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল,
তোমার মদির গন্ধ অন্ধ বায়ু বহে চারিভিতে,
মধুমত্ত ভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধচিতে,
উদ্দাম সংগীতে।
নূপুর গুঞ্জরি যাও আকুল-অঞ্চলা
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা।"

বিশ্বের প্রেয়সী তুমি! ত্রিভুবনের যৌবন তোমার কটাক্ষে, নহিলে তুমি স্বর্গবাসিনী কেন? কবির কল্পনা তোমাকে বেষ্টন করিয়া থাকে, বিশ্বসংসারের যৌবন প্রসারিত হস্তে তোমার মিলন যাচ্ঞা করে। ত্রিভুবনে যৌবন জাগ্রত করিয়া দিয়া তুমি ক্ষান্ত হও না, সর্বত্র উন্মাদনা উৎপাদিত কর।

"সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি
হে বিলোল-হিল্লোল উর্বশী।
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে, সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি ওঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা—
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা।
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে।"

এইরূপ আর একটি শ্লোক বঙ্গভাষায় আবার দেখিব বড় সাধ আছে। উর্বশীর বর্ণনা বিশ্ব-পরিপূরিত রূপ। নক্ষত্রের মালা গলায়, কটিতে বিদ্যুতের মেখলা। যে সে রূপসী হইলে কি বিশ্বের প্রেয়সী হয়, দেবতা মানবকে চিরকাল মোহিত করিতে পারে?

কিন্তু এই যে অতুলনীয়, অক্ষয় রূপ, রূপের মোহ, ইহা কি কেবল সুখের কারণ? তাহা নহে। এত রূপ অসীম দুঃখের মূল। যাহার রূপ আছে সে দুঃখ পায় না, কিন্তু যে সেই রূপে আকৃষ্ট, সেই দুঃখ পায়। চরণনিপতিত কত হৃদয় দলিত করিয়া রূপগর্বভরে উর্বশী চলিয়া গিয়াছে কে তাহার গণনা করিবে? কত তপস্যাচ্যুত তপস্বীর অনুতাপ, কত প্রণয়ীর বিরহ উর্বশীকে আশ্রয় করিয়া আছে, কে জানে? এই জন্য কবি কহিতেছেন,—

"জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা,
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব-বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার"—

অকস্মাৎ কবি বর্তমানের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, কোথায় উর্বশি! তখন আকুল প্রশ্ন উঠিল,—

"আদিযুগ পুরাতন এ জগতে ফিরিবে কি আর—
অতল অকূল হতে সিক্তকেশে উঠিবে আবার?
প্রথম সে তনুখানি দেখা দিবে প্রথম প্রভাতে,
সর্বাঙ্গ কাঁদিবে তব নিখিলের নয়ন-আঘাতে
বারিবিন্দুপাতে"—

উত্তর আসিল,—

"ফিরিবে না ফিরিবে না—অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
অস্তাচলবাসিনী উর্বশী।"

আর কি ফিরিবে না? উর্বশীর অনন্ত যৌবন, অর্জুনের দৃঢ়তা আর কি ফিরিবে না?

"জন্মকথা"

চিত্তরঞ্জন দাশ

"খোকা মায়ে শুধায় ডেকে
'এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্‌খেনে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে'।
মা শুনে কন হেসে কেঁদে
খোকারে তার বুকে বেঁধে,
ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে ॥

ছিলি আমার পুতুল-খেলায়,
ভোরে শিব-পূজার বেলায়,
প্রভাতে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি।
তুই আমার ঠাকুরের সনে
ছিলি পূজার সিংহাসনে,
তাঁরি পূজায় তোমার পূজা করেছি ॥

*   *   *

যৌবনেতে যখন হিয়া
উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া
তুই ছিলি সৌরভের মতো মিলায়ে,

দ্রষ্টব্য : চিত্তরঞ্জন দাশের 'বাঙলার গীতি-কবিতা' (নারায়ণ—১৩২৩, ৩য় বর্ষ, ১ম খণ্ড) নামক প্রবন্ধ হইতে এই রচনাংশটি গৃহীত। ইহা প্রায় সাইত্রিশ বৎসর পূর্বে বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত 'দেশবন্ধু গ্রন্থাবলী'র অন্তর্ভুক্ত হয়। এই রচনাটির মধ্যে দাশ মহাশয় রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের 'জন্মকথা' নামক কবিতাটির সমালোচনা করিয়াছেন। 'শিশু' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১০ সালে এবং ইহা 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র নবম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যের উপর উদার মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন না। বহুক্ষেত্রেই তাঁহার বিরূপ অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার এইরূপ ধারণা ছিল যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতার অধিকাংশই কৃত্রিমতাপূর্ণ এবং তাহাতে বাঙালার খাঁটি প্রাণধর্ম অভিব্যক্ত হয় নাই। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য'র ন্যায় চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকাতেও সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, অমরেন্দ্রনাথ রায়, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রমুখ

আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে,
জড়িয়ে ছিলি সঙ্গে সঙ্গে,
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে ॥

সব দেবতার আদরের ধন,
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী—
তুই জগতের স্বপ্ন হতে
এসেছিস্ আনন্দস্রোতে
নূতন হয়ে আমার বুকে বিলসি ॥"

এ সকল ছত্রের ভিতর এবার আমরা দেখিব যে, বাৎসল্য-রস কেমন ফুটিয়াছে। অবশ্য, ইহাতে ঘোরো বাৎসল্য-রস নাই,—কিন্তু ঘোরাল রকমের

বিভিন্ন লেখক রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিয়া প্রবন্ধ লিখিতেন। বিপিনচন্দ্র পালের 'মৃণালের কথা' (১৩২১—১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা) অমরেন্দ্র রায়ের 'কঠোর সমালোচনা' (১৩২৩—২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা) জনৈক অনামী লেখকের 'ধর্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ' (১৩২৪—৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা) নামক প্রবন্ধগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

প্রসঙ্গত অপর্ণা দেবীর এই উক্তিটি এ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—"অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথের অতো কঠোর সমালোচনা না থাকলে 'নারায়ণ' সর্বাঙ্গসুন্দর হতো। কিন্তু এ কথা সত্য যে, সব যুগে সব মনীষীকেই সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে।··· পিতৃদেব যখন 'রবিদ্বেষী' বলে সমালোচিত হলেন, তখন তিনি বললেন, "কথাটা ঠিক হলো না, আমি 'রবিদ্বেষী' একেবারেই নই, তাঁর অলৌকিক প্রতিভা আমি কখনও অস্বীকার করি না, তবে তাঁর সব লেখাই যে আমার ভাল লাগে তা বলিতে পারি না।"—মানুষ চিত্তরঞ্জন

'শিশু' গ্রন্থের আলোচনা-প্রসঙ্গে 'জন্মকথা' কবিতাটি সম্বন্ধে প্রমথনাথ বিশী লিখিয়াছেন—"জন্মকথা কবিতাটিতে শিশু ও মাতার মধ্যে রহস্যজনক সম্বন্ধটি কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। এই রহস্য মাতার নিকট যত বিস্ময়ের শিশুর নিকটে তাহার কম নয়।

শিশুর প্রশ্ন—

এলেম আমি কোথা থেকে,
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে

মাতা এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন? এই খোকা তাহার খেলায়, তাহার পূজা-আরাধনায় আকাঙ্ক্ষায়, যুবতীর কোলে, তাহার যৌবনের লাবণ্যে এতকাল অবিচ্ছিন্নভাবে ছিল—

রস আছে বটে। এখন দেখিতে চাই, এর কি রকম বাৎসল্য-রস। মাতা তাহার সন্তানকে বলিতেছে,—

"ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।"

কোন খোকা আজও পর্যন্ত

"এলেম আমি কোথায় থেকে
কোন্‌খেনে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।"

বলিতে পার কিনা জানি না। ইহাতে কবি বোধ হয়, বুড়ো খোকার মত আপনার মনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আর তাহার জবাবগুলিও মায়ের মুখে তাঁহার নিজের বুলি বসাইয়া দিয়াছেন। আমি যাহাকে ইংরাজী গীতি-কবিতার

সব দেবতার আদরের ধন
নিত্যকালের তুই পুরাতন
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী।

তারপরে—

নির্নিমেষে তোমায় হেরে
তোর রহস্য বুঝি না রে
সবার ছিলি আমার হলি কেমনে?

এই প্রশ্ন শুধু তাহার মাতার নহে, আমাদেরও বটে। বিজ্ঞান ইহার সঠিক উত্তর দিতে পারে নাই। এই রহস্যের রসে তাঁহার কবিচিত্তে কতগুলি প্রশ্ন সন্দেহ বিস্ময়, বাৎসল্যভাবের তরঙ্গ জাগিয়াছে, কবিতায় তাহারই প্রকাশ।"—রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ (২য় খণ্ড, মিত্র-ঘোষ সংস্করণ)।

অতঃপর প্রমথনাথ এই কবিতাটি সম্পর্কে দুই-একজন বিরুদ্ধ সমালোচকের মতবাদ ও যুক্তি খণ্ডন করেন।

কানাই সামন্ত তাঁহার 'রবীন্দ্রপ্রতিভা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' পুস্তকের তত্ত্বালোচনায় জন্মকথা' কবিতাটির নিম্নলিখিত কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—

"খোকা মাকে শুধায় ডেকে,
এলেম আমি কোথা থেকে
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?"

শিশুর ক্ষুদ্র দেহখানিতে অসীমের কী রহস্য আর আনন্দ প্রাণ পেয়েছে, দৈনন্দিন গদ্যে তারই পুনরাবৃত্তির ব্যর্থ প্রয়াস করব না। এই কবিতাটিকে শিশুরহস্যের অপূর্ব ভূমিকা-রূপে ব্যবহার করবেন রসিক।"

কেমন অজ্ঞাতভাবে ফুটিয়াছে, তাহা একটু মনে ঠিক করিয়া দেখিলে বুঝিবার অসুবিধা হইবেও না। দেশভেদে যেমন চেহারার পার্থক্য আছে, বিশিষ্ট জাতি আছে, তেমনি কবিতারও জাতি আছে।

বাঙ্গালা ভাষার মামলা

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

এ মোকদ্দমায় বাদী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কয়েকজন গণ্য-মান্য ব্যক্তি; এবং প্রতিবাদী এই নগণ্য—আমি। একবার গদাধর বাগ্দী সরকার বাহাদুরকে প্রতিপক্ষ করিয়া একটি মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছিল। পাড়াগাঁয়ের লোক গদাধরকে সাক্ষাৎ কোনও পীর-পয়গম্বরের অবতার ভাবিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। আমিও যাচিয়া প্রতিবাদী হইয়া বড়লোকের নামের মহিমায় খ্যাতি লাভ করিবার আশা রাখি! আমার আর একটি সুবিধা এই যে, বাদিগণ উচ্চপদস্থ; হয়ত তাঁহারা কেহ সাহিত্যের এজলাসে উপস্থিত হইবেন না। আমি চালাকী-পূর্বক এক-তরফা ডিক্রী হাসিল করিয়া জয়-লাভের সুখ অনুভব করিব।

মোকদ্দমার মূল বিষয়ের তর্ক তুলিবার পূর্বে আমি এই কৈফিয়ৎ দিতে

দ্রষ্টব্য: ভাষাতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব, এবং ব্যাকরণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রবন্ধ লিখিতে শুরু করেন ১৮৮৫ সালে। এই সময় হইতে কয়েক বৎসর ধরিয়া উপর্যুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে লিখিত তাঁহার প্রবন্ধসমূহ মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। এই প্রবন্ধগুলির অধিকাংশ পরে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে 'শব্দতত্ত্ব' নামক পুস্তকের অন্তর্গত হয়।

ইহার পরেও ব্যাকরণাদি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী 'প্রবাসী' এবং অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে। এই সকল প্রবন্ধের বিরূপ সমালোচনা করিয়া বিজয়চন্দ্র মজুমদার ১৩১৮ সালের পৌষ মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকায় (২২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা) যে প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন তাহা এস্থলে মুদ্রিত হইল। রবীন্দ্রনাথের ব্যাকরণ-বিষয়ক প্রবন্ধসমূহের সমালোচনা করিতে গিয়া লেখক তাঁহার পূর্বপ্রকাশিত 'শব্দতত্ত্বে'র কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যাকরণাদি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের শেষ প্রবন্ধ রচিত হয় ১৯৩৮ সালে এবং এই বৎসরেই উক্ত বিষয়ে তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বাংলা ভাষা পরিচয়' প্রকাশিত হয়।

শ্ন যে, শিরোনামায় 'বাংলা' না লিখিয়া 'বাঙ্গালা' লিখিলাম কেন? 'ঙ' স্থানধারী ক-বর্গের অনুনাসিকটি 'গ'-এর সঙ্গে যুক্ত হইলে 'গ' অক্ষরের পূর্ণ উচ্চারণ বাঙ্গালা ভাষায় বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। উচ্চারণের অনুরূপ করিয়া লিখিতে গেলে 'বঙ্গ'-কে 'বং-অ,' 'গঙ্গা'-কে 'গংআ' প্রভৃতি লিখিতে

যতদিন সর্বত্র অক্ষরগুলির সেরূপ 'অং-অ'-সৌষ্ঠব না হয়, ততদিন একাকী 'বাংলা'-কে সং'-এর মত করিয়া সাজাইতে পারিব না। 'রঙ্গ' লিখিলে যখন হসন্ত উচ্চারণে বাঙ্গালার প্রাকৃতিক উচ্চারণের নিয়মে 'রং' পড়িতেই বাধ্য হইতে হয়, তখন বানান লইয়া এ রঙ্গ করা কেন?

আমাদের ভাষায় আ, ঈ, উ প্রভৃতির দীর্ঘ উচ্চারণ নাই; accent-যোগে হ্রস্বকেও দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। কথার জোর দিয়া যখন গত' 'মিছে' প্রভৃতি উচ্চারণ করিতে হয়, অর্থাৎ, যখন 'অ-অত' 'মি-ইছে' প্রভৃতি লিখি না, কেবল accent বুঝিবার ও বুঝাইবার উপর নির্ভর করি, তখন কি-ই বুঝাইবার জন্য 'কী' লিখিলে লাভ কি? যদি জানিতাম,

'প্রবাসী-ঈ' উচ্চারণ করি, 'রমণী-ঈ' উচ্চারণ করি, তাহা হইলে দীর্ঘ ঈ-কার-যোগের একটা সার্থকতা থাকিত।

এ-কারে স্থলবিশেষে ইংরেজির at-এর মত যে উচ্চারণ আছে, তাহা

রবীন্দ্রনাথের ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন আলোচনাকারীর অভিমত নিম্নলিখিত ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—

"…বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ভাষাশিল্পীদের তিনি ছিলেন অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বে গলা ভাষা ভারতের একটি প্রাদেশিক ভাষা মাত্র ছিল, তিনি তার সকল সুপ্তশক্তিকে জাগিয়ে গলেন। যে মাতৃভাষা ছিল পিতলের মত ম্লানদ্যুতি তাকেই স্বর্ণকান্তিতে উজ্জ্বল করে দিয়ে যান বীন্দ্রনাথ।"—'বিশ্বমনা বাক্‌পতি', সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

তিনি মাতৃভাষাকে যে অভিনব রূপ দিয়াছেন, তার প্রতিভাসে কেবল সুধীসমাজই অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিতেরাও উদ্ভাসিত।"—'স্বর্গাবর্ত', সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

"…প্রথমেই চোখে পড়ে শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা দেশের গ্রন্থে কবির অনুসন্ধান। যখন ন এই আলোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তখনকার কালে ইংরেজী বা ইংরাজীতে অনূদিত নামজাদা কোন বই বেরিয়েছিল, প্রায় তার কোনটাই বাদ পড়েনি।…কেবল মাতৃভাষা নয়, বিভিন্ন ার শব্দরাজ্যে তিনি বিচরণ করেছেন তার প্রাণের রূপের ও ধ্বনির পরিচয় খুঁজে। লা ভাষাতত্ত্ব ভাণ্ডারের কুলুপ একদা তিনিই খুলে দিয়েছিলেন।"—'কবি সার্বভৌম', অমিয় চক্রবর্তী

"…বাংলা ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনা করে গিয়েছেন তা পণ্ডিতদেরও বিস্মিত রেছে।"—'মৃত্যুঞ্জয় রবীন্দ্রনাথ', চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

বুঝাইবার জন্য যদি স্বতন্ত্র অক্ষরের সৃষ্টি না করা যায়, তবে য-ফলায় আ-কার দিলে কেহ কিছু বুঝিবে না। বাঙ্গালীর ছেলে এ-কারের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উচ্চারণ আপনা-আপনি শিখিয়া থাকে; বঙ্গের বাহিরে সর্বত্র য-আকার দিলে 'ই-আ' উচ্চারণ হইয়া থাকে। কাজেই বিদেশীরা য-আ-কার দেখিয়া কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না। স্বতন্ত্র একটা 'a' চাই

বর্গীয় অনুনাসিকের মধ্যে পাগ্‌ড়ীর গৌরবে একা 'ঙ' যদি স্বাতন্ত্র্য লা করিতে পারে, তবে দুগ্ধপূর্ণ পালানের গৌরবে 'ঞ' স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে না কেন? উচ্চারণের হিসাবে ধরিতে গেলে 'ঙ' এবং উভয়কেই অনুস্বারের কাছে মাথা হেঁট করিতে হয়। যখন উচ্চারণ করি 'অকিন্‌চন,' 'বান্‌ছা,' আগ্‌গাঁ,' তখন 'ঞ্চ,' 'ঞ্ছ,' ও 'জ্ঞ' বাঁচিয়া থাকি কেন? যোগেশবাবুও এই সুযোগে কয়েকটি অক্ষর ঢালাই করিবার দা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গসাহিত্যে যথেষ্ট যশস্বী হইয়াছেন এই অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন, নূতনত্বটুকু না চালাইলেও সে যশ অপ্রতিহত থাকিবে। আশা করি, মুরারির ন্যায় তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করিবে যুক্তি থাকুক আর নাই থাকুক, আমরা যাহা খুশী লিখিব, এবং যাহা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা একজন নগণ্য লোকের কথায় পরিত্যাগ করিব না আশা করি, এরূপ কথা কেহই বলিবেন না। যাহা হউক, আমি দেবী সরস্বতীর এজলাসের ভাষায় 'বাঙ্গলা'ই লিখিলাম। প্রতিপক্ষের ভাষায় একটা অনুরোধ করিয়া বলি যে—"রোবিন্দ্রোবাবু জোদি আগ্‌গাঁ দ-a ন (than) তা হোলে এই নোতুন বানান্‌ গং-আয় সমর্পোন্‌ কোরি।"

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গভাষায় ব্যাকরণ লিখিতেছেন, দেখি পাইতেছি। তিনি যে এই মহৎ কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহা তাঁহার পূর্বপ্রকাশিত 'শব্দতত্ত্ব'* গ্রন্থ পড়িয়াই জানিতে পারা গিয়াছিল। তাঁহার এ ব্যাকরণ হইল বাঙ্গালা ভাষার তত্ত্ব। শব্দের ব্যুৎপত্তি, উচ্চারণের প্রকৃতি ও পদযোজনার নিয়ম প্রভৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া স্থির করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। প্রতিভাসম্পন্ন কৃতী পুরুষ হইলেও, উপযুক্ত উপাদান সংগৃহীত না

* ১৯০৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত।

থাকিলে, কেহ এ কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। উপাদানে উপেক্ষা করিলে, কিংবা ভাবিয়া চিন্তিয়া ব্যুৎপত্তি বাহির করিলে, ভ্রম অবশ্যম্ভাবী। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'ব্যাকরণ বিভীষিকা' নাম দিয়া যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহাতে ব্যাকরণের জন্য এক শ্রেণীর উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। ললিতবাবু কোনও শ্রেণীবিভাগ না করিয়া শব্দাদির সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া ঐ প্রবন্ধটিকে নিরবচ্ছিন্ন উপাদান-সংগ্রহ বলিতে পারি না। কিন্তু কি উপায়ে সংগৃহীত শ্রেণীর উপাদান অধিক সংগৃহীত হইতে পারে, ললিতবাবু তাহার পথ দেখাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে ও ব্যাকরণ বিষয়ক প্রবন্ধে গন্তব্য পথের অনেক কথা সূচিত করিয়া দিয়াছেন। যে যে উপাদান সংগ্রহ না করিলে ব্যাকরণ লেখা সম্ভব হইতে পারে না, তাহার কথঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি।

(ক) যে প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা পরিবর্তিত হইতে হইতে এ কালের বঙ্গভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার প্রকৃতি না বুঝিলে, বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি বুঝিবার পক্ষে বাধা ঘটিবে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। সংস্কৃতে যে সর্বনামটি সঃ, অতি প্রাচীন প্রাকৃতে তাহার উচ্চারণ ছিল 'সো,' এবং যে মাগধী প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা, ওড়িয়া প্রভৃতির জন্ম, তাহাতে উহার উচ্চারণ ছিল 'সে'। এই সে কেবল বাঙ্গলায় ও ওড়িয়ায় প্রচলিত আছে। এই শেষোক্ত প্রাকৃতে অনেক শব্দেরই প্রথমার পদে কর্তৃ-কারকে এ-কার যুক্ত হইত; যথা—মহাবীরে, নায়পুত্তে, লোকে ইত্যাদি। অধিকাংশ জৈন গ্রন্থ এই শেষোক্ত প্রাকৃতে লিখিত। পাঠকেরা ইচ্ছা করিলেই 'নায়া-ধর্ম-কহা' 'ওববায়ীয়-দসাও,' 'উবাসগ-দসাও' প্রভৃতি জৈন প্রাকৃত গ্রন্থের ভাষা পড়িয়া দেখিতে পারেন। এই প্রাচীন প্রথাতেই 'লোকে বলে,' 'ছাগলে খায়,' 'হাতীতে খায়' প্রভৃতি প্রয়োগ বাঙ্গলায় রহিয়াছে। ওড়িয়া ভাষাতেও যে ঐ প্রকার প্রয়োগ আছে, তাহা বাবু যোগেশচন্দ্র রায় দেখাইয়া দিয়াছিলেন। এ সকল স্থলে কোনও তির্যক-গতি নাই, অথবা তৃতীয়া বিভক্তির 'ন'-র লোপ হয় নাই। কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, এ কালের 'তির্যক-গতি'তে না হইলেও, প্রাচীন কালের 'তির্যক-গতি'তে প্রথমা বিভক্তিতে এ-কার আসিয়াছিল। প্রথমতঃ সে কথায় অনুসন্ধান করিলে এ কালের বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি-বিচারে কোনও ফল হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীনকালের প্রাকৃতে অন্তবিধ কারণে

ঐ এ-কারের জন্ম হইয়াছিল। সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিতেছি। ভাষা-বিদেরা জানেন যে, 'দূর' বুঝাইতে হইলে, কিংবা 'বহু' বুঝাইতে হইলে, বর্বরেরা একটি স্থানকে অথবা একটি পদার্থকে একটু টানিয়া দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকে। আমরা যখন সাধারণতঃ 'গন্ধ' বলি, তখন ভাল গন্ধ বুঝায়। দুর্গন্ধ বুঝাইতে হইলে আমরা এখনও একটু নাক সিঁটকাইয়া 'গন্ধ' শব্দটি টানিয়া দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ করি। বর্বরের ভাব-প্রকাশক দীর্ঘ উচ্চারণ ঐ ধরনের। অ-কারান্ত শব্দের বহুবচন প্রকাশ করিতে হইলে ভাষার আদিম যুগে অ-কারকে দীর্ঘ করিয়া টানিয়া উচ্চারণ করিতে হইত; এবং উহা হইতেই 'নর' শব্দের বহুবচনে 'নরাঃ' করিতে হইয়াছিল। এখানে সকল প্রত্যয় ও বিভক্তির বিশ্লেষণ করিলে চলিবে না। যে দীর্ঘ উচ্চারণের ফলে 'নরাঃ' সেই দীর্ঘ উচ্চারণের ফলেই অর্বাচীন প্রাকৃতে 'নরে' হইয়াছিল। সম্বোধনের সময়ে স্বাভাবিকভাবে যে দীর্ঘ টান দিতে হয়, তাহা বহুকাল হইতে এ-কার দ্বারা প্রকাশিত হইত। প্রাকৃত ভাষায় যখন একবচন ও বহুবচনের পদের পার্থক্য কমিয়া আসিতেছিল বলিয়া 'গণ' প্রভৃতি বহুত্বজ্ঞাপক শব্দ জুড়িয়া বহুবচনের সৃষ্টি হইতেছিল, তখন একবচনেও এ-কার রহিয়া গিয়াছিল। একারযুক্ত প্রথমার পদগুলি যে অনেক স্থলে যুগপৎ একবচন ও বহুবচন বুঝায়, তাহা 'লোকে বলে,' 'ছাগলে খায়' প্রভৃতিতে দেখিতে পাই। একটা ছাগল গাছ মুড়িয়া খাইয়াছে, এবং 'ছাগলে কি না খায় ও পাগলে কি না বলে' তুলনা করিলেই উহা বুঝিতে পারা যাইবে।

আমি একটা দীর্ঘ সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ব্যাকরণ প্রবন্ধের ত্রুটি দেখাইতে বসি নাই। উপাদান সংগ্রহ না করিলে, সুবিচারিত হইলেও, মন-গড়া ব্যুৎপত্তি যে ভ্রমের পথে লইয়া যায়, তাহাই অল্প দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে সকল উপাদান সংগ্রহ করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া না থাকিয়া বরং কিছু লিখিয়া ফেলা ভাল; পরে না হয় উহার দোষটুকু সংশোধন করা যাইবে। কথাটি আপাততঃ শুনিতে মন্দ নয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, ভাষার ব্যুৎপত্তি ও প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইবে, তাহার উৎপাদক ও পরিবর্ধক ভাষার সহিত পরিচয় না থাকিলে, আদৌ এই ব্যাকরণ লিখিবার কার্যে হস্তক্ষেপ করা চলে না। রবীন্দ্রবাবু যদি ব্যুৎপত্তি বাহির না করিয়া

কেবল ব্যবহৃত প্রয়োগগুলিকেই শ্রেণীবদ্ধ করিতেন, তবে কচিৎ তাহাতে ভুল হইলে, অন্য লোকে সমালোচনা করিতে পারিত।

(খ) আর্য ভিন্ন অন্যান্য যে সকল জাতি বঙ্গদেশে বাস করিত, এবং করিতেছে, তাহাদের সংস্পর্শে ভাষা যে অনেক পরিবর্তন লাভ করিয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অনেক জাতির শব্দ ও প্রত্যয় আমাদের ভাষায় অন্তর্ভুক্ত হইয়া ভাষাকে পরিবর্ধিত করিয়াছে। সেই সকল দেশী শব্দ যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করিতে হইবে। সংস্কৃতের আধিপত্যে অনেক দেশী শব্দ একটু রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক শব্দসমূহ সংগ্রহ করিবার সময়ে শব্দগুলির প্রচলিত গ্রাম্য উচ্চারণ সর্বথা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। নতুবা ব্যুৎপত্তি ভাবিতে ভ্রমে পড়িতে হইবে। অনেক দেশী শব্দ যে সংস্কৃতের বংশে পোষ্য করিয়া লইবার চেষ্টায় তাহাদের চেহারা বদ্‌লাইয়া ফেলিয়াছে, এবং ঐ পরিবর্তনের জন্য যে সহসা সেই শব্দগুলির দ্রাবিড়ী প্রভৃতি উৎস ধরিতে পারা যায় না, এ বিষয়ে অন্যত্র দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছি।

যে সকল শব্দ সংস্কৃত বা প্রাকৃত হইতে গৃহীত হইলেও প্রাদেশিক ভাষায় বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে, সেগুলিরও উচ্চারণ বজায় না রাখিলে ব্যুৎপত্তি ধরিবার সময় গোলে পড়িতে হয়। সাধারণ শ্রেণীর লোকে 'বাড়ী কোথায়' জিজ্ঞাসা করিতে হইলে 'নিবেশ কোথায়' বলিয়া থাকে। প্রাকৃত ভাষায় দেখিতে পাই, 'বেশ্মন্' শব্দজাত 'নিবেশ' কথাই ব্যবহৃত ছিল। আমরা স্তু ঐ শব্দটি অসাধু প্রয়োগ মনে করিয়া উহার স্থলে 'নিবাস' ব্যবহার করিয়া থাকি। ঐ প্রকার পরিবর্তনে আমাদের ভাষার সহিত প্রাচীন প্রাকৃতের ঘনিষ্ঠতার ইতিহাস নষ্ট হইয়া যাইতেছে। হইতে পারে যে, 'ভদ্র' শব্দ হইতেই আমাদের দেশী 'ভদ্রস্থ' শব্দ উৎপন্ন। 'প্রবাসী' পত্রে দেখিলাম, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ 'ভদ্রস্থ' কথাটিকে সাধু করিয়া 'ভদ্রতা' করিয়াছেন। 'ভদ্রস্থের' অর্থ 'ভদ্রতা' নহে, রবীন্দ্রবাবুর নিজের প্রয়োগেই তাহা তিনি দেখিতে পাইবেন। 'অমুক কাজ না করিলে ভদ্রস্থ নাই' বলিলে, সে কাজের সহিত ভদ্রতা অভদ্রতার কোনও সম্পর্ক থাকে না। এই সকল শব্দ বিশেষ অর্থ বুঝাইবার জন্য দেশী উচ্চারণে রক্ষিত হউক।

(গ) ভাষার কোন্ স্থলে 'খানি' বসে, কোন স্থলে 'টা,' 'টি' প্রভৃতি বসে, তাহা প্রয়োগের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা ভাল। রবীন্দ্রনাথ

এ বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ঐ সঙ্গে সঙ্গে 'টা' 'টুকু' প্রভৃতির যে সকল ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন, উহাই তাঁহার প্রবন্ধের দোষের অংশ। ঐ ব্যুৎপত্তি না দিলে ভাষার idiom বা রীতি-সিদ্ধির বিচারে কোনও ত্রুটি হইত না। তিনি যেভাবে ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন, তাহাতে না-জানা বিষয়ে জোর করিয়া একটা দৃঢ় সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—'টুকু' শব্দ সংস্কৃত 'তণুক' শব্দ হইতে উৎপন্ন। তিনি কোন প্রমাণে এমন স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন? ওড়িয়া ভাষায় 'টিকিএ' বা টিকে' শব্দের অর্থ—অল্প। বাঙ্গালার পশ্চিম দিকে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া অঞ্চলে 'টুক্' শব্দের যে ব্যবহার আছে, তাহা প্রায় ওড়িয়ার 'টিকিএ'র সন্নিহিত মনে হয়। ঐ অঞ্চলের যাত্রাগানের কথায় আছে যে, 'ভীমের গদার আঘাতে দুর্যোধন টুক্‌চের বই মরে গেল।' এই 'টিকিএ' ও 'টুক্' যে কোন খাঁটি দেশী শব্দ নহে, তাহা কি সাহসে বলিব? সন্দেহের বিষয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্ত করা দোষাবহ বলিয়া মনে করি। 'গোটা' হইতে 'টা' 'টি' প্রভৃতির উৎপত্তি, রবীন্দ্রবাবু আমাদিগকে জোর করিয়া বিশ্বাস করিতে বলিতেছেন।—"বাংলা ভাষায় 'গোটা' শব্দের দ্বারা অখণ্ডতা বুঝায়, এই কারণে এই 'গোটা' শব্দের অপভ্রংশ 'টা' চিহ্ন পদার্থের সমগ্রতা সূচনা করে।" এটা খাঁটি নির্ভুল সিদ্ধান্তের ভাষা। 'গোটা' শব্দ দ্বারা ওড়িয়া ভাষায় অখণ্ডতা বুঝায় না। ওড়িয়াতে উহার অর্থ—সংখ্যাবাচক এক। অথচ উড়িয়া ভাষায় স্বতন্ত্রভাবে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত 'টা,' 'টে' প্রচলিত আছে। সংখ্যাবাচক এক অর্থে 'গোটা' শব্দটি উত্তর অঞ্চলের পাহাড়ী ভাষায় প্রচলিত আছে। এই দেশীয় 'গোটা' সম্ভবতঃ বঙ্গভাষাতেও 'এক' অর্থে প্রাচীনকালে ব্যবহৃত ছিল; এবং তাহা হইতেই পরে 'অখণ্ড' অর্থ আসিয়াছে। বাঙ্গলা দেশে অখণ্ড অর্থ প্রচলিত হইবার পর যে ভাষায় 'টা' 'টে' প্রচলিত হইয়াছে, এ কথা সত্য নহে। হিন্দী প্রভৃতি অন্য প্রাদেশিক ভাষাতেও বহু প্রাচীনকাল হইতে 'টা' 'ট' প্রচলিত আছে। অথচ পাহাড়ী, বাঙ্গালা কিংবা ওড়িয়া অর্থের 'গোটা' শব্দ ঐ সকল ভাষায় প্রচলিত নাই। উত্তর অঞ্চলের হিন্দীতে 'এক্‌ঠো,' 'দোঠো' প্রভৃতি ব্যবহৃত আছে। ছত্রিশগড়ী হিন্দীতেও অনেক কথার সঙ্গে 'টা' 'টৈ' ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালার এই 'টা' 'টে' প্রভৃতির আর একটি রূপান্তর পূর্ববঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা 'ডা' 'ডি'। 'ভাইটি' 'বোনটি'র স্থলে

'ভাইড়ি,' 'বুন্ড়ি' ব্যবহৃত হয়। এই 'ডা' 'ডি' বঙ্গের পশ্চিম ভাগেও প্রাচীন-কালে ব্যবহৃত ছিল বলিয়া মনে করিতে পারি। 'কেরে' স্থলে 'কেটারে'র ব্যবহার আছে। পূর্ববঙ্গে ঐ স্থলে 'কেডারে' বলে, নদীয়া জেলার দূর পল্লীতে ঐ সকল স্থলে 'ট' ও 'ড' বিকল্পে ব্যবহৃত দেখিতে পাই। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে মনে হয় যে, 'টা' 'টে' প্রভৃতির নিজের একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, উহার সহিত 'গোটা' কথার কোনও সম্পর্ক নাই। অনেক সংখ্যাবাচক শব্দের পরে প্রাকৃতে যে 'ঠ' দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই হিন্দীর 'ঠ' এবং বাঙ্গালার 'ট,' 'ড' কিনা তাহা সাহস করিয়া বলা যায় না। পালিতে 'ছট্‌ঠো'র অর্থ ষষ্ঠ। কিন্তু পরবর্তী মাগধীতে 'ছয়টি'র স্থলেও 'ছট্‌ঠো' ব্যবহৃত আছে। 'গোটা' শব্দের ব্যবহার না থাকিয়াও যখন হিন্দীতে 'ঠ' আছে, তখন রবীন্দ্রবাবুর ব্যুৎপত্তি অসিদ্ধ হইতেছে।

কার্ত্তিক মাসের 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রবাবু 'গোটা' শব্দের বহুবচনে 'গুলা' শব্দের জন্ম বলিয়া লিখিয়াছেন। বর্ণ-পরিবর্তনের কোন নিয়মে একটা 'ট' বহু অর্থে 'ল' হইয়া উঠিল, তাহা লিখিলে ভাল ছিল। রবীন্দ্রবাবু পূর্বে একবার 'গণ' শব্দের পরিবর্তনে 'গুলা' হইয়াছে বলিয়া লিখিয়াছিলেন। তখনও সে কথার সমালোচনা করিয়াছিলাম। যাহারা তামিল ভাষায় কথা কহে, তাহারা এখন বঙ্গ হইতে বহু দূরে বাস করে। কিন্তু বাঙ্গালায় প্রচলিত এমন অনেক দেশী শব্দ আছে, যাহা তামিল শব্দ। বিশেষভাবে কেহ প্রতিবেশী হইয়া না থাকিলে তাহাদের বহুসংখ্যক শব্দ গৃহীত হইতে পারিত না। সাহিত্য-পরিষদের এক সভায় 'বঙ্গভাষার উপরে তেলেগু তামিল প্রভৃতির আধিপত্য' বিষয়ে একবার কিছু বলিয়াছিলাম। তামিল ভাষায় বহুবচনে 'গুল্' ব্যবহৃত আছে। উড়িয়ায় এবং বাঙ্গলাতেই তেলেগু ও তামিল ভাষার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তামিলের 'গুল' যে বাঙ্গলা ও ওড়িয়ার 'গুলি' ও 'গুলা' নহে, এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারেন কি? বাঙ্গলা ও ওড়িয়ায় যখন তামিল এবং তেলেগুর শব্দ অনেক সংগৃহীত আছে, তখন বহুবচনের চিহ্ন 'গুল্' যে গৃহীত হয় নাই, তাহা বলা কঠিন।

আমার বক্তব্য এই যে, যতদিন এই অবশ্য-জ্ঞাতব্য উপকরণ সংগৃহীত না হয়, ততদিন কেবলমাত্র চিন্তার জোরে কোনও ব্যুৎপত্তির নির্দেশ না করিলে ভাল হয়। ভাষার প্রচলিত প্রয়োগ ও রীতিসিদ্ধি অবলম্বন করিয়া

উহার প্রকৃতিবিচার চলিতে পারে। রবীন্দ্রবাবু ততটুকু করিলে কোনও ক্ষতি নাই।

আমি পূর্বে অতি-পশ্চিমবঙ্গের 'বই' শব্দের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়াছি। ঐ শব্দটির বঙ্গের সাধারণ ব্যবহার মানভূমের ব্যবহারের সহিত মেলে না। 'টুক্ চের বই মরে গেল' স্থলে 'বই' অর্থ বাদে বা অন্তে হয়। এই অর্থটি কিন্তু প্রাথমিক অর্থ বলিয়া মনে হইতেছে। সকল প্রদেশের শব্দ সংগৃহীত হইলে এ কথার বিচার চলিবে।

(ঘ) ভাষা-বিজ্ঞানের যে সকল তথ্য না জানিলে কোনও ভাষারই বিচার করা চলে না, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ঐ বিষয়ে প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের গ্রন্থগুলি সকলেই পড়িয়া থাকেন, মনে করি। কেন না, তাহা না হইলে এ যুগে ভাষা-বিজ্ঞানের চর্চা অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ ও সমালোচনা-সাহিত্য

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

বাঙ্গলার দুই বিরাট পুরুষ—রামমোহন ও বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে জীবন-চরিত, আখ্যায়িকা ও কথা-সাহিত্যের অভাব নাই। সযত্নে এ সকল রচনা পাঠে উক্ত মহাপুরুষদ্বয়ের যে আদর্শ আমাদের মনের মধ্যে জাগ্রত হয়, রবীন্দ্রনাথের দুটি মাত্র স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে তদপেক্ষা কতগুণেই না তাঁহাদের

দ্রষ্টব্য: বিশিষ্ট কবি ও রবীন্দ্রভক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রণীত 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য' (প্রকাশক: আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৫৪; মূল্য ১৷৵০, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৶০+৶০+ ১০৭) নামক পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত 'রবীন্দ্রনাথ ও সমালোচনা-সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে আংশিকভাবে এই রচনাটি গৃহীত।

'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য' গ্রন্থের ভূমিকায় কবিশেখর কালিদাস রায় লিখিয়াছেন—"দ্বিজেন্দ্রলাল যখন রবীন্দ্রনাথকে কঠোরভাবে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন তখন কবি যতীন্দ্রমোহন দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়া প্রত্যেকটি ক্রূর মন্তব্য ও অযথা দোষারোপের উত্তর দেন।" পঞ্চাশৎবর্ষপূর্তিতে রবীন্দ্র-প্রতিভার মর্যাদাস্বরূপ কবিকে যে সংবর্ধনা দেওয়া হয়, তাহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন যতীন্দ্রমোহন।

মূর্তি আমাদের মনের মধ্যে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। দুই একটি ছোট কথায়, দুটি একটি ক্ষুদ্র উপমায়, দুটি একটি অতি সামান্য বর্ণ-রেখাপাতে চরিত্রচিত্র এমনি উজ্জ্বলরূপ ধারণ করে যে, সুবিপুল জনতার মধ্যে দাঁড় করাইয়া দিলেও তাঁহাদের ঊর্ধ্বমৌলি বৈশিষ্ট্য চিনিয়া লইতে মুহূর্তের জন্য বিলম্ব ঘটে না। রাত্রির আলোক হইতে দিনের আলোক যেমন স্বতন্ত্র ও অনায়াসপ্রত্যক্ষ, রবিকরোজ্জ্বল চিত্রগুলিও তেমনি সুস্পষ্ট ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কবি একটি মাত্র ছোট্ট কথায় বলিলেন—"আমাদের এই কাকের বাসায় এই দুটি কোকিলের ডিম কে আনিল?" তখনই সেই একটিমাত্র ঘরোয়া কথায় চরিত্রদ্বয়ের যে অসাধারণ বিশেষত্ব আমাদের মনের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, তাহা দুইটি বৃহদাকার তথা-কথিত চরিত্র-সমালোচনা-প্রবন্ধে ফুটিয়া উঠিতে পারিত না। মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে কি জানি কেন, পিকডিম্বের পরিচয় অতিক্রম করিয়াও ভারতবর্ণিত বিনতানন্দন মহাবলী অরুণ ও গরুড়ের বীর্যমহিমা মনে পড়ে।

সাগর-মাহাত্ম্যের উপমা দিতে গিয়া কবি অন্যত্র বলিয়াছেন, "বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে, বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধি সহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতা-জাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জনে উত্থান করিয়াছিলেন; সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফলদান করিতেন; কিন্তু আমাদের শতসহস্র ক্ষণজীবী সভাসমিতির ঝিল্লীঝংকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। ক্ষুধিত, পীড়িত, অনাথ অসহায়দের জন্য আজ তিনি বর্তমান নাই, কিন্তু তাঁহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয় বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার তলদেশে সমস্ত বাঙ্গালীজাতির তীর্থস্থান হইয়াছে; আমরা সেইখানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, নিষ্ফল আড়ম্বর ভুলিয়া, সূক্ষ্মতম তর্ক-জাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া সরল সবল অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষালাভ করিয়া যাইব।"

—ইহা ত শুধু চরিত্রবিশ্লেষণ নহে, ইহা অভিনব-সৌন্দর্য-সৃজন। এদেশের এই মানসিক খর্বতার রাজ্যে বিদ্যাসাগরের বিরাট ব্যক্তিত্ব বনস্পতিরই মতো শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া দাঁড়ায় এবং কবির ভাষায়—"এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের

মতো দুর্গম বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকব, বিচিত্র শৌর্য-বীর্য-মাহাত্ম্যের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রের প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব"—এ কথার যাথার্থ্যও যেন মনের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠে।

কবি যখন বলেন,—"ভাষা, প্রস্তর অথবা চিত্রপটের দ্বারা সত্য এবং সৌন্দর্য প্রকাশ করা ক্ষমতার কার্য সন্দেহ নাই; তাহাতে বিচিত্র বাধা অতিক্রম এবং অসামান্য নৈপুণ্য প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু নিজের সমগ্র জীবনের দ্বারা সেই সত্য ও সৌন্দর্য প্রকাশ করা তদপেক্ষা আরো বেশী দুরূহ, এবং তাহাতে পদে পদে কঠিনতর বাধা অতিক্রম করিতে হয়, এবং তাহাতে স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তি ও নৈপুণ্য, সংযম ও বল অধিকতর আবশ্যক হয়,"—তখন সমস্ত বিদ্যাসাগর চরিত্রের প্রকৃত মূর্তি এবং অনন্য-সাধারণ বলিষ্ঠ বৈশিষ্ট্য সূর্যালোকে পর্বতের মতো স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। বিশ্লেষণী-প্রতিভায় এই চরিত্রসৃষ্টি মৌলিক রচনার ন্যায় সুসংগত ও রসাঢ্য।

রামমোহন সম্বন্ধেও এই দৃষ্টি তেমনি প্রখর, তেমনি সূক্ষ্ম। কবি যখন রামমোহনের মহত্ত্ব বিশ্লেষণকালে লিখিলেন,—"তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, আবার তিনি যাহা না করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব আরো প্রকাশ পায়। তিনি যে এত কাজ করিয়াছেন, কিছুরই মধ্যে তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠা করেন নাই। তিনি যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে নিজের অথবা কাহারো প্রতিমূর্তি স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি গড়িয়া-পিটিয়া একটা নূতন ধর্ম বানাইতে পারিতেন, তাহা না করিয়া পুরাতন ধর্ম প্রচার করিলেন; তিনি নিজেকে গুরু বলিয়া চালাইতে পারিতেন, তাহা না করিয়া প্রাচীন ঋষিদিগকে গুরু বলিয়া মানিলেন। তিনি তাঁহার কাজ স্থায়ী করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাম স্থায়ী করিবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই, বরং তাহার প্রতিকূলতা করিয়াছেন"—তখন সত্য সত্যই যেন সেই বিরাট কর্মী পুরুষের নিঃস্পৃহ স্বদেশ-সাধনা একক স্বাতন্ত্র্যের মহিমামণ্ডিত তপস্বিমূর্তিতে দেদীপ্যমান হইয়া দেখা দেয়। শিক্ষা বলো, রাজনীতি বলো, বঙ্গভাষা বলো,

বঙ্গ-সাহিত্য বলো, সমাজ বলো, ধর্ম বলো,"—সকল দিক হইতেই সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের উপর আলো আসিয়া পড়ে।

বঙ্কিম সম্বন্ধে কবির বক্তব্য লইয়া এইবার আলোচনা করি। "বঙ্কিমকে কি আমরা স্বহস্তরচিত পাথরের মূর্তিদ্বারা অমরত্ব লাভের সহায়তা করিব? আমাদের চেয়ে তাঁহার ক্ষমতা কি অধিক ছিল না? তিনি কি নিজের কীর্তিকে স্থায়ী করিয়া যান নাই? হিমালয়কে স্মরণ করিবার জন্য কি চাঁদা করিয়া তাহার একটা কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করিবার প্রয়োজন আছে?" এই মন্তব্য শুনিয়া অথবা "বঙ্কিমচন্দ্র সব্যসাচী অর্জুনের ন্যায় এক হস্তে বাঙ্গালার সাহিত্য রচনা করিয়াছেন এবং এক হস্তে তাহার কাঁটাগাছ মারিয়াছেন"—এই উপমার সাক্ষাৎলাভ করিয়া বঙ্গসাহিত্য গঠনের গুরুভার সম্পর্কে বা বঙ্গ-সাহিত্যে অমর কীর্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বঙ্কিমের শুভ্রোজ্জ্বল মূর্তি কি হিমালয়ের মতোই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে না?

এই প্রসঙ্গে মনে আসে, রসদৃষ্টির পক্ষে শ্রদ্ধাদৃষ্টিও কি পরিমাণ প্রয়োজনীয়। পূর্ববর্তী একজন প্রতিভাসম্পন্ন স্রষ্টার সৃষ্টিবিচার করিতে বসিয়া কতখানি শ্রদ্ধা লইয়া তাঁহার সৃষ্টির প্রতি চাহিলে, তবে সে আপন অন্তরের বাণী সমালোচকের নিকট প্রকাশ করিতে চায়। আজিকার দিনে এই সর্বত্র পাটোয়ারী বুদ্ধির যুগে এই শ্রদ্ধা-দৃষ্টির কথা বিশেষভাবে আমাদের স্মরণ করিবার সময় আসিয়াছে।

রবীন্দ্র-বঙ্কিম বিতর্ক

সরলা দেবী

রবিমামার সঙ্গে ছেলেবেলায় একটি সভায় যাওয়া আমার মনে পড়ে। জীবনে এই প্রথম সভাগমন। কি excitement, কি উদ্দীপনা আমাদের—সুরেন বিবি সুধীদাদা বলুদাদারাও আছেন। সভাটি আদি ব্রাহ্মসমাজের হলে

দ্রষ্টব্য: স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা এবং রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলা দেবী কেবলমাত্র রাজনীতিক্ষেত্রে নয় সাহিত্যক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। ১৩০২-৪ সাল পর্যন্ত তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী হিরণ্ময়ী দেবীর সহযোগিতায় 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৩০৫

আহূত, উদ্দেশ্য সে সভায় বঙ্কিমের একটি মতের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের তীব্র প্রতিবাদ পাঠ। বঙ্কিমের যশ ও কীর্তি তখন মধ্যাহ্ন-গগনে সমুদিত আর রবি সবেমাত্র উদীয়মান। লোকদের মধ্যে একটা হুলস্থূল পড়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের নাম তখন তাঁর গানের ভিতরে রবিছায়াতেই প্রায় নিবদ্ধ। এই বক্তৃতায় যে ওজস্বী গদ্যে, যে যুক্তিতর্কে তাঁর শ্রোতাদের মন আকৃষ্ট করলেন তা ইতিপূর্বে তাঁর সম্বন্ধে অভাবনীয়।

সংক্ষেপে ব্যাপারটি এই—রবীন্দ্রনাথের প্রতিপাদ্য এই যে, মিথ্যা কোন অবস্থাতেই কোন সময়েই কথনীয় নয়। এ বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রকারকৃত ব্যতিক্রম বিধিগুলি তিনি সমর্থন করেন না, বঙ্কিম করেন—এই প্রভেদ। রবীন্দ্রনাথের দুই অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ বিষয়ে শাস্ত্রকারদের ও বঙ্কিমের পক্ষাবলম্বী হলেন, তাঁরা বক্তৃতা-সভায় যোগদান করলেন না। কিন্তু ছোটরা তাঁর hero-worshipper হ'ল।

তর্কের বিষয়টি বড় সূক্ষ্ম ও চিরকাল মানবসমাজের আলোচ্য। এক পক্ষের অস্ত্রধারী হয়ে রবীন্দ্রনাথ যেন এইটিতে বঙ্কিমের Achilles' heel আবিষ্কার করে সেইখানেই খোঁচা দিলেন। রবীন্দ্রের বক্তৃতা তৎকালীন 'ভারতী'তে বেরিয়েছিল, বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্র-রচনাসংগ্রহে সেইটি নিশ্চয়ই সন্নিবিষ্ট হয়ে থাকবে। কিন্তু বঙ্কিমকে বাঙালীর মনে চিরজাগরূক রাখবার কোন প্রতিষ্ঠান নেই। তাঁর যে শুধু ঔপন্যাসিক প্রতিভা ছিল না, সংস্কারের ও ভাবের গতানুগতিকতায় বাহিত না হয়ে বুদ্ধির প্রখর বিচারশীলতায় তিনি যে কত বড় 'আধুনিক,' রবীন্দ্রের গুরু ও মার্গদর্শী তিনিই যে,—সে কথা এই পুরুষের বাঙ্গালীরা প্রায় জানে না! 'সত্য' সম্বন্ধে রবীন্দ্রের uncom-

---

সালের শেষে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'র সম্পাদকত্ব পরিত্যাগ করিলে সরলা দেবী উক্ত পত্রিকার (১৩০৬-১৪) সম্পাদিকা হন। সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় ১৩৫১ সালের ২৫শে কার্তিক হইতে ১৩৫২ সালের ২৬শে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত 'জীবনের ঝরাপাতা' নামক তাঁহার একটি আত্মকথা প্রকাশিত হয়। 'রবীন্দ্র-বঙ্কিম বিতর্ক' অভিধাযুক্ত এই রচনাটি উক্ত আত্মকথার অংশবিশেষ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

'জীবনের ঝরাপাতা' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় লেখিকার মৃত্যুর পর। রবীন্দ্রনাথের আক্রমণের লক্ষ্যীভূত, বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত 'কৃষ্ণকথিত ধর্মতত্ত্ব' নামক প্রবন্ধটি 'জীবনের ঝরাপাতা'র মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

promising আপোষশূন্য মনোভাবের অভিব্যক্তিতে সেদিন আমরা বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা মুগ্ধ হলুম। সত্যভক্তি আমাদের বুকে কোদিত করে দেওয়া হল। শিশুদের পক্ষে এইটেই দরকার। তাদের মনে ধর্মের নিয়মগুলির সংস্কারই বসিয়ে দেওয়া উচিত, ব্যতিক্রমের গহনে আগে থেকেই পা বাঁসালে তাদের দুর্বল মন কথায় কথায় ব্যতিক্রমবিধির আড়ে মিথ্যাভাষণ ও মিথ্যা আচরণের আশ্রয় নেবে। শোনা যায় বিদ্যাসাগরমশায় তাঁর স্কুলের কোন পড়ুয়াকে মিথ্যা কথা কইতে শুনে বলেছিলেন,—"যাও বাবা, এখানে তোমার জায়গা হবে না, সেই আলিপুরের বটতলায় 'টুর্নিবাবুদের' কাছে গিয়ে বোসো।" কি শিশু, কি বড়, সকল মানুষেরই অন্তরের গভীর স্তরে কতকগুলি উচ্চ ভাব বসবাস করে। একখানা ব্রিটিশ Military Manual-এ পড়েছিলুম—"সৈন্যদের কেবলমাত্র হুকুমের দ্বারা চালাবে না। তাদের ভিতরকার সাহস প্রভৃতি উচ্চতম ভাব ও আদর্শের প্রতি appeal করে শত্রুজয়ে উদ্দীপিত করবে।" সত্যই পরম ধর্ম। কখনো কখনো অসত্যও ধর্মেরই রূপ; সুতরাং মার্জনীয়—এই কথা শাস্ত্রকাররা বলেছেন। সত্যই পরম ধর্ম। সত্যমিথ্যার ব্যবচ্ছেদ রেখাটি সুস্পষ্ট। কিন্তু কোন কোন অবস্থায় দেখতে অসত্য হলেও, তা ধর্মেরই রূপান্তর ও সেস্থলে ধর্মার্থে অসত্যই বিহিত—এই কথাটিই শ্রীকৃষ্ণের মুখে বঙ্কিম আমাদের শুনিয়েছেন।

বড় হয়ে যখন বিচার-বিবেচনা-শক্তি খানিকটা উদ্বুদ্ধ হল, তখন বঙ্কিমকে পড়ে দেখে অনুভব করলুম, বঙ্কিমের প্রতি সুবিচার করিনি আমরা, সেদিন মাতুলভক্তিতে অযথা বঙ্কিম-মতদ্বেষী হয়ে পড়েছিলুম।

বৈষ্ণব সাহিত্য ও [illegible]

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

রবীন্দ্রনাথ যেদিন প্রথম সাহিত্য-গগনে আবির্ভূত হইলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহাকে ঘেরিয়া সমালোচনার জাল বোনা সুরু হইয়াছিল। আমাদের ছাত্রজীবনে সমালোচ্য বিষয়ের সংখ্যা এখনকার মত এত বেশী ছিল না। রাজনীতির স্রোত সে-দিনে মৃদুমন্থর গতিতে বহিত—অন্ততঃ ছাত্রেরা তাহাতে বড় ঝাঁপ দিতেন না। আমাদের সে-দিনে যে-সকল বিষয় লইয়া সমালোচনা চলিত, তাহার মধ্যে রবীন্দ্রবাবুর কাব্য-গল্প-নাটকই ছিল প্রধান। ইহার মধ্যে প্রতিকূল সমালোচনার বহর নিতান্ত কম ছিল না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা গান গায়িতে বলিলে রবিবাবুর গান গায়িতাম, অন্য গান লোকে তেমন শুনিতে চাহিত না। আবৃত্তি করিতে হইলে রবিবাবুর কবিতা নহিলে চলিত না। মাসিক পত্রে রবিবাবুর নাম নহিলে পাঠকের মন খুশী হইত না।

এই সকল সমালোচনার মধ্যে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই ছিল যে, অনেকে রবিবাবুর লেখা না পড়িয়াই সমালোচনা করিতে অগ্রসর হইতেন। অর্থাৎ সে সময়ে রবিবাবুর লেখার প্রতিকূল সমালোচনা করা একটা 'ফ্যাশানে' পরিণত হইয়াছিল। তাহার কারণ সে-সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা সাহিত্য-জগতে অতুলনীয় ছিল। এখনকার মত সেই নবীন বয়সেও তাঁহার কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।

আমি জানি না এখনও রবিবাবুর লেখা সম্বন্ধে বাঙ্গালী জনসাধারণের এরূপ বিশাল অজ্ঞতা আছে কিনা। আমেরিকা, জার্মানী, জাপান, রুশিয়া, ইতালী, স্পেন প্রভৃতি দেশে যাঁহার কাব্য-উপন্যাস সুপরিচিত, তাঁহার সম্বন্ধে 'জানি না' বলিতে আমাদের অভিমানে আঘাত লাগে। ইহা স্বাভাবিক। এইরূপ

দ্রষ্টব্য : ১৩৩৯ সালে আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'তে খগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিত 'বৈষ্ণব সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি' তখন শুধু রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিয়াই স্বীয় মাসিক কৃত্য সম্পাদনে ক্ষান্ত হইত না, রবীন্দ্রনাথের অনুকূল সমালোচনামূলক প্রবন্ধসমূহও ইহার আক্রমণের বিষয়ীভূত হইত। ঐ বৎসরেরই শ্রাবণের 'শনিবারের চিঠি'তে গোপালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে, পত্রাকারে লিখিত 'পাঁচ হাজারী ও ছ'হাজারী' শীর্ষক রচনাটিতে খগেন্দ্রনাথের উপর্যুক্ত প্রবন্ধটির তীব্র সমালোচনা করা হয়। ঐ দীর্ঘ প্রবন্ধটির অংশবিশেষ এখানে পুনর্মুদ্রিত হইল।

অজ্ঞতার একটি উদাহরণ মনে পড়িতেছে। রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়া বিশ্বের আসরে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করিলেন, তাহার কিছু পরে আমার একটি কবি-বন্ধুর সহিত কথা হইতেছিল। তিনি পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন, কাজেই তাঁহার নাম না-ই করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, 'রবিবাবুর কবিতা বৈষ্ণব কবিতার গন্ধে ভরপুর। তাহারই চর্বিতচর্বণে আজ ইউরোপে তাঁহার যশের দুন্দুভি বাজিয়াছে।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রবিবাবুর কোন্ কবিতার কথা বলিতেছেন? ভানুসিংহের পদাবলী? সেগুলির ত তরজমা হয়নি।' তিনি বলিলেন, 'না, তাঁহার অন্য কবিতার কথা বলিতেছি। রবিবাবুর সব কবিতায় চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির অমর মুদ্রাঙ্ক রহিয়াছে।' আমি ভাবিলাম, 'হয়ত বা ঠিক।' কারণ তখন বৈষ্ণব সাহিত্যের সহিত আমার বেশী পরিচয় ছিল না। পরে যখন বৈষ্ণব কবিতা পড়িতে লাগিলাম, তখন দেখিলাম যে বন্ধুবরের তীর লক্ষ্যের অনেক দূর দিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্র-কবিতায় বৈষ্ণব ভাবের ছায়া কতখানি পড়িয়াছে, তাহা বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয়। আমার মনে হয় যে, বিহারীলালের কবিতা ব্যতীত অন্য কোনও কবিতা রবীন্দ্রনাথের জীবনে তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, যেমন বৈষ্ণব কবিতা করিয়াছে। কবি নিজেও তাঁহার ঋণ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যদি বলা যায় যে, বৈষ্ণব কবিতার মূলধন লইয়াই রবীন্দ্রবাবুর কারবার, তাহা হইলে একটা প্রকাণ্ড সাহিত্যিক অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র। তাঁহার কতকগুলি গানে ও কবিতায় বৈষ্ণব কবিতার ছায়াপাত হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, রবীন্দ্রনাথের নাম বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতি-কবি বলিয়া চিরদিন উল্লিখিত হইবে। ভারতবর্ষ গীতি-কবিতার জন্য প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণব কবিতা যে গীতি-কবিতার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এই হিসাবে যদি বলা হয় যে, রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী তাহা হইলে অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রবাবুর ভাষায় বৈষ্ণব কবিতার অলস তরল গতি আছে, উহারই ন্যায় ছন্দবৈভব আছে। বৈষ্ণব কবির পর প্রেমের উজ্জ্বল মধুর ছবি আর কেহ এমন করিয়া আঁকিতে পারেন নাই। আর একটি মনোমুগ্ধকর সাদৃশ্য এই যে, বৈষ্ণব কবিতারই মত রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতা ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে এক সোনার সেতু নির্মাণ করিয়াছে—

"দেবতারে যাহা দিতে পারি,
তাই দিই মানবেরে ; আর পাব কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা !"

বৈষ্ণব কবি প্রিয়কে দেবতা করিতে চাহিবেন না, সত্য। কিন্তু মানবের প্রেম যে সেই অখণ্ড প্রেমের প্রাতিভাসিক বিকাশ, তাহা ভুলিলে চলিবে কেন ? আমরা যে রবীন্দ্র-কবিতার মধ্যে—বিশেষতঃ প্রেম সম্বন্ধীয় গীতি-কবিতাগুলির মধ্যে বৈষ্ণব কবিতার ছায়া ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে পাই না, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে বৈষ্ণব কবির প্রেমচিত্রের মধ্যে যাহা সার্বভৌম বা বিশ্বজনীন তাহারই উপলব্ধি করিতে হইবে।

প্রতিভাবান লেখক বা কবির রচনার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা পড়িলেই যেন কত পরিচিত, কত পুরাতন বলিয়া মনে হয়। মনে হয় যেন আরও কোথায়ও পড়িয়াছি বা শুনিয়াছি। নূতনত্ব সত্ত্বেও যে তাহারা অপরিচিতের মত আসিয়া মনের আঙ্গিনায় বিপ্লব বাধাইয়া দেয় না, ইহা একটি আশ্চর্য অথচ উপাদেয় সত্য। এই কারণে আমরা বিপুল রবীন্দ্র-সাহিত্যে যদি বৈষ্ণব কাব্য-প্রতিভার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই—ভাবি, তাহা হইলে তাহার অনুকূলে যথেষ্ট বলিবার আছে, কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের গৌরব বাড়াইবার জন্য বা রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক মৌলিকতা খর্ব করিবার জন্য যদি এইরূপ বলা হয়, তাহা হইলে সেরূপ চেষ্টার সমর্থন করা যায় না।

সেদিন একখানি মাসিক পত্রে দেখিলাম যে, "শ্রীরাধাই হইতেছেন রবি-বাবুর কাব্যের একমাত্র লক্ষ্য। রাধাই রবিবাবুর কাব্য-জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।" এ কথা শুনিলে রবীন্দ্রনাথ কিরূপ চমকিয়া উঠেন, তাহা দেখিতে কৌতূহল হয়। লেখক 'উর্বশী' কবিতায় এই রাধা-ভাবের একটা 'য়্যাসপেক্ট' দেখিয়াছেন।

"মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি দেয় পদে তপস্যার ফল।
তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল।"

* * *

"বিকশিত বিশ্ববাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার।"

ইহার মধ্যে লেখক শ্রীরাধাকে নিঃসন্দেহরূপে আবিষ্কার করিয়াছেন। যাঁহারা

এইভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার আলোচনা করিবেন, তাঁহারা যে ঐ কবিতার মধ্যে বৈষ্ণব কবিদের ছায়া ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতে পাইবেন না, ইহা বড় বিচিত্র নহে।

কিন্তু যাঁহারা 'প্রেমের অভিষেক' নামক কবিতাটি পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল প্রেমিকার ছবি দিয়া তাঁহার প্রেমের অমরাবতী সাজাইয়াছেন, তাহার মধ্যে শ্রীরাধার নামগন্ধ নাই। আছেন শকুন্তলা, দময়ন্তী, সুভদ্রা, আর আছেন তপস্বিনী মহাশ্বেতা ও পার্বতী। বলা বাহুল্য, বৈষ্ণব ভাবে অনুপ্রাণিত কোনও কবি রাধিকার চিত্র বাদ দিয়া প্রেমামরাবতী সাজাইবার কল্পনাও করিতে পারেন না। কেন-না, বৈষ্ণবের প্রেম-নন্দনকাননের কল্প-পারিজাত—শ্রীরাধা!

তবে বৈষ্ণব কবিদের অঙ্কিত চিত্রের যে মাধুর্য, যে 'অকথিত বাণী মূক মেদিনীর মর্মের মাঝে' সদাই জাগিয়া রহিয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-লুণ্ঠনকারী হৃদয়কে এড়াইবে কিরূপে? বৈষ্ণব-সাহিত্যের যাহা কিছু সুন্দর আছে, তাহাই তিনি আত্মসাৎ করিয়া বাংলার কাব্য-সাহিত্যকে অপূর্ব সম্পদ দান করিয়াছেন। আমি এস্থলে তাহারই কয়েকটি উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব।

'দেহের মিলন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানদাসের একটি প্রসিদ্ধ কবিতা হইতে ভাব ও ভাষা গ্রহণ করিয়াছেন—

'প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে'—জ্ঞানদাসের কবিতায় রাধা-হৃদয়ের ব্যাকুলতা-ভরা আবেগ বাসনা মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছে—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরান পুতলি মোর থির নাহি বাঁধে।"

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ইহারই কতকটা অনুবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়—

"তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন,
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে।
তৃষিত পরান আজি কাঁদিছে কাতরে
তোমারে সর্বাঙ্গ দিয়ে করিতে দর্শন।"—কড়ি ও কোমল

রবীন্দ্রনাথ যে জ্ঞানদাসের ভাবটি ফুটাইয়া তুলিলেও অনুকরণ করেন নাই, তাহা আর একটু অগ্রসর হইলেই ধরা পড়ে—

"আমার এ দেহ মন চির রাত্রি দিন
তোমার সর্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।"

ইহা ঠিক বৈষ্ণব ভাবের অনুকূল নহে। বৈষ্ণবের প্রেম বিলয় কামনা করে না। বৈষ্ণবের মতে প্রেমিক ও প্রেমিকার, ভক্ত ও ভগবানের, উপাস্য ও উপাসকের চির ব্যবধানই অনুরাগের তীব্রতা ও গাঢ়তা অক্ষুণ্ণ রাখে।

"বড় সাধে জ্বালিনু দীপ গাঁথিনু মালা
চির দিনে বঁধু পাইনু হে তব দরশন।"[১] (গান)

এই যে 'চিরদিনে'র দর্শন পাওয়া—ইহা কেবল তিনিই লিখিতে পারেন, যিনি বিদ্যাপতির পদের সহিত পরিচিত।

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥"

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু এই পদ গায়িয়া স্বগৃহে শ্রীচৈতন্যের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। 'বড় সাধে জ্বালিনু দীপ গাঁথিনু মালা' পড়িলেই মনে পড়ে—

"বঁধুর লাগিয়া শেজ বিছায়লু
গাঁথিলু ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজালুঁ দীপ উজারলুঁ
মন্দির হইল আলা॥"—বড়ু চণ্ডীদাস

রবীন্দ্রনাথের—

১। তথাহি শেষেন্দ্রিয়বৃত্তিরাসাং সর্বাত্মনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা।

—রঘুবংশ, সপ্তম।

চিত্তলোভী নৈনধার অতিহী সুন্দর কহাঁ বহ
সিন্ধু ছবি হৈ অগাধা।
রোম জিতনে অঙ্গ নৈন হোতে সঙ্গ রূপ লেতী
নিদরি কহত রাধা॥—সুরদাস

শ্রীরাধা বলিতেছেন—আমার প্রতি রোম যদি চক্ষু হইত, তাহা হইলে সাধ মিটাইয়া তাঁহার রূপ দেখিতাম।

"এত প্রেম আশা প্রাণের তিয়াষা
কেমনে আছে সে পাসরি।
সেথা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী
সেথা কি বাজে না বাঁশরী॥"

'ক মুরলীরবঃ ক মু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ' স্মরণ করাইয়া দেয় নাকি?'

'ভানুসিংহের পদাবলী' কবির কাব্যকুঞ্জে প্রভাতী-সংগীত। তিনি সেই প্রথম যৌবনে বৈষ্ণব কবিদের ভাব ভাষা ও সংগীতের মধ্যে যত কিছু সুন্দর আছে, তাহা নিঃশেষে লুটিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায় যে, বৈষ্ণব কবিতার তরলিত গতি তাঁহার অনুভূতিপ্রবণ হৃদয়ে কি অপূর্ব মাধুর্যের ঢেউ বহাইয়া দিয়াছিল! আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাংলার আর একজন শ্রেষ্ঠ কবিও বৈষ্ণব কবিতার দ্বারা এইরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মাইকেলের 'ব্রজাঙ্গনা' পরিণত বয়সের রচনা। বৈষ্ণব কবিতার ভাষা ও ছন্দ তাঁহারও প্রাণে মাধুর্যের ঝংকার তুলিয়াছিল। তাঁহার ধর্মমত, শিক্ষাদীক্ষা, আচার-ব্যবহার সমস্তই বৈষ্ণব ভাবের প্রতিকূল ছিল। কিন্তু তাঁহার কবি-হৃদয় সে-সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সৌন্দর্যের সন্ধানে অভিসারে ছুটিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথকেও আমরা দেখিতে পাই নানা প্রতিকূল অবস্থানের মধ্যে থাকিয়াও তিনি সৌন্দর্যের আহ্বানে বৈষ্ণব কবির পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন—

"এখনও তারে চোখে দেখিনি
শুধু বাঁশী শুনেছি।"

পড়িলেই মনে পড়ে—

"কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কানে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি কি মাধুর্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে প্রাণে॥"—অজ্ঞাত পদকর্তা

আর—

"ঐ বুঝি বাঁশী বাজে
বনমাঝে কি মনোমাঝে।"

পড়িলে সেই বিরহব্যাকুলা রাধার চকিত চাহনি মনে পড়ে না কি?

"বেলা যে পড়ে এল জলকে চল্।"

অথবা—

"কেন বাজাও কাঁকন কন কন
কত ছলভরে।"

যেন একখানি জীবন্ত ছবি আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করে। সেই যমুনা-তীরের নীপনিকুঞ্জ, সেই কদম্ব-কেতকী যূথীর পরাগমাখা সৌরভ, সেই বাঁশীর আকুল আহ্বান আর গৃহকর্মে শৃঙ্খলিতা অথচ মন যার নিমেষে শতবার 'কদম্বকাননে ধায়' এমন একখানি রমণীর চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।

"বঁধু হে ফিরে এস!
আমার সজল জলদ স্নিগ্ধ কান্ত সুন্দর ফিরে এস।"

এ শুধু আধুনিক কীর্তন নহে; বৈষ্ণব কবিতার জলতরঙ্গ সংগীতে যাহাদের কান বাঁধা, তাহারা যে ইহাতে সেই বৈষ্ণব কবিতারই সুর শুনিতে পায়, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।২

এমনি এবং আরও কত ভাবে বৈষ্ণব কবিতার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছে। তিনি নিপুণ জহুরীর ন্যায় বৈষ্ণব কবিতার ভাণ্ডারে যে সকল মণিমাণিক্য ছড়ান আছে, তাহা চুনিয়া চুনিয়া নিজের কবিতা-লক্ষ্মীকে সাজাইতে চাহিয়াছিলেন।

"কো তুঁহু বোলবি মোয়।"

একটি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিতার একটি কলি বা অংশ গ্রহণ করিয়া তিনি কেমন সুন্দর ভাবে তাহার অন্তরতম ভাবটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শ্রীরাধা বলিতেছেন—

"হাতক দরপণ মাথক ফুল। পাখীক পাখ মীনক পানি।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল। জীবক জীবন হাম তুহুঁ জানি।
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার। তুঁহুঁ কৈছে মাধব কহ তুঁহুঁ মোয়।
দেহক সরবস গেহক সার। বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ দোঁহা হোয়॥"

২। কালিদাস নাগ তাঁহার 'সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন—
"...রবীন্দ্রনাথের সুর-বিন্যাস বাংলার নিজস্ব ভাটিয়ালি, কীর্তন ও বাউলের প্রাণশক্তিতে ভরপুর।"

—তুমি আমার হাতের দর্পণ, মাথার ফুল, আঁখির অঞ্জন, মুখের তাম্বুল, হৃদয়ের মৃগমদশোভা্তি, গ্রীবার হার, দেহের সর্বস্ব এবং গৃহের সার। পাখীর পাখা যেমন, মাছের পক্ষে জল যেমন, জীবের জীবন যেমন, তেমনই আমার তুমি। (তবু) হে মাধব, তুমি আমায় বল, তুমি কেমন—

"তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।"

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়—তুমি কে আমাকে বলিয়া দাও। তোমার বাঁশীর স্বর বিষামৃতে মিশানো, ('মুরলী বাজায় যেন বিষামৃতে একত্র করিয়া'—অজ্ঞাত পদকর্তা) তোমার হাসি দেখিয়া ঋতুরাজ বসন্ত ছুটিয়া আসিল, ত্রিভুবন চরণ-কমল ছুঁইবার আশে বিভ্রান্ত মধুকরের মত ধাইল, বলিয়া দাও, তুমি কে! কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়। বৈষ্ণব কবিতার একটি কলির অর্ধাংশ নিজ কবিতায় গাঁথিয়া তাহাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিবার যে পদ্ধতি, তাহা নূতন নহে। সার এড্উইন আরনল্ড্ও গীতগোবিন্দের ছন্দে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ইংরেজী কবিতায় এইরূপ একটি কলি জুড়িয়া দিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই—

"The lesson that thy faithful love has taught him
He has heard ;
The wind of spring, obeying thee has brought him
At thy word ;
What joy in all the three worlds was so precious
To thy mind ?
Ma kooroo Manini Manamaye
Ah, be kind !"

—The Indian Song of Songs

ইহা ঠিক অনুবাদ না হইলেও জয়দেবের ঝংকার যেন কতকটা তুলিতে পারিয়াছে। জয়দেবের কবিতায় 'মাধবে মাকুরু মানিনি মানময়ে' যেমন 'ধ্রু' কলি, অর্থাৎ প্রত্যেক যুগ্মের পরে গায়িতে হয়, আরনল্ডও সেইরূপ প্রত্যেক stanza-র শেষে ঐ কলিটি দিয়া জয়দেবের ছন্দ ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়' কলিটিও রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক stanza-র পরে 'ধ্রু' কলির মত প্রযুক্ত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের আর একটি কবিতায় ব্রজবুলির সুন্দর অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়—

"মরণরে তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।"

এই কবিতায় কবি বলিতেছেন, হে মরণ, তুমি আমার শ্যামের সমান। অর্থাৎ আমি তোমাকেই বরণ করিলাম। শ্যাম নির্দয় হইলেও তুমি আমাকে ভুলিয়া থাকিবে না, তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে না; রাধার হৃদয় তুমি কখনও ভাঙ্গিয়া দিবে না।

বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুলা রাধাকে দিয়া অন্য ভাবে এই একই কথা বলাইয়াছেন—

"এ সখি বিরহ মরণ নিরদন্দ।
ঐছনে মিলই যব গোকুল চন্দ।
যাহাঁ পহুঁ অরুণ চরণে চলি য়াত।
তাহাঁ তাহাঁ ধরণি হইয়ে মবু গাত।"—গোবিন্দদাস

—হে সখি, আজ মৃত্যু ও বিরহের মধ্যে যে কলহ তাহা চুকিয়া যাউক।[৩] যদি ঐভাবে গোকুলচন্দ্রের সহিত মিলন ঘটে। (মৃত্যু হইলে আমার দেহের পঞ্চভূত পঞ্চ মহাভূতে মিশিয়া যাইবে, তখন যেন) প্রভু আমার যেখানে রাঙ্গা চরণ ফেলিয়া চলিয়া যান, আমার দেহের মৃত্তিকা যেন সেখানকার মৃত্তিকা হয়। তিনি যে-সরোবরে স্নান করেন, আমার দেহ যেন সেই সরোবরের জল হইয়া তরঙ্গে তরঙ্গে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া শীতল করে।

এখানে একটি কথা এই যে, বৈষ্ণব কবির সহিত সাদৃশ্য সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন। কারণ বৈষ্ণব কবির প্রভাবে প্রভাবিত কোনও কবি হয়ত মরণকে শ্যামের সহিত তুলনা করিতেন না। শ্যাম অতুলনীয়, নিরুপম।

"মধু রিপু সম নহি দেখিও সোহাওন
জে দিঅ তহিক উপামরে।"—বিদ্যাপতি

৩। বিরহে মরণমেব নির্দ্বন্দ্বং নির্বিরোধমিত্যর্থঃ—রাধামোহন ঠাকুরের টীকা। অর্থাৎ এতদিন আমার দেহ লইয়া মৃত্যু ও বিরহের মধ্যে যে কলহ বা বিরোধ চলিতেছিল, তাহা শান্ত হউক। কৃষ্ণবিরহে মরণ অনুকূল হউক।

মধু রিপুর তুল্য সুন্দর দেখি না যে তাঁহার উপমা দিব।

(নগেন্দ্রবাবুর অনুবাদ)

মরণ যখন একান্ত কামনার বিষয় হয়, তখন সে কেবল 'ঐছন মিলই যব গোকুল চন্দ'—তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য। নহিলে মরণ কে চায়?

"হরি-লালসে তনু তেজব পাওব আন জনমে।"—শশিশেখর

বৈষ্ণব কবিতার তরল সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথ বহু পরিমাণে আয়ত্ত করিয়া থাকিলেও তাহাতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য খর্ব করিতে পারে নাই, নানা কারণে। প্রতিকূল বেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়াও তিনি বৈষ্ণব কবিদিগের ভাব, ভাষা ও ছন্দ যতদূর ধরিতে পারিয়াছেন, আর কোনও কবি তাহা পারেন না। এইখানেই তাঁহার অপূর্ব সৃষ্টি-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-সাহিত্য বা অন্য কোনও সাহিত্য হইতে তিনি যদি উপকরণ লইয়া নিজের অনন্যসাধারণ অনুভূতির রসে পাক করিয়া পরিবেষণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাতে কোনও হানি নাই। জয়দেবের গীতি-কবিতা হইতে রস সংগ্রহ করিয়া চণ্ডীদাস যে তাঁহার অমর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার কবি-যশ একটুও ম্লান হয় নাই। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির অনুকরণ করিয়াও বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে অবলীলাক্রমে একটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের ধনে ধনী হইয়াও অমরতা লাভ করিয়াছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতার নিকটে কি পরিমাণে ঋণী। এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে একাধিক ব্যক্তির সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। কোথায় কোন্ কবিতায় বৈষ্ণব কবিতার আভাস আছে, কোথায় কোন্ গানে কীর্তনের সুর বাজে, ইহা নির্দেশ করিতে হইলে বহুকালব্যাপী গবেষণা আবশ্যক। অসামান্য শিল্পী রবীন্দ্রনাথের চিত্তবিকাশের ইতিহাস যেদিন গ্রথিত হইবে, সেদিন বুঝিতে পারা যাইবে বৈষ্ণব কবিদের সহিত রবীন্দ্র-নাথের জ্ঞাতিত্ব কোথায় ও কতখানি।

বৈষ্ণব কবিতার সহিত রবীন্দ্র-সাহিত্যের সাদৃশ্য যতই থাক, ইহা বলিতেই হইবে যে, সে-সাদৃশ্য ঐ সাহিত্যের অতি অল্প অংশ।[৪] রবীন্দ্রনাথ কাব্যে গানে

৪। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার 'দি পোয়েট্রি অফ্ টেগোর' শীর্ষক ইংরেজী প্রবন্ধের একস্থলে ভিন্ন মত উল্লেখ করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তিনি এক আশ্চর্য রূপবোধ ও

নাটকে ও প্রহসনে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে ও আলোচনায় যে বিরাট সৃষ্টিশিল্পের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার মধ্যে বৈষ্ণব কবিতার ছায়া অল্পই স্থান অধিকার করিয়া আছে। যে অপূর্ব কাব্যভোজে তিনি আমাদিগকে তৃপ্ত করিয়াছেন, তাহাতে নানা রসের পরিবেষণ হইয়াছে। বৃন্দাবনের মনোহরা তাহাতে একমাত্র মিষ্টান্ন নহে।

বৈষ্ণব কবিতার প্রতি কবির যে অসাধারণ অনুরাগ আছে, তাহার বহু প্রমাণ তাঁহার লেখা হইতে সংগ্রহ করা যায়।[৫] বাউল ও কীর্তনের সৌন্দর্য তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার 'বৈষ্ণব কবিতা' শীর্ষক কবিতা অভ্রান্তভাবে তাঁহার শ্রদ্ধা ও উদারতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে—

"এ গীতি-উৎসব মাঝে
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জনে বিরাজে ;"—

এ উক্তি মুগ্ধ ভক্তের উক্তি, শ্রদ্ধার প্রস্ফুট কুসুম-সম্ভার। আমার মনে হয় কোনও কবি, কোনও কালে বৈষ্ণব কবিকে এইরূপ মর্যাদা দান করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু যতই হোক, এই 'বৈষ্ণব কবিতা' পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, পথের কোন্‌খানে মহাজনদের সহিত রবীন্দ্রনাথের ছাড়াছাড়ি হইল। কবি প্রশ্ন করিতেছেন—

"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?
…এ কি শুধু দেবতার ?"

মৌলিকতার সঙ্গে বৈষ্ণব কবিতাকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার অন্তর্লোকে প্রবেশ করিয়াছেন ও তাহার স্বরূপ বজায় রাখিয়াও তাহাকে যুগোপযোগী করিয়া নবভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।"—মূল ইংরেজী প্রবন্ধটি মহেন্দ্র কুলশ্রেষ্ঠ সম্পাদিত 'টেগোর সেনটিনারী ভল্যুম,'-এ সাধু আশ্রম, হোসিয়াপুর হইতে বিশ্বেশ্বরানন্দ ভি, আর, ইনষ্টিট্যুট কর্তৃক (১৯৬১, মূল্য ১৬৲, পৃ. ৩৮৫) অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভূমিকা হুমায়ুন কবির কর্তৃক লিখিত।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও তাঁহার রচিত 'রবীন্দ্রনাথ' নামক প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দের উক্তির সমর্থনে একস্থানে লিখিয়াছেন—

"রবীন্দ্রনাথের সত্যকার যে কবিমূর্তি, তাহা সেই বাংলার বৈষ্ণব কবিরই প্রতিচ্ছবি।…সেইজন্যই তাঁহার প্রেম ও ধর্মবিষয়ক সংগীতগুলিতে বৈষ্ণবভাব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।"—'জয়ন্তী-উৎসর্গ' সংকলন-গ্রন্থ, প্রকাশকাল ১৩৩৮

৫। কাজী আবদুল ওদুদের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—"বৈষ্ণব পদাবলী কতটা যত্ন নিয়ে তিনি পড়েছেন, তার পরিচয় রয়েছে তাঁর 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে'।"—'রবীন্দ্রনাথ : বাল্য ও কৈশোর'।

তিনি বলিতে চাহেন—

"বৈষ্ণব কবির গাথা প্রেম-উপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্য পথে নরনারী
অক্ষয় সে সুধারাশি করি কাড়াকাড়ি
লইতেছে আপনার প্রিয়গৃহতরে"…

এইখানেই কবি বৈষ্ণব ভাব পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে গেলেন।

"কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে"…

ইহা শুনিতে যতই সুন্দর হউক, বৈষ্ণবের ভাব এখানে রক্ষিত হইল না। কে প্রিয়? কার তরে এই গান? বৈষ্ণব বলিবেন—তাঁহার প্রিয়তমের জন্য, চির কিশোর-কিশোরীর নিমিত্ত—মানুষের জন্য কথনও নহে। যাহা অনিত্য, যাহা মরণশীল, তাহা প্রেমের বিষয় হইতে পারে না। কাম ও প্রেম, লালসা ও প্রীতি পৃথক বস্তু। কাম-লালসা পার্থিব নশ্বর, সংসারেরই মত অনিত্য। প্রেম, প্রীতি স্বর্গীয়? না; একমাত্র বৃন্দাবনের সামগ্রী। বৃন্দাবনের বাহিরে প্রেমতরু বাঁচে না। ইহাকে ব্রজছাড়া করিও না; তাহাতে প্রেমও থাকিবে না, তোমারও বিপদ হইবে।

"ব্রজ বিনা অন্যত্র ঞিহার নাহি বাস।"—চৈতন্যচরিতামৃত

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ভাব ছুঁই ছুঁই করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি গোবিন্দের মন্দিরের অনতিদূরেই তাঁহার তাজমহল নির্মাণ করিয়াছেন। দুই-ই অপূর্ব, দুই-ই সুন্দর। রবীন্দ্রের কাব্য শুধু ভক্তের জন্য নহে, তাঁহার সংগীত সবই ধর্মসংগীত নহে। তাঁহার বহু কবিতা আছে, যাহা বৈষ্ণব ভাবের ধার ধারে না। মানব-চিত্তের কোমল বৃত্তিগুলি অসামান্য অনুভূতির বলে তিনি যেমন করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, এমন কোনও কবি পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। প্রকৃতির নব নব বিভ্রমশালী সৌন্দর্য তাঁহার কবিতায় যেমন রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, এমন বৈষ্ণব কবিতায় নহে। তাঁহার 'অন্তর্যামী' 'জীবনদেবতা' উপমাহীন। তাঁহার বহু কবিতা সৌন্দর্য ও মাধুর্যরসে ভরপুর, অথচ তাহাতে বৈষ্ণব কবিতার গন্ধমাত্র নাই।

পাঁচ হাজারী ও ছ'হাজারী

গোপালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

খগেন্দ্রনাথ যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালার কেদারায় বসিবেন তিনি, তাহা পূর্ব হইতেই জানিতেন। রবীন্দ্রনাথ যে তাহার মলাট হইবেন একথাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং মুখ শোঁকাশুঁকি হিসাবে তিনি একদা রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনায় আকাঙ্ক্ষিত হইলেন। এ্যাং যায়, ব্যাং যায়, খলিসাই কি বসিয়া থাকিবে? রবীন্দ্রনাথকে সন্তুষ্ট করা হইবে, মৌলিক গবেষণা করা হইবে, মাসিক কাগজে নাম ছাপানো হইবে, লোককে একটুখানি ধাপ্পা দেওয়া হইবে, বোষ্টম বাবাজী ব্রজবাসীর দল খুসী হইবে, হয় তো বা দুটা পয়সাও হইবে, এইরূপ কত হইবে যে ঐ প্রবন্ধের ভ্রূণরূপে সম্ভাবনা দিয়াছে, তাহা আমাদের মত লোকে কি বুঝিবে?

এই প্রবন্ধটির নাম 'বৈষ্ণব সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ', গত আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে খগেন্দ্রবাবু প্রসঙ্গত কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা এবং তাঁহার উপর বৈষ্ণব কবিতার প্রভাব সম্বন্ধে অনেক কিছু মন্তব্য করিয়াছেন। অর্থাৎ খগেন্দ্রবাবুর যে এ-পিঠ ও-পিঠ দুই পিঠই একেবারেই সমান, তিনি বৈষ্ণব সাহিত্য ও রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে বেপরোয়া বিশেষ-অজ্ঞ, প্রবন্ধটিতে প্রতিজ্ঞাপূর্বক তাহার পরিচয় দিয়াছেন।

খগেন্দ্রবাবু বলিতেছেন, সেদিন কে একজন লেখক নাকি লিখিয়াছেন—"শ্রীরাধাই হইতেছেন রবিবাবুর কাব্যের একমাত্র লক্ষ্য, রাধাই রবিবাবুর কাব্য-জীবনে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।" এইটুকু পড়িয়া খগেন্দ্রবাবুর যে ভাবান্তর হইয়াছে, প্রবাসী মারফৎ তিনি তাহা দেশবাসীর গোচরীভূত করিয়াছেন। খগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—"একথা শুনিলে রবীন্দ্রনাথ কিরূপ চমকিয়া উঠেন তাহা দেখিতে কৌতুহল হয়।" এ কৌতুহল খগেন্দ্রবাবুর স্বাভাবিক, আমরা ভরসা করি, এখন মাঝে মাঝে তাঁহার এ কৌতুহল চরিতার্থ হইবে।...

খগেন্দ্রবাবু একটু তদ্‌গদ চিত্তের লোক। যদিও দীনেশচন্দ্রের মত ছিঁচ-কাঁদুনে নহেন, অকস্মাৎ কাঁদিয়া বসেন না, কথায় কথায় ছল-ছল ভাব

---

* দ্রষ্টব্য : খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'বৈষ্ণব সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ' নামক পূর্ব-প্রবন্ধের প্রসঙ্গে 'শনিবারের চিঠিতে' প্রকাশিত এই শ্লেষাত্মক রচনাটির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা ১৩৩৯ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয়।

আনিতে পারেন না, তথাপি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে বিস্মৃত হন না আলোচ্য প্রবন্ধেও একটু অ-সামান্য হইয়াছেন।...

বৈষ্ণব সাহিত্যের পরিধি বালীগঞ্জ হইতে বহুগুণে বৃহত্তম। রায় বাহাদুর এবং এম, এ ডিগ্রী তাহাকে অধিগত করিবার উপায় নহে। বৈষ্ণব দর্শন, বৈষ্ণব রসশাস্ত্র, বৈষ্ণব পদাবলী জলধির মতই অপরিমেয়। যে বিদ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়কে বধ করা যায়, সেনেটের সদস্যদের ঘায়েল করা যায়, সে বিদ্যায় বৈষ্ণব সাহিত্য আয়ত্ত করা যায় না। 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'। রবীন্দ্র-সাহিত্যও বিরাটত্বে কম নহে। ধর্মের পাণ্ডা রবীন্দ্রনাথ, পত্রধারায় হিন্দু ধর্মের মুণ্ডভোজী রবীন্দ্রনাথ, ঋষি রবীন্দ্রনাথ, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতীর (বিশ্ব—বা রথীর) জমিদার রবীন্দ্রনাথ, বিশ্ববিদ্যালয়ের নোকর রবীন্দ্রনাথকে হয় তো মনের দুঃখে সময়ে সময়ে জায়-বেজায় বলিয়া ফেলি, কিন্তু মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে আমি শ্রদ্ধা করি। রবীন্দ্র সাহিত্য হেঁজিপেঁজির জিনিস নহে, খগেন্দ্রবাবুর বিদ্যায় রবীন্দ্র সাহিত্যকে কাবু করা চলিবে না। তাঁহাকে আরো অধিক পড়াশুনা করিতে হইবে, খাটিতে হইবে। শুশ্রূষু হইয়া গুরুমুখ হইতে বুঝিয়া লইতে হইবে। তবে যদি তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যে, তথা রবীন্দ্র সাহিত্যে কিঞ্চিৎ প্রবেশলাভ করিতে পারেন। তাঁহার খোলন্দাজ গুরু একমাত্র ব্রজবাসীর সাহায্যেই এসব জিনিসে বিশেষজ্ঞ হওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথ

দীনেশচন্দ্র সেন

কুমিল্লায় ১৮৯৬ সনে যখন আমি উৎকট রোগ-শয্যায় পড়িয়াছিলাম, এবং যখন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রথম প্রকাশিত হয়,—সেই সময় অর্থাৎ ২৫ বৎসর পূর্বে, আমি রবীন্দ্রবাবুর একখানি চিঠি পাইয়াছিলাম। তাহা একটা গৌরবের জিনিস বলিয়া আমি অনেক দিন রাখিয়া দিয়াছিলাম। ছোট

দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেনের এই রচনাটি তাঁহার 'ঘরের কথা ও যুগ-সাহিত্য' নামক পুস্তক হইতে গৃহীত। (প্রকাশক: শিশির পাবলিশিং হাউস, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রকাশের তারিখ বা মূল্যের উল্লেখ নাই। গ্রন্থকারের ভূমিকায় শেষে ১লা বৈশাখ, ১৩২১ সাল

একখানি কাগজ দোভাঁজ করিয়া মুক্তার মত হরফে কবিবর লিখিয়াছিলেন, সেই প্রত্যেকটি হরফ আমার নিকট মুক্তার মত মূল্যবান বলিয়া মনে হইয়াছিল। বঙ্গ-সাহিত্যের রাজার অভিনন্দন সেই রাজ্যে নূতন প্রবেশার্থীর পক্ষে কত আদর সম্মানের, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রথমবার কলিকাতায় আসিয়া একটি বছর ছিলাম, তখন আমি শয্যাগত,—রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয় নাই। ফরিদপুর থাকা কালে তিনি তাঁহার 'ক্ষণিকা' আমাকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন, আমার মন্তব্যসম্বলিত চিঠির উত্তরে বাং ১৩০৭ সনের ৩০শে ভাদ্র তারিখে তিনি লিখিয়াছিলেন—"আপনার সমালোচনাটি কবির পক্ষে কত যে উপাদেয় হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। অসুস্থ শরীরে যে এই পত্রখানি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, সেজন্য আমার অন্তরের ধন্যবাদ জানিবেন।"…

এই সময় হইতে আমাদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে পত্র-ব্যবহার চলিয়াছিল। / ১৯০১ সনে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইয়া আমি জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে দেখা করি। রবিবাবু শ্রেষ্ঠ কবি শ্রেষ্ঠ লেখক; অপরাপর লেখকের কাব্য পড়িলেই তাঁর মধ্যে যাহা ভাল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর সমস্ত লেখা পাঠ করিলেও তাঁর সম্বন্ধে অনেক জানিবার বাকী থাকে; তিনি রূপ দিয়া চক্ষু ভুলান, "গুণে আঁখি ঝরে।"[১] কণ্ঠস্বরের মিষ্টত্ব, বন্ধুর সহৃদয়তা ও ঋষিতুল্য ধর্ম-ভাব দিয়া মন হরণ করেন,—

উল্লিখিত হইয়াছে। পৃ. ৪৪৯) এই গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র মূলতঃ আত্মকথা বর্ণনা করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গতঃ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখ যে সকল কবি ও মনীষীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাহাদিগের স্মৃতি-চিত্র আঁকিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন; এই প্রবন্ধের মধ্যে তাহার বহু নিদর্শন আছে। অধিকন্তু বিরুদ্ধ-সমালোচকদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উদার মনোভাবের পরিচয় হিসাবেও এই প্রবন্ধটির একটি স্বতন্ত্র মূল্য স্বীকৃত হয়।

সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন একস্থানে তাঁহার ইংরেজী রচনার মধ্যে এই মর্মে লিখিয়াছেন—

১। "কবির ব্যক্তি-সত্তা ছিল প্রাণশক্তির দীপ্যমান আধার। দীর্ঘায়ত সুঠাম দেহ, রাজকীয় মহিমায় ভাস্বর। কুঞ্চিতকেশ শোভন-শ্মশ্রু এই শান্তসমাহিত মূর্তি যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা সকলেই অভিভূত হয়েছেন।"—'বরপুত্র রবীন্দ্রনাথ', (অনুবাদ: বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়: 'চতুরঙ্গ', কার্তিক-১৩৬৮)।

তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার পর অন্য সমস্ত প্রসঙ্গ ছায়ার ন্যায় মন হইতে চলিয়া যায়, এবং ছবির মত তিনি সমগ্র মনটি দখল করিয়া বসেন।[২] কত দিন আমার ন্যায় শ্রোতার সম্মুখে সারাটি দিন বীণা-নিন্দিত সুরে তিনি গান গাইয়া কাটাইয়াছেন,—কত দিন সাহিত্য-ধর্ম-সমাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা চলিয়াছে; তিনি নিত্যই নূতন হইয়া দেখা দিয়াছেন।[৩]...তাঁহার স্নিগ্ধ শ্লেষ ও বাক্‌চাতুরী অনেকেই টের পাইবেন, যাহাকে ইংরেজীতে Pun বলে, তিনি কথাবার্তায় অলংকার-শাস্ত্রের সেই ধারাটি সর্বদা ব্যবহার করেন।... এই চাতুরী তিনি মিষ্টভাবে—নিপুণভাবে এত বহুল পরিমাণে দেখাইয়া থাকেন, যে তাহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি শব্দটির প্রতি যে তাঁহার সর্বদা লক্ষ্য—তাহা টের পাওয়া যায়।

আমার সঙ্গে পরিচয়ের পর তিনি 'চোখের বালি' লিখিতে সুরু করেন। একবার তিনি আমাকে বোলপুরে যাইতে সাদর আহ্বান পাঠাইয়া লিখিয়াছিলেন—(১২ই বৈশাখ, ১৩০৯) "আপনি এবার আমার এলাকার মধ্যে আসিয়া পড়িলে তাহার পরে যে কাণ্ডটা করা যাইবে সে আমার মনেই আছে। তাই বলিয়া বিনোদিনীর রহস্য-নিকেতনে আপনাকে অকালে প্রবেশ করিতে দেওয়া আমার সম্পাদক-ধর্ম-সংগত হইবে কি না, তাহা এখনো স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যাহা হউক আর বিলম্ব করিবেন না,—পুঁথিপত্র সহ লুপমেলের গাড়িতে চড়িয়া বসুন, তাহার পর আর আপনাকে কে নিবারণ করিতে পারে?" কিন্তু 'চোখের বালি' তিনি কিস্তিতে কিস্তিতে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইবার পূর্বে আমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন, বিনোদিনীর রহস্য-নিকেতনে আমাকে প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন। 'গোরা'রও অনেকটা

২। দিলীপকুমার রায়ের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার 'তীর্থংকর' গ্রন্থের একস্থানে বলিয়াছেন—"কবির কথাগুলি শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে পড়ি—তাঁর কণ্ঠস্বরের স্নিগ্ধতায়, উপমায়, চাহনিতে এক কথায় সব জড়িয়ে তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের মহিমায়।"

৩। নলিনীকান্ত গুপ্ত তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা' প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গের সমর্থনে বলিয়াছেন—"রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে একটা চির-তারুণ্যের গতি, যৌবনরসে উচ্ছল ছন্দ বহমান, তাহার ধর্মই নিত্য নূতনের দিকে চলা, অজানার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করা—সবুজকে সাদর বরণ করা।"

ছাপা হইবার পূর্বে আমি তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম। প্রেম খুব বড় বড় তুলিতে মোটা মোটা রেখায় আমাদের সাহিত্যে ইতিপূর্বে আঁকা হইয়াছে। খুব গভীর ভাবের সঙ্গে অসামান্য সৌন্দর্যজ্ঞানের পরিচয় বৈষ্ণব কবিরা দিয়াছেন,—কিন্তু বিনোদিনী প্রভৃতি চিত্রের মধ্যে যে খোদকারী আছে, তাহা একান্ত অভিনব, এ যেন ঢাকাই সেকরার তারের কাজ,—প্রেম জিনিসটাকে কারু-কার্যের এমন নিপুণ সৌন্দর্য দিয়া তিনি আঁকিয়াছেন, যে তাহা চোখ ধাঁধিয়া দেয়। প্রেমিকার চুলের গন্ধ, পঠিত পুস্তকের উপর সুগন্ধ তেলের দাগ, এবং মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোমল রেখা—স্বপ্নের জিনিস, যেন অলক্তকের আলপনার মত, তাহা বিধিসৃষ্ট নারীকে নূতন করিয়া দেখাইতেছে।

এই শিল্প-কলা বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছে। আমি নৌকাডুবি, চোখের বালি, ও গোরা পড়ি নাই, রবিবাবুর মুখে শুনিয়াছিলাম, তেমন আগ্রহে ইহার পূর্বে কোন বই শুনি নাই। কবির লেখা গীত হয় নাই, বাদিত হয় নাই, কিন্তু তথাপি বীণাবেণুর কথাই সর্বদা মনে জাগাইয়া দিয়াছে।—যেন বীণাপাণি নূপুরশিঞ্জিত পদে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছেন, এই পুস্তকত্রয়ের নর্তনশীল গদ্য ছন্দের গতি আমাব নিকট তেমনই বোধ হইতেছিল। আমি নৈতিক আদর্শের কথা আনিব না,—অপেক্ষাকৃত অল্পদরের লেখকরা যখন রসের নামে ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেয়—তখন সে রসের নাম হয় বীভৎস। কিন্তু প্রকৃতই যদি কেহ সুরসিক হন, তবে তিনি মানুষের মনটা লইয়া পুতুলখেলা খেলিতে পারেন—তাহাও কি আবার যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে হইবে।…

রবীন্দ্রবাবুর সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক গুণ—তাঁহার ভগবৎপ্রীতি, ইহাই তাঁহার নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, খেয়া প্রভৃতি কাব্যের ছত্রগুলিকে এত উজ্জ্বল করিয়াছে।[৪]

৪। প্রবোধচন্দ্র বাগচী তাঁহার 'মিসটিক রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে কবির সত্যোপলব্ধি ও ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে একস্থানে 'গীতাঞ্জলি' ও 'গীতিমাল্য' পর্বের কথায় বলিয়াছেন,—

"এ পর্বে কবি সীমার চেয়ে অসীমের দিকে বেশী ঝুঁকেছেন। সংসারের চেয়ে অধ্যাত্মলোকে। তাই দেখা যায়, যাঁকে তিনি পেতে চান তাঁকে 'প্রভু' 'নাথ' 'রাজা' ইত্যাদি নামে ডেকেছেন। এখানে আত্মনিবেদনের ভাবটাই প্রধান, রাধা যেমন করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পায়ে।"—'দেশ' সাহিত্য-সংখ্যা, ১৩৫৩

এই ভগবৎ-প্রীতি তাঁহাকে মনুষ্য-সমাজ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেয় নাই, বরং সমস্ত মনুষ্য-সমাজ, এমন কি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সঙ্গে তাঁহার নৈকট্য ঘনীভূত করিয়া আনন্দরস-সিক্ত করিয়া দিয়াছে[৫]—ইহা শুধু প্রতিভায় স্ফুরিত আকস্মিক আলো নহে—ইহা তাঁহার জীবনের কথা, তাঁহার সাধনা,—তাঁহার বহু চিঠিপত্র আমার নিকট আছে; এই পত্রগুলিতে অনেকের মধ্যেই সেই সাধকের তপস্যা ব্যক্ত হইয়াছে।[৬] তাঁহার বিরুদ্ধে একবার কোন লোক বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং ক্রমাগত বিদ্বেষের বিষ পত্রিকায় বর্ষণ করিতেছিলেন। আমি তৎপ্রসঙ্গে তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম, উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন (২০শে বৈশাখ, ১৩০৯) "পত্রে আপনি যে কথার আভাসমাত্র দিয়া চুপ করিয়াছেন, সে কথাটা আমার গোচর হইয়াছে। লেখাটা আমি পড়ি নাই—আমার দৃষ্টিপথে আনিতে নিষেধ করিয়াছি, কারণ লেখকজাতির অভিমান সহজেই আঘাত পায়, অথচ এরূপ আঘাতের মধ্যে লজ্জার কারণ আছে। নিজেকে সেই গ্লানিকর অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমি কথিত বা লিখিত গালিমন্দের কথা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করি। বিদ্বেষে কোন সুখ নাই, কোন শ্লাঘা নাই, এই জন্য বিদ্বেষ্টার প্রতিও যাহাতে বিদ্বেষ না আসে, আমি তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকি। জীবন-প্রদীপের তেল ত খুব বেশী নয়, সবই যদি রোষে দ্বেষে হুহুঃ শব্দে জ্বালাইয়া ফেলি, তবে ভালবাসার কাজে এবং ভগবানের আরতির বেলায় কি করিব?"[৭]

৫। শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই প্রসঙ্গে তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ ও মানবতাবোধ' প্রবন্ধে ('জন্মশতবর্ষ জয়ন্তী-উৎসর্গ' সংকলন-গ্রন্থ, ১৩৬৮) বলিয়াছেন—"ধর্মবোধ কখনও যেন বৃহৎমানবের সহিত যোগযুক্ত যে কর্ম তাহা হইতে একান্তভাবে অতিরিক্ত না হইয়া ওঠে। ধর্মানুষ্ঠানও চিত্তকে শুভকর্মানুষ্ঠানের দিকে প্রণোদিত করিয়া তুলুক, সকল কর্মানুষ্ঠান 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ' যে পরম সত্য তাহার দিকে চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করুক—ইহাই ছিল তাঁহার আদর্শ।"

৬। অন্নদাশঙ্কর রায় রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাস ও ভগবৎ-ভক্তি সম্বন্ধে তাঁহার 'রবীন্দ্রাদিত্য' নামক একটি রচনার মধ্যে মন্তব্য করিয়াছেন—"রবীন্দ্রনাথ জীবনে একটা দিনও ভাবেতে নাস্তিক হতে পারেন নি, সংশয়ী হতে পারেন নি, একটা দিনও ভাবতে পারেন নি যে জগৎ একটা মায়া কিংবা একটা প্রাণহীন আত্মহীন জড়পিণ্ড।"

৭। দীনেশচন্দ্রের উপর্যুক্ত এই উক্তিসমূহের সমর্থনে হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিম্নলিখিত রচনাংশটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

এই ক্ষমা ও উচ্চ প্রীতির ভাবই কবি দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কেও রবীন্দ্রবাবুর মনে জাগিয়াছিল, তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন (১৩ই কার্ত্তিক ১৩১৩)—"আমার কাব্য সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা লইয়া বাদ-প্রতিবাদ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমরা বৃথা সকল জিনিষকে বাড়াইয়া দেখিয়া নিজের মধ্যে অশান্তি ও বিরোধের সৃষ্টি করি। জগতে আমার রচনা খুব একটা গুরুতর ব্যাপার নহে, তাহার সমালোচনাও তথৈবচ। তা ছাড়া সহিত্য সম্বন্ধে যাঁহার যেরূপ মত থাকে থাক্ না; সেই তুচ্ছ বিষয় লইয়া কলহের সৃষ্টি করিতে হইবে নাকি? আমার লেখা দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভাল লাগে না, কিন্তু তাঁহার লেখা আমার ভাল লাগে, অতএব আমিই জিতিয়াছি—আমি তাঁহাকে আঘাত করিতে চাই না।"…

আমি প্রাচীন বঙ্গীয় কাব্যসমূহ হইতে একটা বড় সংগ্রহগ্রন্থ সংকলন করিব এইজন্য তিনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং আমাকে লিখিয়াছিলেন (১৬ই কার্ত্তিক, ১৩১৩)—"প্রাচীন কবিতা-সংগ্রহের যে প্রস্তাব আপনার নিকট করিয়াছি, তাহা একান্তই প্রয়োজনীয় এবং আপনি ছাড়া আর কাহারো দ্বারা সাধ্য নহে। স্থির করিয়াছিলাম, কয়েক মাস আমিই আপনাকে সাহায্য করিব কিন্তু এখানে (বোলপুরে) নূতন ছাত্র ও রোগীদের জন্য ইমারত ঘর তৈরি করিতে হইতেছে, তাহাতে বিস্তর খরচ পড়িবে। অতএব এখন কিছুকাল আমার সম্বল কিছুই থাকিবে না। তাহার পর বহু ব্যয়ে বই ছাপাই এমন শক্তি আমার নাই।"…

তাঁহার এস্টিমেট্ ছিল লক্ষ টাকা, বিশ্ববিদ্যালয় খুব বৃহদাকারে পুস্তক না ছাপাইয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রভাবে 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' প্রকাশিত করিয়াছেন তাহারই পত্রসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৯১৪। রবীন্দ্রবাবু আমাকে কতটা সম্মা

"এখানে এক উন্নততর সদ্‌বুদ্ধির সাহায্যে তিনি উন্নত স্থিতি লাভ করেছেন। সেই অবস্থা সাধারণ সংসারের মানুষের যে হীনতা দীনতা, সুখদুঃখবোধের ক্ষুদ্রতা, অহংকারবোধের যে দেখা যায়, তা তাঁর মনকে স্পর্শ করতে পারে না। পরম সত্তার সহিত একত্ববোধ সেখানে অহংকারের সীমাগড়া প্রাচীর লোপ করে দেয়। বিশ্ব জুড়ে যে লীলা চলছে তার অখণ্ডভাবে ব্যক্তিগত জীবনকে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মহিমমণ্ডিত করে।"—'রবীন্দ্রদর্শন', পৃ. ৮২

দিতেন, তাহা ব্যোমকেশের নিকট যে একখানি পোস্টকার্ড লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে বুঝা যাইবে। উহা ১৯০৫ সনের ৭ই মার্চ তারিখের লেখা। তিনি 'সফলতার সদুপায়'৮ নামক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই সম্বন্ধে লিখিতেছেন—"মিনার্ভার চেয়ে কার্জেনে বেশী জায়গা আছে। আমার প্রবন্ধটির নাম 'সফলতার সদুপায়'। সভাপতি মেজদাদা হইলে কোন মতেই চলিবে না। বরং নাটোরের মহারাজা হইলে ভাল। নতুবা হীরেন্দ্রবাবু, ত্রিবেদী মহাশয়, বা দীনেশবাবুকে ধরিবে।"...তখনও আমি ইংরেজী কোন পুস্তকই রচনা করি নাই। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' লিখিয়া সাহিত্যরাজ্যের প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম মাত্র। তথাপি রবীন্দ্রবাবু আমার সামান্য সাহিত্যিক গুণের এতটা পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইলে তিনি অতি দীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছিলেন, ও 'রামায়ণী কথা'র শুধু ভূমিকা নহে, তাহার প্রত্যেকটি চরিত্র সম্বন্ধে এরূপ সকল মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, যাহাতে গ্রন্থকার অত্যন্ত উপকৃত ও উৎসাহিত হইয়াছিলেন।

যখন আমি বঙ্গভাষার ইতিহাস ইংরেজীতে লিখিতে আরম্ভ করি, তখন কি ভাবে লিখিতে হইবে তৎসম্বন্ধে অনেক উপদেশ রবীন্দ্রবাবু দিয়াছিলেন। আমার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তকে কবিগণের আলোচনা কতকটা ব্যক্তিগত ভাবে হইয়াছিল—কিন্তু ইংরেজী ইতিহাসখানায় রবীন্দ্রবাবুর উপদেশ অনুসারে আমি নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলাম। তিনি শেষোক্ত পুস্তকের অবলম্বিত প্রথার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। যে সকল কবি ঝড়ের মত তাঁহাদের ব্যক্তিগত ভাবের আতিশয্যে পাঠক-চিত্তকে উলটপালট ও অভিভূত করিয়া ফেলেন রবীন্দ্র তাঁহাদিগের অনুরক্ত নহেন। তিনি সেই সকল কবির পক্ষপাতী যাঁহারা বর্ণিত বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়া নিজেকে একেবারে আড়াল করিয়া রাখিতে পারেন—এইজন্য তিনি বাইরন জাতীয় কবির কবিত্ব স্বীকার করেন না, বাল্মীকির মত বিষয়-গৌরবে সম্পূর্ণ আত্মহারা কবির অনুরাগী।...

'প্রদীপে' কবি হেমচন্দ্র সম্বন্ধে আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, সে প্রবন্ধটি রবীন্দ্রবাবুর বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। তিনি বঙ্গদর্শনের সঙ্গে আমার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। বঙ্গদর্শন পরিচালনায়

৮। ১৩১১ সালে পঠিত এই রচনাটি 'সমূহ' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট।

গুরুতর ভার আমার উপর ছিল—অনেক পত্রে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ওদেশীয় অনেক কাগজ হইতে সন্দর্ভ সংকলন করিবার জন্য সেগুলি আমার নিকট পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার পত্রগুলির পাতা উল্টাইয়া সেই প্রীতি-সম্বন্ধের পূর্বস্মৃতি মনে জাগিয়া উঠে। সেই সূত্র একেবারে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল,—দীর্ঘকাল তাঁহার সঙ্গে আমার পত্র-ব্যবহার ও দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ ছিল; কিন্তু কখনই আমি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হারাই নাই—তাঁহার কৃত রাশি রাশি উপকারের কথা বিস্মৃত হই নাই, তাঁর অপূর্ব সঙ্গ-সুখের লোভ মন হইতে দূর করিয়া ফেলিতে পারি নাই। কোটি কোটি লোকের মধ্য হইতে যাঁহাকে বাছিয়া লওয়া যায়,—যিনি সমগ্র জাতির নিকট ভগবানের এক মহোপহার—তাঁহাকে লইয়া বন্ধুবর্গের শ্লাঘা হইবে—ইহা সহজেই অনুমান করা যায়।…

রবীন্দ্রনাথ

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

…বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পর স্বদেশী আন্দোলনে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে কর্মীরূপে নেমেছিলেন। যখন সন্ত্রাসনবাদ মূর্ত হল, তখন তিনি তার প্রকাশ্য প্রতিবাদ করলেন।[১] রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে কর্মী তিনি বেশীদিন

দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পর ১৩৪৮ সালের ভাদ্র মাসে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কৃত 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধটির অংশবিশেষ, যাহার মধ্যে প্রধানতঃ 'স্বাদেশিকতা ও আন্তর্জাতিকতা'র বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে, এস্থলে তাহাই প্রকাশিত হইল এই প্রবন্ধে রামানন্দবাবু কবির বহুমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার গদ্য-পদ্য উভয়বিধ রচনা ও 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতিকথারও উল্লেখ আছে রচনাটির মধ্যে। উক্ত প্রবন্ধটি পরে 'রবীন্দ্র পরিক্রমা' অভিধাযুক্ত হইয়া একটি সংকলন-গ্রন্থে (অগ্রহায়ণ-১৩৪৮) পুনর্মুদ্রিত হয়।

১। বিমলচন্দ্র সিংহ তাঁহার 'রবীন্দ্র নিদিধ্যাসন' প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন,—"মনুষ্যত্ব যেখানে পীড়িত ও লাঞ্ছিত সেইখানেই রুদ্রবীণায় কবির প্রতিবাদ ঝংকৃত হয়েছে, যে পথে চিরো

থাকেন নাই, কিন্তু তাতে বরাবর অন্যতম চিন্তানায়ক ছিলেন—এ বৎসরও মৃত্যুর কিছুদিন আগেও ছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের কাণ্ডের প্রতিবাদ তিনিই প্রথমে করেন এবং তার কার্যতঃ প্রতিবাদস্বরূপ 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। যে-সব সভায় তাঁর অধিনায়কত্বের প্রয়োজন হয়েছে, তাতে অল্পদিন আগেও তিনি সভাপতি হয়েছেন। সম্প্রতিও তাঁর বাণী উপলক্ষ্য ঘটলেই, সকল দেশভক্তকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছে।২

রাষ্ট্রকে অবস্থাবিশেষে কর দেওয়া বা না দেওয়ার প্রজাদের অধিকার এবং স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব-বন্ধন বরণ এবং তার গৌরব ও আনন্দ, তিনি ১৯০৯ সনে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে প্রথম এবং পরে ১৯২৯ সনে 'পরিত্রাণ' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর মুখে ব্যক্ত করেন। 'মুক্তধারা' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী এই রকম কথা বলেছেন।…রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য ও পরিচালনা নিরপেক্ষভাবে দেশের বিশেষ করে পল্লীর হিতকর কাজ করবার প্রয়োজন ও পদ্ধতি তিনি অসহ-যোগ আন্দোলনের বহু পূর্বে নির্দেশ করে নিজের জমিদারিতে ও সুরুলে তদনুসারে কাজ করিয়ে এসেছিলেন।৩

পাবনার যে প্রসিদ্ধ প্রাদেশিক কনফারেন্সে তিনি সভাপতির কাজ করেন এবং বাংলা ভাষায় সভাপতির অভিভাষণ রচনা ও পাঠের প্রথম দৃষ্টান্ত দেখান, তাতে তাঁর কর্মপদ্ধতি তিনি সভার সম্মুখে উপস্থিত করেন।৪…

আন্তর্জাতিকতা নামে অভিহিত তাঁর বিশ্বমানবপ্রেমের আভাস তাঁর অনেক

উদার স্বরাজ্য এবং বৃহত্তের সঙ্গে সংযোগ সেই প চলার জন্যেই তাঁর আহ্বান সপ্তস্বরে ধ্বনিত হয়েছে।"

২। গোপাল হালদার 'রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা' নামক একটি রচনার মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন,—"ভারতীয় স্বাদেশিকতার প্রথম যুগ থেকে স্বাধীনতার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত দীর্ঘজীবনে রবীন্দ্রনাথ এই স্বাদেশিকতার ইতিহাসে অজস্র দান জুগিয়েছেন।…তাঁর অখণ্ড দৃষ্টিতে স্বাদেশিকতা ও আন্তর্জাতিকতা—বৈচিত্র্য ও ঐক্য—একই মহৎ সত্যের পরস্পরাশ্রয়ী প্রকাশ। সেই সত্য মানবতা।"

৩। অন্নদাশঙ্কর রায় 'তাঁর পরেই প্লাবন' প্রবন্ধে বলিয়াছেন—

"জমিদার ও প্রজার পারস্পরিক সহযোগিতাই ছিল রবীন্দ্রনাথের আদর্শ। তিনি যখন প্রথম যৌবনে মহর্ষির আদেশে জমিদারির কাজ করতে বেরন তখন থেকেই এই আদর্শ ছিল তাঁর মানসে।"—'উত্তরসূরী', রবীন্দ্রশতবর্ষ সংখ্যা, ১৩৬৭-৬৮

৪। কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ ও রাজনীতি' প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে—"রবীন্দ্র-নাথ এই স্বদেশী আন্দোলনের চিন্তাধারায় জাতিকে অভিষিক্ত ও পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন।"

আগের রচনাতেও পাওয়া যায়,[৫] কিন্তু স্পষ্ট পাওয়া যায় 'প্রবাসী'র প্রথম সংখ্যার জন্যে প্রায় একচল্লিশ বৎসর আগে লিখিত সেই কবিতায়—যার গোড়ায় আছে[৬]—

"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া ;
সব দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া ।"

তিনি তাঁর 'ন্যাশনালিজম্' নামক ইংরেজি গ্রন্থে সেই স্বাজাতিকতাই গর্হিত বলেছেন যা বিদেশ ও বিজাতির ধন গ্রাস করতে ও তাদের উপর প্রভুত্ব করতে চায়। সব সাম্রাজ্যবাদ এর অন্তর্গত এবং নাৎসিবাদ সর্বাধম সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত। পরদেশদ্রোহিতা না করে যে স্বাজাতিকতা স্বদেশের কল্যাণ করতে চায়,—কথায়, কাব্যে, বক্তৃতায়, গানে ও কাজে চিরদিনই তিনি তার সমর্থক ও অন্যতম প্রধান অনুপ্রাণক।[৭]

৫। সুশোভন সরকারের 'রবীন্দ্রনাথ ও অগ্রগতি' প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে—"স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে।"

৬। বিনয় ঘোষ তাঁহার 'রবীন্দ্রচিন্তা' ('উত্তরসূরী', রবীন্দ্রশতবর্ষ সংখ্যা, ১৩৬৭-৬৮) প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতাবোধ কোনদিন সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শে কলুষিত হয়নি।"

৭। শশিভূষণ দাশগুপ্ত 'রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার জাতীয় জীবন' (বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৯) প্রবন্ধে প্রসঙ্গত বলিয়াছেন—"রবীন্দ্রনাথ মনে করিতেন, চিত্তের জাগরণের সঙ্গে বিদেশী শক্তির অপসারণের সঙ্গে যদি কোন যোগ থাকিয়াও থাকে তথাপি জাতীয় মুক্তির জন্য পররাষ্ট্র শক্তিকে দূরীভূত করিয়া দিবার চেষ্টা অনেকখানি একটা নঙর্থক চেষ্টা; সর্বপ্রকার সৃষ্টিকর্মের ভিতর দিয়া যে মুক্তি তাহাই হইল মুক্তির যথার্থ সদর্থক রূপ।"

সংগীতে রবীন্দ্রনাথ

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

কবি সতের বৎসর বয়সে যখন বিলেত যান, তখন থেকে তাঁর ইংরিজী গানে হাতে খড়ি।...

ইংরিজী গান গাবার অভ্যাস তাঁর অনেক দিন পর্যন্ত ছিল; অন্যান্য দুই-একটা য়ুরোপীয় ভাষার সংগীতও চর্চা করতেন। কিন্তু তাঁর স্বরচিত গানের উপর বিদেশী সুরের প্রভাব খুব কমই পরিলক্ষিত হয়, সেটা আশ্চর্যের বিষয়। সশরীরে যে বিদেশী সুর নিয়েছেন তা নিয়েছেন বা ভেঙেছেন, যথা 'কালমৃগয়া' বা 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র 'সকলি ফুরালো,' 'কালী কালী বল রে আজ' ইত্যাদি। কিন্তু নিজে যে-সুর বসিয়েছেন, তাতে সামান্য ছায়া ছাড়া সম্পূর্ণ বিদেশী ঢঙ খুব বেশি নেই ব'লে আমার বিশ্বাস। এইখানে না ব'লে থাকতে পারছিনে যে, 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র[১] মত একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর গীতিনাট্য নিদেন আমার চোখে ত আর পড়েনি। কেবলমাত্র গানে অমন সরসভাবে গল্প বলা, অমন চট্‌পট ঘটনা এগিয়ে দেওয়া, অমন বিচিত্র রস ব্যক্ত করা, যে-কথার যে-ভাব তাতে অবিকল সেই ভাবের সুর যোজনা করা,—একাধারে আদর্শ গীতিনাট্যের উপযোগী এতগুলি গুণ এদেশের আর কোন নাটকে আমার সামান্য অভিজ্ঞতায় ত দেখতে পাইনি।...অত অল্প

দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ক্ষিতিমোহন সেনের সভাপতিত্বে রবীন্দ্র-পরিচয়-সভা কর্তৃক প্রকাশিত (১১ই পৌষ, ১৩৩৮) 'জয়ন্তী-উৎসর্গ' নামক সংকলন-গ্রন্থ হইতে এই রচনাটি গৃহীত। ঠাকুর পরিবারের সংগীতানুরাগী আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ইন্দিরা দেবীর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়—সাহিত্য ও সংগীতকলা উভয় বিষয়েই তাঁহার গভীর ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্র-সংগীতের ঔপপত্তিক দিক সম্বন্ধে তিনি প্রভূত আলোচনা করিয়াছেন। 'রবীন্দ্র-সংগীতের ত্রিবেণী সংগমে' আকারে ক্ষুদ্র হইলেও 'বিশ্বভারতী' প্রকাশিত তাঁহার একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ব্যতীত রবীন্দ্রসৃষ্টির বিরাট ও গভীর সংগীতাংশ লইয়া বহু সংগীতবোদ্ধা গুণী ও জ্ঞানীজন প্রচুর আলোচনা করিয়াছেন। আমরা এস্থলে তাঁহাদের কয়েকজনের কিছু উক্তি নিদর্শন হিসাবে উদ্ধৃত করিলাম—

১। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁহার 'নাট্যজগৎ ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"...বাংলা নাটকের ইতিহাসে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' যুগান্তকারী ব্যতিক্রম হিসেবেই দেখা দিয়েছিল বলা যায়। এটিই বোধহয় সে যুগের প্রথম একমাত্র বিশুদ্ধ গীতিনাট্য।"—"বহুরূপী", রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা, মে-১৯৬১

বয়সে অমন সুন্দর গীতিনাট্য রচনা করতে পারাই কবির প্রতিভার প্রথম পরিচয় বলা যেতে পারে।...

বিদেশী সংগীতের স্রোতে তিনি যে গা ভাসিয়ে দেননি, তার কারণ ছেলেবেলা থেকে তাঁদের বাড়ীতে ভাল হিন্দুস্থানী সংগীতবেত্তার যাতায়াত ছিল। যদু ভট্ট, মৌলাবক্স, এসব নাম আমাদের কানে শোনা মাত্র হ'লেও তাঁদের চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন, এবং এঁদের কাছে হিন্দুসংগীত শিক্ষার গোড়া-পত্তন হয়েছিল। বিষ্ণুরাম চক্রবর্তী আমাদের কাল পর্যন্ত সে-সংগীতের জের টেনে এনেছিলেন।...

সুতরাং কোন বিশেষ ওস্তাদের কাছে রীতিমত শিক্ষা না পেলেও সবসুদ্ধ হিন্দুসংগীতের মূলনীতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা লাভ করবার সুযোগ তাঁর যথেষ্ট হয়েছিল এবং ভাল হিন্দী গান-বাজনা শুনতে তিনি খুবই ভালবাসেন, তা সকলেই জানেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসংগীত সকল প্রকার হিন্দী সুরের একটি রত্নাকরবিশেষ, তা মন্থন করলে হেন হিন্দী রাগতাল নেই যা পাওয়া যায় না। এবং তার দ্বাদশ ভাগের প্রথম তিন ভাগ বাদ দিলে, শেষ নয় ভাগের অধিকাংশ গানই বোধ হয় রবীন্দ্ররচিত।

নবীনচন্দ্র সেন একবার একটি সাক্ষাৎ আলোচনা-প্রসঙ্গে গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়কে বলিয়াছিলেন—

"দেখুন, রবির কবিতা আমার ভাল লাগে না। কিন্তু তাঁহার গানগুলি বড় মধুর বাঙ্গালা সাহিত্যে রবির আর কিছু স্থায়ী হউক বা না হউক তাহার গানগুলি 'সারভাইভ করিবে।"—'নবীন-প্রসঙ্গ', আর্যাবর্ত, ২য় বর্ষ, পৌষ-১৩১৮

"বাণী এবং সুরের অপূর্ব মিলনে শিল্পসৃষ্টি হিসাবে আদর্শস্থানীয় হয়েছে কবির আধুনিক গানগুলি যার প্রকাশ 'গীতপঞ্চাশিকায়' এবং 'গীতি-বীথিকা'য়। পরবর্তী রচনায় 'নবগীতিকা' এব 'গীতিমালিকা'র গানগুলিতে এ আদর্শের চরম পরিণতি পরম সৌষ্ঠবে অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন হে উঠেছে।"—'রবীন্দ্র-সংগীত', দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

"কথার সঙ্গে সুর রবিকাকার মতো কেউ মেলাতে পারেনি।"—'রবিকাকার গান অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"অগণিত লোক মুগ্ধ হয়েছে তাঁর সংগীতের কথা ও সুরের অপূর্ব সংমিশ্রণে, ভাবপ্রাচু ও রসমাধুর্যে।"—'রানাঘাট রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় ভাষণ', সুধীরঞ্জন দা

"রবীন্দ্রনাথের লেখা গানের বোধহয় শেষও হয় না, তুলনাও হয় না।...শুধু, এই একা মাত্র গানেই তিনি অমর হয়ে থাকতে পারতেন।"—'নির্ভীকতার কবি রবীন্দ্রনাথ', অনুরূপা দেবী

কবির গানের সঙ্গে যাঁর কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তিনিই জানেন যে, তিনি হিন্দী গানের গঠনপ্রণালী সর্বদা মেনে চলেন; অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ গানে আস্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী আভোগ, এই চার ভাগের ব্যতিক্রম করেন না। রাগরাগিণীও বজায় রাখেন, তবে অনেক সময় ইচ্ছামত মিশ্রিত করেন। মিশ্ররাগ আমাদের সংগীত-শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু কালক্রমে যে কয়টি মিশ্রণ প্রচলিত রয়ে গেছে, তদতিরিক্ত কিছু করলেই শুচিবায়ুগ্রস্ত কানে খট্‌কা লাগে। সব নূতন জিনিসেরই এই ধাক্কা সামলাতে হয়,—পহিলা সামলানা মুস্কিল হে। আমার মনে হয়, তাঁর প্রথম দিককার গানে মিশ্রণ কম। শেষের গুলিতেই সেদিকে বেশি ঝোঁক দিয়েছেন; বিশেষতঃ "আছে দুঃখ আছে মৃত্যু" গানে ভৈরোঁ (টোড়ী?) ও বিভাস মিশিয়ে বাঘে-গরুকে এক ঘাটে জল খাইয়ে, বর্ণ-সংকরের চূড়ান্ত খেলা দেখিয়েছেন। তানকর্তব নেই বলে' লোকে মনে করে কবিবরের গান শেখা সোজা, কিন্তু তাঁর সূক্ষ্ম মীড় ও খোঁচখাঁচ বজায় রেখে গাওয়া মোটেই সোজা কাজ নয়; তার সাক্ষী বোধ হয় তাঁর গানের ভাণ্ডারী শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথ ও তাঁর ছাত্রছাত্রীগণ দিতে

"রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানগুলি ১৩২২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। সে গানের প্রভাব সারা বাংলা দেশকে নূতন জীবন ও নূতন প্রেরণায় জাগাইয়া দিয়াছিল।" 'রবীন্দ্রনাথ ও স্বদেশী আন্দোলন', যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

"সংগীতে রবীন্দ্রনাথের দান আমাদের আনন্দের একটি শ্রেষ্ঠ উপাদান, তাঁর সর্বোতমুখী প্রতিভার চরম বিকাশ।"—'রবীন্দ্রনাথের সংগীত', ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

"রবীন্দ্র-সংগীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ভাব, ভাষা ও সুরের পারস্পরিক সংগতি। গানের তিন অঙ্গের মধ্যে এই যে সামঞ্জস্য, রবীন্দ্র-সংগীতের সমস্ত মাধুর্য ও সুষমার মূল কারণটুকু নিহিত রয়েছে তারই মধ্যে।"—'বাণী ও বীণা', প্রবোধচন্দ্র সেন

"ভারতীয় সংগীতের ধারার অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংগীতের সৃষ্টিস্রোতহীন বদ্ধজলে নূতন সুরসৃষ্টির স্রোত এনেছেন। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে কোন্ দিক থেকে ভারতীয় সংগীতের বিকাশ সম্ভব তারও ইঙ্গিত তিনি দিয়ে গেছেন।"—'সংগীতে রবীন্দ্রনাথ', সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

"এ বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, চিরন্তন হয়ে থাকবে রবীন্দ্রনাথের গান।... রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল একাধারে গীতিকার এবং সুরস্রষ্টার প্রতিভা।" — 'গুরুদেব', সৈয়দ মুজতবা আলি

"বিষয়বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথের গান ভারতের যে কোন যুগের ও যে কোন প্রদেশের সংগীত রচয়িতাদের গানের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে। এত বিচিত্র ভাবের গানের সঙ্গে

পারবেন। মুশকিল এই যে, স্বরলিপিতে সে সূক্ষ্ম কারিগরি দেখানো শক্ত, এবং দেখেও না-দেখা সহজ; আজকাল আমরা সকলেই সহজিয়াপন্থী। তাই স্বরলিপি দেখে তাঁর গান শিখলে ফল সব সময় ভাল হয় না, বিশেষ শিক্ষানবিসের বেলা।

তাল সম্বন্ধে তাঁর তত বৈচিত্র্যের দিকে ঝোঁক নেই, মামুলী তিন ও চারের সরল ছন্দেই তাঁর আশ মেটে।…শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথকে নাকি একবার তিনি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন যে, "আমি যে গানই তৈরি করি তুই বলিস্ তার তাল কাশ্মীরী খেমটা। গুরুগম্ভীর রাগরাগিণীকে নাচিয়ে তোলবার তাঁর একটা অসাধারণ ক্ষমতা আছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানেও তাঁর নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা একেবারে চাপা পড়েনি। 'নবতাল' (নিবিড় ঘন আঁধারে) এবং 'একাদশী' (দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া) তালের নূতনত্ব তার নামেই প্রকাশ, এবং 'ঝম্পকে' ঝাঁপতাল উল্টে ফেলাতেও বোধ হয় তাঁর কিছু হাত আছে। তাঁর 'সংগীতের মুক্তি' নামক প্রবন্ধে গানের ছন্দ বা তাল সম্বন্ধে নিজের বক্তব্য নিজেই বলেছেন।

তান সম্বন্ধেও যেন সম্প্রতি কবির একটু শখ দেখা যায়। পাখীর ছানা যেমন প্রথম উড়তে শিখে অল্প দুর উড়ে আবার মাটিতে পড়ে, তেমনি

এত বিচিত্র রাগ-রাগিণীর প্রয়োগ ভারতের আর কোথাও কোন একজন সংগীতকার করতে পেরেছেন বলে শুনিনি।"—'রবীন্দ্র-সংগীতের বৈশিষ্ট্য', শান্তিদেব ঘোষ

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 'রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ' নামক গ্রন্থের সমালোচনায় একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন—

"রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন বিচিত্র বিষয়ে ভারতেরই ভাব ও আদর্শকে বাহন করে। তাঁর গানে আছে তাই বৈচিত্র্যের বিন্যাস, কিন্তু একত্বের অখণ্ড অনুস্যূত এবং অপার্থিব আনন্দলাভের আকুলতা।"—'চতুরঙ্গ', কার্তিক-পৌষ, ১৩৬৮

রবীন্দ্র-সংগীত প্রসঙ্গে অমল হোম রবীন্দ্র-বিদ্বেষীদের সম্পর্কে একস্থানে বলিয়াছেন—

"আজ দেখা দিয়েছে নারায়ণের নব-কলেবর। পাশাপাশি চলেছে··বাংলা দেশের শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-মোহান্ধতার প্রতিবাদ। বলা হচ্ছে—রবীন্দ্র-সংগীতের বেলায় এই দৃষ্টিহীনতা সব চাইতে বেশী উৎকট। লেখক আবিষ্কার করেছেন, সমাজের উপরতলার উঁচু যারা কোনগতিকে চড়ে বসে আছেন, তাঁদের মধ্যেই রবীন্দ্র-সংগীতের সব চাইতে সমাদর।" 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ', পৃ. ১২৬

আজকাল এক-একটা গানে ছোট ছোট তান সংযোগ করবার ইচ্ছে যেন তাঁর মনে জেগেছে ব'লে বোধ হয়। তার দৃষ্টান্ত 'বাদল-মেঘে মাদল বাজে'-র প্রত্যেক কলির শেষে, এবং অন্যত্র পাওয়া যাবে। কিন্তু তাঁর সুরও যেমন, সে তানও তেমনি, গানের অঙ্গাঙ্গি, সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি—সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত,—তার উপর আর কোন গাইয়ের হাত (অথবা মুখ) চলবে না। এইখানেই তাঁর গানের নূতনত্ব ও বিশেষত্ব। প্রত্যেকটি একটি ব্যক্তিবিশেষ, শুধু জাতিবিশেষের অন্তর্গত নয়। হিন্দী গান রাগিণী বা জাতিকে ফোটাতে চেষ্টা করে; তাই সেই রাগের পরিধির মধ্যে গায়কের স্বাধীনতা অপরিসীম; কিন্তু কবি নিজের কথাকে সুর দিয়ে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেন, অথবা সম্মিলিত সুর ও কথায় 'গান' নামক এক-একটি পরিচ্ছন্ন মূর্তি গড়তে চেষ্টা করেন, যার উপর স্যাক্‌রার ঠুক্‌ঠাক্ দিয়ে চেহারা বদ্‌লে দেবার পক্ষপাতী তিনি মোটেই নন। হিন্দী গানের কথা সুর ফলাবার অবলম্বন মাত্র। বাঙ্গলা গানের সুরকে যে অপর পক্ষে কেবল কথা-প্রকাশের বাহন মাত্র হ'তে হবে তা আমি বলি নে। আমি বলি যে, গান এমন এক জিনিষ যাতে সুরেরও প্রাধান্য নেই, কথারও প্রাধান্য নেই, কিন্তু দুইয়ে মিলে-মিশে একটা তৃতীয় জিনিষ গ'ড়ে ওঠে যার রস আলাদা; যে-রস শুধু কবিতায়ও পাওয়া যায় না, শুধু সুরেও পাওয়া যায় না। শ্রেষ্ঠ গীতিকার পুরোহিত তিনিই, যিনি যোগ্য কথার সঙ্গে যোগ্য সুরের মিলন ঘটিয়ে 'গীতরস' নামক একটি বিশেষ আনন্দ-রসের সৃষ্টি করেন।[২]

"চিত্ত পিপাসিত রে গীত-সুধার তরে।" সেই পিপাসা মেটাবার অফুরান উৎস কবির অন্তরে সঞ্চিত, উৎসারিত, উচ্ছ্বসিত, নিত্য বহমান। সেই বাল্য-কালের 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র পর কত যে গীতি-নাট্য, কত যে গানে তা প্রকাশ পেয়েছে, তার কি বর্ণনা করব, কত হিসেব দেব! গীতিনাট্যগুলি গান হ'লেও গানের সমষ্টি বলে তবু পথ-নির্দেশক চিহ্নরূপে কতকটা ধরা যেতে পারে। 'মায়ার খেলা' বোধ হয় ৪০।৪৫ বৎসর আগে রচিত। সেটাও মনে আছে, সখী সমিতির এক মেলা উপলক্ষ্যে প্রথম অভিনীত হয়। তাতে মেয়েরা পুরুষ সেজেছিল, এবং মায়াকুমারীদের হাতে বিজলীবাতির ছড়ি

২। হরপ্রসাদ মিত্রের 'রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্য-ইন্দ্রির' প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে—"তাঁর প্রত্যেকটি গানই জীবনের আনন্দের ইশারা,—তাঁর প্রত্যেকটি রচনাতেই পরমার্থের গভীর সঙ্কেত।"

একবার জলছিল, একবার নিভছিল। তারপর সেটা আরও কতবার কত রঙ্গমঞ্চে কত অভিনেতা দ্বারা অভিনীত হয়েছে, কিন্তু সেই প্রথম প্রমদার করুণ বিদায়-সংগীত—"এই লহ, এই ধর, এ মালা তোমরা পর" এখনো সকলের কানে বাজছে; তার তুলনা নেই, তার পুনরভিনয়ও আর কখনো হবে না।

'ফাল্গুনী' থেকে একটা নতুন সুর কবির গীতিনাট্যে প্রবেশ করল বেশ মনে আছে, যদিও তারিখ মনে নেই,—সেটি রূপকের সুর, চির যৌবনের সুর—চ'লে যায়, কিন্তু আবার ফিরে আসে। ঘুরে ফিরে সেই একই কথা কতবার কত রকমে প্রকাশ করেছেন, এই সেদিন 'নবীন'-এও ব'লে গেছেন। 'রাজা,'[৩] 'অচলায়তন,' 'রক্তকরবী,'[৪] 'মুক্তধারা' এ সবই রূপক নাট্য-স্রোতের এক-একটি তরঙ্গ, সবই গানে গানে ঝংকৃত, অলংকৃত—মানে খুব স্পষ্ট বোঝা যাক্ বা না যাক্। আমাদের এখন গান নিয়েই কথা। তা ছাড়া তাঁর শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের জন্য রচিত 'ঋতু-উৎসব,' 'বর্ষা-মঙ্গল' প্রভৃতি প্রকৃতি-নাট্যও এক স্বতন্ত্র শ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে, যার প্রতিধ্বনি এই সহরের ইটকাঠকেও বৎসরে বৎসরে রঙিয়ে জাগিয়ে তোলে।

ব্যষ্টিগানও তাঁর এক এক সময়কার রচনা হিসেবে এক এক দলে ফেলা যেতে পারে। যথা:—'ওগো শোন কে বাজায়,' 'মরি লো মরি,' 'বনে এমন ফুল ফুটেছে'—এসব এক দল। আবার 'নিশি নিশি কত রচিব শয়ন,' 'এত প্রেম আশা,' 'আজি শরৎ-তপনে,' 'হেলা-ফেলা সারা বেলা,'—এসব এক দল। তখনকার কালে 'আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে' এবং 'মরি লো মরি'র খুব রেওয়াজ ছিল। 'রাজা ও রানী' এবং 'গোড়ায় গলদে'র গান সংখ্যায় কম হলেও উল্লেখযোগ্য। 'শুধু যাওয়া আসা,' 'তবু মনে

৩। মহম্মদ শহীদুল্লাহ এই 'রাজা' নামধেয় রূপক নাট্যটি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"রূপক ছাড়িয়া দিয়া 'রাজা'কে কেবল একখানি নাটক হিসাবে দেখিলেও আমরা ইহার চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হই। ইহার প্রত্যেক চরিত্রটি স্বাভাবিক ও সজীব।"—'রবীন্দ্রনাথের রাজা', প্রবাসী শ্রাবণ-১৩২২

বিভাস রায়চৌধুরী তাঁহার 'রক্তকরবী' গ্রন্থে আলোচনা প্রসঙ্গে কবির 'রক্তকরবী' নাটক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"...রক্তকরবীতে রবীন্দ্রনাথের নাট্য-প্রতিভা পূর্ণভাবে বিকাশলাভ করেছে।" পৃ. ১১

রেখো' ইত্যাদি পেরিয়ে 'চিনি গো চিনি তোমারে'র দল অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে এসে পড়ে। 'গান' নামে সেকালের একটা বেঁটে মোটা বইয়ে তাঁর সব রকম বয়সের গান পাওয়া যাবে, যদিও সময়োচিতভাবে সাজানো নেই। জানিনে সে-বই এখনও বাজারে পাওয়া যায় কিনা। তাঁর অনেক সুরে বাউল সংগীতের প্রভাব খুব বেশি দেখা যায়। গীতি-নাট্যের যেমন, গানেরও তেমনি তাঁর একটা অভিব্যক্তি হয়েছে, বলা বাহুল্য। তবে তার গতি-নির্দেশ করা তত সহজ নয়। কারও সেকালের গান পছন্দ, কারো একালের; কারো এ ভাল লাগে, কারো ও। ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ। তিনি নিজে বলেন, তাঁর আগেকার গান ছিল emotinal, এখনকার গান হয়েছে aesthetic.

যেবার নোবেল প্রাইজ পেয়ে কবি দেশে ফেরেন—বোধ হয় ১৯১৪ সালে (?) এই সময়েই, সেই থেকে যে তাঁর গানের বন্যা খুলে গেছে, সে-স্রোত এখনো সমান বইছে, তার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, দম নেই, সময় নেই। যদিও সম্প্রতি চিত্রাঙ্কণ তাঁর মনের ও সময়ের অনেকখানি জুড়ে বসেছে, তবু আশা করি বীণার স্থান তুলিতে বেদখল করবে না; সরস্বতীর উদার কোলে উভয়েরই জায়গা আছে। কবির কবিতার যেমন একটা চয়নিকা করা হয়েছে, তেমনি তাঁর অসংখ্য গানের মধ্যে সর্বজনপ্রিয়তম শ'খানেক গান নির্বাচন করে 'সংগীত-শতক' নামে একটা চয়নিকা করলে হয় না? তাঁর নিজের 'ভোট'ও এ বিষয়ে নেওয়া যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

কালিদাসের কালে জন্ম নিলে তাঁর কাব্য-রচনার প্রকৃতি ও পরিমাণ কি রকম হ'তো রবীন্দ্রনাথ তা কৌতুকের সঙ্গে কল্পনা করেছেন। তাঁর লেখা একটি মাত্র শ্লোকের স্তুতিগানেই যে রাজা উজ্জয়িনীর প্রান্তে একখানা উপবন-ঘেরা বাড়ি কবিকে দান করতেন তা সহজেই বিশ্বাস হয়। কিন্তু কালিদাসের কালের রবীন্দ্রনাথ যে বিম্বাধরের স্তুতিগীতেই তাঁর কবি-প্রতিভাকে নিঃশেষ করতেন, আর তাঁর কাব্য-সৃষ্টি দু'একখানি মাত্র ছোটো-খাটো পুঁথি ভ'রে দিতো এ একেবারে অবিশ্বাস্য। ত্বরাহীন জীবন মন্দাক্রান্তা তালে কাটিয়ে দেবার কোনও লোভ, কি রাজার চিত্রশালার কোনও মালবিকার মোহ তাঁর কবি-মর্মের এ সংকোচ ঘটাতে পারতো না। তাঁর কাব্যগুলি খুব সম্ভব আকারে ছোটই হতো, যেমন 'মেঘদূত' ছোট; কিন্তু সংখ্যায় দু'একখানি নয়। নরনারীর চিত্তের সহজ ও সূক্ষ্ম বহু ভাব ও আকাঙ্ক্ষা, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিগূঢ় যোগের পরমাশ্চর্য লীলা অনেকগুলি খণ্ড-কাব্যে বাণীর পরিপূর্ণ মূর্তি নিয়ে ফুটে উঠতো, যার অম্লান দীপ্তি কাব্য-রসিকের মন আজও উদ্ভাসিত করতো। অনুষ্টুপ থেকে স্রগ্ধরা, এবং রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কালে জন্মেন নি ব'লে সংস্কৃত ভাষার যে-সব ছন্দ অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে তাদের বিচিত্র ঝংকার ও দোল, এসব কাব্য থেকে দেড় হাজার বছর পার হ'য়ে আমাদের কান ও মনে এসে লাগতো।

সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য, বিশেষ করে কালিদাসের কাব্য, রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে নানা দিকে নাড়া দিয়েছে। এর কারণ, এ সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্র-নাথের প্রতিভার নিবিড় যোগ আছে। রবীন্দ্রনাথ সুর ও ছন্দের রাজা। তাঁর সুররসিক মন ও আশ্চর্য ছন্দকুশলী কান সংস্কৃত কাব্যের ধ্বনি ও ছন্দের মধ্যে নিজের প্রতিভার একটা অংশের গভীর ঐক্য উপলব্ধি করেছে। বালক-বয়সে যখন সংস্কৃত কাব্যের অর্থ বুঝে তার রসগ্রহণের সময় হয়নি,

---

দ্রষ্টব্য : 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য' নামক এই রচনাটি রবীন্দ্রনাথের স ত্তিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত (১১ই পৌষ, ১৩৩৮) 'জয়ন্তী-উৎসর্গ' নামক সংকলন-গ্রন্থ হইতে গৃহীত। অতুলচন্দ্র গুপ্ত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, এই প্রবন্ধটি তাহাদিগের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে।

তখনও যে তাঁর মনকে ওর ছন্দের তান ও লয়ে মুগ্ধ করতো 'জীবনস্মৃতি'তে তার সাক্ষী দিয়েছেন। কালিদাসের কাব্যে ভাষায় ভাব-প্রকাশের ক্ষমতা ও রসোদ্বোধনের শক্তি একটা চরম পরিণতি লাভ করেছে। এই পরম উৎকর্ষের মূল উপাদান দু'টি—কালিদাসের শব্দ-সম্পদের নিটোল পরিপূর্ণতা ও তার অপূর্ব ধ্বনি-সামঞ্জস্য। এর মিশ্রণে যে কথা ও ভাব কালিদাস প্রকাশ করতে চেয়েছেন তার দীপ্ত পরিচ্ছিন্ন মূর্তি তখনি তাঁর কাব্যে ফুটে উঠেছে, যে রস তিনি জাগাতে চান 'শুষ্কেন্ধন ইবানলঃ' পাঠকের চিত্তকে তা ব্যাপ্ত করে। কালিদাসের ভাষা একসঙ্গে ছবি ও গান। 'রঘুবংশে'র যে-প্রারম্ভটা প্রথম যৌবনে নিতান্ত সরল, বর্ণচ্ছটাহীন মনে হয়, ভাবপ্রকাশে তার কি অদ্ভুত ক্ষমতা !—

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥

মনে হয় কি সহজ এ রচনা। শিল্পীর চরম কৌশল এই সহজের মায়া সৃষ্টি করেছে। এ হচ্ছে সেই শ্রেণীর সহজ, মানব-দেহের সামঞ্জস্য যেমন সহজ ? ও এমনি সু-সম্পূর্ণ যে, তাকে নিতান্ত স্বাভাবিক বলে আমরা মেনে নিই। গড়নের যে আশ্চর্য কৌশলে এই সামঞ্জস্য এসেছে, তার কথা মনেই হয় না।

প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।

একটিমাত্র লাইনে অক্ষমের হাস্যকর নিষ্ফল চেষ্টার ছবি কালিদাস এঁকে তুলেছেন, আর তেমনি সে লাইনের ধ্বনির বৈচিত্র্য ও 'ব্যালান্স'! ভাষা-প্রয়োগের এই চরম নৈপুণ্য কেবল পৃথিবীর মহাকবিদের লেখাতেই পাওয়া যায়। যেমন সেক্সপিয়রে—

"And then it started like a guilty thing
Upon a fearful summons."

"A poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more."

ভাষা যেন রেখা ও ধ্বনি দিয়ে ভাবের মূর্তি গড়ে চলেছে। এই পরিপূর্ণ বাণীর অভাবে অনেক শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা মহাকবিত্ব লাভে বঞ্চিত হয়,

যেমন ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং। রবীন্দ্রনাথের ভাষা এই মহাকবির ভাষা; ধ্বনি, রেখা, রং-এর অদ্ভুত রসায়ন।

"বাণীর বিদ্যুৎ-দীপ্ত ছন্দোবাণবিদ্ধ বাল্মীকিরে।"

"শস্তশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল।"

"পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়।"

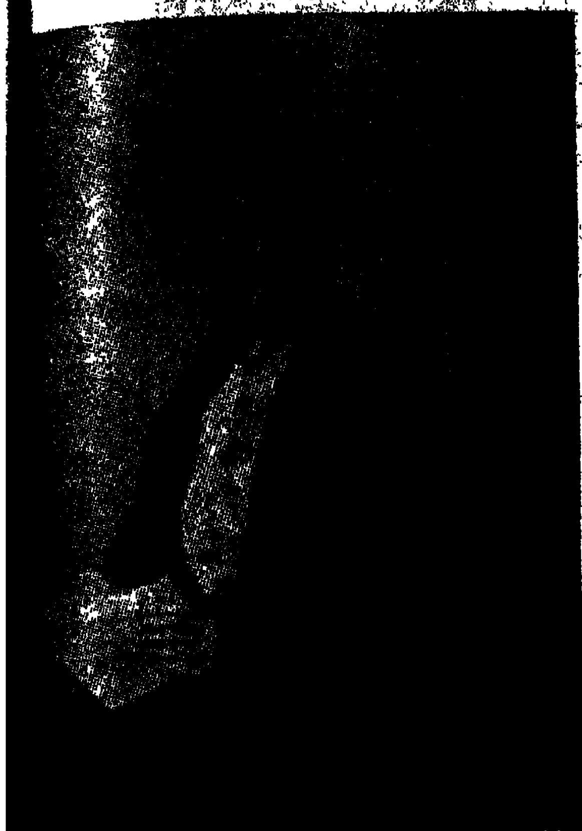
"অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি'।"

কিছুই আশ্চর্য নয় যে, পূর্বভারতের অপভ্রংশের এই মহাকবি পোনর শতাব্দীর ব্যবধান ভেদ ক'রে উজ্জয়িনীর মহাকবির হাতে হাত মিলিয়েছেন।

কালিদাস বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র রূপের মধ্যে মানুষের চিত্তকে ব্যাপ্ত করেছেন। তাঁর কাব্যে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ভাব ও রসের নিবিড় মিলন ঘটেছে। এইখানে কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিকটতম আত্মীয়তা।[১] মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিগূঢ় যোগের যে-রসমূর্তি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ফুটে উঠেছে, পৃথিবীর সাহিত্যে তা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এ সম্পর্কে ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের নাম ইংরাজী কাব্য-রসিকদের মনে হয়। কিন্তু ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে-যোগ, তা প্রধানতঃ তত্ত্বের যোগ, রসের যোগ নয়—প্রকৃতির সঙ্গে ভাবের কারবারে কবির মন কত দিক থেকে কতখানি পুষ্ট হচ্ছে তার হিসাব। এর আস্বাদ বিভিন্ন। যুগল-মিলনের যে মধুর রস রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বয়ে যাচ্ছে এ রস সে অমৃত-রস নয়। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে ভাবৈকরসত্ব মানুষের মনকে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দেয়, বিশ্বপ্রকৃতির সুর মানুষের মনের বীণায় বাজাতে থাকে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বাহিরে কালিদাসের কাব্যেই তার সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের অতীত ও বর্তমানের এই দুই মহাকবি এইখানে পরস্পরের একমাত্র আত্মীয়।

কালিদাসের কাব্য ও সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠাংশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার আর একটি যোগ এমন প্রকট নয়, কিন্তু প্রচ্ছন্ন নাড়ীর যোগ। সে হচ্ছে, এই কাব্যের একটা অভিজাত্যের সংযম। মহাভারতে,

১। রবীন্দ্র সাহিত্যে কালিদাস ওতপ্রোত হইয়া আছেন। কত কবিতা, কত প্রবন্ধের জালে রবীন্দ্রনাথ যে কালিদাসকে ধরিয়া বাঙালী পাঠকের একান্ত নিজস্ব করিয়া ছাড়িয়াছেন পণ্ডিতজন তাহা অবগত আছেন।—'সাহিত্যের পূর্বসূরী প্রণাম', সজনীকান্ত দাস



নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত



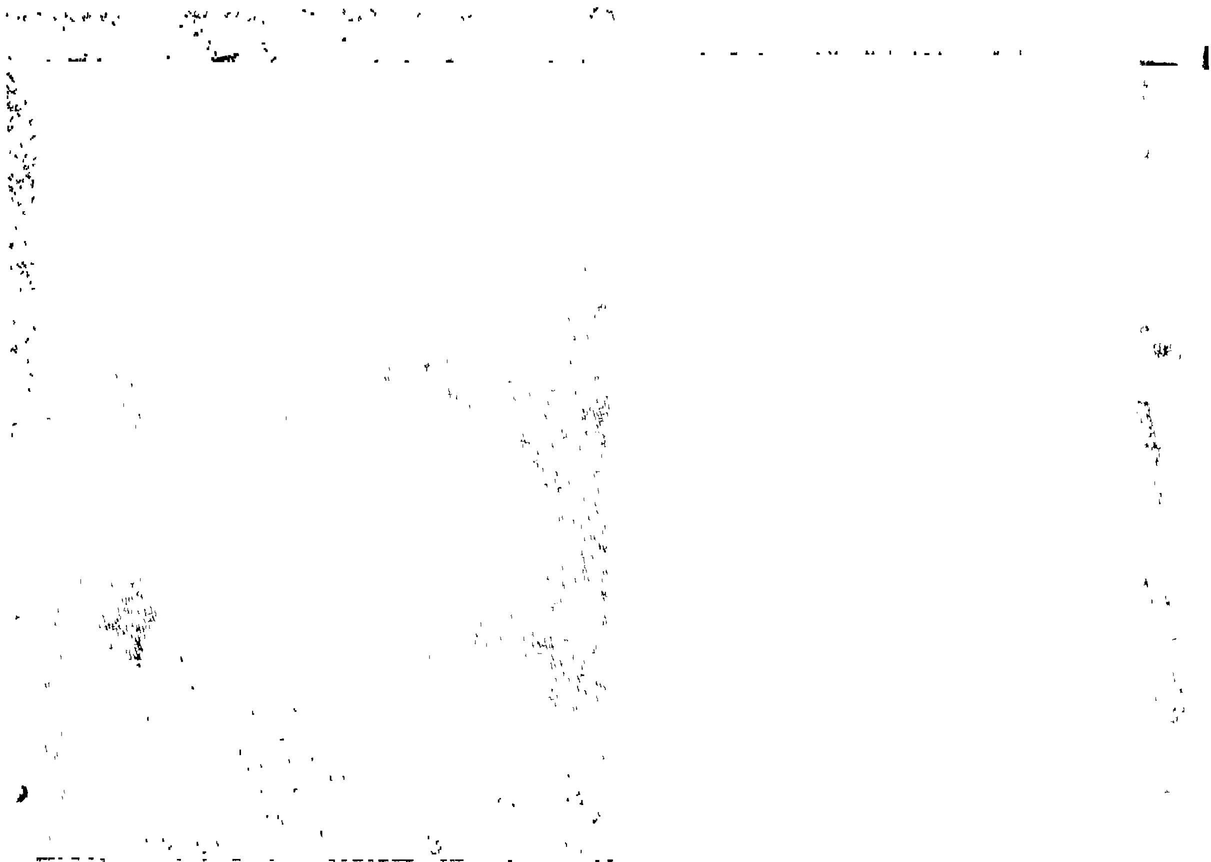
চিত্তরঞ্জন দাশ



বিজয়চ[illegible]

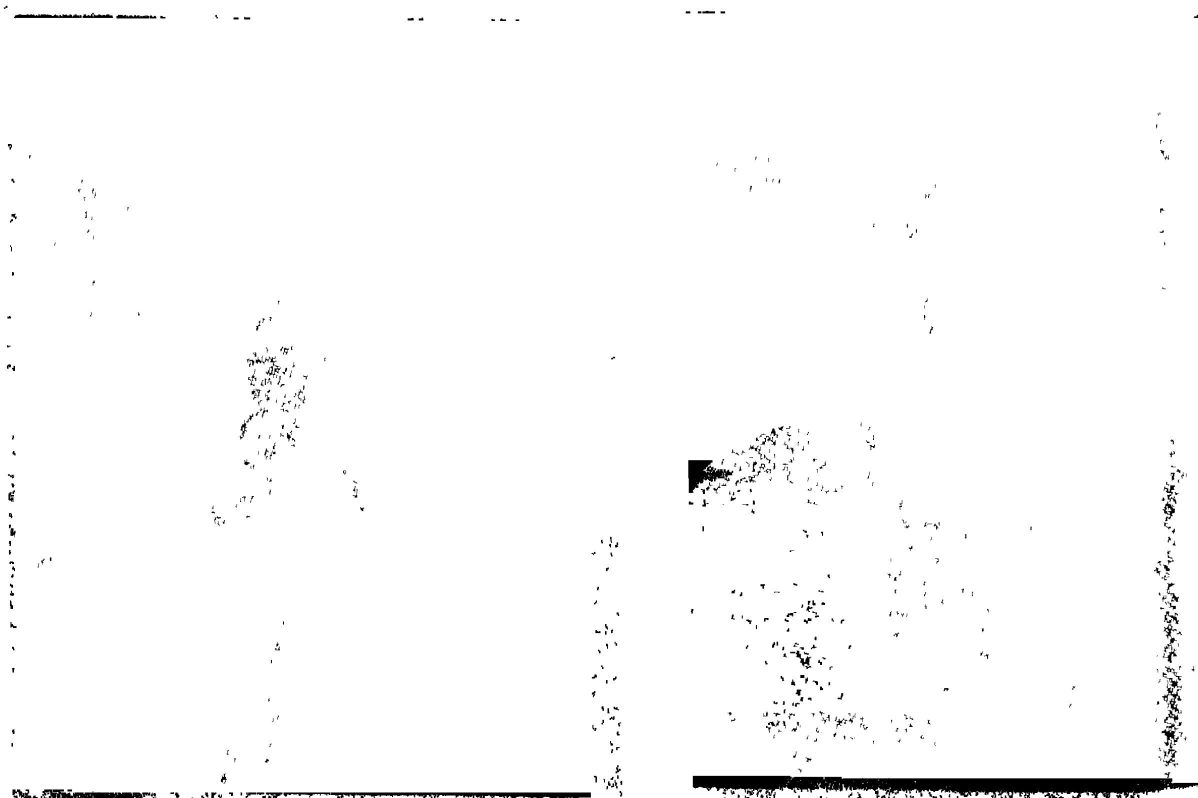


যতীন্দ্রমোহন বাগচী



দীনেশচন্দ্র সেন

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী



রামায়ণে, কালিদাসে সমস্ত তাপ, রস ও বৈচিত্র্যকে একটা গভীর শান্তরসে ঘিরে আছে, যা সমস্ত রকম আতিশয্য ও অসংযমকে লজ্জা দেয়। তার অর্থ নয় যে, এসব কাব্যের ভাব গতানুগতিক, কি রসবৈচিত্র্যহীন। কালিদাস কবি-প্রসিদ্ধির ধার-করা চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখেন নি; সংস্কারহীন কবির চোখেই দেখেছেন। বহু রসের বিচিত্র নবীন লীলায় তাঁর কাব্য ঝলমল করছে। কিন্তু তাঁর কাব্য কখনও সংযমের ছন্দ কেটে সৌন্দর্যের যতিভঙ্গ করে না। ইউরোপীয় অলংকারের ভাষায় কালিদাসের কাব্যে 'ক্লাসিসিজিম্' ও 'রোমান্টিসিজিম'-এর অপূর্ব মিলন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা এই মিলন-পন্থী। পৃথিবীর 'লিরিক' কবিদের মধ্যে তাঁর স্থান সম্ভবত সবার উপরে। মানুষের মনের এত অসংখ্য ভাবের রসের পরিপূর্ণ রূপ আর কোথাও দেখা যায় না।[২] প্রাণের প্রাচুর্যে তাঁর কাব্য কানায় কানায় ভরা।[৩] কিন্তু সমস্ত লীলা ও গতিকে অন্তরের একটি গভীর অটলতা, নটরাজের মূর্তির মত চির সুন্দরের ছন্দে গড়ে তুলেছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের সমধর্মী। রবীন্দ্রনাথের যৌবনে যে কাব্য-সাহিত্যের সবচেয়ে প্রভাব ছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই ইংরেজী কাব্য বরং এর পরিপন্থী। এ কাব্যে ভাব ও প্রাণের বন্যা বহু স্থানেই রসের সীমাকে ভাসিয়ে অদৃশ্য করেছে। দুই তটরেখার মধ্যে কূলে কূলে পূর্ণ নদীর যে রূপ তা এ কাব্যে কচিৎ দেখা যায়। কারণ বন্যা যখন নেমে গেছে তখন জল শুকিয়ে চর দেখা দিয়েছে, যেমন টেনিসনের কাব্যে। রবীন্দ্রনাথের অনতিপূর্ববর্তী বাংলা কাব্য-

---

২। কুমুদরঞ্জন মল্লিক তাঁহার 'রবি উপাসক' প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন—"অত রূপ, অত ঐশ্বর্য, অমন লোকোত্তর প্রতিভা, কণ্ঠ, অত ভাববিভূতি—জীবিতকালে এমন বিশ্বব্যাপী সম্মান ও খ্যাতি কোন যুগের কোন দেশের কবির ভাগ্যে ঘটে নাই—যাহা লাভ করিয়াছিলেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ।"

৩। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উক্তিটি উপর্যুক্ত উক্তির পরিপোষকে উল্লেখ করা যায়—'অফুরন্ত কথা, অফুরন্ত গান, অফুরন্ত সাধ লইয়া রবীন্দ্রনাথের দুর্বার প্রাণশক্তি বিশ্ব-মানবের মনোজগৎ প্লাবিত করিয়া করুণার ধারা ঢালিয়া কোন্ মহাসাগরের দুরন্ত সংগীতের আহ্বানে একদিন বাহির হইয়াছিল। কাব্যে, সাহিত্যে, সুরে, সংগীতে, জীবন-দর্শনের মহিমান্বিত চিন্তায়, আমাদের মনোজগতে সেই প্রাণশক্তির ধারার প্লাবনে বিপুল সমৃদ্ধি আসিয়াছে, যেখানে নূতন বীজ উপ্ত হইয়াছে, ফসলে-ফুলে শ্রীসম্পদে ভরিয়া উঠিয়াছে।"—'দর্পণ', শনিবারের চিঠি, আশ্বিন-১৩৪৮

সাহিত্যে এই ইংরেজী কাব্যের ভাবাতিশয্যের প্রভাব অতিমাত্রায় ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য যে এ থেকে মুক্ত তার কারণ তার প্রতিভার ধর্ম-বৈশিষ্ট্যের পরেই সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য, বিশেষ করে কালিদাসের প্রভাব।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের উপর সংস্কৃত-কাব্যের প্রভাব কোথাও তাঁকে তার অনুকরণে রত করেনি। এ প্রভাব তাঁর প্রতিভার জারকরসে জীর্ণ হয়ে স্বতন্ত্র নব-সৃষ্টির রস যুগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সংস্কৃত-কাব্যের সুর, ধ্বনি, ভাব ছড়ান রয়েছে। কিন্তু তার আস্বাদ সংস্কৃত-কাব্যের স্বাদ নয়। নব-প্রতিভার নবীন রসায়নে তা থেকে নূতন রসের সৃষ্টি হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা সংস্কৃত কবি ও কাব্যের কবিতা; যেমন 'মেঘদূত,' 'ভাষা ও ছন্দ,' 'সেকাল,' 'কালিদাসের প্রতি,' 'কুমারসম্ভব গান,' এ কবিতাগুলি এক অভিনব কাব্য-সৃষ্টি। এগুলি কাব্য বা কবিকে শ্রদ্ধা, প্রীতি বা প্রশংসার অঞ্জলি নয়, যেমন কীট্‌স্‌-এর On Looking into Chapman's Homer, কি রবীন্দ্রনাথের নিজের, "যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্ব-কবি, দূর সিন্ধুপারে।" বস্তুর জগৎ কবির চিত্তকে রস-সমাহিত করে কাব্যের জন্ম দেয়; এখানে কবি ও কাব্যের জগৎ রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে ঠিক তেমনি রসাবিষ্ট করে এই অভিনব শ্রেণীর কাব্যের জন্ম দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' কালিদাসের 'মেঘদূত' পড়ে কবি-চিত্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাস নয়। 'মেঘদূত' ও তার কবি রবীন্দ্রনাথের অনুকূল কবিকল্পনাকে যে-দোল দিয়েছে এ তারি ফলে নতুন রসসৃষ্টি। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাও ঠিক তাই। বাল্মীকির রাম-চরিত রচনায় যে-কাব্যে রামায়ণের আরম্ভ, রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় প'লে তা এক নূতন রস-মূর্তি নিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর কাব্য যে কোথাও সংস্কৃত-কাব্যের প্রতিচ্ছবি, তা মনে হয় না; মনে হয়, সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি, তার কারণ, এসব কাব্যে কবির মন ও দৃষ্টি এখানেও রবীন্দ্রনাথের মন ও দৃষ্টির সীমারেখা নয়। তাঁদের কাব্যের পথেই রবীন্দ্রনাথের চোখ ও মন সেই বস্তু ও ভাবে গিয়ে পৌঁচেছে যা তাঁদের কাব্যের মূল উপাদান, এবং সেই উপাদানকে নিজের প্রতিভার ছন্দে ও রঙে নতুন করে গড়ে তুলেছে। 'মেঘদূত' কবিতার যে-অংশটা বাহ্যত কালিদাসের মেঘের যাত্রা-পথের সংক্ষেপ মাত্র, সেখানেও এর পরিচয় পাওয়া যায়—

"কোথা আছে
সানুমান আম্রকূট ; কোথা বহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্য-পদমূলে
উপল-ব্যথিত-গতি ; বেত্রবতী-কূলে
পরিণত-ফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা।"

এ মেঘদূত কিন্তু ঠিক মেঘদূত নয়। কালিদাস আঙুল তুলে যে-দিকে দেখিয়েছেন, কবি সেই দিকেই চেয়েছেন, কিন্তু দেখেছেন নিজের চোখে। ভাষা ও ছন্দ' কবিতায়,—

"বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি' সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহা দৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক
কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরা মাঝে দুঃখ মহত্তম,—"

রামায়ণের রামচরিত্রই বটে। কিন্তু আদিকাণ্ডের প্রথম সর্গে বাল্মীকি-নারদ প্রশ্নোত্তরের মধ্যে ঠিক এ জিনিস পাওয়া যাবে না।

মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণের প্রসঙ্গ ও উপাখ্যান রবীন্দ্রনাথের অনেক-গুলি কাব্যের উপাদান। প্রাচীন ভারতবর্ষের এই বিশাল ও মহান্ সাহিত্য তাঁর কবি-চিত্তের অনেকখানি জুড়ে আছে। কিন্তু এখানেও তাঁর প্রতিভা সৃষ্টি করেছে তা নতুন সৃষ্টি। এইসব কাব্যে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক সুপরিচিত পাত্র ও পাত্রীর উপর যে কল্পনার আলো ফেলেছেন তাতে মনে হয় যেন 'নতুন লোকে' তাদের সঙ্গে 'নতুন করে শুভদৃষ্টি হলো'। 'গান্ধারীর আবেদন' ও 'কর্ণকুন্তী সংবাদে' রবীন্দ্রনাথ, ব্যাস যাদের সৃষ্টি করেছেন, তার ধারা ধরেই মহাভারতের এই চরিত্রগুলির একেবারে অন্তস্তলে পাঠককে নিয়ে গেছেন। গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের মুখে

রবীন্দ্রনাথ যে-সব কথা দিয়েছেন, কর্ণ ও কুন্তীকে দিয়ে যা বলিয়েছেন তা অনেক কথাই মহাভারতে নেই। কিন্তু সে-সবই যে মহাভারতের ধৃতরা ও গান্ধারী, কর্ণ ও কুন্তীর মুখের কথা তাতেও সন্দেহ নেই। এসব চরিত্র রবীন্দ্রনাথ নিজের কল্পনায় একেবারে আত্মসাৎ করে নিয়েছেন। এবং তাঁ কাব্যে এদের নতুন কথা ও নতুন কাজ অত্যন্ত পরিচিত লোকের স্বাভাবি কথা ও কাজ মনে হয়।

> "হের দেবী পরপারে পাণ্ডবশিবিরে
> জ্বলিয়াছে দীপালোক—এবার অদূরে
> কৌরবের মন্দুরায় লক্ষ অশ্বখুরে
> খর শব্দ উঠিছে বাজিয়া।"

মহাভারতে নেই। কিন্তু মহাভারতের যুদ্ধপর্বগুলিতে আসন্ন যুদ্ধের ভীষণ-গম্ভীর রস পুনঃ পুনঃ ফুটে উঠেছে এ তারি রূপ।

'চিত্রাঙ্গদা'[৪] ও 'বিদায় অভিশাপ' মহাভারতের অতি সামান্য ভিত্তির উ কবির সম্পূর্ণ কল্পনার সৃষ্টি। এ দুই কাব্যের যে-রস তার সঙ্গে মহাভার উপাখ্যান দুটির সম্পর্ক নেই। এখানে পৌরাণিক চরিত্র ও আখ্যান ক কল্পনাকে জাগায় নি, কবির কল্পনাই এদের আশ্রয় করেছে। এ দুই জা তবুও গল্পে এক-একটা কাঠামো ছিল; কিন্তু রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গের উপা থেকে যে 'পতিতা'র কল্পনা তা রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব।

রামায়ণ ও মহাভারতের প্রসঙ্গ নিয়ে আধুনিক বাঙ্গালায় কাব্য-রচ কথায় স্বভাবতই মাইকেলের কথা মনে হয়। 'মেঘনাদ-বধ' ও 'তিলোত্ত বাহ্যিক গড়ন, সংস্কৃত 'ক্লাসিক' কবিরা পৌরাণিক উপাখ্যান নিয়ে যে কাব্য রচনা করেছেন, ঠিক সেই গড়ন। এবং এই দুই কাব্যের অ মিলও ঐ 'ক্লাসিক' কবিদের কাব্যের সঙ্গে। পুরাণ থেকে আখ্যানবস্তু নে হয়েছে মাত্র, কিন্তু তার ঘটনা কি চরিত্র কবির চিত্তের রসের তারে জোরে ঘা দেয় নি। কাব্য-সৃষ্টিতে কবি যে-কল্পনা এনেছেন তা পু

৪। সুশীলকুমার গুপ্ত বলিয়াছেন—"চিত্রাঙ্গদার সংলাপে কতকগুলি সংস্কৃত নাটকের ি করে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এর প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায়।"—'রবীন্দ্র-নাট্য-প্র কাব্যনাটক', পৃ. ১৫৩

সঙ্গকে অতিক্রম করে পাঠককে রসের একটা সম্পূর্ণ নতুন লোকে নিয়ে য় না। এ কাব্য পৌরাণিক আখ্যানের ঘরেই থাকে, কিন্তু 'পেইং গেস্ট'। বীন্দ্রনাথ থাকেন বাহিরে, কিন্তু তিনি ঘরের লোক। বাড়ি যখন আসেন খন একেবারে অন্তঃপুরে যেয়ে উপস্থিত হন। 'বীরাঙ্গনা'য় বিদেশী কবির ল্পনার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মাইকেল অতি সূক্ষ্ম পৌরাণিক সূত্র ধরে ভিনব রস-সৃষ্টি করেছেন। এ কাব্য 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'বিদায়-অভিশপ'-এর মশ্রেণীর কাব্য। স্বাদের যে তফাৎ সে হচ্ছে দুই বিভিন্ন প্রতিভার সৃষ্টির ভেদ।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য ভারতবর্ষের কাব্য-সৃষ্টির ধারায় সংস্কৃত কাব্যের পরম গৌরবের যুগের সঙ্গেই একমাত্র নিজেকে মিলাতে পারে। তাঁর কাব্য সেইজন্য তাঁকেই স্মরণ করায় যিনি রবীন্দ্রনাথের অপরূপ কল্পনায় উজ্জয়িনীর াজ-কবি ছিলেন না, কৈলাসের প্রাঙ্গণে মহেশ্বরের আপন কবি ছিলেন; যাঁর াব্য-পাঠের শেষে নিজের কান থেকে বর্হ খুলে গৌরী কবির চূড়ায় পরিয়ে দিতেন। রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কবি, কিন্তু তিনি কালিদাসের কালেই জন্মেছেন।



নটরাজ

অরসিক রায়

আমাদের সৌভাগ্য যে বঙ্গবাণীর দরবারে 'নটরাজ'ই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র অর্ঘ্য নহে। ঋতুরঙ্গশালায়ও ইতিপূর্বে বারবার তাঁহার ডাক পড়িয়াছে; তিনি কবিতা ও গানের অপূর্ব পুষ্পসম্ভার লইয়া বহুবার তথায় উপস্থিত হইয়া অফুরন্ত দানে রঙ্গশালা ছাইয়া ফেলিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার সমসাময়িক, তাঁহারা তাঁহার পুষ্প-অর্ঘ্যের মধুগন্ধে বিহ্বল হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে

দ্রষ্টব্য : সজনীকান্ত দাসের 'নটরাজ' নামক প্রবন্ধটি 'অরসিক রায়' ছদ্মনামে সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি' (২য় বর্ষ, ৯ই ভাদ্র, ১৩৩৪) পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে পাঁচ সংখ্যায় (ভাদ্র হইতে আশ্বিন) প্রকাশিত হয়। এস্থলে ইহা অংশত মুদ্রিত হইয়াছে। সজনীকান্ত দাস ব্যঙ্গভাবে 'শনিবারের চিঠি'র মাধ্যমে বহু প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যস্রষ্টাদের বিপক্ষে বিষোদ্গার করিবার

করিতেছেন সে পুষ্পমাধুর্য ও সৌরভ ম্লান হইবার নহে, অনন্ত অনাগত কালেও তাহা অমলিন অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিবে।[১] "গ্রীষ্মের বর্ষার জলবিন্দু, শরতের নির্মলতা, হেমন্তের কুজ্ঝটিকা, শীতের নিবিড়তা ও বসন্তের পুষ্পোৎসব"—সমগ্র জগতের কাব্যসাহিত্যে তাঁহার মত কে পরিপূর্ণভাবে বাণীর চরণে বাঁধিয়া দিতে পারিয়াছে? প্রকৃতিরাণীর দরবারে শ্রেষ্ঠ আসন তাঁহার প্রাপ্য।[২]

ঋতুরঙ্গশালার ভোজে তিনি এতদিন ধরিয়া আমাদিগকে নানাবিধ ভোজ্যের স্বাদ ও রসের সহিত পরিচিত করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার এই নব পরিবেশিত পদটি চাখিয়া যাচাই করিয়া লইবার সুবিধা পাইতেছি। তিনি ইতিপূর্বে যাহা দিয়াছেন, তাহাকেই আদর্শ করিয়া আমি তাঁহার এই নূতন দানের বিচার করিব। আশা করি ইহাতে কেহই ক্ষুণ্ণ হইবেন না।

বিশ্ববাণীর দরবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যতখানি গৌরব তাহা

কালে, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেও নির্বিচারে অসি চালনা করেন। 'শনিবারের চিঠি'র 'প্রসঙ্গ-কথা' মুদ্রিত উক্ত ধরনের কিছু নিদর্শন, পরবর্তী পরিশিষ্টের 'খ' অংশে মুদ্রিত হইয়াছে।

'নটরাজ' ঋতু-গীতিনাট্য বা পালাগানখানি ১৩৩৪ সালের আষাঢ় সংখ্যার 'বিচিত্রা' পত্রিকা প্রকাশিত হইলে পর সজনীকান্ত দাস কর্তৃক এই বিরুদ্ধ সমালোচনাটি আত্মপ্রকাশ করে এই বিষয় পরবর্তীকালে তিনি লিখিয়াছিলেন যে—"রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী, চিত্রা, কল্পনা খেয়া প্রভৃতি এবং প্রচলিত পুরাতন গানগুলি হইতে দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া 'নটরাজে'র পঙ্‌ক্তি সহিত তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলাম যে, 'নটরাজ' রবীন্দ্র প্রতিভার আরোহণ নয়, অবতরণ।"—'আত্মস্মৃতি', ২য় খণ্ড, পৃ. ২

এই বিরুদ্ধ সমালোচনাটি সম্পর্কেই সজনীকান্ত অনুতপ্ত হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথকে একখা দীর্ঘ পত্র লিখিলে, রবীন্দ্রনাথ তাহার উত্তরে (১৩ই ডিসেম্বর, ১৯২৭) লিখিয়াছিলেন যে-

১। বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের 'লিপিবিবেক' নামক গ্রন্থের একটি উক্তি এস্থলে উল্লেখ্য—"রবীন্দ্র সাহিত্য-সমুদ্রের যাঁহারা পাকা ডুবুরী তাঁহারা মণি-মুক্তার সন্ধান বিস্তর পাইয়াছেন। রত্নাকর মতই সে ভাণ্ডার অক্ষয়। ডুবিতে জানিলেই হইল, কিছু না কিছু মিলিবেই।"

২। 'বনফুল' তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথের আত্মসম্মান' নামক একটি রচনার মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন "শুধু বাংলার প্রকৃতিকেই নয় বাংলার ছেলেকে, বাংলার মেয়েকে, বাংলার সমাজকে, বাংলার লোককে, বাংলার বাউলকে, বাংলার কীর্তনকে, বাঙালী প্রতিভার বৈচিত্র্যকে তিনি সগৌরবে তাঁহার সাহিত্য-কৃতির মধ্যে স্থান দিয়ে গিয়েছেন।"

পনেরো আনা রবীন্দ্রনাথকে লইয়াই।৩ বিচারের দ্বারা তাঁহাকে ছোট করিতে গেলেই আত্মহত্যা করা হইবে। অনেকে এইজন্য আমাদিগকে মহা অপরাধে অপরাধী করিবেন। যাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে তাহা প্রকাশ করিলে যদি মহাপাতকও হয়, আমরা তাহার শাস্তি মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসি বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের বিচার করিতেছি। শ্রদ্ধা ও স্নেহের বিচার সকল ক্ষেত্রেই মার্জনীয়।

অত্যন্ত শিশু বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম বর্তমান পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহা লইয়াই কেবলমাত্র জয়ঢাক পিটাইলেই বাণীর অর্ঘ্য সম্পূর্ণ হয় না, এককে লইয়া ধর্ম চলিতে পারে, কিন্তু সাহিত্য চলে না। সাহিত্যের বহু বিস্তৃতি, অনেক দিক। একমাত্র বসরাই গোলাপ ফুটাইলেই যেমন বাগান সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না, তেমনই কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের সুস্বরলহরীতে বাণীর বোধন সার্থক নহে।

"আত্মশক্তি'তে কয়েক সংখ্যা ধরে নটরাজের যে সুদীর্ঘ নিন্দাবাদ প্রকাশ হইয়াছিল, সেটা তোমার লেখা বলে আমি জানতুম না বা সন্দেহ করিনি।...এ সম্বন্ধে তোমার মত যদি আমাকে লিখিয়া জানাইতে, আমার কৈফিয়ৎ আত্মীয়ভাবে তোমাকে জানাইতে পারিতাম। কিন্তু 'আত্মশক্তি'তে তোমার সহিত পাল্লা দিতে পারি না, সে কথা তুমি জানো। এমন অবস্থায় ছাপার কাগজের উচ্চাসনে গুপ্তভাবে বসিয়া আমার প্রতি সরাসরি বিচারে যথেচ্ছ দণ্ড বিধান করা তোমার পক্ষে সহজ, কিন্তু এমন কাজ তুমি করিতে পারো তাহা সন্দেহ করা আমার পক্ষে সহজ ছিল না।"

'নটরাজ' প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে, ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯১। রবীন্দ্র-রচনাবলীর অষ্টাদশ খণ্ডে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে পরিবর্তিত আকারে।

সজনীকান্ত পরবর্তীকালে রবীন্দ্রবিদ্বেষ ও তৎকালীন সাহিত্যস্রষ্টাদের বিরুদ্ধে সোজাসুজি আক্রমণের পথ ত্যাগ করিয়া একটি তির্যক ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত তাঁহার রচনার মধ্যে একস্থানে উল্লেখ করিয়াছিলেন—"ভাবখানা এমন করা যাক, যেন সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার নিয়েছি—মুখে মোটা করে মুখোশ টানা যাক—পুলিস কনস্টেবলের মুখোশ।"

৩। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁহার 'শতবর্ষ শেষে' নিবন্ধে প্রসঙ্গতঃ লিখিয়াছেন—"বাংলা যাদের ভাষা তাঁর কাছে তাদের ঋণের সীমা-পরিসীমা নেই। আমাদের ভাষা শুধু নয়, চিন্তা, ভাবনা, স্বপ্ন, কল্পনা, দৃষ্টি ও বোধ সবই তাঁর দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত।"—'আনন্দবাজার পত্রিকা', ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৯ সাল।

প্রত্যেকের দেয় আছে—প্রত্যেকেই কিছু না কিছু ক্ষুদ্র বৃহৎ দিবে। কিন্তু বাণীমন্দিরের বর্তমান পুরোহিত যাঁহারা—অন্য সকলের দান উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা শুধু রবীন্দ্রনাথকে লইয়াই বাণীর অর্চনা সারিতে চাহিতেছেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথেরও অপমান করা হইতেছে এবং উপেক্ষিত সাধকদিগকেও নিস্তেজ ও দুর্বল করিয়া দেওয়া হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ ভাল লিখিতেছেন কি মন্দ লিখিতেছেন তাহা বিচার করিবার সাহস কাহারও নাই, অর্ধ শতাব্দীর অভ্যাসের মোহে তিনি যাহাই লিখিতেছেন, চরমতম কাব্য হইতে তুচ্ছতম বাজার হিসাব পর্যন্ত—সকলই সাদরে সাহিত্যভোজে ভোজ্যরূপে চালাইবার চেষ্টা হইতেছে, যে যাহা পাইতেছ তাহাই মাথায় তুলিয়া লও, লোভ করিবার মত বস্তু অন্য কুত্রাপি কিছুমাত্র নাই।

সাহিত্যে এই 'একরস পরিবেশন' সর্বনাশের সূচনা করে। ইহার প্রতিবাদ-স্বরূপই আমি আজ রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতম লেখার সমালোচনা করিতে বসিয়াছি। আমার উদ্দেশ্য এই যে সাধারণে যেন যাচাই করিয়া সমস্ত জিনিস গ্রহণ করে এবং প্রত্যেক সাহিত্যসেবীই যেন তাহার প্রাপ্য সম্মান বুঝিয়া পায়।

কাব্য ও কবিতার দিক দিয়া সন্ধ্যাসংগীত হইতে প্রভাতসংগীত, প্রভাত-সংগীত হইতে কড়ি ও কোমল, কড়ি ও কোমল হইতে মানসী, মানসী হইতে সোনার তরী, সোনার তরী হইতে চিত্রা, চিত্রা হইতে কল্পনা, কল্পনা হইতে ক্ষণিকা, ক্ষণিকা হইতে খেয়া ও খেয়া হইতে বলাকা পর্যন্ত উত্তরোত্তর তাঁহার শক্তিবৃদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

তাহার পরই রবীন্দ্রনাথের কবিতা গতানুগতিকতা দোষে দুষ্ট দেখিতে পাই। পূরবীতেও তিনি যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিলেও পূরবীর প্রায় সর্বত্রই তিনি পুরানো কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন—অথচ পুরাতনের সে প্রাণশক্তি হারাইয়াছেন। তাহার পরই তাঁহার পতন হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সে সংযম ও বাঁধুনি পূরবী হইতেই নষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে, বহু স্থানে তিনি আপনাকে আপনি অনুকরণ করিয়াছেন। পুরাতন কবিতার ভাব ও ভাষা এমন কি পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি লইয়া তিনি ঢালিয়া সাজাইয়াছেন; কিন্তু পূর্বের সুষমা ও শক্তি নষ্ট হইয়াছে। বিধিদত্ত অপূর্ব প্রতিভাবলে তিনি যে মাঝে মাঝে মনের বার্ধক্যকে জয় করিয়া প্রচণ্ড শক্তিতে অপূর্ব বস্তু সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন নাই একথা সত্য নহে। তবে এখন তাঁহার শক্তিপ্রকাশ কচিৎ কদাচিৎ

লক্ষিত হয়। পূরবীর অন্তর্গত 'যৌবন-বেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি' লীলাসঙ্গিনী, যাত্রা, ক্ষণিক, আহ্বান, ঝড়, পদধ্বনি, অন্ধকার, প্রাণগঙ্গা প্রভৃতি কবিতা তাঁহার এই অপূর্ব শক্তির সাক্ষ্য দিতেছে।

'নটরাজ' তেমনটি হয় নাই। বহুস্থানে কাব্যরস ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, অধিকাংশ কবিতা ও গান অত্যন্ত সাধারণ গোছের। ছন্দ, রস, শব্দ ও ভাবের যে বাঁধুনির জন্য রবীন্দ্রনাথের এত খ্যাতি, এই পালায় রবীন্দ্রনাথ সেই বাঁধুনি বজায় রাখিতে পারেন নাই। তিনি যেন ছন্দ ও শব্দ লইয়া খেলা করিয়াছেন মাত্র। শিল্পসৃষ্টি করিতে পারেন নাই।[৪]

রবীন্দ্রনাথ পালাগানখানির নাম দিয়াছেন—'নটরাজ'। এই বিরাট নামের সার্থকতা এই পালাখানিতে দেখিতে পাইলাম না। নটরাজ বলিতে মনে যে ভাব জাগিয়া উঠে রবীন্দ্রনাথের 'নটরাজে' তাঁহার পরিচয়ও মিলে না। সমগ্র নাটকখানি পড়িয়া এই পালাগানখানির নায়ক 'নটরাজ'কে বিশেষ কেহ বলিয়া মনে হয় না, তাঁহার বিরাটত্ব, রুদ্রত্ব ইত্যাদি কিছুই মনকে নাড়া দিতে পারে না।

এইবার কবিতাগুলির আলোচনা করা যাউক। প্রত্যেক কবিতা বা গান লইয়া এভাবে বিচার করিলে ঠিকমত বিচার করা হয় না—ইহা আমরা জানি; তাই আমরা খুঁটিনাটি লইয়া আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব না। যে সকল বৃহৎ অসংগতি, রসাভাস ইত্যাদি আমাদের চোখে পড়িয়াছে কেবল-মাত্র সেইগুলিরই উল্লেখ করিব। রবীন্দ্রনাথের এই নাটিকাখানির প্রত্যেকটি কবিতা লইয়া তাঁহার আগেকার লেখার সহিত মিলাইয়া দেখিলেই যে কেহ রবীন্দ্রনাথের লেখার অবনতি দেখিতে পাইবেন; আমরা মোটামুটি কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াই ক্ষান্ত থাকিব।

'উদ্বোধন' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ নিজের অনুকরণ করিতে গিয়া নিষ্ফল হইয়াছেন। ইহা তাঁহার বিখ্যাত 'বর্ষশেষ,' পূরবীর 'যাত্রা' ও বলাকার

৪। প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁহার 'ছন্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' নামক রচনাটির মধ্যে উপর্যুক্ত মত অস্বীকার করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—"বস্তুতঃ 'মানসী', (১২৯৭) রচনার সময় থেকেই বাংলায় যে নূতন ছন্দোধারা প্রবর্তিত হ'ল, তা বাংলা গীতিকবিতার সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ বলেই স্বীকৃত হয়েছে।...এই নূতন রীতি ও তার বিচিত্র রূপভেদের ফলে বাংলা ছন্দ অভূতপূর্বরূপে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল।"

'পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি' ইত্যাদি কবিতা স্মরণ করাইয়া দেয়। পুরাতনকে, জীর্ণ দীর্ণ জড়ত্বকে ভাঙিয়া ফেলিয়া নূতনের মাঝে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য একটা অদম্য ব্যাকুলতা এই কবিতায় আছে। কিন্তু, ভাবার সে সুতীব্র প্রাণশক্তি নাই, পাঠকের মনে কবিতাটি দাগ রাখিতে পারে না।...

'উদ্বোধন' কবিতার শেষের অংশটি পড়িয়া আমাদের মনে হতাশার সঞ্চার হইয়াছে। এই অংশটিতে আমরা রবীন্দ্র-পরবর্তী সাহিত্যের নিকট রবীন্দ্রনাথের পরাজয় লক্ষ্য করি। ইহা অবশ্য সর্বত্র দোষের নহে, কিন্তু এখানে সত্য সুন্দরের উপাসক রবীন্দ্রনাথ বীভৎস বিদ্রোহ-রসের মোহে পড়িয়াছেন।[৫] শব্দের ও ছন্দের ঝংকার আছে কিন্তু অর্থসংগতির অভাব মনকে পীড়া দেয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা এই কবিতাটি পাঠ করিলেই আমাদের কথা বুঝিতে পারিবেন। রৌদ্রদগ্ধ তপস্যার মধ্যে সুন্দরের লাগি' অর্ঘ্যমালা সাজাইতে দেখিতেছেন ; এমন সময়ে—

"অকস্মাৎ কোমলের কমলমালার স্পর্শ লেগে
শান্তের চিত্তের প্রান্ত অহেতু উদ্বেগে
ভ্রূকুটিয়া ওঠে কালো মেঘে ;

*　　*　　*

মুহূর্তে অম্বরবক্ষে উলঙ্গিনী শ্যামা
বাজায় বৈশাখী-সন্ধ্যা ঝঞ্ঝার দামামা,
দিগ্বিদিকে নৃত্য করে দুর্বার ক্রন্দন।"

মনে হয় নজরুলী কবিতা পড়িতেছি। রসাভাস স্পষ্ট, কদর্যতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, শ্যামা ও দামামার মিল ভাল হয় বটে কিন্তু শ্যামাকে দিয়া দামামা বাজাইলে আমাদের পৌরাণিক সংস্কারকে ক্ষুণ্ণ করা হয়।

"দিগ্বিদিকে নৃত্য করে দুর্বার ক্রন্দন।"—হায় রবীন্দ্রনাথ!

'মাধুরীর ধ্যান' কবিতাটির ভাব স্পষ্ট নহে।

৫। এই প্রসঙ্গে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের 'বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ' (প্রকাশকাল: ১৯৩১) গ্রন্থের একটি ভিন্ন ধরনের উক্তি স্মরণ করা যায়। তিনি বিদ্রোহী সম্পর্কে লিখিয়াছেন—"বিদ্রোহী সেই, মিথ্যা জীর্ণ সংস্কারকে যে আঘাত করে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের চিত্তে নব নব চিন্তাধারা আনিয়া দিয়াছেন। সেই সকল চিন্তা সতেজ, সবল, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ভয়ংকর।" পৃ. ১০৫

'প্রত্যাশা'র গানটিও রবীন্দ্রনাথের অক্ষমতার পরিচায়ক। হসন্ত অন্ত শব্দ দিয়া ১৬ লাইন কবিতা লিখিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ একেবারে কাত হইয়াছেন। 'পরান-ভরানো ঘন ছায়াজাল' কি রবীন্দ্রনাথের কানে বেসুরা বাজে নাই? তাঁহার সূক্ষ্ম ছন্দজ্ঞান কি নষ্ট হইয়াছে?

আষাঢ় আসিল। কবি আষাঢ়ের অপূর্ব বন্দনা-কবিতা লিখিয়াছেন। এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের মান ক্ষুণ্ণ করে। যে রবীন্দ্রনাথ মানসীতে—একাল ও সেকাল; সোনার তরীর—বর্ষাযাপন; কল্পনার—বর্ষামঙ্গল; ক্ষণিকার—আষাঢ়, নববর্ষা, আবির্ভাব; খেয়ার—ঝড়, গানশোনা ও বর্ষা বিষয়ক অসংখ্য সংগীত রচনা করিয়া বাঙলা সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছেন। এই 'আষাঢ়ে' কবিতাটি তাঁহার আর একটি দান। একটু উদ্ধৃত করিতেছি—

"তোমার ললাটে জটিল জটার ভার
নেমে নেমে আজি পড়িছে বারংবার,
বাদল আঁধার মাতালো তোমার হিয়া,
বাঁকা বিদ্যুৎ চোখে ওঠে চমকিয়া।

* * *

মনে পড়িল কি ঘন কালো এলোচুলে
অগুরু ধূপের গন্ধ?
শিখি-পুচ্ছের পাখা সাথে দুলে দুলে
কাঁকন-দোলন ছন্দ?
মনে পড়িল কি নীল নদীজলে
ঘন শ্রাবণের ছায়া ছলছলে,
মিলি মিলি সেই জল-কলকলে
কলালাপ মৃদুমন্দ;
চকিত-পায়ের চলা দ্বিধাহত,
ভারু নয়নের পল্লব নত,
না-বলা কথায় আভাসের মত
নীলাম্বরের প্রান্ত?"

সকল কবিতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার স্থান নাই। আমরা কয়েক কবিতার ভালো ও মন্দের আভাস মাত্র দিব।

'শ্রাবণ বিদায়' কবিতাটি কবিতা হয় নাই। বর্ষা বিদায় লইবার কালে কি কি পদার্থ ধরণীতে রাখিয়া গেল ইহা তাহারই একটি তালিকা মাত্র।

'শাস্তি' বর্ষাবিদায়ের গান। পাগল (?) আজ বিদায়রজনীতে অর্গল খুলিয়াছে। তুই কি তাহার চরণে ডোর বাঁধিতে চাস? গগন তাহার (?) মেঘ-দ্বার ঝাঁপিয়া বুকের ধন বুকেতে চাপিয়া ছিল। হিম হাওয়ায় সে দ্বার কাঁপিয়া গেল। যাহা ঘিরিয়া ছিল তাহা শূন্যে মিলাইল, সেই ফাঁক দিয়া আলো আসুক। এই কবিতার পাগল কে তুই-ই বা কে, স্পষ্ট বুঝা গেল না।

'শেষ মিনতি' গানটি ছন্দের জন্য পড়িতে বেশ লাগে—তবে 'কেন উদ্‌ভ্রান্ত অশান্ত মতো'—নেহাত গদ্য।

শরৎ-বর্ণনায় কবি মেঘভারকে মায়া বলিয়াছেন অথচ বৈশাখের রুদ্র দাহনের কালে ইহাকেই বিধাতার প্রসন্ন বর ভাবিয়া বন্দনা করিয়াছেন। শরতে রাজচক্রবর্তীরা দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইতেন, ইহা আমরা জানি। কিন্তু এই দিগ্‌বিজয় যাত্রা তো উপকথার দিগ্‌বিজয় নয়—সত্যকার। রাক্ষসপুরী জিনিয়া লইয়া বন্দিনী রাজকন্যাকে জয় করিবার জন্য, কার্মুক হস্তে অশ্বে চড়িয়া দুস্তর প্রান্তর ও মায়াজাল ভেদ করিয়া দানবের বুকে অস্ত্র হানিতে উপকথার রাজপুত্র যায় বটে, কিন্তু দেবসেনাপতি দৈত্যজয়ী কুমারের জয়-যাত্রা এরূপ নয়।

'শরতের ধ্যান' কবিতাটি সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের লেখা বলিয়া মনে হয় না। গীতাঞ্জলির "শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে" "আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ" কিংবা "আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরি খেলা" ইত্যাদি গানের সহিত তুলনা করিলে এই কবিতাটির দৈন্য ধরা পড়বে। এই ধরনের কবিতা 'নাচঘর' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাতে প্রায়শঃই পড়িয়া থাকি।

'শরতের বিদায়' গানটি সত্যেন্দ্রনাথের অক্ষম অনুকরণ। তাও আবার ১২ লাইন কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ছন্দ বজায় রাখিয়া চলিতে পারেন নাই। দুর্গতি ইহাকেই বলে। "আনিল হায় বনছায়ায়"—ছন্দ কাটিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা হয়—

"কেমন ভুল, এমন ভুল?"

'হেমন্ত' কবিতাটি কবিতা হইলেও ইহাতে রবীন্দ্রনাথের বাণী যেন স্থবিরা

হইয়াছেন। এই কবিতাটিও রবীন্দ্রনাথের মনে জড়ত্বের আগমন সূচিত করিতেছে। রূপ যখন বিদায় লয় তখনই অলংকারের দিকে লোকের দৃষ্টি পড়ে। 'নটরাজ' নাটকে বহু স্থানে ভাব পঙ্গু হইলেও ছন্দ দিয়া রবীন্দ্রনাথ ভাবের অভাব ঢাকিতে চাহিয়াছেন। 'হেমন্ত' কবিতাটিতেও অনুপ্রাসের ঘটা আছে। স্থলে স্থলে ইহা হাস্যকর। যথা—"হে হেমন্তলক্ষ্মী, তব চক্ষু কেন রুক্ষ চুলে ঢাকা।"

"লুকায়ে দক্ষিণ হস্ত তব দক্ষিণা দিয়েছ তুমি আনি
ভূমিগর্ভে আপনার দাক্ষিণ্য ঢাকিয়া সাবধানে।"

'দীপালী' গানে—

"দেবতারা আজ আছে চেয়ে
জাগো ধরার ছেলেমেয়ে,
আলোয় জাগাও যামিনীরে"—

অনেকটা 'উঠ শিশু মুখ ধোও' শ্রেণীর কবিতা হইয়াছে।

'শীত' কবিতাটি ভালই লাগিল, কিন্তু—

"হে নির্মল,
সংশয়-উদ্বিগ্ন চিত্তে পূর্ণ করো বল।"
"কঠোর উদগ্রবলে
দুর্বলেরে করো তিরস্কার।"
"হিমশ্বাসে
আরাম করুক ধূলিসাৎ।"

রবীন্দ্রনাথের লেখনীর উপযুক্ত হয় নাই।

'শীতের বিদায়' কবিতাটিও ব্যথিত হইয়া পাঠ করিয়াছি। ইহাও কি রবীন্দ্রনাথের হস্তলিখিত? 'ফাল্গুনী'র একটি ছোট কবিতায় যে ভাব চমৎকার হইয়া ফুটিয়াছিল সেই ভাবই 'শীতের বিদায়' কবিতাটিতে শ্রীহীন হইয়া দেখা দিয়াছে। এ কবিতায় একেবারে প্রাণ নাই।

"হেলায় যে জন ফেলায় সকল তার"
"প্রতাপের তাপ মিলাবে গানের সুরে"
"এতদিন তুমি বনের মজ্জা মাঝে
বন্দী রেখেছ যৌবনে কোন কাজে।"
"ক্ষয়ের দুঃখে দীক্ষা যাহারে দিলে

সব দিকে যার বাহুল্য ঘুচাইলে—
প্রাচুর্যে তার হ'ল আজি অধিকার।"

'বসন্ত আবাহন,' 'বসন্তের বিদায়,' 'প্রার্থনা,' 'অহৈতুক,' 'বিলাপ' প্রভৃতি কবিতা ও গান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই।

'মনের মানুষ' কবিতাটির ছন্দ ও ভাব সুন্দর।' ইহা রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' 'ক্ষণিকা' বা 'লীলাসঙ্গিনী' জাতীয় কবিতা। এই মনের মানুষ বা মানসী কে কবি আজো তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারেন নাই—

"কত ফাল্গুনের দিনে
চলেছিনু পথ চিনে
কত শ্রাবণের রাতে
লাগে স্মরণের ছোঁওয়া—
চাওয়া পাওয়া নিয়ে খেলা
কেটেছিল কত বেলা
কখনো বা পাই পাশে
কখনো বা যায় খোওয়া!"

'চঞ্চল' ও 'দোল' কবিতা দুইটি ভাল। 'শেষের রঙ' গানটি কতকটা—

"আমার কথাটি ফুরালো
নটে গাছটি মুড়ালো"—

ধরনের ছন্দে লিখত। তবে 'কাঁদন বাঁধন ভাগিয়ে দিয়ে' নিতান্ত অকবি-জনোচিত হইয়াছে।

শেষ কবিতা 'শেষ মধু' সুন্দর। ইহা পূর্বে অন্য মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের 'নটরাজ' পালাগানখানির ইহাই হইল বিশ্লেষণমূলক আলোচনা। অনেকে বলিতে পারেন, এইরূপ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দোষ দেখাইতে গিয়া আমি কবির প্রতি অন্যায় করিয়াছি এবং রবীন্দ্রনাথের যে-কোন লেখা লইয়া এইভাবে আলোচনা করিয়া তাহার লাঞ্ছনা করা যায়। এ সম্বন্ধে আমার একটি কথা বলিবার আছে। জীবন্ত মানুষকে লইয়া যেমন ডিসেকশন করা চলে না, এবং চলিলেও তাহা যেমন করা হয় না, তেমনি জীবন্ত ও প্রাণশক্তিসম্পন্ন লেখাকে তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ না করিয়া সমগ্রভাবে

বিচার করাই সংগত। রবীন্দ্রনাথের 'নটরাজ' লেখাটি প্রায় সর্বত্র নির্জীব ও প্রাণহীন বলিয়াই ইহাকে বিশ্লেষণ করিবার প্রবৃত্তি আমার হইয়াছে। নতুবা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লেখা লইয়া এইরূপ দোষত্রুটি ধরিবার স্পর্ধা আমি করি না। রবীন্দ্রনাথের আগেকার লেখার যে কোন দোষত্রুটি নাই, ইহা আমরা বলি না। কিন্তু সকল দোষত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও দুর্গম দুরন্ত প্রাণাবেগে তিনি আমাদিগকে বহন করিয়া লইয়া যান। বিচার করিবার অবসর পর্যন্ত দেন নাই। 'নটরাজ' পালায় প্রাণের সেই বেগ নাই, গতিহারা স্রোতের মত ইহার সহস্র শৈবালদাম সরাইয়া জলের সন্ধান করিতে চেষ্টা করিয়াছি, অন্যায় কিছু করিয়াছি বলিয়া মনে করি না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনের দশম বর্ষ হইতে সপ্তষষ্টিতম বর্ষ বয়স পর্যন্ত কবিতা, গল্প ও গানে বঙ্গবাণীর পূজামণ্ডপ ছাইয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার দান আজিও নিঃশেষিত হয় নাই। তিনি অক্লান্তভাবে লেখনী চালাইতেছেন—এই সকল আধুনিক লেখার অধিকাংশই যে রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত নহে, এই সত্য অস্বীকার করা যায় না। করিলে, রবীন্দ্রনাথের অপমান করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ আজীবন কবিতাচর্চা করিলেও আজকাল যে সকল কবিতা ও গান রচনা করিতেছেন সেগুলি না লিখিলেও বাংলা সাহিত্যের ক্ষতি হইত বলিয়া মনে হয় না। তাহার অধিকাংশই যেন প্রাণহীন ফরমায়েশী কবিতা। নিজের কবিতারই হীন অপটু অনুকরণ; নূতন কোন ভাব, সৌন্দর্য বা তথ্য এইগুলির মধ্যে পাই না। রবীন্দ্রনাথ যদি আপনার মরিচাধরা তরবারি লইয়া ছন্দকৌশল দেখাইবার ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া, তাহাকে শানাইয়া বঙ্গসাহিত্যে অনাচারের স্রোত বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারে যাহা দিয়াছেন তাহা তৌল করিয়া দেখিবার মত তুলাদণ্ড আজিও সৃষ্ট হয় নাই এবং কোনকালেই হইবে না।[৬] এ ক্ষেত্রে

৬। এই প্রসঙ্গে 'রবীন্দ্রমনের দার্শনিক ভিত্তি' নামক প্রবন্ধটিতে নন্দগোপাল সেনগুপ্তের নিম্নোক্ত উক্তিটি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য—"সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য রবীন্দ্র-জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে তন্ন তন্ন করে পড়া এবং তা থেকে তত্ত্ব ও তথ্যের নিষ্কর্ষ আহরণ করে কোন প্রমাণসহ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যতখানি পরিশ্রম ও মননশীলতার কাজ তা করার মতো মানুষ এখনো আমাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না।"

'নটরাজ' পালাগানখানি লইয়াই তাঁহার শক্তির বিচার করিতে যাওয়া মূর্খত মাত্র। আমি তাহা করি নাই। একান্তভাবে 'নটরাজ' বইখানিরই সমালোচন করিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করি নাই। আমি শুধু রবীন্দ্রনাথের অন্ধ স্তাবকবৃন্দকে দেখাইতে চাই যে, তাঁহার এই ধরনের লেখাগুলিকেই তাঁহার শক্তির চরম বিকাশ বলিয়া প্রচার করিলে তাঁহার যথার্থ সুন্দর লেখাগুলির অপমান করা হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিও শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয় না। যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দিবার শক্তি দৈনন্দিন ব্যবহারিক জগতে কাহারো না থাকিলে ক্ষতি হয় না। কিন্তু সাহিত্যজগতে এই শক্তিই সৌন্দর্য উপলব্ধির যথার্থ সহায়ক। আমরা যেন এই বিচারের ক্ষমতা হারাইয়া অকারণ উচ্ছ্বাসের বশে সত্যকে ক্ষুণ্ণ না করি।[৭]

৭। এই ধরনের অসৌজন্যপূর্ণ উক্তিসমূহের উত্তরস্বরূপ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'নবীন কবি' নামক প্রবন্ধে ('বিচিত্রা', কার্তিক, ১৩৩৮) একবার যাহা লিখিয়াছিলেন, পাঠকগণের অবগতির জন্য এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"...কিছুকাল থেকে সাহিত্যক্ষেত্রে কোমর বেঁধে এই কাঁটাগাছের আবাদ চলেছে। যে-জাতের লোকের চরিত্র দুর্বল, তারা মানুষকে পীড়া দিয়েই বাহাদুরী করে। আমাদের দেশে বরযাত্রদের ব্যবহারে বাঙালী বহুকাল থেকে এই কাপুরুষতার পরিচয় দিয়ে এসেচে। যে-পক্ষ শত্রুপক্ষ নয়, কেবলমাত্র অপর পক্ষ তাকে কটুবাক্যে ও উদ্ধত ব্যবহারে উৎপীড়িত অবমানিত করাকে তারা স্বপক্ষের জিত বলে মাতামাতি করতে ভালোবাসে। কে কাকে দুয়ো দিতে পারলে এই নিয়ে তাদের আস্ফালন। অর্থাৎ কোন এক পক্ষের মাথা হেঁট হয়ে গেল এতেই ভারি খুশি। সে-পক্ষ অপরাধ করেচে বলে নয়, সে-পক্ষ আমার পক্ষে নয় বলে, এমন কি, তার কোন পক্ষীয় হবারই দরকার নেই। এই পীড়নের, এই অবমাননার অভদ্রতায় দর্শকদেরও মহা আনন্দ। সে আনন্দের মূল শত্রুতায় নয়, কটুবাক্য সম্ভোগের এবং কারো 'অসম্মানের' দৃশ্যটা দেখবার অহৈতুক পুলকে। অপমান করবার নৈপুণ্য কেবলমাত্র হতভাগ্য নিরপরাধ কন্যাপক্ষের ঘরে নয়, সাহিত্যের আসরেও জয়মাল্য সন্ধান করে।"

পরিশিষ্ট

॥ খ ॥

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকে প্রকাশিত টীকা-টিপ্পনী

'সাহিত্য'

১

সাধনা : ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা-

"আমরা রবীন্দ্রবাবুর 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' পড়িতে আরম্ভ করিয়া যেমন আমোদ পাইয়াছি, উপসংহারে তেমনই নিরাশ হইয়াছি। এই গল্পটির আরম্ভভাগ অতি মনোহর; বেশ স্বাভাবিক। ইহার প্রাঞ্জল ভাষা, সরল প্রণালী ও সহজ অলংকারে, গল্পটিকে আরও মনোহর করিয়া তুলিয়াছে। আদুরে খোকার খামখেয়ালি মেজাজ কেমন স্বাভাবিক! কিন্তু যখন রাইচরণ নিজের বুড় খোকাটিকে, মুন্সেফবাবুর সেই আদুরে খোকা বলিয়া আনিয়া দিতেছে, তখন আমাদের কেমন অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। মুন্সেফবাবু যেন, গল্পটি সমাপ্ত করিবার জন্যই, সন্দেহ সংশয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, পরের ছেলেটিকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। এই জন্য গল্পটি কেমন অঙ্গহীন ও কষ্টকল্পিত বলিয়া বোধ হয়।"—পৌষ, ১২৯৮

২

তর্কবৈচিত্র্য : (অংশতঃ গৃহীত) নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

"বঙ্গের দুইজন খ্যাতনামা লেখক কিছুদিন হইতে বিস্তর তর্ক করিয়া আসিতেছেন। সেই বিস্তারিত বাদপ্রতিবাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক বোধ হইতেছে। বাবু চন্দ্রনাথ বসু এবং বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে বিশেষ পরিচিত। উভয়ে মহৎ স্বভাব, উভয়ে স্বদেশানুরাগী। ইঁহাদের মধ্যে কোন বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হইলে অতিশয় শান্ত ও সংযত-ভাবে তর্ক হইবার কথা, অন্যথা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয়।

কয়েক বৎসর অতীত হইল, বাবু চন্দ্রনাথ বসু কোন বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার বিরুদ্ধে আর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। চন্দ্রনাথবাবু তাহার প্রত্যুত্তর দেন। সেই অবধি চন্দ্রনাথবাবু যে-কোন বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথবাবু সেই মত খণ্ডন করিয়াছেন। প্রতিবারেই তর্কের সূত্রপাত রবীন্দ্রনাথবাবু করিয়াছেন। এই কথাটা একটু খুলিয়া বলিতে হইতেছে। একটা কোন কথা যা যদি মতভেদ হয়, তাহা হইলে তর্কেরও গৌরব থাকে, শ্রোতা ও পাঠকগণও বিরক্ত হয় না। কিন্তু প্রতি কথায়, প্রতি মতে, তর্ক কিঞ্চিৎ বিরক্তিকর হইয়া উঠে। 'লয়তত্ত্ব' লইয়া যখন তর্ক উপস্থিত হয়, তখন

রবীন্দ্রবাবু গত ভাদ্র মাসের 'সাহিত্যে' লিখিয়াছিলেন, 'চন্দ্রনাথবাবু উত্তরোত্তর আমাদের প্রতি রাগ করিতেছেন, ইহাতেই আমরা কিছু চিন্তিত হইয়াছি।' জিতক্রোধ পুরুষ হইলে রাগ করা সকল অবস্থায় অন্যায়, কিন্তু সহজ মানুষের শরীরে একটু-আধটু রাগ থাকিবার কথা। রবীন্দ্রনাথবাবু যদি চন্দ্রনাথবাবুর অবস্থায় পতিত হইতেন, তাহা হইলে তিনি রাগ করিতেন কি না, সেই কথা জিজ্ঞাস্য।...মানিলাম, চন্দ্রনাথবাবুর মতই অপ্রামাণ্য, সকল সিদ্ধান্তই অসিদ্ধ, এবং সকল কথাই অগ্রাহ্য। কিন্তু এই কথা একবার বলিয়াই ত রবীন্দ্রনাথবাবু খালাস পাইতে পারেন। এক কথা বারংবার বলিবার প্রয়োজন কি? যদি এমন সম্ভাবনা থাকিত যে, চন্দ্রনাথবাবু নিজের ভ্রান্ত মত সমূহ ত্যাগ করিয়া অবশেষে রবীন্দ্রনাথবাবুর মত গ্রহণ করিবেন, তাহা হইলেও এই অনন্ত তর্ক কতক বুঝা যাইত, কিন্তু সে সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাই।... চন্দ্রনাথবাবু রাগ করিলে কতক মার্জনীয় বোধ হয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথবাবুর রাগের কোনই কারণ নাই; কেন না, তিনিই প্রত্যেক বারে গায়ে পড়িয়া তর্ক তুলিয়াছেন।...'লয়তত্ত্বের' বিচারকালে রবীন্দ্রনাথবাবু বলিয়াছিলেন (সাহিত্য, ভাদ্র)—'বিষয়টা গুরুতর, অতএব এ সম্বন্ধে বাদপ্রতিবাদ হওয়া কিছুই আশ্চর্য নহে।' কিন্তু তাহার তত্ত্বটাও কি সেইরূপ গুরুতর?

...আষাঢ় মাসের 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথবাবু লিখিয়াছেন—'প্রবন্ধের উপসংহারে (চন্দ্রনাথবাবুর লয় বিষয়ক প্রবন্ধ—সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ) চন্দ্রনাথবাবু রাগের মাথায়, আমাদিগকে অথবা কাহাকে ঠিক জানি না, স্বজাতিদ্রোহী বলিয়াছেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানানুশীলনার মধ্যেও লোকে পরস্পরকে এমন সকল কঠিন কথা বলিয়া থাকে!' চন্দ্রনাথবাবু যদি এমন কথা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে অন্যায় করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কঠিন কথার উত্তরে রবীন্দ্রবাবু কেমন কোমল কথা বলিলেন, দেখা যাউক।...শ্রাবণ মাসের 'সাধনা'য় 'হিং টিং ছট্' নামক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। সেই কবিতা রবীন্দ্রবাবুর রচনা।...

রবীন্দ্রনাথবাবু কি মনে করিয়া এই কবিতা লিখিয়াছিলেন, জানি না। চন্দ্রনাথবাবু কি বুঝিয়াছিলেন, বলিতে পারি না, কিন্তু অনেকেই বুঝিয়াছে যে, এই বিদ্রূপ ও ঘৃণাপূর্ণ কবিতার লক্ষ্য চন্দ্রনাথবাবু।*...

সংযম ও সম্ভ্রমের শাসন একবার ভঙ্গ হইলে তাচ্ছিল্য ভাব সহজেই আসিয়া পড়ে। চন্দ্রনাথবাবু কড়াক্রান্তি-শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথবাবু লিখিয়াছেন—'অন্ধ আত্মাভিমান বৃদ্ধি করিবার জন্য

---

* এ সম্বন্ধে 'সাহিত্য—পাঠকদের প্রতি' নামক একটি ক্ষুদ্র রচনায় 'সাধনা' (২য় বর্ষ, ১ম ভাগ, ১২৯৯-১৩০০) পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন যে,—"কিয়ৎকাল পূর্বে 'হিং টিং ছট্' নামক একটি কবিতা সাধনায় প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত কবিতা যে চন্দ্রনাথবাবুকেই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয় 'সাহিত্য' পত্রের কোন লেখক পাঠকদের মনে এইরূপ সংশয় জন্মাইয়া

চোখ বুজিয়া পাণ্ডিত্য করা অলস সময় যাপনের একটা উপায় বটে।' স্বজাতি-দ্রোহী কথাটা কঠিন হইল, আর এ কথাটা কঠিন হইল না! যদি সুশিক্ষিত উদারস্বভাব সুলেখকগণ মতভেদ প্রকাশকালে বিদ্রূপ করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিবেন, তাহা হইলে আর কে করিবে?"—ফাল্গুন, ১২৯৯

রেন। আমি তাহার প্রতিবাদ 'সাহিত্য' সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিই, তিনি তাহা প্রকাশ করিয়া তাঁহার পাঠকদের অন্যায় সন্দেহ মোচন করা কর্তব্য বোধ করেন নাই। এই কারণে সাধনা পত্রিকা আশ্রয় করিয়া আমি পাঠকদিগকে জানাইতেছি যে, উক্ত কবিতা চন্দ্রনাথ বাবুকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত নহে, এবং কোন সরল অথবা অসরল বুদ্ধিতে যে এরূপ অমূলক সন্দেহ উদিত হইতে পারে তাহা আমার কল্পনার অগোচর ছিল।"

৩

ভারতী : ফাল্গুন-চৈত্র

"'বিদায়কাল' ও 'বর্ষশেষ' দুইটি কবিতা; প্রথমটি সুন্দর, কিন্তু 'বর্ষশেষ' অতি সুন্দর। এই সংখ্যা সম্পাদন করিয়া, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতী'র সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিলেন। 'সম্পাদকের বিদায়গ্রহণে' তিনি যথেষ্ট বিনয়সহকারে ইহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। রবীন্দ্রবাবুর মতে,—'আমাদের দেশের সম্পাদকের পত্রসম্পাদন হালগোরুর দুধ দেওয়ার মত।'—যেখানে হালও বহিতেন, এবং দুধও দিতেন, সেখান হইতে বাহিরে গিয়া তিনি যতটা বুঝিতে পারিতেছেন, যাহারা এখনও লিপ্ত আছে, তাহারা ততটা পারিবে, আশা করা যায় না। তবে আমরা এই পর্যন্ত বলিতে পারি, তাঁহার এতটা কৈফিয়ৎ দিবার আবশ্যক ছিল না। আমরা সকলে জানি, তিনি Lyric কবি,—তাঁহার Lyrical effort-এ তিনি 'ভারতী'র জন্য যাহা করিয়াছেন, এই বিদায়ের ক্ষণে, তাহাই একটি লিরিকের মত বোধ হইতেছে। 'বালক', 'সাধনা' যে পথে গিয়াছে, 'ভারতী' যে সে পথের পথিক হয় নাই, ইহাই আমাদের সৌভাগ্য। রবীন্দ্রবাবু উচ্চ প্রতিভার অধিকারী, তিনি তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করুন; মাসিকের জন্য অনবরত লিখিয়া তাঁহার সাহিত্য-শিল্পের যতটা অবনতি হইয়াছে, তাহা বঙ্গভাষার ক্ষতি বলিয়া গণনা করি।"—বৈশাখ, ১৩০৬

৪

প্রদীপ : আষাঢ়

"এবারকার 'প্রদীপের' শেষ পৃষ্ঠায় 'একটি প্রশ্ন' মুদ্রিত হইয়াছে। প্রশ্নটি একটুকরা কাগজে স্বতন্ত্র মুদ্রিত প্রদীপের পৃষ্ঠায় সংলগ্ন। প্রশ্নকর্তার জিজ্ঞাস্য—লক্ষ্মীন্দরের বাড়ি কোথায়? কিন্তু বন্ধুজনের অনুগ্রহে পরিশেষে জানিতে পারিলাম, 'প্রদীপের' 'প্রশ্ন' একটি বুজরুকী। প্রশ্নের পশ্চাতে একটি অপরূপ কবিতা মুদ্রিত আছে, তাহার নাম, 'একটি কুক্কুরের প্রতি'। [illegible]

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির নাম মুদ্রিত আছে। প্রথম দৃষ্টিতে 'প্রশ্ন' ভিন্ন আর কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না বটে, কিন্তু একটু চেষ্টা করিয়া দেখিলে নিম্নলিখিত কবিতাটি সহজে পড়া যায়—

'একটি কুক্কুরের প্রতি।'
চিরদিন পৃথিবীতে আছিল প্রবাদ
কুকুর চীৎকার করে চন্দ্রোদয় দেখি
আজি এ কলির শেষে অপরূপ একি
কুক্কুরের মতিভ্রম বিষম প্রমাদ!
চিরদিন চন্দ্রপানে চাহিয়া চাহিয়া
এতদিনে কুক্কুর কি হইল পাগল ?
ভাসিছে নবীনরবি নভঃ উজলিয়া
তাহে কেন কুক্কুরের পরাণ বিকল ?
নাড়িয়া লাঙ্গুলখানি ঊর্ধ্বপানে চাহি
ঘেউ ঘেউ ভেউ ভেউ মরে ফুকারিয়া
তবু ত রবির আলো ম্লান হোল নাহি,
নাহি হোল অন্ধকার জগতের হিয়া!
হে কুক্কুর ঘোষ কেন আক্রোশ নিষ্ফল
অতি ঊর্ধ্বে পৌঁছে কি কণ্ঠ ক্ষীণবল ?
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।'

পাতা-ঢাকা ফুল, ঘোমটা-দেওয়া মুখ প্রভৃতির প্রতি কুতূহলী দৃষ্টি সহজে ও আগে আকৃষ্ট হয়, তাই 'প্রদীপ' পাতলা কাগজে ছাপা প্রশ্নের আবরণ দিয়া কবিতাটির আকর্ষণীশক্তির বৃদ্ধি করিয়াছেন। প্রদীপের ও কবিপুঙ্গব প্রভাতের এই অপূর্ব কীর্তি 'সাহিত্যে' উদ্ধৃত করিলাম। কবিতাটির 'রবি' ও 'ঘোষ' এই দুইটি শব্দে বেশ বুঝা যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমালোচক কোনও ঘোষ (শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ?) ইহার লক্ষ্য। এই ব্যক্তিগত গালাগালির বিষয়ে বাক্যব্যয় করিয়া আমরা সাহিত্য কলঙ্কিত করিব না। সাহিত্যসমাজে 'মোসাহেবি'র এমন সুন্দর দৃষ্টান্ত অতি বিরল। চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া কুক্কুর চীৎকার করে কিনা, তাহা আমাদের সাহিত্যিক 'চন্দ্র'-গণই বলিতে পারেন; এবং এই শ্রেণীর মোসাহেবগণ জীবতত্ত্বের কোন্ অধ্যায়ে নিবিষ্ট, তাহার মীমাংসার ভার শ্রীযুক্ত রামব্রহ্ম সান্যাল* মহাশয়ের প্রতি অর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কিন্তু পবিত্র সাহিত্যক্ষেত্রে এইরূপ মোসাহেবি ও মেছুনীর ভাষার যুগপৎ আবির্ভাব দেখিয়া শঙ্কা হয়, আবার কি কবির গান বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইবে ? ভগবান্ রবিবাবুকে এই 'ভক্তের' হস্ত হইতে রক্ষা করুন।"—আষাঢ়, ১৩০৬

* তৎকালীন জু-গার্ডেনের সুপারিনটেন্ডেন্ট।

৫

প্রদীপ : মাঘ

"পুস্তক-সমালোচনায় 'পদ্মা' ও 'কণিকা', এই দুইখানি খণ্ডকাব্যের সমালোচনা আছে। অপরের কৃত গ্রন্থসমালোচনা সম্বন্ধে আমরা প্রায়ই মৌনব্রত, কিন্তু নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া 'কণিকা'র সমালোচনা সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে হইতেছে। সিরাজউদ্দৌলার চরিতাখ্যায়ক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র 'কণিকা'র সমালোচনা উপলক্ষে সমালোচকদিগেকে আক্রমণ করিয়া যথেষ্ট সুরুচি ও শ্লীলতার পরিচয় দিয়াছেন। অক্ষয়বাবুর সেই সদাশয়তার পরিচয় দিবার বা তাঁহার 'উতোর' গাহিবার জন্য আমরা এই পণ্ডশ্রমে প্রবৃত্ত হই নাই। কিন্তু লেখক বন্ধুরূপে 'কণিকা'র কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে যে মিথ্যা কলঙ্কের আরোপ করিয়াছেন, তাহার অপনয়নই আমাদের উদ্দেশ্য। অক্ষয়বাবু সাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, সমালোচকগণের মুণ্ডপাত করিবার জন্যই কবি 'কণিকা'র অনেকগুলি কবিতার রচনা করিয়াছেন। যদি সত্যই রবীন্দ্রবাবু সমালোচনায় অসহিষ্ণু হইয়া 'কণিকা'র মত রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলেও, সমালোচকগণের ক্ষোভের কারণ ঘটিত না। আমাদিগকেও কর্তব্যের অনুরোধে রবীন্দ্রবাবুর রচনা সম্বন্ধে ভালমন্দ অনেক কথা বলিতে হইয়াছে। প্রতিকূল সমালোচনার বাক্যবাণে যদি অমর কবি রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের ভোগবতী উৎসারিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যকে স্নিগ্ধ সরস শ্যামল করে, তবে সমালোচকগণের তদপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? উপকথার রাজকন্যা হাসিলে মাণিক পড়িত, কাঁদিলে মুক্তা ঝরিত। রবীন্দ্রবাবু উদার কল্পনায় অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালী পাঠককে অনেক 'মাণিক' দান করিয়াছেন; অসহিষ্ণুতা বা প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হইয়া তিনি যদি 'কণিকা'র মত মুক্তা দিতেন, তাহাও আমরা পরম সৌভাগ্য মনে করিতাম। কিন্তু সত্যপ্রিয় ঐতিহাসিক অক্ষয়বাবু শুনিয়া দুঃখিত হইবেন, স্বয়ং রবীন্দ্রবাবু অক্ষয়বাবুর কৃত 'কণিকা'র সমালোচনা পাঠ করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন, তাঁহার এরূপ কোন গূঢ় অভিসন্ধি ছিল না। অক্ষয়বাবুর প্রচারিত 'কণিকা' রচনার গূঢ় উদ্দেশ্য বিনা প্রতিবাদে রবীন্দ্রবাবুর স্কন্ধে আরোপিত হইতে দিলে সাহিত্যে ধৃষ্টতা ও নীচতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহাই আমরা এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিলাম। 'কণিকা'র জাতি-যূথী-মল্লিকাপুঞ্জ সংকীর্ণতার নরকে ফুটিয়া হিংসাবিদ্বেষের পবনে সৌরভ বিকীর্ণ করিতেছে; যে লেখক সমালোচকগণের প্রতি নিজের বিদ্বেষ-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অসঙ্কুচিতচিত্তে সাধারণের নিকট ইহা প্রচার করিতে পারেন, তিনিও যে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন, ইহা বিস্ময়কর। এরূপ বিড়ম্বনা বাংলা দেশেই সম্ভবে।"

—ফাল্গুন, ১৩০৬

৬

ভারতী : জ্যৈষ্ঠ

"শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষণিকের গান' হয় নিতান্তই ক্ষণিক, নয় আমরা রসগ্রহণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু তাঁহার 'কাব্যের উপেক্ষিতা' পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। ঊর্মিলা চরিত্রের সমস্ত সৌন্দর্য লেখকের রচনায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।"—আষাঢ়, ১৩০৭

৭

ভারতী : আষাঢ়

'"নববর্ষা' শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি কবিতা—

'ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে ক্লিন্ন কপোত,
দাদুরী ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি,
গরজে গগনে গগনে।'

অতি সুন্দর। কিন্তু অবশিষ্ট ভাগ অত্যন্ত সাধারণ; কৃত্রিমতাদুষ্ট ও কেবল শব্দঝংকারে মুখরিত। বিশেষতঃ হৃদয়-ময়ূরের নৃত্য দেখিয়া হাস্যরসের উদ্রেক হয়।"—শ্রাবণ, ১৩০৭

৮

ভারতী : শ্রাবণ

"'উদ্ধার' শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি ক্ষুদ্র গল্প। রবীন্দ্রবাবুর গৌরী 'অমেঘবাহিনী বিদ্যুল্লতাই' বটে। তাহার চকিত দীপ্তি নিমেষের জন্য চক্ষের উপর উজ্জ্বল হইয়া উঠে, কিন্তু তাহার সমস্তটা কখনই কল্পনার কারায় ধরিয়া রাখিতে পারা যায় না। গল্পটি নিতান্তই ক্ষুদ্র,—গল্পের কঙ্কাল বলিলেও চলে। এই পঞ্জর-পিঞ্জরে তিনটি প্রাণী,—তেজস্বিনী মিতভাষিণী গৌরী, সন্দেহবিষদিগ্ধ ক্রুদ্ধ পরেশ ও সংযমভ্রষ্ট প্রচারক ব্রহ্মচারী পরমানন্দ। অতি ক্ষুদ্র গল্পের সংকীর্ণ পরিসরে তিনজনের স্থান পর্যাপ্ত নয়। কবি কেবল 'রেখায়' গল্পটি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে আখ্যানবস্তুর একটা অস্পষ্ট আভাসমাত্র অভিব্যক্ত হইয়াছে। ছায়ালোকসম্পাতে আর একটু পরিণত হইলে গল্পটি সম্পূর্ণ বিকশিত হইতে পারিত।"—ভাদ্র, ১৩০৭

৯

নির্মাল্য : আষাঢ়

"'বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য ও চন্দ্রনাথবাবু' প্রবন্ধের লেখক এই প্রবন্ধে পৃথিবীর কোন বিষয়ই অসমালোচিত রাখিবেন না। এবার রবীন্দ্রবাবুর 'সোনার

তরী,' রাং কি সোনা, তাই পরখ করিতেছেন! লেখকের ভাবুকতা দেখিয়া হাস্যরসের উদয় হয়। তিনি যদি এইভাবে কাব্যসাহিত্যের সমালোচনা করেন, তাহা হইলে আমরা 'হুতোমে'র দুঃখ বিস্মৃত হইতে পারিব। 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'র লেখক লিখিতেছেন, 'বিশেষ আগ্রহের সহিত রবিবাবুর 'সদর-অন্দর' ঘুরিলাম।' ইহার যোগ্য পুরস্কার এত দূর হইতে দেওয়া চলে না।"
—ভাদ্র, ১৩০৭

১০

ভারতী : বৈশাখ

"প্রথমেই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সাগরসংগমে' নামক কবিতা। বোধ করি, কবিবরের নবকল্পিত গীতিকাব্য 'নৈবেদ্যে'র দেবোদ্দিষ্ট উপকরণের অন্যতর,—আধ্যাত্মিক। নিতান্ত 'চিনির পুলি' নয়। রবীন্দ্রবাবু আজকাল ভাবের মায়া কাটাইয়া নিপুণ শিল্পীর মত কবিতার প্রত্যেক চরণ অনবরত 'পালিশ' করিতেছেন। তাহার ফলে কাবতাগুলি 'চকচকে' 'ঝকঝকে' হইতেছে বটে, কিন্তু ভাব বেচারীর চক্ষে জল দেখিয়াও কি তাঁহার কবিহৃদয়ে করুণার উদ্রেক হয় না?"—জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮

১১

ভারতী : জ্যৈষ্ঠ

"সর্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পিপাসী' নামক একটি কবিতা। কৃত্রিমতার আতিশয্যে আহত হইয়া কবির 'মানসী'র দ্বার হইতে ফিরিলাম—এত বাধা বৃাত অতিক্রম করিয়া কবিতায় গুপ্ত সুরক্ষিত স্বর্গীয় অমৃত পান করিতে পারিলাম না। দুর্ভাগ্য, আমরা অসমর্থ! গরুড়ের সামর্থ্য নহিলে অমৃত আহরণ সহজ নহে!"

"শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিরকুমার সভা' নামক গল্পটি ক্রমে নাটকে পরিণত হইয়া এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। গুটীপোকার মত গল্পটির প্রকৃতির পরিবর্তন হইয়াছে। আবার শুনিতেছি লেখক ইতিমধ্যেই কাঁচি ও কলম লইয়া 'চিরকুমার সভা'র সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তবে, রচনাটি 'চিরকুমার সভা'র বর্তমান গুটী ভেদ করিয়া আগে প্রজাপতির রূপ পরিগ্রহ হউক, তখন তাহার লাবণ্য উপভোগ করিব।"—আষাঢ়, ১৩০৮

১২

সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী : কৃষ্ণকুমার বসু

"১৮ই জ্যৈষ্ঠ। জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সাধনা'র রবীন্দ্রনাথবাবুর একটি কবিতা

প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতাটির নাম 'মৃত্যুর পরে'। বোধ হয় স্বর্গীয় ঔপ-ন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুকে লক্ষ্য করিয়াই ইহা লিখিত হইয়াছে। আমাদের সম্পাদক সু-চন্দ্র ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন; এমন কি 'সাধনা' হইতে সেই কয়েক পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া যত্নপূর্বক রাখিয়া দিবেন, এইরূপ ইচ্ছাও জানাইয়াছেন। আমি কিন্তু সমগ্র কবিতাটির তেমন সুখ্যাতি করিতে পারিতেছি না। আজ-কাল রবীন্দ্রের কবিতার একটা প্রধান দোষ এই যে, উহারা প্রয়োজনাতিরিক্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। বর্তমান কবিতাটির আধখানা বাদ দিলেও বোধহয় কোন ক্ষতি হয় না। বিষয়টির গাম্ভীর্যের সহিত তুলনা করিলে কবির নির্বাচিত ছন্দের গতি কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় দ্রুত বলিয়া অনুভূত হয়। অপেক্ষাকৃত ভাল শ্লোকগুলি রাখিয়া, অপরগুলি বাদ দিলে কবিতাটি বেশ সুন্দর হইতে পারিত। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল ধরিয়া কবিতার চর্চা করিতেছেন কিন্তু এখনও তাঁহার fitness ও proposition-এর জ্ঞান যদি দেখিতে না পাই, তবে উহা বড়ই দুঃখের কথা। স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি তাঁহার pegasus-কে সংযত করিতে পারিতেছেন না; সে স্বেচ্ছানুসারে প্রচণ্ডবেগে তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে, তাহার ঠিক নাই।"—মাঘ, ১৩১০

১৩

ভারতী : শ্রাবণ

"সর্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ক্ষুদ্র 'গান'। আমরা ভাব গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বোধ করি, রচয়িতা ভিন্ন আর কেহ এই গোলকধাঁধার ব্যূহভেদ করিতে পারিবেন না—

'আজি যত তারা তব আকাশে
সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে।'

বাঙ্গালায় লিখিত, কিন্তু বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে 'গ্রীক্'।

'দিকে দিগন্তে যত আনন্দ
লভিয়াছে এক গভীর গন্ধ হে,'

অত্যন্ত মৌলিক, কিন্তু সম্পূর্ণ অর্থহীন। 'আনন্দের গভীর গন্ধ' বোধ করি আকাশকুসুমের সৌরভের মত,—প্রতিভাশালী কবি ভিন্ন অন্য কাহার 'নাসাগম্য' নহে। রবীন্দ্রবাবু অনেক লিখিয়াছেন, অনেক ছাপিয়াছেন, অনেক গাহিয়াছেন,—এখনও তিনি যা-তা ছাপাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন না, ইহা আমাদের বিচিত্র বলিয়া বোধ হয়। নাবালক-কবি-সুলভ কবিত্ব কণ্ডূতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির পক্ষে নিতান্ত অশোভন—সে দৃষ্টান্ত সাহিত্যের পক্ষে অত্যন্ত অপকারী, রবীন্দ্রবাবুর ন্যায় প্রতিভাশালী লেখকও যদি তাহা বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে আমরা নাচার।"—ভাদ্র, ১৩১১

১৪

বঙ্গদর্শন : কার্তিক

"সম্পাদকের 'নৌকাডুবি' এখনও চলিতেছে, ভক্ত পাঠকগণ নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া ভরাডুবির প্রতীক্ষা করিতেছেন।"—অগ্রহায়ণ, ১৩১১

১৫

বঙ্গদর্শন : চৈত্র

"শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সফলতার সদুপায়' প্রবন্ধে বাঙ্গালা-ভাষা-বিভাগের প্রতিবাদ করিয়াছেন, এবং আমাদিগকে বিদেশী রাজার উপর একান্ত নির্ভর ত্যাগ করিয়া স্বাবলম্বনের সাহায্যে উন্নত হইতে আহ্বান করিয়াছেন। রবীন্দ্র-বাবু ইতিপূর্বে সাহিত্য-পরিষদে ও অন্যত্র বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে প্রাদেশিক ভাষার অনেক ওকালতী করিয়াছেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের রেজোলুউশন্ বজ্রে তাসের প্রাসাদ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বঙ্গবাণীর বরপুত্র এখন ভাষার সার্বভৌমিকতার পক্ষ গ্রহণ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। 'সফলতার সদুপায়ে' রবীন্দ্রবাবু যেন 'থলে ঝাড়িয়া' অপূর্ব মুন্সীয়ানা, তীক্ষ্ণ শ্লেষ, প্রগাঢ় রস ও তীব্র ধিক্কার ঢালিয়া দিয়াছেন। বহুকাল তাঁহার পঠিত প্রবন্ধে এমনতর বৈদ্যুতী অনুভব করি নাই।"—বৈশাখ, ১৩১২

১৬

বঙ্গদর্শন : বৈশাখ

"'বঙ্গদর্শনে'র মোট পঞ্চাশ পৃষ্ঠার মধ্যে সাড়ে ছাব্বিশ পৃষ্ঠা সম্পাদক রবীন্দ্রবাবু স্বয়ং অধিকার করিয়াছেন। বামন ঠাকুর তিন পদক্ষেপে ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন, সম্পাদক ঠাকুর 'নৌকাডুবি' ও 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণে' একখানি মাসিকের অর্ধেক ব্যাপ্ত করিয়াছেন। রবীন্দ্রবাবু 'সম্ভাষণে' বলিতেছেন,—'বাংলাদেশ আমাদের নিকটতম—ইহারই ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতিকে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ আপনার আলোচ্য বিষয় করিয়াছেন। পরিষদের নিকট নিবেদন এই যে, এই আলোচনা ব্যাপারে তাঁহারা ছাত্রদিগকে আহ্বান করিয়া লউন। তাহা হইলে প্রত্যক্ষবস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হইয়া উঠিবে এবং নিজের দেশকে ভাল করিয়া জানিবার অভ্যাস হইলে অন্য সমস্ত জানিবার যথার্থ ভিত্তিপত্তন হইতে পারিবে। তাছাড়া, নিজের দেশকে ভাল করিয়া জানার চর্চা নিজের দেশকে যথার্থভাবে প্রীতির চর্চার অঙ্গ। বাংলাদেশে এমন জিলা নাই, যেখান হইতে কলিকাতায় ছাত্রসমাগম না হইয়াছে। দেশের সমস্ত বৃত্তান্ত সংগ্রহে ইঁহাদের যদি সহায়তা পাওয়া যায়, তবে সাহিত্যপরিষদ্ সার্থকতালাভ করিবেন।… বাংলাভাষায় একখানি ব্যাকরণ-রচনা সাহিত্যপরিষদের একটি প্রধান কাজ। কিন্তু কাজটি সহজ নহে। এই ব্যাকরণের উপকরণ-সংগ্রহ একটি দুরূহ

ব্যাপার। বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে, তাহারই তুলনাগত ব্যাকরণই যথার্থ বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ। আমাদের ছাত্রগণ সমবেতভাবে কাজ করিতে থাকিলে এই বিচিত্র উপভাষার উপকরণ-গুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।'...ইত্যাদি।

রবীন্দ্রবাবুর এই সাধু প্রস্তাব 'ইঁদুরের পরামর্শে' পরিণত না হইলেই আমরা সুখী হইব। এরূপ অনুষ্ঠানে, যিনি বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিতে সক্ষম, এমন একজন 'নায়ক' আবশ্যক। দেশে ছাত্রের অভাব নাই, ছাত্রমণ্ডলেও কাজ করিবার ইচ্ছা বা শক্তির অসদ্ভাব নাই। সেই তরুণ শক্তি কার্যে প্রবর্তিত করিবার জন্য যে শক্তি ও নিপুণতা আবশ্যক, বঙ্গদেশে সচরাচর তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। যে নেতৃত্বে যে আদর্শে ছাত্রসম্প্রদায় অনুপ্রাণিত হইবে,—নিষ্কাম কর্মে ব্রতী হইবে, সে আদর্শ নির্জীব সভায় সম্ভবে না। সে জন্য মনুষ্যত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব চাই। পরিষৎ সভা ডাকিতে পারেন, নেতা যোগাইতে পারিবেন কি? রবীন্দ্রবাবু স্বয়ং অগ্রসর হইলে ভাল হয়।"—আষাঢ়, ১৩১২

১৭

বঙ্গদর্শন : শ্রাবণ

"শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'দেশীয় রাজ্য' নামক প্রবন্ধে ভারতীয় উৎকর্ষের আদর্শ উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রচারিত অনেক পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। রবীন্দ্রবাবুর ভাষার ব্যায়াম উপভোগের যোগ্য।"—ভাদ্র, ১৩১২

১৮

বঙ্গদর্শন : আশ্বিন

"এবারকার বঙ্গদর্শনের প্রথমেই সম্পাদকের 'সোনার বাংলা' নামক বঙ্গ-বিশ্রুত গানটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবার পূর্বেই গানটি মুদ্রিত ও লক্ষ কণ্ঠে গীত হইয়াছে। এখনও বঙ্গের কুটীরে প্রাসাদে 'সোনার বাংলা' প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এ হিসাবে গানটি সার্থক। রবীন্দ্রবাবু ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অসংখ্য 'লিরিক' ও গান রচনা করিয়াছেন, কিন্তু 'সোনার বাংলা'র মত আর কিছু এমন সার্থক হয় নাই, তাহা সাহস করিয়া বলা যায়। একবার দেশের ঘোর দুর্দিনে ধীরাজ গাহিয়াছিলেন—

'নীল বাঁদরে সোনার বাংলা করলে ছারখার।'

আজ আবার বাঙ্গালীর মাকে মনে পড়িয়াছে, তাই মাতৃভক্ত কবির বীণায় 'সোনার বাংলা' ঝংকৃত হইয়া উঠিয়াছে।"—কার্তিক, ১৩১২

১৯

ভারতী : বৈশাখ

"শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নিন্দা' নামক প্রহেলিকার সমস্যাপূরণ সহজ বুদ্ধির

সাধ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষার মড়া-বাছের প্রাচুর্য দেখিয়া কষ্ট হয়,—এই সদীর্ঘ সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দের ঘটা, তাহার পরই চলিত ভাষার অপশব্দের বৃষ্টি! বাঙ্গালা ভাষা যে বেওয়ারিশ মড়া, এবং কবিরা যে নিরঙ্কুশ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।"—বৈশাখ, ১৩১৬

২০

দেবালয় : বৈশাখ

"প্রথম সংখ্যার প্রথমে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নববর্ষ-মঙ্গল' নামক একটি কবিতা লিখিয়াছেন। ইহা আধ্যাত্মিক বটে, কিন্তু রবি-করে সমুজ্জ্বল নহে। 'যে মহা একের পানে বিশ্ব-পদ্ম উঠিছে বিকশি' রবীন্দ্রনাথের রচনায় বোধ হয় বহুবার পড়িয়াছি।"—বৈশাখ, ১৩১৬

২১

ভারতী : জ্যৈষ্ঠ

"'পাওয়া ও হওয়া' নামক প্রবন্ধে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাষাকে, ভাবকে, বক্তব্যকে নির্দয়ভাবে পাক দিয়া, জড়াইয়া, মোচড়াইয়া যে জটিল প্রহেলিকার সৃষ্টি করিয়াছেন, তা অত্যন্ত অদ্ভুত। বিবাহ-সভায় যদি প্রশ্ন করা যায়,—'সে আমার কাছে প্রাপ্ত অথচ অপ্রাপ্ত' কি? তাহা হইলে বোধ করি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকেও মৌনব্রত ধারণ করিয়া পরাজয় স্বীকার করিতে হয়! কতখানি ন্যায়ের ফাঁকি, কতখানি সত্য, কতখানি কবিত্ব, কতখানি কথার প্যাঁচ, কতখানি ঢেঁকির কচকচি মিশাইয়া রবীন্দ্রবাবু এই 'পাওয়া ও হওয়া'র জগাখিচুড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা কে নির্ণয় করিবে? রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন,—'একটু রস, একটু ভাব, একটু চিন্তাই ব্রহ্ম নয়।' সে কথা সত্য। 'একটু চিন্তা' ব্রহ্ম হইলে আমরা তাঁহাকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ ক্ষেত্রে 'একটু চিন্তা' ব্রহ্ম-রূপে অবতীর্ণ না হইয়া বিষম প্রবন্ধে পরিণত হইয়াছে; অগত্যা আমাদের মত দুর্ভাগ্য পাঠককে 'বিপত্তৌ' মধুসূদনকে স্মরণ করিতে হইতেছে। রবীন্দ্রবাবু আজকাল ধর্মোপদেষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহার উপদেশগুলি মানব-বুদ্ধির অতীত হইয়া উঠিতেছে। যতদিন রবীন্দ্রসূত্রের ভাষ্য প্রকাশিত না হয়, ততদিন পাঠকের পক্ষে 'গোলক-ধাঁধা'র 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' অনিবার্য।"—জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬

২২

প্রবাসী : শ্রাবণ

"শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্রমে আমাদের 'অবোধ্য' হইয়া উঠিলেন। তাঁহার একটি গানের প্রথম কলি এই,—

'আজ শ্রাবণ ঘন গহন মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে

নিশার মত নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।'

শ্রাবণের ঘন গহনে পরিণত হইল, তাহাও বুঝিলাম। কিন্তু চরণ কেমন করিয়া 'গোপন' হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সাপের পা 'গোপন' বটে। কিন্তু, এ 'গোপন' চরণ কাহার? পরে আছে,—'নীলাব্জ নীল আকাশ।' 'নীলাব্জ নীল' কি বুঝিতে পারিলাম না।"—ভাদ্র, ১৩১৬

২৩

বঙ্গদর্শন : বৈশাখ

"শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নিশীথে' নামক কবিতায় যে বিনিদ্র রজনীর বর্ণনা করিয়াছেন,—তাহা অত্যন্ত ভয়ংকর।—তখন বিশ্ব নিদ্রামগ্ন; অকস্মাৎ কে কবির বীণায় ঝংকার দিল, এবং 'নয়নে ঘুম নিল কেড়ে!' নয়নে ঘুম অর্থাৎ নয়নের ঘুম? 'ঘুম' পরে থাকিলে নয়নের 'র' লুপ্ত হয়।—ইতি ইস্পাতরামের বাঙ্গালা ব্যাকরণ।—তারপর কবি 'শয়ন ছেড়ে' উঠিয়া বসিলেন। 'আঁখি মেলে চেয়ে থাকি' তার দেখা পাইলেন না!—কবি যে অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারিবে না। এ রোগে আঁখি মেলিয়া সারা রাত্রি চাহিয়া থাকিতে হয়, কিন্তু ঘুমের দেখা পাওয়া যায় না! ইহা insomnia অর্থাৎ অনিদ্রারোগের কথা! আমরা পড়িয়াছি, আর কাঁদিয়াছি। সাধারণ মানবের অনিদ্রারোগে অবসাদ ও যন্ত্রণা ভিন্ন আর কোনও লাভ নাই। কিন্তু কবির 'ইনসম্নিয়া' বন্ধ্যা হইতে পারে না। তাই তাঁর 'গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া প্রাণ উঠিল পুরে,'—অথচ 'কোন বিপুল বাণী ব্যাকুল স্বরে বাজিতে' লাগিল, তাহা কবি বুঝিতে পারিলেন না। সুতরাং ব্যাপারটি গুরুতর 'কবিতা' হইয়া উঠিল! অনিদ্রার যন্ত্রণার উপর অনির্বচনীয় বেদনা। অগত্যা কবি বলিলেন,—'কোন বেদনায় বুঝি না রে হৃদয়ভরা অশ্রুভারে!' আমরা অনিদ্রার বেদনা বুঝি, কিন্তু 'হৃদয়ভরা অশ্রুভারে'র অন্বয় বা অর্থ, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। 'অশ্রুভারে' হৃদয় ভরে না। 'হৃদয়ভরা অশ্রুভার' কি, তাহাও কল্পনা করিতে পারি না। অথচ অশ্রু, হৃদয় ও ভরা, এই তিনের সংযোগে দিব্য করুণ রস উথলিয়া উঠিল। যথা,—'অলাবু-বেণু-তন্ত্রাণাং সংযোগে মধুরধ্বনিঃ।' তখন কবি বেহাগ এক-তালায় গাহিয়া উঠিলেন,—'পরিয়ে দিতে চাই কাহারে আমার কণ্ঠহার!' ভাবটা একটু পুরাতন বটে, কিন্তু 'সেবকারে পুরাতনে!' ভাব কবিদের সেবকও বটে, অন্নও বটে। অতএব রবীন্দ্রের 'নিশীথে' বেহাগ একতালায় গীত হইতে থাকুক!"—আষাঢ়, ১৩১৭

২৪

প্রবাসী : শ্রাবণ

"শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'অপমান' নামক কবিতায় আপনার প্রতিভারই অপমান করিয়াছেন।"—শ্রাবণ, ১৩১৭

২৫

ভারতী : আষাঢ়

"শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্মপ্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া 'ভারতী'র মন্দিরে 'দুর্লভ' নিবেদন করিয়াছেন। কবি যখন আধ্যাত্মিক হন, তখন ভাষায় কিরূপ প্যাঁচ লাগে,'দুর্লভে' তাহার নমুনা আছে। রবীন্দ্রবাবু বলিতেছেন,— 'অনন্তের মধ্যে, অভয়ের মধ্যে, অশোকের মধ্যে মাথা তুলে আমরা সরল হয়ে উন্নত হয়ে সঞ্চরণ করব।' 'অনন্তের মধ্যে' মাথা তুলবেন, না, 'সঞ্চরণ' করবেন? যদি অনন্তের মধ্যে মাথা তোলেন, তাহা হইলে কোথায় সঞ্চরণ করবেন? রচনায় তাহা প্রকাশ নাই। ঈথরে? রবীন্দ্রনাথ তপস্যা, গায়ত্রী প্রভৃতির যে মৌলিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা তত্ত্ব ও কবিত্বের বর্ণসংকর। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাও শেষে—ব্রহ্ম-লাভ করিল!"—শ্রাবণ, ১৩১৭

২৬

প্রবাসী : শ্রাবণ

"শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মাতৃ-অভিষেক' নামক কবিতার ছন্দের ঝংকারে কবির 'মানসী' ও 'সোনার তরী'র মন্ত্রধ্বনি মনে পড়ে। কিন্তু 'মাতৃ-অভিষেক' কবিতা নহে, ছন্দে গ্রথিত বক্তৃতা—

'পোহায় রজনী, জাগিছে জননী
বিপুল নীড়ে,'

সু-কল্পনা নহে। 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'—নীড়ে অর্থাৎ পাখীর বাসায় জননী জাগিতেছেন, এই খণ্ড কল্পনা রবীন্দ্রনাথের যোগ্য নহে।"

—ভাদ্র, ১৩১৭

২৭

প্রবাসী : ভাদ্র

"প্রথমেই শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনটি কবিতা—ব্রাহ্মস্পর্শ। স্বাক্ষর দেখিয়া বুঝিলাম, রবীন্দ্রনাথের রচনা। নতুবা বিশ্বাস করিতাম না। ইহাতে কবিবরের প্রতিভার পরিচয় নাই। ধর্মোপদেশ আছে, কবিত্ব নাই। শিক্ষা-নবীশ ও রবীন্দ্রনাথের অনুকারীদের রচনাতেও এত অক্ষমতা দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিষ্ঠাপন্ন কবি এই অপচারগুলি সাধারণের দ্বারে নিক্ষেপ করিতেছেন কেন, তাহা কে বলিবে? জগতে কিছুই অবিনশ্বর নহে, রবীন্দ্র-নাথের প্রতিভাও অবশেষে ব্রহ্মসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া 'নির্বাণ' লাভ করিল।

'রাখোরে ধ্যান, থাক্‌রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র লাগুক ধুলা বালি,
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম পড়ুক ঝরে।'

রবীন্দ্রনাথও ইহা মুদ্রিত করিতে লজ্জিত হন নাই,—'কিমাশ্চর্যমতঃপরম্‌।' কর্মযোগে ঘর্ম ঝরিয়া পড়িবে কিনা, বলিতে পারি না; কিন্তু কবিতাত্রয়ের শ্রীঅঙ্গ কবিবরের ললাটের ঘর্মে সিক্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখিতেছি না। এতদিন ঘাম হইতে 'ঘামাচি'র সৃষ্টি হইতেছিল; কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর 'কর্মযোগের ঘর্ম' কবিতায় পরিণত হইতেছে। রবীন্দ্রবাবু যদি গদ্যে 'আধ্যাত্মিকতা'র প্রচার করেন, তাহা হইলে, তাঁহার কবি-কীর্তিকে এত ক্ষতবিক্ষত হইতে হয় না।''—আশ্বিন, ১৩১৭

২৮

প্রবাসী : কার্তিক

"প্রথমেই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মাতৃশ্রাদ্ধ' নামক একটি প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ 'এক ঢিলে দুইটি পাখী মারিয়াছেন।' এক প্রবন্ধেই দার্শনিকতার ও মাতৃভাষার শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। 'মাতৃশ্রাদ্ধে' হেঁয়ালি ছন্দে তিনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, মা 'অনন্ত পিতামাতা'র অবতার, অতএব 'মা তুমি আছ।' বক্তব্য বিষয়কে এত জটিল করিয়া তোলা যায়, তাহা আমরা জানিতাম না।"—অগ্রহায়ণ, ১৩১৭

২৯

প্রবাসী : পৌষ

"শ্রীযুত বিধুশেখর ভট্টাচার্য 'ভক্ত ও অবমান' নামক সন্দর্ভে গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। সন্দর্ভের শেষে ভট্টাচার্য মহাশয়ের রবি-ভক্তি প্রকটিত দেখিতেছি। ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন—'বর্তমান বঙ্গ-সাহিত্যে যাঁহার অনভিভবনীয় প্রভাবে এই ভাবের পুণ্য-জাগরণ হইয়াছে'—ইত্যাদি। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের পূর্বে 'বর্তমান বঙ্গ-সাহিত্যে' এ ভাব ছিল না। ভক্তের লীলাভূমি বঙ্গে ভক্তি-ভাব ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের 'বেণু'র খোঁচায় তাহার 'পুণ্য-জাগরণ' হইয়াছে; ভাব-খোকার কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়াছে! সেই জন্যই কি তাহার 'বাহানা'য় ও চীৎকারে কান পাতা ভার হইয়া উঠিতেছে? শাক্ত ও বৈষ্ণব কবিগণের কথা দূরে থাক, চিরঞ্জীব শর্মা প্রভৃতিও বিধুশেখর-কলম-নিঃসৃত ভক্তি-ভাগীরথীর প্রবল প্রবাহে ভাসিয়া গেলেন! নির্লজ্জ তোষামোদ আর কাহাকে বলে? তবে ইহা ভক্তের ভক্তি, ভক্তের অবমান নহে, সত্যের অবমান।"—মাঘ, ১৩১৭

৩০

নব্যভারত : মাঘ

"শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বেদনা'য় দেখিতেছি,—
'যে লতাটি আছে, শুকায়েছে মূল,
কুঁড়ি ধরে শুধু—নাহি ফোটে ফুল ;'
কর্তাভজাদের 'আলোক-লতা'র গান ইহা অপেক্ষা সহজ। লতার হেঁয়ালি আমরা ভাঙ্গিতে পারিলাম না। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গান—'প্রকাশ' সহজ ও সুন্দর।"

—চৈত্র, ১৩১৭

৩১

ভারতী : ফাল্গুন

"শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কর্মযোগ' বুঝিবার সৌভাগ্য ও সামর্থ্য আমাদের নাই। রবীন্দ্রবাবু বাঙ্গালা ভাষাকে কোন পাতালে লইয়া যাইতে চান, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারিতেছি না। 'যেখানেই জলাজঙ্গল গর্তগাড়ীকে সরিয়ে ফেলে মানুষ আপনার বাসভূমিকে পরিচ্ছন্ন করে তুলেচে, সেইখানেই পারিপাট্যের মধ্যে তোমার আনন্দ প্রকাশিত হয়ে পড়চে।' 'গর্তগাড়ী' কি ? 'গাড়া' শুনিয়াছি। 'গাড়ী' চড়িয়াছি। 'গর্তগাড়ী'র সহিত এই প্রথম পরিচয় হইল। ভাষার এই জগাখিচুড়ীর পরিণাম কি, তাহা যদি প্রতিভাশালী লেখকেরা একবার ভাবিয়া দেখিতেন !"—চৈত্র, ১৩১৭

৩২

প্রবাসী : আশ্বিন

"'জীবনস্মৃতি' রবীন্দ্রনাথের আত্ম-জীবন-চরিত। রবীন্দ্রনাথ এবার 'ভৃত্য-রাজক' তন্ত্রের বর্ণনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সাত আট বৎসর বয়সে সংঘটিত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পড়িয়া কবিবরের স্মৃতিশক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। 'জীবন-স্মৃতি' পল্লবিত রচনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।"

—কার্তিক, ১৩১৮

৩৩

প্রবাসী : চৈত্র

"কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' উপন্যাসের মত মনোরম। রবীন্দ্রনাথ অতীত জীবনের এক একটি ঘটনা স্মরণ করিয়া নিপুণ তুলিকায় তাহার ছবি আঁকিতেছেন, আপনার অতীতকে বর্তমান কালের চিন্তা ও অনুভূতির রাগে রঞ্জিত করিয়া ফলাইয়া তুলিতেছেন। সুদূর অতীতে তখনকার রবীন্দ্র-নাথ যে যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, সেই সেই অবস্থাচক্রে পড়িলে এখনকার রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে ও ভাবনায় অনুপ্রাণিত হইতেন, কল্পনাকুশল

কবি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া সুখপাঠ্য সুন্দর সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছেন। ইহাতে কবিত্ব আছে; সৌন্দর্যসৃষ্টি আছে, কল্পনার লীলা আছে। স্থানে স্থানে কৌতুক ও স্নেহের আলোকপাতে রচনাটি উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে।"

—বৈশাখ, ১৩১১

৩৪

অর্চনা : শ্রাবণ

"'কাব্যে গন্ধ' শ্রীঅমরেন্দ্র রায়ের রচনা। এই প্রবন্ধে লেখক নিপুণভাবে কবিবর রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রচনা পদ্ধতির সমালোচনা করিয়াছেন। সমালোচনাটি নির্ভীক, সুস্পষ্ট ও সুযুক্তিপূর্ণ। আমরা সকলকে, বিশেষতঃ কবিবরের অন্ধ স্তাবকগণকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। লেখক লিখিয়াছেন, 'রবীন্দ্রনাথের এখনকার লেখা পড়িতে আমরা বড়ই ভয় পাই। তাঁহার পাকানমোয়ান প্যাচওয়ালা ভাষাব্যূহ যদি বা কোন প্রকারে ভেদ করিতে পারি, কিন্তু তাহার মর্মকোষের গন্ধ, ঘনানন্দ প্রভৃতি কবিত্ব-কুহেলিকা মনে এমন একটা বিষম বিভীষিকা জন্মাইয়া দিয়াছে যে, সে জন্য তাঁহার আধুনিক রচনাগুলি পড়িতে প্রবৃত্তি হয় না। আমাদের মাতৃভাষায় লিখিত কবিবরের এই 'জীবনস্মৃতি'র স্থলবিশেষ আমাদের কাছে দুরধিগম্য, যেন ভাষার গোলক ধাঁধা; এই কথা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার ভক্তগণ হয়ত একটু মুচকি হাসিয়া বলিবেন—'ইহাতে বুঝিবার কিছু নাই, এ যে কেবল গন্ধ।'—গন্ধই বটে! বিনয়ের বেড়ায় ঘেরা আত্মম্ভরিতার এমন ঝাঁজাল তীব্র গন্ধ আর কোথাও আজ পর্যন্ত পাই নাই।—নিরপেক্ষ পাঠকেরা এ কথা অস্বীকার করিবেন না, তবে রবিভক্তগণের কথা স্বতন্ত্র। কবিবরের অসামান্য প্রতিভার সর্বপ্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার মত 'নিতুই নব।' কবিবরের নিকট আজ যাহা 'হাঁ' কাল তাহা 'না'। রাজনীতি, সমাজনীতি, এমন কি কাব্যনীতিতেও কবিবরের মত নিত্য পরিবর্তিত হইতেছে। লেখক কবিবরের রচিত আধুনিক ও অতীত কালের নানা প্রবন্ধের স্থানবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া 'চোখে আঙুল' দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন,—কাব্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্বে কবিবরের যে মত ছিল, এখন তাহা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। লেখক বলিতেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে স্বয়ং কাব্য কাহাকে বলে, কাব্যের উদ্দেশ্য কি, এবং তাহার অস্পষ্টতার কারণ কি প্রভৃতি বিষয়ে আমাদিগকে যাহা বুঝাইয়াছিলেন, আমরা আজ সেই সকল উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার আধুনিক মতের অসারতা 'প্রমাণ' করিয়া দিব। তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের উক্তি যাঁহাদের পক্ষে বেদবাক্য বলিয়া ধারণা, তাঁহাদের সে ভুল ধারণা ভাঙ্গিতে পারে।' কিন্তু ভাঙ্গিবে কি? যাহারা জাগিয়া ঘুমায় তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিবার নয়। রবীন্দ্রনাথ বোধ করি স্বপ্নেও ভাবেন নাই, একদিন নবীন লেখক তাঁহারই অস্ত্রে তাঁহাকে

জর্জরিত করিবে। ইহাকেই বলে, 'যার শিল, যার নোড়া, তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া'।"—শ্রাবণ, ১৩১৯

৩৫

প্রবাসী : ভাদ্র

"'ইংলণ্ডে সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনায়' দেখিতেছি,—ইংলণ্ডের অনেক সুধী স্বীকার করিতেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও ভাবুক—এ বিষয়ে তাঁহার তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি জগতের কোন দেশে নাই।—আহ্লাদের কথা নয়? তবে দেশের লোকে এতদিন তাহা বুঝিতে পারে নাই; কারণ 'চেরাগের নীচেই অন্ধকার।' আর, ইদানীং রবীন্দ্রনাথ ভক্ত-বৃন্দের বগলেই বিরাজ করেন, দর্শন দুর্ঘট। বিস্ময়ের বিষয় এই যে দেখিতে দেখিতে জগতের সাহিত্য এত দরিদ্র,—প্রায় দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে। কোন্ কোন্ সুধী এই জগদ্ব্যাপী কবি-জরীপের সার্ভেয়ার ছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। যাঁহারা আমাদের ধন্য করিলেন, তাঁহারাও ধন্য।"—কার্তিক, ১৩১৯

৩৬

সুপ্রভাত : চৈত্র

"এবার একটি নমুনা দিব। 'অননুভূত পুলকে যামিনীর বক্ষের স্পন্দন মধ্যে মধ্যে দ্রুত হইয়া উঠিয়া থামিয়া আসিতে লাগিল।' রবীন্দ্রনাথের 'পুলক' গাছে গাছে নাচিয়া অনেক দিন পূর্বে চম্পট দিয়াছিল, বহুকাল পরে তাহার দর্শন পাইয়া আমাদের 'আত্মা পুলকিত' হইয়া উঠিতেছে! কিন্তু যাহা 'অননুভূত', অর্থাৎ আদৌ অনুভূত হয় নাই, তাহার প্রভাবে বক্ষের স্পন্দন প্রভৃতি ক্রিয়ার উৎপত্তি ঘটিল? বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানের অভাব বলিয়া ডাক্তার রায়* আর কাঁদিবেন না। গৌড় দেশে বিজ্ঞানে উপন্যাস ও উপন্যাসে বিজ্ঞানের সন্ধান করিতে হয়!"—বৈশাখ, ১৩২০

* স্যার পি. সি. রায়

৩৭

ভারতী : বৈশাখ

"শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী 'দুপুরে ও নিশীথে' বৈরাগ্যের-দেহতত্ত্বের-'ও-পারে'র গান ধরিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ 'তাঁহার' সন্ধানে মানসীকে নিযুক্ত করিবার পর, বাঙ্গালা সাহিত্যের কবিতাকুঞ্জে টপ্পার আসরে বৈরাগ্যের সুর জমিয়া উঠিতেছে। রবীন্দ্রনাথের মানসীর ব্রহ্মলাভের বয়স হইয়াছে। নবীন কবিরাও যদি সঙ্গে সঙ্গে গেরুয়ার আলখাল্লা পরিয়া বাউলের সুরে দেহতত্ত্বের গান ধরেন, তাহা হইলে আমাদিগকেও সুরদাসের ভাষায় বলিতে হয়,—'দেখো এক বালা যোগী' ইত্যাদি। টপ্পায়, খেয়ালে, ধ্রুপদে, মেঠো সুরে, সংকীর্তনে

তাঁহাকে' পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালার কবিতা কি 'যৌবনে যোগিনী' সাজিবে ?"—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০

৩৮

রবীন্দ্র-সংবাদ* : (অংশতঃ গৃহীত) কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

"'রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গ' আমরা পড়িয়াছি, এবং হাসিয়াছি। এমন হাস্যরসাত্মক (?) প্রবন্ধ অনেকদিন পড়ি নাই, সেই জন্য ইহার একটি পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ করি। যাঁহারা রবিবাবুকে 'ঋষি' ভাবেন, তাঁহারা তাঁহার কথাগুলি 'ঋষিবাক্য' ভাবিতে পারেন।

রবিবাবু বলিয়াছেন, 'হাঁ, ঐ দেখুন, আমি কখনও ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না যে 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম', বঙ্কিমবাবু কেন ভাল বলিতেন। কিন্তু এটা ঠিক যে, তিনি ঐ উচ্ছ্বাসগুলিকে খুব পছন্দ করিতেন। চন্দ্রশেখরবাবুও ইদানীং আমায় বলিতেন যে, তাঁহার ও লেখাটা ভাল হয় নাই, ওটার ভিতর বিশেষ কিছুই নাই।'—ইহাতে রবিবাবু এক লাঠিতে দুই সাপ মারিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর রসবোধ ছিল না, তাহা দেখাইবার জন্য তিনি উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের লেখককেই সাক্ষীশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের অসারত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোনও কারণই কেহ দেখাইতে পারিবেন না!

কিন্তু আমরা চন্দ্রশেখরবাবুকে 'রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গ' দেখাইয়াছি। চন্দ্রশেখরবাবু বলিলেন, 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম-সম্বন্ধে রবিবাবুর সঙ্গে আমার কখনও কোনও কথা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গের এতদ্‌বিষয়ের কথাগুলি সর্বৈব মিথ্যা। নিজের সুখ-দুঃখের কথা সাধারণে প্রকাশ না করিলেই ভাল হয়, এমন কথা অন্য কাহারও কাহারও কাছে বলিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয়, কিন্তু আমার কোনও রচনা বা পুস্তকের Literary merit সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা আমি কখনও কাহারও সহিত করি নাই।'

বলিয়া রাখা ভাল, চন্দ্রশেখরবাবু তামাতুলসী-গঙ্গাজল হাতে না লইয়াই কথাগুলি বলিয়াছেন; সুতরাং কে সত্যবাদী, কে মিথ্যাবাদী—সে মীমাংসা

* 'রবীন্দ্র-সংবাদ' নামক এই রচনাটি 'সাহিত্যে'র আলোচনা বিভাগে প্রকাশিত হয়। সংক্ষিপ্তাকারে এস্থলে উহা প্রকাশিত হইল। লেখক আলোচনাটির সহিত একটি 'ফুটনোটে' বিবক্ষা ব্যক্ত করেন। উক্ত ফুটনোটে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"'রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে' 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকায় ১৩২৩ সালের ফাল্গুন-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। নানা কারণে এতদিন ইহার পরিচয় দিতে পারি নাই। 'রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে' সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র হইতে সাহিত্যাচার্য চন্দ্রশেখর পর্যন্ত অনেকের প্রতি রবিবাবু যে অত্যাচার করিয়াছেন, তাহা দেখানই এই আলোচনার উদ্দেশ্য।"—লেখক

আমরা করিব না। তবে দেখা যাইতেছে, রবিবাবুর এই উক্তি ১৩১৮ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র গত মাঘ-সংখ্যার বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, রবিবাবু ইহা পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে চন্দ্রশেখরবাবুর পরলোকপ্রাপ্তি হইলে কোন গোলই থাকিত না, এই নীরস আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকেও সময়ের অপব্যবহার করিতে হইত না।

বিনা বিজ্ঞাপনেই যে পুস্তকের অনেকগুলি সংস্করণ বাহির হইয়াছে, তাহার Literary merit আমরা বিচার করিব না। তবে বঙ্কিমবাবু ইহার উচ্ছ্বাস-গুলি খুব পছন্দ করিতেন বলিয়াই 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' ভাল বলিতেন, বলিলে, বঙ্কিম-প্রতিভার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়। দার্শনিকপ্রবর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের 'New Essays in Criticism' পুস্তকখানি পড়িলে বুঝা যায়, 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে' উচ্ছ্বাস ছাড়া আরও এমন অনেক জিনিস আছে যাহার বলেই সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কেন, সাহিত্যসেবীমাত্রেরই ইহা আদরের বস্তু হইয়াছে।...

তাহার পর বিপিনবিহারীবাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'আপনার বঙ্গদর্শনে চন্দ্রশেখরবাবু তো সমালোচক ছিলেন।' রবিবাবু বলিয়াছেন, 'হাঁ! সমা-লোচনা করিতে আমি একেবারেই রাজি ছিলাম না। শৈলেশ যখন সমা-লোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, আমি বলিলাম, 'আমি সমালোচনা করিব না; যদি সমালোচনা প্রকাশ করা আবশ্যক বিবেচনা কর, তাহা হইলে তুমি আলাদা লোক ঠিক কর, তাঁহার স্বাক্ষর দিয়া সমালোচনা প্রকাশিত হইবে।' শৈলেশের প্রস্তাবে চন্দ্রশেখরবাবু রাজি হইয়াছিলেন।...

যে কথার উত্তরে হাঁ বা না বলিলেই চলিত, তাহাতে রবিবাবু এত কথা বলিয়াছেন কেন বুঝিলাম না।...

* * *

'রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে' আরও অনেক কথা আছে।—শাস্ত্র সম্বন্ধে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে, সাহিত্য সম্বন্ধে—সকল রকমের তথ্যই আছে। কুচবিহারের মহারাণী ভূতের গল্প শুনিতে ভালবাসেন, তাহাও ইহাতে আছে।...

প্রথমেই তাঁহার 'অচলায়তন'-এর কথা। রবিবাবু বিপিনবিহারীবাবুকে বলিয়াছেন, 'আমার সমালোচকেরা গায়ত্রীমন্ত্র জপ করেন কিনা জানি না, কিন্তু আমি আমার পিতৃদেবের নিকট যে গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলাম, সেই মন্ত্রসাধনে আমি কতদূর উপকৃত হইয়াছি তাহা আপনাকে কি বলিব।'

(১) রবিবাবুর সমালোচকেরা গায়ত্রীমন্ত্র জপ করেন কিনা, তাহা

রবিবাবু জানেন না বলিয়াই এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে, তাঁহারা গায়ত্রীমন্ত্র জপ করেন না!

(২) রবিবাবু তাঁহার পিতৃদেবের নিকট যে গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সেই মন্ত্রসাধনে তিনি কতদূর উপকৃত হইয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করিতে তিনি সংকোচবোধ করিলেও, সমালোচক সংকোচবোধ করিবে না।

কতকগুলি গল্প বা কবিতা লেখা বা গান রচনা করা বা নোবেল প্রাইজ পাওয়া যদি গায়ত্রীমন্ত্র-সাধনের ফল হয়, তবে এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। আর যদি গায়ত্রীমন্ত্র-সাধনের ফলে আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের সম্ভাবনা থাকে, তবেই ত সমস্যার উৎপত্তি হয়। এই সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হইবার যোগ্যতা আমাদের নাই।

* * *

তাহার পর রবিবাবু চন্দ্রনাথবাবুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'চন্দ্রনাথবাবু অনেক লিখিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুই রহিল না, তাঁহার লেখার মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা দিনকতকের জন্যেও টিকিতে পারে।'

রবিবাবু ব্যতীত অন্য কেহ চন্দ্রনাথবাবুকে এইরূপ সার্টিফিকেট দিয়াছেন কিনা জানি না। রবিবাবুর যাহা ভাল না লাগে, তাহা টিকিয়া নাই, এরূপ ধারণা রবিবাবুর পক্ষেই সম্ভব। 'চন্দ্রনাথবাবুর 'শকুন্তলাতত্ত্ব' সমালোচনা হিসাবে অসার।'—ইহাও রবিবাবু বলিয়াছেন।

* * *

'রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে' চন্দ্রনাথবাবুর সম্বন্ধে আরও একটি কথা আছে একদিন চন্দ্রনাথবাবু রবিবাবুকে লিখিয়াছিলেন, 'তুমি হিন্দুর ছেলে, ওরকম লেখ কেন?' রবিবাবু উত্তর দিয়াছিলেন, 'হিন্দুত্ব সম্বন্ধে আপনার মত লইতে প্রস্তুত নহি।'

এই অবিনয়ের দৃষ্টান্তটি চাপিলে চলিত না কি?

* * *

তাহার পর বঙ্কিমচন্দ্রের কথা।

রবিবাবু বলিয়াছেন, 'তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) যেখানে মানুষের সমষ্টি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, সেইখানেই সমস্তটা একটা পিণ্ডবৎ তাল পাকাইয়া গিয়াছে, কোনও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার চেষ্টা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না।'

রবিবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার ত্রুটি দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন বলিয়া আমরা বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হই নাই। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের গুণের পক্ষপাতী হইলেও, তাঁহার রচনায় যে দোষ আছে, তাহাও দেখিতে চাহি। 'আনন্দমঠে' ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য নাই বলিয়াই রবিবাবুর তাহা ভাল না লাগিতে পারে,

কিন্তু দেখিতে হইবে, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য দিবার মানসেই কি বঙ্কিমবাবু 'আনন্দমঠ' লিখিয়াছিলেন? বেলতলায় আম পাওয়া যায় না, এই সরল সত্যটুকুও রবিবাবুর জানা নাই। 'আনন্দমঠে' যে উন্নত আদর্শ ও একপ্রাণতার পরিচয় পাওয়া যায়, রবিবাবুর কোনও উপন্যাসে তাহা পাওয়া যায় কি?...

রবিবাবু তাঁহার নিজের উপন্যাসের চরিত্রগুলির বিষয় চিন্তা করেন কি? তাঁহার যে কোনও উপন্যাস পড়িলেই বুঝা যায়, তাঁহার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা সকলেই যেন কলেজ-ফেরত, তাহাদের আড়ষ্ট-আড়ষ্ট কথাগুলা তর্জমা করা,—ঠিক যেন মুখস্থ-করা বুলি আওড়াইবার জন্যই রঙ্গমঞ্চে দাঁড়ায়। সেগুলো কি আমাদের ঘরের ছবি? 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি'র মত ছায়াবাজি আর কোনও বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দিয়াছেন কিনা, জানি না। 'ধরি ধরি ধরা নাহি যায়', অথবা 'বলি বলি বলা হ'ল না',—এই কথাই ত রবারের মত বাড়াইয়া রবিবাবু উভয় উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। উহাকে সামাজিক বিশৃঙ্খলার ছবি ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। অধিকাংশ নায়ক-নায়িকাই কদর্যভাবে বিভোর। তাঁহার এই ছায়াবাজির সহিত আমাদের সমাজের নাড়ীর কোনই সংযোগ নাই, সংযোগের আশাও নাই। যিনি কেবলই বাংলার মাটিতে বিলাতী গাছের চারা রোপণ করিতেছেন, তিনিই শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কথা স্মরণ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, 'আমার বরাবর মনে হইত যে আমাদের বাংলা (বাঙ্গালা) দেশে কি এমন লোক নাই, যে আমাদের ঘরের ছবিটি নিপুণহস্তে অঙ্কিত করে?'—ইহা শুনিলে কে হাসি চাপিতে পারে?"—শ্রাবণ, ১৩২৪

৩৯

নারায়ণ : আষাঢ়

"'ধর্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ' কে লিখিয়াছেন তাহা প্রকাশ নাই। হেঁয়ালির সৃষ্টিকর্তা রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ লেখক হেঁয়ালিচ্ছন্দে নিষ্পন্ন করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন,—'যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ'। 'ধর্মস্য তত্ত্বং' যেমন 'নিহিতং গুহায়াম্', তেমনই রবীন্দ্রনাথের ধর্মপ্রচারের তত্ত্বও লেখকের বাগাড়ম্বরে অপ-প্রযুক্ত শব্দস্তূপে নিহিত—প্রচ্ছন্ন। ইহাই 'নারায়ণে'র নৈবেদ্যের চূড়ার সন্দেশ! ইহাতে অনেক নূতন ও সাংঘাতিক সিদ্ধান্ত আছে। উপসংহারের সিদ্ধান্ত এই যে, 'আদর্শ মানুষ যিনি, আদর্শ মনুষ্যত্বের সাধক যিনি, তিনি জগতের সমস্ত দ্বন্দ্বে গা ঢালিয়া দিয়া, জীবনের শত অসুন্দর ব্যাপারের [illegible] লিপ্ত হইয়া তাহারই মধ্য হইতে নিজের অন্তরে বাহিরের জগতে একটা উচ্চতর মহত্তর সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন সৃষ্টি করিয়া চলিবেন।' অবশ্য, ইহার সবটাই মানে হয় না। যতটুকু অর্থ বুঝা যায়, তাহাই কি 'নারায়ণে'র

creed? আদর্শ মনুষ্যত্বের সাধক বলিয়াই কি 'নারায়ণ' জীবনের শত অনুন্দর ব্যাপারের কাদা-মাটি একচেটিয়া করিতেছেন?"—শ্রাবণ, ১৩২৩

৪০

প্রবাসী : আষাঢ়

"রবীন্দ্রনাথের 'বাতায়নিকের পত্র' তাঁহার যোগ্য হইয়াছে। প্রত্যেক বাঙ্গালীকে আমরা পড়িতে, মনে মুদ্রিত করিয়া রাখিতে বলি। রবীন্দ্রনাথের এই যুগধর্মের বিশ্লেষণ ও সনাতন মানবধর্মের নির্দেশ—তাঁহার কম্বুকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত এই ভারতবাণী বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিধ্বনি তুলিবে। ইহা ইউরোপের পক্ষেও মহৌষধ, এশিয়ার পক্ষে ও আমাদের পক্ষে মৃতসঞ্জীবনী-সুধার কাজ করিবে। ইউরোপ যদি তাহার ভাবনা না ভাবে, বর্তমানের মোহে ভবিষ্যৎকে ভুলিয়া থাকে, ক্ষতি নাই। কিন্তু আমরা যেন বর্তমানের আলোকে আমাদের অবস্থার বিচার করিতে পারি; অবস্থার মত ব্যবস্থা করিয়া ভবিষ্যতের পথে প্রবর্তিত হইতে পারি। রবীন্দ্রনাথ 'বাতায়নিকের পত্রে' সেই পথের সন্ধান দিয়াছেন।"—শ্রাবণ, ১৩২৬

'মানসী'

৪১

প্রবাসী : ফাল্গুন

"'মুক্ত' ও 'স্বর্গ' শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুইটি কবিতা। রবিবাবুর আং নিক কবিতার মধ্যে অনেকগুলি তাঁহার মত ও তর্ক প্রচার করিতে এত ব্যস্ত যে সেগুলির মধ্যে কবিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। ঐ সমস্ত কবিতা অন্তর্গত সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বটি ক্রমশঃ রসকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিতেছে

—চৈত্র, ১৩:

৪২

সবুজপত্র : ফাল্গুন

"'শ্রীবিলাস' শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প; রবিবাবু ইদানীং 'সবুজপত্রে' গল্পগুলি লিখিতেছেন সেগুলি স্বতন্ত্র হইলেও তাহাদের মধ্য দিয়া একটি কথার স বর্তমান রহিয়াছে। সব গল্পগুলি না পড়িলে কোন একটি বিশেষ গল্পের ভাব নিঃশেষে গ্রহণ করা যায় না। বাঙ্গালা ভাষায় এ ধরনের রচনা নূতন এই গল্পটিতে দামিনী ও শচীশের চিত্র দুটি মনোরম হইয়াছে। যে ম তত্ত্বের কথা বিবৃত হইয়াছে তাহা জটিল, ছোটগল্পের মধ্যে তাহা স্ফু করিতে লেখক অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।"—চৈত্র, ১৩২১

৪৩

সবুজপত্র : চৈত্র

"এবার সবুজপত্রে নূতনত্ব আছে—লেখক একা রবীন্দ্রনাথ, সম্পাদক মুখপত্রে নামাবশেষ হইয়াই আছেন।...

'বসন্তের পালা' নাম দিয়া যে কয়টি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ভূমিকায় লেখক বলিতেছেন—'এগুলি কানে করিয়া লইলে খেয়াল নাটকের (অর্থাৎ পরে প্রকাশিত 'ফাল্গুনী' শীর্ষক নাটকের) চেহারাটি ধরিবার সুবিধা হইতে পারে।' যাহাতে আমাদের মত পাঠকেরা নাটকটি বুঝিতে পারি সেই জন্যই 'বসন্তের পালা' লিখিতে হইয়াছে কিংবা ইহা একটি স্বতন্ত্র রচনা তাহা বুঝিয়া ওঠা কঠিন।...

এই হেঁয়ালি নাট্যে রবীন্দ্রবাবু একটা নূতন ধরন অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার কবিত্বশক্তি কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কথোপকথন সংক্ষিপ্ত, অথচ সারবান। গানগুলি স্থানে স্থানে প্রাণস্পর্শী, জিনিসটিকে হেঁয়ালির আকার দান করিলেও তাহা পরিস্ফুট।

কিন্তু তত্ত্বটি খুব দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয় না। হিন্দুদর্শন প্রকৃতিকে যে স্থান দিয়াছেন রবীন্দ্রবাবু তাহা উচ্চতর করিতে চান। তিনি আত্মা ও প্রকৃতির সম্পর্কটা খুব দৃঢ় প্রমাণ করিয়া ইউরোপের সভ্যতার স্রোত এদেশে আনিতে চান—যে আধ্যাত্মিকতা, তত্ত্বজ্ঞান, শাস্ত্রীয় বচন তাঁহার মতে আমাদের অকাল বার্ধক্য আনিয়া দিয়াছে, তাহার সহিত ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা ও ইহলোকের মঙ্গলের বিরোধ নাই—স্বতন্ত্রতা ও প্রকৃতির অনুবর্তিতা আমাদের আধ্যাত্মিকতায় আনয়ন করে, ইহাই রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য। অকালবৃদ্ধ হইয়া আমরা যে সমাজকে বৃদ্ধ অকর্মণ্য করিয়া তুলিতেছি তাহা সত্য। রবীন্দ্র-বাবুর যাহা বক্তব্য তাহাও অযৌক্তিক নয়। হিন্দুদর্শন প্রকৃতিকে নিম্ন স্থান দেয় নাই। কবি হিন্দুদর্শনের উপর আপনার কথা প্রতিষ্ঠিত না করিয়া ইংরাজী দর্শনের একটা পুরাতন জীর্ণ শাখাকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। যাহা নিজের কাছে প্রচুর তাহার জন্য পরের কাছে হাত পাতিতে কি জানি কেন বাঙ্গালী এখন একটু নারাজ। কেহ কেহ রবীন্দ্রবাবুর কথা বিদ্বেষীর কশাঘাত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাহা বন্ধুর তিরস্কার বলিয়া মানিয়া লইলাম।

তারপর রবীন্দ্রবাবু যাহা কবিকল্পনায় গড়িয়া তুলিয়াছেন, যেমন ভাবে চলিলে প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য না করিয়া জ্ঞানে পৌঁছিতে পারা যায় ও প্রকৃতি

ও জ্ঞানে কোন বিরোধ অনুভূত হয় না, তাহা কার্যক্ষেত্রে কতটা সম্ভব এখনও প্রমাণিত হয় নাই।"—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২

৪৪

প্রবাসী : বৈশাখ

"'বিবিধ প্রসঙ্গে' প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় লিখিতেছেন, 'জীবিত লেখকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম করিতে সাহস হয় না ; যদিও তাঁহার অনেক গদ্যরচনা খুব মূল্যবান, অনুবাদেও সমজদার বিদেশীরাও তাহার মূল্য বুঝিয়াছে। কেন না, বঙ্গদেশে রবিবাবুকে তুচ্ছজ্ঞান না করিলে বিজ্ঞ হওয়া যায় না।' লেখকের এ উক্তির সার্থকতা খুঁজিয়া পাইলাম না। রবিবাবুকে বোধ হয় এবার চিৎকার করিয়া বলিতে হইবে 'আমার বন্ধুদের নিকট হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর।' বঙ্গদেশের লোক রবিবাবুকে বুঝেন নাই, বুঝিয়াছেন কেবল প্রবাসী-সম্পাদক! আমরা সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি—বঙ্গদেশের কোন গ্রন্থকার জীবিতাবস্থায় রবীন্দ্রবাবুর মত এ দেশে সম্মান লাভ করিয়াছেন কি ?"—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২

৪৫

সবুজপত্র : বৈশাখ

"'ঘরে বাইরে' শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস ; এই সংখ্যায় ইহার আরম্ভ। যেভাবে লেখক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা হইতে অনেক জিনিস অনুমান করা যায়, কিন্তু বেশী কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমরা সাগ্রহে উপন্যাসটি পড়িতে আরম্ভ করিলাম—সময়ে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিব এই আরম্ভভাগ ভাবে, ভাষায় কবিত্বে অপূর্ব, স্থানে স্থানে এমন এক একটি স্বল্পাক্ষর অসন্দিগ্ধ বাক্য আছে, যাহা পাঠমাত্র অন্তরে রেখাপাত করিয়া যায়।"
—আষাঢ়, ১৩২২

৪৬

সবুজপত্র : আষাঢ়

"'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের যতটুকু এ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে লেখকের মনস্তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সন্দীপবাবু ও ছোট রাণীর, দেখাসাক্ষাৎ বড়ই উপভোগ্য ; এই বর্ণনাটুকুতে লেখকের অদ্ভুত শিল্প চাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মেজ জা'টির চিত্তের সংকীর্ণতা দু-একটি কথায় এত উজ্জ্বল হইয়া পড়িয়াছে, যে তাহার এ দিকটি আর ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। উপন্যাস অবসরের পাঠ্য ইহাই অধিক লোকের ধারণা, রবীন্দ্রবাবু এখন দেখাইতেছেন—উপন্যাসও দর্শনশাস্ত্রের মত সারকথায় পরিপূর্ণ হইতে পারে। উপন্যাসটি পড়িতে

পড়িতে যখন কঠিন মনস্তত্ত্বের দুর্গম গুহার মধ্যে প্রবেশ করি, তখন কখন কখন পাঠ বন্ধ করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু ইচ্ছাটা আর কার্যে পরিণত হয় না।

'সোনার কাঠি' প্রবন্ধে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিতেছেন—'আমাদের সাহিত্য-চিত্রে সমুদ্রপারের রাজপুত্র এসে পৌঁছেচে। কিন্তু সংগীতে পৌঁছায় নি। সেই জন্য আজও সংগীত জাগতে দেরি করচে। অথচ আমাদের জীবন জেগে উঠেছে। সেইজন্য সংগীতের বেড়া টলমল করচে। একথা বলতে পারব না, আধুনিকের দল গান একেবারে বর্জন করেচে। কিন্তু তারা যে গান ব্যবহার করচে, যে গানে আনন্দ পাচ্চে সে গান জাত-খোয়ানো গান। তার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার নেই, কীর্তনে বাউলে বৈঠকে মিলিয়ে যে জিনিস আজ তৈরি হয়ে উঠচে, সে আচারভ্রষ্টা; তাকে ওস্তাদের দল নিন্দা করচে। তার মধ্যে নিন্দনীয়তা নিশ্চয়ই অনেক আছে। কিন্তু অনিন্দনীয়তাই যে সব চেয়ে বড় গুণ তা নয়। প্রাণশক্তি শিবের মত অনেক বিষ হজম করে ফেলে। লোকের ভাল লাগছে; সবাই শুনতে চাচ্চে, শুনতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়চে না,—এটা কম কথা নয়। অর্থাৎ গানের পঙ্গুতা ঘুচল, চলতে সুরু করল। প্রথম চালটা সর্বাঙ্গসুন্দর নয়, তার অনেক ভঙ্গী হাস্যকর এবং কুশ্রী—কিন্তু সব চেয়ে আশার কথা যে চলতে আরম্ভ করেচে—সে বাঁধন মানচে না, প্রাণের সঙ্গে সম্বন্ধই যে তার সবচেয়ে বড় সম্বন্ধ, প্রথার সঙ্গে সম্বন্ধটা নয়, এই কথাটা এখনকার এই গোলমেলে হাওয়ার মধ্যে বেজে উঠেছে। ওস্তাদের কারদানিতে আর তাকে বেঁধে রাখতে পারবে না।'

এ কথার উত্তরে আমরা বলিতে চাই—আমাদের সাহিত্যে চিত্রে সমুদ্র-পারের রাজপুত্র আসিয়াছেন। তিনি সোনার কাঠির স্পর্শে আমাদের জাগাইয়াছেন। তিনি আসিতেই তাঁহাকে আমরা বরণ করিয়াও লইয়াছি। প্রাণহীন সাহিত্য ও চিত্র লইয়া আমরা অসাড় ভাবে একটা গতির প্রতীক্ষা করিতেছিলাম—যখনই তাহা আসিল, আমাদের সাহিত্য ও চিত্র উন্নতির পথে যাত্রা করিল। আমাদের দেশে গানের কথাটা কিন্তু স্বতন্ত্র। ওস্তাদ কালোয়াতের যুগ হইতে ইহা ক্রমশঃ উন্নতির পথেই চলিয়াছে। কীর্তন, বাউল ও প্রতিভাবান্ গায়কের চাল-গানের জীবনীশক্তিকে কখনও স্তম্ভিত হইতে দেয় নাই, সুতরাং গানের ক্ষেত্রে আমরা বিদেশের রাজপুত্রকে বরণ করিতে চাই নাই, সেই জন্যই তাঁহার সোনার কাঠি এখানে আপনার অক্ষমতারই প্রমাণ দিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল যে ইংরাজী চাল বাঙ্গালা গানে আনিয়াছেন, তাহাও অসময়ে আসিয়াছে, কেন না দেশ এখনও সে চালটাকে আয়ত্ত করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। আজকাল যে সব গান চলিয়াছে তাহা 'আচারভ্রষ্ট'

হইতে পারে, কিন্তু তাহারা জাতি খোয়ায় নাই। জাতির সহিত প্রাণের সম্পর্ক আছে। ৺দ্বিজেন্দ্রলালের গান যদি জাতি হারাইয়া পুরাদস্তুর ইংরাজী হইয়া যাইত, তাহা হইলে সে গান শুনিবার জন্য বোধ হয় একটুও ইচ্ছা হইত না। আধুনিকের দল শুধু যে আচারভ্রষ্ট গান পছন্দ করে তাহা নয়, ওস্তাদি গানের প্রতি অনেকের ঝোঁক পড়িয়াছে। লেখক অনেক গানে ওস্তাদি গানের সুর, তাল, লয় অনুকরণ করিয়াছেন, সেগুলি শুনিতে চান না এমন লোক বিরল। আধুনিকের দল যে গান পচ্ছন্দ করে তাহা সবই সমুদ্রপারের রাজপুত্রের কৃপায় হয় নাই; ওস্তাদি গানের আদর দেশে চিরকালই আছে। মধ্যে সে আদর কমিয়াছিল, এখন আবার বাড়িতেছে, সেই জন্য অল্পকাল পরেই গানের প্রাণশক্তি বাড়িয়া উঠিলে কেহ যদি সমুদ্রপারের রাজপুত্রের স্তুতিগান করিতে বলেন, তাহা হইলে তাঁহার কাজটা যুক্তিসংগত হইবে না।

দেশে আচারভ্রষ্ট গানের আদর ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। 'লোকের ভালো লাগচে, সবাই শুনতে চাচ্ছে, শুনতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়চে না,'—এটা বড় কথা নয়, 'চলতে সুরু' করিলেই আশা হইতে পারে, কিন্তু সে আশার সাফল্য অনেক দূরে। সমুদ্রপারের রাজপুত্র গানে আসুন, এখানে তাঁহাকে সোনার কাঠি হাতে করিয়াই বসিয়া থাকিতে হইবে, হয়ত কার্যে প্রবৃত্ত হইতে তাঁহার লজ্জা বোধ হইতে পারে।"—শ্রাবণ, ১৩২২

'মানসী ও মর্মবাণী'

৪৭

প্রবাসী : চৈত্র

"শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'খোলা জানালায়' কবিতাটি আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। ইহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রাচুর্য আছে, কিন্তু ইতিপূর্বে তিনি অনেক আধ্যাত্মিক কবিতা লিখিয়াছেন, তাহার ভাব আমরা স্পষ্ট-রূপেই বুঝিয়াছি।"—বৈশাখ, ১৩২৩

৪৮

সবুজপত্র : মাঘ

"রবীন্দ্রনাথের 'বৈরাগ্য-সাধন' একখানি নাট্য। ভাব ও ধরন অনেকটা 'ফাল্গুনী' নাটকেরই মত। মহারাজ বৈরাগ্য-সাধন করিতে চান—রাজকোষে ধনাভাব, প্রজাদের দুর্ভিক্ষ, বিপক্ষের আক্রমণ—তবুও তিনি শ্রুতিভূষণের 'বৈরাগ্য বারিধি' শ্রবণে তন্ময়। কবিশেখর অন্য ধরনের লোক। মহারাজের মাথায় পাকা চুল দেখিয়া শ্রুতিভূষণ বৈরাগ্যের ব্যবস্থা দেন। কবিশেখর কিন্তু বলেন, 'ঐ সাদা ভূমিকার উপরে আবার নূতন রং লাগাবে,

প্রাণের মধ্যে সব রঙেরই বাসা।' কথাটা মধ্যদর্শন ও বিজ্ঞানের অনুমোদিত। কবিশেখরও বৈরাগী। তাঁহার মতে 'সংসারে যে কেবলি সরা, কেবলি চলা ; তারই সঙ্গে সঙ্গে যে লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কেবলি সরে, কেবলি চলে, সেই ত বৈরাগী।' শান্তি বা ধ্রুব সম্পদে তাহার আসক্তি নাই, সে অধ্রুব-মন্ত্রের বৈরাগী—সংসারে কেবলই চলা কেবলি ছাড়িতে ছাড়িতে অগ্রসর হওয়া—সেই জন্ম ধ্রুব জিনিসকে সে জানিতে চায় না। সে নদীর মত আনন্দে বহিয়া চলিয়াছে। এই চলার লীলার মধ্যে সে সব সুখ দুঃখকে ভাসাইয়া লইতে চায়। গতিশীল নদী ভারী জিনিসও আনন্দে ভাসাইয়া লইতে পারে, মাটির পাকা রাস্তাই ভারকে ভারী করিয়া তোলে। সংসারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য গতি, একথা মানিয়া লইলে সুখদুঃখভার লঘু হইয়া পড়ে। শ্রুতিভূষণ একথা মানিতে চান না—তিনি সংসারের একটা ধ্রুব লক্ষ্য নির্দেশ করিয়া পৃথিবীর জঞ্জালজালকে পরিহার করিতে চান—তাঁহার নিকট সংসার জ্বালাযন্ত্রণায় ভরা; এখানে শান্তি বা আনন্দের কিছুই নাই। শ্রুতিভূষণের কথা খুবই স্পষ্ট ; কিন্তু শ্রোতার প্রাণের সহিত তাহার মিল নাই। কবিশেখরের কথা অস্পষ্ট হইতে পারে, কিন্তু শ্রোতা তাহা প্রাণ দিয়া অনুভব করে। কবিশেখর খুব জোর গলায় বলিয়াছেন—'যারা বৈরাগ্য-বারিধির তলায় ডুব মেরেচে তারা নয়, যারা কাজের কৌশলে হাত পাকিয়েচে তারাও নয়, যারা কর্তব্যের শুষ্ক রুদ্রাক্ষের মালা জপচে তারাও নয়, যারা অপর্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে পেয়েচে বলেই জগতের কিছুতে যাদের উপেক্ষা নেই, যাদের সাধনা কেবলই কর্মের সাধনা নয়, প্রাণের সাধনা, জয় করে তারা। ত্যাগ করেও তারাই, বাঁচতে জানে তারা, মরতেও জানে তারা, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ পায়, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ দূর করে,—সৃষ্টি করে তারাই, কেন না তাদের মন্ত্র আনন্দের মন্ত্র, সবচেয়ে বড় বৈরাগ্যের মন্ত্র।'

কবি, কবিশেখরকেই জয়ী করিয়াছেন।"—বৈশাখ, ১৩২৩

৪৯

বিচিত্রা : মাঘ

"কল্যাণী—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবি কল্যাণের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিতে চান, 'প্রত্যেক মানুষের নিজের জানা জিনিসে এবং বেছে নেওয়া জিনিসে তৈরী একটি স্বকীয় জগৎ আছে।' 'বিধাতার জগতে তারায় তারায় মিল আছে' কিন্তু মানুষের স্বকীয় জগতে পরস্পর সংঘাত নিয়তই বিরাজমান ; ইহা হইতেই যত দুঃখ যত অমঙ্গলের উৎপত্তি। তবে একথাও বুঝিতে হইবে যে, 'এক আমির জগৎ এবং আর এক আমির জগতে যদি আকাশপাতাল প্রভেদ থাকত তাহলে আমাদের না থাকত ভাষা, না থাকত

সমাজ, না থাকত সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, তন্ত্র। মানুষের যা কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ অর্থাৎ যাতে তার স্থায়ী আনন্দ, সে সমস্তেরই ভিত্তি হচ্ছে মানুষের সাধারণ ঐক্যের মধ্যে।' আমির সার্থকতাটি এইখানে। এই ঐক্য একাকারত্ব নহে। উভয়ের মধ্যে এই ঐক্যকে দেখাই কল্যাণকে দেখা। এই কল্যাণের প্রতি 'বিশ্বাস' মানুষের 'আমির' অন্তরে নিহিত।"—চৈত্র, ১৩৩৫

৫০

প্রবাসী : ফাল্গুন

"'দীক্ষা'—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শান্তিনিকেতনে কবি যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই এই প্রবন্ধের আকার ধারণ করিয়াছে। কবি বলেন, 'হঠাৎ একদিন অন্তরে অন্তরে বন্ধন ক্ষয় হয়ে আসে তখন (আমরা) চোখ মেলে দেখি সূর্য উঠেছে, আলো এসেছে, দীক্ষার দিন উপস্থিত হ'ল। সেই দীক্ষায় বাণীর জন্য প্রত্যেক মানুষ অপেক্ষা করে।' এইরূপে দীক্ষার নিগূঢ় অর্থটুকু সোজা কথায় বুঝাইয়া তিনি আবার বলিতেছেন, 'মৃত্যুর ভিতর থেকে অমৃতকে জয় করতে হবে। সেই দীক্ষাই অমৃতলোকের দীক্ষা।' কবি অন্যত্র বলিয়াছেন, 'স্বার্থ থেকে ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত করে যাঁরা আপনাকে নিবেদন করে দিয়েছেন পরম পরিপূর্ণের কাছে, তাঁরা সমস্ত জীবনকে নিবেদন করেছেন সকলের হয়ে। তাঁদের দীক্ষা আমাদের প্রত্যেকের দীক্ষা। সেই দীক্ষার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জাগ্রত হোক।' কথাটি সংক্ষেপে উক্ত হইলেও ইহার মধ্যে যে গভীর সত্য নিহিত আছে, তা প্রণিধানযোগ্য। উপসংহারে উক্ত হইয়াছে, 'সব মানুষের যিনি বিধাতা তাঁর আসনের একপাশে আমাদের স্থান হোক।' এই বাক্য সাধকের উপযোগী। কবি আচার্যরূপে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা ভারতের বাণী—যুগে যুগে ইহার সার্থকতা আছে। ভাষার লালিত্য ও গতি উপভোগ্য।"—চৈত্র, ১৩৩৫

৫১

মাসিক বসুমতী : ফাল্গুন

"'বিলাতের স্মৃতি'—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এবারে বিষয়বস্তুর অভাব কবিত্বে পূর্ণ করিয়াছে। কবিবর 'সকালে চোখ মেলিয়াই দেখিলেন বরফে সমস্ত সাদা হইয়া গিয়াছে' আর তাঁহার ভাবের শুভ্র-নির্মল স্রোত প্রবাহিত হইল। 'নিস্তব্ধতার অন্তর্নিগূঢ় সংগীত তাঁহার অন্তরকে রসপূর্ণ করিয়া তুলিল,' ও তিনি 'নূতন মিলনের মঙ্গলোৎসব' গাহিলেন। এ 'সাদার' গান লীলাচঞ্চল প্রাণের গান। অনুভূতির সাহায্যে ইহা বুঝিতে হয়।"—বৈশাখ, ১৩৩৬

'আলঙ্ক'

৫২

মানসী ও মর্মবাণী : অগ্রহায়ণ

"কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যের গুণ বিবেচনা লইয়া সাহিত্যরাজ্যে এমন একটি দলাদলির আগুন জ্বলিয়াছে যে আর তাহাকে অবহেলা করা চলে না—এখন ক্রমে উহা সাহিত্য হইতে ব্যক্তিত্বে পৌঁছিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা কি হইবে এই লইয়া দুই দল দুই দিকে দাঁড়াইয়া তাল ঠুকিতেছেন। ফলে মীমাংসার দিকে কেহই যাইতেছেন না। বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টি কোনও দলের মীমাংসার উপর নির্ভর করিতেছে না। এ সাহিত্যের এখন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে,—ইহার প্রাণশক্তি দেশের অন্তরতম প্রদেশ হইতে পথনির্দেশ করিয়া দিবে। সাহিত্যিকদের দলাদলি করাই সার। বঙ্গসাহিত্যও একটা জীবিত অঙ্গী পদার্থ, organism। এরূপ পদার্থ কোন চরমকেই গ্রহণ করিবে না। জীবনশক্তি সকল বিরুদ্ধশক্তির সমন্বয় করিয়া লইয়া আপনার পুষ্টিসঞ্চয় করিবে। যদি বিদ্বেষদুষ্ট না হয়, তবে এই দলাদলির যে একটা ভাল দিক নাই, তাহাও নহে। ইহা জাতির কর্মশক্তির লক্ষণ—এই বাদ-প্রতিবাদ সাহিত্যের জীবনকে সর্বদা কর্মশীল ও সচেষ্ট করিয়া রাখিবে।"—পৌষ, ১৩২৩

'অর্চনা'

৫৩

"রবীন্দ্রনাথ একবার দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন,—'ভাল কাব্যের সমালোচনায় পাঠকের হৃদয়ে সৌন্দর্য সঞ্চার করিবার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া নূতন এবং কঠিন কথায় পাঠককে চমৎকৃত করিয়া দিবার প্রয়াস আজকাল দেখা যায়; তাহাতে সমালোচনা সত্য হয় না, সুন্দর হয় না, অত্যন্ত 'আশ্চর্যজনক হইয়া উঠে।'—কথাটা যখন রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, তখন বোধ করি, স্বপ্নেও তিনি মনে করেন নাই যে, তাঁহারই কাব্যগ্রন্থের অদৃষ্টে ঐ সমালোচন-বিড়ম্বনা লেখা আছে।

* * *

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের যে সকল 'সমালোচনা' আজকাল বাহির হইয়া থাকে, তাহার প্রায় পনেরো আনা সাড়ে তিন পাই 'সত্য হয় না, সুন্দর হয় না, শুধু অত্যন্ত আশ্চর্যজনক হইয়া উঠে।'—একথা আমাদের মন-গড়া কথা নহে। 'প্রবাসী' ও 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকার পাতা উল্টাইলেই এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানে রবীন্দ্রনাথকে কেহ 'ঋষি' বলিতে-

ছেন, কেহ বা তাঁহার ব্রহ্ম-সংগীতের সহিত সামগানের তুলনা করিতেছেন। অথচ 'ঋষি' কাহাকে বলে, 'মন্ত্রদ্রষ্টা' কে, 'সামগান' জিনিসটা কিরূপ, সে সব কথা এই সমালোচক সম্প্রদায়ের একেবারেই জানা নাই। জানা থাকিলে কি কেহ এমন কেলেঙ্কারি করিতে পারে?

* * *

সেদিন একখানা বাঙ্গালা মাসিকে দেখিতেছিলাম, রবীন্দ্রনাথের 'ঠিকুজী'তে নাকি আছে যে, দেশের কতকগুলি বানর তাঁহাকে খোঁচা মারিবে। কথাটা নেহাত মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাকে 'ঋষি' 'মন্ত্রদ্রষ্টা' প্রভৃতি বলা, প্রকারান্তরে তাঁহাকে খোঁচা দেওয়ারই সামিল। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতি কত কবি কত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের অদৃষ্টে 'ঋষি' খেতাব কখনও জুটে নাই। এমন কি, কালিদাস, ভবভূতি, জয়দেব প্রভৃতি সংস্কৃত কবি-গণকেও তাঁহাদের টীকাকারগণ কোনও কালে 'ঋষি' বা 'মন্ত্রদ্রষ্টা' প্রভৃতি কিছু বলিয়া যান নাই। রবীন্দ্রনাথের দুরদৃষ্ট। তাই তাঁহাকে তাঁহার সমালোচক-গণের নিকট হইতে এই অত্যাচার অবিচার সহ্য করিতে হইতেছে। 'ঋষি' বা 'মন্ত্রদ্রষ্টা' বলিলে আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হয়—আমরা যাহা বুঝি, তাহাতে বলিতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতি ঐ কথা প্রয়োগ করিলে তাঁহাকে উপহাস করা হয়—তাঁহাকে লইয়া রঙ্গ করা হয়।"—শ্রাবণ, ১৩২২

৫৪

বরিশাল হিতৈষী : জ্যৈষ্ঠ

"বিগত ৯ই জ্যৈষ্ঠের 'বরিশাল হিতৈষী'তে 'নভেলে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' নামক নব প্রকাশিত 'নভেলে' 'স্বদেশী'র সপিণ্ডীকরণ কিভাবে হইয়াছে, তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য প্রবন্ধটি আমূল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

'সেদিন শয্যাপার্শ্বে দুই ভাগে এক খণ্ড 'সবুজপত্র' পড়িয়াছিল। নিদ্রা-গমের পূর্বে উহা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'র প্রতি দৃষ্টি গেল। দু'একটি অধ্যায় পড়িতেই প্রাণে একটা দারুণ উদ্বেগ অনুভব করিতে লাগিলাম—প্রাণপণ বেগে ছত্রের পর ছত্র, পত্রের পর পত্র পড়িতে লাগিলাম। বিমলার চরিত্র কখন রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত দেখিব সেই আকাঙ্ক্ষা আমাকে তীব্র কশাঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু পারিলাম না। আমার প্রদীপের তেল ফুরাইল, রাত্রিতে ভাল নিদ্রা হইল না। রবীন্দ্রনাথ—স্বদেশীর কবি রবীন্দ্রনাথ একজন স্বদেশী-প্রচারককে নায়ক করিয়া, তাহারই

মস্তকে পরস্ত্রীহরণ-প্রচেষ্টার আরোপ করিয়া আপন লেখনী মসীলিপ্ত করিলেন, এ দুঃখ প্রাণে বড় বাজিল। ক্রমে বইখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম; কিন্তু সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম কৈ? সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, নভেল মাত্রেই রবীন্দ্রনাথের এই লীলা প্রকট—'নৌকাডুবি', 'চোখের বালি' সর্ব্বদাই এই পরকীয়া পীরিতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। বাখানি সেই চুলচেরা কুশাগ্র লেখনী। কিন্তু একের স্ত্রীর অপরকে লইয়া লীলাখেলা—এসব নভেলের বিষয় কেন? তাও যাক্, বয়স থাকিতে একরূপ ছিল, আজ বিপত্নীক রবীন্দ্রনাথ, 'শান্তিনিকেতনে'র রবীন্দ্রনাথ, উৎকট স্বদেশীর স্কন্ধে পরস্ত্রী চাপাইয়া দিয়া কি বীভৎসরস উপভোগ করিলেন, বুঝিলাম না।

নভেল-পড়া সাঙ্গ করিয়া—টীকা-টিপ্পনীর দিকে দৃষ্টি গেল—ও হরি! একজন মহিলা-লেখিকার আপত্তি খণ্ডন করিতে গিয়া একি হেঁয়ালি রচিত হইয়াছে। সাফাই দিতে গিয়া দেশকে জবাই দেওয়া হইয়াছে যে। তিনি লিখিয়াছেন, 'আমিও দেশকে ভালোবাসি, তা যদি না হ'ত তা'হলে দেশের লোকের কাছে প্রিয় হওয়া আমার পক্ষে কঠিন হ'ত না। সত্য প্রেমের পথ আরামের নয়, সে পথ দুর্গম। সিদ্ধিলাভ সকলের শক্তিতে নাই এবং সকলের ভাগ্যেও ফলে না। কিন্তু দেশের প্রেমে যদি দুঃখ ও অপমান সহ্য করি, তা'হলে মনে এই সান্ত্বনা থাকবে যে, কাঁটা বাঁচিয়ে চলবার ভয়ে সাধনায় মিথ্যাচরণ করিনি।' কথাগুলি কেমন লাগে! রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধি বাকী কোন্ দিকে? তিনি এখন পূর্ণ 'সার'। অর্থের, সম্মানের অবধি নাই। দেশহিত করিতে যাইয়া তাঁহাকে এক পশুপতিনাথ বসুর বাড়ীর সভায় ব্যতীত অন্য কুত্রাপি হতাশ হইতে হয় নাই! 'বিধির বাঁধন' রাখতে গিয়ে তাঁকে জেলে যেতে হয় নাই, এমন কি 'বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে দিয়ে' একলাও চল্‌তে হয় নাই। বরং নানা কারণে তিনি 'সারত্ব' প্রাপ্ত হইয়াছেন। তা সে ঋণ শোধ দিতে গিয়া তিনি ১৩২২ সনে ১৩১২ সনের ঝাল মিটাইলেন কেন?···তিনি পরস্ত্রী মজাইবার একটা চিত্র আঁকিয়া দিলেন! 'ঘরে বাইরে'র উপসংহারে তিনি স্বদেশীর সর্ব কার্য্যই দোষদুষ্ট বলিয়া বাহবা লইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এখন সত্য প্রেমের পথকেই দুর্গম মনে করেন। Oh how fallen! আজ বড় দুঃখে বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথকে দুইটি তীব্র কথা বলিতে হইল।"—আষাঢ়, ১৩২৩

'কল্লোল'

৫৫

"প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের ডায়েরী একটি অমূল্য জিনিস। প্রবাসীতে ডায়েরীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি ছাপা হওয়াতে তাঁদের সুবিধা বিশেষ

হোক্ বা না হোক্ আমাদের বেশ সুবিধা হয়েছে। একসঙ্গে একস্থানে রবীন্দ্রনাথের আজকালকার অধিকাংশ প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পদ্যগুলি আমরা পড়তে পাচ্ছি। এ কি কম সুযোগ?—আষাঢ়, ১৩৩২

৫৬

"কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সবটুকু দান এক করিয়া বিচার করিলেও মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ জীবনের একটা দিক বাদ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সুচিত্রিত চরিত্রগুলির সকলেই যেন শুচিতায় ভরা; এমনকি বিনোদিনীর মধ্যেও পঙ্কিলতা নাই। মানুষ যেখানে সর্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া বসিয়া আছে হয় তো তাহার অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে সত্যের অগ্নিস্ফুলিঙ্গটুকু বাঁচিয়া আছে মাত্র—সেখানে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পাই না। জীবনের এই পাপের দিকটার চিত্রণে শরৎচন্দ্রের অসাধারণ শক্তির পরিচয়ে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ইহার কারণ বুঝা সহজ। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মভাবে অনুপ্রাণিত যে কবি-হৃদয় 'নৈবেদ্য' ও 'গীতাঞ্জলি' সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা তাঁহার উপন্যাস-গুলিতেও ছায়া ফেলিয়াছে। তাঁহার চিত্ত হোমানলের মত উপর দিকে উঠিয়া সুন্দরের মাঝে সত্যকে খুঁজিয়াছে, মলিনতার ভিতর নামিয়া তাহারও ভিতর যে পরম সত্য লুকাইয়া আছে তাহার সন্ধানলুব্ধ হয় নাই।"

—শ্রাবণ, ১৩৩৪

'কালি-কলম'

৫৭

"রবীন্দ্রনাথ রসসাহিত্য ও রঙ্গব্যঙ্গের 'আর্টের' স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর অপূর্ব ব্যাখ্যান দিয়েছিলেন 'পঞ্চভূতে'। সেটা পড়ে মনে হয়েছিল যে, এ বিষয়ে তিনি একটা চরম ও চিরন্তনী বাণী উচ্চারণ করে গেলেন। আজ দেখছি তিনি তাঁর সেই মত বদলেছেন এবং আমাদেরও বদলাতে বলছেন। 'আর্টের কোঠা' থেকে আজ 'পঞ্চভূত' নির্বাসিত, সেখানে স্থান পেল পাঁচ-ভূতের কলকোলাহল ও গালাগালি। কলমের 'অসাধারণ তীক্ষ্ণ ও তীব্র' অভিব্যক্তিই হ'ল 'আর্ট'! অর্থাৎ কিনা প্রচুর লঙ্কা ও মরিচের ঝাল দিলেই তরকারি সুস্বাদু হবে। খুব সাধু এবং সহজ উপায়। কবিগুরুর নির্দেশ অনুসারে তো তা'হলে 'মিঠেকড়া', 'আনন্দবিদায়' এবং সমাজপতি মহাশয়ের অসামাজিক সাহিত্যালোচনাকে আর্টের কোঠায় ফিরে ডাক দিতে হয়।

কিছুদিন পূর্বে 'প্রগতি' আবিষ্কার করেছেন যে রবীন্দ্রনাথের রচনাশক্তি মুমূর্ষু হয়ে পড়েছে। তাঁর আজকালকার ভাষা ও ভাব আল্‌গা এবং অসংলগ্ন;

নেক কথা বলেও তিনি যে ভাবটি সম্পূর্ণ ফুটিয়ে তুলতে পারেন না, শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁর সরল ও জীবন্ত ভাষার সাহায্যে দু'চার কথাতেই তা করে থাকেন। সম্প্রতি শোনা গেল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই অভিনব আবিষ্কারের মর্মার্থ গ্রহণ করে চমকে উঠেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত থেকে কলম খসে গেছে। সে কলম নাকি তিনি আর কুড়িয়ে নিতে ইচ্ছা করেন না। এমন কি তিনি তাঁর কবিগুরুর আসন ছেড়ে দিতেও নাকি রাজী। (যদিও দুষ্টলোকে বলে তিনি সম্প্রতি কোন সভায় নাকি 'আসন ছাড়ব না, ছাড়ব না' বলে দৃঢ়ভাবে এই বিষয়ের প্রতিবাদ করেছিলেন)। এ খবর সত্যি হলে প্রেমেন্দ্র-ভক্তের জয়জয়কার। ভবিষ্যৎ কবিগুরুর কলম এবং আসন তাহলে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের পক্ষেই বহাল হয়ে গেল।"—ফাল্গুন, ১৩৩৪

৫৮

"সমস্ত জগৎ দুঃখবেদনায় ক্লিষ্ট হ'ল, তার জন্য রাজ্য-স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ ক'রে তপস্যা করলেন বুদ্ধদেব। একজনের পাপের ভার আর একজন বহন করেন, এই অপরূপ division of labour সব যুগেই দেখা যায়। এ যুগেও দেখছি, 'নটরাজ'কে রাজ্যচ্যুত করে অরসিক রায়* যে পাপ করলেন, 'সংগীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা'য় শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস নটরাজের হৃতরাজ্য প্রত্যর্পণ করে তার প্রায়শ্চিত্ত করলেন। অপরের পাপক্ষালনে তাঁর এই আচার্যব্রতে আমরা তাঁকে আমাদের সহানুভূতি জানাচ্ছি। কিন্তু এরকম একটা আত্মোৎসর্গের পরম মুহূর্তে তাঁর 'মনের কোণে অন্ধকার ঘনাল' কেন তাই ভাবি। তিনি বলেছেন, 'সময় নাহি আর'। তাহলে কি তিনি তাঁর সাহিত্যিক কলেবর ত্যাগ করলেন? যদি আমাদের সন্দেহ সত্য হয়, তাহলে আমরা এখন থেকেই তাঁর সাহিত্যিক আত্মার সদ্গতি কামনা করি।"—বৈশাখ, ১৩৩৫

*অরসিক রায় সজনীকান্ত দাস নিজেই। 'নটরাজ' রচনাটি এই গ্রন্থে পরিশিষ্ট 'ক'-এর শেষ রচনা হিসাবে আংশিকভাবে মুদ্রিত হইয়াছে।

৫৯.

বাসী : বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ

"রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য-রূপ' ও 'সাহিত্য-সমালোচনা' উল্লেখযোগ্য রচনা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনায় এখন আর সে জোয়ারের যুগ নাই। কয়েকটি কবিতার মধ্যে 'বাসন্তী' ('বরযাত্রা') ভালো লাগিল।

'আজি পবন দিগন্তের দুয়ার নাড়ে,
সে যে চকিত অরণ্যের সুপ্তি কাড়ে,
যেন দূর হতে দুর্দম

বিপুল বিক্রম
গগনে মুহুর্মুহু পক্ষ ঝাড়ে ॥'

সুন্দর! রবীন্দ্রনাথের ছিটেফোঁটা চলিতেছে তাই রক্ষা, নহিলে 'প্রবাসী'র কি অবস্থা হইত তাই ভাবি!"—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫

৬০

"শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে এবারে পণ্ডিচেরীতে দেখা করে এসে রবীন্দ্রনাথ জুলাই সংখ্যা মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় সেই সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটি একেবারে সাধারণভাবে লেখা কিন্তু 'বাংলার কথা'র সম্পাদকীয় বিভাগের কোন ধনুর্ধর লেখক তার মধ্যে কবির স্বাদেশিকতার প্রতি বক্র কটাক্ষের সন্ধান পেয়েছেন এবং এই উপলক্ষে 'রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ' নামক একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের উপর এক ভীষণ লেকচার ঝেড়েছেন। ইংরাজী ভাষা সম্বন্ধে কতদুর সূক্ষ্ম জ্ঞান থাকলে এরকম সূক্ষ্ম অর্থ আবিষ্কৃত হতে পারে, তাই ভাবি। বার হাত কাঁকুড় থেকে এরকম তের হাত বীচি বার করবার চেষ্টা না করলে কি খবরের কাগজ চালান যায় না?"—আষাঢ়, ১৩৩৫

৬১

"গত কার্তিকের 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথ 'লেখন'-সম্পর্কে একস্থানে লিখছেন—'আমার ভোলবার শক্তি অসামান্য এবং নিজের পূর্বের লেখার প্রতি প্রায়ই আমার মনে একটা অহেতুক বিরাগ জন্মায়।'—কথাটা খুবই সত্য। কবিগুরুর মন অতীতকে আঁকড়ে প'ড়ে থাকে না বলেই ভবিষ্যতের নব নব পথে বিজয়যাত্রা তাঁর পক্ষে এত সহজ। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তাঁর যে তরুণ বন্ধুটি 'কিছুতেই মনে পড়ছে না এ আমার লেখা'—তাঁর এই শান্ত প্রতিবাদ সত্ত্বেও জোর করেই বললেন, 'কোন সংশয় নেই' এবং নিরঙ্কুশ চিত্তে শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবীর লেখা কবিতা রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে তাঁর সামনেই তুলে ধরলেন, বাঙলা-সাহিত্যের সেই ক্ষণজন্মা জহুরীর নামটা চেপে গিয়ে কবিগুরু ভাল কাজ করেন নি। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব গরু-খোঁজা করে যদি এই করিতকর্মা লোকটিকে বার করেন তাহলে বোধহয় তিনি কিঞ্চিৎ উপকৃত হবেন, কারণ 'কাব্য-দীপালি'র দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে।"

—পৌষ, ১৩৩৫

'শনিবারের চিঠি'

৬২

"'শেষের কবিতা' পড়িলে ইহাই মনে হয় যে, অতি-আধুনিকতার চরম-সিদ্ধিকে আগাইয়া আনিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতিভার শেষ শক্তিটুকু

নিঃশেষে ব্যয় করিতে চাহিয়াছেন। ভাষা ও ভাবের যে বিজাতীয়তা তরুণেরা রসকল্পনার দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারিতেছেন না, সেই বিজাতীয় মনোবৃত্তি ও '[illegible]' কাল্‌চারকে একটা জীবিত-রূপ দিবার জন্য তিনি যে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন তাহা তাঁহার মত কবিরই আয়ত্ত ; এবং ভাষাকে অনুরূপ গতি দিবার জন্য তিনি যে বলপ্রয়োগ করিয়াছেন তাহাও আর কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না। শক্তির prostitution-এর কথা আমরা শুনিয়া থাকি, কিন্তু এত বড় শক্তির এতখানি আত্মবিস্মৃতি আমরা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। 'শেষের কবিতা' সর্বপ্রকারেই অতি-আধুনিকতার জয়ধ্বনি ; এই একখানি পুস্তকের প্রভাব রসাতলযাত্রীদের পক্ষে যথেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ, ভাবের মদোন্মত্ত হাওয়ায় ভাষার তক্‌মা-তাবিজ ছেঁড়ার এমন ভরসা ও আশ্বাস তাহারা আর কোথায়ও পায় নাই।"

* * *

"রবীন্দ্রনাথের 'বনবাণী' বাহির হইয়াছে। যে দেশে পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যাওয়াই রীতি এবং যেখানে রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষণিকা'র যৌবনেই বানপ্রস্থ অবলম্বনের পক্ষে ওকালতী করিয়াছেন, সেখানে ৭০-এর কোঠায় 'বনবাণী' বহু-বিলম্বিতই বলিতে হইবে। এই পুস্তকে গাছ-গাছড়ার বন্দনা দেখিয়া ভরসা হইতেছে ইহাই বুঝি কবি-রাজ মহাশয়ের শেষ বাণী।"—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

৬৩

"'বিচিত্রা'র ফরমায়েসে রবীন্দ্রনাথ যে তরুণ-মূর্তি ধরিয়াছেন সেটা আমরা সত্যই বুঝিতে না পারিয়া গালি দিই। তবু এবার দেখিলাম 'বিচিত্রা'র নূতন বিজ্ঞাপনে আমাদের সে ভুল সংশোধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এবারকার বিজ্ঞাপনে আছে—'অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ তরুণ সাহিত্যিককে বিচিত্রা সাহিত্যজগতে সুপরিচিত করিয়াছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠকে সুপরিচিত করা।—সহসা হেঁয়ালি বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এর মানে আছে। যেমন ধরুন, রবীন্দ্রনাথ ত' লব্ধপ্রতিষ্ঠ ? তবুও 'তরুণ সাহিত্যিক' রূপে তাঁহাকে সুপরিচিত করিয়াছে কে ? বুঝিলাম—'বিচিত্রা'র রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই পূর্ব-পরিচিত প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ নহেন, তরুণ রবীন্দ্রনাথ।"

* * *

"আজকাল নানা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বহু পত্র প্রকাশিত হইতেছে, এ-গুলির যথেষ্ট মূল্য আছে। এ পত্রগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অলতর্ক ব্যক্তি-মন অনেকস্থানে অনেক confession করিয়া ফেলিতেছে। এগুলি 'ছিন্নপত্র' নয়, এগুলিতে কবি অপেক্ষা মানুষটির পরিচয় বেশী পাওয়া যায়—ইহা কম

লাভ নয়। এই আত্মকথা বলিবার ইচ্ছা তাঁহার অন্যান্য আধুনিক লেখাতে প্রকাশ পাইতেছে। মনে হয়, কবি শেষজীবনে নিজের সম্বন্ধে আরও দুর্বল হইয়া পড়িতেছেন—আত্মপ্রকাশের সংকোচ আর টিকিতেছে না।"—পৌষ, ১৩৩৮

৬৪

"রবীন্দ্রনাথকে এ যুগের বাংলা-সাহিত্যিক যে প্রেম নিবেদন করিয়াছে, তার তুল্য প্রেম আর কোন্ কবি পাইয়াছেন, আর কোন্ সাহিত্যে এক যুগ ধরিয়া আর কোন্ কবির 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' এই অকথিত বাণী এমনভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে? রবীন্দ্রোত্তর বাংলাসাহিত্য রবীন্দ্রনাথের চরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছে—সে সাহিত্যের আর কোনও ধর্ম নাই, সে রবীন্দ্রময় হইয়াছে; তাই একালের বাংলাসাহিত্য সেই সকল সাহিত্যিক-গণের মুখ দিয়া যথার্থই বলিতে পারে—'ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ, আরও কি তোমার চাই'!"

* * *

"রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকিয়াছেন; শুধু আঁকা নয়—আঁকিয়া জগতের গুণী-সমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার ইহা বিকাশ না বিবর্তন? —বিস্ময়ের যে আর সীমা রহিল না। যতগুলি কলা ছিল, ক্রমে ক্রমে প্রায় সবগুলি রবীন্দ্র-প্রতিভাশশীর তিথিতে তিথিতে পূরিয়া উঠিয়া এতদিনে কি ষোলকলা সম্পূর্ণ হইয়া পৌর্ণমাসী দেখা দিল? না কৃষ্ণপক্ষের রবীন্দ্রশশী একে একে সকল কলাগুলি ত্যাগ করিয়া শেষ কলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে? —'কলামাত্র শেষাং হিমাংশো!' আমরা প্রার্থনা করি, ইহাই যেন শেষ কলা না হয়; মূর্তি ও বাস্তব এই দুইটি কলা এখনও বাকি আছে, আশা হয় এ দুটিও বাদ যাইবে না, অন্ততঃ বাস্তব-কলাটি।"

"ছবিগুলি ছবি হউক আর না হউক—একটা কিছু বটেই, আমরাও তাহা অস্বীকার করি না। অনেকগুলিতে শ্যাওলা-ছ্যাৎলা-মেছেতা জাতীয় একটা রূপ আছে; আবার কতকগুলিতে যে বিকট হিলিবিলির মত রেখা-বিন্যাস আছে তাহার সহিত লালাক্লিন্ন সরীসৃপের সাদৃশ্য আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ছবিগুলির অঙ্কনরহস্যের যে আভাস দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, এগুলি তাঁহার অবচেতনা হইতে উদ্ভূত। যদি তাহাই হয় তবে এগুলিকে চিত্র-শিল্পের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া মনোবিকলন-শাস্ত্রের অধীন করাই ত সংগত। সজ্ঞান সৌন্দর্যসাধকের নির্জ্ঞানে যে কুৎসিত-কুরূপের প্রীতি অবরুদ্ধ হইয়া থাকে, এগুলিতে কি তাহাই কবি-প্রতিভার তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিতেছে? শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় এ সম্বন্ধে কি বলেন?"

"এক কথায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, কবিতা পড়িলে হইবে না, আমাকে পড়; আমার শেষ না পাইলে আমার কবিতার শেষ পাইবে না।...

কবি একটি দৃষ্টান্তও দিয়াছেন—

'বহুকাল আগে 'কড়ি ও কোমলে'র যে একটি কবিতায় লিখেছিলুম—

'মাহুষের (sic) মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'

তার মানে হচ্ছে এই মানুষ যেখানে অমর সেইখানেই বাঁচতে চাই। সেইজন্যই মোটা মোটা নামওয়ালা ছোট ছোট গণ্ডীগুলোর মধ্যে আমি মানুষের সাধনা করতে পারি নে, স্বাজাত্যের খুঁটিগাড়ি ক'রে নিখিল মানবকে ঠেকিয়ে রাখা আমার দ্বারা হ'য়ে উঠল না, কেন না অমরতা তারই মধ্যে যে-মানব সর্বলোকে, আমরা রাহুগ্রস্ত হয়ে মরি যেখানে নিজের দিকে তাকিয়ে তাঁর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াই।'

—'তার মানে হচ্ছে'—শুনিলেই ভয় করে! কবি এখন একাধারে কালিদাস ও মল্লিনাথ। সত্তর বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে কবিকেও কি এমন মরা মরিতে হয়! এ ত' কবি নয়—এ যে মানবানন্দ স্বামী! রবীন্দ্রনাথের কি একবারও মনে হইল না যে তিনি বুড়া হইলেও তাঁহার কবিতা বুড়া হয় নাই? সেই চির-যৌবনা অপ্সরীকে এমন করিয়া নিজের সঙ্গে সহমরণে বাঁধিতে চাহিলে সে শুনিবে কেন? 'কড়ি ও কোমলে'র ঐ কবিতাটির উপর অত্যাচার না করিয়া তাঁহার আধুনিক কালের কোন শুক্লকেশিনীকে বাছিয়া লইলেই ত' ভালো হইত! কিন্তু তিনি যে প্রমাণ করিতে চান—কবিতার হবিষ্যান্নই তিনি আজীবন পাক করিয়াছেন! হায় 'মানব'! তুমি তখন 'প্রাণের খেলায় তরঙ্গিত' হইতে 'বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়'! তুমি ত' তখন 'নিখিল-মানব' হইয়া উঠিতে পার নাই। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের এই 'নিখিল-মানব' বহুবচন নয় একমেবাদ্বিতীয়ম্, যথা—'আমরা রাহুগ্রস্ত হয়ে মরি যেখানে নিজের দিকে তাকিয়ে তাঁর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াই।' এ সেই ব্রহ্মন্—একেবারে neuter gender। 'স্বাজাত্যের খুঁটিগাড়ি ক'রে এঁকে ঠেকিয়ে রাখা' তাঁর অসাধ্য। কবির মনে আজকাল স্বাজাত্যের বিভীষিকা এতই বেশি যে, পাছে, মানুষকে ভালোবাসার কথায় স্বদেশ-বিদেশের কথাও আসিয়া পড়ে, তাই সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে পিণ্ডীভূত করিয়া তাহার ব্রহ্মনির্যাসটুকুই তিনি পেটেন্ট করিয়া লইয়াছেন।"—মাঘ, ১৩৩৮

৬৫

"কি বর্তমানে কি অতীতে আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ কোনও ঋষির সাক্ষাৎ পান নাই—এক সেই উপনিষদ ছাড়া। Theology শিখাইতে যেমন Medville College-এ ছাত্র পাঠাইতে হয়, তেমনি ঋষি বা সাধুসংগমের জন্যও য়ুরোপেই তীর্থযাত্রা করা উচিত; অন্যত্র আর কোথাও এত ঋষি ত' নাই।—

'সত্য কথা বলি, বিদেশেই তাদের বেশী দেখলুম, কিন্তু তারা যে দেশে থাকে সে দেশ বিদেশ নয়, সে যে সর্বমানবলোক। সেই দেশেরই দেশাত্মবোধ আমার হোক এই আমার কামনা।'

এর চেয়ে স্পষ্ট করিয়া নিজ দেশের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা রবীন্দ্রনাথ বোধ করি আর কোথাও প্রকাশ করেন নাই। এত উচ্চভাবের snobbery আমরা আর কোথাও দেখি নাই। ইহারই নাম বিশ্বমানবপূজা, ইহারই সাধন-পন্থা বিশ্বপরিশীলন-চর্চা। সেই বিশ্বমানব য়ুরোপেরই এক অংশে প্রকাশ পাইয়াছেন, সেইখানেই তিনি তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন; দেশে কোথাও তাঁহার প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করেন নাই—দেশে তাঁহার অপ্রকাশের দিকটাই তিনি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং সেজন্য দেশ তাঁহাকে অতিশয় পীড়া দেয়। তাই বারবার দেশ ছাড়িয়া তিনি বিদেশে ছুটিয়া যান।"—বৈশাখ, ১৩৩৯

৬৬

"আষাঢ়ের প্রবাসীতে সেই হনি চাক (শ্রী) চারু (চন্দ্র) বন্দ্যো (পাধ্যায়) মহাশয়ের লিখিত রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র সম্বন্ধে একটি তিন পৃষ্ঠা বা ছয়কলম বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। প্রবাসীতে ঐরূপ ধরনের বিজ্ঞাপন সম্প্রতি বাহির হইতে সুরু হইয়াছে। গত মাসে 'যোগাযোগে'র একটি বিজ্ঞাপন ছিল। 'পঠিতব্য' পৃষ্ঠার মধ্যে এরূপ বিজ্ঞাপনের হার পৃষ্ঠা প্রতি কত জানিতে পারিলে আমরাও চেষ্টা করিয়া দেখিতাম।"

* * *

"'শেষের কবিতা' বাহির হইবার দুই বৎসর পরে পুরানো পড়া ঝালানোর মত তাহার গল্পাংশ চটকদার ভাষায় পুনরায় প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইল কেন? বইখানির কাটতি কি আশানুরূপ হইতেছে না? আমাদের মতে চারুবাবুকে দোভাষীর কাজে না লাগাইয়া 'শেষের কবিতা'টাই আগাগোড়া আবার ছাপিয়া দিলে মন্দ কি হইত? এই উপন্যাস-সংকটের দিনে তাহাতে অন্ততঃ মাসকয়েকের জন্য উপন্যাসের ভাবনা ভাবিতে হইত না।"—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯

৬৭

"রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটা জিনিস আমরা বরাবরই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, হিন্দুধর্ম, সমাজ ও আচার সম্পর্কে তিনি বরাবরই অত্যন্ত অসহিষ্ণু; একবার 'গোরা'র যুগে বাহিরের কাহারও প্রভাবে পড়িয়া হিন্দুধর্মকে বুঝিবার বাসনা তাঁহার হইয়াছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার শ্রদ্ধা টিকে নাই। নিজে অপরিমিত

ভোগ বিলাসের মধ্যে বাস করিয়া, মাংসাহার কালে এখনও 'পরানকে অরুণ-বরনী' করিবার প্রবৃত্তি লইয়া রহিয়া রহিয়া উপনিষদের বুকনি আওড়াইলেই যদি ঋষি হওয়া যাইত তাহা হইলে ভাবনা ছিল না। ত্যাগ ও সাধনা ব্যতীত কোনও দেশে মানুষ কখনও ধর্ম সম্বন্ধে কথা বলিবার অধিকারী হয় নাই—রবীন্দ্রনাথ জীবনে এমন কি ত্যাগ করিয়াছেন যাহার জন্য ধর্ম সম্বন্ধে কথা বলিবার দাবী করিতে পারেন? কাব্যমার্গে চীনাংশুক আলখাল্লা পরিয়া বিচরণ করিলেই গুরু হওয়া যায় না, গুরু হইতে হইলে তপস্যা প্রয়োজন।"—শ্রাবণ, ১৩৩৯

॥ পত্রিকাগুলির পরিচয় ॥

সাহিত্য (মাসিক পত্রিকা)—প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ, ১২৯৭ (১ম বর্ষ-৩৩ বর্ষ) সম্পাদক: সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। তৎপরে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (৩১ বর্ষ-৩৩ বর্ষ) ১৩৩৩-এর আংশিক বর্ষ। এস্থলে উদ্ধৃত অংশগুলির অধিকাংশই 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' হইতে গৃহীত।

মানসী (মাসিক পত্রিকা)—প্রথম প্রকাশ: ১৩১৫। সম্পাদক: ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবরতন মিত্র, সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী। ১৩২০ (৬ষ্ঠ বর্ষ) সালে একাকী সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন জগদিন্দ্রনাথ রায়। তৎপরে ইহা 'মর্মবাণী' নামক (প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩২২) সাপ্তাহিক পত্রিকার সহিত যুক্ত হয়। সম্পাদক হন জগদিন্দ্রনাথ রায় ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। উদ্ধৃত অংশগুলি 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' হইতে গৃহীত।

মানসী ও মর্মবাণী (মাসিক পত্রিকা)—প্রথম প্রকাশ: ১৩২২: সম্পাদক: জগদিন্দ্রনাথ রায় ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। এস্থলে উদ্ধৃত অংশগুলি 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' হইতে গৃহীত।

মালঞ্চ (মাসিক পত্রিকা)—প্রথম প্রকাশ: ১৩২১। সম্পাদক: কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত। উদ্ধৃত অংশগুলি 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' হইতে গৃহীত।

অর্চনা (মাসিক পত্রিকা)—প্রথম প্রকাশ: ১৩১০। সম্পাদক: জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পরবর্তী বৎসরসমূহে কেশবচন্দ্র গুপ্ত ও কৃষ্ণদাস চন্দ্র। শেষ ১৩৪১ হইতে কয়েক বৎসর চিত্রিতা দেবী সম্পাদকতা করেন। উদ্ধৃত অংশগুলি 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ', 'নানা কথা' প্রভৃতি বিভাগ হইতে গৃহীত।

কল্লোল (মাসিক পত্রিকা)—প্রথম প্রকাশ: ১৩৩০, শেষ ১৩৩৫। সম্পাদক: দীনেশরঞ্জন দাশ। পরে দীনেশরঞ্জন দাশ ও গোকুলচন্দ্র নাগ। উদ্ধৃত অংশগুলি 'ডাকঘর' বিভাগ হইতে গৃহীত।

কালি-কলম (মাসিক পত্রিকা)—প্রথম প্রকাশ: ১৩৩৩ সাল। ১ম বর্ষের সম্পাদক: মুরলীধর বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১৩৩৪, ২য় বর্ষে মুরলীধর বসু ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৪র্থ বর্ষে মুরলীধর বসু। উদ্ধৃত অংশগুলি 'আর্টের আটচালা' বিভাগ হইতে গৃহীত। লেখক: বিরূপাক্ষ শর্মা।

শনিবারের চিঠি (সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা)—প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ, ১৩৩১, সাপ্তাহিক রূপে। সম্পাদক: যোগানন্দ দাস। ১৩৩৪ সালের ভাদ্র হইতে মাসিক রূপে প্রকাশিত হয় এবং যোগানন্দ দাসের স্থলে নীরদ চৌধুরী সম্পাদক হন। ইহার সাত মাস পরে সম্পাদক হন সজনীকান্ত দাস। মধ্যে কিছুকাল 'বঙ্গশ্রী' মাসিক পত্রের বেতনভোগী সম্পাদক হিসাবে কর্মভার গ্রহণ করায়, তাঁহার অনুপস্থিতিতে পরিমল গোস্বামী সম্পাদকতা করেন ৫ম বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা হইতে ৮ম বর্ষের ৯ম সংখ্যা পর্যন্ত। তৎপরে জীবিতকাল (মাঘ, ১৩৬৮) পর্যন্ত সজনীকান্ত নিজেই সম্পাদকতা করেন। উদ্ধৃত অংশগুলির অধিকাংশই 'সংবাদ সাহিত্য' ও 'প্রসঙ্গ-কথা' বিভাগ হইতে গৃহীত।

"তোমার উপর আমাদের দেশের মঙ্গলামঙ্গল পুরোমাত্রা নির্ভর করিতেছে এইজন্তে বলি যে, তোমার উচিত আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার আগা গোড়া ভালমতে বিবেচনা করিয়া দেখিয়া দেশের জনসাধারণকে প্রকৃত হিত পরামর্শ প্রদান করা, আর, সে কার্যে তুমি যেমন পারদর্শী এমন আর কেহই না। আমি সর্বান্তঃকরণের সহিত প্রার্থনা করিতেছি যে, আমাদের দেশের গাত্র হইতে মোহনিদ্রা ঝাড়িয়া ফেলিবার এই মুখ্য সময়টিতে ঈশ্বর তোমাকে এবং আমাদের সকলকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।"—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

:::

"তুমি সাহিত্যের যে মূর্তিতেই হাত দিয়াছ, তাহাকে উদ্ভাসিত ও সজীব করিয়া তুলিয়াছ। কারণ, তোমার প্রাণ আছে, সে প্রাণে যেমন মধুরতা আছে, তেমনি তেজ আছে—যেমন মোহিনীশক্তি আছে, তেমনি উন্মাদিনী শক্তি আছে—যেমন সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে—তেমনি দূরদৃষ্টি আছে। তোমার প্রতিভা যেমন গড়িতে পারে, যেমন মাতাইতে পারে—তেমনি ঠাণ্ডা করিতে পারে —যেমন কাঁদাইতে পারে, তেমনি হাসাইতে পারে। কিমধিকং, তোমার প্রতিভা সর্বতোমুখী, সর্বতঃপ্রসারী এবং সর্বতোমুগ্ধকারী। সংগীতের সহিত সাহিত্যের মিলনে তোমার হাতে উভয়ের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, তোমাকেও যশোমন্দিরের চূড়ায় তুলিয়া দিয়াছে।"—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

:::

"হৃদয়ের অনেক আকাঙ্ক্ষা যাহা আমার মনেই থাকিত তাহা তোমার মুখে তোমার লেখাতে পরিস্ফুট দেখিতে পাই। নিরাশায় কে মন বাঁধিতে পারে? তবুও এক বিশ্বাস যে আমরা একদিন আলোর সন্ধান পাইবই, সেই আশায় তোমাকে দেখিয়া বিশ্বস্ত হইয়াছি।"—জগদীশচন্দ্র বসু

:::

"রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ বর্ণনা করতে বসে আমি যে দেখতে পাচ্ছি সেই যুগ-যুগান্তরের মহাপুরুষকে—যিনি মৃত্যুঞ্জয়, আপনার অবিনশ্বর কীর্তির চেয়েও যিনি মহৎ, যিনি লোকে লোকে চির-পূজিত। এই রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভার সম্যক বিশ্লেষণ আমার কাছে তাই অসম্ভব বলেই মনে হয়।"
—জলধর সেন

:::

"আমাদেরই কবি রবীন্দ্রনাথ, যাঁহার সংগীতে এ-দেশের লক্ষ লক্ষ স্ত্রী-পুরুষ ছেলেমেয়ে মাতোয়ারা হইয়াছে, যাঁহার বৈতালিক গীতে জাগিয়া এ জাতি দেশকে ভালবাসিতে শিখিয়াছে, তিনিই অবশেষে সমগ্র সভ্যদেশের ঘরে ঘরে পূজিত হইলেন। বিশ্বপ্রেমের হোতারূপে তাঁহার আবির্ভাব;—ইতিহাসের অনন্ত আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলে তাঁহার স্থান চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট

হইয়া গেল। আমাদের সেদিনের সে-আনন্দের কথা আমাদেরই প্রাচ্যভাষায় বলিতে হয়,—কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা। আর, সেই আনন্দ আজিও আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া আছে।"—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

:::

"বীণাপাণির অঙ্গুলিপ্রেরণে বিশ্বযন্ত্রের তন্ত্রীসমূহে অনুক্ষণ যে ঝংকার উঠিতেছে, ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে তোমার অগ্রজাত কবিগণের পশ্চাতে আসিয়াও তুমি তাহা কর্ণগত করিয়াছ; সুপর্ণরূপিণী গায়ত্রী কর্তৃক গন্ধর্বরক্ষিত অমৃত-রসের দেবলোকে নয়নকালে মর্ত্যোপরি যে ধারাবর্ষণ হইয়াছিল, পৃথিবীর ধূলিরাশি হইতে নিষ্কাশিত করিয়া নরলোকে সেই অমৃত-কণিকার বিতরণে তোমার সহকারিতা গ্রহণ দ্বারা তাঁহারা তোমায় কৃতার্থ করিয়াছেন। পঞ্চাশৎ সংবৎসর তোমাকে অঙ্কে রাখিয়া তোমার শ্যামা জন্মদা তোমাকে স্নেহপীযূষে বর্ধন করিয়াছেন; সেই ভুবনমনোমোহিনীর উপাসনাপরায়ণ সন্তানগণের মুখ-স্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশ্বপিতার নিকট তোমার শতায়ুঃ কামনা করিতে-ছেন। কবিবর, শংকর তোমায় জয়যুক্ত করুন।"—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

:::

"এইবারের পূর্ববারে রবীন্দ্রনাথ যখন ইউরোপে গিয়াছিলেন, তখন তিনি 'তীর্থযাত্রী'র মত গিয়াছিলেন এবং সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন 'গীতাঞ্জলি' এবং গীতাঞ্জলি বলিতে যে বস্তু বুঝায়। ভগবানের সহিত আত্মার লীলার যে একটি দিক্ আছে, প্রকৃতিতে, জীবনে এবং সামাজিক নানা সম্বন্ধের ভিতর দিয়া যে লীলার বিচিত্র প্রকাশ এবং যে লীলাতত্ত্ব ভারতবর্ষের অনেক কালের সাধনার ফল,—সেবারে সেই বস্তুটিকে তিনি 'গীতাঞ্জলি'র ভিতর দিয়া পশ্চিমে লইয়া গেলেন। ইউরোপের সমস্যা-প্রপীড়িত, ব্যস্ততাসংকুল ব্যক্তি-জীবনে যে শান্তিরসের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, তিনি সেখানে তাহারি উৎস উৎসারিত করিয়া দিলেন। কিন্তু সেখান হইতে তিনি লইয়া আসিলেন কি? সেখান হইতে তিনি লইয়া আসিলেন একটা বড়ো অশান্তি, একটা ঝঞ্চাবাত, একটা storm and stress (struym und drang), যাহা আজ প্রাচ্যে ব্যক্তিজীবনের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। যে-সকল অর্থহীন সামাজিক নিগড় ব্যক্তিকে ক্রমাগত সংকুচিত করিয়া বিশ্বমানবের দিকে তাহার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করিতেছে, সতেজে সংগ্রাম করিয়া সে-সমস্ত ভাঙিয়া-চুরিয়া ব্যক্তিকে মুক্তির পথে বাহির হইতে হইবে; সেই উন্মুক্ত মার্গের সন্দেশ তিনি সমুদ্র-পথে বহিয়া আনিয়াছেন। এ ভাব পূর্বে তাঁহার রচনায় সৌন্দর্যানুভূতি ও রসানুভূতির দিক দিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল বটে। কিন্তু সম্প্রতি, যে-ক্ষেত্রে ব্যক্তির সহিত সমাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, সেই ক্ষেত্রে এই ভাবটিকে অবতরণ করাইয়া এবং তাহাকে রক্তমাংসে সজীব করিয়া, জীবনের সঙ্গে

প্রথিত করিয়া, আমাদের সম্মুখে তিনি উপস্থিত করিয়াছেন। পূর্বের সহিত বর্তমানের এইখানে পার্থক্য।"—আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

:::

"বঙ্কিমের জীবদ্দশাতেই যে কিশোর রবির কিরণসম্পাতে বঙ্গভারতীর কবিতাকুঞ্জে কুসুমরাজি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কালক্রমে সেই রবির উজ্জ্বল তেজে আজ সমগ্র ভারতভূমি উজ্জ্বলিত। সেই সাহিত্য রাজরাজেশ্বর তাঁহার মনোরত্ন-শালার নিভৃত মণিপ্রকোষ্ঠ হইতে নানাবিধ মহার্ঘ ও অমূল্য রত্নরাজি আহরণ করিয়া শিশু-সাহিত্যের সর্বাঙ্গ ভূষিত করত বিশ্বসাহিত্য-সমাজের নিকটে আজ তাহাকে দাঁড় করাইয়াছেন। অঙ্গদ, কুণ্ডল, বলয়, কেয়ূর প্রভৃতি দিব্যাভরণ-ভূষিত তরুণ বঙ্গসাহিত্যের রূপচ্ছটায় দশদিক যে আজ উদ্ভাসিত হইয়াছে, ইহা কবিবর একক তোমারই কৃতিত্ব, তোমারই অক্লান্ত পরিশ্রম ও অকুণ্ঠিত মুক্তদানের ফলে। আজ তোমার বীণার অমৃতনিস্যন্দী ঝংকারে বঙ্গসাহিত্য-কুঞ্জের সর্বত্র প্রতিধ্বনিত।"—জগদিন্দ্রনাথ রায়

:::

"রবীন্দ্রনাথের কবিতা যে বিপুল সাফল্যলাভ করিয়াছে এবং বিরাট স্পন্দন জাগাইয়াছে তাহাকে যুগ-মানসের তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষণ হিসাবে ধরা যাইতে পারে।...কবিতার জগতে এতাবৎকাল সূক্ষ্মতম ও অতি সুকুমার যাহা কিছুই হইয়াছে, তাহাদের উচ্চতম পরিণতিস্তরের ঊর্ধ্বে, এক অমর্ত্য মধ্যলোকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বলা যাইতে পারে।"—শ্রীঅরবিন্দ

:::

"বৈদিক যুগে দেখা যায় আর্য মানব প্রার্থনা করিতেছেন—'পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতম্' এবং বৈদিক ঋষি যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়া বলিতেছেন—'বয়ং জীবেম শরদঃ সবীরা।' দাতা সম্বন্ধে ঐ যুগে তাঁহাদের আশীর্বচন ছিল—'দাতা শতং জীবতু।' রবীন্দ্রনাথও দাতা—শুধু দাতা নন, প্রদাতা (প্রকৃষ্ট দাতা)। তিনি নিজের প্রতিভাভাণ্ডার হইতে মুক্তহস্তে জগৎকে অজস্র দান করিয়াছেন। অতএব আমাদের সমবেত প্রার্থনা এই—এ বরণীয় দাতা শতায়ুঃ হোন—দাতা শতং জীবতু জীবতু জীবতু।"

—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

:::

"(সেদিন) যে বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদ উপলক্ষে প্রবর্তিত আন্দোলনের কথা তাঁহার মনে সমুদিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। সেই আন্দোলনে তাঁহার কৃতকর্ম অসাধারণ। তিনি তাহার পুরোভাগেই ছিলেন। তিনি সেই আন্দোলনের কবি, গায়ক ও প্রচারক। সে আন্দোলনে তাঁহার যোগদানের সার্থকতা পরবর্তী আন্দোলনের সহিত তাহার তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। বাঙ্গালার সেই আন্দোলনে মনীষার স্ফূর্তি ছিল, তাহা

টাকা-আনা-পাই' হিসাব করে নাই। সে সময় রবীন্দ্রনাথ কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে সেই আন্দোলনে অসীম শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। সেই সময় বাঙালায়—ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে অরবিন্দের আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথ সাগ্রহে তাঁহাকে নমস্কার নিবেদন করিয়াছিলেন, 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।'"

—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

:::

"অন্য ভাষার সম্বন্ধে যাহাই হউক, আমাদের বঙ্গভাষার অভ্যুদয়ের মূলে ঐ ভক্তি ও ভক্ত, এবং এখনো তাহার নবনব কাব্যসৌন্দর্যের মূলে ঐ ভক্তি ও ভক্তকেই দেখিতে পাই। আজকাল বঙ্গভাষার অভিনব কবিতা-সমূহের মধ্যে একটি বিলক্ষণ ভক্তিভাব পরিলক্ষিত হয়; অধিকাংশ কবিতাতেই ভগবানের জন্য ভক্তের দুঃখস্বীকার ও অবমান গ্রহণাদির ভাব বেশ স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায়।...বর্তমান বঙ্গসাহিত্যে যাঁহার অনভিভবনীয় প্রভাবে এই ভাবের পুণ্য জাগরণ হইয়াছে, সেই ভগবদ্‌ভক্ত মহাকবি রবীন্দ্রনাথেরই ভক্তিগাথায় উপসংহার করি—

'আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে,
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।'"

—বিধুশেখর শাস্ত্রী

:::

"রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, বিশ্বসাহিত্যিক, বিশ্ববন্ধু, বিশ্ববরেণ্য। নারীজাতির প্রতি তাঁর কর্তব্যবোধের ও সম্মান প্রদানের বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটেনি। তাঁর কাব্যে, বিশেষতঃ নাট্যে, ছোটগল্পে ও উপন্যাসে নারীর বিচিত্র চিত্র এঁকে তাদের মহামহিমান্বিতরূপেই তিনি প্রচার করেছেন। মাতৃ-চরিত্রে তাঁর উপন্যাস থেকে ধার না নিয়ে কোন বড় লেখকই পার পাননি।"—অনুরূপা দেবী

:::

"স্বদেশী যুগে কয়েক সহস্র জাতীয় ভাবপূর্ণ সংগীত বাঙলা দেশের কবিগণ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একা রবীন্দ্রনাথের দানই সর্বাধিক। দেশমাতৃকাকে তিনি যে গভীরভাবে ভালবাসিয়াছিলেন, জাতীয় আন্দোলনে যেভাবে নিজের মনপ্রাণকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন—সেই প্রেম, সেই আত্মোৎসর্গই সহস্র ধারায় তাঁহার গানের মুখে উৎসারিত হইয়াছিল। এই সমস্ত গান একদিকে যেমন গভীর দেশপ্রেম, অন্যদিকে তেমনি অপূর্ব উদ্দীপনায় পূর্ণ। স্বদেশী আন্দোলনে বাঙলার সর্বত্র সহস্র সহস্র জনসভায়, হাটে, মাঠে, ঘাটে রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত গান গীত হইত। দেশবাসীর চিত্তে স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশী ভাবের সঞ্চারে উহা যে কতদূর সহায়তা করিয়াছে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।"—প্রফুল্লকুমার সরকার

:::

"রবীন্দ্রনাথ সেই দলের কবি যাঁরা জীবন ও জগৎকে খণ্ডচেতনার দ্বারা দেখেন নি। জীবন ও জগতের অন্তরে একটি সত্য তিনি খুঁজে পেয়েছেন। সে সত্য কবিদার্শনিকের সত্য। তাই হৃদয়ের উপলব্ধি এবং জ্ঞানের উপলব্ধি এ দুয়েরই মিলনে তাঁর আবির্ভাব।"—প্রবোধচন্দ্র বাগচী

:::

"যাকে আমরা স্বদেশী আন্দোলন বলে জানি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার অন্যতম চিন্তানায়ক। তখন তিনি একেবারে প্রত্যক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্রেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তখনকার দিনের কথা যাঁদের মনে আছে, তাঁরা ভুলতে পারবেন না রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা, সংগীত ও উপস্থিতির সে কি উদ্দীপনাময়ী শক্তি। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তাঁর ইঙ্গিত থেকে বঞ্চিত হলে স্বদেশী আন্দোলন ভিন্নতর মূর্তি গ্রহণ করত।"—শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

:::

"গুরুদেব! আপনি বিশ্বমানবের শাশ্বতকণ্ঠে আমাদের সুপ্তোত্থিত জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়েছেন। আপনি চিরকাল মৃত্যুঞ্জয়ী যৌবনশক্তির বাণী শুনিয়ে আসছেন। আপনি শুধু কাব্যের বা শিল্পকলার রচয়িতা নন। আপনার জীবনে কাব্য এবং শিল্পকলা রূপ-পরিগ্রহ করেছে। আপনি বিশ্বকবি।"—সুভাষচন্দ্র বসু

॥ লেখক-পরিচিতি ॥

অকিঞ্চন দাস (?)—'সাহিত্য', 'অর্চনা' প্রভৃতি কয়েকখানি তৎকালীন পত্রিকার সহিত সুর মিলাইয়া মফস্বলের যে-কয়েকটি পত্রিকা রবীন্দ্র-বিদূষণে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল, '২৪ পরগণা বার্তাবহ' ছিল তাহাদিগেরই অন্যতম। অকিঞ্চন দাস ছিলেন উক্ত পত্রিকাখানির সম্পাদক। তৎকালীন বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁহার বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁহার সম্পর্কে আর বিশেষ কিছুই জানা যায় না।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০)—নদীয়া জেলার সিমলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রাজসাহীতে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত একদা ইঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গতা হইয়াছিল। ঐতিহাসিকরূপে প্রভূত প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় লিখিয়াছেন। অক্ষয়কুমার রাজশাহীর 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। ইঁহার বাগ্মিতাও ছিল অনন্যসাধারণ। রচিত গ্রন্থ: সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম, ফিরিঙ্গি বণিক, গৌড় লেখমালা প্রভৃতি।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭)—হুগলী জেলার চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বঙ্কিম-মণ্ডলের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কসমূহের অন্যতম। সম্পাদিত পত্রিকা: 'সাধারণী' ও 'নবজীবন' বাংলা সাময়িক পত্রিকার জগতে বিশেষ খ্যাত। অক্ষয়চন্দ্র দীর্ঘদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য ও সহঃ-সভাপতি ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: কবি হেমচন্দ্র, সনাতনী, রূপক ও রহস্য ইত্যাদি। সম্পাদিত গ্রন্থ: চণ্ডীদাসের পদাবলী, প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ প্রভৃতি।

অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮)—কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং কবির শিক্ষাব্রতের আদর্শকে কার্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য আত্মোৎসর্গ করেন। রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল অপরিসীম। রচিত গ্রন্থ: রবীন্দ্রনাথ, বাতায়ন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিত, খৃষ্ট (রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সংবলিত) প্রভৃতি।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৭-১৯৬১)—জন্ম: পূর্ববঙ্গের টাঙ্গাইলে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট এডভোকেট হিসাবে প্রভূত সাফল্যলাভ করেন। অতুলচন্দ্র প্রধানতঃ 'সবুজপত্র' লেখক-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' পত্রিকা-গোষ্ঠীর সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে। 'কাব্যজিজ্ঞাসা' গ্রন্থখানি তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। রচিত গ্রন্থ: শিক্ষা ও সভ্যতা, কাব্য-জিজ্ঞাসা, নদীপথে, জমির মালিক, সমাজ ও বিবাহ, ইতিহাসের মুক্তি, Trading with the Enemy, (আন্তর্জাতিক আইন সংক্রান্ত গ্রন্থ)।

অমরেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৭-১৯৫৯)—রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যাঁহারা অক্লান্ত-ভাবে লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন ইনি [illegible] অন্যতম। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। অন্যান্য পত্রিকাতেও ইঁহার রচনা প্রকাশিত হইত। রচিত গ্রন্থ : রবিয়ানা, গিরিশ নাট্য-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, বাঙ্গালার পূজাপার্বণ। সম্পাদিত গ্রন্থ : বঙ্গসাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও ভাষাপ্রীতি।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী (১৮৭৩-১৯৬০)—জন্ম : কলিকাতায়। রবীন্দ্র-নাথের অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা এবং প্রমথ চৌধুরীর (বীরবল) পত্নী। সাহিত্য ও সংগীতকলা উভয় বিষয়েই ইঁহার গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রে'র অধিকাংশ পত্রই ইঁহার নিকট লিখিত। রচিত গ্রন্থ : নারীর উক্তি, রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী সংগমে, রবীন্দ্রস্মৃতি প্রভৃতি।

ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯১৫)—খুলনা জেলার সেনহাটী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিদ্যাসাগরের চরিতকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ গমন করেন এবং আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে লুসি-টেনিয়া জাহাজডুবি হইয়া অল্প বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। 'প্রবাসী', 'ধ্রুব', 'প্রকৃতি' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। রচিত গ্রন্থ : কবি রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব, পদ্মিনী।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১)—স্বদেশভক্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। জন্ম : বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ায় পাণ্ডু গ্রামে, মাতুলালয়ে। উক্ত জেলারই গঙ্গাটিকুরী গ্রামে পৈতৃক নিবাস। আইনজীবী ছিলেন। প্রথমে পূর্ণিয়ায় পরে কলিকাতা হাইকোর্টে কিছুকাল প্র্যাক্‌টিস করিবার পর বর্ধমানে আইন ব্যবসার দ্বারা জীবিকা অর্জন করিতেন। সুদীর্ঘ দিন 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। 'পঞ্চানন্দ' ছদ্মনামে রঙ্গরস ও বিদ্রূপাত্মক রচনায় বিশেষ পারংগম ছিলেন। ইঁহার সম্পাদিত 'পঞ্চানন্দ' পত্রিকা (২৬ অক্টোবর, ১৮৭৮) একদা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। রচিত গ্রন্থ : উৎকৃষ্ট কাব্যম্‌, কল্পতরু, ভারত উদ্ধার, হাতে হাতে ফল, পাঁচুঠাকুর (তিন খণ্ড), খাজানার আইন, ক্ষুদিরাম, জাতিভেদ প্রভৃতি।

কালীপ্রসন্ন ক[illegible] (১৮৬১-১৯০৭)—কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। 'হিতবাদী' (প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩০১) পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। ব্যঙ্গ রচনাতেও ইঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল এবং ইঁহার রচিত জাতীয় ভাবোদ্দীপক সংগীত-সমূহ তৎকালে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছিল। রচিত গ্রন্থ : মিঠেকড়া, রুচি-বিকার, লুক্রেশিয়া। বিদেশ হইতে প্রত্যাগমনকালে সমুদ্র-পথে ইঁহার মৃত্যু হয়।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০)—ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক লেখক। 'পূর্ববঙ্গের বিদ্যাসাগর' নামে খ্যাত ছিলেন। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের ভরাকর গ্রামে জন্ম। স্বনামখ্যাত গদ্যলেখক ও বাগ্মী। পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ 'বান্ধব' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন (প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১২৮১)। রচিত গ্রন্থ : প্রভাত-চিন্তা, নিভৃত-চিন্তা, নিশীথ-চিন্তা, মা না মহাশক্তি, ছায়াদর্শন প্রভৃতি।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র (১৮৮০-১৯৬১)—যশোহর জেলার খুলগ্রামে জন্ম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন। বৈষ্ণব-সাহিত্যে গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। গল্প এবং বিবিধ ধরনের প্রবন্ধাদিও রচনা করিয়া গিয়াছেন। রচিত গ্রন্থ : সুখ-দুঃখ, কীর্তন, মুদ্রাদোষ, বিবি বউ, নীলাম্বরী, বৈষ্ণব রসসাহিত্য, বৈষ্ণব পদাবলী, (দীনেশচন্দ্র সেনের সহযোগিতায় সম্পাদিত)।

গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৭০-১৯৩৪)—জন্ম : রাণাঘাটের নিকটবর্তী গরীবপুর গ্রামে। 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। গদ্য-পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই তাঁহার কৃতিত্ব ছিল। রচিত গ্রন্থ : পরিমল, পত্রপুষ্প।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪)—কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। বহুবাজারের অক্রুর দত্ত পরিবারের নরেশচন্দ্র দত্তের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। অকাল-বৈধব্যের পরে রচিত 'অশ্রুকণা' নামক কাব্যগ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে। রচিত গ্রন্থ : অর্ঘ্য, অশ্রুকণা, আভাস, সিন্ধুগাথা, স্বদেশিনী, শিখা।

চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০)—হুগলী জেলার কৈকালা গ্রামে জন্ম। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সুহৃদ এবং 'বঙ্গদর্শন'-এর বিশিষ্ট লেখক। সনাতনপন্থী এবং রক্ষণশীল মনোবৃত্তিসম্পন্ন প্রাবন্ধিক এবং বিশেষভাবে সমালোচকরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। রচিত গ্রন্থ : ত্রিধারা, হিন্দুত্ব, সাবিত্রীতত্ত্ব, কঃ পন্থা, বর্তমান বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতি, ফুল ও ফল, বেতালের বহুরহস্য, পুরানো কথা।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮)—মালদহ জেলার চাঁচল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল 'প্রবাসী'র সহকারী সম্পাদক ছিলেন; পরে কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক পদে বৃত হন। ইঁহার রচনার প্রাচুর্য ও বিষয়-বৈচিত্র্য উভয়ই বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত, রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশিষ্ট বোদ্ধা এবং ব্যাখ্যাতা ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : রবি-রশ্মি (দুই খণ্ড), যমুনা পুলিনে ভিখারিণী, হাইফেন, সর্বনাশের নেশা, পরগাছা, পঙ্কদলী, চোরকাঁটা, নষ্টচন্দ্র, রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিচয়, খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস প্রভৃতি।

চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫)—ঢাকা, বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত তেলিরবাগে দাশ বংশের আদি নিবাস। চিত্তরঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন, কলিকাতার পটলডাঙ্গা অঞ্চলে। রাজনীতি-ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগের পূর্বে চিত্তরঞ্জন বাংলা সাহিত্যে খ্যাতিমান হইয়াছিলেন প্রধানতঃ 'সাগর সংগীত'-এর কবি হিসাবে। তাঁহার সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকা একদা রবীন্দ্র-বিরোধিতার একটি প্রধান বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গদ্য-রচনায়ও তিনি সুনিপুণ ছিলেন। তাঁহার গদ্য-পদ্য উভয়বিধ রচনা-সংবলিত গ্রন্থাবলীর একটি সংস্করণ বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত হয়। রচিত গ্রন্থ : সাগর-সংগীত, মালঞ্চ, কিশোর-কিশোরী, মালা, অন্তর্যামী প্রভৃতি।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৫১-১৯০৩)—খুলনা জেলার সারসা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুর এস্টেটে চাকরি করিতেন। রবীন্দ্র-নাথের সহিত ইঁহার পত্র-ব্যবহার হইত। 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক পত্রের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। 'জন্মভূমি' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। রচিত গ্রন্থ : সাহিত্যমঙ্গল (কাব্যগ্রন্থ), শারদীয় সাহিত্য, শহরচিত্র, সোহাগচিত্র।

দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯)—জন্ম : ঢাকা জেলার বগজুড়ি গ্রামে মাতুলালয়ে। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকতা করার পর, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রিডার নিযুক্ত হন। তাঁহার প্রকাশিত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬) বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। এই গ্রন্থ রচনার দ্বারাই রবীন্দ্র-নাথের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্য জন্মে। শেষ বয়সে বিজয়চন্দ্র মজুমদারের সহযোগিতায় 'বঙ্গবাণী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। রচিত গ্রন্থ : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, বৃহৎ বঙ্গ, রামায়ণী কথা (রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সংবলিত), বেহুলা, ফুল্লরা, জড়ভরত, ওপারের আলো, নীলমাণিক প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ : মৈমনসিংহগীতিকা, পূর্ববঙ্গগীতিকা প্রভৃতি।

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (১৮৫০-১৯১৮)—বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রধানতঃ 'নব্যভারত' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হিসাবেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাস বিপন্ন অবস্থায় কলি-কাতায় আসিলে তাঁহাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। দেবীপ্রসন্ন গল্প উপন্যাস প্রভৃতিও রচনা করিয়া গিয়াছেন। রচিত গ্রন্থ : দীপ্তি, দ্যুতি, প্রসাদ, প্রসূন, বিবেকবাণী, সান্ত্বনা প্রভৃতি।

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী (১৮৭৩-১৯২৭)—জন্ম : নদীয়া জেলায়। ইনি কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জ্ঞাতি-ভ্রাতা। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট ভক্ত এবং একজন

সুকবি ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি ইঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। গান্ধীজীর কোনো উক্তি লইয়া 'প্রবাসী'তে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত ইঁহার বাদ-প্রতিবাদ হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)—জন্ম : নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। এম. এ. পাস করিয়া কৃষিবিদ্যা অধ্যয়নার্থ বিলাত গমন করেন। ইঁহার 'মন্দ্র' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইলে পর রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া সমালোচনা লেখেন। ইনি উচ্চাঙ্গের কবিত্বশক্তির অধিকারী হইলেও, মুখ্যতঃ নাট্যকার রূপেই বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। হাস্যরসপ্রধান সংগীত-রচনায় বাংলা সাহিত্যে তাঁহার জুড়ি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রচিত গ্রন্থ : আর্যগাথা, আষাঢ়ে, হাসির গান, মন্দ্র, দুর্গাদাস, আলেখ্য, মেবারপতন, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, পরপারে, ত্রিবেণী, আনন্দ-বিদায় (রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিত) কালিদাস ও ভবভূতি প্রভৃতি। দেবকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীর ভূমিকাটি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লিখিত।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০)—রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন। করাচীতে 'ফিনিক্স' ও লাহোরে 'ট্রিবিউন' পত্রিকা সম্পাদনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রদীপে'র সম্পাদকতা হইতে অবসর গ্রহণ করিলে নগেন্দ্রবাবু এই পত্রিকাখানির সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন। বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই সমানভাবে লেখনী চালনা করিতে পারিতেন। রচিত গ্রন্থ : স্বপনসংগীত, পর্বতবাসিনা, অমরসিংহ, সংগ্রহ, লীলা, জয়ন্তী, আরাতমা, বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী (সম্পাদিত গ্রন্থ)।

নিত্যকৃষ্ণ বসু (১৮৬৫-১৯০০)—বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করিয়া শিক্ষকতা-কার্যে ব্রতী হন। সুরেশ সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' মাসিক পত্রিকার একজন বিশিষ্ট এবং নিয়মিত লেখক ছিলেন। উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার 'সাহিত্য সেবকের ডায়েরি' একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। রচিত গ্রন্থ : মায়াবিনী।

নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য (?)—একদা একশ্রেণীর খ্যাত-অখ্যাত লেখক যে-ক্ষেত্রে সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে রবীন্দ্র-নিন্দায় তৎপর হইয়া উঠিয়াছিলেন, সে-ক্ষেত্রে ভট্টাচার্য মহাশয়ের আত্মপ্রকাশ ঘটে। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার লেখক হিসাবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন।

নিশিকান্ত সেন (১৮৬৮-১৯৩৭)—জন্ম : ময়মনসিংহ জেলায়। ভট্টাচার্য এণ্ড সন্স প্রকাশিত 'শিক্ষক' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে নিযুক্ত হন। পরে ঐ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শিশুদিগের মাসিক পত্র 'খোকাখুকু' প্রকাশিত হইলে সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। শিশু-সাহিত্য রচনায় ইঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল এবং অন্যান্য বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধও রচনা করিয়া গিয়াছেন।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৬-১৯২৩)—জন্ম : ভাগলপুরে। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই নানা সাময়িক পত্রিকার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 'হিতবাদী' 'সাহিত্য', 'বঙ্গবাণী', 'রঙ্গালয়', 'বসুমতী' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁহার সম্পাদনায় 'নায়ক' বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়। চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত মাসিক 'নারায়ণ' পত্রিকার বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত 'পাঁচকড়ি গ্রন্থাবলী'তে তাঁহার বহু উৎকৃষ্ট রচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রচিত গ্রন্থ : উমা, রূপলহরী, সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস, প্রভৃতি।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)—পৈতৃক নিবাস হুগলী জেলার গুড়প গ্রামে। জন্ম : বর্ধমান জেলার ধাত্রী গ্রামে মাতুলালয়ে। বিলাতে গিয়া ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দেশে ফিরিয়া প্রথমে রংপুরে ও পরে গয়ায় প্র্যাকটিস করেন। জীবনের শেষভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ল' কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের সহযোগিতায় তিনি 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রভাতকুমারের গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল। সার্থক ছোটগল্পের রচয়িতা হিসাবে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ঔপন্যাসিক হিসাবেও খ্যাতিমান। রচিত গ্রন্থ : নবকথা, অভিশাপ, ষোড়শী, রমাসুন্দরী, দেশী ও বিলাতী, নবীন সন্ন্যাসী, গল্পাঞ্জলি, সিন্দুরকৌটা, রত্নদীপ, প্রভৃতি।

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)—জন্ম : পাবনা জেলার হরিহরপুরে। ব্যারিস্টারি পাস করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। কিন্তু সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ বশতঃ বেশী দিন আইন-ব্যবসায় করেন নাই। ১৩২১ বঙ্গাব্দে 'সবুজপত্র' প্রকাশ করেন। 'বীরবল' ছদ্মনামে কথ্য ভাষায় লিখিতে সুরু করেন এবং সবুজপত্রের মাধ্যমে কথ্যভাষাকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতৃ-জামাতা হিসাবে তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : তেল নুন লকড়ি, সনেট পঞ্চাশৎ, চার-ইয়ারি কথা, প্রভৃতি।

প্রিয়নাথ সেন (১৮৫৪-১৯১৯)—কলিকাতার নিমতলা অঞ্চলে এক সুবর্ণবণিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত, কবি ও প্রাবন্ধিক। রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের অন্তরঙ্গ সুহৃদ এবং তাঁহার গদ্য-পদ্য উভয়বিধ রচনার একজন শ্রেষ্ঠ বোদ্ধা ও ব্যাখ্যাতা। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেনের কথা বলিয়াছেন। প্রিয়নাথের মৃত্যুর পর সাময়িক পত্র হইতে রচনাদি সংকলন করিয়া তাঁহার পুত্র প্রমোদনাথ সেন সম্পাদিত 'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি' নামক সংকলন-গ্রন্থ (১৩৪০) প্রকাশিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)—জন্ম : চব্বিশ পরগনা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দুই জন গ্রাজুয়েটের

অন্যতম। ১৮৬৫ সালে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইবার পর বাংলা ভাষা তথা বাংলা উপন্যাসের এক নূতন দিগন্ত উদ্‌ঘাটিত হয়। তাঁহার সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা বাংলা সাময়িক সাহিত্যের জগতে এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সংস্পর্শে আসেন। রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসংগীতের' মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র দিব্যচক্ষে তাঁহার গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করেন। রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক সাহিত্য' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে অননুকরণীয় ভাষায় এই বরণীয় পূর্বসূরীর স্মৃতিতর্পণ করিয়াছেন। রচিত গ্রন্থ : দুর্গেশনন্দিনা, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী, রাজসিংহ, ললিতা মানস (কবিতা), লোকরহস্য, বিজ্ঞানরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম, ২য় খণ্ড), রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী, কৃষ্ণচরিত্র, সাম্য, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, প্রভৃতি।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২)—বৃত্তিতে আইন-ব্যবসায়ী ছিলেন। ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশের ভাষায় গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের আলোচনায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ইংরেজীতে নৃতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। উচ্চাঙ্গের জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ খ্যাত ত প রণতবয়স্ক পাঠক এবং শিশুদের জন্য কবিতা ও গল্প লিখিয়াছেন প্রচুর। বহুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা-কার্যে ব্রতী ছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেনের সহযোগিতায় 'বঙ্গবাণী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। শেষ বয়সে অন্ধ হইয়া যান। রচিত গ্রন্থ : পঞ্চকমালা, ফুলশর, যজ্ঞভস্ম, সচ্চিদানন্দ, হেঁয়ালী, গীতগোবিন্দ, প্রভৃতি।

বিনয়কুমার সরকার (১৮৮৭-১৯৪৯)—বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্‌। নানা ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল। স্বদেশী যুগে প্রতিষ্ঠিত যাদবপুর ন্যাশনাল কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। কিছুকাল 'গৃহস্থ' নামক একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য দেশে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন। অধিকাংশ রচনাই ইংরেজী ভাষায়। বাংলায় রচিত গ্রন্থ : বর্তমান জগৎ, সাধনা, রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী।

বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২)—জন্ম : শ্রীহট্ট জেলার পৈল গ্রামে। অসাধারণ বাগ্মী এবং রাজনীতিক্ষেত্রে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। সারাজীবন অক্লান্তভাবে লেখনী চালনায় রত ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকার নিয়মিত লেখক এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। 'প্রবাসী'তে 'সত্তর বৎসর' নামক তাঁহার আত্মচরিত প্রকাশিত হয়। ইংরেজী ভাষায় সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনেও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। রচিত গ্রন্থ : সাহিত্য ও সাধনা (১ম ও ২য়), চরিতকথা, জেলের খাতা, প্রভৃতি।

বি[illegible] গুপ্ত (১৮৭৫-১৯৩৩)—জন্ম : চব্বিশ পরগনার হালিশহরে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও রিপন কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। রচিত গ্রন্থ : পুরাতন প্রসঙ্গ (১ম ও ২য় খণ্ড), বিচিত্র প্রসঙ্গ।

বিহারীলাল গোস্বামী (১৮৭১-১৯৩১)—জন্ম : পাবনা জেলার সাত বেড়ে। উক্ত জেলার পোতাজিয়ার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ছন্দ ও ভাষার উপর তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। সংস্কৃত ও পারসিক ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। 'প্রদীপ', 'ভারতী', 'বঙ্গদর্শন', প্রভৃতি পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার বহু প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হয়। রচিত গ্রন্থ: 'কুমারসম্ভব'-এর অনুবাদ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এ (১৩১৪) প্রথম প্রকাশিত ; বর্তমানে মিত্র ও ঘোষ প্রকাশক কর্তৃক পুস্তকাকারে গ্রথিত), গীতাবিন্দু, পন্দনামা (সাদীর অনুবাদ), প্রভৃতি।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১-১৯০৭)—পৈতৃক নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত খন্নান গ্রামে। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী, গার্হস্থ্যাশ্রমের নাম ছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' সম্ভাষণ তাঁহারই উদ্ভাবিত। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে 'সন্ধ্যা' ও 'Twentieth Century' পত্রিকার মাধ্যমে জাতীয়তার অগ্নিমন্ত্র প্রচার করেন। সম্প্রতি 'ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা' নামক তাঁহার তিনখানি গ্রন্থ একত্রে (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং (প্রা) লিঃ কর্তৃক) প্রকাশিত হইয়াছে। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : পালপার্বণ, আমার ভারত উদ্ধার।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪)—আদি নিবাস হুগলী জেলার নথিপুর গ্রামে। জন্মস্থান কলিকাতা। পুরাতন হিন্দু কলেজের উজ্জ্বল রত্নবিশেষ। মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহপাঠী। সরকারী শিক্ষাবিভাগে উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা 'এডুকেশন গেজেট' ও 'বার্তাবহ' সম্পাদনা করেন। বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। রচিত গ্রন্থ : ঐতিহাসিক উপন্যাস, স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস, পুষ্পাঞ্জলি, পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ, বিবিধ প্রবন্ধ, (১ম ও ২য় ভাগ), প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রভৃতি।

মোহিতচন্দ্র সেন (১৮৭০-১৯০৬)—জন্ম : কলিকাতার কলুটোলাস্থিত সেন পরিবারে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট বোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যগ্রন্থ' বাংলা সাহিত্যে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল।

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২)—জন্ম : চব্বিশ পরগনা জেলার হালিশহরে, মাতুলালয়ে। অল্প-কিছুদিন সরকারী জরিপ বিভাগে কাজ করেন।

অতঃপর শিক্ষকতা-বৃত্তি গ্রহণ করিয়া গভীর নিষ্ঠার সহিত সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী হন। রবীন্দ্র-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে যেমন সুপরিচিত, তেমনি আবার গদ্যরচনা ও সমালোচনা-সাহিত্যেও তাঁহার কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ। বঙ্কিম, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসম্ভারের আলোচনায় তাঁহার রচনা সমৃদ্ধ। রচিত গ্রন্থ : মরুগরল, বিশ্বরণী, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, রবি-প্রদক্ষিণ, কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য, সাহিত্য-বিতান, স্বপনপসারী, কবি মধুসূদন, প্রভৃতি।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮)—জন্ম : নদীয়া জেলার জামশের-পুরে। রবীন্দ্রানুসারী কবি-সমাজে ইঁহার একটি বিশিষ্ট আসন আছে। গদ্যরচনাতেও পারংগম ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : নীহারিকা, লেখা, মহাভারতী, অনুপূর্বা, কাব্যমালঞ্চ, নাগকেশর, রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য।

যতীন্দ্রমোহন সিংহ (১৮৫৮-১৯৩৭)—জন্ম : উত্তরবঙ্গের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে। প্রাচীনপন্থী এবং রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন ছিলেন। কর্মোপলক্ষে কিছুকাল উড়িষ্যায় অবস্থান করেন। রচিত গ্রন্থ : ধ্রুবতারা, অনুপমার প্রেম, উড়িষ্যার চিত্র, সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা।

যদুনাথ সরকার (১৮৭০-১৯৫৮)—জন্ম : রাজসাহী জেলার করচ-মারিয়া গ্রামে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপন করিয়া পাটনায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রথমে ইংরেজী সাহিত্যের অনুশীলন করিতেন। শেষে ইতিহাসের প্রতি অনুরক্ত হন এবং ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধারে সারাজীবন অক্লান্তভাবে গবেষণা করিয়া ভারতের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক হিসাবে ভারতে এবং বিদেশেও খ্যাতি অর্জন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হইয়াছিলেন। রচিত গ্রন্থের অধিকাংশই ইংরেজীতে এবং ঐতিহাসিক বিষয়ে। রচিত বাংলা গ্রন্থ : মারাঠা জাতির বিকাশ, শিবাজী, ইত্যাদি।

রমণীমোহন ঘোষ (১৮৭৭-১৯২৮)—রাজসাহী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পাঠ্যাবস্থায় যদুনাথ সরকারের সহযোগিতায় ইডেন হিন্দু হোষ্টেল হইতে সাময়িক পত্র মারফত সাহিত্যসেবায় ব্রতী হন। সরকারী ডাক-বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও, সাহিত্যচর্চায় অবহেলা করেন নাই। ইঁহার 'উর্মিকা' কাব্যগ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রমাপ্রসাদ চন্দ (১৮৭৪-১৯৪২)—জন্ম : রাজসাহী জেলার ধোড়ামারায়। প্রধানতঃ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ হিসাবে খ্যাত হইলেও, সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ ছিল। প্রথম জীবনে 'সাহিত্য' ও শেষজীবনে 'বসুমতী'র নিয়মিত লেখক ছিলেন। সাময়িক পত্রে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : গৌড়রাজমালা।

রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০)—জন্ম : বর্ধমান জেলার ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামে। পৈতৃক নিবাস নদীয়া জেলার উলা বা বীরনগরে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। দীর্ঘকাল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাঙ্গালা লাইনো টাইপ অক্ষরের প্রবর্তনা করেন। পরিণত বয়সে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করিয়া শ্লেষ ও হাস্যরসাত্মক রচনায় বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। ভাষার বিশুদ্ধ ব্যবহারের প্রতি তাঁহার বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। বৈয়াকরণ হিসাবেও খ্যাতনামা ছিলেন। বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্বন্ধেও বহু প্রবন্ধাদি রচনা করিয়াছেন। রচিত গ্রন্থ : গড্ডলিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন, চমৎকুমারী, লঘু-গুরু, ভারতের খনিজ, আনন্দীবাই ইত্যাদি গল্প, চলন্তিকা (অভিধান), বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত, মেঘদূত, গীতা, বিচিন্তা, চলচ্চিন্তা, প্রভৃতি।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩)—জন্ম : বাঁকুড়ার পাঠকপাড়ায়। এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালার প্রিন্সিপাল ছিলেন। এই কর্ম পরিত্যাগ করিয়া 'প্রবাসী' ও ইংরেজী 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'ধর্মবন্ধু', 'দাসী' এবং 'প্রদীপ' পত্রিকাগুলিও সম্পাদনা করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে হিন্দী 'বিশাল ভারত' নামক একখানি পত্রিকাও তাঁহার সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়। সাংবাদিক হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহার ইংরেজী ও বাংলা অজস্র প্রবন্ধ, এবং 'প্রবাসী'র সম্পাদকীয় নিবন্ধ 'বিবিধ প্রসঙ্গ' অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল ধরিয়া জাতিকে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে। সম্পাদিত গ্রন্থ : আরব্য উপন্যাস, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৮-১৯২৯)—পৈতৃক নিবাস নদীয়া জেলার কাঁচকুলি গ্রামে। উক্ত জেলারই শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যাপকরূপে খ্যাতিলাভ করেন। রচিত গ্রন্থ : অনুপ্রাস, কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব কৃষ্ণকান্তের উইলের আলোচনা, ফোয়ারা, ব্যাকরণ বিভীষিকা, ক'কারের অহংকার, পাগলাঝোরা, প্রেমের কথা, বানান সমস্যা, আহ্লাদে আটখানা (ছোটদের বই), প্রভৃতি।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)—পৈতৃক নিবাস ও জন্ম হুগলী জেলার দেবানন্দপুর। কৈশোর কাল অতিবাহিত হয় ভাগলপুরে মাতামহের আলয়ে। সাহিত্য-রচনার সূত্রপাতও হয় সেইখানেই। দীর্ঘকাল ব্রহ্মদেশে যাপন করেন। ১৯০৭ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রথম কয়েক মাস লেখকের নাম ব্যতীত 'বড়দিদি' প্রকাশিত হইলে পাঠকসমাজে রীতিমত বিস্ময়ের সৃষ্টি হয় এবং রবীন্দ্র-প্রতিভার পূর্ণদীপ্তির মধ্যেই অপরাজেয় কথাশিল্পীরূপে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। রচিত গ্রন্থ : শ্রীকান্ত (চার খণ্ড), চরিত্রহীন, দেবদাস,

বিন্দুর ছেলে, বড়দিদি, পথের দাবী, গৃহদাহ, দেনা-পাওনা, পরিণীতা, বড়দিদি, ষোড়শী (নাটক), স্বদেশ ও সাহিত্য (প্রবন্ধ), নারীর মূল্য, প্রভৃতি।

শশাঙ্কমোহন সেন (১৮৭৩-১৯২৮)—কবি ও প্রবন্ধকার হিসাবে খ্যাত। চট্টগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। শেষজীবনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত ছিলেন। জীবনের শেষাংশে কঠোর বৈদান্তিক হইয়া গিয়াছিলেন। রচিত গ্রন্থ : মধুসূদন, বঙ্গবাণী, বাণীমন্দির, শৈলসংগীত, সাবিত্রী, প্রভৃতি।

সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২)—জন্ম : বর্ধমান জেলার বেতালবনে। পৈতৃক নিবাস বীরভূম জেলার রায়পুর গ্রামে। প্রথম যৌবনে 'প্রবাসী' কার্যালয়ে কর্মে নিযুক্ত হন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে থাকাকালীনই সাময়িক পত্র 'শনি-বারের চিঠি'র সহিত যুক্ত হন। পরবর্তীকালে তাঁহারই সুযোগ্য সম্পাদনায় পত্রিকাখানি স্বীয় বৈশিষ্ট্যে বিদগ্ধ-সমাজে আকর্ষণীয় হইয়া উঠে। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, সমালোচনা ও নানাজাতীয় প্রবন্ধ রচনায় তিনি ছিলেন বিশেষ পারংগম। রচিত গ্রন্থ : অজয়, মনোদর্পণ, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, আলো-আঁধারি, আকাশ-বাসর, পঁচিশে বৈশাখ, রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য, রাজমোহনের স্ত্রী (অনুদিত), বাংলার কবিগান, প্রভৃতি।

সতীশচন্দ্র রায় (১৮৮১-১৯০৩)—জন্ম : বরিশাল জেলার উজিরপুরে। বি. এ. পরীক্ষার অব্যবাহত পূর্বে তিনি বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত সতীশচন্দ্র অকালে, মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে, পরলোকগমন করেন। কবিতা-রচনা ও সাহিত্য-সমালোচনায় অল্পকালের মধ্যেই তিনি বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। তাঁহার জীবদ্দশায় 'উতঙ্কের গুরুদক্ষিণা' নামক তাঁহার একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা-ভূষিত হইয়া প্রকাশিত হয়। সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর অজিতকুমার চক্রবর্তী লোকান্তরিত সুহৃদের রচনাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)—জন্ম : কলিকাতার অদূরে নিমতা গ্রামে, মাতুলালয়ে। পৈতৃক আলয় কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে দর্জিপাড়ায়। পিতামহ বিখ্যাত সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্ত। রবীন্দ্রানুসারী প্রখ্যাত কবি-গণের মধ্যে তাঁহার স্থান সর্বাগ্রে। তাঁহার ছন্দোবৈচিত্র্যের মাধুর্য বিস্ময়কর। কাব্য ব্যতীত অন্যবিধ রচনাতেও সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার কবিতা, তাঁহার ন্যায় নৈপুণ্যের সহিত বাংলাভাষায় আর কেহ অনুবাদ করেন নাই। রচিত গ্রন্থ : বেণু ও বীণা, কুহু ও কেকা, তীর্থসলিল, তীর্থরেণু, অভ্র-আবীর, বেলাশেষের গান, ধূপের ধোঁয়া, তুলির লিখন, রঙ্গমল্লী, প্রভৃতি।

সরলা দেবী (১৮৭২-১৯৪৫)—জন্ম : কলিকাতায়। মাতা স্বর্ণকুমারী দেবী। শিল্প-সাহিত্যের পরিবেশে মাতুল রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে বর্ধিত হন।

'ভারতী'র অন্যতম সম্পাদিকা ছিলেন এবং জাতীয় আন্দোলনের সহিতও যোগ ছিল। তাঁহার বহু প্রবন্ধ সমসাময়িক পত্রিকাদিতে আত্মগোপন করিয়া আছে। তাঁহার আত্মজীবনী 'জীবনের ঝরাপাতা' একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'শতগান' তাঁহার সম্পাদিত ও সংকলিত আর একখানি গ্রন্থ।

সরসীলাল সরকার (১৮৭২-১৯৪৪)—জন্ম: ইনি চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করেন এবং সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইয়া সিভিল সার্জন পদে উন্নীত হন। দায়িত্বপূর্ণ কর্মে নিযুক্ত থাকিয়াও সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। মনস্তত্ত্ব ইঁহার বিশেষ আলোচ্য বিষয় ছিল। রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগের নিদর্শন পাওয়া যায় বিভিন্ন রচনার মধ্যে। রচিত গ্রন্থ: রবীন্দ্রকাব্যে ত্রয়ী পরিকল্পনা।

সুধীরঞ্জন রায় (১৮৮৯- ?)—এক সময় 'প্রবাসী', 'নব্যভারত', 'সাহিত্য' প্রভৃতি সাময়িক পত্রের লেখক ছিলেন। ১৩২০ সালে 'কবি দেবেন্দ্রনাথের কাব্য' নামক তাঁহার একটি রচনা প্রকাশিত হইলে সমালোচক হিসাবে খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার রচিত 'শুক্লা' নামক একখানি খণ্ডকাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১৮৮৮-১৯৫২)—পৈতৃক নিবাস বরিশাল জেলার গৈলায়। জন্ম: পিতার কর্মস্থল কুষ্টিয়ায়। বাংলা দেশের বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করিয়া অবশেষে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। রচিত গ্রন্থ: রবি-দীপিতা, দার্শনিকী, ইত্যাদি।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৭০-১৯২১)—জন্ম: কলিকাতা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যা হেমলতা দেবীর পুত্র। মাতামহের নিকট সংস্কৃত পাঠ গ্রহণ করেন। অল্পবয়সে সাহিত্য-সেবাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়া, 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' (১২৯৬) ও 'সাহিত্য' (১২৯৭) মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। 'সাহিত্য' তাঁহার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান ও একমাত্র অবলম্বন ছিল। তাঁহার যাবতীয় সাহিত্য-কীর্তি এই পত্রিকার মাধ্যমেই প্রচারিত হয়। রচিত গ্রন্থ: কল্কিপুরাণ, সাজি, রণভেরী, ইউরোপের মহাসমর, ছিন্নহস্ত, বঙ্কিম প্রসঙ্গ।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৭-১৯৫৯)—জন্ম: ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের যশাইকাটি গ্রামে। নানাস্থানে শিক্ষকতা করিয়া পরে ঠাকুর পরিবারের জমিদারীতে কর্মচারীরূপে প্রবেশ করেন। পরে রবীন্দ্রনাথের আনুকূল্যে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক নিযুক্ত হন। প্রসিদ্ধ অভিধান-গ্রন্থ 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' (পাঁচ খণ্ড) একচল্লিশ বৎসরের পরিশ্রমে রচিত হয়, শেষ অংশ প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: রবীন্দ্রনাথের কথা, কবির কথা।

॥ নির্ঘণ্ট ॥

অকিঞ্চন দাস ৩৮২, ৫৫
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ১৫৬-৭. ৫১৭. ৫৫৭
অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ১৪
অক্ষয়চন্দ্র সরকার ১০, ২৫৫, ৩৫৭-৮
৩৬২-৩, ৫৫
অচলায়তন ২১৭, ২৫২-৭, ২৬৪, ৪০৮
৫৩
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৫০৩
অজিতকুমার চক্রবর্তী ২৩০, ২৩৮-৯,
৫৫৭
অণিমানন্দ ১৮৩
অতুলচন্দ্র গুপ্ত ১০৪, ৪৯৪, ৫৫৭
অতুলানন্দ রায় ৪২৩
অনুরূপা দেবী ৪৮৮, ৫৫৫
অন্তর্যামী ১৩০
অন্নদামঙ্গল ১০১
অন্নদাশঙ্কর রায় ৪৮১, ৪৮৫
অপর্ণা দেবী ৪৪৬
অবতার ২৫
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১১৪-৫, ১২৩, ২৫৮,
৪৮৮
অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ ৫০০
অমল হোম ৪৯০
অমরেন্দ্রনাথ রায় ৪২৯-৩০, ৪৪৫-৬,
৫২৮, ৫৫৮
অমিয় চক্রবর্তী ৪৫১
অমিয়কুমার সেন ৪৩৯
অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ২১১, ৫৫১
অমূল্যচরণ সেন ৩৭০, ৩৮২, ৪৩০
অর্চনা (পত্রিকা) ৩৬৯-৭০, ৪৩০, ৫২৮,
৫৪১, ৫৫১
অরবিন্দ ঘোষ ৫৪৬
অশ্বিনীকুমার দত্ত ৩৭১
আত্মশক্তি (পত্রিকা) ৫০১, ৫০৩
আত্মস্মৃতি ৫০২
আদি ব্রাহ্মসমাজ ৭,
আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়
৩৫
আধুনিক সাহিত্য ৩৬৪
আনন্দবাজার পত্রিকা ৫০৩
আনন্দবিদায় ৫৪৪
আর্যাবর্ত (পত্রিকা) ২৫৪, ৪০৮, ৪৮৮
আলোচনা ১৯
আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ১৮২
আশুতোষ চৌধুরী ২৪, ৪০
ইণ্ডিয়া সোসাইটী ২১৬, ২২৭
ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ১২৯, ৪৮৭, ৫৫৮
ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ২১৬-৭, ৫৫১,
৫৫৮
ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী ৯
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭-৮, ৫৫৮
ইয়েটস্ ২৩১
ঈশ্বর গুপ্ত ১
উৎসর্গ ২১৭
উত্তরসূরী (পত্রিকা) ৪৮৫-৭
উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম ৫৩
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৩৪৪
উমা ১৯৮
উর্বশী ১২৫, ১৩৩, ৪৩৮-৪৪
এডুকেশন গেজেট (পত্রিকা) ১৪
এথিনিয়ম্ ২৩০
এমারেল্ড নাট্যশালা ৫৯
ওয়াল্ট হুইটম্যান ৮১
ওয়েস্টার্ণ ইনফ্লুয়েন্স ইন বেঙ্গলী নভেল
২৬৫
কড়ি ও কোমল ২৪-৪৭, ১২৯, ৫৪৯
কণিকা ১৬৬-৬৭, ৫১৭
কথা ১৫৬-৬৫
কবিকঙ্কণ ১০১

কবি-কাহিনী ১-৬
কবিতার ছন্দ ও মিল ৪১৩-২২
কবি-প্রণাম ৩০২
কবিবরের শাক্তভাব ৪০২-৭
কবি রবীন্দ্রনাথের ঋবিত্ব ২১৭
কবি সার্বভৌম ৪৩১
কবির কথা ২০
কল্পনা ১৬৬, ২১৭
কল্লোল (পত্রিকা) ৪২৬, ৫৪৩-৪, ৫৫১
কাজী আব্দুল ওদুদ ৪৭৪
কানাই সামন্ত ৪৪৭
কানাইলাল দে ৯
কাব্য গ্রন্থাবলী ১২
কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা ৩৮৫
কাব্যজিজ্ঞাসা ১০৪
কাব্য পরিক্রমা ২৩০, ২৩৯
কাব্যে-নীতি ৩৬৩
কারলাইল ৬০
কাল-মৃগয়া ১০
কালি-কলম (পত্রিকা)৪২৬, ৫৪৪,৫৫১
কালিদাস ১, ১১০, ৪৯৪-৮, ৫০০-১
কালিদাস চক্রবর্তী ১০
কালিদাস নাগ ১২৫
কালিদাস রায় ৪৫৮
কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩০
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ২৪, ২৫, ৪১, ৫৫৮
কালীপ্রসন্ন ঘোষ ১, ২, ১১, ১২, ৫৫৯
কিশোরীমোহন সাঁতরা ৩৫২
কীট্‌স ১৭
কুমারসম্ভব ১০১, ৩০৩
কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী ৪৮৫
কুমুদরঞ্জন মল্লিক ৪৯৭
কৃষ্ণকান্তের উইল ২৭৫
কৃষ্ণদাস চন্দ্র ৪৩০
কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত ৪০৮
কেশবচন্দ্র (ব্রহ্মানন্দ) ৭, ২৫
কেশবচন্দ্র গুপ্ত ৩৬৯, ৫৫১
কৈলাসচন্দ্র সিংহ ৩৫৯
ক্রস (লর্ড) ৫৯, ৬৫, ৬৭-৯
ক্ষণিকা ১৬৬-৭৯, ২৪৩
ক্ষিতিমোহন সেন ২৭৭, ৪৮৭
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৬৪
ক্ষিতীশ রায় ৩৩৫
ক্ষীরের পুতুল ১২৩
খগেন্দ্রনাথ মিত্র ৪৬৪,৪৭৪, ৪৭৬, ৫৫৯
খেয়া ১৮২, ২১৬-৮, ৫০৭
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৫৮
গল্পসপ্তক ২৭৬
গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ৩৮১, ৪৮৮, ৫৫৯
গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী ৪৪৫
গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭
গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ৪৮-৯, ২০০, ৫৫৯
গিরীন্দ্রশেখর বসু ৫৪৮
১৮২, ২১৬-৩৭, ২৭৬, ৩৯৬-৭, ৪৮০, ৫০৮, ৫৪৪
২০০, ২৩০
গীতিমাল্য ২১৭, ২৩০, ৪৮০
গীতাবিন্দু ৪১৪
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৯, ৩৭১, ৪৬৪, ৪৭৬
গৃহদাহ ১৮৪
গৃহস্থ ৪০২-৩
গোকুলচন্দ্র নাগ ৫৫১
গোপাল হালদার ৪৮৫
গোপালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬৪, ৪৭৬
গোবিন্দ অধিকারী ১

গোরা ১৯৭, ২০৯-১৫, ৩৬৪
গৌড় রাজমালা ৩৯৫
ঘরে-বাইরে ১৯৭, ২৬৩-৭৬, ৫৩৬
ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য ৪৭৭
চণ্ডীদাস ৭৫
চতুরঙ্গ ২৬৪, ২৭৬, ৩০১-১৮, ৪৩৭, ৪৭৮, ৪৯০
চন্দ্রনাথ বসু ১৬৬-৭, ১৯৬, ৩৩৭, ৩৩৯, ৩৫৭, ৩৬২, ৫১৩-৪, ৫১৮, ৫৫৯
চন্দ্রশেখর ১৯৬, ২২৮, ২৭৫
চন্দ্রশেখর বসু ৩৬২
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ১৯৮-৯, ৩৬২
চব্বিশ পরগনা বার্তাবহ (পত্রিকা) ৩৮২
চরিতকথা ৩৭০-৭১
চরিত্রহীন ১৮৪
চার অধ্যায় ৩৫২-৩৫৪, ৫৫৯
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৮, ১৬৮, ৩১৯-২০, ৩৪২, ৩৬৭, ৫৫০, ৫৫৯
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ৪৫১
চিত্তরঞ্জন দাশ ৩৭১, ৩৮০, ৪২৭, ৪২৯-৩০, ৪৪৫, ৫৬০
চিত্রা ১২৪-৩৯, ১৪৩, ৪৩৮
চিত্রাঙ্গদা ৯১-১১৭, ৩৬৫, ৫০০-০১
চিত্রিতা দেবী ৫৫১
চিরকুমার সভা ৫১৯
চৈতন্য চরিতামৃত ৪৭৫
চৈতালি ১৪০-৫৫, ২১৭, ৩৯৫
চোখের বালি ১৮৪-২০০, ৫৪৩
ছিন্নপত্র ৪১৪
জগদানন্দ রায় ৩৩৫
জগদিন্দ্রনাথ রায় ৪২৭, ৪৭৮, ৫৫৪
জগদীশচন্দ্র বসু ৫৫২
জন্মকথা ৪৪৫-৮
জয়দেব ১
জয়ন্তী উৎসর্গ ৩০২, ৪৭৪, ৪৮৭
জলধর সেন ৩১৯, ৫৫২
জাভা যাত্রীর পত্র ৩৪৩
জাহ্নবী (পত্রিকা) ২০০
জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮৬
জীবনদেবতা ১২৫, ১৩৭, ৩৯১, ৪৭৫, ৪৯৪, ৫৫১
জীবনস্মৃতি ১,৮, ১৯, ২৪৩, ৩৫৮, ৫২৭-২৮
জীবনের ঝরাপাতা ৪৬২
জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৫৫১
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ৭, ১১
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি ৮
টড ১৫৬
টমসন ৯৮-৯৯, ১০৮-৯
টলস্টয় ২৭০
টাইমস (পত্রিকা) ২২৯
টুয়েনটিএথ সেন্চুরি (পত্রিকা) ১৮০,১৮২
ট্রিবিউন (পত্রিকা) ৯
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ৫৯, ৬০, ৫৬০
ডাকঘর ২৩৮-৫২
তত্ত্ববোধিনী (পত্রিকা) ৩৫৭, ৩৫৯
তপতী ৪৮, ৩৪৩
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৯৭
তিনপুরুষ ৩১৯
তিলোত্তমা ৫০১
তীর্থংকর ৪৭৯
তুর্গিনিভ ২৬৫
দাসী (পত্রিকা) ১২২, ১২৪, ১৪০, ১৫৫, ৩৯৫
দাশু রায় ১
দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৮৮-৯
দিলীপকুমার রায় ৪২২, ৪৭৯
দীনেশচন্দ্র বর্মণ ৪২৭
দীনেশরঞ্জন দাশ ৫৫১

দীনেশচন্দ্র সেন ৩৭১, ৩৭৫, ৪১৩, ৪৭৭-৮, ৪৮১, ৫৬০
দেবকুমার রায়চৌধুরী ৫২৯
দেবদাস ২৭৫
দেবালয় (পত্রিকা) ৩৬৭
দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ৪১, ৩৭২, ৫৬০
দেবেন্দ্রনাথ (মহর্ষি) ৭
দেশ (পত্রিকা) ৪৬২, ৪৮০
দ্বারকানাথ ঠাকুর ৫৯
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৯, ৬২, ২৫৮, ৩৫৯, ৫৫২
দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী ৩৭৫-৬, ৫৬০
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৯১-২, ১১৪-৭, ২০৯, ৩৬৩-৬, ৩৭৬, ৪৫৮, ৫৬১
ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৫
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৪৮৯
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৮০, ২৩৮, ৪৩৮, ৫১৩, ৫৬১
নটরাজ ৫০১-৩, ৫০৫-১২, ৫৪৫
নদী ১২২-৩
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ৫১১
নবজীবন (পত্রিকা) ৩৫৭-৮, ৩৬২-৩
নববিধান সমাজ ৮
নবীন কবি ৫১২
নবীনচন্দ্র সেন ৪৮৮
নব্যভারত (পত্রিকা) ৪১, ৬০, ১২৯, ৩৭২
নরেন্দ্র দেব ৫৪৬
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ৩৩৬, ৩৮০, ৩৭৫, ৩৭৬, ৪২৬, ৪২৭
নলিনীকান্ত গুপ্ত ৪৭৯
নলিনীকুমার ভদ্র ৩০২
নষ্টনীড় ১৯৭,
নায়ক (পত্রিকা) ৩৭০
নারায়ণ (পত্রিকা) ৩৭১, ৪২৭, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩৬, ৪৪৫, ৫৩৩
নিউ এসেইজ ইন্ ক্রিটিসিজম ৫৩১
নিত্যকৃষ্ণ বসু ৫৬, ১১৯, ৫১৯, ৫৬১
নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য ৩৭২, ৫৬১
নিবেদিতা (ভগিনী) ৪৭৮
নিরুপমা দেবী ৩০০
নির্মাল্য ৫১৪
নিশিকান্ত সেন ২০০, ৫৬১-২
নীরদ চৌধুরী ৫৫১
নীহাররঞ্জন রায় ২০১
নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ৯২
নেশন (পত্রিকা) ২২৮
নৈবেদ্য ১৮০-৩, ২১৬-৭, ৫১৯, ৫৪৪
নোবেল প্রাইজ ২২৭
নৌকাডুবি ২০০-৮, ৫২১, ৫৩৩, ৫৪৩
ন্যাশনালিজম্ ৪৮৬
পঞ্চভূত ৫৪৪
পথের দাবী ৪২৭
পরিচারক (পত্রিকা) ৪২৩
পরিত্রাণ ৩৪৩
পরিমল গোস্বামী ৫৫১
পলাশীর যুদ্ধ ২২৮
পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি ৩৪৩
পসারিণী ৩৬৭-৯
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৮১, ৪৫১, ৫৬২
পাঁচ হাজারী ও ছ' হাজারী ৪৬৪, ৪৭৬-৭৭
পি. সি. রায় (স্যার) ৫২৯, ৫৫৩
পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ ৪৯০
পুলিনবিহারী সেন ৩৮৬
পূরবী ৫০৪-৫
প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ৪৩৯

প্রকৃতির প্রতিশোধ ১৯-২২
প্রগতি (পত্রিকা) ৫৪৪
প্রচার (পত্রিকা) ৩৫৭-৮
প্রজ্ঞানানন্দ (স্বামী) ৪৯০
প্রতিভা (পত্রিকা) ১৮৪
প্রতিভা দেবী ৭, ৮, ৯
প্রদীপ (পত্রিকা) ১৪০, ১৫৭, ৪৩৮, ৪৮৩, ৫১৫-৭
প্রফুল্লকুমার সরকার ৫৫৫
প্রফুল্লচন্দ্র রায় (আচার্য) ৩৬৭, ৪৭৪,৫৫৩
প্রবাসী (পত্রিকা) ১১৯, ১২৫, ১৮৪, ২০৯, ৩৪২, ৩৫৩, ৩৭৪, ৪৩১, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৬৪, ৪৮৪, ৪৯২, ৫২৩, ৫২৫-৭, ৫২৯, ৫৩৪, ৫৩৬, ৫৩৮, ৫৪০, ৫৪৩, ৫৪৫-৬
প্রবোধচন্দ্র ঘোষ ১
প্রবোধচন্দ্র বাগচী ৪৮০, ৫৫৬
প্রবোধচন্দ্র সেন ৪৮৯, ৫০৫
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (ঔপন্যাসিক) ১২৪, ৫১৬
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (জীবনীকার) ১০, ২০১, ২৩৮, ২৫২, ৫১৬,৫৫১, ৫৬২
প্রভাত গ্রন্থাবলী ১২৫
প্রভাত সংগীত ১৪-১৮
প্রমথ চৌধুরী ৯১, ১১৫, ২৬৪, ৩০১, ৩৬১ ,৩৮১, ৫৬২
প্রমথনাথ বিশী ৩৫৩, ৪৪৬-৭
প্রমোদনাথ সেন ৭৪, ১৬৭
প্রায়শ্চিত্ত ৪৮৪
প্রিয়নাথ সেন ৭২, ৭৪, ১১৫, ১৬৭, ৫৬২, ৫৬৩
প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি ৭৪,
প্রিয়ম্বদা দেবী ৫৪৬
প্রিয়রঞ্জন সেন ২৬৫
প্রেমেন্দ্র মিত্র ৪৮৭, ৫০৩, ৫৪৫, ৫৫১
ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৫১
ফাল্গুনী ২৫৮-৬২, ২৭৬
ফ্রয়েড ৩১৭-১৮
বঙ্কিমচন্দ্র ৯, ১৬৬, ১৯৬, ২৩৫, ২৫৫, ২৭৫, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৪৬২-৩, ৫২০, ৫৩০, ৫৩১-৩, ৫৬২-৩
বঙ্গদর্শন (পত্রিকা) ১৮৪, ৩৭০
বঙ্গদর্শন (পত্রিকা, নবপর্যায়) ২০০, ৫২১-২, ৫২৪, ৫২৭
বঙ্গবাণী (পত্রিকা) ৩৭১, ৩৭৫, ৪২৭
বঙ্গবাণী ৩৯৯, ৪০০
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৪৮৩
বঙ্গভাষার লেখক ১৯
বঙ্গশ্রী (পত্রিকা) ৫৫১
বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ২৬৫
'বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান অবস্থা' ৩৯০
বঙ্গীয় শব্দকোষ ২০
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ৫২১
বনফুল ৫০২
বনবাণী ৫৪৭
বরিশাল হিতৈষী (পত্রিকা) ৫৪২
বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ৩৯৫
বলাকা ২৭৬-৩০০
বলাকা কাব্য পরিক্রমা ২৭৭
বসুমতী সাহিত্য মন্দির ১৮৪, ৪৪৫
বহুরূপী ৪৮৭
বাইবেল ২২৯
বাংলাভাষা পরিচয় ৪৫০
বাংলার নবযুগের কথা ৩৭১
বাঙ্গালা ভাষা ৩৬৮-৭০
বাঙ্গালা ভাষার মামলা ৪৫০
বাঙ্গালার গীতিকবিতা ৪৪৫
বাঙ্গালী (পত্রিকা) ৪৩০

বাণী (পত্রিকা) ২১১
বান্ধব (পত্রিকা) ২,১২
বালক (পত্রিকা) ৫১৫
বাল্মীকি-প্রতিভা ৭, ৮, ৪৮৭, ৪৯১
বিচিত্রা (পত্রিকা) ৩১৯, ৩৭৫, ৪২২, ৪২৬, ৪২৭, ৫০২, ৫১২, ৫৩৯, ৫৪৭
বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ৫০২
বিজয়চন্দ্র মজুমদার ৩৭১, ৩৭৫, ৪৫০, ৫৬৩
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ৫০৬
বিজয়া ৪৩৯, ৫০০
বিদায় অভিশাপ ১১৪
বিদ্বজ্জনসমাগম ৭,৮
বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ ৫০৬
বিধুশেখর ভট্টাচার্য ৫২৬, ৫৫৫
বিনয় ঘোষ ৪৮৬
বিনয়কুমার সরকার ৪০২-৩, ৫৬৩
বিপিনচন্দ্র পাল ৩৭০, ৪৩৯, ৪৪৬, ৫৬৩
বিপিনবিহারী গুপ্ত ২২৭, ২৩০, ৪০৮, ৫৩১, ৫৩৫, ৫৬৩
বিভাস রায়চৌধুরী ৪৯২
বিমলচন্দ্র সিংহ ৪৮৪
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৪৭৮
বিশ্বপতি চৌধুরী ২৬৫
বিশ্বভারতী ৮
বিশ্বভারতী পত্রিকা ৪৮৬
বিশ্বমনা বাক্‌পতি ৪৫১
বিষবৃক্ষ ১৯৬, ২৭৫
বিসর্জন ২৬৪
বিহারীলাল গোস্বামী ৪১৩-৪, ৫৬৪
বিহারীলাল চক্রবর্তী ৭, ৭১
বীরচন্দ্র মাণিক্য ১১
বীরবল ৯১
বীরাঙ্গনা কাব্য ৫০৫
বুদ্ধদেব বসু ৩০২
বৃত্রসংহার ২২৮
বৈরাগ্য সাধন ৫৩৮
বৈষ্ণব কবিতা ৪৭৪
বৈষ্ণব সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ ৪৬৪-৭৫
বৌঠাকুরাণীর হাট ২০২
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২৩, ৫২৪
ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ২৩৫, ৩৬৭, ৫৩১, ৫৫৪
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ১৮০, ১৮১, ১৮৩, ৫৬৪
ব্রাডলার বিল ৬৭
ব্লেড্ (দি) ১৮৩
ভক্তমাল ১৫৬
ভগ্নহৃদয় ১১-১৩
ভাই হাততালি ৩৬২-৩
ভাইকার অব্ ওয়েকফিল্ড ২১
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ৪৬৯, ৪৭৪
ভানুসিংহের পত্রাবলী ৩৪৩
ভারতচন্দ্র ২২৮
ভারতী (পত্রিকা) ১, ১০, ২৩৯, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬০, ৩৭০, ৪১৩, ৪৬২, ৫১৫, ৫১৮, ৫১৯ ৫২০, ৫২২, ৫২৩, ৫২৫, ৫২৭, ৫২৯
ভারতী ও বালক (পত্রিকা) ৫৯
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৪, ৫৬৪
মডার্ন রিভিউ (পত্রিকা) ৪৩৮
মধুসূদন ৩৯৯
মন্ত্রি-অভিষেক ৫৯-৭০
মহম্মদ শহীদুল্লাহ ৪৯২
মহাভারত ৪৯৯, ৫০০
মহুয়া ৩৪৩
মহেন্দ্র কুলশ্রেষ্ঠ ৪৭৪
মাইকেল ৬

মানসী ৭১-৭০, ৩০৮ ৫০৫, ৫১০, ৫৫১
মানসী (পত্রিকা) ২৩০, ৫২৫, ৫৩৫-৮ ৫৫৫
মানসী ও মর্মবাণী (পত্রিকা) ৫৩০, ৫৩৫, ৫৩৮, ৫৪১, ৫৪৫, ৫৫১
মানুষ চিত্তরঞ্জন ৪৪৬
মালঞ্চ (পত্রিকা) ৫৪১, ৫৫১
মালিনী ২৫২
মাসিক বসুমতী (পত্রিকা) ২৬৪, ৩৩৭, ৫৪০
মিঠেকড়া ৫৪৪
মিল্টন ৬, ৬১
মুকুন্দরাম (কবিকঙ্কণ) ৬২
মুরলীধর বসু ৫৫১
মৃণালের কথা ৪৪৬
মৃত্যুঞ্জয় রবীন্দ্রনাথ ৪৫১
মেঘদূত ৪৯৮-৯
মেঘনাদবধ কাব্য ২২৮, ৫০০
মৈত্রেয়ী দেবী ৪৩১
মোহিতচন্দ্র সেন ১১৪, ১২১, ১৫৭, ৩৮৫, ৩৮৬, ৫৬৪
মোহিতলাল মজুমদার ২৭৮, ৩৪২, ৩৪৩, ৫৬৪
ম্যাকমিলান কোম্পানী ২২৭
ম্যাথু আরনল্ড ২৪৫
যতীন্দ্রমোহন বাগচী ৪৫৮, ৫৫১, ৫৬৫
যতীন্দ্রমোহন সিংহ ১৭৭, ২৬৩, ৫৬৫
যদুনাথ সরকার ১১৮-৯, ৫৬৫
যাত্রী ৩৪২
যোগানন্দ দাস ৫৫১
যোগাযোগ ৩১৯-৩৩৫
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৪৮৯
যোগেশচন্দ্র রায় ৪৫৩
রঘুবংশ ৪৯৫
রজনীকান্ত সেন ৫৭
রবিকীর্তি ৩৭২
রবিচ্ছায়া ৪৫২
রবি-দীপিতা ২৬
রবি-প্রদক্ষিণ ৩৪৩
রবিয়ানা ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩৬
রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ ৪৪৭
রবীন্দ্র জীবনকথা ১০, ২৩৮, ২৫২
রবীন্দ্র দর্শন ৪৮২
রবীন্দ্র নাট্যপরিক্রমা ৩৪৪
রবীন্দ্র-পরিক্রমা ৪৮৪
রবীন্দ্র-প্রতিভা ৪৪৭
রবীন্দ্র-বিচিত্রা ৩৫৩
রবীন্দ্র-বঙ্কিম বিতর্ক ৪৬১
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, ২০, ৪২, ৪৯, ৭৪, ১১৫, ১১৯, ১২৩, ১২৫, ১৪০, ১৫৭, ১৮১, ১৮৫, ২১১, ২৩০, ২৩৯, ২৫২, ২৭৮, ৩০১, ৩২৩
রবীন্দ্র রচনাবলী (অচলিত) ২, ১০, ১১
রবীন্দ্র-সংগীতের ত্রিবেণী-সংগমে ৪৮৭
রবীন্দ্র সংবাদ ৫৩০
রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী ৪০২
রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য ৪৫৮-৪৬১
রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য ৪৯৪
রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা ৩৭০-৭২
রবীন্দ্রনাথের কাব্যরহস্য ৩৮৬
রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিক প্রবন্ধ ৪২৯
রমণীমোহন ঘোষ ১৪০, ৫৬৫
রমাপ্রসাদ চন্দ ১২১, ২৬৪, ৩৩৫, ৩৯৪, ৩৯৫, ৫৬৫
রমেশচন্দ্র দত্ত ২২৯
রাজনারায়ণ বসু ৩৫৯
রাজশেখর বসু ৩৫২-৩, ৫৬৬*
রাজা ২৩৮
রাজা ও রাণী ৪৮, ৫৮

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৫৬
রানাঘাট বার্তাবহ (পত্রিকা) ৩৮১
রামপ্রসাদ ২২৮, ৪০৫
রামব্রহ্ম সান্যাল ৫১৬
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১২২, ২০৮-১০, ৪৮৪, ৫৬৬
রামায়ণ ৪৯৯
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ৫২৩, ৫৫৩
রুদ্রচণ্ড ১১
ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৭, ২৫২-৩, ৪০৮, ৫৬৬
লালমাধব মুখোপাধ্যায় ৯
লেখন ৫৪৬
শকুন্তলা ১২৩
শকুন্তলাতত্ত্ব ২৩২
শচীন সেন ৩৫৩
শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসর্গ ৪৮১
শনিবারের চিঠি (পত্রিকা) ৬০, ৪৬৪, ৪৭৪, ৪৭৬, ৪৯৭, ৫০১-২, ৫৪৬, ৫৫১
শব্দতত্ত্ব ৩৭২, ৪৫০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯৭, ৩৭৫, ৪২২, ৪২৬, ৫৪৪, ৫৬৬
শশাঙ্কমোহন সেন ৩৯৯
শরৎচন্দ্রের রচনাবলী ৪২৩
শশাঙ্কমোহন সেন ৫৬৭
শশিভূষণ দাশগুপ্ত ৪৮১, ৪৮৬
শান্তিদেব ঘোষ ৪৯০
শান্তিনিকেতন ২৭৬
শারদোৎসব ২৪৭
শিবরতন মিত্র ৫৫১
শিশু ১২০, ২১৬, ৪৪৬
শীতলবাবু ৯
শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় ৩৮৬
শেলি ৬১
শেষের কবিতা ৩৩৫-৫১, ৫৪৬, ৫৫০
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ৫৫১
শৈলেশচন্দ্র মজুমদার ৩৭০, ৫৩৫
শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ৯
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৫৫৬
শ্রীঅরবিন্দ ৪৭৩, ৪৭৪, ৫৫৪
শ্রীকান্ত ২৭৫
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩৬
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ১৯৬-৭, ৩৭০, ৫৩৩
সংগীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা (পত্রিকা) ৫৩৫
সংগীতে রবীন্দ্রনাথ ৪৮৭
সজনীকান্ত দাস ৪৬৪, ৪৯৬, ৫০৩, ৫৪৫, ৫৫১, ৫৬৭
সঞ্চয় ২৭৬
সঞ্চয়িতা ৪১, ৭১
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯৬
[illegible]নী (পত্রিকা) ৩৫৮
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৪৪৫
সতীশচন্দ্র রায় ১৬৮-৯, ৫৬৭
সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ১২, ১১৪, ১৪০
সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ৪৪৫
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৬৯, ৫৬৭
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ৪৪৫
সবুজপত্র (পত্রিকা) ২৫৮, ৩০১, ৩৬৯-৭০, ৫৩৪-৫, ৫৩৮, ৫৪২
সমূহ ৪৩১, ৪৮৩
সরলা দেবী চৌধুরাণী ৪১৩, ৪৬১-৬২, ৫৬৭
সরসীলাল সরকার ৩০১-২, ৫৬৮
সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ৪৭৮
সাগর সংগীত ৪৩০
সাধনা (পত্রিকা) ৩৬৪, ৫১৩-১৪, ৫১৫
সাহিত্যধর্মের সীমানা ৩৭৫
সাহিত্য সেবকের ডায়েরী ৫১৯

সাহিত্য (পত্রিকা) ৪৯, ৫৬, ৫৭, ৭২, ১১৫, ১১৭, ১২১, ১৮৪, ১৯৬, ৩৬৪, ৩৬৭, ৩৯৯, ৪৩০, ৪৪৫, ৫৫১
সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা ১৯৭, ২৬৩-৪, ২৭৫
সাহিত্যে স্বেচ্ছাচার ৩৮১-২
সাহিত্যের মাত্রা ৪২২
সাহিত্যের রীতি ও নীতি ৪২৬
সীতারাম ২২৮
সুকুমার সেন ৩৪৩
সুখরঞ্জন রায় ১৮৪, ৫৬৮
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ৪৫১
সুধীরঞ্জন দাশ ৪৮৮
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪৫১
সুপ্রভাত (পত্রিকা) ৫২৯
সুবোধ সেনগুপ্ত ২০১, ৩০২, ৩৫৩
সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৫১
সুভাষচন্দ্র বসু ৫৫৬
সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ২৫৯, ২৭৬, ২৭৮, ৫৬৮
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৭১
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ৫৬, ৭২, ১৯৬, ২৬৪, ৩৬৩, ৩৬৭, ৪৩০
সুশীলকুমার গুপ্ত ৫০০
সুশোভন সরকার ৪৮৬
সূর্য্যাবর্ত্ত ৪৫
সেক্ষপীয়র ৬১? ৪৯৫
সৈয়দ মুজতবা আলি ৪৮৯
সোনার তরী ১১৮, ১২১, ২৪০, ৩৬৭, ৩৮৮, ৩৯৪, ৩৯৫-৬, ৫০৪, ৫২৮-৯
সোফিয়া (পত্রিকা) ১৮০
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৮৯
স্মরণ ২১৭
স্বদেশ ও সভ্যতা ৪২৭
স্বর্ণকুমারী দেবী ৪৬১
হরপ্রসাদ মিত্র ৪৯১
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৯, ৫৫২
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৬৮
হরিশ্চন্দ্র মিত্র ১
হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮১-২
হিরণ্ময়ী দেবী ৪৬১
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৫৫৪
হুমায়ুন কবির ৪৩৭, ৪৭৪
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৬, ৩৬২, ৪৭৮
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৪১, ২৫৬, ৩৯৫, ৫১৬, ৫৫৫

॥ জ্ঞাতব্য ॥

অরসিক রায় স্বর্গত সজনীকান্ত দাসের ছদ্মনাম। পরিশিষ্ট 'ক' অংশে তাঁহার ছদ্মনাম ব্যবহৃত হইলেও, 'লেখক-পরিচিতি'র মধ্যে তাঁহার নিজস্ব নামই উল্লিখিত হইয়াছে।